ছে

অধ্যাপ

(১৩৪৩)

	পৃষ্ঠা
ধ্যায় ...	৫৮৯
...	৯
...	৫৩৮
...	৪৭১
-এস্-সি ...	৬১২
...	১৮০
...	৩৫০
...	১৪
...	৪৭২
ম্-এ, বি-এল্ ...	৫২১
...	৫৬০
এ ...	২৮৮
	, ২১৫, ২৬৫, ৩১৬, ৩৬৮,
	, ৪৭০, ৫৪১, ৫৯৩, ৬৪৩
...	২৬২
...	৪৫৪
...	২৬১
ম্-এস্-সি ...	৬২১
...	৩৪৫
-এস্-সি ...	৭৪
...	৩৭৭
...	৫৪৩
...	৫৩৫
...	৫৩০
	৩৩৯, ৩৯০, ৬০৯

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
কেশ কর্ষণের করুণ কাহিনী (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	১১৬
ক্যালেণ্ডারের কাণ্ড (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	২৩১
খেলা-ধূলা ...		৩৫২
খোকার কথা (কবিতা) ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ	২৬৪
খোকার কল্পনা („) ...	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৫৭
গরিলার প্রতিহিংসা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে	৬০৩
গৃহহারা („) ...	শ্রীমতী ভারতী দেবী	১৫৭
গ্র্যাণ্ড্‌সান্ অব্ কং (গল্প) ...	শ্রীনিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	১৪৬
ঘুম পাড়ানী গান (গান) ...	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ	৫০৮
চূণবর্ণ-শ্রীদাম কথা (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্	২৯৫
চেরাপুঞ্জি (ভ্রমণ) ...	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১১১
চোর (গল্প) ...	শ্রীরজত সেন	৫৪৫
চৌকি নিয়েই গোলমাল (গল্প) ...	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	২০৪
ছুটীর খেলা ...	শ্রীজয়ন্তকুমার বসু, বি-এস্-সি	২৪১
ছোট একটি মেয়ে ছিল (গল্প) ...	শ্রীরজত সেন	৬০০
ছোটদের চিত্রশালা (ও চিত্রশালা)...		৫৫, ৯৬, ১৫৮, ২৬৫, ৩১৩, ৩১৪, ৪১৫, ৪৫৯, ৫৩৭, ৫৯৭
ছোট্ট ক্যামেরা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী	১০
জানা উচিত ...	শ্রীঅমিয়কুমার দাস	৩১৩
জাপান ! জাপান !! (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীজগৎমোহন সেন	৫৫০
জীবন ও মরণের বিচিত্র দোলায় (গল্প)	শ্রীসত্যগোপাল	২৫৪
জংলী আবহাওয়ার পরশ (শিকারের গল্প)	শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়	৪২২
জ্যান্ত পিসের শ্রাদ্ধ (গল্প) ...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি	৫০৯
টুনি (কবিতা) ...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত	৪২১
তারে চন্দ্রার নানান্ ফ্যাসাদ (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৪৩০
তিনটে ইঁদুর-বাচ্চা (গল্প) ...	শ্রীসুকুমার দে সরকার	৬৮
তিমি শিকার (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	১৮৭
তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ্ (প্রবন্ধ) ...	শ্রীরমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	১০৫
১৩৪২ সালের রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল ...		৫০
দন্তচর্য্যা (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি	১৭২
দরদী বুড়ো (গল্প) ...	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩৮২
ধর্ম্ম (প্রবন্ধ) ...	কুমারী অরুণা বাগ্‌চী	৪৫৭

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
ধাঁধার উত্তর		৫৫, ১০৮, ১৫৯, ২১৫, ২৬৫, ৩১৬, ৩৬৬, ৪১৭, ৪৭০, ৫৪১, ৫৯৩
নক্ষত্রের কথা (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	২৭১
নদীর চরের দৈত্য (গল্প)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৪৮৯
নাপিতের কাণ্ড (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	৪৪২
নিরুদ্দেশ রহস্য (গল্প)	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী	৪৯৫
নূতন ধাঁধা		৫৬, ১০৮, ১৬০, ২১৬, ২৬৬, ৩১৬, ৩৬৭, ৪১৮, ৪৭০, ৫৪২, ৫৯৪, ৬৪৭
নূতন বছর (কবিতা)	শ্রীরামপ্রসাদ সিং	২১৩
নেপচুন ও প্লুটো (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	৩১
পথের রাত্রি (গল্প)	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	৬২৯
পতিতপাবনের প্রতিভা (গল্প)	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	১৯৪
পরলোকগত সম্রাট্ (জীবনী)	শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪
পুস্তক-পরিচয়		১০৮, ১৬০, ৫৩৮, ৫৯১
পূজা সংখ্যা রামধনু		৪৬৯
পৃথিবীর আর এক রূপ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	১২৫
প্রৌষ-প্রাতে (কবিতা)	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৬৪৪
বইছে ফাগুন বায় (কবিতা)	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৮৩
বর্ম্মার দাদামশাই (গল্প)	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ	৩
বল্লাল সেন (ইতিহাসের কথা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্	১৩৯
বয়সে কি বুদ্ধি বাড়ে ? (গল্প)	শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্-এস্-সি	৪৬১
বাজার করা সোজা নয় (গল্প)	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	২৬৮
বাদল (কবিতা)	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩১৩
বাড়ী বদল (গল্প)	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	২২৪
বায়ুমণ্ডলের কথা (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীধ্রুবচন্দ্র মল্লিক	৪০৫
বিজ্ঞাপনের বহর (গল্প)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি	৩৮
বিপিন বাবুর ধাড়াবাড়ি	শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪
বিয়োগান্ত জলযোগ (গল্প)	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	৩৪২
বীরবাহুর বনিয়াদী চাল (গল্প)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি	১৬৪
বুনো হাতীর কবলে (শিকার-কাহিনী)	শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্	৪৭৮
বেতার-কাহিনী (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	৫০৩
ভ্রম-সংশোধন		১৫৬
ভ্রাতৃ প্রেম (কবিতা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্	৫৭

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
মকরধ্বজের ধাক্কা (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩২৮
মনুষ্য-প্রাণ (কবিতা)	শ্রীরমা দে	৫৮৯
মর্ণিং ইস্কুল (কবিতা)	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৭
মাতৃভক্ত (কবিতা)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	২৩০
মায়ের ডাক (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৬১
মার চিঠি (কবিতা)	কাদের নওয়াজ	২৬৭
মা-হারা (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৬৭
মেঘলা দিনে (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৬৯
মেজ মামার এক্সপেরিমেণ্ট (গল্প)	শ্রীমতী নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়	৪৪৮
যন্ত্রহীন ব্যায়াম (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি, বি-ই-এস্	৩১৯
যুধিষ্ঠির বাবু ও টম্ (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	[illegible]
রঙ্গ	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪৯
রঙ্গকণা	শ্রীরমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫, ৬০
রঙ্গকণা	শ্রীহিরণলাল সান্যাল	৬৪২
রঙ্গচিত্র	শ্রীসুমথনাথ মিত্র	৩৩৭
রামধনুর শততম সংখ্যা	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্, বি-সি-এস্	২০১
রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা		৫৩৯, ৫৯১
লিফ্‌ট্‌ম্যান্ (গল্প)	শ্রীসুকুমার দে সরকার	১৩২
লেখক ধনগোপাল (জীবনী)	শ্রীনির্ম্মলকুমার সরকার	৩৯৪
শরতের সাদা মেঘ (কবিতা)	শ্রীনলিনী দাশগুপ্ত এম্-এ	৪৪৮
শান্তিধামের অশান্তি (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্	৫৬৯
শিলং ত্যাগ (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ	৫৯৫
শিলং যাত্রা (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ	৪৮৪
শীত (কবিতা)	শ্রীভারতী সেন	৬৪২
শেষ গোলাপ (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর	১
শোক-সংবাদ	শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র	৬৪৩
শ্রাদ্ধের ভোজ (গল্প)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি	২৮০
শ্রাবণ মাসের বর্ষা (কবিতা)	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ	৩৮৮
শ্রাবণ-সাঁঝে (কবিতা)	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৭
শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী	শ্রীহেমলতা দেবী	২৩৫
সন্দেশ		৫৩, ১০৭, ১৫৮, ২১৪, ২৪৪, ৩১৫, ৩৬৪, ৪১৬, ৪৬০, ৫৪০, ৫৯২, ৬৪৪

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)		লেখক		পৃষ্ঠা
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (গল্প)	...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	...	৬১
সভ্যতার গোড়াপত্তন (ইতিহাসের কথা)		শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ	...	৫১৫
সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক	...	...	...	৫৩৯,
সম্পাদকের বিপদ্ (গল্প)	...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি	...	৯৭
সর্প নদীর সন্ধানে (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	...	৫৬২
৭ই পৌষ (ভ্রমণ)	...	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত	...	৩৫৫
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা	...	...		৩৩৭, ৩৮৯, ৫৩৮, ৬১৩
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর	...	...		৩৬৮, ৪২০, ৫৪২, ৬৪৭
সোনার হরিণ (ধারাবাহিক উপন্যাস)		অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্		৪৬, ৮৮,
	...	১৫২, ২৪৫, ২৪৮, ৩০৮, ৩৫৮, ৪১০, ৪৬৪, ৫৭৯, ৬৩৪		
স্বপন পরী (কবিতা)	...	শ্রীরমা দেবী	...	১০৯
স্বপ্ন (গল্প)	...	শ্রীযমুনাবিহারী মিত্র	...	৫১
স্বপ্ন (কবিতা)	...	শ্রীপিনাকীশঙ্কর সেন	...	৮০
স্বপ্ন (গল্প)	...	কুমারী রুবী চ্যাটার্জ্জি	...	৮১
হঠাৎ (বিজ্ঞানের কথা)	...	শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্-সি	...	২১৯
হাসি-কান্না (কবিতা)	...	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	১৬৩
হিংসুটি রিপীটস্ (গল্প)	...	শ্রীবুদ্ধদের বসু	...	৩৭০

বিষয় (
ধাঁধার
নক্ষত্রের
নদীর চ
নাপিতে
নিরুদ্দে
নূতন ধ
নূতন বা
নেপচুন
পথের র
পতিতু
পরলোক
পুস্তক-
পূজা স
পৃথিবীর
প্রৌষ-প্র
বইছে ব
বর্ম্মার
বল্লাল
বয়সে
বাজার
বাদল (
বাড়ী বা
বায়ুমণ্ড
বিজ্ঞাপ
বিপিন
বিয়োগ
বীরবার
বুনো হা
বেতার
ভ্রম-সং
ভ্রাতৃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

৯ম. বর্ষ | মাঘ, ১৩৪২ | ১ম সংখ্যা

শেষ গোলাপ

(শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর)

গেছে মধুমাস, শুকায়ে ঝরেছে
সকল গোলাপগুলি,
বুলবুলি আর মিঠে বোল তুলি
যায় নাক' হেথা বুলি'।
সব দিল ফাঁকি আছিসু একাকী
শেষ বিদায়ের বাণী,
জীবন-পথের একলা পথিক
পথ আর কতখানি ?

বিষয় (
ধাঁধার
নক্ষত্রের
নদীর চ
নাপিতে
নিরুদ্দে
নূতন ধ
নূতন বা
নেপচুন
পথের র
পুতিতু
পরলোক
পুস্তক-
পূজা স
পৃথিবীর
পৌষ-পু
বইছে হ
বর্ম্মার দ
বল্লাল
বয়সে দি
বাজার
বাদল
বাড়ী বা
বায়ুমণ্ড
বিজ্ঞাপ
বিপিন
বিয়োগ
বীরবাল
বুনো হ
বেতার
ভ্রম-সং
ভ্রাতৃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

৯ম. বর্ষ } মাঘ, ১৩৪২ { ১ম সংখ্যা

শেষ গোলাপ

(শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর)

গেছে মধুমাস, শুকায়ে ঝরেছে
সকল গোলাপগুলি,
বুলবুলি আর মিঠে বোল তুলি
যায় নাক' হেথা বুলি'।
সব দিল ফাঁকি আছিস্ একাকী
শেষ বিদায়ের বাণী,
জীবন-পথের একলা পথিক
পথ আর কতখানি ?

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

ব্যথার ব্যথী বা মরমের কথা
শুনিতে সাথীটি নাই ;
তিল তিল ক'রে দাহ স'হে তোরে
মরিতে দিব না ভাই।
প্রিয়জন গুলি ঘুমায় যেথায়
এই বাগিচার গোরে,
তোরো সেথা ভাই হোক্ আজ ঠাঁই
বোঁটা হ'তে যাও ঝ'রে।
এমনি করিয়া বান্ধবগুলি
চলে যাবে যবে ছাড়ি,
আমিও তাদেরি পিছু পিছু আহা
চলে যেতে যেন পারি।
ভোরের আলোতে আশমান হ'তে
রাতের তারার মত,
সবে হাসিভরা সংসার হ'তে
একে একে যবে গত,
ভাঙা বুক নিয়ে কবরের ধারে
একা কে জাগিবে রাতি ?
তোর মত যেন আমিও হই রে
বন্ধুগণের সাথী।*

---

* ইংরাজী কবিতার ভাবানুসরণে।

বর্ম্মার দাদামশাই

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ)

রবিবার ; ইস্কুল ছিল না। "হাফ এ-ডজন" মামার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম বাজার করতে। "হাফ-এ-ডজন" মানে ছ'জন মামা নয়। মামা একটিই ; ওটা তাঁর একটা বিশেষণ। মধ্যপ্রদেশের কোন্ এক রাজ-এষ্টেটে মামা বড়দরের চাকুরে। সেখানে শালবনের মধ্যে কোন জিনিষই পাওয়া যায় না। সেইজন্যে ফি বছর শীতকালে মামা কলকাতা এসে বছরের মত বাজার করেন। তাঁর নিয়ম হচ্ছে, যা কিছু কিনবেন জুতো, জামা, ছাতা, ঘড়ি—সব অন্ততঃ হাফ্-এ-ডজন। কোন ক্ষেত্রেই এ নিয়মের নড়চড় চল্‌বে না। মামীমার এক দিন চালকুমড়ো খাবার সাধ হ'য়েছিল ; মামাকে জানাতেই হাফ্-এ-ডজন বড় বড় চালকুমড়ো চলে এল। আর একবার সংসারের জন্য শীলনোড়া আর বঁটি কেনার দরকার হয়েছিল ; পরদিনই বাজার থেকে হাফ্-এ-ডজন শীলনোড়া আর হাফ্-এ-ডজন বঁটি এসে হাজির।

এবারে হল্ এণ্ড্ এণ্ডারসনের দোকানে মামার জুতোর অর্ডার ছিল। ছ' জোড়া জুতো পছন্দ করে প্যাকিংএর জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময়ে তাকিয়ে দেখি ওদিকের একটা চেয়ারে আমাদের সুধীর—একটা বেশ দামী জুতো পায়ে ঢোকাচ্ছে। সঙ্গে তার বাবাও আছেন। প্রথমেই মনে হল ভুল দেখ্‌ছি। সুধীরের বাবাকে আমরা চিনি তো ! সেবার সরস্বতী পূজোর জন্যে চার আনা চাঁদা আদায় করতে চার দিন হাঁটাহাঁটির পর পাওয়া গেল পাঁচ পয়সা এবং সেই সঙ্গে দু'চারটে কথা যা শোন্‌বার পরে বাকী এগার পয়সার দুরাশা আর রাখি নি।

সেই ভদ্রলোক জুতো কিনতে ঠনঠনে কিংবা চীনা-বাড়ী না গিয়ে এসেছেন সাহেব-বাড়ী ! কাছে গিয়ে দেখ্‌ব ভাবছি, এমন সময় সুধীর নিজেই এগিয়ে এল। হাতে একটা কার্ড্‌বোর্ডের বাক্স ; ভেতরে, বল্‌লে, স্যুট্—র্যাঙ্কিনের বাড়ীতে তৈরী ! !

জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'ব্যাপার কি রে ?'

'সুধীরের মুখ উজ্জ্বল ; বল্‌লে, 'শুনিস্ নি বুঝি ? বর্ম্মার দাদামশাই এসেছেন যে ! দেখা করতে যেতে হ'বে।'

এক কথায়ই সব বোঝা গেল। এই বর্ম্মার দাদামশায়টির নাম অন্ততঃ পঁচিশবার শোনে নি এমন লোক সুধীরের পরিচিত মহলে নেই। এঁকে আমরা দেখি নি, কিন্তু তৈমুর লঙ্ বা ভাস্কো-ডি-গামার মত এঁর ইতিহাস আমাদের কণ্ঠস্থ। বর্ম্মার কোন্ সহরে কিসের ব্যবসা করে কত লাখ টাকা তিনি জমিয়েছেন, সব এক নিঃশ্বাসে বলে দিতে পারি। এই লাখপতি দাদামশা'য়ের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সুধীর—কেননা তাঁর আর কেউ কোথাও নেই। সুধীর এ কথা অনেক দিন আমাদের শুনিয়েছে। সেজন্যে পরীক্ষায় বার বার ফেল্ করেও দমে যায় নি। পণ্ডিত মশায়কে আশ্বাস দিয়েছে যে, সম্পত্তিটা পেলেই তাঁকে নিজের বাড়ীতে একটা টোল করে দেবে। এর পর থেকে পণ্ডিত মশায় আর কোন গোলমাল করেন না।

বল্‌লাম, 'তোর দাদামশায় কোথায় উঠ্‌লেন ? তোদের বাড়ীতে ?' সুধীর চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, 'বলিস্ কি ? আমাদের বাড়ী ! অত বড় সাহেব মানুষ ? উঠেছেন বালীগঞ্জে। বাবা বল্‌লেন, প্রথম দিন একটা ভালো সুট্ পরে যাওয়াই ভালো। তা না হ'লে হয়তো চটেই যাবেন। সাহেব-সুবোর মেজাজ তো, বলা যায় না !'

পর দিন ইস্কুলে সুধীরের দেখা পাওয়া গেল না। ছুটির পর বাড়ী ফিরে জামা-কাপড় ছাড়ছি, নিধে চাকর এসে বল্‌লে, একটি সাহেব বাবু এসেছেন দেখা কর্‌তে। তাড়াতাড়ি চুলটা ঠিক করে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি—সুধীর। পায়ের নখ থেকে মাথার ডগা পর্য্যন্ত নিখুঁৎ সাহেবী পোষাকে মোড়া।

বল্‌লাম, 'হ্যালো মিষ্টার রয়, আই য়্যাম্ সো গ্ল্যাড্...'

'থাম্, থাম্, চল্ বেরিয়ে পড়ি।'

'বেরোবো ! কোথায় ?'

'কেন, দাদামশায়ের বাড়ী !'

'সর্ব্বনাশ ! সেখানে আমি কি কর্‌ব ?'

সুধীর অনুনয় করে বল্‌লে, 'না ভাই, চল্। আমার একা যেতে সাহস হচ্ছে না। যদি ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলেন, একটু সাহায্য করবি। আমার ইংরাজী-জ্ঞান তো জানিস্ ?'

'কিন্তু আমার যে সুট্ নেই !'

'সুট্ নেই ? তা আর কি হবে ? তুই পেছনে থাকিস্'খন।'

সুধীরকে এড়ানো যায় না। যেতে হ'ল। বাড়ীর নম্বর ছিল, খুঁজতে খুঁজতে প্রায় পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এসে পড়্‌লাম। একটি ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। সুধীর জিজ্ঞাসা করলে, 'মিষ্টার রসরাজ রয়ের বাড়ীটা জানেন ? এ পাড়ায় নতুন এসেছেন বর্ম্মা থেকে।'

ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে বল্‌লেন, 'ঐ সাদা পাঁচীল। একটু সাবধানে ঢুকবেন।'

সুধীর রুমাল দিয়ে মুখটা একবার মুছে কোট্ হ্যাট্ সব ঠিকঠাক করে নিলে।

বাড়ীর ভিতর থেকে খোল-করতালের আওয়াজ কানে এল। সাহেবের বাড়ীতে খোল ! সুধীর বল্‌লে, 'লোকটা গাঁজা খায়, এ বাড়ী হ'তেই পারে না।'

আমি বল্‌লাম, 'তবু যখন এত দূর এসেছি, একবার ঢুঁ মেরেই দেখা যাক্।'

ভেতরে ঢুকতেই উঠোন। সেখানে কীর্ত্তনের আসর বসেছে। আমাদের দেখে একটি বাবাজি গোছের লোক এগিয়ে এল, 'কি চাই ?'

'মিষ্টার রসরাজ রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনারা কারা ?'

'আপনি চিন্‌বেন না। উনি এ বাড়ীতে থাকেন কি ?'

'থাকেন। কিন্তু এখন দেখা হবে না।'

'আচ্ছা সে আমি বুঝ্‌ব' বলে সুধীর গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেল। আমিও সঙ্গ নিলাম। তিন-চারজন বাবাজি 'রা রা' করে ছুটে এল। তার আগেই আমরা সামনের বড় ঘরটায় ঢুকে পড়েছি। ভীষণ অন্ধকার, প্রথমটা কিছুই দেখ্‌তে

পেলাম না। অনেকক্ষণ তাকাবার পর দেখলাম, ওদিকের কোণে একটা লোক বসে। খালি গা, মাথা ন্যাড়া, বুকভরা বড় বড় লোম, গলায় এক বোঝা তুলসীর মালা; পরনে আট হাত ধুতি। লোকটা এমনি রোগা যে চামড়ার ভেতর থেকে হাড়গুলো যেন বেরিয়ে আস্‌ছে। ভাঙা গলায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, 'কে—কে—কে তোরা? কি চাই এখানে?'

আমরা হ'টে এলাম। কে একজন লোক এসে আমাদের গায়ে মাথায় কিসের খানিকটা জল ছিটিয়ে দিল। হায়রে র‍্যাঙ্কিনের সুট্! তাদের হুকুমে জুতোও খুল্‌তে হ'ল। তার উপরেও খানিকটা তুলসী-জল ঢেলে দিল।

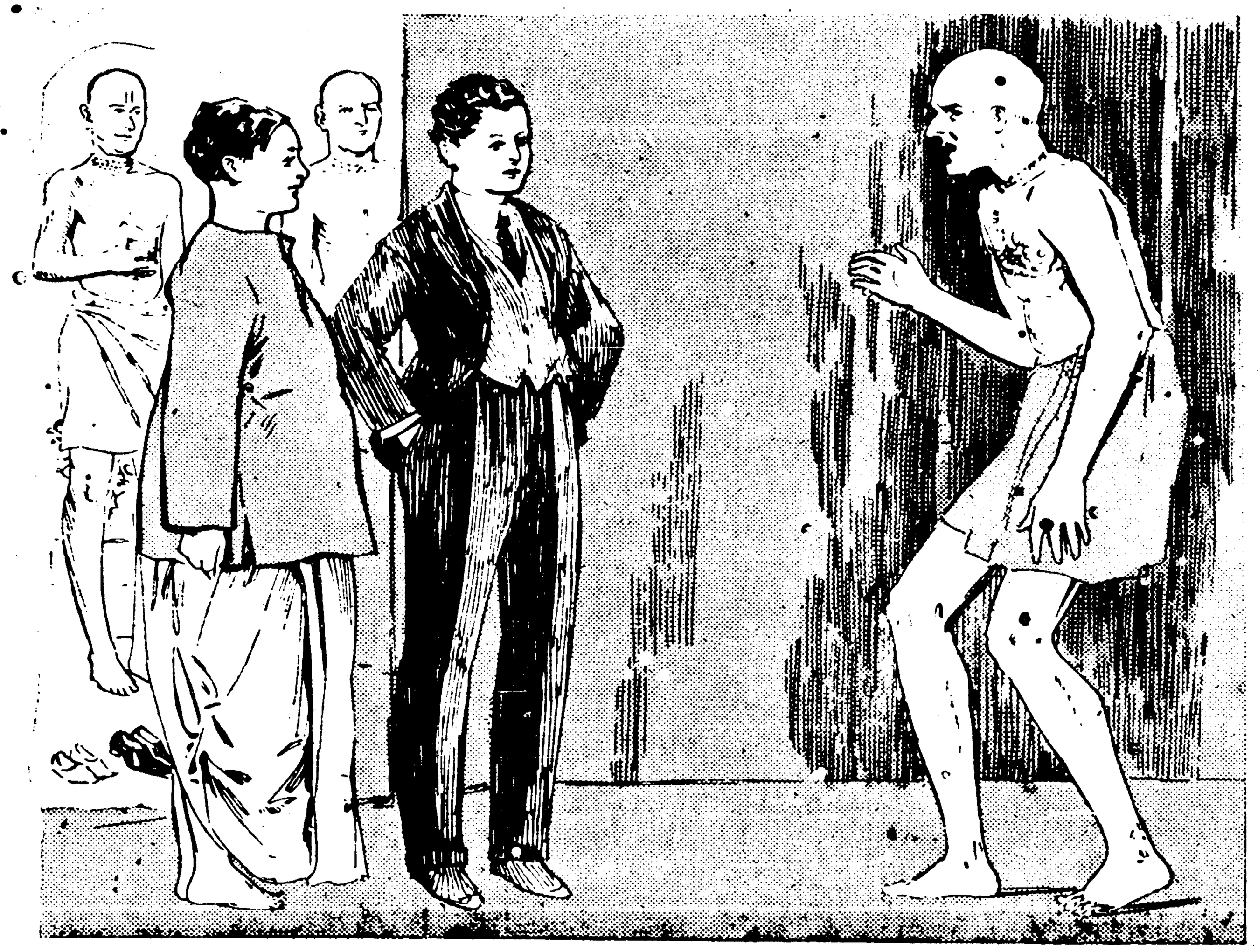

ফুট্‌বলের চাঁদা আমি দিই না

রোগা লোকটা দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিল। সুধীর বল্‌লে, 'আমরা মিষ্টার রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই—মিষ্টার রসরাজ রয়।'

লোকটা মুখ ভেংচে বল্‌লে, 'আজ্ঞে আমিই সেই অধম। মিষ্টার-ফিষ্টার

নই, রয়-টয়ও নই। সোজাসুজি রসরাজ রায়। আপনাদের শুভাগমনের হেতুটা কি? ফুটবলের চাঁদা আমি দিই না।'

সুধীর বল্‌লে, 'আজ্ঞে সেজন্য আসি নি। আমি আপনার নাতি, বৃন্দাবন রায় মশায় আমার পিতা।'

'কোন্ বৃন্দাবন?'

'আপনার ভাইপো, উত্তরপাড়ায় ১৩ নং—বসাক লেনের'—

'ওঃ বেন্দা? তার ছেলে এমন বাঁদর হয়েছে? সাজটা তো দেখ্‌ছি চমৎকার! একটা ল্যাজ লাগাও নি কেন? সুন্দর মানা'ত। তা' এখানে কি মনে করে? সঙ্গে এটি কে?'

সুধীর একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল। তাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলাম, এবং শীতের রাতে সেই ভিজে জামা-জুতো পরে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরলাম।

(২)

'দমে যাওয়া' কথাটা সুধীরের অভিধানে ছিল না। দিন সাতেক পরে রাস্তায় দেখা। চিনতেই পারি না। মাথাটা কামানো, পরনে গেরুয়া, গলায়, হাতে তুলসীর মালা, খালি পা। বল্‌লাম, 'ব্যাপার কিরে?'

সুধীর করুণ ভাবে বল্‌লে, 'এর মধ্যে আর একবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ফল সেদিনের মতই গলাধাক্কা। তবু হাল ছাড়তে পার্‌ছি না। চোখের উপর আমার মুখের গ্রাস ঐসব ন্যাড়ামাথাগুলোর উদরস্থ হবে, কেমন করে সহ্য করি বল্ ত'? তাই এই রাস্তা ধর্‌লাম। তবে এইবারই শেষ। চল্ না,…'

সুধীরকে এড়ানো যায় না। তা ছাড়া একটু কৌতূহলও ছিল। চল্‌লাম।

আজও কীর্ত্তন হচ্ছিল। ভক্তবর রসরাজ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আমি দরজার পাশে দাঁড়ালাম। সুধীর সোজা সেই দলের মধ্যে গিয়ে বস্‌ল। গানটা বেশ জমে উঠেছে; যে খোল বাজায় সে এত জোরে মাথা নাড়ছে, মনে হ'চ্ছে মাথাটা যে কোন সময়ে গলা থেকে ছিট্‌কে পড়ে যাবে। হঠাৎ এক প্রলয় কাণ্ড। সুধীর লাফ দিয়ে উঠে ধপ্পাস্ করে সটান মাটিতে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাউ হাউ করে আকাশ ফাটিয়ে কান্না। সে কী আর্ত্তনাদ! যেন তার একটা হাত বা পা

কেউ কেটে নিয়ে গেছে। কীর্ত্তন গেল থেমে; সবাই মিলে তাকে টেনে তুল্‌ল। রসরাজ বল্‌লেন, 'কি হয়েছে তোর? চেঁচাচ্ছিস্ কেন?'

সুধীর বুক চাপড়ে বল্লে, 'বুক ফেটে গেল প্রভু, বুক ফেটে গেল। শ্রীরাধার দুঃখ আর সইতে পারছি না। আমায় কৃপাকণা দিন।'

ভক্তের দল ছবির মত দাঁড়িয়ে; রসরাজ গম্ভীর ভাবে বসে; আর সুধীর শ্রীরাধার শোকে পাগল···। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে এলাম।

মাস তিনেক পরে দেখা। সুধীর বেচারা একেবারে আধখানা হ'য়ে গেছে। বল্‌লাম, 'করছিস্ কি! মরে যাবি যে!'

সুধীর বল্‌লে, 'আর কোন রকমে দিন পনেরো। বুড়োর হয়ে এসেছে। উইল্‌টা না হওয়া পর্য্যন্ত লেগে থাকতেই হবে।'

'এখনও তেম্‌নি হাউ হাউ করছিস্ পড়ে পড়ে?'

'নাঃ, ঐ একদিনের কান্নার চোটেই একেবারে প্রধান চেলা হয়ে গেছি। এখন সমস্ত কাজের ভার আমার ওপর। তামাক সাজা থেকে ওষুধ খাওয়ানো। সেবা যে রকম করছি, ঐ সিন্ধুক বোঝাই কোম্পানীর কাগজগুলো আর কারুর ভাগে একখানা পড়বে বলেও মনে হয় না।'

তার পর এক দিন শুনলাম, রসরাজ মারা গেছেন, অর্থাৎ দেহরক্ষা করেছেন। উইল তার আগেই হ'য়ে গিয়েছিল। উকিল ছাড়া আর কেউ এখনো জানে না। তবে সকলেই বুঝে নিয়েছিল প্রায় সমস্ত টাকাটা সুধীরকেই দেওয়া হয়েছে।

সেদিন উইল পড়া হ'বে। সুধীর এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আজ তার পায়ে পাম্প্-শু, পরনে জরিপাড় শান্তিপুরী, গায়ে মটকার পাঞ্জাবী। চেলার দল সব উপস্থিত। উকিল উইল পড়ে চলেছেন—'* * * যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি বিগ্রহ মদনগোপালের সেবায় ব্যয়িত হইবে। শ্রীমান্ যাদবচন্দ্র সেন তাহার সেবায়েত নিযুক্ত হইল। * * * নগদ্ টাকা আর কোম্পানীর কাগজ নগেন, বিনোদ, ভজুয়া এবং রামাচলম্ সমান ভাগে পাইবে।······

সুধীর অধীর হ'য়ে উঠেছিল। আর থাক্‌তে না পেরে মাঝখানেই বলে উঠ্‌ল—"আর আমি?"

উকিল বল্‌লেন, 'আপনার কথাও আছে; শুনুন:

'আমার প্রিয়তম শিষ্য সুধীরকুমার মহাপুরুষ। তাহাকে তুচ্ছ সম্পদের মায়ায় আবদ্ধ করিয়া যাইতে চাহি না। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ আর নামকীর্ত্তনের জন্য আমার একতারাটি দিয়া যাইতেছি।······'

সুধীর লাফিয়ে, চেঁচিয়ে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুল্‌ল। 'আমি দেখে নেব··· দেখে নেব···ভণ্ড, জোচ্চোর, পাজি, শুঁটকো বুড়ো···'

সেদিন অতি কষ্টে তিন জনে মিলে ধরাধরি করে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে হয়েছিল।

অতীত

(শ্রীবিষ্ণু দে, এম্-এ)

গেলো যেই দিন, রেখে গেলো কিছু স্মৃতি?
ধূলিই উড়ালো প্রখর অশ্বক্ষুরে?
পিছু ধাও তবে? সে যে মরণের রীতি!
তুষারশুভ্র আরোহী যে বহু দূরে!

গেলো যেই দিন, দায়ভাগে তার স্মৃতি
নিষেধ করে কি নবজীবনের গীতি?
হাওয়ায় যে ধূলি উড়ালো অশ্বক্ষুরে
সে হাওয়া ছড়ায় জীবনেরই অঙ্কুরে!

কুমার! তোমার বাহুতে বীরের মুক্তি।
দেখি তব হাতে শ্বেত আরোহীর বর্শা?
সে কি রেখে গেছে তব সাথে গূঢ় চুক্তি?
কুমার, তুমিই আমাদের দাও মুক্তি।
তোমারই বাহুতে আমাদের আশা-ভরসা।

ছোট্ট ক্যামেরা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

রামায়ণে পড়েছি, সীতাহরণের পর বানরেরা পৃথিবীর চারি দিকে সীতার খোঁজে ঘুরেছিল। যেখানে ভীষণাকার রাক্ষসেরা মানুষের ছায়া ধ'রে মানুষকে খেয়ে ফেলে, সেখানেও নাকি তা'রা সীতার খোঁজ করেছিল। কি সর্ব্বনাশ! ছায়া ধ'রে খাওয়া! অর্থাৎ কিনা, ঘোর অন্ধকার ছাড়া সেখানে যাওয়াই বিপদ্।

এখনকার দিনে ছায়া ধ'রে খাওয়াটা সম্ভব হয় কিনা কেউ বল্‌তে পারে না; কিন্তু, ফটোগ্রাফারের বুদ্ধি যে ছায়াকে খুব ভাল ক'রেই ধর্‌তে পারে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাক্‌বে না এই ছবিটি দেখ্‌লে। সাহেব, মেম আর তাদের ছেলে—এই তিন জনের ছায়া কেমন গম্ভীর ভাবে হেঁটে চলেছে একবার দেখ। সে আবার কি! হ্যাঁ, ছায়াই বটে। তবে, ছায়া যখন আছে তখন কায়াও নিশ্চয়ই আছে। ছবির নীচের দিকে একবার দেখ। ব্যাপারটা হয়েছে এই:—সাহেব, মেম তাঁদের ছেলেকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। দোতালা থেকে ফটোগ্রাফার ক্যামেরার মুখটি নীচু ক'রে তাঁদের ছবি তুলে নিয়েছেন।

ছায়া…হেঁটে চলেছে।

আর একটি ছবিতে দেখ, একটি ছেলে অনায়াসে তা'র বন্ধুটিকে এক হাতে তুলে ধরেছে; বন্ধুটি মাথা নীচের দিকে রেখে কেমন হাস্‌ছে! ছেলেটির গায়ে

জোর আছে বটে! কিন্তু সবই যে ফাঁকি। তুলে ধরা-টরা কিছু নয়;—দুটি ছেলে শুয়েছিল—এর হাতের উপর ওর মাথা; এমন সময় ফটোগ্রাফার উপর থেকে ক্যামেরার মুখ নীচু ক'রে ছবি তুলে নিয়েছেন। এখন ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হয়েছে তো?

ক্যামেরার ফাঁকি—একটি ছেলে তার বন্ধুকে এক হাতে তুলে ধরেছে।

বলা বাহুল্য, এই ধরণের ছবি তুল্‌তে হ'লে ছোট্ট হাল্কা ক্যামেরা চাই; নইলে ফটোগ্রাফারকে অনেক কষ্ট ক'রে ক্যামেরা সাম্‌লাতে হবে, চট্‌ ক'রে ছবি তোলাও যাবে না।

এখনকার দিনে ফটোগ্রাফারের ভাবনা কিসের? আগে ছিল ছোট ক্যামেরা কেবল সখের ফটোর জন্য। আজকাল কিন্তু তা' নয়। অত্যন্ত ছোট ছবি,—যা'কে "ছো—ও—ও—ট্ট ছবি" বলা যায়,—তা'কেও বড় ক'রে "এন্‌লার্জ্জ্" কর্‌লে সুন্দর ছবি হয়। কাজেই, ছোট ক্যামেরারই আজকাল আদর বেশী। ছোট্ট হাল্কা জিনিষটি, চট্‌ ক'রে খাটিয়ে ফেলা যায়, অনেকগুলি ছবি পর-পর তোলা যায়, দিনের বেলা ফিল্ম্ ভরা যায় আর বদ্‌লান যায়, এক-একটি ছবি তোলার খরচ খুব কম হয়; তা' ছাড়া, খুব কম 'এক্স্‌পোজারে' ছবি তোলা যায়, দিনে এবং রাত্রে তোলা যায়। আর কি চাই?

ছবি তোলা হ'য়ে গেলে যেগুলি খুব ভাল হয়েছে সেগুলি থেকে একটু বড় ছবি "এন্‌লার্জ্জ্" ক'রে তুলে নিলেই হ'লো। সহজে এবং সস্তায় এই কাজ করার জন্যও খুব ভাল যন্ত্র তৈয়ারী হয়েছে।

ছোট্ট ক্যামেরার চল হওয়ার ফলে অজানিত ভাবে লোকের ছবি তোলার খুব সুবিধা হয়েছে। এমন জায়গায় ক্যামেরাটি লুকান থাক্‌বে যে তুমি ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। শুধু ছোট্ট লেন্স্‌ কোন একটি ছোট ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে আছে, বাকিটুকু কিছু-একটার আড়ালে। যখন ছবি তোলা হ'লো তখন শুধু একটি আঙ্গুল ন'ড়ে উঠ্‌ল।

এন্‌লার্জ্‌ করা ছবি। যে ছোট্ট ছবিটাকে বড় করা হয়েছে সেটা নীচে তীর দিয়ে দেখান হয়েছে।

সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'তেই সাহেব "গুড মর্ণিং বলে একবার টুপিটি খুল্‌লেন; সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছবিটি উঠে গেল। ছবিতে দেখ, টুপির মাঝখানে একটি ছেঁদা। সেটিই হচ্ছে লেন্স্‌; ক্যামেরাটি টুপির মধ্যে। পাশে একটি সূতোর মত জিনিষ দেখা যাচ্ছে; সেটি 'শাটার' টিপ্‌বার তার। বাঁ হাতে সেটিতে একটা টিপুনি দিলেই হ'লো। তার পর, টুপির মধ্যেই সেটি ঢুকে যাবে। একবার মাথায় টুপি বসালে কারো সাধ্যি নাই ক্যামেরার বিষয় সন্দেহ করে।

আর এক সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি এগিয়ে এলেন শেক্‌-হ্যাণ্ড কর্‌তে। বাঁ হাতে একটি রিষ্ট-ওয়াচ্‌ দেখা গেল। শেক্‌-হ্যাণ্ড হয়ে যাবার পর তিনি হাত সরিয়ে নিলেন। তা'র কিছুক্ষণ পর জানা গেল তোমার ছবি তিনি তুলে নিয়েছেন। রিষ্ট-ওয়াচ্‌টির মাঝখান দিয়ে ছোট্ট একটি লেন্স্‌ বেরিয়ে ছিল; রিষ্ট-ওয়াচের পিছনে ছিল ছোট্ট একটি ক্যামেরা। বাঁ হাতের তলার দিক্‌ দিয়ে এক্সপোজার দেবার তার

বেরিয়ে ছিল। ডান হাতটি যখন এগিয়ে দিলেন তখন তোমার দৃষ্টি ডান হাতের

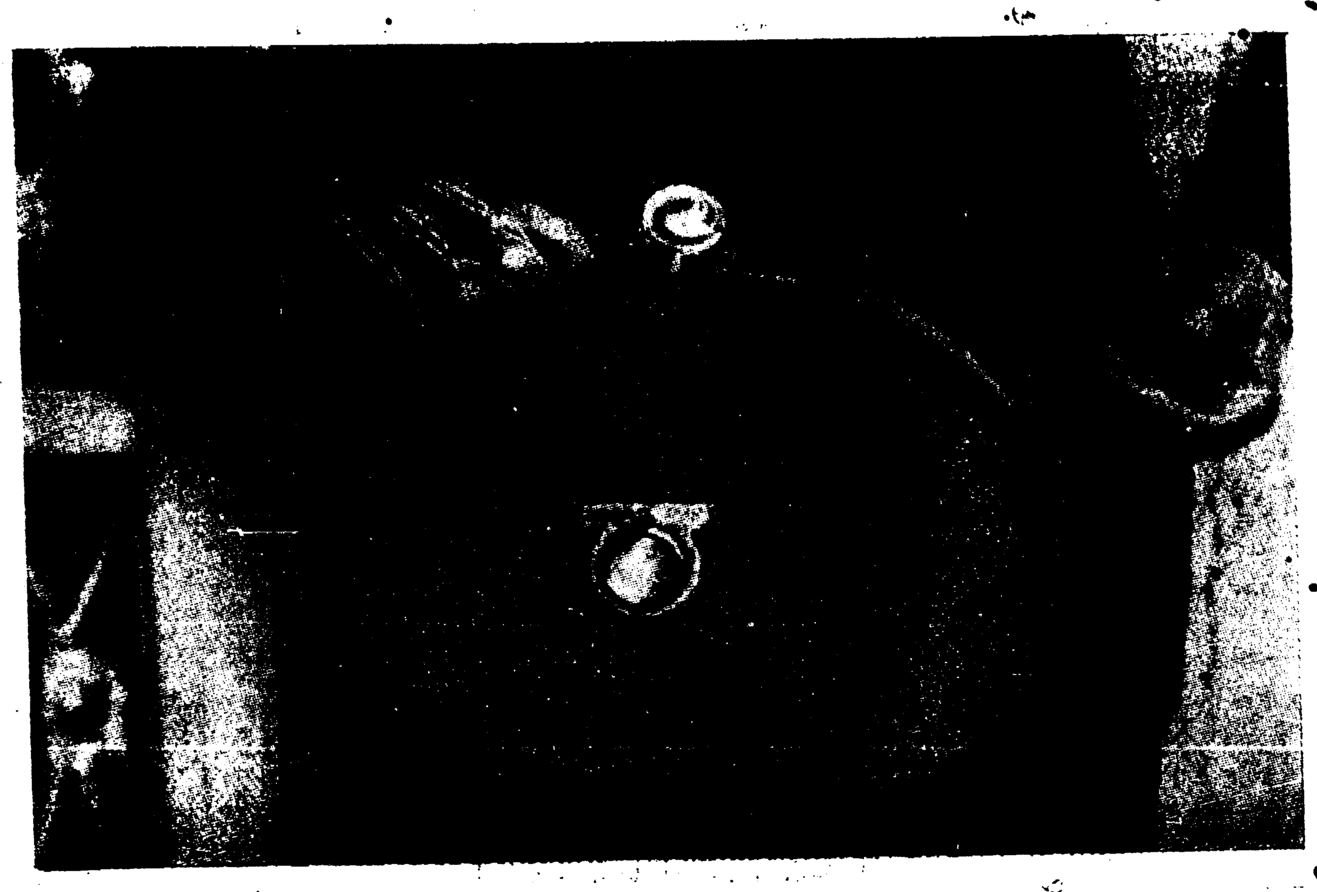

টুপির মধ্যে ক্যামেরা

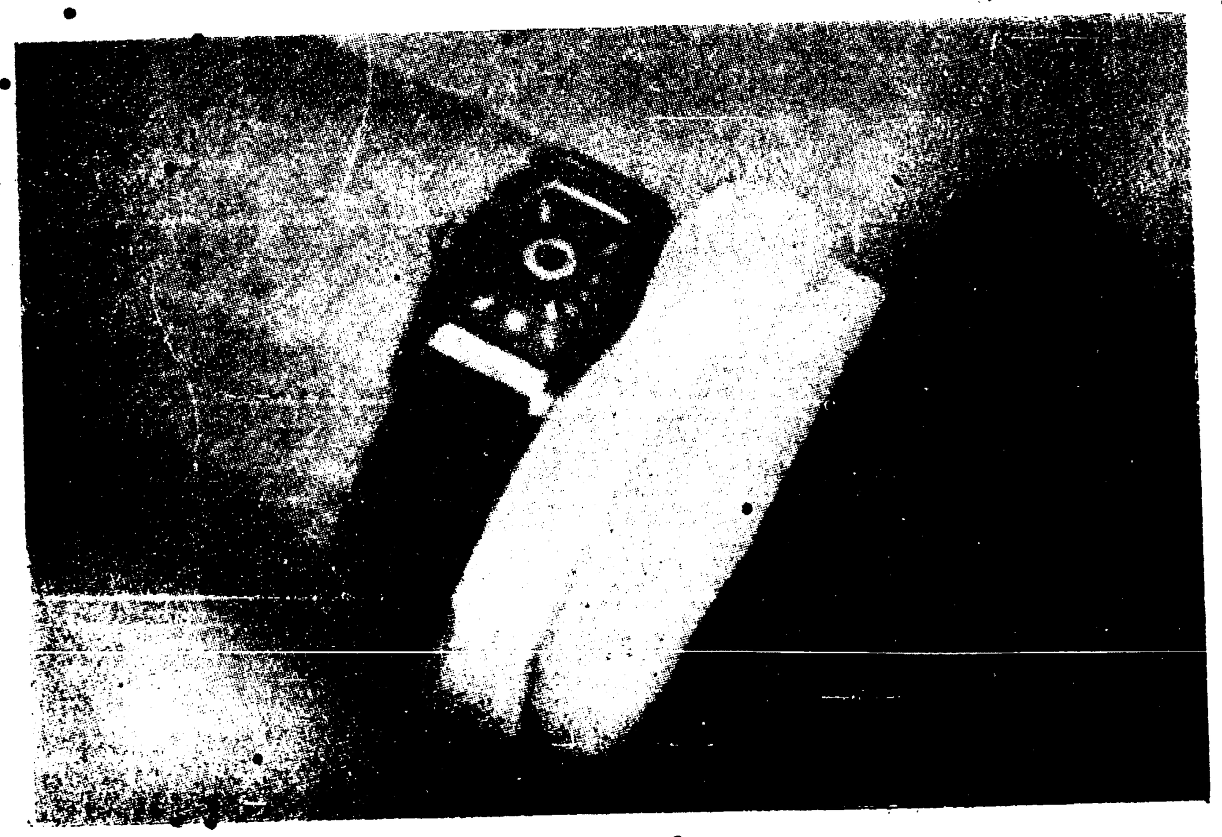

রিষ্ট্‌-ওয়াচের মধ্যে ক্যামেরা

দিকেই গেল; সেই সুযোগে তোমার অলক্ষিতে বাঁ হাতে এক্সপোজার দিয়ে দিলেন

ছোট্ট ক্যামেরার চল হওয়ার ফলে অজানিত ভাবে লোকের ছবি তোলার খুব স্থবিধা হয়েছে। এমন জায়গায় ক্যামেরাটি লুকান থাক্‌বে যে তুমি ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। শুধু ছোট্ট লেন্স্ কোন একটি ছোট ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে আছে, বাকিটুকু কিছু-একটার আড়ালে। যখন ছবি তোলা হ'লো তখন শুধু একটি আঙ্গুল ন'ড়ে উঠ্‌ল।

এন্‌লার্জ্ করা ছবি। যে ছোট্ট ছবিটাকে বড় করা হয়েছে সেটা নীচে তীর দিয়ে দেখান হয়েছে।

সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'তেই সাহেব "গুড মর্ণিং বলে একবার টুপিটি খুল্‌লেন ; সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছবিটি উঠে গেল। ছবিতে দেখ, টুপির মাঝখানে একটি ছেঁদা। সেটিই হচ্ছে লেন্স্ ; ক্যামেরাটি টুপির মধ্যে। পাশে একটি স্থতোর মত জিনিষ দেখা যাচ্ছে ; সেটি 'শাটার' টিপ্‌বার তার। বাঁ হাতে সেটিতে একটা টিপুনি দিলেই হ'লো। তার পর, টুপির মধ্যেই সেটি ঢুকে যাবে। একবার মাথায় টুপি বসালে কারো সাধ্যি নাই ক্যামেরার বিষয় সন্দেহ করে।

আর এক সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি এগিয়ে এলেন শেক্-হ্যাণ্ড কর্‌তে। বাঁ হাতে একটি রিষ্ট-ওয়াচ্ দেখা গেল। শেক্-হ্যাণ্ড হয়ে যাবার পর তিনি হাত সরিয়ে নিলেন। তা'র কিছুক্ষণ পর জানা গেল তোমার ছবি তিনি তুলে নিয়েছেন। রিষ্ট-ওয়াচ্‌টির মাঝখান দিয়ে ছোট্ট একটি লেন্স্ বেরিয়ে ছিল ; রিষ্ট-ওয়াচের পিছনে ছিল ছোট্ট একটি ক্যামেরা। বাঁ হাতের তলার দিক্ দিয়ে এক্সপোজার দেবার তার

বেরিয়ে ছিল। ডান হাতটি যখন এগিয়ে দিলেন তখন তোমার দৃষ্টি ডান হাতের

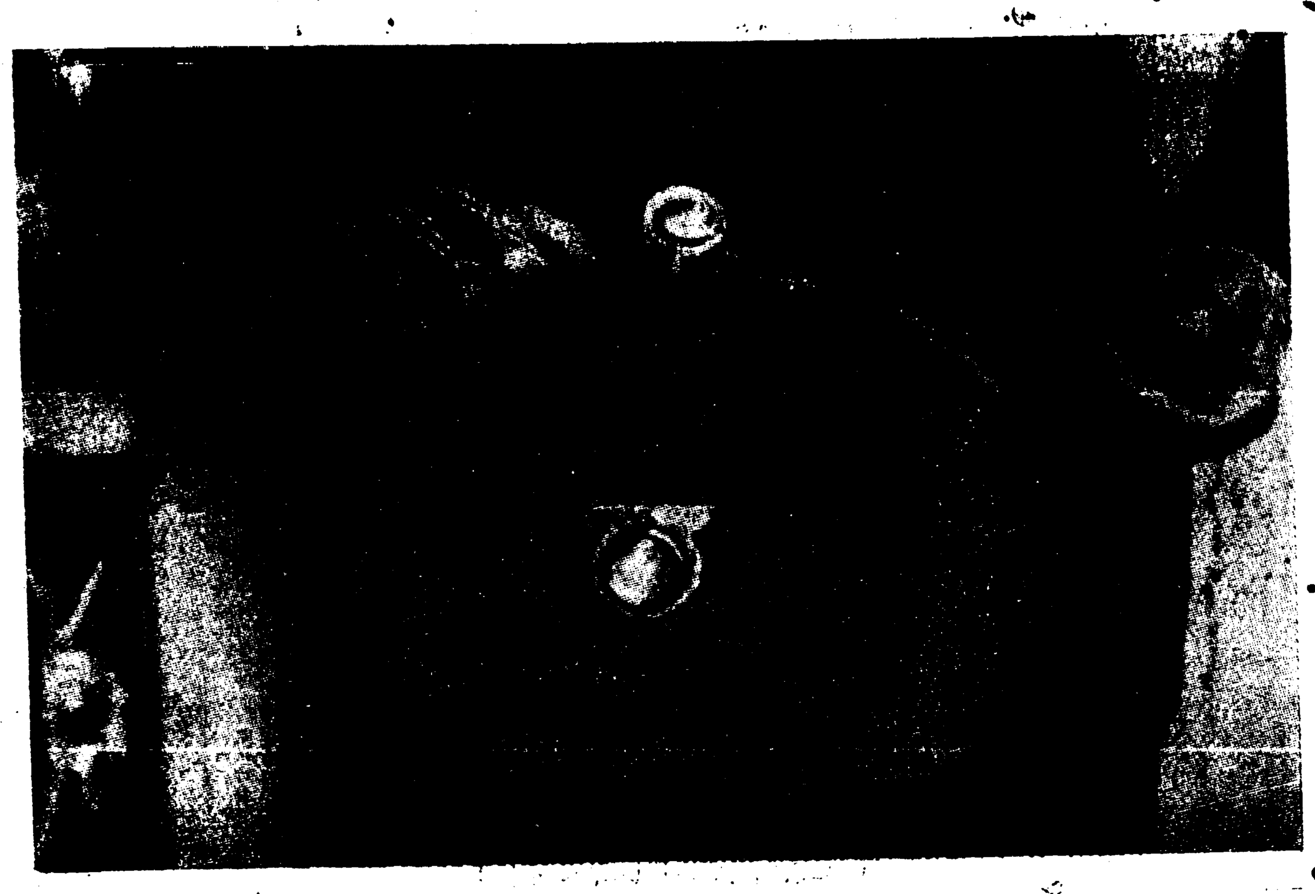

টুপির মধ্যে ক্যামেরা

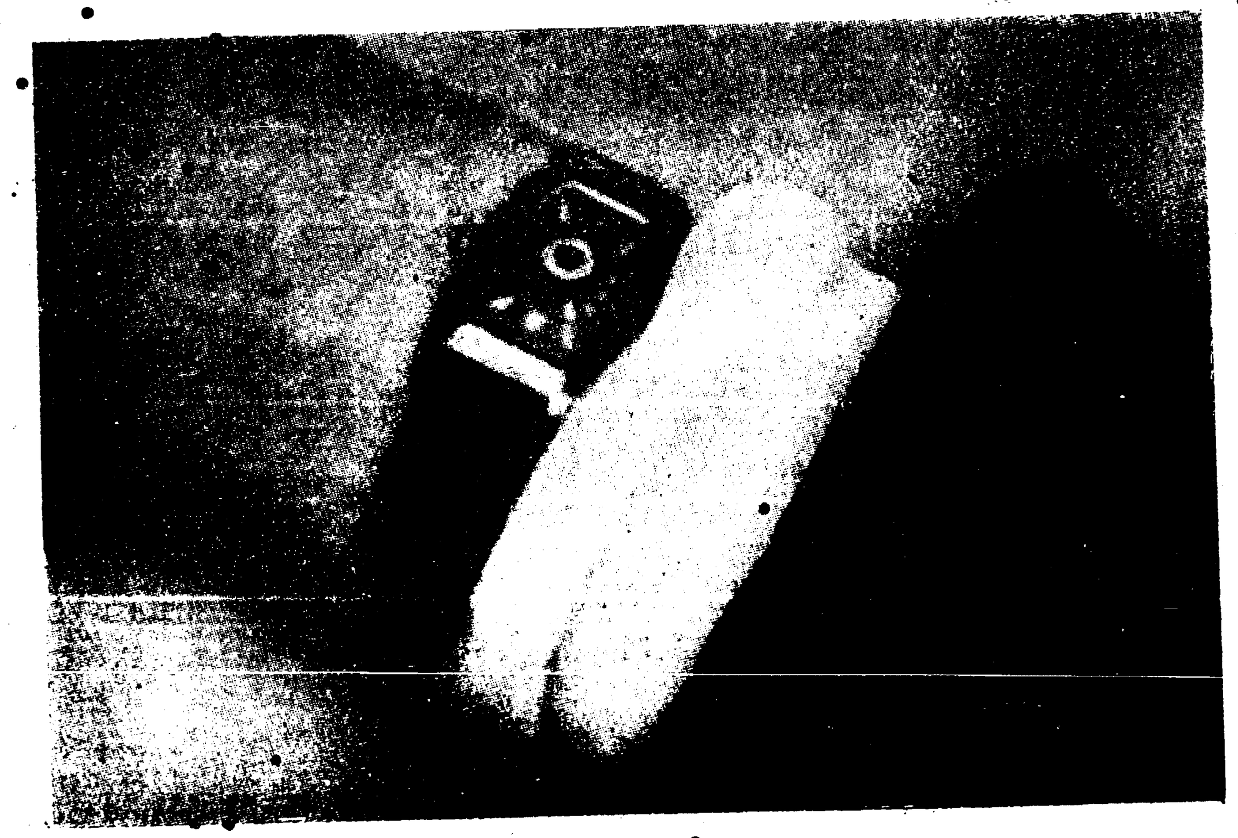

রিষ্ট্-ওয়াচের মধ্যে ক্যামেরা

দিকেই গেল ; সেই স্থযোগে তোমার অলক্ষিতে বাঁ হাতে এক্সপোজার দিয়ে দিলেন।

পুলিশের বড় কর্ত্তার ঘরে একজন দেখা করতে এলেন। কথাবার্ত্তা হয়ে গেলে তিনি চ'লে গেলেন ; যাবার আগে তাঁর একটি ছবি তোলা হয়ে গেল ; অথচ, ক্যামেরা কোথাও দেখা গেল না ; সে ঘরে অন্য কোন লোকও ছিল না ; বড় কর্ত্তা একবার হাতও নাড়েন নি। দেয়ালে ক্যালেণ্ডার টাঙ্গান, তা'রই মাঝে লেন্স ছিল ; ক্যামেরা ছিল পিছনে। শাটারের তার ছিল বড় কর্ত্তার পায়ের নীচে। লোকটি আসতেই বড় কর্ত্তা পা দিয়ে তার টিপলেন,—বাস্, ছবি উঠে গেল।

চোর, ডাকাত, দুষ্টু লোকদের বড় মুস্কিল হ'লো দেখছি !

আমার সম্পাদক-শিকার !

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

হাম কিংবা টাইফয়েড্, সর্পাঘাত কিংবা মোটর-চাপা, জলে ডোবা কিংবা গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, এগ্‌জামিনে ফেল্-করা কিংবা কাঁকড়া-বিছে কামড়ানো—জন্মাবার পর এর কোনটা-না-কোনটা কারু-না-কারু বরাতে কখনো-না-কখনো একবার ঘটেই। অবশ্য যে মোটর-চাপা পড়ে তার সর্পাঘাত হওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার, সেরকম আশঙ্কা প্রায় নেই বল্‌লেই হয়, এবং যার সর্পাঘাত হয় তাকে আর গাছ থেকে পড়তে হয় না। যে ব্যক্তি জলে ডুবে যায় মোটর-চাপা পড়ার সুযোগ তার যৎসামান্যই এবং উঁচু দেখে গাছ থেকে ভালো ক'রে পড়তে পারলে তার আর জলে ডোবার ভয় থাকে না। তবে কাক্‌ড়া বিছের কামড়ের পরেও এগ্‌জামিনে ফেল্ করা সম্ভব, এবং অনেক ক্ষেত্রে হামের ধাক্কা সাম্‌লাবার পরেও টাইফয়েড্ হতে দেখা গেছে।

কিন্তু বলেছিই, এ সব কারু-না-কারু অদৃষ্টে ঘটে কখনো বা কদাচ। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা প্রায় সবারই জীবনে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনিবার্য্যরূপে প্রকট হয়, তার ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়। আমি গোঁফ ওঠার কথা বল্‌ছি না—তার

চেয়েও শক্ত ব্যারাম—গোঁফ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হবার প্রেরণা মানুষকে পেয়ে বসে।

আমারও তাই হয়েছিল। প্রথম গল্প লেখার সূত্রপাতেই আমার ধারণা হয়ে গেল আমি দোলগোবিন্দবাবুর মত লিখতে পেরেছি। দোলগোবিন্দকে আমি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ মনে করতাম—কেননা, একই কাগজে দু'জনের লেখা এবং দু'জনের নাম একই টাইপে ছাপার অক্ষরে আমি দেখেছিলাম। এমন কি অনেক সময়ে দোলগোবিন্দকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় লেখক আমার বিবেচনা হয়েছে—তাঁর লেখা কেমন জলের মত বোঝা যায় অথচ বোঝার মত মাথায় চাপে না। কেন যে তিনি নোবেল্ প্রাইজের জন্য চেষ্টা করেন না, সেই গোঁফ ওঠার প্রাক্কালে অনেকবার আমি আন্দোলন করেছি—অবশ্য মনে মনে। এখন বুঝতে পারছি পণ্ডিচেরী, পাশাপাশি, কিংবা রাঁচীতে তাঁর পরামর্শ দেবার কেউ ছিল না বলেই। আরো দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের লেখা এখনো চোখে প'ড়ে যায় কিন্তু কোন কাগজ-পত্রেই দোলগোবিন্দবাবুর দেখা আর পাই না।

যাই হোক্, গল্পটা লিখেই বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে, দোলগোবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের রচনার ঠিক পরেই সেটা প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। নিশ্চিন্ত ব'সে আছি যে নিশ্চয়ই ছাপা হবে এবং ছাপার অক্ষরে লেখাটা দেখে কেবল আমি কেন, রবীন্দ্রনাথ এমন কি স্বয়ং দোলগোবিন্দ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠবেন—ও হরি ! পর পর তিন মাস হতাশ হবার পরে একদিন দেখি বুকপোষ্টের ছদ্মবেশে লেখাটা আমার কাছেই আবার ফিরে এসেছে। ভারী মর্ম্মাহত হলাম—বলাই বাহুল্য। শোচনীয়তা আরো বেশী এইজন্যে যে তিন মাসে তিনখানা কাগজ কিনেছিলাম—খতিয়ে দেখলাম সেই দেড়টা টাকাই ব্যাটাদের পাকা লাভ !

তারপর, একে একে আর যে-কটা নামজাদা মাসিক ছিল সবাইকেই যাচাই করা হ'ল,—কিন্তু ফল একই। আট আনার পেট মোটাদের ছেড়ে ছ-আনার কাগজদের ধরলাম—অবশেষে চার আনা দামের নব্যপন্থীদেরও বাজিয়ে দেখা গেল, কিন্তু নাঃ, সব শেয়ালের একই আওয়াজ ! গল্পটা ভালোই, তবে ছাপতে তাঁরা অক্ষম ! আরে বাপু, এত অক্ষমতা যে কেন তাতো আমি বুঝতে পারি নে, যখন

এত লেখাই অনায়াসে ছাপ্‌তে পারছ তোমরা। মাসিক থেকে পাক্ষিক, পাক্ষিক থেকে সপ্তাহিকে নাম্‌লাম, অগত্যা, লেখাটার দারুণ অমর্য্যাদা ঘট্‌ছে জেনেও দৈনিক সংবাদ-পত্রেই প্রকাশের জন্য পাঠালাম। কিন্তু সেখান থেকেও ফেরৎ এল। দৈনিকে নাকি অত বড় 'সংবাদ' ধর্‌বার জায়গাই নেই। আশ্চর্য্য! এত বাজে বিজ্ঞাপন—যা কেউ পড়ে না—তার জায়গা আছে আর আমার বেলাই যত স্থানাভাব! বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে ছাপালেই তো হয়। কিন্তু অদ্ভুত এদের একগুঁয়েমি—সব সংবাদ-পত্র থেকেই বারবার সেই একই দুঃসংবাদ পাওয়া গেল!

তখন বিরক্ত হয়ে, সহর ছেড়ে মফঃস্বলের দিকে লক্ষ্য দিতে হ'ল—অর্থাৎ লেখাটা দিগ্বিদিকে পাঠাতে সুরু কর্‌লাম। মেদিনীপুর-মন্থন, চুঁচুড়া-চন্দ্রিকা বাঁকুড়া-হর্‌করা, ফরিদপুর-সমাচার, গৌহাটি-গবাক্ষ, মালদহের গৌড়বান্ধব—কারুকেই, বাদ রাখ্‌লাম না। কিন্তু সহুরে পেট-মোটাদের কাছে যে দুর্ব্ব্যবহার পাওয়া গেছে পাড়াগেঁয়ে ছিটে-ফোঁটাদের কাছ থেকে তার রকম ফের প্রত্যাশা করা গেল না। আমার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক দারুণ ষড়্‌যন্ত্র আমার সন্দেহ হতে লাগ্‌ল।

এইভাবে সেই প্রথম ও পুরোবর্ত্তী একমাত্র লেখার ওপরে ট্রাই এণ্ড্ ট্রাই এগেন্-পলিসির কার্য্যকারিতা পরীক্ষা কর্‌তেই বাংলা মুলুকের সমস্ত কাগজ এবং পুরো সাড়ে তিন বছর ফুরিয়ে এল—বাকী রইল কেবল একখানি কাগজ—এক কৃষি-সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক। চাষাড়ে কাগজ বলেই ওর বিষয়ে আমি এতাবৎ মনোযোগ দিই নি, তারা কি আমার এই সাহিত্য-রচনার মূল্য বুঝ্‌বে? ফেরৎ তো দেবেই, হয় তো সঙ্গে সঙ্গে ব'লে পাঠাবে, 'মশাই, আপনার আষাঢ়ে গল্প আমাদের কাগজে অচল; তার চেয়ে ফুলকপির চাষ সম্বন্ধে যদি আপনার কোন বক্তব্য থাকে তা লিখে পাঠালে বরং আমরা দেখ্‌তে পারি।'

এই ভয়েই এতদিন ওধারে তাকাই নি—কিন্তু এখন আর আমার ভয় কি? (ডুবন্ত লোক কি কুটো ধর্‌তে ভয় করে?) কিন্তু নাঃ, ওদের কাছে আর ডাকে পাঠানো না, অনেক ডাকখরচা গেছে য়্যাদ্দিন্, এবার লেখা-সমভিব্যাহারে আমি নিজেই যাব।

"দেখুন, আপনি—আপনিই সম্পাদক, না? আমি—আমি একটা—একটা লেখা এনেছিলাম আমি—?"

গম্ভীর ভদ্রলোক চশ্‌মার ফাঁকে কটাক্ষপাত করলেন। "কই দেখি!"

"একটা গল্প। একেবারে নতুন ধরণের—আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন।" লেখাটা বাড়িয়ে দিলাম—"আন্‌কোরা প্লট, আন্‌কোরা ষ্টাইলে একেবারে—"

ভদ্রলোক গল্পে মনোযোগ দিয়েছেন দেখে আমি বাক্যযোগ স্থগিত রাখ্‌লাম। একটু পড়তেই সম্পাদকের কপাল কুঞ্চিত হ'ল, তার পরে ঠোঁট বেঁকে গেল, নাক সিঁট্‌কাল, দাড়িতে হাত পড়ল,—যতই তিনি এগুতে লাগ্‌লেন, ততই তাঁর চোখ-মুখের চেহারা বদ্‌লাতে লাগ্‌ল, অবশেষে পড়া শেষ ক'রে যখন তিনি আমার দিকে তাকালেন তখন মনে হ'ল তিনি যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন। হতেই হবে। কি রকম লেখা একখান্!

"হ্যাঁ, পড়ে দেখ্‌লাম—নিতান্ত মন্দ হয় নি। তবে এটা যে একটা গল্প তা জানা গেল আপনি ব্র্যাকেটের মধ্যে কথাটা লিখে দিয়েছেন ব'লে—নতুবা বোঝার কোন উপায় ছিল না।"

"তা বটে। আপনারা সম্পাদকরা যদি ছাপেন তবেই নতুন লেখক আমরা উৎসাহ পাই।" বল্‌তে বল্‌তে আমি গলে গেলাম, "এ গল্পটা আপনার ভালো লেগেছে তা হলে?"

"লেগেছে এক রকম। তা এটা কি—"

"হ্যাঁ, অনায়াসে। আপনার কাগজের জন্যই তো এনেছি।"

"আমার কাগজের জন্য?" ভদ্রলোক বসেই ছিলেন কিন্তু মনে হ'ল আরো যেন বসে গেলেন, "তা আপনি কি এর আগে আর কখনো লিখেছেন?"

ঈষৎ গর্ব্বের সঙ্গেই আমি জবাব দিলাম, "নাঃ, এই আমার প্রথম চেষ্টা।"

"প্র ম চেষ্টা? বটে?" ভদ্রলোক ঢোঁক গিল্‌লেন, "আপনার ঘড়িতে এখন ক'টা?"

ঘড়িটা পকেট থেকে বার ক'রে অপ্রস্তুত হলাম, মনে পড়ল ক'দিন থেকেই এটা বন্ধ যাচ্ছে, অথচ ঘড়ির দোকানে দেওয়ার অবকাশ হয় নি। সত্য কথা বল্‌তে

কি, সম্পাদকের কাছে ঘড়ি না হোক অন্তত ঘড়ির চিহ্নমাত্র না-নিয়ে যাওয়াটা বে-ষ্টাইলি হবে ভেবেই আজ এখন পর্য্যন্ত ওটা সারাতে দিই নি। এখান থেকে বেরিয়েই বরাবর ঘড়ির দোকানে যাব এই মৎলব ছিল।

ঘড়িটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লাম, "নাঃ, বন্ধ হয়ে গেছে দেখ্ছি। ক'দিন থেকেই মাঝে মাঝে বন্ধ যাচ্ছে।"

"তাই নাকি? দেখি তো একবার। তনি হাত বাড়ালেন।

"ঘড়ি মেরামতও জানেন নাকি আপনি?" আমি সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করলাম।

"জানি বলেই তো মনে হয়। কই দেখি, চালানো যায় কিনা।"

আমি আগ্রহভরে ঘড়িটা ওঁর হাতে দিলাম—যদি নিখরচায় লেখা আর ঘড়ি এক সঙ্গে চালিয়ে নেওয়া যায় মন্দ কি!

ভদ্রলোক পকেট থেকে পেন্‌সিল-কাটা ছুরি বার করলেন, তার একটা চাড় দিতেই পেছনের ডালা সমস্তটা সটান্ উঠে এল। আমি চম্‌কে উঠ্‌তেই তিনি সান্ত্বনা দিলেন, "ভয় কি? আবার জুড়ে দেব।"

সেই ভোঁতা ছুরি এবং সময়ে সময়ে একটা চোঁথা কলমের সাহায্যে তিনি একটার পর একটা ঘড়ির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। মিনিট্ এবং সেকেণ্ডের কাঁটাও বাদ গেল না। খুঁটিনাটি সব যন্ত্রপাতি টেবিলের উপর স্তূপাকার হ'ল—তিনি এক একটাকে চশ্‌মার কাছে এনে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। সূক্ষ্ম তারের ঘোরানো ঘোরানো কি একটা জালের মত—বোধ হয় হেয়ার স্প্রিংই হবে—দু'হাতে ধ'রে সেটাকে লম্বা করার চেষ্টা করলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটা দুখান্ হয়ে গেল, তিনি মৃদুহাস্য ক'রে আমার দিকে তাকালেন; তার মানে, ভয় কি, আবার জুড়ে দেব।

ভয় ছিল্ না কিন্তু ভরসাও যেন ক্রমশঃ কমে আস্‌ছিল। যেটা জুয়েলের মধ্যে সবচেয়ে স্থূলকায় সেটাকে এবার তিনি দাঁতের মধ্যে চাপ্‌লেন, দাঁত বসে কিনা দেখ্‌বার জন্যই বোধ হয়। কিন্তু দন্তস্ফুট করতে, না পেরে সেটাকে ছেড়ে ঘড়ির মাথার দিকের দম দেবার গোলাকার চাবিটাকে মুখের মধ্যে পূর্‌লেন

অতঃপর। একটু পরেই কটাস্ ক'রে উঠ্‌ল, ওটার মেরামৎ সমাধা হয়েছে বুঝ্‌তে পার্‌লাম।

তারপর সমস্ত টুক্‌রো-টাক্‌রা এক ক'রে ঘড়ির অন্তঃপুরে রেখে নীচুকার ভেতরের ডালাটা চেপে বন্ধ করতে গেলেন কিন্তু ডালা বস্‌বে কেন? সে উঁচু হয়ে থাক্‌ল। ওপরের ডালাটা আগেই ভেঙ্গেছিল, এবার সেটাকে হাতে নিয়ে আমাকে বল্লেন, "আঠার পাত্রটা আগিয়ে দিন্ তো—এটাকে দেখি।"

অত্যন্ত নিরুৎসাহে গাম্‌পট্‌টা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আঠার সহায়তায় যথেষ্ট সংগ্রাম করলেন কিন্তু তাঁর যৎপরোনাস্তি চেষ্টা সমস্ত ব্যর্থ হ'ল। আঠায় কখনো ও জিনিষ জোড়ে? তারপর সবগুলো এক মুঠোয় ক'রে আমার দিকে প্রসারিত কর্‌লেন—"এই নিন্ আপনার ঘড়ি।"

আমি অবাক্ হয়ে এতক্ষণ দেখছিলাম, বল্লাম—"একি হ'ল মশাই?"

তিনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন—"কেন, মেরামত ক'রে দিয়েছি তো।"

বড়্‌দার কাছ থেকে বাগানো দামী ঘড়িটার এই দফারফা দেখে আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল—"এই বুঝি মেরামৎ করা? আপনি ঘড়ির যদি কিছু জানেন না তবে হাত দিতে গেলেন কেন?"

"কেন, কি ক্ষতি হয়েছে?" এ কথা বল্‌তে তিনি অনায়াসে হাস্‌তে পারলেন—"তা ছাড়া, আমারও এই প্রথম চেষ্টা।"

আমি অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলাম, তারপর বল্লাম—"ওঃ! আমার প্রথম লেখা বলেই এটা আপনার পছন্দ হয় নি? তাই বল্লেই পারতেন—ঘড়ি ভেঙ্গে একথা বলা কেন?" আমার চোখ ফেটে জল বেরুবার মত হ'ল, কিন্তু অবহিষ্কৃত অশ্রু কোনোমতে সম্বরণ ক'রে, এমন কি, অনেকটা আপ্যায়িতের মত হেসেই অবশেষে বল্লাম—"কাল না হয় আর একটা নতুন গল্প লিখে আনুব, সেটা আপনার পছন্দ হবে। চেষ্টা করলেই আমি লিখ্‌তে পারি।"

"বেশ, আস্‌বেন।" এবিষয়ে সম্পাদকের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল, "কিন্তু ঐ সঙ্গে আর একটা নতুন ঘড়িও আন্‌বেন মনে ক'রে। আমাদের দু'জনেরই

শিক্ষা হবে তাতে। আপনারও লেখার হাত প্যাক্‌বে, আমিও ঘড়ি সম্বন্ধে পরিপুক্কতা লাভ করব।"

পরের দিন 'মরীয়া' হয়েই গেলাম এবং ঘড়িয়া না হয়েই। এবার আর গল্প না, তিনটে ছোট ছোট কবিতা—সিম, বেগুন, বরবটির ওপরে।

আমাকে দেখেই সম্পাদক অভ্যর্থনা করলেন—"এই যে এসেছেন, বেশ। ঘড়ি আছে তো সঙ্গে?"

আমি দম্‌লাম না—"দেখুন এবারে একেবারে অন্য ধরণের লিখেছি। লেখাগুলো সময়োপযোগী, এমন কি সব সময়েরই উপযোগী। এবং যদি অনুমতি করেন তাহ'লে একথাও বল্‌তে সাহস করি যে আপনাদের কাগজের উপযুক্তও বটে। আপনি যদি অনুগ্রহ—"

আরো খানিকটা মুখস্থ ক'রে আনা ছিল কিন্তু ভদ্রলোক আমার আবৃত্তিতে বাধা দিলেন—"ধৈর্য্য, উৎসাহ, তিতিক্ষা এসব আপনার আছে দেখ্‌ছি। পারবেন্ আপনি। কিন্তু আমাদের কি মুস্কিল জানেন, বড় লেখকেরই বড় লেখা কেবল আমরা ছাপ্‌তে পারি। প্রবন্ধের শেষে বা তলার দিকে দেওয়া চলে এমন ছোটো খাটো খুচ্‌রো-খাচ্‌রা যদি আপনার কিছু থাকে তাহ'লে বরং—। এই ধরুন, চার লাইনের কবিতা কিংবা কৌতুক-কণা—"

আমি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিলাম—"হ্যাঁ, কবিতা। কবিতাই এনেছি এবার। পড়ে দেখুন আপনি, রবীন্দ্রনাথের পরে এমন কবিতা কেউ লিখেছে কিনা সন্দেহ।"

তিনি কবিতা তিন পিস্ হাতে নিলেন এবং পড়্‌তে সুরু ক'রে দিলেন—

"সিম্।

সিমের মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

ধামার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।..."

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সপ্রশংস অভিব্যক্তি দেখা গেল—"বাঃ, বেড়ে হয়েছে। আপনি বুঝি সিমের ভক্ত? সিম্ খেয়ে থাকেন খুব? অত্যন্ত ভালো জিনিস, যথেষ্ট ভিটামিন্।"

"সিম্ আমি খাই নে। বরং অখাদ্যই মনে করি। তবে এই কবিতাটা লিখতে হিম্‌সিম্ খেয়েছি।"

"হ্যাঁ, এগুলো চল্‌বে। খাসা কবিতা লেখেন আপনি! বরবটির সঙ্গে চট্‌পটির মিল্‌টা মন্দ না। তুলনাটাও ভালো—তা; এক কাজ করলে তো হয়!—" অকস্মাৎ তিনি যেন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হলেন। "দেখুন, ভিটামিনের কাগজ বটে কিন্তু ভিটামিন্ আমরা খুব কমই খাই। কলা বাদ দিয়ে কলার খোসা কিংবা শাঁস বাদ দিয়ে আলুর খোসার সারাংশ প্রায়ই খাওয়া হয়ে ওঠে না—এইজন্যে মাসকয়েক থেকে বেরিবেরিতে ভুগ্‌তে হচ্ছে; তা আপনি যদি—" তিনি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন।

"হ্যাঁ, পারব। খুব পারব। ঝুরি ঝুরি কলার খোসা আপনাকে যোগাড় করে দেব। কিন্তু শুধু-খোসা তো কিন্‌তে পাওয়া যায় না, কলার দামটা আপনিই দেবেন।" তাঁর সমর্থনের অপেক্ষায় একটু থাম্‌লাম, "কলাগুলো আমিই না হয় খাব কষ্টে-সৃষ্টে—যদিও অনুপকারী, তবু বেরিবেরি না হওয়া পর্য্যন্ত খেতে বাধা নেই তো?"

"না, সে কথা নয়। আমি বল্‌ছি কি, আমি তিন মাসের ছুটি নিয়ে ঘাটশিলায় হাওয়া বদ্‌লাতে যেতাম, আপনি সেই সময়ে আমার কাগজটা চালাতেন?"

"আমি?" একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম যেন।

"তা লিখতে না জান্‌লেও কাগজ চালানো যায়। লেখক হওয়ার চেয়ে সম্পাদক হওয়া সোজা। আপনার সঙ্গে আমার এই চুক্তি থাক্‌বে: আপনাকে নামজাদা লেখকদের তালিকা দিয়ে যাব, তাদের লেখা আপনি চোখ বুজে চালিয়ে দেবেন—কেবল কপি মিলিয়ে প্রুফ্ দেখে দিলেই হ'ল। সেই সব লেখার শেষে পাতার তলায় যা এক-আধটু জায়গা থাক্‌বে সেখানে আপনার এই ধরণের ছোটো ছোটো কবিতা আপনি ছাপ্‌তে পারবেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। এই রকম কৃষি-কবিতা—ওলকপি, গোলআলু, সকর্‌কন্দ্, যার সম্বন্ধে খুসি লিখতে পারেন।"

বলা বাহুল্য, আমাকে রাজি করতে ভদ্রলোককে মোটেই বেগ পেতে হ'ল না, সহজেই আমি সম্মত হলাম। এ যেন আমার হাতে স্বর্গ পাওয়া—গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি! সম্পাদক-শিকার করতে এসে সম্পাদকতা স্বীকার—তোমাদের মধ্যে খুব কম অজাতশ্মশ্রু লেখকেরই এরকম সৌভাগ্য হয়েছে ব'লে আমার মনে হয়।

সম্পাদনা-কাজের গোড়াতেই এক জোড়া চশ্‌মা কিনে ফেল্‌লাম: ফাউণ্টেন্ পেন্ তো ছিলই। অতঃপর সমস্ত জিনিসটাই পরিপাটি নিখুঁত হ'ল। কলম হাত্‌রে "কৃষিতত্ত্বের" সম্পাদকীয় লিখ্‌তে সুরু করলাম। যদিও সম্পাদকীয় লেখার জন্য ঘুণাক্ষরেও অনুরোধ ছিল না সম্পাদকের তরফ থেকে কিন্তু ওটা বাদ দিলে সম্পাদকতা করার কোন মানেই হয় না, আমার মতে। অতএব লিখ্‌লাম:

"আমাদের দেশে ভদ্রলোকদের মধ্যে কৃষি-সম্বন্ধে দারুণ অজ্ঞতা দেখা যায়। এমন কি অনেকের এরকম ধারণা আছে যে এই যে সব তক্তা আমরা দেখি, দরজা জান্‌লা, কড়ি বড়গা, পেন্‌সিল্, তক্তপোষে যে সব কাঠ সাধারণতঃ দেখ্‌তে পাওয়া যায় সে সমস্ত ধান গাছের। এটা শোচনীয় ব্যাপার। তাঁরা শুন্‌লে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন যে ওগুলো ধান গাছের তো নয়ই, বরঞ্চ পাট গাছের বলা যেতে পারে। অবশ্য পাট গাছ ছাড়াও কাঠ জন্মায়, আম জাম কাঁঠাল কদ্‌বেল ইত্যাদি বৃক্ষেরাও তক্তাদান করে থাকে। কিন্তু নৌকার পাটাতনে যে কাঠ ব্যবহৃত হয় তা কেবল পাটের।..."

ইত্যাদি—এই ভাবে একটানা প্রায় আড়াই পাতা কৃষি-তত্ত্ব। কাগজ বেরুতে না বেরুতে আমার সম্পাদকতার ফল প্রত্যক্ষ করলাম। মোটে পাঁচ শো ক'রে আমাদের ছাপা হ'ত, কিন্তু পাঁচ শো কাগজ বাজারে পড়তেই পেল না। সকাল থেকে প্রেস্ চালিয়ে, সাত গুণ ছেপেও অনেক 'হকার'কে শেষে ক্ষুণ্ণমনে ও শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিতে হ'ল।

সন্ধ্যার পরে যখন আপিস থেকে বেরুলাম দেখলাম এক দল লোক আর

বালক সাম্‌নের রাস্তায় জড়ো হয়েছে, আমাকে দেখেই তারা অকস্মাৎ ফাঁক হয়ে আমার পথ ক'রে দিল। দু'একজনকে যেন বল্‌তেও শুন্‌লাম—ইনি, ইনিই! স্বভাবতঃই ভারী খুসী হ'য়ে উঠ্‌লাম। না হব কেন?

পরদিনও আপিসের সাম্‌নে সেই রকম লোকের ভিড়; দল পাকিয়ে বা দু'জন চার জন ক'রে এখানে ওখানে ছড়িয়ে, রাস্তার এধারে, ওধারে, দূরে, সুদূরে (কিন্তু অনতিনিকটে), প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়েই ব্যক্তিবর্গ। সবাই বেশ আগ্রহের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করছে। তাদের কৌতূহলের কারণ আমি বুঝতে পারলাম এবং পেরে আত্মপ্রসাদ বোধ হতে লাগ্‌ল।

আমি কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিচলিত হ'য়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ছিল, আমি দ্বিধাবোধ করার আগেই মণ্ডলীরা দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে আমার পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছিল। একজন বলে উঠ্‌ল—"ওর চোখের দিকে তাকাও, কি রকম চোখ দেখেছ!" আমি-যে-ওদের লক্ষ্য এটা যেন লক্ষ্য করছি না এই রকম ভাব দেখাচ্ছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, মনে মনে বেশ পুলক সঞ্চার হচ্ছিল আমার। ভাব্‌লাম এ সম্বন্ধে লম্বা চওড়া বর্ণনা দিয়ে আজই বড়দাকে একখানা চিঠি ছেড়ে দেব।

দরজা ঠেলে আপিস-ঘরে ঢুক্‌তেই দেখলাম দু'জন গ্রাম্যগোছের লোক আমার চেয়ার এবং টেবিল ভাগাভাগি ক'রে বসে আছে—বসার কায়দা দেখলে মনে হয় লাঙ্গল ঠেলাই ওদের পেশা। আমাকে দেখেই তারা তটস্থ হয়ে উঠ্‌ল। মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাদের লজ্জায় ম্রিয়মান বলে আমার সন্দেহ হ'ল কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাদের আর দেখতে পেলাম না—ওধারের জান্‌লা টপ্‌কে ততক্ষণে তারা সট্‌কেছে। আপিস্ ঘরে যাতায়াতের অমন দরজা থাক্‌তেও তা না ব্যবহার ক'রে অপ্রশস্ত জান্‌লাই বা তারা কেন পছন্দ করল, এই অদ্ভুত কাণ্ডের মাথামুণ্ডু নির্ণয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সযত্ন-পালিত ছড়ি হস্তে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তাঁর দাড়ির চাকচিক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। চেয়ারে ছড়ির ঠেসান্ দিয়ে দাড়িকে হস্তগত ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনিই কি নতুন সম্পাদক?"

আমি জানালাম, তাঁর অনুমান সত্য।

"আপনি কি এর আগে কোন কৃষি-কাগজের সম্পাদনা করেছেন?"

"আজ্ঞে না," আমি বল্লাম, "এই আমার প্রথম চেষ্টা।"

"তাই সম্ভব।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "হাতে কলমে কৃষি-কাজের কোন অভিজ্ঞতা আছে আপনার?"

"একদম্ না।" স্বীকার করলাম আমি।

"আমার তাই মনে হয়েছে।" ভদ্রলোক পকেট থেকে ভাঁজ করা এই সপ্তাহের একখানা "কৃষি-তত্ত্ব" বার করলেন—"এই সম্পাদকীয় আপনার লেখা, নয় কি?"

আমি ঘাড় নাড়লাম,—"এটাও আপনি ঠিকই ধরেছেন।"

"আমার আন্দাজ ঠিক।" ব'লে তিনি পড়তে শুরু করলেন:

"মূলো জিনিসটা পাড়বার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কখনোই টেনে ছেঁড়া উচিত নয়, ওতে মূলোর ক্ষতি হয়। তার চেয়ে বরং একটা ছেলেকে গাছের ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে ডালপালা নাড়তে দিলে ভালো হয়। খুব ক'সে নাড়া দরকার। ঝাঁকি পেলেই টপাটপ মূলোবৃষ্টি হবে, তখন কুড়িয়ে নিয়ে ঝাঁকা ভর।..."

"এর কি মানে আমি জান্তে চাই।" ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে যেন উষ্মার আভাস ছিল।

"কেন? এর মানে তো স্পষ্ট।" বৃদ্ধ ব্যক্তির বোধশক্তিহীনতা দেখে আমি অবাক্ হলাম, "আপনি কি জানেন, কত হাজার হাজার, কত লাখ লাখ মূলো অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় টেনে ছিঁড়ে নষ্ট করা হয় আমাদের দেশে? মূলো নষ্ট গেলে কার যায় আসে? কেবল যে মূলোরই তাতে অপকার করা হয় তা নয়, আমাদের—আমাদেরও ক্ষতি তাতে। দেশেরই তাতে সর্ব্বনাশ, তার হিসেব রাখেন? তার চেয়ে যদি মূলোকে গাছেই পাকতে দেওয়া হোতো এবং তার পরে একটা ছেলেকে গাছের ওপরে—"

"নিকুচি করেছে গাছের! মূলো গাছে জন্মায়ই না।"

"কি! গাছে জন্মায় না! অসম্ভব—এ কখনো হ'তে পারে? মানুষ ছাড়া সব কিছুই গাছে জন্মায়, এমন কি বাঁদর পর্য্যন্ত।"

ভদ্রলোকের মুখবিকৃতি দেখে বুঝ্লাম বিরক্তির তিনি চরম সীমায়। রেগে 'কৃষি-তত্ত্ব' খানা ছিঁড়ে কুচি কুচি ক'রে ফুঁ দিয়ে ঘরময় উড়িয়ে দিলেন—তার পরে নিজের ছড়িতে হস্তক্ষেপ করলেন। আমি শঙ্কিত হলাম—লোকটা মারবে নাকি? কিন্তু না, আমাকে ছাড়া টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আলমারি, ঘরের সব কিছু ছড়িপেটা ক'রে অনেক কিছু ভেঙে চূরে, অনেকটা শান্ত হয়ে অবশেষে সশব্দে দরজা খুলে তিনি সবেগে বেরিয়ে গেলেন। লোকটা মাষ্টার নয় তো?

আমি অবাক্ হলাম, ভদ্রলোক ভারী চটে চলে গেলেন তা তো স্পষ্টই, কিন্তু কেন যে কি সম্বন্ধে এত অসন্তোষ তা কিছু বুঝ্তে পারলাম না।

এই দুর্ঘটনার একটু পরেই আগামী সপ্তাহের সম্পাদকীয় লেখবার জন্য সুবিধে মত জাঁকিয়ে বস্ছি এমন সময়ে দরজা ফাঁক্ করে কে যেন উঁকি দিল্। যারা জান্লা-পথে পালিয়েছিল সেই 'চষ্য'রাজদের একজন নাকি? কিন্তু না, নিরীক্ষণ ক'রে দেখ্লাম বিশ্রী চেহারার জনৈক বদ্খৎ লোক। লোকটা ঘরে ঢুকেই যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেল, ঠোঁটে আঙুল চেপে, ঘাড় বেঁকিয়ে, কুঁজো হয়ে কি যেন শোন্বার চেষ্টা করল। কোথাও শব্দ মাত্র ছিল না। তথাপি সে শুন্তে লাগ্ল। তবু কোন শব্দ নেই। তার পরে অতি সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে পা টিপে টিপে আমার কাছাকাছি এগিয়ে এসে সুতীব্র ঔৎসুক্যে আমার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ একেবারে নিষ্পলক, তার পরেই কোটের বোতাম্ খুলে হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে এক খণ্ড 'কৃষিতত্ত্ব' বার কর্ল।

"এই যে, তুমিই! তুমিই লিখেছ? পড়—পড় এই খান্টা, তাড়াতাড়ি। ভারী কষ্ট হচ্ছে আমার।"

আমি পড়তে সুরু করলাম:

"মূলোর বেলা যে রকম আলুর বেলা সে রকম করা চল্বে না। গাছ ঝাঁকি দিয়ে পাড়্লে আলু চোট্ খায়, এই কারণেই আলু পচে এবং তাতে পোকা ধরে। আলুকে গাছে বাড়্তে দিতে হবে—যতদূর খুশী সে,

বাড়ুক্। এ রকম ব্যবস্থা করলে এক একটা আলুকে তরমুজের মত বড় হতে দেখা গেছে। অবশ্য বিলাতেই; এ দেশে আমরা আলু খেতেই শিখেছি, আলুর যত্ন নিতে শিখিনি। আলু যথেষ্ট বেড়ে উঠলে তাকে এক একটা ক'রে আলাদা আলাদা ফজলি আমের মত ঠুসি-পাড়া করতে হবে।

"তবে পেঁয়াজ আমরা আঁকশি দিয়ে পাড়তে পারি, তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই। অনেকের ধারণা পেঁয়াজ গাছের ফল, বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। বরং ওকে ফুল বলা যেতে পারে—ওর কোন গন্ধ নেই, যা আছে কেবল দুর্গন্ধ। ওর খোসা ছাড়ানো মানেই ওর কোরক ছাড়ানো। পেঁয়াজেরই অপর নাম শতদল।

"অতি প্রাচীন কালেও এদেশে ফুলকপি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাকে আহার্য্যের মধ্যে তখন গণ্য করা হ'ত না। শাস্ত্রে বলেছে অলাবু-ভক্ষণ নিষেধ, সেটা ফুলকপির সম্বন্ধেই। আর্য্যেরা কপি খেতেন না, ওটা অনার্য্য হাতীদের খাদ্য ছিল। 'গজভুক্ত কপিত্থ' এই প্রবাদে তার প্রমাণ আছে।

"বাতাবি নেবুর গাছে কমলা নেবু ফলানোর সহজ উপায় হচ্ছে এই—"

"ব্যস্, ব্যস্—ওতেই হবে।" আমার আগ্রহবান্ শ্রোতা উত্তেজিত হয়ে আমার পিঠ চাপড়াবার জন্য হাত বাড়াল। "আমি জানি আমার মাথা ঠিকই আছে, কেননা তুমি যা পড়লে আমিও ঠিক তাই পড়েছি, ওই কথাগুলোই। অন্ততঃ আজ সকালে, তোমার কাগজ পড়ার আগে পর্য্যন্ত এই ধারণাই আমার ছিল। যদিও আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে সব সময়ে নজরে নজরে রাখে তবু এই ধারণা আমার প্রবল ছিল যে আমার মাথা ঠিকই আছে—"

তার সংশয় দূর করার জন্য আমি সায় দিলাম—"নিশ্চয়! বরং অনেকের চেয়ে বেশী ঠিক এ কথা আমি বল্‌ব। এই মাত্র একজন বুড়ো লোক—কিন্তু যাক্ সে কথা।"

লোকটাও জোর দিল—"হ্যাঁ, যাক্। তবে আজ সকালে তোমার কাগজ পড়ে সে ধারণা আমার টলেছে। এখন আমি বিশ্বাস করি যে সত্যি সত্যিই

আমার মাথা খারাপ। এই বিশ্বাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এক দারুণ চীৎকার ছেড়েছি—নিশ্চয়ই তুমি এখানে ব'সে তা শুন্‌তে পেয়েছ!"

আমি ঘাড় নাড়লাম কিন্তু আমার অস্বীকারোক্তিতে সে আমল দিল না—"নিশ্চয় পেয়েছ। দু মাইল্ দূর থেকে তা শোনা যাবে। সেই চীৎকার ছেড়েই এই লাঠি নিয়ে আমি বেরিয়েছি, কাউকে খুন না করা পর্য্যন্ত আমার স্বস্তি হচ্ছে না। তুমি বুঝ্‌তেই পারছ আমার মাথার যা অবস্থা তাতে একদিন না একদিন কাউকে না কাউকে খুন আমায় করতেই হবে—তবে আজই সুরু করা যাক্ না কেন?"

কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না, একটা অজানা আশঙ্কায় বুক গুড় গুড় করতে লাগ্‌ল।

"বেরুবার আগে আর একবার তোমার প্যারাগুলো পড়্‌লাম, সত্যিই আমি পাগল কিনা নিশ্চিত হবার জন্য। কিন্তু তার পরক্ষণেই বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তায় যাকে পেয়েছি তাকেই ঠেঙিয়েছি, অনেকে খোঁড়া হয়েছে, অনেকের মাথা ভেঙেছে; সবশুদ্ধ কত জন হতাহত বল্‌তে পারি না, তবে একজনকে জানি, সে গাছের উপর উঠে বসে আছে। গোলদীঘির ধারে। আমি ইচ্ছা কর্‌লেই তাকে পেড়ে আন্‌তে পার্‌ব। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হ'ল তোমার সঙ্গে একবার মুলাকাৎ করে যাই—"

হৃৎকম্পের অজ্ঞাত কারণ এতক্ষণে আমার আয়ত্তে এল—কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্প একেবারেই স্থগিত হবার যোগাড় হ'ল যেন।

"কিন্তু তোমায় আমি সত্যি বল্‌ছি, যে লোকটা গাছে চেপে আছে তার কপাল ভাল। এতক্ষণ তবু বেঁচে রয়েছে। ওকে খুন ক'রে আসাই উচিত ছিল। যাক্, ফেরার পথে ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। এখন আসি তা হ'লে—নমস্কার।"

লোকটা চলে গেলে ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়্‌ল। কিন্তু এতগুলো লোক যে আমার লেখার জন্যই খুন-জখম্ হয়েছে, হাত-পা হারিয়েছে এবং একজন গোলদীঘির ধারে এখনও গাছে চেপে ব'সে আছে এই সব ভেবে মন অত্যন্ত ভারী

হয়ে গেল। কিন্তু শীঘ্রই এই সব দুশ্চিন্তা নির্ব্বাসন দিতে হ'ল, কেননা 'কৃষিতত্ত্বের' আটপৌরে সম্পাদক অপ্রত্যাশিতরূপে প্রবেশ করলেন।

সম্পাদকের মুখের ভাব গম্ভীর, বিষণ্ণ, লম্বমান। আমরা দুজনেই চুপচাপ্। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটিমাত্র কথা বল্লেন—"তুমি আমার কাগজের সর্ব্বনাশ করেছ।"

আমি বল্লাম, "কেন, কাট্‌তি তো অনেক বেড়েছে।"

"হ্যাঁ, কাগজ বহুৎ কেটেছে, আমি জানি। কিন্তু আমার মাথাও কাটা গেছে সেই সঙ্গে।" তার পরে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কীর্ত্তি-কলাপ তাঁর দৃষ্টিগোচর হ'ল, চারিদিকে ভাঙাচোরা দেখে তিনি নিজেও যেন ভেঙে পড়লেন—"সত্যি বড় দুঃখের বিষয়, বড়ই দুঃখের বিষয়। 'কৃষিতত্ত্বের' সুনামের যে হানি হ'ল, যে বদ্‌নাম হ'ল তা বোধহয় চিরস্তন হয়ে থাক্‌বে। অবশ্যি কাগজের এত বেশী বিক্রী এর আগে কোনদিন হয়নি বা এমন নামডাকও চারধারে ছড়িয়ে পড়েনি—কিন্তু পাগ্‌লামির জন্য বিখ্যাত হয়ে কি লাভ? কে-ই বা তা হতে চায়? একবার জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ দিকি চারধারে কি রকম ভিড়—কি সোরগোল। তারা সব দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে দেখ্‌বার জন্য। তাদের ধারণা তুমি বদ্ধ পাগল। তাদের দোষ কি? যে তোমার সম্পাদকীয় পড়্‌বে তারই ওই ধারণা বদ্ধমূল হবে। তুমি যে চাষ-বাসের বিন্দুবিসর্গও জান তা তো মনে হয় না। কপি আর কপিথ যে এক জিনিস এ কথা কে তোমাকে বল্‌ল? গোল আলুর সম্বন্ধে তুমি যে গবেষণা করেছ, মূলো-চাষের যে আমূল পরিবর্ত্তন আন্‌তে চেয়েছ সে সম্বন্ধে তোমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই। তুমি লিখেছ শামুক অতি উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু তাদের ধরা অতি শক্ত। মোটেই তা নয়, শামুক মোটেই সারবান্ নয়, এবং তাদের দ্রুতগতির কথা এই প্রথম জানা গেল। কচ্ছপরা সঙ্গীত-প্রিয়, রাগ-রাগিণীর সম্মুখে তারা মৌনী হয়ে থাকে তোমার এ মন্তব্য একান্তই বাহুল্য—একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কচ্ছপদের মধ্যে উচ্চ-অঙ্গের সুরবোধের কোনই পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। এম্‌নিই ওরা চুপ-চাপ থাকে, মৌনী হয়ে থাকাই ওদের স্বভাব—সঙ্গীতের কোন ধারই ধারে না ওরা। কচ্ছপদের দ্বারা জমি চষানো

অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। আপত্তি না করলেও জমি তারা চষ্‌বে না—তারা তো বলদ নয়। তুমি যে লিখেছ ঘোড়ামুগ ঘোড়ার খাদ্য আর কলার বীচি থেকে কলাই হয় তার ধাক্কা সাম্‌লাতে আমার কাগজ উঠে না গেলে বাঁচি! গাছের ডাল আর ছোলার ডালের মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেটা বোঝাবার জন্য দেড় পাতা খরচ করে তা বোঝাবার তোমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কেবল তুমি ছাড়া আর সবাই এ কথা জানে। যাক্, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি বিদায় নাও। তোমাকে আর সম্পাদকতা করতে হবে না। আমার আর বায়ু-পরিবর্ত্তনে কাজ নেই—ঘাটশিলায় গিয়েই আমাকে দৌড়ে আস্‌তে হয়েছে—তোমার পাঠানো কাগজের কপি পেয়ে অবধি আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। পরের সপ্তাহে আবার তুমি কি গবেষণা ক'রে বস্‌বে সেই ভয়েই আমার বুক কেঁপেছে। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! যখনই তোমার ঘোষণার কথা ভেবেছি—জাম, জামরুল আর গোলাপ জাম কি ক'রে একই গাছে ফলানো যায়, পরের সংখ্যাতেই তুমি তার উপায় বাৎলে দেবে তখন থেকেই নাওয়া খাওয়া আমার মাথায় উঠেছে—বেরিবেরিতে প্রাণ যায় সেও ভালো—তখনই আমি কলকাতার টিকেট কিনে গাড়ীতে চেপেছি।"

এতখানি বক্তৃতার পর ভদ্রলোক এক দারুণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। ওঁরই কাগজের কাট্‌তি আর খ্যাতি বাড়িয়ে দিলাম, আয়ও বেড়ে গেল কত, অথচ উনিই আমাকে গাল-মন্দ করছেন! ভদ্রলোকের নেমক্-হারামি দেখে আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল। অতএব, শেষ-বিদায় নেওয়ার আগে আমিই বা নিরস্ত হই কেন? আমার বক্তব্য আমিও বলে যাব। এত খাতির কিসের?

"বেশ, আমার কথাটাও শুনুন্ তবে। আপনার কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই, আপনি একটি আস্ত বাঁধাকপি। এরকম অসহৃদয় মন্তব্য যা এতক্ষণ আমাকে শুন্‌তে হয়েছে তা শুনব ব'লে কোনদিন আমি কল্পনাও করিনি। কাগজের সম্পাদক হ'তে হ'লে কোন কিছু জান্‌তে হয় তাও এই প্রথম আমি শুন্‌লাম। এতদিন তো দেখে আস্‌ছি যারা বই লিখ্‌তে জানে না তারাই বইয়ের সমালোচনা করে, আর যারা ফুটবল্ খেল্‌তে পারে না তারাই ফুটবল্ খেলা দেখ্‌তে যায়।

আপনি নিতান্তই শালগম্ আর গাঁজর তাই এ কথা বুঝতে আপনার বেগ পেতে হচ্ছে। যদি ভূমিকুষ্মাণ্ড না হ'তেন তা হ'লে অবশ্যই বুঝতেন যে 'কৃষি-তন্ত্রের' কি উন্নতি আর আপনার কতখানি উপকার আমি করেছি! কি আর বল্ব আপনাকে, পালংশাক, পানফল, তালশাঁস যা খুসী বলা যায়। আপনাকে পাতি নেবু বল্লে পাতি নেবুর অপমান করা হয়—"

দম্ নেবার জন্য আমাকে থাম্‌তে হ'ল। গায়ের ঝাল্ মিটিয়ে গালাগালের শোধ তুল্‌লাম, কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে নির্ব্বাক্। আবার আরম্ভ করলাম—

"হ্যাঁ, এ কথা সত্যি, সম্পাদক হবার জন্য আমি জন্মাই নি। যারা সৃষ্টি করে আমি তাদেরই একজন, আমি হচ্ছি লেখক। ভুঁইফোড় কাগজের সম্পাদক হয় কারা? আপনার মত লোক—নিতান্তই যারা টম্যাটো। সাধারণতঃ যারা কবিতা লিখ্‌তে পারে না, আট-আনা-সংস্করণের নভেল্‌ও যাদের আসে না, পিলে-চম্‌কানো থিয়েটারী নাটক লিখ্‌তেও অক্ষম, প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্রেও অপারগ তারাই অবশেষে হাত-চুলকানো থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আপনার মত কাগজ বের ক'রে বসে। আপনি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছেন তাতে আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাক্‌তে আমার রুচি নেই। এই দণ্ডেই সম্পাদক-গিরিতে আমি ইস্তফা দিচ্ছি। 'চাষাড়ে' কাগজের সম্পাদকের কাছে ভদ্রতা আশা করাই বাতুলতা! ঘড়ির দুর্দ্দশা দেখেই আমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। যাব তো আমি নিশ্চয়ই, কিন্তু জান্‌বেন্, আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রে গেছি। যা চুক্তি ছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি আমি। বলেছিলাম আপনার কাগজ সর্ব্বশ্রেণীর পাঠ্য ক'রে তুল্‌ব—তা' আমি করেছিও। বলেছিলায় আপনার কাগজের কুড়ি হাজার গ্রাহক ক'রে দেব—যদি আর দু' সপ্তাহ পেতাম তাও আমি কর্‌তে পারতাম। এখন—এখনই আপনার পাঠক কারা? কোনো চাষের কাগজের ভাগ্যেই যা কোনদিন জোটেনি সেইসব লোক আপনার কাগজের পাঠক—যত উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, মোক্তার, হাইকোর্টের জজ্, কলেজের প্রোফেসার, সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। একজনও চাষা নেই ওর মধ্যে—যত চাষা গ্রাহক ছিল তারা সব চিঠি লিখে কাগজ ছেড়ে দিয়েছে—ওই দেখুন্ টেবিলের উপর চিঠির গাদা। কিন্তু আপনি এমনই চাল্‌কুম্‌ড়ো যে পাঁচ শো মুখ্যু চাষার জন্যে বিশ হাজার উচ্চ-শিক্ষিত গ্রাহক পরিত্যাগ করলেন! (বলি রাজাও যা কখনো কর্‌ত না!) কিন্তু এতে আপনারই ক্ষতি, আমার কি! আমি চল্লাম।"

নেপ্‌চুন্ ও প্লুটো

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

তোমাদের মধ্যে যারা একটু-আধটু বিদেশী পুরাণের গল্প পড়িয়াছ নেপ্‌চুন্ ও প্লুটোর নাম তাদের কাছে নিশ্চয়ই নতুন লাগিবে না। ইহারা দু'জনেই বেশ

পাহাড়ের উপর অবস্থিত 'মাউন্ট্ উইল্‌সন্ অবজারভেটারি'র (পর্য্যবেক্ষণাগার) আকাশ হইতে তোলা ফটো। এটি পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ অবজারভেটারি। এখান হইতে বড় বড় শক্তিশালী দূরবীণ দিয়া পণ্ডিতেরা গ্রহ-তারা পর্য্যবেক্ষণ করেন।

একটু হোমরা-চোমরা দেবতা—একজনের রাজ্য সমুদ্রে, আর একজনের পাতালে। অর্থাৎ, আমাদের পুরাণে যেমন বরুণ আর যম, ওদেশের পুরাণে ইঁহারাও ঠিক তেমনি। কাজেই ইঁহাদের সম্বন্ধে একটু সমীহ করিয়াই কথাবার্ত্তা বলা উচিত। কিন্তু আজ আমি তোমাদের দেবতা নেপ্‌চুন্ কিংবা দেবতা প্লুটোর কথা বলিতে

রসি নাই—আমি গ্রহ নেপ্‌চুন্ আর প্লুটোর কথা বলিতেছিলাম ; অবশ্য ঐ দেবতাদের নাম হইতেই এই গ্রহদের এই রকম নামকরণ হইয়াছে।

নেপ্‌চুন্ গ্রহের নাম তোমরা সবাই জান। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্—তার পরেই নেপ চুন্। আমাদের সূর্য্যমামাকে ঘিরিয়া যে ক'টি 'ভদ্রলোক' দিবারাত্র লাট্টুর মত পাক খাইতে খাইতে ঘুরিতেছে—এই নেপ্‌চুন্‌ই এত দিন তাদের মধ্যে সব চেয়ে দূরের গ্রহ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। তবে প্লুটো আবার আসিল কোথা হইতে! প্লুটোর নাম বোধ হয় তোমাদের অনেকের কাছেই নতুন ঠেকিতেছে! বাস্তবিক, গ্রহ হিসাবে প্লুটো নিতান্তই 'ছেলেমানুষ'। তার 'বয়স' সবে এই ছয় বছর। তাই বলিয়া যেন মনে করিও না, প্লুটো মাত্র ছয় বছর হইল সূর্য্য হইতে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়াছে। তা নয়, অন্যান্য গ্রহের মত সেও বহু দিন আগেই জন্মিয়াছে তবে তার অস্তিত্বের কথা পৃথিবীর কেউ এত দিন জানিত না ; সবে ছয় বছর হইল পণ্ডিতেরা তার খোঁজ পাইয়াছেন। কাজেই প্লুটোকে ছয় বছরের 'খোকা-গ্রহ' বলিলে নেহাৎ দোষের হইবে না বোধ হয় !

কিন্তু এমন একদিন ছিল যখম নেপ্‌চুন্‌কেও লোকে খোকা-গ্রহ বলিত—খুব বেশী দিন নয়, এই একশ' বছর আগের কথাই বলিতেছি। তখন ইউরেনাস্‌কেই লোকে সূর্য্যের রাজত্বের সব চেয়ে দূরের গ্রহ বলিয়া জানিত। ইউরেনাসের আবিষ্কারের গল্প তোমাদের একবার বলিয়াছিলাম (রামধনু, বৈশাখ, ১৩৪০)। উইলিয়াম্ হার্সেল্ নামে এক বাজনাদার কেমন করিয়া রাত জাগিয়া নিজের হাতে দূরবীণ তৈরী করিয়া তা দিয়া আকাশের অসংখ্য গ্রহ-তারার মধ্য হইতে ইউরেনাস্‌কে বাছিয়া ফেলিলেন—সে এক আশ্চর্য্যজনক গল্প। কিন্তু নেপ্‌চুনের আবিষ্কার বোধ হয় তার চেয়েও বিস্ময়কর।

ইউরেনাস্ তখন সবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নতুন একটা গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে চারিদিকে—বিশেষতঃ পণ্ডিতদের মধ্যে—খুবই হৈ-চৈ পড়িয়া যাইবার কথা। ইউরেনাস্ আবিষ্কারের পরও ঠিক তাই হইল। ইউরেনাস্ সম্বন্ধে

নানা তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বড় বড় জ্যোতিষীরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। ইউরেনাসের হাল-চাল, সে কোন্ পথে সূর্য্যকে ঘুরিতেছে, তার ঘুরিবার নিয়ম-কানুন কি, কখন আকাশের কোন্ জায়গায় তাকে দেখা যাইবে ইত্যাদি নানান্ খবর তাঁরা হিসাব কষিয়া ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখা গেল কোথায় যেন একটু গোল রহিয়া গিয়াছে। হিসাব মত ইউরেনাসের যখন যে জায়গায় থাকিবার কথা তখন তাকে ঠিক সে জায়গায় পাওয়া যাইতেছে না। অঙ্ক কষিতে কোন রকম ভুল হইয়াছে ভাবিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা আবার হিসাব করিতে বসিয়া গেলেন, কিন্তু অঙ্কে কোন রকম ভুল ধরা পড়িল না। পণ্ডিতেরা বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। আকাশের এত অসংখ্য গ্রহ-তারা তাঁদের অঙ্কের হিসাব মত চলাফেরা করিতেছে, ইউরেনাসের বেলা এ কি হইল !

বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে পণ্ডিত-মহলে আরও বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল। অনেকেই এই বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতে সুরু করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্যারিস্ সহরে লে ভেরিয়ার নামে একটি ফরাসী যুবক এবং কেম্ব্রিজে য়্যাডাম্‌স্ নামে একটি ইংরাজ যুবকও ছিলেন। ইঁহাদের দু'জনেরই অঙ্কে ছিল ভয়ানক মাথা। অবশ্য ইঁহারা কেউ কাউকে চিনিতেন না—এমন কি নামও জানিতেন কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর দুই অঞ্চলে বসিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে একে অপরের অজ্ঞাতসারে ইঁহারা এই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করিতেছিলেন।

য়্যাডাম্‌স্ ও লে ভেরিয়ার অনেক হিসাব-পত্র ঘাঁটাঘাঁটির পর অনুমান করিলেন নিশ্চয়ই আকাশের কোথাও আরও একটা অজানা গ্রহ আছে, এবং তারই টানে পড়িয়া ইউরেনাস্ ঠিক সময়ে আমাদের দেখা দিতে পারিতেছে না। তার পর এই দুই যুবক বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত কৌশলে সেই অজানা গ্রহটি আকাশের কোথায় আছে, আকারেই বা সেটা কত বড়, এবং কখন তাকে কোথায় দেখা যাইবে ইত্যাদি সমস্ত খুঁটিনাটি খবর অঙ্ক কষিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। কী অদ্ভুত ক্ষমতা বল দেখি ! য়্যাডাম্‌স্-এর হিসাবই আগে শেষ হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নতুন গ্রহ আবিষ্কারের প্রথম সম্মান তাঁর অদৃষ্টে জুটিল না।

ছোক্‌রা বৈজ্ঞানিক, কোথায় কি ভুলচুক্‌ বাহির হইবে, তাই গোড়াতেই ব্যাপারটা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া তিনি হিসাবটা ইংলণ্ডের একজন বড় জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে দেখিতে দিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেন না, সুবিধামত এক সময়ে দেখিবেন ভাবিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। এদিকে লে ভেরিয়ারের হিসাবও কিছু দিন পরেই শেষ হইল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি জার্ম্মেনীর এক বড় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ গল্‌ সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

গল্‌ কিন্তু লে ভেরিয়ারের হিসাবপত্র মোটেই ফেলিয়া রাখিলেন না; তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন, তার পর তাঁর বিরাট্‌ দূরবীণ লইয়া আকাশের যেখানটায় সেই সময়ে লে ভেরিয়ারের হিসাব অনুযায়ী অজানা গ্রহটির থাকিবার কথা সেখানে খোঁজ করিতে লাগিলেন। কিছু খুঁজিবার পরই নতুন গ্রহের সন্ধান মিলিল;—লে ভেরিয়ারের অঙ্কে কোনও ভুল হয় নাই। এই ভাবে ইউরেনাস্‌ আবিষ্কৃত হইবার ৬৫ বছর পরে ১৮৪৬ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর আমাদের পরিচিত গ্রহের তালিকায় আর একটি গ্রহের নাম যোগ করা হইল। এই গ্রহটিই আমাদের নেপ্‌চুন্‌।

এ রকম অদ্ভুত ঘটনা বড় একটা দেখা যায় না। এত বড় একটা আবিষ্কার—যা নাকি বড় বড় দূরবীণ লইয়া ততোধিক বড় বড় পণ্ডিতের দল দীর্ঘকালের চেষ্টায়ও ধরিতে পারেন নাই—তাই কিনা একটি ছোক্‌রা বৈজ্ঞানিক শুধু অঙ্ক কষিয়া বাহির করিয়া ফেলিল! এ তো বড় সহজ কথা নয়! নেপ্‌চুনের আবিষ্কারে তাই সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিত-মহলে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

এদিকে যে ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ্‌টির কাছে য়্যাডাম্‌স্‌ তাঁর হিসাবপত্র দিয়াছিলেন তিনি তখন পর্য্যন্ত সে হিসাব দেখিয়া উঠিতে পারেন নাই। নেপ্‌চুনের আবিষ্কারের সংবাদ কানে যাইতেই হঠাৎ তাঁর য়্যাডাম্‌স্‌-এর কথা মনে পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া য়্যাডাম্‌স্‌-এর কাগজপত্র পরীক্ষা করিলেন, তার পর দূরবীণ লইয়া আকাশে নতুন গ্রহের খোঁজ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তিনি অবাক্‌ হইয়া দেখিলেন—য়্যাডাম্‌স্‌ অঙ্ক কষিয়া আকাশের যেখানে অজানা গ্রহের সন্ধান দিয়াছেন বাস্তবিকই সেখানে একটি নতুন গ্রহ রহিয়াছে। তখন

তাঁর মনের অবস্থা কেমন হইল ভাব দেখি! তাঁর একটু ত্রুটীর জন্য এত বড় একটা আবিষ্কারের সম্মান ইংলণ্ডের য়্যাডাম্‌স্‌-এর নিকট হইতে ফস্‌কাইয়া চলিয়া গেল ফ্রান্সের লে ভেরিয়ারের কপালে। লে ভেরিয়ারের অসাধারণ কৃতিত্বের অবশ্য তুলনা নাই, কিন্তু য়্যাডাম্‌স্‌-এর হিসাবই তো আগে শেষ হইয়াছিল।

যাই হোক্‌, তার পর ৯০ বছর চলিয়া গিয়াছে। নেপ্‌চুন্‌ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখন আরও অনেক কথা বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। নেপ্‌চুন্‌ আকারে নেহাৎ কম নয়, ইউরেনাসের চেয়ে বড়; আমাদের পৃথিবীর মত ২৫টি পৃথিবী পর পর যোড়া লাগাইলে তবে নেপ্‌চুনের সমান হইবে, যদিও ওজনে নেপ্‌চুন্‌ পৃথিবীর মাত্র ১৭ গুণ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন নেপ্‌চুনের উপরটা সবই তরল। সূর্য্য হইতে পৃথিবী যতখানি দূরে আছে, নেপ্‌চুন্‌ আছে তার প্রায় ত্রিশ গুণ দূরে—সূর্য্য হইতে নেপ্‌চুনের দূরত্ব গড়ে প্রায় ২৭৫ কোটি মাইল্‌। অত দূরে আছে বলিয়া নেপ্‌চুনে সূর্য্যের আলো বিশেষ পৌঁছিতে পারে না, নেপ্‌চুনের আকাশ তাই সব সময়েই অন্ধকার। তোমরা যদি নেপ্‌চুনে যাইতে পারিতে তবে সেখান হইতে সূর্য্যকে দেখিলে হয়ত একটা নক্ষত্র বলিয়া ভুল হইত। সূর্য্য হইতে অত দূরে থাকায় নেপ্‌চুনে শীতও খুব তীব্র। একটু-আধটু নয়, আমাদের পৃথিবীর চেয়ে সেখানে নয়শ' গুণ বেশী শীত। আমাদের উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু তার তুলনায় অগ্নিকুণ্ড। কাজেই নেপ্‌চুনে আমাদের পরিচিত কোনও জীব যে থাকিতে পারে না তা' বোধ হয় না বলিলেও চলে।

নেপ্‌চুন্‌ সূর্য্য হইতে অনেক দূরে থাকায় তার সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিবার রাস্তা খুব লম্বা,—তা' ছাড়া নেপ্‌চুন্‌ চলেও পৃথিবীর তুলনায় খুব ধীরে ধীরে। পৃথিবী যেখানে চলে সেকেণ্ডে ১৮ মাইল্‌, নেপ্‌চুন্‌ সেখানে চলে সেকেণ্ডে সাড়ে তিন মাইল। কাজেই সূর্য্যকে এক-এক পাক ঘুরিয়া আসিতে নেপ্‌চুনের লাগে প্রায় ১৬৫ বছর। অর্থাৎ নেপ্‌চুনের এক-একটি বছর আমাদের ১৬৫টি বছরের সমান। নেপ্‌চুনে যদি লোক থাকিত আর সেখান হইতে একটি এক বছরের খোকা আসিয়া যদি আমাদের পৃথিবীতে বাস করিতে সুরু করিত তবে দেখিতে সে বয়সে জেরো আগার চেয়েও বড়।

পণ্ডিতেরা নেপ্‌চুনের একটি চাঁদেরও খোঁজ পাইয়াছেন। এই চাঁদ ৬ দিনে নেপ্‌চুন্‌কে একবার করিয়া পাক খায়—অর্থাৎ সেখানে মাসে ৫টা করিয়া পূর্ণিমা আর ৫টা করিয়া অমাবস্যা। চাঁদটির আবার আর এক গুণ আছে। অন্যান্য গ্রহের চাঁদগুলি সাধারণতঃ যেদিকে মুখ করিয়া ঘোরে নেপ্‌চুনের চাঁদ ঘোরে তার উল্টা দিকে। নেপ্‌চুনের দিন সম্বন্ধে—অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে এক-একবার পাক খাইতে তার কত সময় লাগে সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখন পর্য্যন্ত তেমন কিছু জানিতে পারেন নাই।

নেপ্‌চুন্‌ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, এবার প্লুটোর সম্বন্ধে কিছু বলি। প্লুটোর আবিষ্কারও হইয়াছে ঠিক নেপ্‌চুনের মত করিয়া—আবিষ্কারের মূলে সেই ইউরেনাস্‌ গ্রহ। নেপ্‌চুন্‌ আবিষ্কারের পর ইউরেনাসের গতিবিধি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আবার নতুন করিয়া হিসাব করিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখা গেল ইউরেনাস্‌ এখনও ঠিক পথে ঘুরিতেছে না—যখন যেখানে তার দেখা দিবার কথা ঠিক তখন সেখানে সে দেখা দিতেছে না। তখন পণ্ডিতেরা আবার সন্দেহ করিলেন হয়ত নেপ্‌চুনের মত আরও কোন অজানা গ্রহ ইউরেনাস্‌কে টানিতেছে।

য়্যাডাম্‌স্‌ ও লে ভেরিয়ার যেমন অঙ্ক কষিয়া নেপ্‌চুনের স্থান, গতিবিধি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবারেও তেমনিধারা আর এক পণ্ডিত অঙ্ক কষিয়া এই নতুন অজানা গ্রহটি আকাশের কোথায় কখন থাকিতে পারে ইত্যাদি খবর হিসাব করিয়া ফেলিলেন। এই বৈজ্ঞানিকটি আমেরিকার লোক—আরিজোনার ফ্ল্যাগ্‌ষ্টাফ্‌ অব্‌জারভেটারির (পর্য্যবেক্ষণাগার) প্রফেসার লাওয়েল্‌।

লাওয়েল্‌ যখন আকাশের যে জায়গার কথা বলিয়াছিলেন সেখানে সেই সেই সময়ে তন্ন তন্ন করিয়া এই নতুন গ্রহের সন্ধান চলিল। বড় বড় অব্‌জারভেটারিতে আজকালকার ‘বাঘা বাঘা’ দূরবীণ—যা দিয়া নাকি চাঁদের গায়ে একটা তেতালা বাড়ী উঠিলে তা'ও ধরা পড়িয়া যায়—তাই লইয়া খোঁজাখুঁজি হইতে লাগিল। অবশেষে দীর্ঘ পনেরো বছরের চেষ্টার পর ১৯৩০ সনের মার্চ্চ্‌ মাসে গ্রহটিকে পাওয়া গেল—যেখানে লাওয়েল্‌ বলিয়াছিলেন প্রায় সেখানেই। গ্রহটির

গতিবিধি সম্বন্ধে লাওয়েল্‌ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাও প্রায় মিলিয়া গেল। দুঃখের বিষয় এই আবিষ্কার যখন হইল তখন লাওয়েল্‌ সাহেব আর বাঁচিয়া নাই। নিজের এত বড় সাফল্য তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

প্লুটো আবিষ্কার হইয়াছে বটে কিন্তু প্লুটো সম্বন্ধে এখনও তেমন কিছু জানা যায় নাই। সূর্য্য হইতে গ্রহটি এত দূরে যে খুব ভাল দূরবীণ দিয়াও তাকে ভাল করিয়া দেখা যায় না। সূর্য্য হইতে পৃথিবী যত দূরে, প্লুটো আছে তার প্রায় চল্লিশ গুণ বেশী দূরে। কাজেই সেখানে এত ঠাণ্ডা যে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—সেখানকার শুধু ডাঙ্গা আর জলই নয়, যদি বাতাস বলিয়া কিছু থাকে তবে তা'ও জমিয়া বরফের মত শক্ত জমাট হইয়া আছে। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে প্লুটোর এক-একটি বছর (অর্থাৎ সূর্য্যের চারদিকে এক-একটা পাক খাইবার সময়) আমাদের প্রায় ২৫০টি বছরের সমান, আর প্লুটো ঘুরিতেছে সেকেণ্ডে ২.৯ মাইল্‌ বেগে।

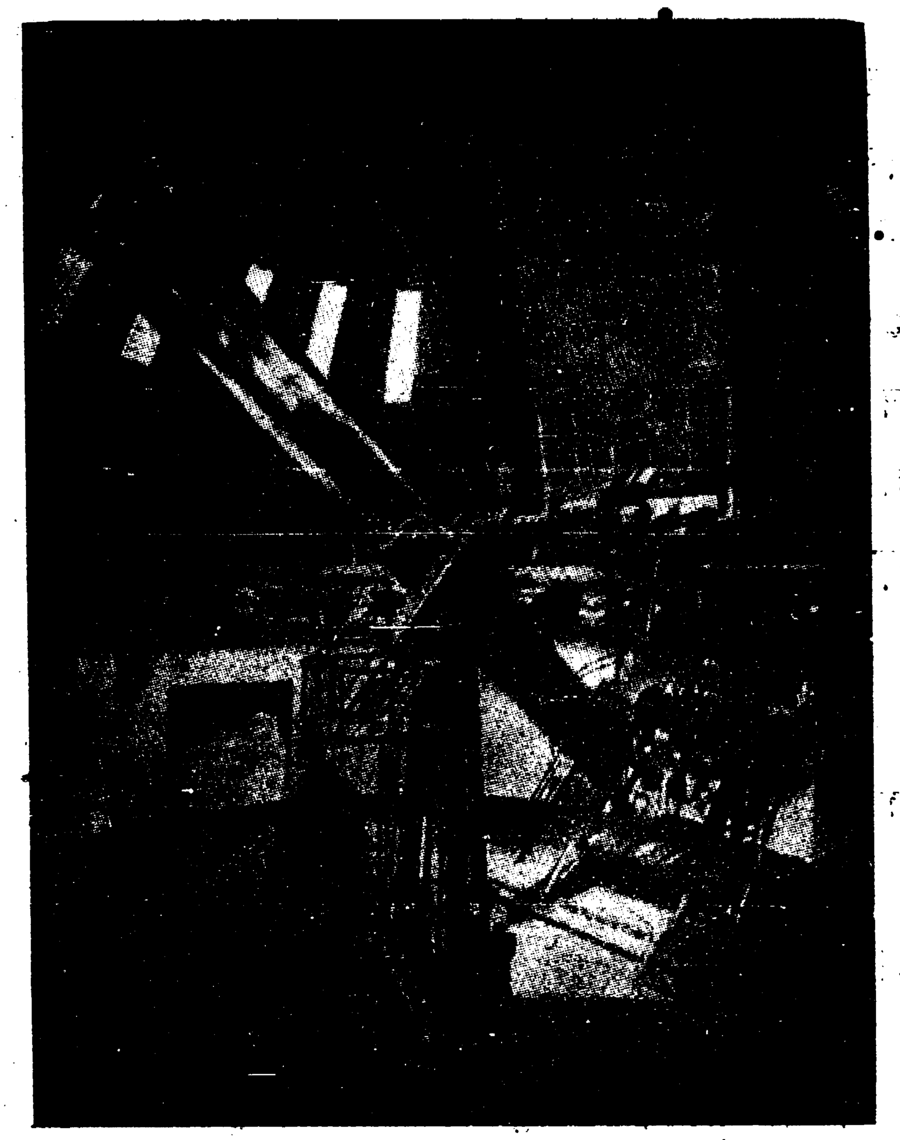
আকাশের গ্রহ-তারা দেখিবার একটি “বাঘা” দূরবীণ। এটির সাহায্যে চাঁদকে এত বড় দেখায় যে চাঁদের গায়ে একটা তেতালা বাড়ী উঠিলে তা'ও এর মধ্যে ধরা পড়িবে।

বিজ্ঞাপনের বহর

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি)

লীলা—লীলা কিনা শেষ পর্য্যন্ত বিনয়কে আজ এত লোকের সাম্‌নে ঐ রকম করে অপমান কর্‌লে?...লীলার জন্য কি না করে সে? কোথায় উল, কোথায় পিক্টোগ্রাফ, কোথায় ব্লাউসের পিস্—সমস্ত কিনে এনে দেয়; আজ আইস্‌ক্রিম, কাল চকোলেট—কত কি এনে এনে খাওয়ায়, আর সেই লীলাই আজ পাঁচজনের সাম্‌নে তাকে অম্‌নি করে অপদস্থ কর্‌লে! কি অপরাধটা সে করেছে?—লীলার চোখ দুটো কটা,—এই নিয়ে একটু ঠাট্টা করেছে বৈ ত নয়! তাতেই লীলা তাকে অম্‌নি বল্‌ল—"আর তোমার চুল? চুল নয়ত সজারুর কাঁটা! তার উপর রং ত আরও চমৎকার—যেন সব সময়েই ইটের গুঁড়ো মাখান থাকে—এম্‌নি কটা রং।"—সব বলে দিল আজ সে বিশ্বাসঘাতকতা করে? এও বল্লে যে যতক্ষণ ওর চুল ভিজে থাকে ততক্ষণ ওর চুল কোনও রকমে পাতা থাকে, শুকোলেই একেবারে খাড়া হয়ে ওঠে। কোথাও নতুন জায়গায় যেতে হ'লে সে মাথা ধুয়ে জল মোছে না, পাছে শুকিয়ে গেলে সকলের সাম্‌নে চুল খাড়া হয়ে ওঠে। মাথা ভিজে থাকার জন্য কতদিন তার মাথা ধরেছে, কতদিন সর্দ্দি হয়েছে, এমন কি দু' একদিন জ্বর পর্য্যন্তও হয়েছে। আবার বল্লে, "মাসীমা, ওর চুলগুলি এখন বেশ মাথায় পাতা রয়েছে দেখ্‌ছেন—মাথায় একটু হাত দিয়ে দেখুন ত কি রকম ভিজে! আপনাদের সাম্‌নে এসে বস্‌তে হবে বলে বাথরুমে গিয়ে এখনি মাথা ধুয়ে চুল আঁচড়ে এল, দেখবেন একটু পরেই আবার উঠে যাবে জল দিতে; আর যদি না যায় তা হ'লে দেখবেন চুলগুলো কি রকম আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে উঠ্‌বে একটু পরেই।

মাসীমা সত্যিই মাথায় হাত দিয়ে দেখ্‌লেন। বল্লেন, "একি সত্যিই, এ যে বড্ড ভিজে—ছিঃ বাবা, অসুখ কর্‌বে যে!"—বলে নিজের শাড়ী দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার চুলগুলো সটান খাড়া হয়ে উঠল।

উঃ, তার মাসতুত ভাই-বোনগুলি—যারা আজ প্রথম তাদের বাড়ী এসেছে এবং যাদের সঙ্গে এখনও ভাল করে তার পরিচয়ও হয় নি—সেই ভাই-বোনগুলি কি রকম এক সঙ্গে চেঁচিয়ে হেসে উঠল তার চুলের অবস্থা দেখে।

বিনয় লজ্জায়, অপমানে লাল হয়ে উঠ্‌ল, একটা কথা পর্য্যন্ত বল্‌তে পার্‌লে না। আর লীলাটা ঠোঁট চেপে চেপে কি রকম বিদ্রূপের হাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল! বাবা বা মাও তাকে কিছু বল্লেন না বরং তাঁরাও হাসিতে যোগ দিলেন।

বিনয় সেই দশটার সময় না খেয়ে দেয়ে বাড়ী থেকে বা'র হয়ে পড়েছে। সমস্ত দিন রৌদ্রের মধ্যে ঘুরে বেরিয়েছে—পকেটে টাকা রয়েছে তবুও এক পয়সার মুড়িও কিনে খায় নি। একবার ভাব্‌ছে যে এ জীবন সে আর রাখ্‌বে না; আবার ভাব্‌ছে দেশত্যাগী হবে; আবার কখনও বা ভাবছে যে তার নেই কি? অমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ সুগঠিত চেহারা, দুধে-আলতা রং, অমন সুন্দর চোখ—কিন্তু এক ঐ চুলের জন্য তার সমস্ত সৌন্দর্য্য মাঠে মারা গেল! ঐ চুলের দফা আজ ও শেষ কর্‌বে, একেবারে সমস্ত চুল সে ছেঁটে ফেল্‌বে, নয়তো একেবারে ন্যাড়া হবে; এ সজারুর কাঁটার মত খাড়া, আর ইটের গুঁড়োর মত কটা চুল থাকার চেয়ে ন্যাড়া হওয়া ঢের ভাল।

শেষ পর্য্যন্ত সে ন্যাড়া হবেই ঠিক কর্‌ল। ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌ল একটা হেয়ার-কাটিং সেলুনের দিকে। সেলুনে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় দেখ্‌লে পাশের একটা ষ্টেশনারী দোকানের দরজার কাছে প্রকাণ্ড এক বিজ্ঞাপন—"দুর্দ্দান্ত-কেশবিমর্দ্দিনী তৈল ব্যবহারে যে কোনও রকমের শক্ত এবং খাড়া চুল পশমের মত নরম হয় এবং যে কোন বর্ণের চুল কালীর মত কালো হইয়া যায়। মূল্য এক শিশি ২৲—এই দোকানে পাওয়া যায়।"

বিনয় প্রথমটা যেন বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ল না—একবার, দু'বার তিনবার পড়্‌ল। তার পর এক লাফে দোকানের ভিতর ঢুকে পড়ে দোকানের একটী লোককে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"হ্যাঁ মশায়, সত্যি?"

লোকটী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কি সত্যি, মশায়?"

বিনয় লজ্জিত হয়ে বল্লে, "এই যে দুর্দ্দান্ত-কেশবিমর্দ্দিনী তৈল, এ মাখলে কি সত্যিই শক্ত চুল নরম হয়?"

"আজ্ঞে হাঁ, হয়"

বিনয় তার নিজের চুল দু'হাতে ধরে বল্লে—"দেখুন মশাই, আমার এ স্কাউণ্ড্রেল্ চুলকে নরম করা যা তা কর্ম্ম নয়—আমার চুলকে নরম কর্‌তে পার্‌বে আপনাদের ঐ তেল?"

লোকটী এবার হেসে বল্লে, "নিশ্চয়ই, আপনার চুল ত ছার, সজারুর কাঁটা, শূয়োরের কুঁচি—যাতে লাগাবেন তা নরম হয়ে যাবে, একেবারে পশমের মত।"

"আর চুলের রং?—"

"একেবারে কালো—মিশমিশে কালো হয়ে যাবে মশায়।"

বিনয়ের কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, সে ভাব্‌ল, নিশ্চয়ই ফুঁকো ব্যবসাদারী কথা এ সব⋯

এমন সময় এক ভদ্রলোক দোকানে ঢুকলেন, বল্লেন, "মশায়, আপনাদের সেই 'দুর্দ্দান্ত-কেশবিমর্দ্দিনী তৈল' দু শিশি দিন ত!"

বিনয় ভদ্রলোকটীর মাথার দিকে একবার তাকাল; দেখ্‌লে যে তাঁর মাথায় চমৎকার কালো চুল সুন্দর করে আঁচড়ান। সে অবাক্ হয়ে গেল, বল্লে, "মশায়, কিছু মনে করবেন না, আপনার মাথায় ত চমৎকার কালো চুল—তবে ঐ তেল⋯?"

ভদ্রলোকটী হেসে বল্লেন, "মশায়, আমার চুল এ রকম ছিল না—ছিল ভীষণ খাড়া আর বিশ্রী রকমের কটা, এই তেল ব্যবহার ক'রে স্রেফ দু'ঘণ্টার মধ্যে চুল একেবারে বদলে গেছে। আজ আবার দু' শিশি নিতে এসেছি আমার এক বন্ধুর জন্য"।

বিনয়ের এবার আর কোন সন্দেহই রইল না? "দু'ঘণ্টার মধ্যে—?" তার মনটা মহানন্দে নেচে উঠল, ইচ্ছা হ'ল যে একবার চীৎকার করে হেসে ওঠে। সে তক্ষণি পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে বল্লে, "আমাকে এক শিশি দিন ত মশায়।"

একজন লোক একটী তেলের শিশি এনে টেবিলটার উপর রাখ্‌ল। বিনয় একটু এগিয়ে যে ভদ্রলোক ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে ছিলেন তাঁর কাছে গিয়ে টাকা দুটো দিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর থেকে শিশিটা তুলে নিয়ে ছুটল বাড়ীর দিকে।

বাড়ীতে এসেই চাকরকে বল্ল—"আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে—রাতে কিচ্ছু খাব না, আমার শরীর ভাল নেই।" বলে দরজা বন্ধ করে দিল।

মা এসে কত সাধলেন, কিন্তু বিনয় দরজা খুলল না।

লীলা এসে কত অনুরোধ, কত কাকুতি-মিনতি কর্‌লে—বিনয় তবুও দরজা খুল্‌ল না। শুধু সে বল্‌লে, "না আজ নয়, কাল সকালে খুল্‌ব, কাল সকালে।"

সকলেই হতাশ হয়ে চলে গেল।

বিনয় ভাবলে—সকাল একবার হোক্, তখন একবার সকলে দেখ্‌বে যে বিনয়ের চুল আর সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে নেই, একেবারে পশম—পশম হয়ে গেছে, আর চুলের রং কালো মিশমিশে।

শিশিটা পকেট থেকে বার করে সে একবার বুকে চেপে ধর্‌ল, তার পর আবার সেটাকে মাথায় করে প্রচণ্ড তাণ্ডব নাচ্‌তে সুরু করে দিল আর নিজে-নিজেই বল্‌তে লাগ্‌ল, "ওরে দুর্দ্দান্ত-কেশবিমর্দ্দিনী তৈল—আমার বাঞ্ছাকল্পতরু, কোথায় ছিলি এত দিন? আমি যে কত দুঃখ, কত অপমান সহ্য করেছি, কত কষ্ট পেয়েছি এতদিন—"

বিনয় প্রায় আনন্দে পাগল হয়ে উঠেছে। সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য দিন সে আয়নার সম্মুখে সহজে যেত না—তার ঐ 'স্কাউণ্ড্রেল' চুলগুলোর চেহারা দেখলে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করত। কিন্তু আজ? আজ আর তার কোনও দুঃখ নেই—আয়নায় খাড়া খাড়া কটা রংএর চুলগুলোর দিকে তাকায় আর হাসিতে মুখ ভরে ওঠে—ভাবে এই রাত্রিটুকু, ব্যস্, তার পরই কাল সকালে বাছাধনদের সব মাথা কাৎ ক'রে পড়্‌তে হ'বে—স্রেফ পশম; আর রং? একেবারে মিশমিশে কালো। একবার লাগাবো, দুটী ঘণ্টা, ব্যস্, তার পরেই—আর সে ভাব্‌তে পার্‌লে না। শিশি থেকে তেল ঢেলে মাথায় মাখতে লাগ্‌ল আর পাগলের মত চেঁচাতে

লাগ্‌ল, "কেমন বাছাধনেরা ? আর দুটী ঘণ্টা—তার পর, তার পর যে পশমের মত নরম হয়ে ঘাড় কাৎ করে পড়তে হ'বে !" শিশিটার প্রায় অৰ্দ্ধেক তেল সে খালি করে ফেল্‌ল।

ক্রমশঃ বিনয় ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। খালি ঘড়িটার দিকে তাকায়—কখন দু'ঘণ্টা কাটবে। কিন্তু দু'ঘণ্টার ঢের আগেই তার চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এল। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়্‌ল সে।

স্বপ্নে দেখল—তার চুল পশমের মত নরম আর কালো কুচকুচে রংএর হয়ে গেছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে ! এত সুন্দর চেহারা ! হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল দু'ঘণ্টা ছেড়ে কখন চার-পাঁচ ঘণ্টা হয়ে গেছে। লাফিয়ে উঠ্‌ল সে—ছুটে গেল আয়নার কাছে। কিন্তু আয়নার দিকে তাকিয়ে তার চোখ কপালে উঠে গেল—তার মনে হ'ল সমস্ত পৃথিবী যেন টল্‌ছে। একবার, দু'বার, তিনবার সে তাকাল আয়নার দিকে—চোখ রগড়ে নিয়ে তাকাল, কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন নেই। তার চুল নরম হওয়া ত দূরে থাক যেন আরও শক্ত, আরও খাড়া হয়ে গেছে, আর সব চেয়ে সাংঘাতিক যে চুলের রং কালো না হয়ে হয়েছে একেবারে ঘোর সবুজ। কি কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হয়েছে তার ! সে ছোট ছেলের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌ল, পাগলের মত নিজের চুল ছিঁড়তে লাগ্‌ল, শেষে বিছানায় পড়ে মহা যন্ত্রণায় মানুষ যেমন ছট্‌ফট্‌ করে তেমনি ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। এম্‌নি কর্‌তে কর্‌তে কখন সে আবার ঘুমিয়ে পড়্‌ল। ঘুম ভাঙ্গল যখন তখন বেলা প্রায় আটটা। লীলা এসে দরজায় ঘা দিচ্ছে—হাতে তার চা, ডিম, রুটী। কাল থেকে লীলার মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে। তার কথাতেই তো তার দাদা রাগ করে সারা দিন না খেয়ে আছে। অনুশোচনায় বুকটা তার ফেটে যাচ্ছে। আজ সে ঠিক করেছে যে দাদার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে—কক্ষণও সে ওরকম কথা বল্‌বে না।

কিন্তু বিনয় তো দরজা খোলে না—কিছুতেই খোলে না। লীলা নিরুপায় হয়ে জানালার খড়খড়ি খুলে দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। লজ্জায়, রাগে বিনয় দরজা খুল্‌ছিল না। জানালার শব্দ শুনে সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে

রুমাল বার করে মাথায় বেঁধে ফেল্‌লে—যদিও রুমালে তার সমস্ত মাথা মোটেই ঢাক্‌ল না। তারপরে সে এমন ভান করে পরে রইল যেন কতই ঘুমুচ্ছে।

লীলা কিন্তু জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে যা দেখ্‌ল তাতেই তার চক্ষুস্থির। সারাদিন না খেয়ে, রৌদ্রে ঘুরে, রাতে ভাল না ঘুমিয়ে বিনয়ের মুখের চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে, চোখ-মুখ গেছে বসে, চোখের কোলে কালী পড়ে গেছে। তার উপর তার গায়ে রয়েছে জামা, পায়ের জুতোটা পর্য্যন্ত সে কাল উত্তেজনার মাথায় খোলে নি। মাথায় রুমাল বাঁধা, আশ-পাশ দিয়ে চুলগুলো বার হয়ে পড়েছে—সে পড়ে আছে যেন মড়ার মত। মাথার গোড়ায় একটা শিশির মধ্যে সবুজ মত কি রয়েছে, অৰ্দ্ধেক শিশি খালি। দেখেই লীলা চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল—"ওগো দাদা গো, তুমি এ কি কর্‌লে ! কেন এ কাজ কর্‌লে ?"

তার কান্না শুনে বাবা, মা সকলে ছুটে এলেন। লীলাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি হয়েছে কি ? কাঁদছিস্‌ কেন ?"

লীলা ডুকরে কেঁদে উঠ্‌ল, "মাগো, দাদা বিষ খেয়েছে কাল রাতে, ঐ দেখ—"

জানালার ফাঁক দিয়ে সবাই দেখ্‌লেন, সকলেরই ভয় হ'ল ভীষণ। সকলে মিলে দরজা ভেঙ্গে ফেললেন। দরজা ভেঙ্গে সবাই ঢুকতেই বিনয় তখন মহাভয়ে এবং লজ্জায় উঠে বস্‌ল।

তার চেহারা এবার সবাই বেশ ভাল করে দেখে অবাক্‌ হয়ে গেল। চুলের অবস্থা দেখে আরও অবাক্‌ হ'ল।

তার বাবা বল্লেন, "ব্যাপার কি, সব খুলে বল্‌।" তখন বিনয় সব কথা খুলে বল্‌তে লাগ্‌ল।

এদিকে লীলা ততক্ষণ শিশিটা নাড়াচাড়া কর্‌ছিল, সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল "বাঃ, এ কি চুলের ওষুধ নাকি ! এতে যে লেখা রয়েছে—গ্রীণ্‌ পেণ্ট্‌ ফর হাই ক্লাস্‌ মেটিরিয়ালস্‌—"

শুনেই তো বিনয়ের মাথা গেল ঘুরে। তবে, তবে কি সে তেলের শিশি নিয়ে আসে নি ? তার মনে হ'ল, তাই তো দোকানে টেবিলের উপর আর

একটা শিশিও ছিল তো! সে ভুল করে তেলের শিশির বদলে পেণ্টের শিশি নিয়ে এসেছে? সে সকলের সামনেই এবার কেঁদে ফেল্‌লে। অন্য সকলে কেবল হাস্‌তে লাগ্‌ল। কেবল বিনয়ের মা তাঁর একমাত্র ছেলের এই অবস্থা দেখে মহা দুঃখিত হয়ে বল্‌লেন, "তাই বল, তেল ব্যবহার কর্‌লে নিশ্চয় চুল ভাল হয়ে যেত—যখন তা'রা লিখেছে বিজ্ঞাপনে!" তাঁর বোনের ছেলেকে বল্‌লেন "যা তো বাবা সমর, একশিশি ঐ তেল কিনে আন্‌ তো ঐ দোকান থেকে—"

এবার বিনয়ের বাবা ভীষণ রেগে উঠলেন, বল্‌লেন, "না, না আর যেতে

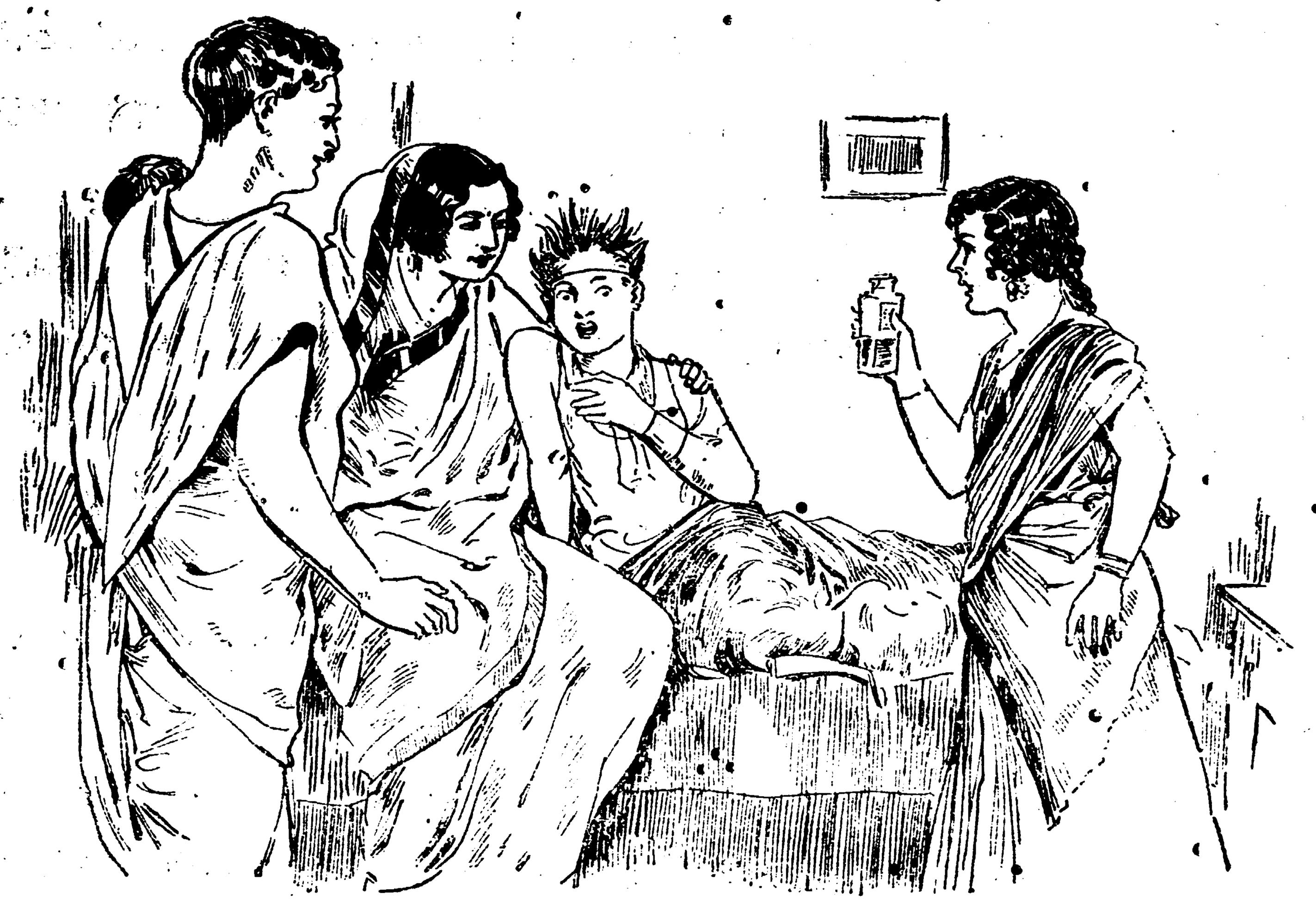

একি চুলের ওষুধ নাকি?

হ'বে না। তুমিও কি ঐ বাঁদরটার মত ক্ষেপলে নাকি? বিজ্ঞাপনে কি না লেখা থাকে? একটা ওষুধে থাইসিস্‌ থেকে আঙ্গুল-হারা পর্য্যন্ত সারে। একটা তেলে মাথার অসুখ সারে, টাকে চুল গজায়, সাদা চুল কালো হয়ে যায়, শক্ত চুল নরম হয়, সব। বিজ্ঞাপনের জোরে সব হয়। অত বড় ধেড়ে ছেলে, আজ বাদে কাল কলেজে পড়তে চলেছে, ওর এ জ্ঞানটুকুও নেই? গাধা কোথাকার!" বিনয় কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল, "আমার চোখের সামনে যে আর এক ভদ্রলোক দু' শিশি

ঐ তেল কিনে নিয়ে গেলেন। তিনি বল্লেন যে তাঁর চুল দু' ঘণ্টার মধ্যে কালো আর নরম হয়ে গেছে।"

তার বাবা আরও রেগে উঠে বল্লেন, "গাধা বলছি তোকে সাধ করে? হতভাগা! এটা তোর মনে হ'ল না যে ও লোকটা ওদের নিজের লোক হ'তে পারে? নইলে ঠিক যে সময় তুই ঐ তেলটা কিন্‌তে গেলি সেই সময়েই আর একজন লোক ঠিক ঐ তেলটাই কিন্‌তে এল? আর ঐ তেল মেখে দু' ঘণ্টার মধ্যে তার চুল একেবারে পশম হয়ে গেল? গাধা, তোর একটু সন্দেহ হ'ল না? তেলের বদলে পেণ্ট্‌ লাগিয়ে বিশেষ কিছু খারাপ হয় নি, ঐ তেলে হয়ত আরও অবস্থা খারাপ হ'ত। বিনয়ের মাকে বল্‌লেন,—"সাবান দিয়ে মাথাটা ধুইয়ে দাও।"

সাবান দিয়ে মাথা ধুইয়েও সবুজ রং উঠ্‌ল না। ওর বাবা বল্লেন, "থাক্‌, ঐ রকম করে যত দিন না রং ওঠে। ওর ঠিক শাস্তি হয়েছে। ঐ রং ওর মুখেও খানিক মাখিয়ে দাও।"

অনেক দিন পর্য্যন্ত সে সবুজ রং রইল। শেষ কালে বিনয়ের মাথার সমস্ত চুল কেটে ফেলে ন্যাড়া কর্‌তে হ'ল।

লীলাটা কিন্তু সমানে বল্‌ত, "দাদা, তুমি কিন্তু কারো কথা শুন না। এবার চুল উঠ্‌লেই 'দুর্দ্দান্ত-কেশবিমর্দ্দিনী' তেল'টা মেখ, দু' ঘণ্টার মধ্যে তোমার চুল পশমের মত নরম আর মিশমিশে কালো হয়ে যাবে।"

বিনয় রাগে লীলার কথার কোন উত্তর দিত না। বিনয় ঠিক করেছে সারা জীবন সে ন্যাড়া হয়েই থাক্‌বে তবু মাথায় আর চুল গজাতে দেবে না।

একটী ছেলে তার বাপ-মায়ের সঙ্গে জাহাজে করে কোনও এক জায়গায় যাচ্ছিল। রাস্তায় খুব ঝড় উঠায় সে ওই জাহাজের এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করল—"ভাই, এখান থেকে ডাঙ্গা কতদূর?"

নাবিক বল্লে—"দেড় মাইল।"

ছেলে—"কোন্‌ দিকে?"

নাবিক—"একেবারে নীচের দিকে।" (শ্রীরমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)

সোনার হরিণ

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

পূর্ব্বকথা :—শ্রীপুর চিনির কলের মালিক এবং প্রসিদ্ধ ধনী দ্বারকানাথ বসুর সেক্রেটারী অহিভূষণ চৌধুরী এক দিন রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। নিরুদ্দেশ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সে যে দ্বারিক বাবুর বাড়ীতেই ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। খোঁজাখুঁজির ফলে আবর্জ্জনার স্তূপে একখানা চিঠি মিলিল; তাহাতে কোন অজ্ঞাত লোক অহিভূষণকে শাসাইয়াছে যে কোন একটা "নির্দ্দিষ্ট কাজ" সমাধা না করিতে পারিলে তাহার পরিণাম বড়ই ভীষণ হইবে। দ্বারিক বাবুর একটী বহুমূল্য সোনার হরিণ তাঁর এটর্ণীর জিম্মায় ছিল, অল্প পরেই জানা গেল একখানা মিথ্যা চিঠি দেখাইয়া অহিভূষণ সেইটি লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে চিঠিখানা মিথ্যা হইলেও তাহাতে দ্বারকানাথের যে স্বাক্ষর ছিল, সেটি জাল নয়। প্রসিদ্ধ জাপানী ডিটেক্‌টিভ্ হুকা-কাশির উপর ব্যাপারটির কিনারা করার ভার পড়িল। তাঁহার সাহায্যকারী হইতেছে বলিষ্ঠ যুবক রণজিৎ। দ্বারিক বাবুর ছেলেপেলে নাই; দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন আট-দশ বছর ধরিয়া আমেরিকায়, ছোট জনের নাম সলিল। সলিলের ব্যবহারে কাহারো কাহারো নানারূপ সন্দেহ হইতেছে—বিশেষতঃ সন্তোষের; সন্তোষ দ্বারকানাথের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, চিনির কলে কাজ করে।

ধনপৎ কাজেরিয়া নামে কাশীর এক গুণ্ডা কি করিয়া ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া কলিকাতায় কয়েকজন 'চেলা' পাঠাইয়া দেয়। যে দলের নিকট সোনার হরিণ ছিল তাহাদের নিকট হইতে সেই চেলার দল উহা কাড়িয়া লয়; কিন্তু কতগুলি অলৌকিক ব্যাপার ঘটায় উহারা বিশেষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। এদিকে হুকা-কাশির নিকট হইতে একখানা রহস্যময় ফটো পাইয়া রণজিৎ দলের একজনকে ট্রেনে চড়িয়া অনুসরণ করিতে থাকে। তাহার কামরায় একজন অপরিচিত যুবক ছিল; রাত্রে রণজিৎ একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগিয়া দেখে ফটো এবং যুবক দুই-ই অদৃশ্য।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(১৩)

হুকা-কাশির ভ্রূ দুইবার কুঞ্চিত হইল।

প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া লইতে রণজিতের কিছু সময় লাগিল, তার পরেই সে একেবারে ধড়্‌মড়াইয়া উঠিয়া বসিল। এ অবস্থায় সাধারণ লোক যে কাজটিকে প্রথমেই অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, অভিভূত সে তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। সহযাত্রী সুদর্শন যুবকটিই যে ফটোখানা সরাইয়াছে এ ধারণা মনে তার এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে পাশের কামরার সেই দুষমণ চেহারার লোকটা গাড়ীতেই আছে কিনা সেটা লক্ষ্য করার প্রয়োজনও সে এতক্ষণ বোধ করে নাই। কিন্তু সে অনুসন্ধান লওয়া যে প্রয়োজন, এইবার তাঁহার মনে হইল; তাড়াতাড়ি দেওয়ালের জানালাটিতে চোখ রাখিয়া দেখে, যুবকটির মত সেও নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে। দুইজনে যে একযোগে কাজ সারিয়াছে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র

সন্দেহ নাই। সে একবার ভাবিল, শিকল টানিয়া গাড়ী খানাকে দাঁড় করায় কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল তাহাতে লাভ হইবে না কিছুই উপরন্তু খানিকটা ক্ষতিরই সম্ভাবনা, কেননা ব্যাপারটি তাহা হইলে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে; কিন্তু রাষ্ট্র হইতে দেওয়া হুকা-কাশির বোধ হয় মনঃপূত হইবে না। বাহিরে তখন নিশাদেবীর পূর্ণ রাজত্ব চলিতেছে, গাঢ় অন্ধকার হানা পাতিয়া বসিয়া আছে। সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে কিছুই আর করার নাই, তাই রণজিৎ ভোরের প্রতীক্ষায় বেঞ্চির উপর ঠেসান দিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

অন্ধকারের ঘোর ক্রমেই কাটিয়া আসিল এবং কিছুক্ষণ পরেই আবীরের রংএ দিগ্বিদিক্ রাঙাইয়া ভোরের আলো রণজিতের মুখে চোখে স্নেহ-স্পর্শ বুলাইয়া দিল। তাহার মনে হইল দূর হইতে বহু লোকের একটা ব্যস্ততাপূর্ণ কোলাহল যেন বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। মুখ বাড়াইয়া সে দেখে, তাহাদের ট্রেন একটা বিরাট্ ষ্টেশনের আঙিনায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে। ষ্টেশনটা কি হইতে পারে ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লেখাগুলি জানাইয়া দিল যে গাড়ী মোগলসরাই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চিন্তাকুল মুখে ট্রেন হইতে নামিয়া রণজিৎ ধীরে ধীরে রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, উদ্দেশ্য এক কাপ চা খাইয়া মস্তিষ্কটাকে একটু সবল এবং সজীব করিয়া তুলিবে। কয়েক পা আগাইয়াই কিন্তু হঠাৎ সে এমনই ভাবে থামিয়া পড়িল যে মনে হইল কেহ যেন তাহাকে স্ক্রু দিয়া মাটির সঙ্গে আঁটিয়া দিল। সে নির্ণিমেষে সাম্‌নের দিকে তাকাইয়া রহিল; নিজের চক্ষুকেও সে যেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এও কি সম্ভব? রণজিৎ এ গাড়ীতে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ জানিয়াও কোন্ ভরসায় প্রকাশ্য দিবালোকে এ লোকটি প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইল! মাথায় বিশাল পাগড়ী, মোটা একখানি উড়ুনি চিবুক ঢাকিয়া গলার চারিপাশে কয়েকটা পাক খাইয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রণজিতের বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, যে লোকটার অনুসরণে কলিকাতা হইতে প্রায় পাঁচশো মাইল সে ছুটিয়া আসিয়াছে, ব্যাণ্ডেল জংসনে যে ব্যক্তি জলের কুঁজা ভর্ত্তি করিয়াছিল, এ সেই। রিফ্রেস্-রুমটি ছিল অতি নিকটেই, চট্ করিয়া সরিয়া আসিয়া রণজিৎ তাহারই একখানা কপাটের আড়ালে দাঁড়াইল।

লোকটা একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে অপরে না শুনিতে পায় এমনি খাটো গলায় কথা কহিতেছিল। হিন্দুস্থানীটির চোখে মুখে একটু অস্বস্তির ভাব, সে কহিল, "তুই এক্‌লা আইসে পড়্‌লি, রামদোয়াল আর সকুলে কুথা গেলো?"

"সব ঠিক আছে সর্দ্দারজি, দু'চার দিনের ভেতরে সকলেই আলাদা আলাদা রাস্তায় এসে তোমার আড্ডায় জমা হবে; একসঙ্গে আস্‌বার কি জো আছে—পেছনে ফেউ লেগেছিল যে!"

রুদ্ধকণ্ঠে 'সর্দ্দারজি' কহিল "তারপর ?"

রামদয়াল চোখ দু'টিকে একটু মিটি-মিটি করিয়া অর্থ-পূর্ণ এক হাসি হাসিল; রতনে রতন চেনে, সর্দ্দার সে হাসির অর্থ বুঝিয়া মনে মনে নিশ্চিন্ত হইল, বলিল, "তুই খুব হুঁসিয়ার আদ্‌মি আছিস্ রামদোয়াল।" তার পর বার কতক এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া আরও নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল সোনেবালা হরিণ? সেটা কুথায় রাইখেছিস্ ?

আর সকুলে কুথা গেল ?

"ঘাবড়িও নাসর্দ্দার, সব ঠিক্ আছে; এত-দিন নামেই ছিলে শুধু 'ধনপৎ' এবার কাজেও হবে ধনপৎ। কিন্তু আর নয়, এবার একটু আড়ালে যাও; আমরা সব স্বনাম-ধন্য পুরুষ কিনা এখানে এক সঙ্গে দু'জনাকে গুল্‌তানি পাকাতে দেখ্‌লে পুলিশের দৃষ্টি পড়বার ভয় আছে। আর একটা কথা—এ গাড়ীখানায় কাশী ফিরো না যেন; পরের কোন একটা ট্রেন ধরবে, আর বেনারস্ ক্যান্টন্‌মেণ্টে না নেমে রাজা-ঘাটেই নেমে পড়বে।"

প্ল্যাটফর্ম্মের অপর পারে আর একখানা ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল, মুটের মাথায় মালপত্র চাপাইয়া রামদয়াল গজেন্দ্রগমনে তাহাতেই গিয়া চাপিয়া বসিল। ধনপতের সহিত এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার কি কথা হইয়াছে রণজিৎ অবশ্য তাহা শুনিতে পায় নাই, কিন্তু লোকটির গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছে সে বরাবর। এইবার তাহাকে গাড়ী বদল করিতে দেখিয়া, সে খোঁজ লইয়া জানিল ওটি বেনারস্ লাইনের ট্রেন। তাহাকেও এই ট্রেনেরই যাত্রী হইতে

হইবে; তবে ট্রেনটি ছাড়িবার তখনও বেশ কিছু দেরী আছে, ইত্যবসরে কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া লওয়া চলে। রিফ্রেস্‌মেণ্ট্ রুমের ভিতরে ঢুকিয়া সে তখন এক বাটি চা, কিছু কেক্ ও ডিমের ফরমাস করিল।

রণজিতের কাশী-যাত্রা দেখিয়া আমরা একবার হুকা-কাশির খবর লইয়া আসি।

হুকা-কাশি সুরষমল নগরচাঁদ লেনের বাড়ীখানার উপর রণজিৎকে কেবল দৃষ্টি রাখিতেই বলিয়াছিলেন; ওবাড়ীর লোক কয়টি যে সে দিনই বাসা ভাঙ্গিয়া পালাইবে এবং তাহাদের অনুসরণে রণজিৎ যে কাশী পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিবে, তাহা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। সেই দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যখন রণজিৎ ফিরিয়া আসিল না অথবা তাঁহাকে কোন সংবাদ পাঠাইল না তখন তিনি বাস্তবিকই একটু ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে পরের দিনটাও কাটিয়া গেল, তথাপি রণজিতের কোন সংবাদ নাই। হুকা-কাশি এইবার রীতিমত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পর দিন প্রত্যুষেই তিনি বেহারা অমৃতকে রণজিতের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন; ঘণ্টাখানেক বাদেই সে ফিরিয়া আসিল—বাড়ীর কেহই রণজিতের খবর বলিতে পারে না—দু'দিন আগে সকালে সে চা খাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, তার পর হইতেই সে নিরুদ্দেশ। বিষম উৎকণ্ঠার সহিত হুকা-কাশি সময় কাটাইতে লাগিলেন, ডাক আসিবার সময় হইতেই প্রতিবার সোৎসুক ভাবে খোঁজ লইতে লাগিলেন, রণজিৎ কোন খবর পাঠাইয়াছে কিনা, কিন্তু প্রতিবারই তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। তিনি প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন এমন সময় অমৃত কাগজে-মোড়া একটা প্যাকেট আনিয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির করিল—এই মাত্র ডাক-পিওন নাকি সেটি বিলি করিয়া গিয়াছে। প্যাকেটটার ভিতরে কি আছে এবং কোথা হইতেই বা সেখানা আসিয়াছে উপর হইতে হুকা-কাশি সে সমস্ত কিছুই ঠাহর করিতে পারিলেন না; ঠিকানায় কেবল লেখা আছে, "মিঃ হুকা-কাশি, ডাফ্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা"। একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ সাবধানের সহিত ধীরে ধীরে মোড়কটা তিনি খুলিতে লাগিলেন; সাবধানতার প্রয়োজন ছিল যথেষ্টই, কেননা তাঁহার মত লোক—সমাজের শত্রুগুলাকে অন্ধকার গর্ত্ত হইতে নির্ম্মম হাতে টানিয়া বাহির করাই যাঁহাদের জীবনের কাজ, তাঁহাদের শত্রুর অভাব নাই। আমেরিকায় বিষাক্ত সাপ পার্শেল করিয়া কখনো কখনো শত্রুর কাছে পাঠান হয় এমন কথাও তো তিনি খবরের কাগজে পড়িয়াছেন। ভাগ্যিস্ এদেশ এখনও আমেরিকা হইয়া ওঠে নাই, তবুও প্রচলিত প্রবাদটা বড়ই ভালো—'সাবধানের বিনাশ নাই'।

মোড়ক খুলিয়াই কিন্তু হুকা-কাশি আতঙ্কে একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। বিষধর বাহির হইল না বটে, কিন্তু যে জিনিষটি বাহির হইল তাহাতে তিনি একেবারে 'থ' হইয়া গেলেন।

রণজিৎ কাজে বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং তাহাকে যে ফটোখানা দিয়াছিলেন সেখানাই মোড়কে পূরিয়া কোন অজ্ঞাত লোক তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছে। রণজিৎ যে পাঠায় নাই তাহা সুনিশ্চিত; কেননা, প্রথমতঃ তাহার পাঠাইবার কোনই হেতু নাই, আর দ্বিতীয়তঃ তাহা হইলে ফটোর সঙ্গে একখানা চিঠিও থাকিত অবশ্যই। নাম-ধাম গোপন রাখিয়া এ ভাবে ফটো পাঠানোর উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট—হুকা-কাশিকে একটু ব্যঙ্গ করা। একখানা ফটোর উপর নির্ভর করিয়া রণজিৎ কাজে নামিয়াছে; যে দলের বিরুদ্ধে নামিয়াছে তাহারা যে হুকা-কাশির চেয়েও বেশী ধড়িবাজ তাহা বুঝাইবার জন্যই এ ভাবে ফটো পাঠানো। হুকা-কাশির মত হুঁসিয়ার লোক যে এ ফটো হারাইয়া গেলে কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া আগে হইতেই সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন তা তাহারা জানে এবং জানে বলিয়াই এ ভাবে ফটো পাঠাইতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে নাই। এ ভীষণপ্রকৃতির সুচতুর লোকগুলির হাতে পড়িয়া রণজিতের কি যে দশা হইবে ভাবিতেই হুকা-কাশি শিহরিয়া উঠিলেন; ডিমের খোলসের মত তাহারা যে তাহাকে পিষিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিবে! পোষ্ট-অফিসের সীলমোহরটা তিনি তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলার চেষ্টা করিলেন, মোড়কখানাকে নানান্ ভাবে ঘুরাইয়া অবশেষে বুঝিলেন, মধুপুরে সেখানাকে ডাকে দেওয়া হইয়াছিল। ঘড়ির দিকে একবার তাকাইয়াই উচ্চকণ্ঠে তিনি হাঁকিলেন, "অমৃত।"

অমৃত সাড়া দিয়া নিকটে আসিল, হুকা-কাশি বলিলেন, "আমার সুট্‌কেশ গুছিয়ে ফেল, ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই আমি হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হয়ে পড়ছি।"

যথা সময়ে হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া মধুপুরগামী গাড়ীতে তিনি চাপিয়া বসিলেন; গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় একটী লোক প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতিরিক্ত ব্যস্ততার সহিত একটা সেকেণ্ড ক্লাস্ কামরায় উঠিয়া পড়িল। হুকা-কাশি ঘাড় বাড়াইয়া দেখিলেন লোকটি সলিল। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ঘণ্টা পাঁচেক পরে মধুপুর-জংসনে গাড়ী আসিয়া থামিতেই হুকা-কাশি লক্ষ্য করিলেন, সলিল বিশেষ ব্যস্ততার সহিত তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিতেছে। (ক্রমশঃ)

১৩৪২ সালের রামধনু-পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

কবিতার জন্য পুরস্কার পাইলেন শ্রীপিনাকীশঙ্কর সেন (গ্রাঃ নং ১৭০, ফরিদপুর); গল্পের জন্য—শ্রীযমুনাবিহারী মিত্র (গ্রাঃ নং ১৭১৪ বড়রা, বীরভূম) ও কুমারী রুবি চাটার্জ্জি (গ্রাঃ নং ১৭৩৬, ভাগলপুর)। এই দুইজনকে ভাগাভাগি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহারা

ফটো পাঠাইলে আগামী সংখ্যা রামধনুতে ইহাদের ছবি প্রকাশ করা হইবে। রচনাগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কবিতাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও সর্ত্তানুযায়ী না হওয়ায় তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া গেল না। শ্রীঅশোক চাটার্জ্জির কবিতা, কুমারী সুজাতা গুপ্ত, কুমারী চিণ্ময়ী দাস ও সুজনকুমার দাস ও শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের লেখাগুলি পরীক্ষককর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে।

ভাবীসাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা (আগামী মাস হইতে এই বিভাগ আরও বাড়ান হইবে)

স্বপ্ন

লেখক শ্রীযমুনাবিহারী মিত্র (প্রতিযোগিতার অন্যতর শ্রেষ্ঠ গল্প)

আশ্বিনের 'রামধনু' বাড়ীতে আসবামাত্র কাড়াকাড়ির ধূম পড়ে গেল। দাদা সেটা কোনরকমে হস্তগত করে একলাফে নিজের ঘরে গিয়ে কপাট বন্ধ ক'রে পড়্‌তে সুরু ক'রে দিল। খুকু কত ধাক্কা দিলে, কত অনুনয়-বিনয় কর্‌লে, কত কাঁদলে, কিন্তু দাদা তখন স্বেন্ হেডিনের সঙ্গে মধ্য-এসিয়ার মরুভূমির মধ্যে জলের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন কি আর উঠে দরজা খোলা যায়? খুকু বেচারা আর কি করে, দরজায় ঠেশ্ দিয়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে সেখানে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

হঠাৎ খুকু চেয়ে দেখে সে এক অচিন্ জায়গায় এসে পড়েছে। সেখানের মাটী সবুজ মখমলের মত ঘাসে ঢাকা আর চারিদিকে কেবল ফুটন্ত ফুলের ছড়াছড়ি। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রামধনু তার সাতটা রং মেখে সূর্য্যের আলোয় ঝক্‌মক্ কর্‌ছে। খুকু অবাক্ হ'য়ে এসব দেখতে লাগ্‌ল। সাম্‌নে পায়ের কাছে একটা অসম্ভব রকম বড় ব্যাঙের ছাতা দেখে খুকু তাতে হেলান দিয়ে বস্‌ল; তার পর আকাশে যে চারটে বকের মত সাদা পাখী মনের সুখে উড়ে বেড়াচ্ছিল তাদের দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কতক্ষণ যে তাদের দিকে তন্ময় হ'য়ে দেখ্‌ছিল তার ঠিক নেই, হঠাৎ একটা সড়সড় আওয়াজ শুনে, সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে খুকু দেখে যে কোত্থেকে একটা গঙ্গাফড়িং লাফাতে লাফাতে ঠিক তার সাম্‌নে একটা পাতায় এসে বস্‌ল।

খানিকক্ষণ এদিক্-ওদিক্ চেয়ে গঙ্গাফড়িং খুকুর দিকে তাকিয়ে কট্ কট্ ক'রে গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞেস্ করল "কাঁদছিলে কেন ?"

খুকু ত অবাক্! গঙ্গাফড়িং আবার কথা বলে নাকি ? এ কি রকম আজব দেশরে বাপু! সে হাঁ ক'রে ফড়িংটাকে বেশ ভাল ক'রে দেখছিল। এতে কিন্তু ফড়িং মহাশয় গেলেন চটে, বল্লেন, "হাঁ করে দেখছ কি ? কথা বল্‌তে পার না ? বোবা নাকি ?"

সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিক্ থেকে কে টিট্‌কারী দিয়ে হেসে উঠল। খুকু চম্‌কে পেছন ফিরে দেখে একটা গোলাপ ফুল গোল গোল চোখ ক'রে তার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে। খুকু একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেল। গোলাপ ফুল মানুষের মত হাস্‌ছে !

এদিকে ফড়িং মহাশয় কোনও জবাব না পেয়ে ক্রমশঃ চটেই চলেছেন। তিনি একবার পাখা দুটীকে আচ্ছা ক'রে ঝেড়ে নিলেন। সেই শব্দে খুকু ফের সাম্‌নের দিকে ফিরে তাকাল। তার পর ফড়িংএর কথা মনে পড়তে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কাঁদ কাঁদ সুরে বল্লে "দাদা আমাকে রামধনু পড়তে দেয় নি, তাই।" বল্‌তে বল্‌তে সে প্রায় কেঁদেই ফেল্লে।

কিন্তু তাকে কাঁদবার অবসর না দিয়ে সাম্‌নের ঝুঁকে-পড়া ফুলটা গম্ভীরস্বরে বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালে বল্লে, "হুঁ, তাই নাকি—।" সে আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু ফড়িং মহাশয় এমন লালচোখে তার দিকে তাকালেন যে বেচারা একেবারে মুষ্‌ড়ে গেল। খুকুর একটু কষ্ট হ'ল, আহা! অমন সুন্দর ফুলটা !

এদিকে ফড়িং মহাশয় আবার হেঁড়ে গলায় বল্লেন, "তবে ত তোমার দাদা ভারী দুষ্টু ? তুমি আর ঘরে যেওনা, এইখানে আমাদের সঙ্গে থাক। এমন সুন্দর দেশ কখনও দেখেছ ? তুমি আমাদের সঙ্গে রামধনুর সাতটা রঙের মধ্যে লুকোচুরি খেল্‌বে আর ক্ষিদে লাগলে খাবে ফুলের তাজা মধু। কি বল !"

খুকুর যদিও খুব ইচ্ছে হচ্ছিল একবার রামধনুর ভেতরটা দেখে আস্‌তে, এমন কি সে বল্‌তেও যাচ্ছিল, 'হ্যাঁ তোমাদের সঙ্গে থাক্‌ব', কিন্তু হঠাৎ তার মার ও খোকনমণির কথা মনে পড়ে গেল। তাদের ছেড়ে সে কোথাও থাক্‌তে পার্‌বে না। তাদের কথা মনে পড়তেই তার চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠল ও ঠোঁট ফুলে উঠল।

তাই দেখে তার ডান পায়ের কাছের ফুলটা এত জোরে হেসে উঠল যে আকাশে যে চারটে পাখী উড়ছিল তাদের মধ্যে একটা সাঁ করে নীচে নেমে ব্যাপারটা কি দেখে গেল। খুকুর মনে হ'ল যেন যাবার সময় সেও একটু মুচকে হেসে গেল খুকুকে দেখে। খুকু বেচারা আর কি করে, এখানে কেউ তাকে সমবেদনা জানাবার নেই দেখে বাধ্য হয়েই সে ফ্রক দিয়ে চোখের জল মুছে ফেল্ল।

ফড়িং মহাশয় কিন্তু এদিকে রেগে টং। তিনি কেলে হাঁড়ির মত মুখ ক'রে বল্লেন "কি, কথা বল্‌ছ না যে, আমাদের দেশটা কি এতই খারাপ ?"

খুকু কি আর বল্‌বে, পাছে তার মনের কথা খুলে বল্লে ফড়িং আরও চটে যায় সেজন্যে সে চুপ করে রইল। হঠাৎ পাশ থেকে কে জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্ল। খুকু এদিকে ওদিকে চেয়ে কাউকেও দেখতে পেল না। ক্রমশঃ কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাসের মাত্রা বেড়েই চল্ল ও ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গে হুস্ হাস্, ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ ইত্যাদি শব্দ শোনা যেতে লাগল। খুকুর মনে হ'ল যেন কেউ একটা ভারী জিনিষ ঘাড়ে নিয়ে বইতে পারছে না, হাঁপিয়েই মর্‌ছে। ব্যাঙের ছাতাটাও মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগ্‌ল। খুকু কিছুই বুঝতে না পেরে ফড়িং মহাশয়ের দিকে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু ফড়িং মহাশয়ের এখন কোনদিকেই লক্ষ্য নেই। তাঁর রাগ এখন সর্ব্বোচ্চ স্তরে। খুকুর খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল যে তাকে জিজ্ঞেস করে যে কোত্থেকে হাঁপানির আওয়াজ আস্‌ছে; কিন্তু তার গোল চোখ ও ঘন ঘন পা ও ডানা নাড়া দেখে তার আর ভরসা হ'ল না।

এদিকে হাঁপানির ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ ভীষণ ভাবে বেড়ে চল্ল ও ব্যাঙের ছাতাটাও বেশ জোরে জোরে কাঁপতে লাগল। কি রকম সন্দেহ হওয়ায় খুকু ব্যাঙের ছাতাটার দিকে চেয়ে দেখে যে বেচারার অবস্থা শোচনীয়। এতক্ষণ খুকুর ভর স'য়ে সে একদম গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠেছে, তার মুখ দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ও চোখ কপালে উঠে গেছে। তার অবস্থা দেখে খুকুর ভারী দয়া হ'ল। সে যেমনি স'রে বস্‌তে যাবে অমনি ব্যাঙের ছাতাটার পিছন দিক্‌টা ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে খুকুও পেছনে উল্টে পড়ে গেল।

চম্‌কে উঠে খুকুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চেয়ে দেখে যে দাদা দরজা খুলে দিয়েছে ও সে তাতে ঠেসান দিয়ে ছিল বলে পিছনের মেঝেতে উল্টে পড়ে গেছে।

সন্দেশ

'রামধনু'র নতুন বছরে পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে একদল বাছাই-করা খেলোয়াড় ক্রিকেট খেলিতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন এবং বোম্বাইএ ভারতবর্ষের বাছাই করা দলের সঙ্গে প্রথম খেলায় তাঁরা ভারতবর্ষকে নয় উইকেটে পরাজিত করিয়াছেন সে খবর তোমাদের আগেই দিয়াছি। কিছু দিন হইল কলিকাতায় ইঁহাদের দ্বিতীয় খেলা হইয়া

গিয়াছে। এই খেলায়ও অষ্ট্রেলিয়ান্ দল ৮ উইকেটে জয়লাভ করিয়াছেন। ১ম ইনিংসে ভারতীয় দল সকলে মিলিয়া মাত্র ৪৮ রান্ করেন, অষ্ট্রেলিয়ান্ দলও করেন মাত্র ৯৯ রান্। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতীয় দল খুব বেশী রান্ তুলিতে পারেন নাই—সকলে মিলিয়া ১২৭ রান্ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান্ দল দুই উইকেটেই ভারতীয়দের রানের সংখ্যা ছাড়াইয়া যাওয়ায় ৪ দিনের বদলে ২ দিনেই খেলা শেষ হয়।

সম্প্রতি লাহোরে আবার তৃতীয় ম্যাচ্ হইয়া গেল। এবার ভারতীয়দের অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড় খেলিতে পারেন নাই। সি, কে, নাইডু, অমরনাথ, অমর সিং, মার্চ্চেণ্ট, লাল সিং প্রভৃতি অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। তা সত্বেও ভারতীয় দল এবার অষ্ট্রেলিয়ানদের হারাইয়া দিয়াছেন। এবার ভারতীয় দলের কাপটেন্ ছিলেন উজির আলি। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসএ ১৪৯ রান্ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংস্এ করেন ৩০১ রান্। অষ্ট্রেলিয়ানদের প্রথম ইনিংসএ হয় ১৬৬, ২য় ইনিংসএ ২১৬। ফলে ৬৮ রানে তাঁরা হারিয়া গিয়াছেন। এবার ভারতীয় দলে বাংলার এস্ ব্যানার্জ্জি খেলিয়াছিলেন; তিনি ২য় ইনিংসএ ৭০ রান্ করেন। এ পর্য্যন্ত আর কোনও বাঙ্গালীর ভারতবর্ষের হইয়া ক্রিকেট টেষ্ট্ খেলার সৌভাগ্য হয় নাই। উজির আলিও ২য় ইনিংসএ ৯২ রান্ করিয়াছেন। ভারতীয় দলের এই জয়লাভে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হইতেছে।

ক্যাণ্টন্ সহরে নতুন নিয়ম হইয়াছে—যে সব লোক বিনা টিকেটে বাসে যাতায়াত করে পুলিশ তাদের ধরিয়া সহর হইতে দশ মাইল দূরে ছাড়িয়া দিয়া আসে। বেচারাদের শাস্তি-স্বরূপ ঐ দীর্ঘপথ হাঁটিয়া ফিরিতে হয়।

* * *

কোন কোন পিঁপড়ে তার নিজের ওজনের চেয়ে তিন হাজার গুণ বেশী ওজন বহিতে পারে।

* * *

ব্যালট্রম্প্ নামে এক ভদ্রলোক ত্রিশ বছরের চেষ্টায় একটা ভারী মজার ঘড়ি তৈরী করিয়াছেন। ঘড়িটাতে শুধু ঘণ্টা, মিনিটও সেকেণ্ডই দেখা যায় না সেই সঙ্গে মাস, বার, এমন কি পূর্ণিমা অমাবস্যাও ধরা পড়ে।

* * *

ভারতবর্ষের মধ্যে আসামে মৃত্যু-সংখ্যা সব চেয়ে কম, সব চেয়ে বেশী মধ্য প্রদেশে। বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী ব্রহ্মদেশে, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যাও সব চেয়ে ঐ দেশেই কম। লেখাপড়া জানা লোকও ব্রহ্মদেশেই সব চেয়ে বেশী। বিধবার সংখ্যা সব চেয়ে বেশী বাংলাদেশে।

* * *

বেশী উত্তাপ পাইলে সব কঠিন জিনিষই গলিয়া যায় তবে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষে কম-বেশী তাপের দরকার হয়। লোহা গলে ২৭৮৬ ডিগ্রী উত্তাপে। তামা গলে ১৯৯৬ ডিগ্রীতে, সোনা গলে ১৯৪৭ ডিগ্রীতে, সীসা গলে ৬১৭ ডিগ্রীতে, দস্তা গলে ৭৭৩ ডিগ্রীতে আর খাঁটী টিন গলে মাত্র ৪৪২ ডিগ্রীতে। এগুলি সবই অবশ্য কারেন হাইট্ ডিগ্রী।

ছোটদের চিত্রশালা

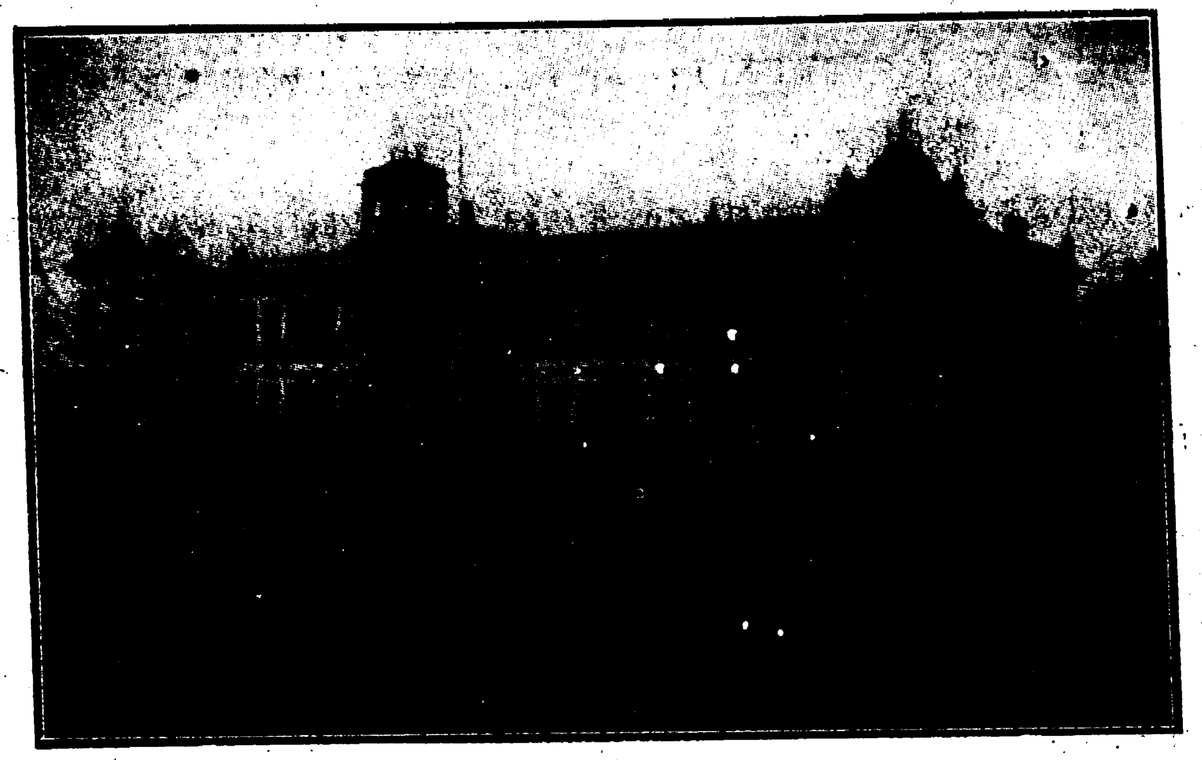

পাটনার যাদুঘর
(আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ পালিত)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মহাশয়,

গতকাল সন্ধ্যায় পিশামশাই পত্রে জানাইয়াছেন পরশু সকালে দরকারী কাগজপত্র ও অন্যান্য সবই পাঠান স্থির করিয়াছেন।

বিনীত
স্নেহময় চক্রবর্ত্তী

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

বেণ্টু, খেঁদু, আইকন্ প্রভৃতি (কলিকাতা); দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডস্থ কর্পোরেশন্ প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ (কলিকাতা); মুকুল, মীনা, কালিদাস খাঁ (শিলং)।

যাঁহাদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে—

রামপ্রসাদ, কাটু, বলাই (বেহালা); জ্যোতির্ম্ময় বসু (কলিকাতা); কৃষ্ণদাস ও

পাঁচুগোপাল ঘোষ (নওয়াপাড়া—শ্যামনগর) ; মিনি, কুটু, সীতেশ (মীরাট) ; রুবি চাটার্জ্জি, মঞ্জু ও ডলি (ভাগলপুর) ; ছায়া দেবী (রতনপুর) ; রবীন্দ্রনাথ দে (মধুবাণী—দ্বারভাঙ্গা) ; সুজনকুমার ও চিণ্ময়ী দাস (কলিকাতা) ; প্রশান্ত, প্রতাপ, শুভ্রা প্রভৃতি (সীতারামপুর) ; সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড) ।

নিম্নলিখিত গ্রাহকগণ অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়াছিলেন, ভুলক্রমে ইঁহাদের নাম প্রকাশিত হয় নাই—

যাঁহাদের ১টি ভুল হইয়াছিল—

নীলারাণী মুস্তফি (আরা) ; দিলীপকুমার রায় (কলিকাতা) ; রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর) ।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছিলেন—

বেন্দা ছাত্রসজ্ঘ (যশোহর) ; শচীন ও অবিনাশ বায়েন (ভীমেশ্বরীবাজার) ; ছবিরাণী রায় (নিউ দিল্লী) ।

নূতন ধাঁধা

নীচের অক্ষরগুলির জায়গায় ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই সংখ্যাগুলির এক-একটি বসাইতে হইবে। একটি বিশেষ অক্ষরের পরিবর্ত্তে একটি বিশেষ সংখ্যা বসাইতে হইবে। অর্থাৎ একবার 'ক' এর জায়গায় যে সংখ্যা বসান হইল প্রত্যেকবারই 'ক' এর স্থানে সেই সংখ্যা বসাইতে হইবে। সংখ্যাগুলি ঠিক মত বসাইয়া যোগ করিলে দেখা যাইবে পাশাপাশি ১ম লাইন, ২য় লাইন, ৩য় লাইন, চর্থ লাইন, ৫ম লাইন্ এবং উপর নীচে প্রথম লাইন (ক ড চ গ ক) ও শেষ লাইন-এর (ড ব ছ চ থ) যোগফল সমান হইতেছে।

ক + গ + ছ + ড

ড + থ + গ + ব

চ + ক + জ + ছ

গ + ড + জ + চ

ক + ত + ড + থ

পাঁচুগোপাল ঘোষ (নওয়াপাড়া—শ্যামনগর) ; মিনি, কুটু, সীতেশ (মীরাট) ; রুবি চাটার্জ্জি, মঞ্জু ও ডলি (ভাগলপুর) ; ছায়া দেবী (রতনপুর) ; রবীন্দ্রনাথ দে (মধুবাণী—দ্বারভাঙ্গা) ; সুজনকুমার ও চিণ্ময়ী দাস (কলিকাতা) ; প্রশান্ত, প্রতাপ, শুভ্রা প্রভৃতি (সীতারামপুর) ; সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড) ।

নিম্নলিখিত গ্রাহকগণ অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়াছিলেন, ভুলক্রমে ইঁহাদের নাম প্রকাশিত হয় নাই—

যাঁহাদের ১টি ভুল হইয়াছিল—

নীলারাণী মুস্তফি (আরা) ; দিলীপকুমার রায় (কলিকাতা) ; রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর) ।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছিলেন—

বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ (যশোহর) ; শচীন ও অবিনাশ বায়েন (ভীমেশ্বরীবাজার) ; ছবিরাণী রায় (নিউ দিল্লী) ।

নূতন ধাঁধা

নীচের অক্ষরগুলির জায়গায় ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই সংখ্যাগুলির এক-একটি বসাইতে হইবে। একটি বিশেষ অক্ষরের পরিবর্ত্তে একটি বিশেষ সংখ্যা বসাইতে হইবে। অর্থাৎ একবার 'ক' এর জায়গায় যে সংখ্যা বসান হইল প্রত্যেকবারই 'ক' এর স্থানে সেই সংখ্যা বসাইতে হইবে। সংখ্যাগুলি ঠিক মত বসাইয়া যোগ করিলে দেখা যাইবে পাশাপাশি ১ম লাইন, ২য় লাইন, ৩য় লাইন, চর্থ লাইন, ৫ম লাইন্ এবং উপর নীচে প্রথম লাইন (ক ড চ গ ক) ও শেষ লাইন-এর (ড ব ছ চ থ) যোগফল সমান হইতেছে।

ক + গ + ছ + ড
ড + থ + গ + ব
চ + ক + জ + ছ
গ + ড + জ + চ
ক + ত + ড + থ

পরলোকগত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ্

৯ম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪২ | ২য় সংখ্যা

ভ্রাতৃপ্রেম

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর্-এ-এস্)

মুক্ত করিতে সত্যে পিতায়
শান্ত স্নিগ্ধ আননে,
বাঁধিলা কুটির দশরথ-সুত
চিত্রকূটের কাননে।

কল কল রবে খেলিছে অদূরে
মন্দাকিনীর লহরী,
গাইছে কোকিল, নাচিছে ময়ূর
বিটপীর শাখে বিহরি।'

আজি এ বিজন কেনরে ধ্বনিত
গজবাজী-রথ চলনে ?
আসিছে কি কোন ধৃষ্ট অরাতি
ক্লিষ্ট কেশরী দলনে ?

উচ্চ তরুর শিখরে আরোহি'
লক্ষ্মণ রোষে নেহারি'
কহিলা 'আসিছে ভরত সদলে
গজবাজী-রথ তাহারি।'

পরলোকগত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ্

৯ম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪২ | ২য় সংখ্যা

ভ্রাতৃপ্রেম

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর্-এ-এস্)

মুক্ত করিতে সত্যে পিতায়
শান্ত স্নিগ্ধ আননে,
বাঁধিলা কুটির দশরথ-সুত
চিত্রকূটের কাননে।

'কল কল রবে খেলিছে অদূরে
মন্দাকিনীর লহরী,
গাইছে কোকিল, নাচিছে ময়ূর
বিটপীর শাখে বিহরি।'

আজি এ বিজন কেনরে ধ্বনিত
গজবাজী-রথ চলনে ?
আসিছে কি কোন ধৃষ্ট অরাতি
ক্লিষ্ট কেশরী দলনে ?

উচ্চ তরুর শিখরে আরোহি'
লক্ষ্মণ রোষে নেহারি'
কহিলা 'আসিছে ভরত সদলে
গজবাজী-রথ তাহারি।'

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

সম্বর ক্রোধ, ঊর্ম্মিলা-পতি,
এ নহে অরির সৈন্য,
আসিছে যে ভ্রাতা খিন্ন হৃদয়ে
ঘুচাতে ভ্রাতার দৈন্য !

পশ্চাতে রাখি বিপুল বাহিনী
নগ্ন, ত্বরিত চরণে
চীরবাস-ধারী কৈকেয়ীসুত
পশিলা শ্রীরামসদনে

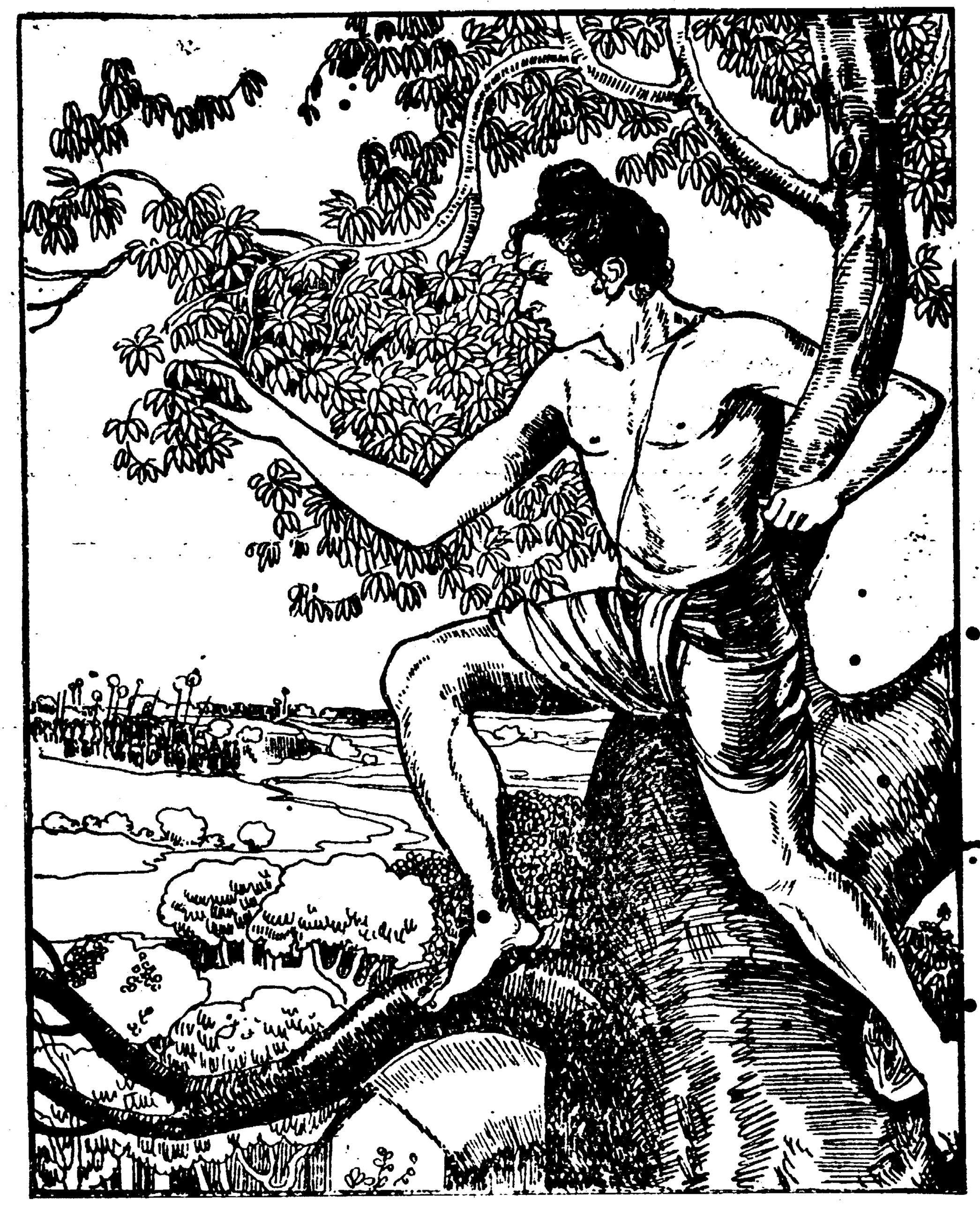

'আর্য্য' বলিতে অশ্রু আসিয়া
ভরিল অক্ষি-যুগলে,
নাহি পরশিতে রামের চরণ
পড়িলা ভরত ভূতলে।

পসারিয়া বাহু ধরিলা শ্রীরাম,
তুলিলা ভ্রাতায় বক্ষে,
গদগদ ভাষ, প্রণয়ের ধারা
উভয় ভ্রাতার চক্ষে।

হইলা রাঘব বিগতচেতন
মৃত্যু পিতার শ্রবণে,
পিণ্ড সঁপিলা করি তরপণ
মন্দাকিনীর জীবনে।

গলিত নয়নে কহিলা ভরত
'পারি না এ দুখ সহিতে,
কিঙ্কর সহ চল আজি দেব,
ধরণীর ভার বহিতে।

'যদি এ রাজ্য আমার, আর্য্য
সঁপিনু তোমার চরণে
চল ত্বরা করি, আজি যে কোশল
অনাথ পিতার মরণে।'

মধুর হাসিয়া কহিলা শ্রীরাম,
'এ নহে উচিত কর্ম্ম,
গিয়াছেন পিতা অক্ষয় লোকে
রক্ষিয়া নিজ ধর্ম্ম ;

'বদ্ধ এ দাস আদেশে তাঁহার
চৌদ্দ বরষ কাননে,
ফিরে যাও ভাই, পালহ কোশল
বিমাতায় পাল যতনে।'

রুদ্ধকণ্ঠে কহিল ভরত
'এ তব কেমন যুকতি ?
শাসিবারে সেই বিশাল কোশল
কোথা এ দাসের শকতি ?

'খগরাজ-তেজে কখনো নরেশ,
পারে কি বায়স শোভিতে ?
পারে কি ত্বরিত তুরগের গতি
গর্দ্দভ কভু লভিতে ?'

পরশি' সলিল কৈকেয়ীসুত
কহিলা বিমল আননে,
'তোমার বদলে চৌদ্দ বরষ
বঞ্চিব আমি কাননে।

'এই কুশাসন দাসের শয়ন
যদি না কোশলে ফিরিবে;
তোমার সমুখে কুটীরের দ্বারে
তোমার ভরত মরিবে।'

আশ্বাসি' তাঁয় স্নিগ্ধ ভাষায়
কৌশল্যাসুত কহিলা
'এই কি কারণে স্বর্গীয় নৃপ
সন্তাপ এত সহিলা ?

'হিমাচল যদি না রহে শীতল
সুধাকর শোভা বরজে,
সৈকত বেলা করি অতিক্রম
পয়োনিধি যদি গরজে,

'তবু রাঘবের প্রতিজ্ঞা ভাই,
জানিও অটুট রহিবে,
বনবাস-ক্লেশ চৌদ্দ বরষ
অকাতরে রাম সহিবে।

'জনকের সেই ধর্ম্ম্য আদেশ
অন্যথা কেন করিব ?
থাকিতে শকতি বনবাসে ভাই
অন্যেরে কেন প্রেরিব ?

'শত্রুঘ্ন তব সতত সহায়
বিরাজ নৃপতি-আসনে,
দণ্ডক-বনে লক্ষ্মণ-সনে
থাকি আমি পশুশাসনে।

'শিল্পিরচিত খচিত ছত্র
দিবে তোমা ছায়া নিয়ত,
প্রকৃতি-দেবীর বিটপী, লতিকা
আমার সেবায় নিরত।

'চারি ভাই মোরা দশরথসুত
তাঁহার বাক্য রাখিব
বিশ্ব-প্রথিত কীর্ত্তি তাঁহার
এছার অঙ্গে মাখিব।'

অশ্রু মুছিয়া কহিলা ভরত
'যদি না কোশলে ফিরিবে,
দাও দেব, তব পাদুকা-যুগল
এরাই রাজ্য শাসিবে

'কর দেব, এই স্বর্ণপাদুকা
পুণ্য চরণ-পরশে,
দেখি যেন অই দুর্ল্লভ পদ
বঞ্চি' চৌদ্দ বরষে।

'চৌদ্দ বরষ ধরি তব স্মৃতি
পাদুকা-যুগলে ভজিব,
যদি না আসিবে একাল-অন্তে
অনলে এ দেহ ত্যজিব।'

অর্পিলা রাম পদ পাদুকায়,
ভকতি-নমিত হস্তে
ধরি সে পাদুকা কৈকেয়ীসুত
মস্তকে নিলা ত্রস্তে—

* * *

করি অভিষেক বসালা যতনে
পাদুকায় রাজ-আসনে
ফলমূলভোজী ভরত রহিলা
চীরবাসে প্রজা-শাসনে

রঙ্গ-কণা

"আমি জানি, সতীশ বাবুর সঙ্গে আপনার অত্যধিক সাদৃশ্য আছে।"

"কিন্তু আশা করি তুমি সেই ১০৲ যা আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলে, সতীশ বাবুকে দিয়ে দাও নি।"

শ্রীরমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

১

নাম তার সত্যি-সত্যি রামচন্দ্র।

দেখতে সে বেঁটে, চৌকো ছাঁচের একখানা মুখের মধ্যিখানে একটা বেয়াড়া নাক খাঁড়ার মত উঁচিয়ে আছে, ছোট ক'রে ছাঁটা মাথার চুল যেন সজারুর কাঁটা। চীনেম্যানদের মত হল্‌দে গায়ের রঙ, তার উপর চোখ দুটো অতিশয় ক্ষুদ্র এবং ভুরু নেই।

আঠারো বছর বয়েসে সে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এ পড়ে। একদিন তাদের ইংরিজির প্রোফেসর অক্সনিয়ান্ মিঃ নন্দী ক্লাশে ঢোকবার আগে জ্বলন্ত পাইপটা বুটে ঠুকে-ঠুকে তামাক বার ক'রে ফেলছেন, এমন সময় রামচন্দ্র পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলো, "দেখুন, একটু শুনবেন ?" মিঃ নন্দী ফিরে তাকালেন। রামচন্দ্র বল্‌লে: "দেখুন তো, এই য়্যাপ্লিকেশনটা লিখেছি, কেমন হয়েছে! আপনি তো খুব ভালো ইংরিজি জানেন শুনেছি।"

নন্দী-সাহেব স্তম্ভিত হ'লেন, পাইপটা পাৎলুনের পকেটে রাখতে গিয়ে ভুল ক'রে মুখে দিয়ে ফেললেন, ডগাটা একবার চিবোলেন, তার পর কেসে বললেন, "দেখি।"

য়্যাপ্লিকেশনখানা দেখে তাঁর মুখ আরো গম্ভীর হ'য়ে গেল।

"দ্যাখো, এ য়্যাপ্লিকেশন থাক্। তুমি কী বলতে চাও আমাকে মুখে বোলো—এ-ঘণ্টার পরে—আমি লিখে দেবো। এটা ঠিক করতে গেলে প্রতি কথা কেটে নতুন কথা বসাতে হয়, প্রতি লাইন তুলে লিখতে হয় নতুন লাইন; তাতেও হয় না, কেননা তুমি কী বলতে চাচ্ছো সেটা আমি মোটেও বুঝতে পারলাম না।"

রামচন্দ্র গম্ভীরমুখে বললে, "বেশ, বেশ, আপনি দেবেন ভালো ক'রে লিখে, নয় তো আর অত ভালো ইংরিজি শিখেছেন কী জন্যে!"

কথিত আছে, সে-য়্যাপ্লিকেশন ছিলো প্রিন্সিপালের কাছে একটা ষ্টাইপেণ্ডের জন্য : এবং এ-ও কথিত আছে যে তার অমন সুন্দর ইংরিজি দেখেই খুসি হ'য়ে প্রিন্সিপাল তার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছিলেন।

২

তার পর দেশে এলো নন্-কো-অপারেশনের ঢেউ।

ছেলেরা কলেজ ছাড়ছে, স্বরাজ আজ আসে কি কাল আসে। কলেজের কড়াকড়ি বাঁধাবাঁধি ছাড়িয়ে তারা যখন স্বাধীনতা পেলো তখন দেশও এ-পথ ধ'রেই অবিলম্বে স্বাধীন হবে, এ-যুক্তিটা বড় চমৎকার ঠেকলো অনেকেরই কাছে। রামচন্দ্রের কাছে, বিশেষ ক'রে। কলেজ বর্জ্জন ক'রে সে নাম লেখালে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকের দলে। পিতৃদেব বললেন, "ওরে গর্দ্দভ, এ কী করলি ?"

রামচন্দ্র বললে, "কেন, বেশ তো করেছি।"

"দশটাকা ক'রে ষ্টাইপেণ্ড পেতিস, সেটা তো গেলো।" পিতৃদেব মনে করলেন এ-যুক্তিটাই সব চেয়ে লাগসই হবে।

রামচন্দ্র নিতান্ত অবজ্ঞার সুরে বললে, "চ্ছোঃ! দশটাকা! এদিকে হিন্দু হস্‌টেলে রেস্তোরাঁয় আমরা ষাট টাকা ধার, লিলি কেবিনে পঁয়ত্রিশ টাকা, সিলেশ্চিয়ালে একুশ টাকা বারো আনা—সেদিনও ব্যাটা এসেছিলো টাকার তাগাদা দিতে। মাসে-মাসে বেড়েই চলবে : আর দশ টাকা দিয়ে কোন্ গর্ত্ত আমি ভরাবো! এদিকে, দেশের 'স্বেচ্ছা-সেবকের' কাছে কোন্ কাপুরুষ টাকা চাইতে সাহস করবে তুমিই বলো!"

পিতৃদেব স্তম্ভিত হ'লেন। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ মাথায় বাড়ি দিলে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম। খানিক চুপ ক'রে থাকবার পর প্রকৃতিস্থ ভাবটা যেন ফিরে এলো। তখনো তাঁর মুখ দিয়ে বেশী কথা বেরোয় না, তাই সংক্ষেপে বল্‌লেন, "দূর হ'।"

৩

রামচন্দ্র দূর হ'লো। সে ছাড়লো কলেজ, বাপ ছাড়লো তাকে।

একেবারে পূর্ণ স্বরাজ! ভারতবর্ষ যে দ্রুতগতিতে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছে, নিজের অবস্থা দিয়ে সে সেটা ভালো ক'রেই বুঝতে পারলে।

চোদ্দ মাস সে বাঙলার বাইরে বিভিন্ন জনপদে স্বাধীনতার ব্রত নিয়ে ভ্রমণ করলে। তার এ-সময়কার ইতিহাস একটু ঝাপসা। জনশ্রুতি এই যে সে কাশীধামে মালব্যজীর দর্শনলাভ করে, এবং তাঁর সঙ্গে হিন্দু-দর্শন নিয়ে গভীর আলোচনাও নাকি করে। সে-আলোচনা সম্ভবতঃ খুবই সূক্ষ্ম হয়েছিলো, কিন্তু তার ফলে তার যে-দক্ষিণালাভ হয় সেটা নাকি রীতিমত স্থূল। অন্ততঃ লোকে তা-ই বলে। তার পর সে নাকি কানপুর কংগ্রেসে বক্তৃতা করেছিলো, এবং সে-বক্তৃতা নাকি বাঙালী ছাড়া আর সব জাতেরই মর্ম্ম স্পর্শ করতে পেরেছিলো। কেননা মান্দ্রাজীরা ভেবেছিলো সে তামিলে বল্‌ছে, খোট্টাদের কানে লেগেছিলো বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীর মত, গুর্জ্জর-অধিবাসীরা চমৎকৃত হয়েছিলো তাদের মাতৃভাষা শুনে। সব দিক্ থেকেই উৎসাহের হাততালি : কেবল বাঙালীরাই ছিলো চুপ করে, কেননা বাঙালীরাই কেবল বুঝতে পেরেছিলো যে সে ইংরিজিতে বলছে।

৪

এ-চোদ্দ মাসে উত্তর ভারতের বিভিন্ন নগরে রামচন্দ্র অনেক কীর্ত্তিকলাপই স্থাপন করলে, তার মধ্যে একটি শুধু এখানে উল্লেখ করবো। এই যান্ত্রিক সভ্যতাই আমাদের সর্ব্বনাশ করছে, এবং প্রতি মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হওয়াই আমাদের ত্রাণের উপায়, এই নীতি সে শুধু মুখে প্রচার ক'রেই ক্ষান্ত হ'লো না, নিজে তার একটা মহৎ দৃষ্টান্তও দেখালো! একবার ফরাক্কাবাদে কি এলাহাবাদে কি লাহোরে, রামচন্দ্র যখন এক মেসে আছে, এবং সে-মেসের অতি কৃপণ আহারে ক্ষুব্ধ হচ্ছে, সে কোত্থেকে আস্ত একটা পাঁঠা জোগাড় করলে। স্বহস্তে বধ করলে সেই সুখাদ্য জীবকে, স্বহস্তে তাকে রন্ধন করলে, তার পর অন্য কারো সাহায্য না-নিয়ে সমস্তটা আহার ক'রে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বিতার পরিচয় দিলে। আরো কথিত আছে যে সেই পাঁঠার চামড়াটা রোদে শুকিয়ে সে নাকি স্বহস্তে জুতো তৈরী ক'রে সে-জুতো স্বচরণে ধারণ করেছিলো—কিন্তু এটা আমি বিশ্বাস করি নে। আর তার পর থেকে কেউ-কেউ

নাকি তার রামনামের পরে সেই বিশিষ্ট জীবকে যুক্ত ক'রে ডাকতো, কিন্তু এমন কোন্ কথা আছে যা নিন্দুকে না বলবে!

৫

চোদ্দ মাস পরে রামচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলো। নন্-কো-অপারেশনের হুজুক ততদিনে কেটে গেছে, ছেলেরা সুড়সুড় ক'রে খদ্দরের কুর্ত্তা আর টুপি বাক্স-বন্দী ক'রে ফিরে এসেছে কলেজে। কিন্তু রামচন্দ্র তা ভাবতেও পারে না! একবার ছাড়া পেয়ে আবার সে কি গলায় দড়ি পরবে! মরে গেলেও না। সে স্বাধীন, সে স্বাবলম্বী।

বন্ধুরা বললে, "কিন্তু একটা কিছু ক'রে খেতে হবে তো!"

রামচন্দ্র তার উঁচু নাক ফুলিয়ে বললে, "চ্ছোঃ! তার জন্যে ভাবনা! খেতে হবে, এই তো সমস্যা! তা এ-সমস্যার চমৎকার সমাধান আমি বার করেছি।"

বন্ধুরা উৎসুক হ'য়ে বললে, "কী? কী?"

"আমাদের শাস্ত্রে বলে আহার সম্বন্ধে নির্ব্বিকার নিরপেক্ষ হওয়াই মুক্ত পুরুষের একটি লক্ষণ। অত বাছ-বিচার করি বলেই তো আমাদের অন্ন-সমস্যা। নিজের বাড়ীতে ব'সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমাদের খাওয়া চাই। এটাই তো দাসত্ব। এই সঙ্কীর্ণতার উপরে উঠতে হবে। যখন এবং যেখানেই যা-কিছু পাবে, তা-ই যদি খেতে পারো তা হ'লে কি আর ভাবনা থাকে? আমি আহার সম্বন্ধে নির্ব্বিকার নিরপেক্ষ, আমার মত নিশ্চিন্ত ভাইসরয় অব-ইণ্ডিয়াও নন্।"

রামচন্দ্র কখনো কোন মত প্রচার করেনি যা সে নিজের জীবনে না খাটিয়েছে। সুতরাং সুরু হ'ল তার নির্ব্বিকার নিরপেক্ষ নিশ্চিন্ত জীবন: যে-কোন সময়ে যে-কোন জায়গায় যা-কিছু পায় তা-ই খেয়ে ফেলে। এক বাড়ীতে গিয়ে দেখলে টেবিলের উপর নানা রকম ফল সাজানো রয়েছে। তৎক্ষণাৎ সেগুলো চালান হ'ল তার জঠরে। তার পরেই চোখে পড়লো একটিন বিস্কুট। এক সঙ্গে তিনখানা ক'রে সমস্ত টিনটা খালি করতে বেশী সময় লাগলো না। অন্য কোথায় গিয়ে হয় তো দেখলো রোগীর জন্যে টনিকের বোতল রাখা হয়েছে। চোঁ-চোঁ ক'রে শেষ ক'রে দিলে বোতল। একবার কোথায় নাকি চুলের তেল খেয়েছিলো—তার পর

থেকে তার মত হ'ল পানীয় হিসেবে চুলের তেল নেহাৎ মন্দ নয়। বাছ-বিচার ক'রেই তো আমাদের এই বিপদ্: রামচন্দ্র মুক্ত পুরুষ, সে যা পায় তা-ই খায়। এক দিন রুটিতে জুতোর কালি মাখিয়ে খেয়ে মাখন-জ্যাম প্রভৃতিতে তার নাকি ঘোরতর অরুচি ধ'রে গিয়েছিলো। ওয়াটারম্যানের কালি খেয়ে সে বেশী পছন্দ করে নি, তার চেয়ে নাকি 'সোয়ান' কালি খেতে ভালো। অবিশ্যি শেষের কথাগুলো খুব সম্ভবতঃ গল্প।

ইতিমধ্যে রামচন্দ্র এক বাঙলা দৈনিকে চাকরী পেলো—খেলার রিপোর্ট লেখা তার কাজ। মাইনে সেখান থেকে সব সময় পাওয়া যায় না, নিয়মিত পাওয়া যায় বাস্-এর একখানা অল্-সেক্শন মান্থ্লি, সেটাই রামচন্দ্রের মস্ত লাভ। থাকে সে শ্যামবাজারের এক মেসে, সকালবেলা টিকেটখানা নিয়ে বেরোয়। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে কেক-বিস্কুটের দোকান, সেখানে তার প্রাতঃকালীন জলযোগ আরম্ভ হয়। রুটি, কেক, বিস্কুট সে যত পারে তত খায়, যত খায় তত চায়। তার পর মেছো-বাজারে এক সোডার দোকানে গোটাচারেক আইসক্রীম লেমনেড খেতে হয়—বিস্কুটগুলো যা শুকনো! তার পর কলেজ ষ্ট্রীটে চা, এবং চায়ের সঙ্গে চপ্, কটলেট্, অমলেট্। ওয়েলিংটনে স্যাঙ্গু ভ্যালির দোকানে আর এক প্রস্থ চা ও তৎসহ দুটি বর্ম্মা চুরুট। কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে এসে তার ব্রেক্ফাস্ট্ শেষ হয় চার খিলি মিঠে পানে—আর কোনোখানকার পান তার পছন্দ হয় না। সব দোকানে বলে, "'ধনুর্দ্ধরে' বিনি পয়সায় বিজ্ঞাপন ছেপে দেবো', কেউ পয়সা চায় না। শুধু পানের দোকানে বলে, "বিনি পয়সায় খেলা দেখাবো—আর কী চাও?"

৭

এমনি ক'রে রামচন্দ্রের দিন বেশ সুখেই কাটছিলো, এবং এই বিচিত্র ও সহরব্যাপী আহারে তার গণ্ডদেশ স্ফীত হ'য়েই উঠছিলো। এর মধ্যে একদিন মোহনবাগানের খেলা নিয়ে সেই যে কী গোলমাল হ'ল, তার পরে কাগজে-কাগজে তুমুল হৈ-চৈ। 'ধনুর্দ্ধর'ও পেছ-পা হবে না, 'ধনুর্দ্ধরে'র প্রতিনিধি যাবে স্বয়ং স্যর হরিশ্চন্দ্রের কাছে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জান্তে। এবং সে প্রতিনিধি অবশ্য আমাদের নিজস্ব শ্রীরামচন্দ্র।

স্যর হরিশ্চন্দ্রের বাড়ী থিয়েটার রোডে; এবং যদিও সেদিন সকালে গ্রে ষ্ট্রীট-টু-কর্পোরেশন ষ্ট্রীট ভোজ তার যথারীতিই সমাধা হয়েছিলো, তবু বাকি পথটুকু যেতে যেতে আবার তার ক্ষিদে পেয়ে গেলো। তার উপর বাস্ থেকে নেমে হাঁটতেও হ'ল মন্দ না। স্যর হরিশ্চন্দ্রের প্রাসাদে ঢুকে কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে সে ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করতে লাগলো। এদিক্-ওদিক্ তাকাতে-তাকাতে চোখে পড়লো দেয়ালের গায়ে প্রায় লুকোনো ছোট্ট শ্বেতপাথরের আলমারি, তার উপরের তাকে মস্ত একটা বোতল। উঠে গিয়ে বোতলটির ছিপি খুলে দেখলো লাল রঙের একটা তরল পদার্থ টলটল করছে। বাঃ, গন্ধও বেশ! আর কিছু না ভেবে ঢক্‌ঢক্ ক'রে সে—কিন্তু অর্দ্ধেকটা না-খেতেই তার মাথা ঘুরে উঠলো, চোখে দেখলো সর্ষেফুল, মুখ দিয়ে থুঁতু গড়াতে লাগলো—বোতলটা তার হাত থেকে পড়ে' গেলো, কিন্তু সে-শব্দ সে শুনলো না। তার পর সে সেখানেই মেঝের উপর পড়ে গেলো, আর একটু পরে স্যর হরিশ্চন্দ্র ঘরে ঢুকে দেখলেন রামচন্দ্রের নাভিশ্বাস উঠেছে। আর একটু পরেই সে মরে গেলো।

উত্তররামচরিত

রামচন্দ্র অবিশ্যি সত্যি-সত্যি মরলো না, হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভালো হ'য়ে উঠলো। ওটা ছিলো স্যর হরিশ্চন্দ্রের বাতের ওষুধ, রোজ দু'ঘণ্টা মালিশ করেন, চাকরেরা ভুল ক'রে সেখানে রেখেছিলো। ব্যাপারটা বিষ, কিন্তু খুব মারাত্মক বিষ নয়।

রামচন্দ্র এখনো বেশ ভালো আছে; এবং এখনো মান্থলি টিকেট নিয়ে অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরি করছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পনেরো ঘণ্টাই প্রায় তার বাস্-এ বাস্-এ কাটে। এখনো সে আহারসম্বন্ধে নির্ব্বিকার ও নিরপেক্ষ: একদিন কোন-না-কোন উপায়ে মৃত্যু তো হবেই, মৃত্যুকে ভয় করলে বেঁচে সুখ কী? রামচন্দ্রকে যদি তোমরা কেউ স্বচক্ষে দেখতে চাও, যে-কোনদিন যে-কোন সময়ে বাস্-এ উঠে ব'সে পিছনে তাকিয়েই যাকে দেখবে, সে-ই রামচন্দ্র।

মা-হারা

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

[সম্প্রতি কবি কুমুদরঞ্জনের মাতৃবিয়োগ হয়েছে, তিনি শোকাভিভূত। শোকের দিনে স্বভাবতঃ প্রিয়জনের কথাই মনে পড়ে, কবি তাই তাঁর অতি-প্রিয় 'রামধনু'কে এই ছন্দবদ্ধ শোকাশ্রু পাঠিয়েছেন। কবিতাটির প্রতি ছত্রে কবির মন যেন কেঁদে উঠছে।]

১

মা যে আমার নাই!
বাৎসল্যের সে গঙ্গা-ধারা
শুকিয়ে গেছে ভাই।
দুধ-সাগরে পড়লো চড়া,
শুষ্ক আমার বসুন্ধরা;
মরু-দেশের গুল্ম আমি
এক কণা জল চাই।

২

আজকে ভাগ্যহীন,
মা-হারাদের রাজ্যে থাকি
একলা কাটাই দিন।
মা কেউ সেথা বলে না রে,
সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে না রে!
কোথায় গেলে সেই নবনীর
দেশকে ফিরে পাই?

৩

চক্ষে ঝরে জল,
বুড়া খোকার চোখ মুছাতে
নাইক' সে অঞ্চল।

মা যে গোটা ধরণীরে,
স্বর্গ মায়ের চরণই রে।
জগন্মাতার পরিচয়ও
পেলাম তাঁহার ঠাঁই!

৪

মন করে কেমন,
ঝল্‌সে গেঁছে কালিদহের
সেই সে কমল-বন।
সাগরের ঢেউ লাগ্‌ছে যে গায়,
ঝঞ্ঝা-ঝানাস্‌ ডাক দিয়ে যায়
কোথায় কমল-কামিনী মা
ভাবছি যে সদাই!

তিনটে ইঁদুর-বাচ্চা

(শ্রীসুকুমার দে সরকার)

ভাঁড়ার-ঘরে চালের সিন্দুকের পাশে, হাঁড়ির পর হাঁড়ি মনুমেণ্টের মত সোজা উঠে গেছে, তারি কানাচে অন্ধকার ঘুপ্সী কোণটুকুতে ইঁদুরের বাচ্চা তিনটের আজ চোখ ফুটেছে। চোখ খুলেই তারা দেখে, উঃ কি আলো! চোখ একেবারে ধেঁধে যায়! মা-ইঁদুর বললে, "এ আর কি দেখছিস্‌ বাছারা, একবার যদি বাইরে আকাশের নীচে যাস্‌, একেবারে অন্ধ হয়ে যাবি। যাস্‌ নে যেন কখনও! এখানে কেমন নিশ্চিন্দি আরাম। ওই দেখ ওখানে চালের সিন্দুক, যত খুসী খেয়ে যাও, সারা জীবনেও ফুরাতে পারবে না। আর ওই ওধারে আছে গুড়ের কলসী, ওপরে ঘিয়ের টিন আর হাঁড়িতে কত কি! নাক-

উঁচু বড়ি, চুকচুকে লঙ্কা, তেজপাতা, জিরে, সরষে কত কি! অরুচি হবার জো টি নেই।"

"আর," মা-ইঁদুর বলে চলে, "আয়, পাড়া-পড়শীদের পরিচয় করিয়ে দিই। ওই যে ওপরের কোণে ঝুপ্সী কালো ঝুল দেখা যাচ্ছে ওখানে থাকেন মাকড়সা দাদা, আর ওই টিনের পাশে আরস্থলারা; এখন ডিমে তা দিচ্ছে। পিঁপড়েদের কথা না-ই বা বল্‌লাম। যাক্‌, বুঝে সুঝে ত নিলি বাছারা, এবার সব চরে খা, আমি চল্‌লাম।"

ইঁদুর-মা সেই যে পিছন ফির্‌ল, বাচ্চাদের সঙ্গে আর তার দেখা হয় নি বললেই হয়। জানোয়ার, পোকা-মাকড়, ছোট প্রাণীদের অমনি—বাচ্চারা একবার নিজে খাবার জোগাড় করবার উপযুক্ত হলেই হ'ল; আর তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই।

ইঁদুর-বাচ্চা তিনটে সারাদিন ঘরের কোণে চুপচাপ বসে রইল, তার পরে অন্ধকার যখন হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেল ভাঁড়ারের দরজা, তখন আর তাদের পায় কে? সমস্ত ঘরময় নেচেকুঁদে ছুটোছুটি করে তারা সমস্ত তছ্‌নছ্‌ করে বেড়া'ল। খেয়ে, ফেলে, ছড়িয়ে, নষ্ট করে, কেটে-কুটে, সে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড! জালের মধ্যে বসে মাকড়সা দাদা মুরুব্বি-চালে বললেন, "ওরে, অমন দৌরাত্মি করিস্‌ নি ইঁদুর-বাচ্চারা, সর্ব্বনাশ ঘটবে—।"

আরস্থলারা হকচকিয়ে ফরফরিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। কিন্তু ইঁদুর-বাচ্চাদের তখন পায় কে? ভাঁড়ার ভরা খাবার আর সারারাত ধরে স্ফূর্ত্তি। কেই বা মানা শোনে? ঘরময় চাল ছড়ান, নাক-উঁচু বড়ীর দল নাক কেটে গড়াগড়ি যেতে লাগল, গুড়ের কলসী বেয়ে গুড়, ঝরণা থেকে নদীর মত বেরিয়ে এল, আর মসলার হাঁড়ির মধ্যে কালো কালো যে সব জিনিস তারা ভরে দিল তা আর 'কহতব্য' নয়।

এল সকাল, ভাঁড়ারের মধ্যে কত ঘর, কত দেউড়ী, পার হয়ে ভয়ে ভয়ে এসে ঢুকল অতি ক্ষীণ একটু দিনের আলো। ইঁদুরের বাচ্চারা তাদের 'ঘুপ্সী কোণে শ্রান্ত হয়ে ঢুকে পড়্‌ল আর সেই ভাঁড়ার-ঘরে ঢুক্‌ল চক্‌-চকে এক

চওড়া লালপাড় শাড়ী, মাথায় ডগডগে লাল সিঁদূর। শোনা গেল, "ওমা, কি জ্বালাতন, ইঁদুরের দৌরাত্ম্যিতে আর থাকবার জো নেই।"

গুড়ের কলসীটা আবার মাথা সোজা করে দাঁড়াল, চালেরা সিন্দুকে উঠ্‌ল, বড়ীরা হাঁড়িতে। প্রতিদিনের কাজ প্রাত্যহিক শ্লথতায় চলতে লাগ্‌ল।

ভাঁড়ার-ঘরের জালে ঘেরা ছোট্ট জানলাটার ওপর পেয়ারা গাছের একটা ডাল এসে পড়েছে, তাকে পার হয়ে একফালি নীল আকাশ ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে হাসে। পেয়ারার ডালটায় রোজ দুটো শালিক বসে ঠোঁট দিয়ে ডানা খোঁটে আর সুখদুঃখের গল্প করে। এ ত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—মাকড়সা দাদাও জানে, আরসুলারাও জানে, সবাই জানে। কিন্তু ইঁদুরের বাচ্চাদের কাছে তাই প্রকাণ্ড বিস্ময়। ওপারে নাকি মস্ত পৃথিবী, ভাঁড়ার-ঘরের থেকেও বড়, অনেক বড়! আর আকাশ-ছোঁয়া সুপুরী গাছের দল ছাড়িয়ে, দীঘি পার হয়ে, ধানক্ষেত ছাড়িয়ে গিয়ে আছে মাঠ—প্রকাণ্ড মাঠ। সেই মাঠ ছড়িয়ে যেতে যেতে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। আর মাঠে নাকি থাকে মেঠো ইঁদুরের দল, গাছের কোটরে কত গেছো ইঁদুর—ইয়া-ইয়া তাদের গোঁফ!

ইঁদুরের বাচ্চারা পাখীদের কথা অবাক্ হয়ে শোনে। আকাশে নাকি হুমকি দিয়ে মেঘ ওঠে, সেই মেঘের ধারে সূয্যিঠাকুরের আলো জরীর পাড়ের মত ফুটে ওঠে, গাছে গাছে কত মিষ্টি ফল!

একজন ইঁদুরের বাচ্চা বলে, "চল ভাই, বাইরে চলে যাই, দেখা যাবে কত মজা!" কিন্তু বাকী দু'জন শিউরে বলে, "ওরে বাবা, মায়ের কথা মনে নেই? এখানে কি আরাম!"

আবার রাত আসে, আবার সুরু হয় মাতামাতি। মাকড়সা দাদা সাবধান করে দিয়ে বলে, "অমন করিস্ নে রে ইঁদুর-বাচ্চারা, ধনে-প্রাণে সকলে মারা যাব।"

আরসুলারা হকচকিয়ে ফরফরিয়ে উড়ে বেড়ায়। গুড়ের কলসী উল্টে পড়ে, নাক-কাটা বড়ীরা গড়াগড়ি দেয়, ঘরময় চালের ছড়াছড়ি।

সকাল বেলা ডগডগে সিঁদূর আর লালপাড় শাড়ী এসে বলে, "নাঃ, বাপু, আর পারা গেল না, এর একটা বিহিত করতেই হ'ল।"

সেদিন রাতে, প্রতিদিনের অভ্যাস মত ইঁদুর-বাচ্চারা খেয়ে, ফেলে, ছড়িয়ে মহা উৎসব লাগিয়েছে। নিঝুম নিস্তব্ধ পৃথিবী, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। কিন্তু এমন মিষ্টি গন্ধ আসে কোথা থেকে? গন্ধতেই পেটে ক্ষিধে চোঁ চোঁ করে ওঠে! খুঁজে-পেতে ইঁদুরের বাচ্চারা দেখলে ঘরের এক কোণে কাঠের একটা সাদা বাক্স হাঁ করে রয়েছে আর তারি থেকে ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ আসছে। ওটাকে ওখানে ত কোনদিন দেখা যায় নি! ইঁদুরের বাচ্চারা ভাবলে, আর যে প্রকাণ্ড হাঁ! কিন্তু নড়েও না চড়েও না। একটা বাচ্চা সাহস করে কাছে এগিয়ে গেল, এমন কি ক্ষুদে ক্ষুদে পা দিয়ে আঁচড় কেটেও দেখলে, তবুও নড়ে না। তখন সে মুহূর্ত্তের জন্যে এক ছুটে বাক্সটার হাঁয়ের মধ্যে ঢুকেই বেরিয়ে এল। কিছুই ত হ'ল না! তখন সে নিতান্তই উদাস, অলস চরণে বাক্সটার মধ্যে ঢুক্‌ল। বাক্সটার ঠিক মধ্যিখানে একটা তারের ডগা থেকে ঝুলে আছে একটা খাবার—কি তার ভুরভুরে গন্ধ! ইঁদুর-বাচ্চা আলগোছে একটুখানি খেয়ে দেখলে, তার পরে বলে উঠ্‌ল, "ওঃ ভাই, কি চমৎকার!"

বলতে বলতে এবার সে পেটুকের মত বেপরোয়া ভাবে মারলে খাবারটায় টান। বাকী বাচ্চা দুটো ছুটে আসছিল, কিন্তু তাদের আর ঢোকা হ'ল না। বোমা-ফাটার মত প্রকাণ্ড একটা শব্দে বাচ্চা দুটো ডিগবাজী খেয়ে পড়্‌ল। বাক্সটার হাঁ-করা মুখ তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতরের ইঁদুর-বাচ্চাটা কত কিচির-মিচির করলে, কত আঁচড় কাটলে, কিছুতেই কিছু হ'ল না, বাক্সের মুখ আর কিছুতেই খুল্‌ল না। সকালবেলা ডগডগে সিঁদূর আর লালপাড় শাড়ীর সঙ্গে দুটো কালো কালো পা এসে নাচতে নাচতে বাক্সটা নিয়ে চলে গেল। বাকী ইঁদুর-বাচ্চা দুটো তাদের ভায়াকে আর কখনও দেখে নি।

ভাঙ্গন যখন লাগে, নিতান্ত বেপরোয়া ভাবেই লাগে। ইঁদুরের বাচ্চাটাকে বার করে দিয়ে এসে লালপাড় শাড়ী বললে, "ওরে, ভাঁড়ার-ঘরে বড় ঝুল হয়েছে, বড় নোংরা হয়েছে—চারদিক্ একটু পরিষ্কার কর্ দেখি!" ঝাঁটা আর ঝাঁকড়া

ঝুলঝাড়া নিয়ে দুটো কালো কালো পা ধেয়ে এল। দেখতে দেখতে মাকড়সা দাদা পেট উল্টে চিৎ হয়ে পড়লেন আর ফরফরিয়ে উড়তে গিয়ে ঝাঁটার ঘায়ে কত আরসুলা যে মারা পড়ল তার ইয়ত্তা নেই।

একটা ইঁদুর-বাচ্চা বললে, "চল ভাই, মাঠে পালিয়ে যাই, এখানে আর নয়।"

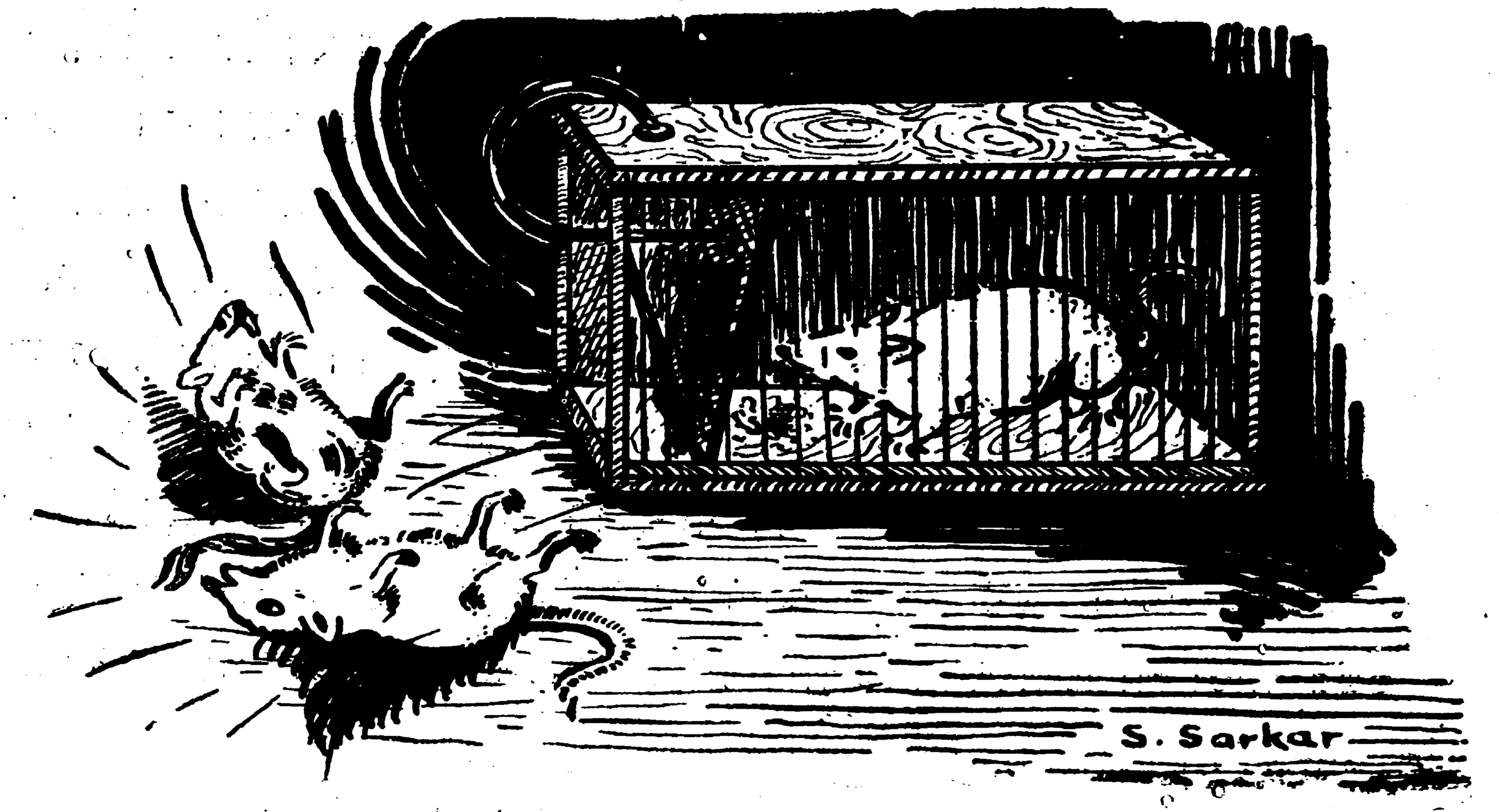

বাচ্চা দুটো ডিগবাজী খেয়ে পড়ল।

অন্য জন কিন্তু সায় দিলে না, সে উত্তর দিলে, "লুকিয়ে থাক না এখন, এমন খাওয়া-দাওয়া, সুখের ঘর-দোর ছেড়ে কোথায় যাব?"

রয়ে গেল তারা।

সেই দিন রাতে, নিস্তব্ধ খাঁ খাঁ পুরীতে তারা বার হ'ল খাওয়ার জোগাড় করতে। চালের সিন্দুকে চাল ভরা। গুড়ের কলসী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, নাক-উঁচু বড়ীরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। কোণের ঘুপসী গর্ত্ত ছেড়ে তারা বেরিয়ে এল; প্রথমে আক্রমণ করতে হবে চালের সিন্দুক। কিন্তু ওকি? চালের সিন্দুকের পাশে অন্ধকারে মরকত মণির মত দুটো কি জ্বলছে? ভাববার আর সময় হ'ল না।

কি যেন একটা প্রকাণ্ড জিনিষ পেটুক ইঁদুর-বাচ্চাটার ওপর লাফিয়ে পড়ল। তার পরে একটা ঝাঁকুনি, দুটো আছাড়, ব্যস্।

বাকী ইঁদুর-বাচ্চাটা লেজ তুলে ছুট দিলে কোণের ঘুপসী গর্ত্তের দিকে, আর সেখানে বসে কাঁপ্‌তে কাঁপতে শুনলে হাড়গোড় চিবানোর কড়মড় শব্দ, আর মাঝে মাঝে মহা সন্তুষ্ট—'মিঞাউ'।

সমস্ত রাত ইঁদুর-বাচ্চাটা সেখানে বসে কাঁপ্‌ল। ভাঁড়ার ঘর খাঁ খাঁ করছে, মাকড়সা দাদা নেই, আরসুল্লারা নেই, ভায়ারাও ধ্বংস হয়েছে; নিঝুম নস্তব্ধ খাঁ খাঁ রাত এগিয়ে চলেছে। ভাঁড়ারের জানলা দিয়ে কালো আকাশের টুক্‌রোটাতে একটা তারা ঝলমল করছে। নিঃশব্দে আবার একটা সঙ্গীহীন দিন এগিয়ে আসছে।

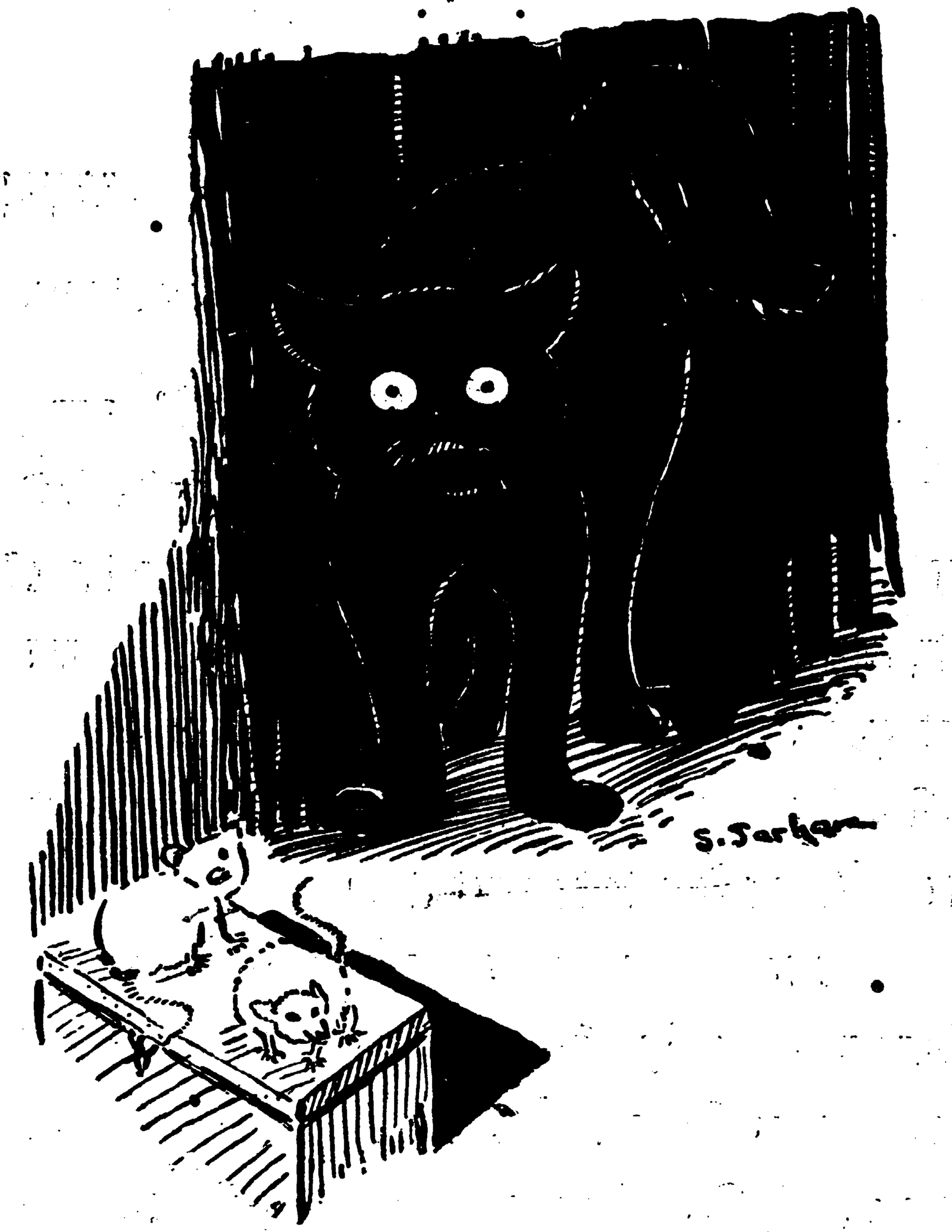

অন্ধকারে মরকত মণির মত…দু'টো কি জ্বলছে!

তার পরে ভোরের বাতাস যখন পাখীদের জাগিয়ে তুলল, তারারা টুপ্ টুপ্ করে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। লালপাড় শাড়ী এসে ভাঁড়ারের দরজা খুলে গঙ্গাজলের ঘটীটা নিয়ে সারা বাড়ীময় ছিটোতে বের হ'ল, ইঁদুর-বাচ্চাটা তার গর্ত্ত থেকে বের হয়ে লাল শাড়ীর পায়ের ফাঁক দিয়ে ছুট মারলে। ভাঁড়ার পার হয়ে, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, শোয়ার ঘর ছাড়িয়ে, দেউড়ীর ওপর দিয়ে সে ছুট দিলে। পেছনে একটা হৈ হৈ উঠ্‌ল কিন্তু সে তখন সুপুরী গাছের দলের মধ্যে দিয়ে মাঠের দিকে

ছুটে চলেছে,—সে মাঠ ছড়িয়ে যেতে যেতে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে, যেখানে থাকে মেঠো ইঁদুরের দল আর গেছো ইঁদুরের দল আর যাদের ইয়া ইয়া গোঁফ।

কলিযুগের ওজন-দাঁড়ি

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

আমাদের একটি 'আড়াই মণী' বন্ধু আছেন, স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর ভয়ানক নজর। প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া তিনি নিউ মার্কেটে যান—কিছু কিনিবার জন্য যান না, যান দেহের ওজন নিতে। নিউ মার্কেটে ওজনের যন্ত্র আছে; তার উপর দাঁড়াইয়া ভিতরে একটি আনি ফেলিয়া দিলে আপনিই একটি কার্ড্ বাহির হইয়া আসে, তার মধ্যে লেখা থাকে—'আপনার ওজন এত ষ্টোন্ এত পাউণ্ড্' অর্থাৎ বাংলা করিয়া বলিলে এত মণ এত সের। যে সপ্তাহে ওজন একটু বেশী হয় বন্ধুবর সে সপ্তাহটা ভারী আরামে কাটান।

সেদিন কি একটা কাজে বন্ধুটির বাড়ী গিয়া দেখিলাম তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ-চিত্তে চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আছেন। কারণ—আগের দিন নিউ মার্কেটের ওজনযন্ত্র নাকি জানাইয়াছে—তাঁর ওজন পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে দেড় সের কম। অতএব—পৃথিবী তাঁর কাছে এখন কুইনিনের মত বিস্বাদ হইয়া আছে।

কাজ মাথায় রহিল, আমি বন্ধুবরকে নানা রকমে বুঝাইতে লাগিলাম। প্রথমে দিলাম প্রবোধ, তার পর দিলাম বৈজ্ঞানিক যুক্তি। বলিলাম, "ওজন কম, ওজন কম বলে চেঁচাচ্ছ, ওজন মানে কি? মা বসুন্ধরা তোমাকে কত জোরে টানছেন তারই একটা মাপ ছাড়া কিছুই নয়। এতে ঘাব্ড়াবার কি আছে?" বন্ধুবরের বুদ্ধিটাও ছিল শরীরের মতই কিছু মোটা, দেখিলাম এ সব ঠাট্টা তাঁর ঠিক বোধগম্য হইতেছে না। তখন বাধ্য হইয়াই তাঁর কাছে ওজন সম্বন্ধে একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিতে হইল।

বাস্তবিক ওজন জিনিষটা কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন পৃথিবী তার উপরকার সমস্ত জিনিষকে তার কাছে (কেন্দ্রের দিকে) দিবারাত্র টানিতেছে। সেই জন্যই আমরা সব জিনিষকে ভারী বলিয়া বোধ করি। মাটী হইতে কোন জিনিষ টানিয়া তুলিতে হইলে পৃথিবীর আকার্ষণী শক্তির চেয়ে—অর্থাৎ পৃথিবী সে জিনিষটাকে যত জোরে টানিতেছে তার চেয়ে বেশী জোরে না টানিলে তাকে উঠান যায় না। কোন জিনিষের উপর পৃথিবীর এই যে আকর্ষণী শক্তি এটা এড়াইতে হইলে ঠিক যতটা জোর দরকার হয় তাকেই আমরা বলি সেই জিনিষটার ওজন। এই জোর মাপিবার নানা রকম মাপকাঠি আছে। পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম মাপ ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশের মাপ—মণ, সের, ছটাক; ইংরাজেরা ব্যবহার করে টন, হন্দর, পাউণ্ড্। এক পাউণ্ড্ ওজন বলিতে বুঝায় একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে এবং চাপে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলের (এক ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া এবং এক ফুট উঁচু) যা ওজন তাই। অন্য দেশে আবার অন্য রকম মাপ আছে। জিনিষ হিসাবেও বিভিন্ন মাপ ব্যবহার করা হয়—সোনা ওজন করিতে যে মাপ ধরা হয়, ধানের বেলা তা' চলে না। এই সব মাপ লইবার যন্ত্রকে বলা হয় দাঁড়িপাল্লা বা ওজন-দাঁড়ি তা' তোমরা জান।

সেকালে যে সব দাঁড়িপাল্লায় জিনিষপত্র ওজন করা হইত সেগুলি ছিল মোটা রকমের—খুব সূক্ষ্ম ওজনের তফাৎ তার মধ্যে ধরা যাইত না। খুব বিরাট আকারের কিংবা অতি সূক্ষ্ম—চুল পরিমাণ কি তার চেয়েও ছোট জিনিষের ওজন লইতে হইলেই যত গোল বাধিত।

কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তন হয়, এ ক্ষেত্রেও হইয়াছে। আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের হাতে পড়িয়া এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব যন্ত্র তৈরী হইয়াছে যা দিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিষের ওজন লইয়া ছাড়িতেছেন,—যেমন ধর একটা ধূলার দানার ওজন কত, এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে যতগুলি লাল দানা আছে তার প্রত্যেকটির ওজন কত ইত্যাদি।

আবার বড় বড় জিনিষের ওজন নিতেও তাঁরা ছাড়েন নাই। আমাদের হিমালয় পাহাড়টি ওজন করিলে কত মণ দাঁড়ায় তা' তাঁরা অক্লেশে বলিয়া

দিতে পারেন। এমন কি আমাদের পৃথিবীর ওজন কত তা'ও তাঁরা বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন।

'পৃথিবীর ওজন' কথাটা শুনিতে একটু গোলমেলে, নয় কি? কারণ আগেই বলিয়াছি কোন জিনিষের ওজন বলিতে পৃথিবী তাকে কত জোরে টানিতেছে তারই একটা মাপ বুঝায়। পৃথিবী নিজেকে আবার কেমন করিয়া টানিবে? পৃথিবীর ওজন বলিতে এই রকম বুঝায়—"পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। কাজেই পৃথিবীর উপরকার কোনও জিনিষ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে ৪০০০ মাইল দূরে আছে। কেন্দ্র হইতে ৪০০০ মাইল দূরের কোনও জিনিষকে সে জিনিষটার যত ওজন তত জোরে টানিতে হইলে পৃথিবীর নিজের ওজন সেই অনুপাতে কত হওয়া দরকার।" একটু চেষ্টা করিলেই বোধ হয় কাথাটা বুঝিতে পারিবে।

হেনরি ক্যাভেণ্ডিশ

পৃথিবীর এই ওজন বাহির করিবার জন্য গত দু'শ বছর ধরিয়া নানা পণ্ডিত নানা পরীক্ষা করিয়াছেন। তার মধ্যে প্রথম ভাল ভাবে জিনিষটা বাহির করেন উপরে যে লাজুক ভদ্রলোকটির ছবি দেখিতেছ তিনি। লাজুক

বলিতেছি এই জন্য যে ইনি কোন দিন কারও সঙ্গে মিশিতে পারিতেন না। এই যে ছবিটি দেখিতেছ এটিই ইঁহার একমাত্র ছবি—ইঁহার অজ্ঞাতে একজন শিল্পী আঁকিয়া লইয়াছেন; ইনি জানিতে পারিলে হয়ত আঁকিতেই দিতেন না। ইঁহার নাম জান কি? হেন্‌রি ক্যাভেণ্ডিশ। ইনি আজকালকার লোক নন, প্রায় দেড় শ' বছর আগেকার লোক। লাজুক বলিয়া ইঁহাকে যেন নেহাৎ 'কেওকেটা' মনে করিও না, ইঁহার মত বড় বৈজ্ঞানিক সে আমলে তো বড় একটা ছিলেনই না, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতেও খুব বেশী জন্মান নাই। রসায়নশাস্ত্রে, বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানে ইঁহার আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

ক্যাভেণ্ডিশ পৃথিবীর ওজন বাহির করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক দিন আগেকার কথা, আজকালকার মত সূক্ষ্ম হিসাবপত্রের—সূক্ষ্ম যন্ত্রের তখনও চলন হয় নাই। কাজেই তাঁর হিসাবে পৃথিবীর ওজন নিখুঁত ভাবে পাওয়া যায় নাই—মোটামুটি ভাবে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছু দিন হইল আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক আরও সূক্ষ্ম ভাবে পৃথিবীর ওজন বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। তোমরা হয়তো ভাবিতেছ পৃথিবীকে যা দিয়ে ওজন করা যায় সে দাঁড়িপাল্লা না জানি কত বড়! কিন্তু মোটেই তা বড় নয়, ও পাতায় সেই দাঁড়িপাল্লার খানিকটা অংশের ছবি দেখ। সমস্ত দাঁড়িপাল্লাটা একটা ঘরের চেয়ে বড় নয়—তবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র, ভিতরে অনেক কারিকুরি আছে। এই দাঁড়িপাল্লাটি রাখিতে হইয়াছিল মাটী হইতে ৩৫ ফুট নীচে একটী ঘর তৈরী করিয়া—সে ঘরের উত্তাপ সব সময়ে সমান, শীতে গ্রীষ্মে তা' একটুও বদ্‌লায় না, এইজন্য। এই দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে নানা হিসাবপত্রের পর পৃথিবীর ওজন ঠিক হইয়াছে ৬০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ টন্‌ অর্থাৎ ১৬৮র পিঠে একুশটা শূন্য দিলে যত হয় প্রায় তত মণ।

শুধু পৃথিবীর এই ওজনই নয়, এই দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে নানা রকম হিসাবপত্র করিয়া আজকালকার পণ্ডিতেরা চাঁদ, সূর্য্য, এমন কি অন্যান্য গ্রহেরও ওজন বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। কি ভয়ানক কাণ্ড বল দেখি! এখান হইতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল দূরে যে জিনিষ রহিয়াছে—খুব ভাল আর বড় দূরবীণ না

হইলে যাদের অস্তিত্বের কথাই জানা যায় না—বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া তাদের ওজন শুদ্ধ বাহির হইয়া পড়িল, এ কি কম আশ্চর্য্যের কথা ?

শুধু ওজন বলিয়া নয়, আজকালকার পণ্ডিতেরা সমস্ত রকম মাপই এত সূক্ষ্ম ভাবে বাহির করিবার যন্ত্র তৈরী করিয়াছেন যে ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগ লম্বা একটা লাইনকে (যাকে বিন্দু বলিলেও বড় বলা হয়) তাঁরা নিখুঁত ভাবে মাপিয়া দিতে পারেন। একটা আধলার ধারে তাঁরা পাশাপাশি একশ'টা সমান্তরাল রেখা টানিয়া দিতে পারেন। একটা মাছির ডানা কতখানি পুরু (এক ইঞ্চির ত্রু'লক্ষ ভাগ) তা'ও তাঁরা বাহির করিয়াছেন। একটা গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতটা বাড়িতেছে তা'ও তাঁরা মাপিতেছেন। ১০০ ডিগ্রী উত্তাপ হইলে জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে, কাজেই ৪০,০০০ ডিগ্রী যে কতখানি উত্তাপ তা' ধারণা করাই কঠিন। অথচ পণ্ডিতেরা তা'ও মাপিয়া দিতেছেন—আকাশের কোন কোন তারা নাকি ততখানি গরম। সে উত্তাপে কোন কঠিন জিনিষ থাকিতে পারে না, তরল জিনিষও পারে কিনা সন্দেহ। আবার এক ডিগ্রীর এক হাজার ভাগ উত্তাপ যে কতটুকু তা'ও আমাদের ধারণা করা কঠিন—পণ্ডিতেরা তা'ও নিখুঁত ভাবে মাপিয়া দিতেছেন। আর কত বলিব ?

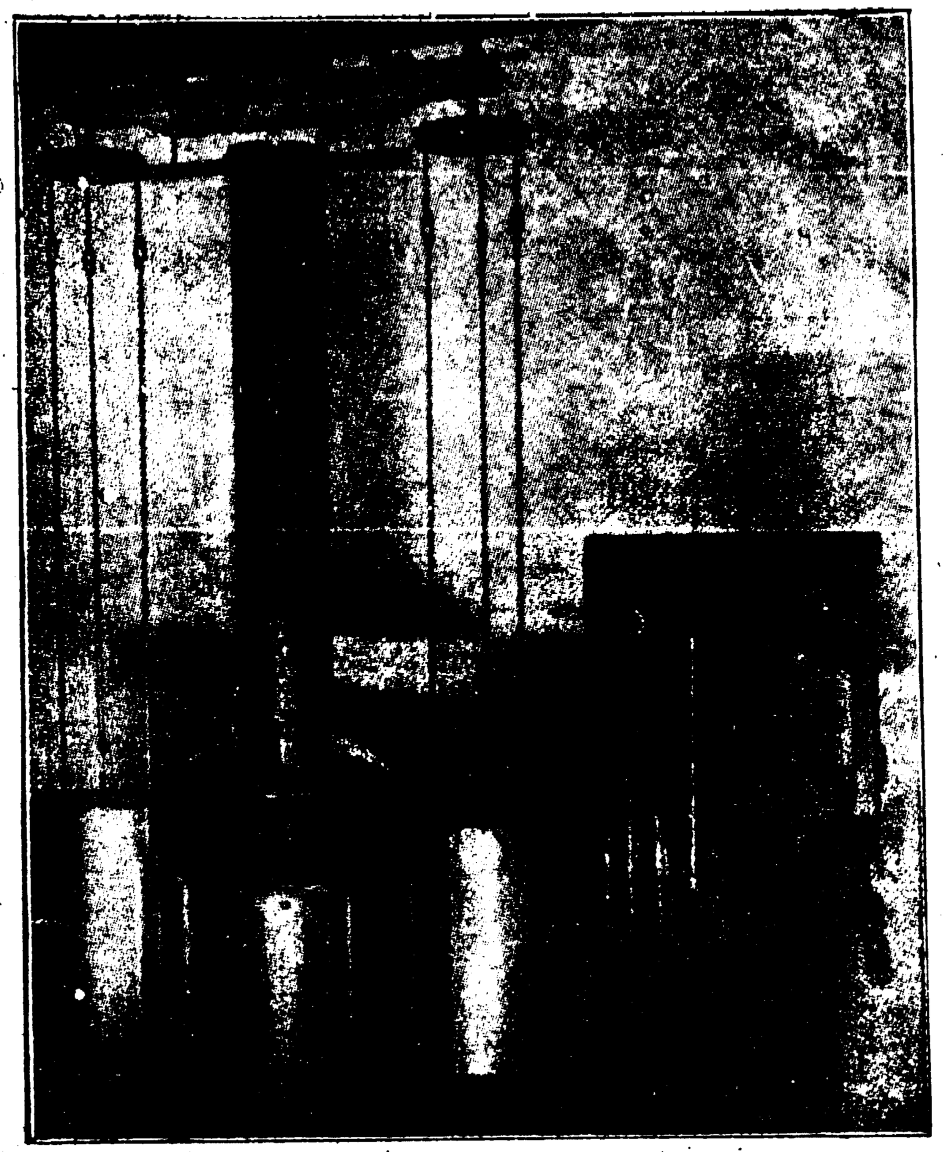

পৃথিবীর ওজন মাপিবার যন্ত্রের একটি অংশ

এই নিখুঁত ভাবে মাপিবার নানা যন্ত্রের জন্য বিজ্ঞান-জগতে যে কত

বড় বড় আবিষ্কার সম্ভব হইতেছে—শিল্পে, বাণিজ্যে, চিকিৎসায় কত রকম উন্নতি হইতেছে তারও হিসাব দেওয়া কঠিন। মনে কর একটা বড় পোল তৈরী হইবে। পোলের কোন্ অংশ কোন্ জিনিষের হইলে তার উপর চাপ পড়িলে কোনও ক্ষতি হইবে না তা' জানা দরকার। এজন্য নানা জিনিষের—যেমন ধর কন্‌ক্রিট্, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতির টুকরার উপর বড় বড় হাইড্রলিক্ প্রেসের সাহায্যে নানা রকম ওজনের চাপ দিয়া সে চাপের ফলে উহাতে যে পরিবর্ত্তন হইল সে পরিবর্ত্তন মাপিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্র দেখিয়া কোন্ অংশ তৈরীর কাজে কোন্ জিনিষ ব্যবহার করা উচিত বোঝা যাইবে। এই যন্ত্র এত সূক্ষ্ম যে এক টুক্‌রা ইস্পাতের উপর ফুঁ দিলে সে ফুঁ-এর বাতাসটুকুর চাপে ইস্পাত কতটা বসিয়া গেল তা' মাপা যায়।

একটা বাড়ী একশ' বছরে কতটা (ইঞ্চি বা তারও কম) বসিয়া যাইবে আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা তা' যন্ত্রের সাহায্যে আগেই বলিয়া দেন—তার পর সেই অনুযায়ী মজবুত করিয়া বাড়ী তৈরী করেন। তা' না করিলে আজকালকার আমেরিকার ৪০-তলা ৫০-তলা বাড়ীগুলি কত দূর সাফল্য লাভ করিত বলা কঠিন।

বড় বড় কারখানায় জিনিষপত্র ওজন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কৌটায় প্যাক্ করিতে হয়। এ সব আপনা-আপনি মাপিবার যন্ত্রও আজকাল হামেশা তৈরী হইতেছে। এক পাউণ্ড চা ওজন করিতে হইলে আর দাঁড়িপাল্লা নিয়া লোককে খাটিতে হয় না; যন্ত্রই আপনা-আপনি চা ওজন করিয়া বাক্সবন্দী করিবে—একটুও বেশী ভরিবে না, একটুও কম ভরিবে না; আর হাতের চেয়ে শতগুণ তাড়াতাড়ি কাজ করিবে। ব্যাঙ্কে আপনা হইতে টাকা গুণিয়া বস্তাবন্দী করিবার নিখুঁত যন্ত্রও আজকাল বাহির হইয়াছে। আর এ যন্ত্র শুধু টাকা গুণিয়াই ক্ষান্ত হয় না—রেজগী হইতে টাকা বাছা, বাজান, মেকি টাকা ধরিয়া দেওয়া—এ সব কাজও করে।

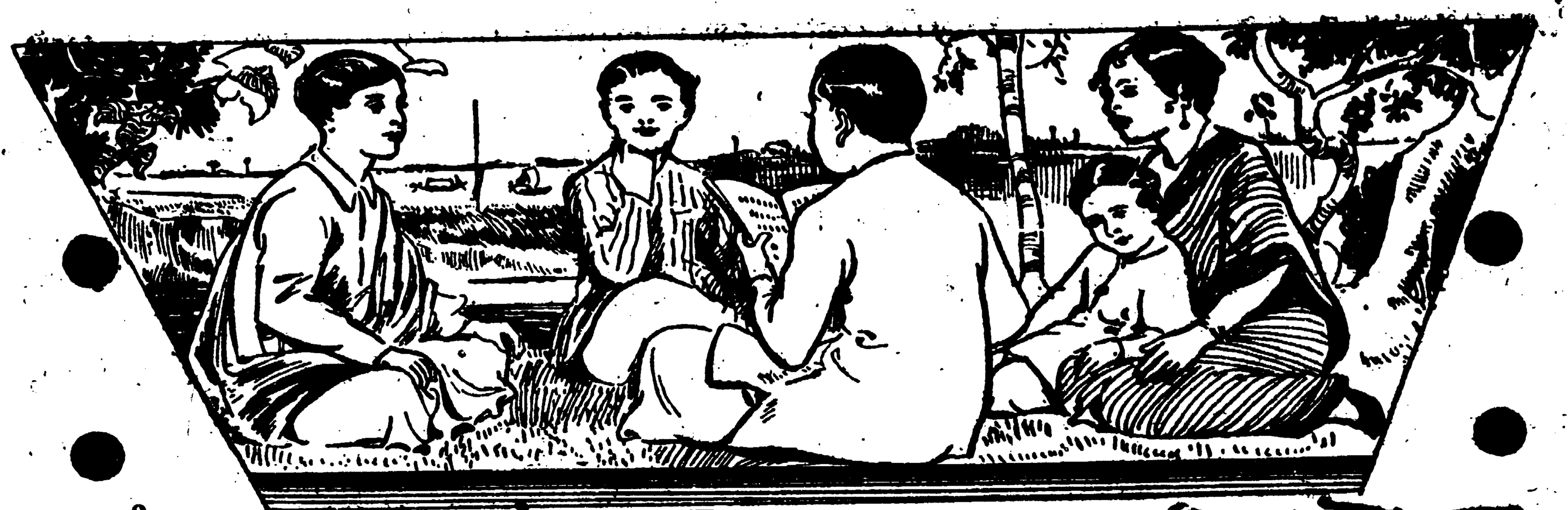

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

স্বপ্ন *

(শ্রীপিনাকীশঙ্কর সেন)

চিত্রকর হার মেনে যায়, থম্‌কে ভাবে কবি,—
নিখুঁত করে আঁক্‌তে গিয়ে অপরূপের ছবি।
ওগো তুমি ছোট্ট মেয়ে, কোলাহলের হাটে
স্বপ্ন তুমি, স্বপ্নে তোমার ছোট্ট জীবন কাটে।
অজানা দেশে অচেনা সব, অ-দেখা যাহা দেখ,
সব নূতনের মোহে যে তাই মগ্ন হয়ে থাক।
এই প্রকৃতির মধ্যে তুমি মিলিয়ে ছিলে আগে,
লতাপাতা, মাটি, আকাশ তাই যে ভালো লাগে।
তোমায় আমি দেখ্‌ছি যত, ভাব্‌ছি আমি হেন,
জীবন্ত এক স্বপ্নটাকে দেখছি আমি যেন ;—
হাল্কা মেঘ ঘুরে বেড়ায়, সে এক শরৎ-ভোর,
তুমি যে এক বনে এলে, এল ঘুমের ঘোর ;
চুলের গোছা এলিয়ে পড়ে সারাটা পিঠ বেয়ে,
স্বপ্ন এল আবেশ নিয়ে নয়ন দু'টি ছেয়ে।
ব্যাঙের ছাতা মাথায় দিয়ে, এলিয়ে সোনার দেহ,
পাতার বনে ছড়িয়ে দিলে তোমার অসীম স্নেহ।

* রামধনু-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত

চোখটি মুদে গেল যেমন, জাগ্‌ল ঘুমের দেশ,
নানা রকম জীব-জানোয়ার, নাইকো তাহার শেষ ;
নীল আকাশে মেঘের ফাঁকে রামধনুটির রং
তোমার কাছে লাগ্‌ছে বুঝি, কেমন মজার ঢং !
বক উড়ে যায় মাথার উপর ডানা দু'খান মেলে,
প্রজাপতি পাখ্‌না মেলি' বর্ণ-ছটায় খেলে ;
চারিদিকে ফুল ফুটেছে, বাতাস বহে মৃদু,
খুকুকে আজ কে ভুলাল, কে করেছে যাদু ?
ফুলগুলি সব রূপ ধরে যে চাইছে তোমার পানে,
রূপের নেশা লাগায় চোখে, ঘুমের কাজল টানে ;
সকল রূপের মাঝে আছ, সবার সেরা রূপ,
যতই দেখি ততই লাগে ও রূপ অপরূপ ;
কোন্ দেশেতে আছ খুকু, নাইকো আমার জানা,
ভেটিয়ে এলাম অনেক দূরে, জান্‌তে বুঝি মানা ?
ধরার সোহাগ ছড়িয়ে দিতে জাগ ধরার মেয়ে,
পুণ্য কর, ধন্য কর, তোমার দিঠি দিয়ে।

স্বপ্ন *

(কুমারী রুবী চাটার্জ্জি)

ছোট্ট ফুট্‌ফুটে একটী মেয়ে। নাম তার নমিতা—ডাকে সবাই 'নিমু' বলে। তার বাবা-মায়ের আদরের, কোল-যোড়া একমাত্র মেয়ে নিমু ক্রমে বড় হ'য়ে এই সবে ছয় বছরে পা দিয়েছে।

আজ বাদে কাল নমিতার জন্মদিন। বাড়ী লোকজনে ভর্ত্তি—সবাই আনন্দোৎসবে মগ্ন। কিন্তু নিমু ? সে এক কোণে লাল একটা ফ্রক্ পরে তার সাধের পুতুল নিয়ে খেলতে বসেছে ; কোলে তার আগের বছরের মার দেওয়া একটা 'ডল্' পুতুল।

* রামধনু-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত

ক্রমে দিনের আলো এল ফুরিয়ে, পাখীরা সব কূজন করতে করতে যে যার বাসার দিকে ফিরছে। সূয্যিমামা পাটে ব'সে জানিয়ে দিলেন—'সন্ধ্যা সমাগতা'।

নিমুর আর ব'সে খেলা করতে ভাল লাগ্‌ল না, সে আস্তে আস্তে শুয়ে প'ড়্‌ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবছে—সে যেন একা, এই 'ডল্' পুতুলটা যেন তার একমাত্র মেয়ে—ইত্যাদি আকাশ বাতাস কত কী!

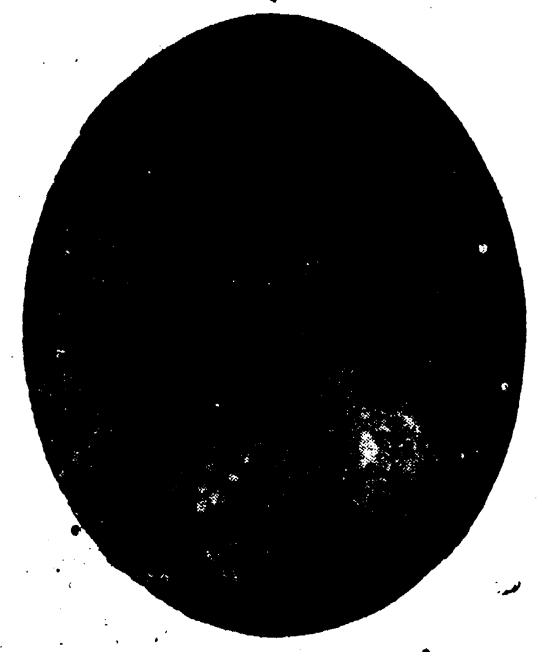
কুমারী রুবী চাটার্জ্জি

* * *

হঠাৎ এ কি! এ সে কোথায় এসে প'ড়েছে! বিশ্রী স্যাঁৎসেঁতে জায়গা—অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্টি—চারদিক্ ভিজে সপ্‌সপে; বোধ হয় কিছু আগে বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছে।

ও মা! তার মাথা যে একটা ব্যাঙের ছাতার ওপর! চারপাশে কত সব মুখওয়ালা পাথরের টুকরো—আবার ঘেসো ফুলগুলোও মুখওয়ালা! এই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এসে তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হ'ল কিন্তু পারলে না—গলা যেন কে তার চেপে ধ'রেছে। উত্তেজনা ও ভয়ে সে দু' চোখ বন্ধ ক'রলে।

বর্ষাকাল। চারিদিকে থম্‌থমে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মধ্যে মধ্যে ব্যাঙের কট্-কট্ আর ঝিঁঝি পোকার ঝিঁ-ঝিঁ এই দুই সংমিশ্রিত সুর পুকুর-পাড়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

পাশে ছিল এক শ্যাওলা-ধরা পাথর, আস্তে আস্তে তার ডান হাতখানা দিয়ে সে পাথরটাকে জড়িয়ে ধরলে। পাথর আদর পেয়ে দরদ দেখিয়ে বল্লে—"নিমু ভাই, তোমার নাকি কাল জন্মদিন, আমাদের নেমন্তন্ন ক'রবে ত'?" পাথরের এই দরদী কথায় নিমুর একটু সাহস হ'ল, সে আস্তে বল্‌লে—"হাঁ, নিশ্চয়।"

ছোট, বড়, মাঝারি, লাল, নীল—অনেক রঙ-বেরঙের ফুল ছিল তার চারিদিকে—সকলেরই নিমুকে পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল। সবাই মিলে নিমুকে ধরে ব'সলে তাদের দেশের গল্প বলবার জন্যে। মনে অনেকখানি বল এনে নিমু ব'ল্‌ল—"আমাদের দেশ আবার আলাদা নাকি? এটাই ত আমাদের দেশ!" ফুল, পাখীরা উত্তর করলে—"না খুকু, এটাকে বলে "স্বপনপুরী"। দেখ্‌ছ না আমরা সব কথা কইছি—পাখীরা গান গাইছে—ফড়িং ভায়া নাচ্‌ছে?" নিমু সাম্‌নে তাকিয়ে দেখে তাই ত'! সত্যিই ত' তার সাম্‌নের পদ্মপাতায় বসে এক হল্‌দে রংএর ফড়িং তিড়িং-তিড়িং নাচ্‌ছে আর যেন গাইছে—

"তাইরে নাইরে নাইরে না—
এমন মজা পাবে না।"

সে আর আনন্দ চেপে রাখতে পারলে না, মনের আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল। তার তালির শব্দে বোধ হয় কোন অজানা অচেনা শত্রুর টনক্ ন'ড়্‌ল। কিন্তু সে তার অজ্ঞাতে।

নিমু দেখছে তার সাম্‌নের আকাশ বেশ পরিষ্কার। দু'-এক খণ্ড সাদা মেঘের মধ্যে দিয়ে নানা রংএ মেলানো 'রামধনু' উঠেছে; কিন্তু ও কি! তার পুতুল 'ডলুকে' কে নিয়ে যায়! তাড়াতাড়ি সে 'ডলু'কে আঁকড়ে বুকে চেপে ধ'রলে।

কিন্তু অচেনা, নাম-না-জানা শত্রু ওপর দিক্ থেকে টান মারে জোরে। সে বুঝি আর ধ'রে রাখতে পারলে না, ওই বুঝি ছেড়ে গেল! ক্রমে সত্যিই তার হাত অবশ হ'য়ে এল—মাথা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগ্‌ল—'ডলু' তার হাত থেকে ছেড়ে গেল। আঁৎকে সে কেঁদে উঠ্‌ল—"ওমা; আমার ডলুকে নিয়ে গেল—"।

হঠাৎ ভয়ে তার চোখ খুলে গেল; চেয়ে দেখে সে ঘরেই শুয়ে আছে—বেশ আরামে; আর তার সাধের ডল্ পুতুলটা তার মার হাতে র'য়েছে।

নিমু ভাবলে—তবে যে এতক্ষণ কী সব দেখছিল! ওঃ, তবে এ সব একদম্ বাজে—একেবারে মিথ্যে—স্বপ্ন—!

বইছে ফাগুন-বায়

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

আজকে হঠাৎ খুসীর পরশ
লাগ্‌ল আমার গায়;
মাঘ গিয়েছে, চারদিকে তাই
বইছে ফাগুন-বায়।
ছোট ছোট ফুলের কলি
দেখছে চেয়ে ঘোমটা খুলি,
বনের ভিতর ছুটতে গিয়ে
থম্‌কে মৃগ যায়;
ঐ দেখ ভাই, ফাগুন-রাণী
ধরার পানে চায়।

মধুর হাওয়ার পরশ পেয়ে
বিশ্ব আজি উঠ্‌ছে গেয়ে
উঠ্‌ছে নেচে পরাণ আমার
এ কোন্ সুষমায় !
ফাগুন এল, ফাগুন এল,
আজকে রে ধরায় !

বিপিন বাবুর বাড়াবাড়ি

[ব-এর বাহার]

(শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিখ্যাত বাঙ্গালী বণিক্ বিপিনবিহারী বাঁড়ুয্যে বাগবাজারে ব্যবসা বসাইয়াছেন। বিপিন বাবুর বোন্ বেলার বেনারসে বেড়াইবার বায়নায় বিপিন বাবু বলিলেন, 'ব্যবসা বড় বিপজ্জনক ব্যাপার; বাহিরিলেই ব্যস্, ব্যবসাটি বন্ধ।' বেলা বিপিন বাবুর বৃদ্ধ বাপকে ব্যাপারটি বলিল। বৃদ্ধ বঙ্কিম বাবু বিপিন বাবুর ব্যবহারে বড়ই বিমর্ষ। ব্যবসা বড়ই বদ্ বিষয়, বিপিন বাবুর ব্যবহারও বড়ই বিশ্রী।

(ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক সমাপ্ত)

পরলোকগত সম্রাট্

(শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

যখনকার কথা বল্‌ছি সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তখন রাজা হন্‌নি, তখন তিনি ছোট্ট একটি রাজপুত্র। পিতা সপ্তম এডোয়ার্ডের বড় ইচ্ছে যে ছেলেরা নাবিক হয়—তারা নৌবিভাগের শিক্ষা লাভ করে। তাই হ'ল। রাজকুমার জর্জ্জ আর তাঁর দাদা এডোয়ার্ড গেলেন নৌশিক্ষা গ্রহণ ক'র্‌তে। রাজার ছেলে, কিন্তু সত্যি শিক্ষা যেখানে সেখানে তো রাজা-প্রজার প্রভেদ নেই—তাই দুই রাজপুত্রের শিক্ষা সুরু হ'ল সাধারণের মতই। সেই ভোর বেলা থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত

হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—রাত্রিটুকু বিশ্রাম, তাও বা কখনো হয়ত পেছল ডেকের ওপর বা মাস্তুলের ওপর ভর দিয়ে চোখে দূরবীণ্ লাগিয়ে সারা রাত্রি কাটিয়ে দিতে হ'ত। সবল দেহ, অসীম সাহস, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা জর্জ্জকে ক'রে তুল্‌ল প্রিয় নৌবিভাগে।

নাবিক-বেশী রাজকুমার জর্জ্জ

এর পর জর্জ্জ তাঁর নৌবিদ্যা সম্পূর্ণ করার জন্যে জলপথে ভ্রমণ আরম্ভ কর্‌লেন। দেশের পর দেশ তিনি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন রাজা এত ভ্রমণ করেন নি। একদিকে তাঁর নাবিক-জীবনের অভিজ্ঞতা হ'তে লাগ্‌ল, আর অপর দিকে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা এবং সম্প্রদায়ের লোকের সংস্পর্শে এসে মানুষের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌তে লাগলেন। একদিকে যেমন জনমুখর ও জলমুখরের ভেতর দিয়ে সময় কাট্‌ত, তেমনি আবার কাট্‌ত নির্জ্জন বনপ্রান্তে—ফুল তুলে, শিকার করে, গাছপালা লাগিয়ে। বহুদিন পরে তিনি রাজা হয়ে সেই সব জায়গায় যান এবং নিজের হাতে লাগান গাছের তলায় বিশ্রাম লাভ করেন।

যুবরাজ জর্জ্জ যখন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ হ'লেন তখনও তিনি পূর্ব্বের মতই শিকার কর্‌তেন, নৌবিভাগের সকল বিষয়ের সব খবর রাখতেন। যুদ্ধের সময় তিনি নিয়মিত সৈন্যদের ও নাবিকদের কাছে যেতেন। অনেকবার তিনি অনেক বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানে মন্ত্রীদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে গিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল নাবিক-জীবন, তাই পরে

যদিও তাঁর আর নাবিক হওয়ার সুযোগ ছিল না, তবুও তাঁর আসক্তি কিছু-মাত্র কমে নি।

আশৈশব বিশেষ পরিশ্রম করার অভ্যাস থাকায় তিনি রাজা হয়েও কঠিন পরিশ্রম করতেন—প্রতি দিন তিনি প্রায় আট-দশ ঘণ্টা কাজ করতেন। তাঁর স্মরণ-শক্তি ছিল সত্যিই 'শক্তি'। সব খবর তাঁর নখদর্পণে থাকৃত।

মন্ত্রীরা তাঁর কাছে ভাল ক'রে তৈরী হয়ে যেতে বাধ্য হতেন, কারণ না গেলেই অপ্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা। একবার মন্ত্রীসভার এক সদস্য তাঁর সঙ্গে কোন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। রাজার সঙ্গে বোধ করি সে ভদ্রলোকের কথায় অমিল হচ্ছে, রাজা তাঁর কথাই ঠিক প্রমাণ করার জন্যে বললেন, "ওমুক কাগজে কিন্তু এ রকম মতই লেখা আছে।" মন্ত্রী মশাই চোখ গোল ক'রে বললেন, "হ্যাঁ ঠিক—,কিন্তু—কিন্তু সে যে আজ বিকেলে পেশ করা হয়েছে মাত্র"। রাজা হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমি সন্ধ্যার সময়েই কিন্তু তা পড়ে নিয়েছি।" এই কার্য্যকুশলতাই তাঁকে এত উচ্চ স্থান অধিকার করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। যখন তিনি রাজা হন্ তখনকার প্রধান মন্ত্রী বিশেষ শঙ্কিত হয়ে ছিলেন কারণ ইংল্যাণ্ডের ভেতর তখন রাজনৈতিক বিবাদ চলছে পূরো দমে। কিন্তু নতুন রাজা ঠিক সামলিয়ে নিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার এবং কার্য্য-কুশলতার সাহায্যে।

তাঁর দায়িত্বমিশ্রিত কঠিন পরিশ্রমের পরিচয় আমরা আরো পাই মহাযুদ্ধের সময়ে। প্রথমে তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন—সর্ব্বদা শান্তিই ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু যখন যুদ্ধ করা ছাড়া আর উপায় রইল না, তখন তিনি তাঁর কায়মন সব সঁপে দিলেন তা'তে। মাঝ-রাত্রে ঘুমের পরিবর্ত্তে তাঁকে নৈশ পোষাকে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়েছে। সময়ে-অসময়ে সৈন্যবেশে সেনাশিবিরে গিয়েছেন; কারণ সেনারা বল পায় রাজার দর্শনে, তাঁর উৎসাহদীপ্ত মুখ দেখে।

শৈশবে নৌশিক্ষার সঙ্গে জর্জ্জের আর এক শিক্ষা হয়েছিল অলক্ষিতে, সেটা হচ্ছে সাধারণের সঙ্গে সাধারণের মত মেশা। যে শিক্ষা অলক্ষিতে একদিন ছিল সেই শিক্ষাই পরজীবনে আত্মপ্রকাশ ক'রে সম্রাট্ জর্জ্জকে ক'রে

তুল্ল প্রজাদের অতি আপন। এর প্রমাণ তাঁর জীবনের প্রতি দিনেই পাওয়া যায়। ৪ঠা আগষ্ট; রাত্রি বেলা। প্রজারা রণোল্লাসে এসে রাজপ্রাসাদ ঘিরে দাঁড়াল। ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করেছে—প্রজারা এখন রাজার পাশে দাঁড়াতে চায়! চার বছর পরের কথা। রাজপ্রাসাদ মুখর হয়ে উঠ্ল ক্লান্তি-জড়িত তৃপ্তির নিঃশ্বাসে। মহা-যুদ্ধ আজ থেমেছে। প্রজারা আজ নিঃস্ব, অক্ষম, তাই তারা এই দুঃখের দিনে এসেছে তাদের রাজার পাশে।

বর্ত্তমান সম্রাট্—মহাযুদ্ধের সময়কার চেহারা।

আবার আর এক রাত্রে প্রজারা বরফে অর্দ্ধ-সমাহিত প্রাসাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে, সেদিন রণোল্লাসের বদলে ছিল তাদের বুকে কাতর মিনতি ভগবানের পায়ে—তাদের রাজার আরোগ্য-কামনা। রাজা সেদিন শঙ্কটাপন্ন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী।

আর একদিনের কথা—রাজপ্রাসাদের সম্মুখে অগণিত লোক, আনন্দোল্লাসে পাগল। তারা এসেছে জর্জ্জকে শুভেচ্ছা জানাতে, তাঁর 'রজত-জয়ন্তীতে'। এ তাদের মহোৎসব। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এলেন ঠিক তাদের আপনার জনের মতই তাদের মধ্যে। কম রাজার পক্ষেই এতটা জনপ্রিয়তা ঘটে থাকে।

ঠিক এম্নি আর এক দিনে মুখর নগরী হয়ে গেল নীরব, শঙ্কিত। মৃত্যুর কালছায়া তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা সহরে, লোকের মুখে, লোকের মনে। জর্জ্জের তখন শেষ সময়। আবার সেই মিনতি-ভরা প্রার্থনা নিয়ে লোকসমুদ্র রাজপ্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে।

এম্‌নি ক'রে প্রজারা তাদের রাজার সঙ্গে সুখের দিনে, দুঃখের দিনে বরাবর পার্শে ছিল। আর রাজার জীবনের ব্রত ছিল প্রজার সেবা, প্রজার মঙ্গল—তাদেরই উন্নতি ছিল রাজার একমাত্র কাম্য।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

(১৪)

য়্যাক্‌সিডেণ্ট

হুকা-কাশির কাজ অনেকখানি সরল হইয়া পড়িল। ষ্টেশনে সলিল না আসিলে হয়তো তাঁহাকে অনেকখানি কৌশলের জাল বিস্তার করিতে হইত, সুনিপুণ দাবা-খেলোয়াড়ের মত এক-একটি চাল চালিয়া ধীরে ধীরে রহস্যের মূলে অগ্রসর হইতে হইত। এখন কিন্তু ব্যাপারটা অনেক সহজ হইয়া গেল, কেননা ঠিক এই সময়েই সলিলের মধুপুরে আসিয়া হাজির হওয়া একটা আকস্মিকের বস্তু নয় নিশ্চয়ই, ফটোচুরির সঙ্গে ইহার যোগাযোগ অবশ্যই আছে। এখন কেবল প্রয়োজন তাহার গতিবিধির উপর নজর রাখা।

প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়াই সলিল একটা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিল। হুকা-কাশি অবশ্য সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে অন্তরালে রাখিয়াছিলেন কিন্তু উহারই মধ্যে আসল জ্ঞাতব্যটুকু জানিয়া লইতে তিনি ত্রুটি করেন নাই—সলিলের গন্তব্যস্থান 'লিণ্টন নার্সিং হোম'। গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিতেই এইবার তিনি গাড়োয়ানের ভীড়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন। উপর খোলা হাল্‌-ফ্যাসানের ফিটন গাড়ী, এমন কি ট্যাক্সিও ছিল প্রচুর—কিন্তু সে সবের দিকে দৃষ্টি না দিয়া বাছিয়া বাছিয়া শেষটায় তিনি পছন্দ করিলেন একখানা চারিদিক্‌ বন্ধ পাল্কী গাড়ী। গাড়োয়ানকে বলিলেন—একটু খাটো গলায়—"ওই যে ফিটন গাড়ীখানা যাচ্ছে দেখ্‌ছ, ঠিক ওর পেছন পেছন যেতে হবে; ছাড়িয়ে গেলে চল্‌বে না কিন্তু। ঠিক মত কাজ কর্‌তে পারলে তোমায় আমি খুসী করে দেব। কেমন পারবে ?"

গাড়োয়ান ঘাড় নাড়িয়া জানাইল পারিবে; হুকা-কাশি সুটকেস বগলে করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন এবং উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাখী তুলিয়া সমস্তগুলি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে লিণ্টন নার্সিং হোমের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল, গাড়োয়ান হাঁকিয়া কহিল, "নামিয়ে হোজুর, দোস্‌রে গাড়ীকি বাবুজী উতার গয়ে।" বলিতে বলিতে সে নিজেই নামিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজাটি খুলিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

সুটকেস্‌ হাতে ঝুলাইয়া গাড়ী হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছেন কে এ ব্যক্তি? গাড়ী যিনি ভাড়া করিয়াছিলেন এ তো সে ব্যক্তি নয়! এ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোক এবং বয়সেও অনেক বড়। সে সমানে গাড়ী হাঁকাইয়া আসিয়াছে, পথের মাঝখানে একবারও থামে নাই; তদুপরি তাহার দোস্ত আগাগোড়া পিছনের 'ক্যারিয়ার'টির উপর দাঁড়াইয়া ছিল। এ সব সত্ত্বেও আসল লোকটি কি করিয়া উধাও হইয়া গেল এবং এই নবাগত উড়িয়া আসিয়া তাহার জায়গায় জুড়িয়া বসিল তাহা বেচারার বুদ্ধির একেবারেই অগম্য। বোধ করি কথা বলার চেষ্টাও সে একটা করিয়া থাকিবে কিন্তু নবাগত তাহাকে সে অবসর একেবারেই দিল না, তাড়াতাড়ি পাঁচ টাকার একটা নোট তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "তোমার তো বাপু বক্‌শিস্‌ পাওয়া নিয়ে কথা, তা যিনি গাড়ী ভাড়া করেছিলেন তিনিই দিন, আর আমিই দিই। এই নাও, এক টাকার জায়গায় তার পাঁচ গুণ ভাড়া পেলে, এবার বোধ করি খুসীমনেই বাড়ী ফির্‌বে।"

খুসী হয় নাই, এ কথা বলিবার উপায় ছিল না, গাড়োয়ান নিজের মনে কি সব বিড় বিড় করিতে করিতে কোচ-বক্সের উপর গিয়া উঠিয়া বসিল, গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল।

নার্সিং হোমের চত্বরের ভিতরে, হাসপাতাল-বাড়ীর সম্মুখে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া মখমলের মত সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ লন, ঠিক তার মধ্যখানে প্রকাণ্ড এক

টেবিলের উপর দেশী বিলাতী নানান্ রকমের পত্রিকা। অনেকগুলি ডেক্‌চেয়ার টেবিলের চারি ধারে সাজান রহিয়াছে ; যে সমস্ত রোগী এখন আর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া নাই বিকালের দিক্‌টায় তাহারা এখানে মুক্ত বাতাসে আসিয়া বসে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্পগুজব করে। সাহেব, বাঙ্গালী, ফিরিঙ্গি অনেকেই এখানে বসিয়া ছিল, সলিল অগ্রসর হইতেই দলের ভিতর হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল "এই যে ছোট মামা আসুন, এদিকে এদিকে !"

সলিল তাড়াতাড়ি একটি যুবকের দিকে আগাইয়া গেল, কহিল, "কি করে য়্যাক্‌সিডেন্ট্ হল অনিল ? উঃ, কি ইলাবরেট্ ব্যাণ্ডেজ ? তবু ভাল যে বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেখ্‌ছি না—টেলিগ্রাম পেয়ে ভাবনায় আর বাঁচি না।......"

"বড় মামাকে এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ কিছু বলেন নি ত ?" কথা কয়টি বলিতে বলিতেই বক্তার মুখ যেন গম্ভীর এবং কঠিন হইয়া উঠিল।

"না এখনও বলা হয় নি, তবে···"

"বলেন নি ভালই করেছেন, ভবিষ্যতে বল্‌বেনও না। যিনি নিতান্ত অবিচার করে আমার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছেন, ইহজন্মে আমার মুখ দেখ্‌বেন না বলে তাঁর বাড়ী থেকে বার হয়ে যেতে বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমারও আর কোন সম্পর্ক নেই। আমার সুখদুঃখ কোনটারই তিনি ভাগী হন এ আমি চাইনে। আমি তাঁর আত্মীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি, লোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলি, আমার মাত্র দুই মামা ; আপনি আর মেজ মামা।"···

বাধা দিয়া সলিল কহিল, "আহা-হা অনিল, ওসব কথা এখন থাক্, তুমি এ অবস্থায় অতটা উত্তেজিত হ'য়ো না।···কি করে তোমার এ য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ হল ধীরে ধীরে আমায় তাই বল শুনি। গাড়ীর দরজাটা বুঝি ভাল করে না আট্‌কিয়েই ঠেসান দিয়েছিলে ? ওটা বুঝি বাইরে থেকে খুল্‌ত ?"

"না ছোট মামা, ঠেসান আমি দিই নি, আমায় চলতি গাড়ী থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল।"

রুদ্ধকণ্ঠে সলিল বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, কে ধাক্কা মার্‌লে ?"

"সে কথা গুছিয়ে বলতে হলে অনেক-কিছুই বলতে হবে।···শ্রীপুরে

আপনি তো ষ্টেশনে এসে তুলে দিয়ে গেলেন ; হাওড়াতে এসে দেখি ট্রেনে বিষম ভীড়। শ্রীরামপুরে পৌঁছুতেই কিন্তু গাড়ী অনেকটা হাল্কা হয়ে এল, তার পর চুঁচ্‌ড়োয় আস্‌তেই কামরা একেবারে ফাঁকা—প্যাসেঞ্জার শুধু একা আমি। আপনার কাছ থেকে যে নভেলখানা চেয়ে এনেছিলাম এইবার সেটা খুলে বস্‌লাম কিন্তু মন বইয়ে বস্‌তে চাইল না। ওদিকে আবার পাশের কামরাটাতে উজবুক্ রামাটাকে তুলে দিয়েছি, কুষ্মাণ্ড কখন কি করে জানি না ! দু'গাড়ীর মাঝে একটা জান্‌লা ছিল, মাঝে মাঝে তা'তে চোখ রেখে রামাকে দেখ্‌ছি। রামা ঝিমোচ্ছিল—অনেকেরই প্রায় সেই অবস্থা—একটা লোক কেবল চাদরে মুখ ঢেকে ঠায় বসে ছিল আর যতবার আমি জান্‌লার গায়ে চোখ লাগাচ্ছি ততবারই মিট্ মিট্ করে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল। একটু বাদেই ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন এসে পড়্‌ল, লোকটা দেখি জলের কুঁজো হাতে দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—অবশ্য আমার দিকে পেছন ফিরে। গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় হঠাৎ দেখি আমার কামরায় এসে উঠ্‌ল রণজিৎ রায়।"

"কে ?". সলিল সোৎকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

"ফুট্‌বলার রণজিৎ রায়, হুকা-কাশির সঙ্গে যিনি বারকয়েক চিনির কলে এসেছিলেন। ময়দানে অনেক খেলায় নাম্‌তে দেখেছি, ও চেহারা তো ভুল কর্‌বার কথা নয় ! একটু একটু করে আলাপ সুরু হ'ল ; যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়—শ্রীপুরের নাম উঠ্‌তেই বড় মামার প্রসঙ্গ তুলে উনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে কিনা। যদি আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তেন তো সে স্বতন্ত্র কথা হ'ত, কিন্তু বড় মামার কথায় আমার মেজাজ ঠিক থাকে না তাতো জানেনই, স্রেফ্ বলে দিলাম—'না'। ক্রমে সন্ধ্যা, তার পর রাত্তির হয়ে এল, রণজিৎ বাবু শুয়ে পড়্‌লেন, আমিও আলো নিভিয়ে একটু গড়াগড়ির চেষ্টা দেখ্‌লাম। কিন্তু আমার বার্থটাতে ছিল অসম্ভব রকম ছারপোকার উপদ্রব, তাই খানিকটা বাদে উঠে রণজিৎ বাবুর বেঞ্চি ডিঙ্গিয়ে ওপাশের আর একটা বেঞ্চিতে গিয়ে গা ঢেলে দিলাম।

"অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে আছি, তন্দ্রার ঘোরে চোখ বুঁজে আস্‌ছে এমন

সময় টের পেলাম সেই চল্‌তি গাড়ীর মধ্যে কে একজন আমাদের কাম্‌রায় ঢুকেছে।

"গোড়াতে আমি যে বেঞ্চিটাতে শুয়ে ছিলাম লোকটা প্রথমতঃ সেই দিকেই এগোচ্ছে দেখতে পেলাম; তার পর হঠাৎ ঘুরে রণজিৎ বাবুর দিকে পিছিয়ে এসে তাঁর জামার ওপর আস্তে আস্তে হাত রেখে রেখে কি যেন অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। ঠিক তার পরের মুহূর্ত্তেই দেখি কিনা পকেটমারের মত নিপুণ হাতে কি একটা জিনিষ ওঁর জামার ভেতর থেকে ও টেনে বার কর্‌ছে। ভাবে-ভঙ্গীতেই লোকটার স্বরূপ বুঝে নিয়েছিলাম, ও জিনিষটা যে রণজিৎ বাবুর মাণিব্যাগ্‌ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রইল না। আর দেরী করা উচিত হবে না মনে করে আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল, পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে হেঁচকা টানে ওর হাত থেকে রণজিৎ বাবুর জিনিষ কেড়ে নিলাম, তার পরেই ধর্‌লাম গায়ের জোরে ওকে জাপ্‌টে। বেশ বুঝ্‌লাম লোকটা দারুণ চম্‌কে গেছে। কিন্তু সে শুধু এক নিমেষের জন্যে, পরমুহূর্ত্তেই বেড়াল যেমন নেংটি ইঁদুরকে অক্লেশে তার গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় ঠিক তেম্‌নি ভাবেই আমাকে ও ঝেড়ে ফেলে লোহার সাঁড়াশীর মত পাঁচটা আঙ্গুল দিয়ে সবলে আমার টুঁটি চেপে ধর্‌ল। গলা দিয়ে রা' বার করব কি, মনে হল সমস্ত শরীর আমার অবশ, নিঝুম হয়ে আস্‌ছে। অন্ধকারের ভেতর বাঘের চোখের মত ওর চোখ দু'টো তখন ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করে জ্বলছে। বাঁ হাতে একটা টর্চ্চ জ্বেলে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল; আমার চোখ ধেঁধে গেল, তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজে ফেল্লাম। তার পরেই লোকটা খোলা দরজার সামনে আমায় ঠেলে এনে এক ধাক্কায় চল্‌তি ট্রেন থেকে বাইরে ফেলে দিলে।"

সলিল আতঙ্কে দুই চোখ বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "উঃ।"

"ছিট্‌কে গিয়ে তারের বেড়ার ওপর পড়্‌লাম এইটে শুধু মনে আছে, তার পর পাঁচ সাত মিনিট কি যে করে কেটে গেল সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। ঘোরের ভাবটা একটু কেটে গেলে আশ্চর্য্য হলাম এই দেখে যে তখনও বেঁচে আছি।

পৃথিবীতে রোজই কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা ঘট্‌ছে লোকের মুখে শুন্‌তে পাই, খবরের কাগজেও হামেশা পড়ি, কিন্তু নিজের জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা এই আমার প্রথম। চল্‌তি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে এত সামান্য চোট্‌ও মানুষে পায়? অবশ্যি প্রথমটায় মনে হল, গোটা জীবনটাই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল, চিরটা কাল পঙ্গু হয়েই কাটাতে হবে, কিন্তু পরে টের পেলাম চোট যা কিছু গুরুতর হয়েছে সেটা পায়েই, নইলে শরীরের অন্যান্য জায়গায় যে সব ছড়ে গেছে দিন কতক ভাল মত ওষুধ লাগালেই তার ঘা মিলিয়ে যাবে। না না না, কি বল্‌ছেন, হাঁট্‌ব কি করে? দেখ্‌ছেন না চেয়ারের পায়ে চাকা লাগান আছে—বেয়ারারা ঠেলে নিয়ে এসেছে আবার সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে চালান দেবে। হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম—ঘুরঘুটি অন্ধকার, পাঁচ হাত দূরের লোকও নজরে আসে না, তারই মাঝখানে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাৎরাতে লাগ্‌লাম, চেঁচিয়ে গলা ভেঙ্গে ফেল্লাম, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, সেই তেপান্তরের মাঠে কে আর আমার জন্য বিছানা-বালিস নিয়ে বসে আছে! ক্রমে ভোর হয়ে এল, জনাকয়েক সাঁওতাল এগোচ্ছে দেখা গেল। তখন হল আবার আর এক নতুন বিপদ্—আমার অবস্থা দেখে ও-বেচারাদের শুশ্রূষা কর্‌বার আগ্রহ রয়েছে পূরো মাত্রায় কিন্তু ওদেরকে কথা বুঝিয়ে বলে কার সাধ্য? গোল পাকাতে পাকাতে বেলা যখন প্রায় সাড়ে আট্‌টায় গড়িয়েছে তখন অনেকটা দূরে দেখ্‌লাম—বোধ হয় রেল্‌ কোম্পানীরই কোন সাহেব হবে, অনেকগুলো কুলীর সঙ্গে ট্রলিতে চড়ে আমাদের দিকে আস্‌ছে। সাঁওতালের দল সবাই মিলে হল্লা করে সাহেবকে থামিয়ে আমার কাছে নিয়ে এল। সাহেবকে সমস্ত কথা খুলে বল্‌তে সে বল্লে, "তোমাকে এখন ফার্ষ্ট্‌ এড্‌ দেওয়া হচ্ছে সব চাইতে আগে দরকার, তার পর রেল্‌ওয়ে এ ব্যাপারের তদন্ত কর্‌বে। কাছেই মধুপুর ষ্টেশন, চল ট্রলিতে করে সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তার পর এখানে এসে পৌঁছেছি। এত যে কাণ্ড ঘটে গেল, তার গোড়াতেই কিন্তু রয়ে গিয়েছিল একটা প্রকাণ্ড গলদ্‌। ও ব্যাটা রণজিৎ বাবুর পকেট থেকে যা সরিয়ে নেবার মৎলব কর্‌ছিল এবং যাকে মাণিব্যাগ্‌ ভেবে আমি

এগিয়ে এসেছিলাম, আসলে কিন্তু মাণিব্যাগ-টানিব্যাগ কিছুই তা নয়, একটা অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষ যা হারালে রণজিৎ বাবুর বিশেষ কোনই ক্ষতি হত বলে মনে হয় না। একটা ফটো।"

"য়ঁ্যা? ফটো? কিসের ফটো? দেখি!" সলিল এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া উঠিল। অনিল একটু বিস্ময়ের সহিত সলিলের দিকে তাকাইয়া কহিল, "সে ফটো তো এখন আমার কাছে নেই! রণজিৎ বাবুর ফটো তাঁর কাছেই পাঠান উচিত, কিন্তু তাঁর নিজের ঠিকানা জানিনা বলে এখানকার সুপারভাইজার ডক্টর জোন্স্‌কে অনুরোধ করেছি তিনি যেন মিঃ হুকা-কাশি ডাফ্ ষ্ট্রীট্—এই ঠিকানায় সেটা পাঠিয়ে দেন। হুকা-কাশির কাছে ফটো পৌঁছুলে নিশ্চয়ই রণজিৎ বাবু তা পাবেন।"

"ওঃ" বলিয়া সলিল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে মনে হইল কি একটা চিন্তায় যেন সে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। অনিল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি ভাব্‌ছেন কি ছোট মামা? হুকা-কাশিকে ফটো পাঠালে রণজিৎ বাবু তা পাবেন না এ কথা মনে কর্‌বার তো কোনই হেতু নেই—ওঁরা দু'জন যে একেবারে অভেদাত্মা!"

"না না, সে কথা নয়; আজকেই আমায় শ্রীপুর ফির্‌তে হবে, তোমাকেও সেই সঙ্গে নিয়ে যাব কিনা তাই ভাব্‌ছি।"

অনিল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, কহিল, "অসুখের সময় মনটা কেমন যেন একটু দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পেতে চায়। আপনাদের পাঁচ জনকে কাছে পাব, মেজমামাকে সেই ছেলেবেলা দেখেছি, তার পর দশ বছর দেখা শুনা নেই—পরশু দিন তিনি দেশে ফির্‌ছেন, তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে—এ সব ভেবে এক একবার যেতেই ইচ্ছে কর্‌ছে। কিন্তু উঠ্‌তে তো হবে গিয়ে সেই বড় মামারই বাড়ীতে?"

"তুমি কিন্তু একটা মস্ত ভুল কর্‌ছ অনিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর অসুখে ভুগে ভুগে বড়দার ভেতরটা এখন অনেক মোলায়েম হয়ে এসেছে। তুমি গেলে বিরক্ত তো তিনি হবেনই না, বরং আদর করে কাছে টেনে নেবেন।"

"তা হয় না ছোটমামা, ভাঙ্গা কাচ কখনো জোড়া লাগে না; আর তা ছাড়া ডক্টর জোন্সও এ অবস্থায় আমার যাওয়াতে কিছুতেই মত দেবেন না।"

"অবশ্যি ডাক্তার যদি সে রকম বলেন তবে তাঁর কথার ওপর আমার আর কিছুই বল্‌বার নেই।"

"আরও সপ্তাহখানেক আমি এখানেই থাকি, তার পর বরং আপনাকে খবর দিলে আপনি এসে নিয়ে যাবেন। উঠ্‌ব কিন্তু আমি কল্‌কাতায় জ্যাঠামশায়ের বাড়ীতে।"

আরও কিছুক্ষণ এই ভাবে কথাবার্ত্তা চলিবার পর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল; রোগীদের এইবার নিজের নিজের ঘরে স্থানান্তরিত করা হইবে। সলিল উঠিয়া পড়িল। তিন ঘণ্টা পরে কলিকাতা ফিরিবার একখানি গাড়ী আছে, এ সময়টা সে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে কাটাইবে।

ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে পৌঁছিয়াই সলিল একটা ইজিচেয়ারের উপর চক্ষু বুঁজিয়া সটান শুইয়া পড়িল; হাজারো রকমের চিন্তা আসিয়া তখন তাহার মস্তিষ্কে ভীড় জমাইয়াছে। এই ভাবে কতটা সময় যে কাটিয়া গেল সে সম্বন্ধে তাহার কোনই ধারণা ছিল না, হঠাৎ দরজার সম্মুখে লোকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে সচেতন হইয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্তপরেই চাহিয়া দেখে একজন পুলিশ-অফিসার কয়েকজন সিপাহী সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন। সলিলের নিকটে আসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সলিল বাবু আপনি?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমার সঙ্গে আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে; আপনার নামে অভিযোগ আছে।"

সলিলের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল, "আমার নামে অভিযোগ? কে কর্‌লে? আপনি কি আমায় গ্রেপ্তার কর্‌তে এসেছেন? কিন্তু..."

বাধা দিয়া পুলিশ-অফিসার বলিলেন, "না গ্রেপ্তার আপনাকে এখনও করিনি, থানায় যেতে বল্‌ছি মাত্র। আপনার পরিচয় আমরা জানি, কিন্তু আপনিও

বোধ হয় জানেন, আইনের চোখে ছোটয় বড়য় কোন ভেদ নেই!……ষ্টেশনের গেটেই আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।” (ক্রমশঃ)

চিত্রশালা

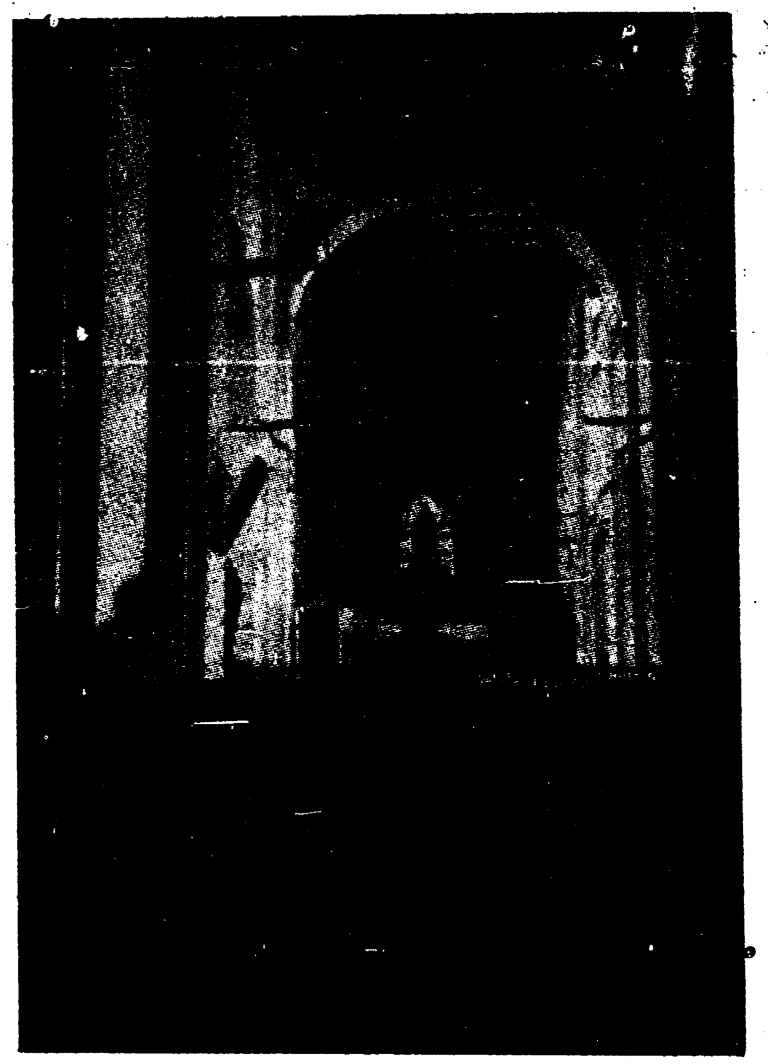

এই গীর্জ্জাটি পর্ত্তুগীজদের। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাণ্ডেলে এটি তৈরী হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে সম্ভবতঃ এইটিই সব চেয়ে পুরানো গীর্জ্জা।

ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জার উপাসনাগার
(আলোকচিত্র-গ্রহীতা শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র)

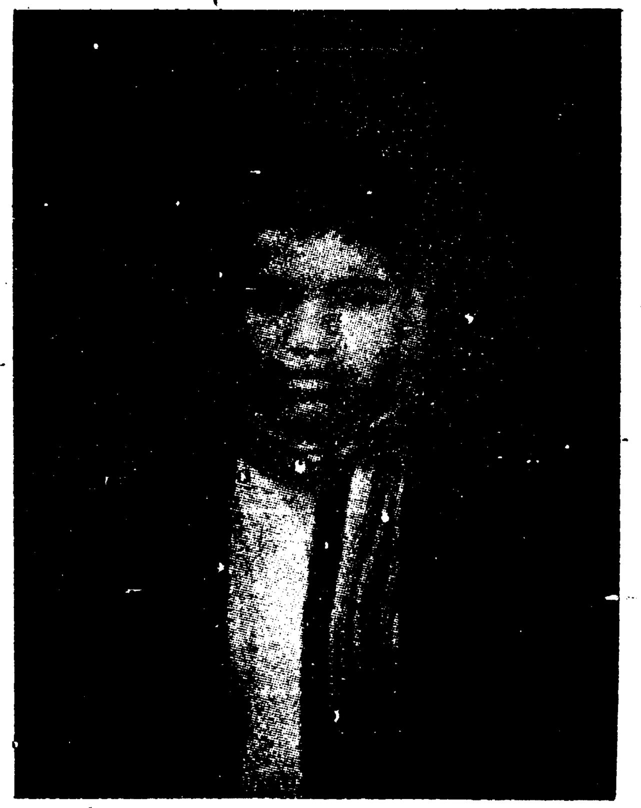

শ্রীমান্ যমুনাবিহারী মিত্র

শ্রীমান্ যমুনাবিহারী মিত্র রামধনু-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় গল্পের জন্য পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহার গল্প গত সংখ্যার রামধনুতে বাহির হইয়াছে। গল্প-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় অপর পুরস্কারপ্রাপ্ত কুমারী রুবী চাটার্জ্জির লেখা ও ছবি এ সংখ্যায় ভাবী-সাহিত্যিকের বৈঠকে প্রকাশিত হইল। শ্রীমান্ পিনাকীশঙ্কর সেনের কবিতাও ঐ বিভাগে বাহির হইল। তাঁহার ছবি আমরা পাই নাই।

সম্পাদকের বিপদ্

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি)

নীরেন মিত্র বহু কাল থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গল্প লিখে আস্‌ছে। এত মিষ্টি করে, এত চমৎকার করে ছোটদের মন-ভোলানো গল্প লিখতে পারে সে যে ছেলেমেয়েরা নীরেন মিত্রের লেখা গল্প পড়বার জন্য পাগল। যে মাসিকপত্রে নীরেন গল্প লিখতে আরম্ভ করে সে মাসিকপত্রের গ্রাহক-সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

নীরেনের বহু দিন থেকে ইচ্ছা যে সে নিজে বেশ ভাল দেখে মনের মত একটা ছোটদের মাসিকপত্র বার করে। কেবল টাকার অভাবে তার এত দিনের ইচ্ছাটা সে কাজে পরিণত কর্‌তে পারছিল না।

কিন্তু সেই টাকার অভাবটাই হঠাৎ গেল কেটে। ভগবান্ যখন দেন তখন মাটী ফুঁড়ে টাকা ওঠে। নীরেনের ভাগ্যেও ঘট্‌ল তাই। তার বড় মামার ছিল না ছেলেপিলে—কিন্তু ছিল মস্ত একটা প্রেস আর বেশ কিছু টাকা। হঠাৎ তাঁর হ'ল কঠিন অসুখ, অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচান্ গেল না। মরবার সময় সব কিছু তিনি নীরেনের নামে লিখে দিয়ে গেলেন। প্রেস এবং টাকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে বার কর্‌লে চমৎকার ছোটদের এক মাসিক-পত্র—নাম হ'ল তার 'মিতালি'।

ছোটদের গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায় যে ক'জনের হাত বেশ পাকা—তা'দের সকলকে লেখা পাঠাবার জন্য নীরেন অনুরোধ করে পাঠাল। নীরেন শিশু-সাহিত্যের রাজা—তার অনুরোধ কেউই উপেক্ষা কর্‌তে পারে না; সকলেই তা'দের সাধ্যমত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লিখে পাঠাল।

প্রথম মাসের 'মিতালি' যখন বা'র হ'ল তখন সকলে অবাক্ হয়ে গেল—এতগুলি নাম করা ভাল লেখকের লেখা একই মাসিক-পত্রে! এদের যে কোনও একজনের লেখা যে কোনও মাসিক-পত্রে বার হ'লে যে হু হু' করে তার কাট্‌তি বেড়ে যায়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সে কি আনন্দের সাড়া! কয়েক দিনের মধ্যে 'মিতালি'র গ্রাহক-সংখ্যা সব মাসিকের গ্রাহক-সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেল।

নীরেনেরও সে কি আনন্দ! এত দিনে তার আশা সফল হ'ল। নীরেনের আজকাল আর কোনও কাজ নেই—দিন রাতি সে কেবল 'মিতালি' নিয়েই মস্‌গুল।

আদিত্য রায় নীরেনের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধু। আদিত্য চমৎকার হাসির গল্প লেখে—মানে লিখতে পারে। লেখা সম্বন্ধে ওর মত অত বড় কুঁড়ে ভূ-ভারতে জন্মায় নি; কুঁড়েমির জন্য 'নোবেল প্রাইজ' থাক্‌লে ও নিশ্চয় সেটা সকলের আগে পেত। নীরেন তার কাছ থেকে গল্প চেয়ে চেয়ে হতাশ হয়ে গেছে, শেষে নিরুপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সেই প্রথম সংখ্যায় একটা গল্প দিয়েছিল আর তার পর আট সংখ্যা মিতালি বার হয়ে গেল তবু কিছুতেই আর একটা গল্প তার হাত দিয়ে বার করান গেল না! পর পর কয়েকখানা চিঠি লেখার পর নীরেন কিছু দিন হ'ল চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছে।

কিছু দিন—বেশ কিছু দিন কেটে গেছে আরও। আদিত্য সেদিন ভাবলে—যাক্ বাবা, বাঁচা গেল, নীরেনটা বোধ হয় আর গল্পের জন্য তাগিদ দেবে না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। পরের দিন 'চিঠির বাক্স' খুলতেই চোখে পড়্‌ল—বাক্সের একটী কোণে 'মিতালির' ছাপ বুকে নিয়ে একটী লম্বা খাম দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়্‌ল; তার মনে হ'ল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য থেকে যদি পোষ্ট-অফিসগুলো উঠে যায় তবেই লেখার তাগিদ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়, তা নইলে আর নয়।

চিঠিখানা খুলতে খুলতে সে ভাবলে যে এবার নিশ্চয় খুব কষে গালাগালি করেছে নীরেনটা। নাঃ, এবার সে গল্প লিখবেই, নিশ্চয়ই লিখ্‌বে।

চিঠিটা খুলেই প্রথমটা একটু অবাক্ হয়ে গেল চিঠির আয়তন দেখে। এত ছোট চিঠি নীরেন ত' কখনও লেখে না!

যাই হোক, চিঠিটা সে পড়ে ফেল্‌ল এক নিঃশ্বাসে। পড়ে একেবারে বোকা বনে গেল—চিঠিটার কোনও মানে খুঁজে পেল না। একবার, দু'বার, তিন বার পড়ল, কিন্তু কিছুতেই তার কোনও রকম মানে কর্‌তে পার্‌ল না। নীরেন লিখছে—

ভাই আদিত্য, 'মিতালি' মাসিকপত্র বার করা বন্ধ করে দেব ঠিক করেছি। আমার জীবন বিপন্ন। আমাকে লেখকে পেয়েছে—আমার মন এবং শরীর অবসন্ন। এ রকম ভাবে আর কিছু দিন চল্‌লে পাগল হয়ে যাব। একদিন এস ভাই। এর চেয়ে বেশী লিখবার এখন সময়ও নেই, সামর্থ্যও, নেই। তুমি এলে সাক্ষাতে সব কথা হবে।

—তোমার নীরেন।

আদিত্য ভয়ানক ভাবতে লাগ্‌ল; ভাবতে ভাবতে ঘরের কড়িকাঠগুলি সব গুণে ফেল্‌ল, হাতের আঙুল সব ক'টা কামড়ান হয়ে গেল, মাথার চুলগুলো দশ বারেরও বেশী

টানা শেষ হয়ে গেল তবুও কোনও মানে বার কর্‌তে পার্‌ল না সে চিঠির। 'লেখকে পাওয়া' কিরে বাবা? 'ভূতে পাওয়া' শুনেছে ঢের, কিন্তু লেখকে পাওয়া! উঁহু, এ ত' কখনই শোনে নি!

কাপড় জামা পরে বার হয়ে পড়্‌ল সে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে 'বাস' থেকে নাম্‌ল—নীরেনদের বাড়ী থেকে একটু দূরে।

নীরেনের বাইরের ঘরে ঢুকে প্রথমটা সে বুঝতে পার্‌ল না ব্যাপারটা কি! প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন লোক নীরেনের টেবিলের চারিদিকে বসে নীরেনকে ঘিরে ধরেছে।

নীরেনের চেহারা কি ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে! অত্যন্ত রোগা হয়ে গেছে, চোখের কোলে পড়েছে কালী, রং গিয়েছে কালো হয়ে, চুলগুলো রুক্ষ—কত দিন তেল পড়ে নি তার ঠিক নেই।

আদিত্য ঘরে ঢুক্‌তে নীরেনের সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। সে কথা পর্য্যন্ত কইতে পার্‌ল না আদিত্যর সঙ্গে, ইসারায় তাকে বস্‌তে বললে।

আদিত্য একটু দূরে বসে সব লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌ল। সে দেখ্‌লে যে যারা নীরেনকে ঘিরে ধরেছে তা'দের মধ্যে হরেক রকম বয়সের লোক রয়েছে। পাকা চুল, কাঁচা চুল, টাক, বাবরি চুল, সব রকম। কারো গায়ে কোট, কারো গায়ে শার্ট, কারো গায়ে পাঞ্জাবী, চাদর। সকলেই এক সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা কর্‌ছে। নীরেন একবার এর কথায়, একবার ওর কথায় কান দিতে চেষ্টা কর্‌ছে কিন্তু কেউই কারো কথা শুন্‌তে দিচ্ছে না।

পাকা-চুল বল্লেন, 'দেখ বাবা, ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাবটা প্রথম থেকেই জাগিয়ে তোলা উচিত; তাই আমি কতকগুলি স্তব আর স্তোত্র—'

নীরেন বিনীত ভাবে বল্লে, 'দেখুন, ছোট ছেলেমেয়েরা আগে প্রাণ ভরে হাসুক। জানেন ত' মস্ত বড় একজন লোক বলে গেছেন যে যে শিশুদের মুখে এক মুহূর্ত্তের হাসি ফোটাতে পারে সে ঈশ্বরের—'

বাবরি-চুল এবার বাধা দিয়ে মিহি গলায় বলে উঠলেন, 'যা বলেছেন নীরেন বাবু, ছেলেদের গল্প ছেলেদের মতই হওয়া উচিত। তাই ত' আমি ভূতের গল্প লিখে এনেছি। জানেন ত' আমার ভূতুড়ে গল্প ছেলেরা কি রকম—'

নীরেন তাঁকে বাধা দিয়ে বল্‌ল, 'দেখুন, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা একেই ত ভীরুর চরম, মিথ্যে ভূতের গল্প শুনিয়ে তাদের আরও বেশী ভীরু করে তুলবেন না; পারেন ত' এমন কিছু গল্প লিখবার চেষ্টা করুন যাতে ছেলেদের মধ্যে বীরত্ব, সাহস—'

এবার 'চাদর-গলায়' বেশ গম্ভীর স্বরে এবং গর্ব্বিতভাবে বলে উঠলেন, 'নীরেন বাবু,

আপনি আমার লেখা অমনোনীত করলেন কি বলে? আমার লেখার মধ্যে যে কি উচ্চাঙ্গের রসিকতা আছে, তা ভেবে দেখেছেন কি?'

নীরেন বেশ বিরক্ত হয়েই বললে, 'আজ্ঞে, এটা ছোট ছেলেমেয়েদের কাগজ, তারা আপনার অত উচ্চাঙ্গের রসিকতা বুঝতে পারবে না। শুধু ছেলেমেয়েরা কেন, তাদের বাবারাই যদি আপনার ঐ উচ্চাঙ্গের রসিকতা বুঝতে পারে তা হ'লেই ছেলেমেয়েদের ঠাকুরদার ভাগ্যি—'

এবার বেঁটে মত একটা কালো ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন, আপনি আমার লেখা নিতে চান না, কিন্তু অন্য শিশুদের পত্রিকায় আমার লেখা কি রকম আদর করে নেয় তা জানেন? আমি ইংরাজিতে এম্, এ—ফার্ষ্ট্ ক্লাশ ফার্ষ্ট্—যথেষ্ট পড়াশুনা করা হয়েছে।'

নীরেন বললে, 'ক্ষমা করবেন বিনয় বাবু, ঠিক এম্-এ ফার্ষ্ট্ ক্লাশ ফার্ষ্ট্ দেখে আমরা লেখা নিই না। যাঁদের সত্যিকারের লিখবার ক্ষমতা আছে তাঁদেরই লেখা আমরা সাগ্রহে চেয়ে পাঠাই—'

এবার বছর পনেরোর একটা ছেলে বললে, 'স্যর, আমার লেখাটা?' নীরেন বল্লে, 'তোমার লেখা কিছু হয় নি, আগে লিখতে শেখ, তার পর কাগজে ছাপিও—'

'স্যর, তা' হ'লে কাল আর একটা লেখা নিয়ে আসব?'

নীরেন রেগে উঠে বল্লে, 'না না তোমার মত কাঁচা লেখা আমরা ছাপাব না—'

এবার টাক-মাথা বলে উঠলেন, 'বাবা নীরেন, আমি তোমার ৺পিতৃদেবের পরম বন্ধু ছিলাম; আমার লেখাটা?'

নীরেনের মুখ রাগে, বিরক্তিতে বিশ্রী হয়ে উঠেছে; এবার বোধ হয় সে কেঁদে ফেলবে, মানুষের আর কত সয়? সে করুণভাবে বল্লে, 'দেখুন, আপনি আমার বাবার বন্ধু হ'তে পারেন সব পাঠকদের বাবাদের ত' বন্ধু নন! তারা আপনার লেখা পড়তে চাইবে কেন যদি না আপনার লেখা ভাল হয়?'

পাকা-চুল আবার সুরু করলেন, "কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ, ভেবে দেখ শৈশবকাল থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মভাব জাগান উচিত, নইলে দেশ উন্নত হ'তে পারবে না—"

আবার সকলে সুরু করলে নতুন করে।

শেষকালে অনুনয়-বিনয়, অভিযোগ-অনুযোগ, এমন কি গালি-গালাজ পর্য্যন্ত আরম্ভ হয়ে গেল প্রায়।

আদিত্য দেখলে সর্ব্বনাশ, এরা ত' কেউ উঠবার নাম করে না, বেলা প্রায় একটা বাজে যে! এরা কি নীরেনটাকে পাগল করে দেবে, না মেরে ফেলবে? সম্পাদক হওয়ার এ কি বিপদ রে, বাবা!

আদিত্য আর বসে থাকতে পারল না, উঠে বাড়ীর ভিতর চলে গেল, বলে গেল, 'নীরেন, তোমার কাজ শেষ হ'লে ভিতরে এস—আমি একটু কাকীমার সঙ্গে দেখা করি গে।'

নীরেন কি ব্যাকুল ভাবে তাকাল আদিত্যর দিকে। তার মনের ভাবটা যেন—আদিত্য তার এত বড় বন্ধু হয়ে এই বিপদের মধ্যে ফেলে সরে পড়ল!

খানিকক্ষণ কেটে গেছে, সম্পাদকে আর লেখকে ঠিক একই ভাবে বাকবিতণ্ডা চলেছে—হঠাৎ ভিতর থেকে ছোট মেয়ের গলায় একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেল, "মা গো, বাবা গো! পুড়ে গেলাম—'

আরও দু-একটা ছেলেমেয়ের ভয়ার্ত্ত চীৎকার তার সঙ্গে শোনা গেল।

আদিত্য তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এসে বল্লে, "নীরেন, শীঘ্রি ভিতরে এস, মিনু পুড়ে গেছে—"

ছেলেমেয়ে পুড়ে যাওয়ার সংবাদ পাওয়ায় বাপের মুখের চেহারা অনেক রকম ভাবে বদলাতে দেখা গিয়েছে কিন্তু নীরেনের মুখের চেহারা যা বদলা'ল তা কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারে না। তার মুখের চেহারা বদলে গেল বটে কিন্তু দুঃখে বা ভয়ে নয়, মহা তৃপ্তিতে, আনন্দে। মেয়ে পুড়লে সারতে পারে কিন্তু লেখকে ধরলে যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ যে ছাড়ে না—

ভিতরে চলে গেল সে; আদিত্য সকলকে বল্লে, 'আজ আর নীরেন বাবু এখন আসতে পারবেন না, আপনারা তা'হলে আজ—'

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা কাল আসব আবার" বলতে বলতে সকলে বার হয়ে গেল।

একটু পরে নীরেন বাইরে এসে বল্লে, "কই হে আদি, মিনু পোড়ে নি ত'!"

আদিত্য হেসে বল্লে—'পুড়বে কেন! আমি মিনুকে চার আনা পয়সা দিয়ে বল্লাম—দেখ, তুই খুব চীৎকার করবি—মাগো, বাবাগো, পুড়ে গেলাম, পুড়ে গেলাম—বলে আর কানু শানু ওদের বল্লাম, তোরাও চীৎকার করবি সঙ্গে সঙ্গে। ঐ রকম একটা কিছু না করলে ওরা ত' আজ তোমাকে না মেরে ফেলে উঠত না।' একটু থেমে আদিত্য বল্লে, 'তোমার চিঠিটা পড়ে কিছুতেই কোন মানে বুঝতে পারলাম না—"ভূতে পাওয়া" শুনেছি কিন্তু "লেখকে পাওয়া" কখনও শুনি নি! এখন কিন্তু সব সাফ হয়ে গেছে—"লেখকে পাওয়া" কি তা চোখের সামনে দেখলাম। এ যে ভূতে পাওয়ার বাবা! এরা ছেড়েও ছাড়ে না। আজ কোনও রকমে ভাগালাম, আবার কাল আসবে বলে ভয় দেখিয়ে গেল।'

নীরেন ক্লান্ত সুরে বল্লে—'দেখলে ত' ভাই, আমার কি হাল হয়েছে। আমার এত সাধের "মিতালি" বন্ধ করে দিতে হবে। কি করব, উপায় নেই—নইলে বাঁচতে হবে ত? তা ছাড়া প্রেসও চালান অসম্ভব—নীচে নামলেই দেখি বাইরের-ঘর লেখকে ভর্ত্তি।'

আদিত্য বল্লে—'আচ্ছা, "মিতালি" বন্ধ করে দেবার আগে আমাকে একটু সময় দাও, দেখি কিছু করতে পারি কিনা।'

নীরেন হতাশ ভাবে বল্লে—'আদি, তোমার দুষ্টকে জব্দ করার ক্ষমতা অসাধারণ—তোমার উপস্থিত বুদ্ধির গল্পও ঢের শুনেছি—কিন্তু এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারে এ ক্ষমতা বোধ হয় দেবতাদেরও নেই।'

আদিত্য তখন মহা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—ভয়ানক ভাব্‌তে সুরু করেছে কি একটা বিষয়ে।

সে শুধু বল্লে, 'আচ্ছা, আজ চলি, আস্‌ব দু'-একদিনের মধ্যে। আমি আসার আগে যেন 'মিতালি'র সম্বন্ধে কিছু করে ব'স না।'

চার-পাঁচ দিন পরে আদিত্য এসে হাজির। এসে দেখে সেই মহারথীর দল নীরেনকে ঘিরে ধরেছে।

আদিত্য সেখানে অপেক্ষা না করে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই যেন মহা ভীত এমনি ভাবে বাইরে এসে বল্‌লে—'নীরেন, তোমার বাড়ীতে তিন-চার জনের এই রকম ভীষণ বসন্ত হয়েছে তা' ত' আমাকে জানাও নি!'

নীরেন কিছু বুঝ্‌তে না পেরে আদিত্যের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আদিত্য তা'কে ইসারায় চুপ করে থাকতে বলে আবার বলে যেতে লাগ্‌ল—'এ তোমার ভারী অন্যায়—আমাকে জানালে আমি মাস খানেকের ভিতর এ বাড়ীর ছায়া মাড়াতাম না। তুমি এই সব ভদ্রলোকদেরও কিছু জানাও নি নিশ্চয়?'

সকলে তখন প্রায় এক সঙ্গে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—"না, না মশায়! আমাদের ত' নীরেন বাবু কিছু বলেন নি!"

আদিত্য বল্লে—'নীরেন, এ কি, এঁদের তুমি কিছু বল নি? এত বড় সংক্রামক ব্যাধি—হাওয়ায় রোগের বীজাণু উড়ে আসে—'

লেখক মহাপ্রভুদের মুখ তখন ভয়ে আমসী হয়ে গিয়েছে।

আদিত্য বল্লে—'কে জানে এঁদের মধ্যে কারো কারো শরীরে হয়ত এর মধ্যে বীজাণু প্রবেশ করেও থাকতে পারে—'

সকলে তখন উঠে দাঁড়িয়েছে—'বাবরি চুল' ত' প্রায় কেঁদে ফেল্‌ল—বল্‌ল, 'নীরেন বাবু, আপনি শিক্ষিত লোক, এটুকু জ্ঞান আপনার থাকা উচিত ছিল—'

ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট এম্‌, এ নিজের জামার আস্তিন তুলে ভয়ে ভয়ে দেখ্‌ছে গায়ে কোথাও কিছু বার হয়েছে কিনা। যাই হোক্‌, মিনিট কয়েকের মধ্যে ঘর খালি।

নীরেন এতক্ষণ অবাক্‌ হয়ে শুধু তাকিয়েছিল। অদ্ভুত ক্ষমতা এই আদিটার! কি করে মাথায় ওর এই সব অদ্ভুত বুদ্ধি যোগায়! রোগের সেরা রোগ বসন্ত, ও রোগের নাম শুনলে অতি বড় সাহসীরও বুক কেঁপে ওঠে। লেখকগোষ্ঠী যে রকম করে পালাল তা ভাবতেও ওর হাসি পাচ্ছে ভীষণ।

আদিত্য বল্লে—'নীরেন, কিছু মনে ক'র না ভাই। একদিন তোমার মেয়ে পুড়ে গিয়েছে বলে মিথ্যা রটালাম, আজ আবার মিথ্যা রটালাম বাড়ীতে বসন্ত হয়েছে। এবার আর অন্য নয়। অবশ্য ওরা মাস খানেক আর এ বাড়ীমুখো হ'বে না—কিন্তু আবার হাজির হবে এক মাস পরে। আমি ঐ ছিনে জোঁকগুলিকে জব্দ করবার মতলব ঠিক করেছি। তুমি এই মাস খানেক বেশ করে খেয়ে-দেয়ে, ভাল করে ঘুমিয়ে একটু সেরে ওঠ—লেখকে পেয়ে তোমার যে মরবার দাখিল হয়েছে!'

নীরেন বল্লে—'মাস খানেক পরে আবার যখন ওরা আসবে তখন কি করবে? পারবে ওদের তাড়াতে?' ওর গলাটা ভয়ে একটু কেঁপে উঠল।

আদিত্য বল্লে—'দেখ তখন; এখন শুধু তুমি এই মাসের 'মিতালি'তে ছাপিয়ে দাও বড় বড় অক্ষরে—আদিত্য রায়, সহকারী সম্পাদক। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতাদি সম্বন্ধীয় যে কোনও প্রয়োজনে সহকারী সম্পাদকের সহিত দেখা করবেন।'

নীরেন সেই মাসের মিতালিতে আদিত্যের কথামত সব কথা ছাপিয়ে দিল।

আদিত্য এক দিন এসে বল্‌ল—'নীরেন, তোমার ড্রয়ারের চাবিটা দাও ত'।'

নীরেন তার ড্রয়ারের চাবি দিলে; আদিত্য পকেট থেকে লাল ফিতে জড়ান গোটা পাঁচ-সাত টিনের কৌটো বার করে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে তা'তে চাবি দিয়ে দিল। তার পর বল্লে—'এ চাবিটা আমার কাছে থাক্‌ কিছুদিন।'

এর পর সে নূতন চেয়ার টেবিল আন্‌ল—আরও খান পনেরো সুন্দর সুন্দর বেতের চেয়ার কোথা থেকে নিয়ে এল। তার পর বেশ করে সাজিয়ে নিয়ে বস্‌ল সহ-সম্পাদক হয়ে।

মাত্র কয়েক দিন বাদে সেই মহারথীর দল এসে ঘিরে ধর্‌ল আদিত্যকে।

আদিত্যও তা'দের মহাসমারোহে অভ্যর্থনা কর্‌ল—চা, বিস্কুট এল ট্রেতে করে। পান এল, সিগারেট এল।

দূরে বসে বসে নীরেন আদিত্যের কীর্ত্তি লক্ষ্য করছিল। সে ভাবলে আদিত্য করে কি! এদের মেরে ওঠান যায় না—আর ও দিব্যি চা-বিস্কুট-পান-সিগারেট দিয়ে আপ্যায়িত করছে! এরা যে তা হ'লে এ বাড়ীতেই পড়ে থাকবে!

আদিত্য প্রত্যেকের লেখার ভীষণ সুখ্যাতি করছে। 'পাকা চুল'কে বল্‌ছে, 'নিশ্চয়,

ছোটদের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগান সকলের আগে দরকার। 'বাবরি চুল'কে বল্ছে, 'কি ইন্‌টারেষ্টিং আপনার ভূতের গল্প!' 'চাদর গলায়'কে বল্লে, 'আপনার রসিকতা সত্যি উপভোগ্য'; 'ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট'কে বল্লে, 'আপনার মত বিদ্বান্ লোকের লেখা—'

নীরেন ভাবলে সর্ব্বনাশ, আদিটা ক্ষেপে গেল নাকি! এদের তাড়াবে বলে এ কি কর্‌ছে! ওরা আজ বেলা পাঁচটার আগে নড়বে না—

কিন্তু ওকি, সবাই যে উসখুস্ উসখুস্ কর্‌ছে! ওকি, চাদর গলায় ভদ্রলোক আর বেঁটে ভদ্রলোক যে উঠে দাঁড়াল—বল্‌ছে, 'আজ চলি'!

আদিত্যটা আবার অনুরোধ কর্‌ছে যে বসবার জন্য! কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু কই, বস্‌ছে না ত! ওকি, সবাই যে উঠে দাঁড়াল, ব্যাপার কি! আদিটা মন্ত্র জানে নাকি!

আদিত্য বল্লে, 'আর একবার চা কর্‌তে বলেছি।'

সকলে বল্লে, "না না, থাক্" বলে তাড়াতাড়ি বার হয়ে গেল। তারা খানিক দুর চলে যেতেই আদিত্য হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। নীরেন এগিয়ে এসে বল্লে, 'ব্যাপার কি আদি, তুমি যাদু জান নাকি? এত আদর-আপ্যায়ন, এত লেখার সুখ্যাতি, তবু চলে গেল যে তাড়াতাড়ি?'

আদিত্য উঠে এসে একটা চেয়ার একটু নাড়া দিতেই তার থেকে ঝুর ঝুর করে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছারপোকা পড়তে লাগ্‌ল।

আদিত্য বল্লে, 'এ সব সোজা ছারপোকা নয়, বড় বনিয়াদী জাতের ছারপোকা; আমার দাদার শ্বশুরবাড়ীতে এদের রাজত্ব। এদের কামড়ের জন্য বৌদি নিজে আর তার ভাইবোনগুলি মোটা হ'তে পার্‌ল না—রক্তশূন্য, রোগা চেহারাই চিরকাল থাক্‌ল তাদের। পাঁচ-সাত কৌটো ভর্ত্তি করে এনেছিলাম সেখান থেকে, তার পর ঐ ড্রয়ারের মধ্যে রাখলাম বন্ধ করে, যাতে বেশ কিছু দিন খেতে না পায়। কাল বার করে সব চেয়ারে ছেড়ে দিয়েছি। বুঝতেই পার্‌ছ একে ঐ জাতের ছারপোকা, তার উপর উপোসী ছারপোকা—বাছাধনরা বসবেন কি! কামড়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন না? তার ওপর চুলকোতে হবে এখন তিন্ ঘণ্টা। আমি বাজি ফেল্‌তে পারি—ওরা সকলে এখন বাড়ী গিয়ে ঘরে দরজা দিয়ে প্রাণপণে গা চুলকোচ্ছে।' তারা ছু'জনেই এবার হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।

এর পর বিশেষ কেউ আর আসে নি। আরও এক-আধ দিন তাদের মধ্যে দু-একজন যারা এসেছিল তারা ছারপোকার কামড়ে অস্থির হয়ে শেষ পর্য্যন্ত আসা ছেড়ে দিয়েছে।

'মিতালি' আবার এখন নিরুপদ্রবে সুন্দর ভাবে চল্‌ছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ্

(শ্রীরমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ)

ভারতবর্ষ বনাম অষ্ট্রেলিয়ার চারটে খেলাই শেষ হয়ে গেল।

অষ্ট্রেলিয়ান্‌রা এ খেলাটাকে গোড়া থেকেই আসল টেষ্ট্ ম্যাচ্ বলে মেনে নিতে রাজী হন্ নি; তার কারণ, বর্ত্তমানে ও দেশের যাঁরা বাস্তবিকই বড় বড় খেলোয়াড়—যেমন ব্র্যাড্‌ম্যান্, পন্স্‌ফোর্ড্, উড্‌ফুল, ম্যাক্‌কেব, ওল্ড্‌ফিল্ড্, চিপারফিল্ড, ওরিলি, গ্রিমেট—তাঁরা কেউই এ দলের সঙ্গে আসেন নি। যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যেও বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় কেউ কেউ আছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অনেকেরই বয়স হয়েছে; অবশ্য ছোক্‌রা-বয়সীও জনা কয়েক আছেন, এবং ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আস্‌ছে টেষ্ট্ ম্যাচে এঁরা অনেকেই হয়ত খেলবেন।

ভারতবর্ষের সঙ্গে যে দলের টেষ্ট্ ম্যাচ্ হ'ল তাকে 'অষ্ট্রেলিয়া'র দল না বলে 'পাতিয়ালার অষ্ট্রেলিয়া দল' বলা হচ্ছে; কারণ পাতিয়ালার মহারাজাই এ দলটিকে ভারতবর্ষে এনেছেন।

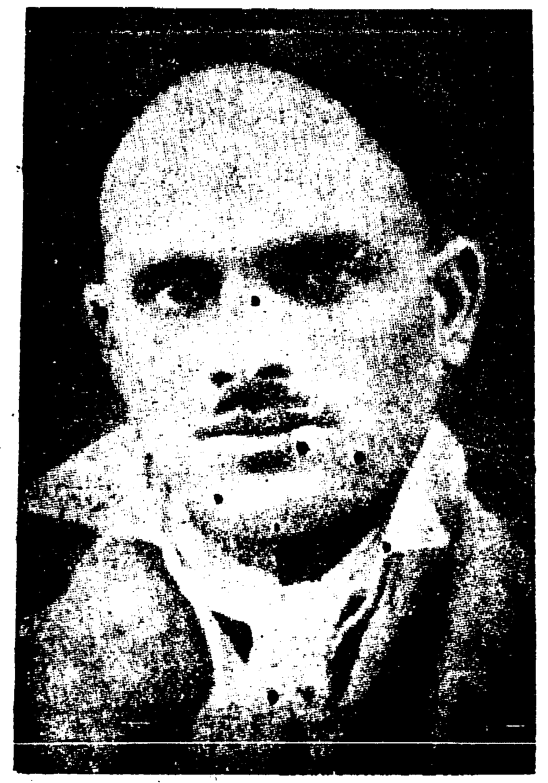

৩য় ও ৪র্থ টেষ্ট ম্যাচে
ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন্ উজীর আলি

বোম্বাই এবং কল্‌কাতায় যে প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্ট্ ম্যাচ্ হয় তার খবর ইতিপূর্ব্বেই তোমরা পেয়েছ। সে ম্যাচের ইতিহাস ভারতবর্ষের পক্ষে কিছু গৌরবের বস্তু নয়—দুটো খেলাতেই ভারতবর্ষের পরাজয় ঘটে, এবং বল্‌তে কি, শোচনীয় পরাজয়ই ঘটে। তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচে কিন্তু ভারতবর্ষ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে—দু'বারই অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে। এই শেষ দুটো ম্যাচেই ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেছিলেন উজীর আলি, কাজেই সমস্ত দেশ আজ তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

তৃতীয় টেষ্ট্ ম্যাচ্ আরম্ভ হয় দারুণ হতাশার মধ্যে। ভারতের নামজাদা খেলোয়াড়দের মধ্যে নানা কারণে অনেকেই হ'লেন অনুপস্থিত। তাঁদের স্থান পূর্ণ কর্‌তে হ'ল নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ে। কিন্তু ক্যাপ্‌টেন্ উজীর আলি অদম্য উৎসাহে লড়লেন; তাঁর নিজের খেলা হ'ল অপূর্ব্ব—এক ইনিংসে ৭৬, আর পরের ইনিংসে ৯২। এস্, ব্যানার্জ্জি, যিনি টেষ্ট্ ম্যাচের ইতিহাসে বাংলার নাম প্রথম লেখালেন, তাঁর কৃতিত্বও কম দেখা গেল না। প্রথমতঃ বোলার হওয়া সত্ত্বেও ২য় ইনিংসে তিনি ৭০ রান্ তুলে ফেল্লেন। ভারতীয় দলের ফিল্ডিংও হ'ল চমৎকার—এ বিভাগে ভায়ার ঔজ্জ্বল্য সবাইকে পরাস্ত কর্‌ল। ভারতীয় দল ৬৮ রানে জিতে গেল।

ভারতীয় দল		১ম ইঃ	২য় ইঃ	অষ্ট্রেলিয়ান্ দল		১ম ইঃ	২য় ইঃ
এস্, ব্যানার্জ্জি	...	৫	৭০	ওয়েণ্ডেল বিল	...	১৭	৫
মেহের হোম জি	...	২৬	১২	ব্রায়াণ্ট্	...	১০	৬
মহম্মদ সৈয়দ	...	০	২৬	মরিস্‌বি	...	২৩	৩৫
উজীর আলি	...	৭৬	৯২	রাইডার	...	২১	৭০
পাতিয়ালার যুবরাজ	...	১৪	১৬	হেনড্রি	...	৩	৬
ভায়া	...	৭	২৭	ম্যাকার্ট্‌নি	...	৩৪	১৬
বাকা জিলানি	...	৪	০	লাভ্	...	৩	১০
আমীর ইলাহি	...	০	২৬	অক্সেনহাম	...	৪	৩০
সালাউদ্দীন (ন. আ.)		১২	২৩	ন্যাগেল	...	১	০
ডি, আর, পুরী	...	০	০	মেয়ার (২বার ন. আ.)		১৭	১৪
নিসার (ন. আ.)	...	০	৩	লেদার	...	২৭	১১
অতিরিক্ত	...	৫	৬	অতিরিক্ত	....	৬	১৩
		১৪৯	৩০১			১৬৬	২১৬

৪র্থ বা শেষ টেষ্ট ম্যাচ্ হ'ল মান্দ্রাজে। অমরনাথ সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন, অমর সিং নামলেন, কিন্তু সি, কে, নাইডু এবারও অনুপস্থিত। এস্, ব্যানার্জ্জিকে বসিয়ে বাংলার কার্ত্তিক বসুকে স্থান দেওয়া হ'ল—কতটা সুবিবেচনার কাজ হ'ল জানি না, কেননা এস্, ব্যানার্জ্জি অল্ রাউণ্ডার। বসু ছাড়া আরও কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় টেষ্টে খেল্‌বার এইবার সুযোগ পেলেন। ভারতীয় দলে এবার 'হিরো' হ'লেন প্রথম ইনিংসে অমর সিং—কি ব্যাটিংএ, কি বোলিংএ তিনি একেবারে আগুন ছুটিয়ে দিলেন। ২য় ইনিংসে বল হাতে প্রলয়কাণ্ড ঘটালেন নিসার। ফলে ৩৩ রানে ভারতের জয় হল।

ভারতীয় দল		১ম ইঃ	২য় ইঃ	অষ্ট্রেলিয়ান্ দল		১ম ইঃ	২য় ইঃ
কে বসু	... ...	৪	১	হেণ্ড্রী	... ...	০	৯
মুস্‌তাক্ আলি	... ...	৪৩	৭	ব্রায়াণ্ট্	... ...	২৬	১১
অমরনাথ	... ...	৩২	১৮	মরিস্‌বি	... ...	১২	৩
অমর সিং	... ...	৪৫	১০	রাইডার	... ...	২০	৪১
এম্, এম্, নাইডু	... ...	৭	৭	লাভ	... ...	১৯	২
উজীর আলি	... ...	১৮	১৬	এলিস্	... ...	২	১২
রাম সিং	... ...	৫	০	ম্যাকার্ট্‌নি	... ...	৩	১৪
এম্, এম্. হাদি (২বার ন. আ.)		১৯	১৯	মেয়ার (ন. আ.)	...	৪৮	৩
সালাউদ্দীন	... ...	৫	১২	লেদার	... ...	১৩	৩
নিসার	... ...	০	১৭	ডেভিস্ (ন. আ.)	...	৪	০
তিরু ভেঙ্কটচারি	... ...	৫	১	আলেকজাণ্ডার	... ...	১	২
অতিরিক্ত	... ...	৬	৫	অতিরিক্ত	... ...	১৪	৭
		১৮৯	১১৩			১৬২	১০৭

সন্দেশ

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ আর ইহলোকে নাই। এই নিদারুণ সংবাদ সমস্ত বৃটীশ সাম্রাজ্যের বুকে শেলের মত বিঁধিয়াছে। সম্রাট্ কি রকম প্রজাবৎসল ও জনপ্রিয় ছিলেন তা' কাহারো অজানা নাই। আমরা সম্রাটের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

* * *

মানুষের হাতের লেখা দেখিয়া নাকি তার স্বভাব কেমন বলিয়া দেওয়া সম্ভব। ব্যাপারটি এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতদের মগজের সাহায্যেই যা কিছু সম্ভব হইত কিন্তু বুডাপেষ্ট্ সহরের বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাপারটি যন্ত্রের সাহায্যে হাসিল করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁরা তোমাকে একটা বৈদ্যুতিক পেন্সিল দিয়া লিখিতে বলিবেন। পেন্সিলটি তার দিয়া আর একটা যন্ত্রের সঙ্গে যোড়া। তুমি যেই লিখিতে থাকিবে অমনি তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ গিয়া যন্ত্রের ভিতর তার সাড়াচিত্র আঁকিয়া লইবে। সেই সাড়াচিত্র দেখিয়াই পণ্ডিতেরা তোমার স্বভাব সম্বন্ধে নানা তথ্য বাহির করিয়া ফেলিবেন।

* * *

ক্ষেতে বা বাগানে পোকার উপদ্রব কি বিশ্রী এবং ক্ষতিকর ব্যাপার তা যারা চাষ-আবাদ করে তারাই জানে। পোকা তাড়াইবার জন্য নানা জায়গায় নানা উপায় অবলম্বন করা হয়, কিন্তু ক্যালিফোর্ণিয়ার এক আঙ্গুর-ব্যবসায়ী যে উপায় ঠাওরাইয়াছেন তা বাস্তবিকই বড় অদ্ভুত। ইনি একটা প্রকাণ্ড কল বানাইয়াছেন—কলটা দেখিতে অনেকটা তাঁবুর মত। এই তাঁবু-কলের উপর উঠিয়া তিনি গাছগুলির উপরে বিষাক্ত গ্যাস ছড়াইতে থাকেন—বেশীক্ষণ নয়, কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। উহাতেই গাছের সমস্ত পোকা মরিয়া যায়—গাছগুলির অবশ্য কোনও ক্ষতি হয় না।

* * *

আমাদের নতুন সম্রাট্ অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড্ এখনও অবিবাহিত। ইংলণ্ডে অবিবাহিত রাজা এ পর্য্যন্ত বেশী দেখা যায় নাই। যে কয়জন ছিলেন তোমাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য তাঁদের নাম দিতেছি—(১) তৃতীয় জর্জ্জ—ইনি ২২ বছর বয়সে রাজা হন, তার এক বৎসরের মধ্যেই বিবাহ করেন। (২) দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ ৩০ বছর বয়সে রাজা হন, বিবাহ করেন তার দু'বছর পরে। (৩) রাজা ষষ্ট এড্‌ওয়ার্ড্ মাত্র ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই মারা যান—তিনি আর বিবাহ করিয়া যান নাই। (৪) অষ্টম হেনরি রাজা হইবার কিছুদিন পরেই বিবাহ করেন। (৫) সপ্তম হেনরি রাজা হইবার পরের বছর বিবাহ করেন। (৬) চতুর্থ এড্‌ওয়ার্ড্ রাজা হন ২০ বছর বয়সে, বিবাহ করেন ২৩ বছর বয়সে। (৭) পঞ্চম হেনরি রাজা হন ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে আর বিবাহ করেন ১৪২০ খৃষ্টাব্দে। (৮) ১ম রিচার্ড রাজা হইবার ২ বছরের মধ্যে বিবাহ করেন। (৯) ১ম হেনরি বিবাহ করেন রাজা হইবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। ষষ্ট এড্‌ওয়ার্ড্‌কে বাদ দিলে ইংলণ্ডের রাজাদের মধ্যে একমাত্র রাজা ২য় উইলিয়াম্‌ই সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন। ইনি ৪৪ বছর বয়সে শিকার করিতে গিয়া দৈব-দুর্ঘটনায় মারা যান।

পুস্তক-পরিচয়

পঞ্চাননের অশ্বমেধ—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅপূর্ব্ব কুমার বাগচি; এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ৸০

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে শিবরাম বাবুর লেখার নতুন ক'রে পরিচয় দিতে হবে না। আজকালকার বাংলা শিশুসাহিত্যে তাঁর মত শক্তিশালী লেখক খুব বেশী নেই। তাঁর লেখার প্রধান গুণ—সে লেখা অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার। নিতান্ত সাধারণ কথাগুলোকে তিনি এমন সরসভাবে বলতে পারেন যে তা'তে বুড়োরা পর্য্যন্ত না হেসে থাকতে পারেন না। 'পঞ্চাননের অশ্বমেধে' এই ধরণের ৭টি হাসির গল্প আছে—তার মধ্যে ২টি গল্প রামধনুতেই বেরিয়েছিল। এর ক'টি গল্পই লেখার গুণে সুন্দর হয়েছে। ছেলে-মহলে এ বইএর আদর অবশ্যম্ভাবী।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ক=৪, গ=৬, চ=১, ছ=৫, জ=৮, ড=৩,
ত=৯, থ=২, ব=৭

উত্তরদাতাদের নাম

ছায়া দেবী (রতনপুর); আইকন, খেঁদু, বেটু প্রভৃতি (কলিকাতা); মোহন, সন্তু, মন্তু প্রভৃতি (মাণিকতলা); কামাখ্যাপ্রসাদ খাঁ ও দেবীপ্রসাদ খাঁ (শিলং); জগদীশচরণ বক্সী (করকেন্দ কোলিয়ারি); শক্তিপ্রসাদ গর্গ (কলিকাতা); প্রশান্ত, প্রতাপ, শোভা প্রভৃতি (সীতারামপুর); রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর); মণি দাস (নর্থ লক্ষ্মীপুর); বিষ্ণুপদ স্মৃতি-পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা—হাওড়া); ষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত (শালিখা—হাওড়া)।

নূতন ধাঁধা

মেজমামা বাজার থেকে এক ঝুড়ি ফল এনে সবাইকে ডেকে বললেন, "এই ঝুড়ি ওজন না করে বল্ দেখি এর ওজন কত? তা' হ'লে ফলগুলি পাবি—ঠিক ঠিক ওজন বলা চাই।" সবাই একে একে ঝুড়ি তুলে এক-এক রকম ওজন বলতে লাগ্ল, মামা মাথা নাড়তে লাগলেন, "হ'ল না, হ'ল না।" শেষে তিনি বল্লেন, "আচ্ছা, আমি কতকটা বলে দিচ্ছি—৫ সের আর তা ছাড়া ঝুড়িটার ওজন যত তার অর্দ্ধেক।"

সবাই বল্ল, "ওতে কি বোঝা যায়?" মামা বল্লেন, "ওতেই বুঝতে পার তো ফল পাবে, নইলে ভাগো, ও ফল আমি একাই খাব।" তোমরা বলে দিতে পার ঝুড়িটার ওজন কত? তা হ'লে সবাই ফলগুলোর ভাগ পায়।

রামধনুর সাড়া পেয়ে—

শিল্পী—শ্রীসমুখনাথ মিত্র

৯ম বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪২ | ৩য় সংখ্যা

স্বপন-পরী

(শ্রীরমা দেবী)

অজানা এক মায়া-লোকে মোদের বাড়ী-ঘর,
দিনের আলোয় লুকাই মোরা আঁধার রাতের চর।
খোকা খুকু কাঁদছে কিনা, দেখ্‌ব বলে তাই
আমরা সবাই নীরব রাতে ধরায় আসি ভাই।
কোথাও যদি দুষ্টু ছেলে মায়ের আঁচল ধ'রে
কাঁদছে দেখি একলা বসে প্রদীপ-জ্বালা ঘরে,
অমনি মোরা হাওয়ার পরে পাখনা ছুটী মেলে
স্বপন-মাখা চোখে নামি তন্দ্রা গায়ে ঢেলে।

খোকা খুকুর মুখেতে দিই স্বপন-লোকের চুম্,
কোথা থেকে আসে নেমে স্বরগ-পুরের ঘুম !
গোলাপ-রাঙা পাতলা ঠোঁটের আবেগ ভরা চুমে
আঁচল ছেড়ে খোকা খুকু লুটিয়ে পরে ভূমে।
চোখের তলে যত্নে আঁকা কাজল-রেখার পরে
স্বপন-তূলি আমরা বুলাই নীরব নিথর ঘরে।

আলতা-রাঙা পায়ে মোরা দেশ-বিদেশে যাই,
রবি-রাঙা সাগর-জলে আমরা যে গো নাই ;
কচি কচি গাছের পাতায় আমরা মুছি চুল,
সন্ধ্যা হলে খোঁপায় গুঁজি ঝুমকো জবা ফুল ;
কুঙ্কুমেরি টিপগুলিরে ভূরুর মাঝে দিই—
ঘুমের পরীর কথায় মোরা স্বপন-মালা নিই।
কোন্ দেশেতে কাহার তরে কাঁদ্ছে বসে কে,
মোদের কানে বাতাস আনে তাহার খবর যে !
আলতা-রাঙা মোদের হাতে পরাই মালা তায়,
শিউরে উঠে কান্না ভুলে অবাক্-চোখে চায়।
আমরা তখন পাখনা মেলে আবার চলে যাই,
পূব-আকাশে ঊষারাণীর চিন্ দেখতে পাই।
মনের সুখে বেড়াই মোরা স্বপন-তরী বেয়ে—
দিনের আলোয় লুকাই মোরা আঁধার রাতের মেয়ে।

চেরাপুঞ্জি

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

শিলং-এ এক শীতের সকাল। চায়ের টেব্‌লের চারধারে বসে গল্প কর্‌ছি সবাই। হঠাৎ ঠিক হ'ল আজকেই চেরায় যাওয়া হ'বে। ও অঞ্চলে চেরাপুঞ্জি নামটাকে সংক্ষেপ ক'রে 'চেরা' বল্‌তেই সকলে অভ্যস্ত।

শিলং থেকে চেরা প্রায় ত্রিশ মাইল পথ। যাবার জন্য বাস্ কিংবা ট্যাক্সী পাওয়া যায়, কিন্তু নিজেদের গাড়ী থাকায় আর পরমুখাপেক্ষী হ'তে হ'ল না। গরম জামার ওপর গরম জামা চাপিয়ে, মোজা-জুতো পরে আমরা 'রেডি' হ'য়ে নিলা'ম।

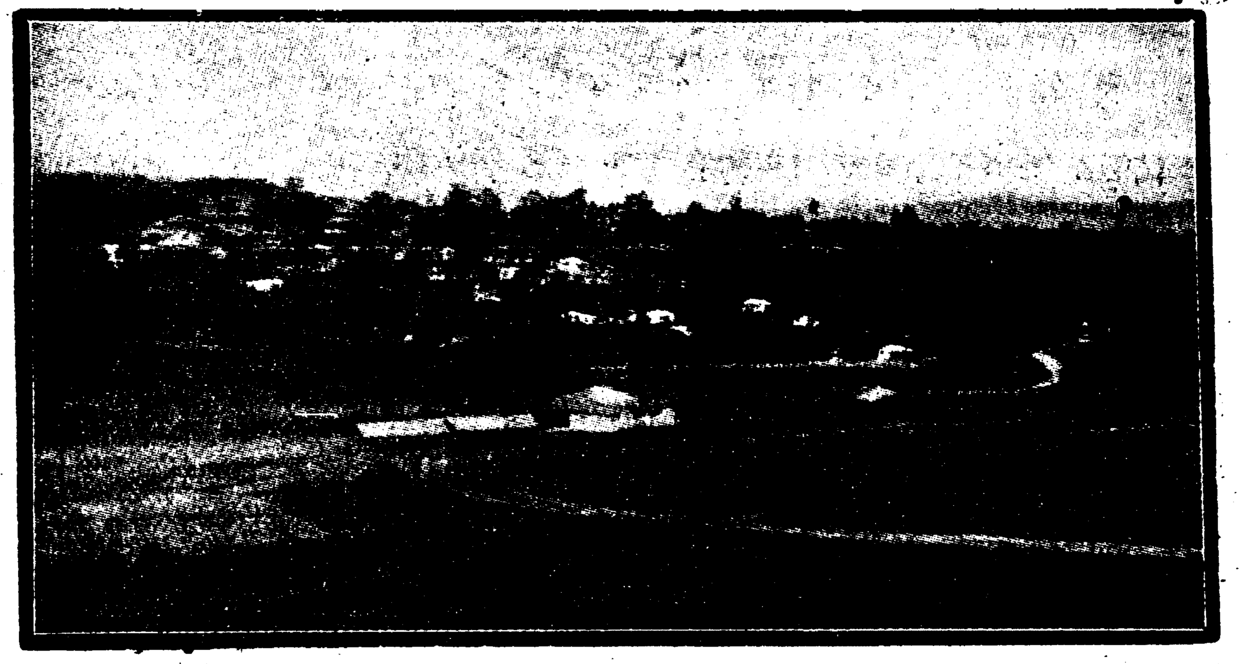

শিলংএর সাধারণ দৃশ্য

বলা বাহুল্য টিফিন্-ক্যারিয়ারে খাবার ও ফ্লাস্কে করে চা সঙ্গে নিতে ভুল হয় নি।

সিলেট্ রোড্ ধরে গাড়ী ছুট্‌ল। পথ চলেছে এঁকেবেঁকে। আকাশে মেঘ নেই একটুও। প্রভাতী সূর্য্যের সোনালী আলোয় ঝক্‌ঝকে নীলাকাশ যেন হেসে উঠ্‌ছে বার বার। ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে লুটিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

পাহাড়ী পথ, পাহাড়ী জাতির মতই খামখেয়ালী। কখন যে সেটা কোন দিকে মোড় নেয় তা বোঝা কঠিন। অনেক টার্নিং বিপদ্‌জনক বলে সঙ্কেতে দূর থেকেই চালককে তা জানিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে তা অস্বীকার কর্‌বার জো নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ আরো—আরো বেশী।

মাঝে মাঝে পাচ্ছি কয়েকটি ক'রে ঝর্ণা আর তার ওপর সুন্দর সুন্দর সেতু। পাহাড়ী পথ অনেক উঁচু থেকে ধীরে ধীরে তার ওপর নেমে এসেছে। এই রকম একটি ঝির্‌ঝিরে ঝর্ণার পাশে গাড়ী দাঁড় করিয়ে আমরা জলযোগের পর্ব্বটা সেরে নিতে লাগ্‌লাম।

খানিক পরে গাড়ী আবার ছুট্‌ল। পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ উঠেছে—সমুদ্রে যেমন ঢেউ দেখা যায়। কোন কোন পাহাড়ের গায়ে একটুও শ্যামলতা নেই—ধূসর, রুক্ষ—যেন কঠোর অথচ সুন্দর বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি; আবার কোনও কোনও পাহাড়ের বুকে সবুজ গাছের শ্যামলিমা, জীবনের সমস্ত রসাস্বাদনে যেন তারা ব্যগ্র। আঁকাবাঁকা পথটি সর্পিল ভঙ্গীতে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ের ওপর দুরন্ত শিশুর মতই ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

মাঝে মাঝে আমাদের পথে পড়ছে ছোট ছোট খাসিয়া গ্রাম। ছেঁড়াখোঁড়া জামা গায়ে খাসিয়া ছেলেরা পাহাড়ের ঢালু জায়গার ওপর ভেড়া চরাতে চরাতে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে, মাঝে মাঝে আবার আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়্‌ছে। স্বাস্থ্যময় দেহ তাদের ছেঁড়া জামার বাঁধন উপ্‌চে বার হয়ে পড়্‌তে চায়—চার ধারের প্রকৃতির সঙ্গে তারা যেন এক হয়ে মিশে গেছে।

প্রায় মাঝ পথে একটি গেট্‌ পড়্‌ল, সেটি বন্ধ। যত মোটর, ট্যাক্সী, বাস্‌ সমস্তই সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আসামের পার্ব্বত্য রাস্তায় এই বিশেষত্বটি বরাবর দেখে আস্‌ছি। পাহাড়ের গা কেটে-কুঁদে যে রাস্তা তৈরী হয়েছে তার পরিসর সামান্য, দু'দিক্‌ থেকে দু'খানা গাড়ী নির্ব্বিবাদে চলার পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাই আপ্‌ এবং ডাউন গাড়ীর যাতায়াতের ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট করা আছে। দু দিক থেকে গাড়ী এসে গেটের দু'দিকে দাঁড়াবার পর এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে গেট্‌ খুলে দেওয়া হয়। গেটের পাশেই একটা লাল টিনের সাইন-বোর্ডের ওপর শাদা রঙে একটা মড়ার মাথার খুলি ও দু'টি হাড় আঁকা। তার তলায় লেখা—'পথের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ হ'লে সর্ব্বাগ্রে সেইটে জেনে নাও নতুবা এই রকম পরিণতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে'। পথটি এমনিই বিপদ্‌-সঙ্কুল! ঐ সাইনবোর্ড্‌ দেখে সত্যিই মনে ভয় হয়, মনে হয় আমরা বুঝি যমালয়ের দক্ষিণ দরজার ভেতরে চলেছি!

খানিক বাদে 'গেট্‌-কিপার' গেট্‌টি খুলে দিল। গাড়ী আবার ছুট্‌ল। একটু পরে একটি পোলের ওপর দিয়ে শ্রীহট্টের রাস্তাটি বেঁকে গেল, আর চেরার রাস্তা চল্‌ল সোজা।

চেরায় পৌঁছুবার প্রায় মাইল দশ আগে থেকে পথ অতি দুর্গম হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু দৃশ্যাবলী হ'তে লাগ্‌ল আরও চমৎকার। পাহাড়ে ঠিক ওপর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ চলেছে। বাঁ দিক্‌টায় হাজার দেড় হাজার ফিট্‌ গভীর খাদ হাঁ করে রয়েছে। খাদের ওপাশ দিয়ে আর একটি পাহাড় উঠেছে। মাঝখানে রাস্তা। চোখে না দেখ্‌লে এ রাস্তার ভীষণতা ঠিক বোঝা যায় না। মনে কর কল্‌কাতার মনুমেণ্টের মত আট-দশটা মনুমেণ্ট্‌ পর পর সাজান হয়েছে, আর তার মাথার উপর দু'খানা মোটর চল্‌তে পারে এমন একটু রাস্তা। সে রাস্তা চলেছে অনবরত মোড় ফির্‌তে ফির্‌তে, কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে; হঠাৎ হয়তো কুয়াশায় (fog) দিগ্বিদিক্‌ ঢেকে

'গেট্‌কিপার' গেট্‌ খুলে দিল

গেল—এমন হামেশাই হয়—ব্যস্‌, কোথায় যে বাঁ দিকের রাস্তার সীমানা শেষ হয়ে খাদ আরম্ভ হ'ল তা চোখে ঠাহর হয় কি হয় না। এদিক্‌কার রাস্তা সম্বন্ধে ভাল অভিজ্ঞতা আছে এমম ড্রাইভার ছাড়া এ পথে আসা যে অসম্ভব তা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। কল্‌কাতা থেকে অনেক সাহেব নিজেয় মোটরে শিলং আনেন কিন্তু চেরায় যেতে হলে সেদিনকার মত নিজের ড্রাইভারকে ছুটী দিয়ে ট্যাক্‌সীর শরণাপন্ন হন। অতি ভয়ঙ্কর পথ, কিন্তু তবুও অতি সুন্দর তার দৃশ্য।

কুয়াশায় পথের ভীষণতা বেড়ে যায় কিন্তু দৃশ্যের রমণীয়তাও বেড়ে যায় ঠিক চতুর্গুণ। মনে হয় যেন মহাশূন্য ভেদ করে অনন্তের পথে চলেছি।

চেরায় পৌঁছুনো পর্য্যন্ত চল্‌ল এই রকম দৃশ্য। সঙ্গে ক্যামেরা এনেছিলাম, ইচ্ছে ছিল ছবি তুলি। কিন্তু এই সব দৃশ্য দেখে ছবি তুল্‌তে আর ইচ্ছে কর্‌ল না। কতটুকুই বা আমি আমার ছোট ক্যামেরাটির ভিতর বন্ধ করে নিয়ে যেতে পার্‌ব! কিন্তু তবুও এই যাত্রার আংশিক স্মৃতি রাখ্‌বার জন্য দু'-একটি ছবি নিলাম।

এই দৃশ্যাবলীর ভেতর নিজেকে হারিয়ে দিয়ে নিতান্ত উন্মনা হ'য়েই চেরায় এসে পৌঁছুলাম। আমাদের ভাগ্য ভাল, তাই এ জায়গাটায় তখন বিশেষ মেঘের দৌরাত্ম্য দেখ্‌তে পেলাম না। আকাশটা গাঢ় নীল—ঝল্‌মলে, ঝক্‌ঝকে! নীচের দিকেও একটুও কুয়াশা নেই। দূরে সমতল ভূমির ওপর শ্রীহট্ট সহরটা দেখা গেল। ঘর-বাড়ী কিছু বোঝা যায় না, তবে জল ও স্থলের একটা অস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে।

এখানকার মস্‌মাই ফল্‌স্ মস্ত বড়। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই জলপ্রপাতটির স্থান ছিল বিশ্ব-বিখ্যাত নায়গ্রা প্রপাতের প্রায় পরেই। কিন্তু এখন এর থেকে বহু শাখা-প্রশাখা কেটে দেওয়ার দরুণ তার যেন অকাল-বার্দ্ধক্য এসেছে—তার যৌবনের সেই উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম গতিবেগ চিরতরে হ'য়ে গেছে রুদ্ধ।

এই সেই জায়গা—পৃথিবীর ভেতর সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি যেখানে হয়। যত মেঘ সমস্তই এখানে এসে এর পায়ের ওপর মাথা কোটে। তারা যেন বল্‌তে চায়, "ওগো, পথ ছাড়, পথ ছাড়।" দলে দলে সাদা মেঘ উড়ে আসে আর জানায় তাদের অনুনয়। কিন্তু পাষাণ পাহাড়ের করুণা হয় না।

এক গাইডকে সঙ্গে করে চেরাপুঞ্জির বিখ্যাত 'কেভ' বা গুহা দেখ্‌তে চল্‌লাম। এ গুহাটি বাস্তবিকই দেখ্‌বার জিনিষ—অর্থাৎ গুহার ভিতরটা। অনবরত জল পড়ে পড়ে পাহাড়ের গা ফোঁপড়া হয়ে গিয়ে এ গুহার সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় সিকি মাইল অবধি এই গুহা চলে গেছে; ভিতরের অন্ধকারের তুলনা

মেই, বাঘ-ভালুক নির্ব্বিবাদে সেখানে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারে। সাধারণ টর্চ্চ্ সে অন্ধকারের গায়ে এতটুকু আঁচড় কাটতে পারে না, গাইডের জলন্ত মশালের সাহায্য নিতে হয়। ভিতরে মধ্যে মধ্যে বটগাছের ঝুরির মত পাথরের ঝুরি ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। কখনও বসে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, নানা রকম কস্‌রৎ করতে করতে এ গুহার শেষ অবধি পৌঁছুতে হয়।

মস্‌মাই জলপ্রপাত

গুহাটি দেখার পর আমরা রোপ্‌ওয়ে দেখ্‌তে গেলাম। এ জায়গাটিও বেশ কিছু দূরে। দড়ির ওপর দিয়ে দূর জায়গা থেকে জিনিষপত্র অতি সহজে ও অল্প সময়ে চেরায় আনা হয় বা চেরা থেকে পাঠানো হয়। গাইড্ আমাদের শ্রীহট্টে যাবার পায়ে-চলা পথটি দেখিয়ে দিল।

এইবার ফেরার পালা। মনের ভিতর একটুখানি ক্ষোভ ছিল যে চেরায় এলাম অথচ মেঘ বা বৃষ্টি এখানে পেলাম না কিছুই। মেঘই হচ্ছে চেরার বিশেষত্ব—মেঘহীন চেরা যেন আমের আঁঠির মত।

কিন্তু আমার মনের ক্ষোভ মিট্‌তে বিশেষ দেরী হ'ল না। আমরা প্রায় আমাদের গাড়ীর কাছে এসে পৌঁছেছি, হঠাৎ কোথা থেকে জানি না রাশি রাশি

সাদা মেঘ এসে মুহূর্ত্তের মধ্যেই চারদিক্‌টায় রূপালি পর্দা বিছিয়ে দিল। আমরা জলে কি স্থলে তা যেন কিছুক্ষণের জন্য বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। চারদিকে তখন ঝমঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি নেমেছে। গাড়ীর চারদিকে কাঁচের স্ক্রীন্‌ তুলে দিয়ে ফেরার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। গাইড্‌ বল্‌ল, 'বাবু, আপনাদের ভাগ্য খুব ভাল। আজ যদি আপনারা কিছু দেরী ক'রে আস্‌তেন তা হ'লে এই মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পেতেন না'। মনের ভেতর কবির সেই কথাটা মনে পড়্‌ল,

"চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে ?"

ভাবি, যেখানে বৃষ্টির প্রয়োজন নেই এত বেশী, সেখানেই হয় অসম্ভব বারিপাত, আর লোক যেখানে এক ফোঁটা জলের কাঙ্গাল সেখানেই পর্জ্জন্যদেবের যত কার্পণ্য।

কেশ-কর্ষণের করুণ কাহিনী

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

আসামের বিখ্যাত কাঠের ব্যবসাদার হর্ষবর্দ্ধন ও গোবর্দ্ধন নতুন কল্‌কাতায় এসেছে এবং কল্‌কাতার নানা হালচালে অভ্যস্ত হচ্ছে সে কথা তোমরা ইতিপূর্ব্বেই রামধনুতে পড়েছ। সম্প্রতি এক গাড়োয়ানের সাহায্যে তারা চুল ছাঁটবার জন্য এক সেলুনের দরজায় এসে পৌঁছেছে। সেলুন্‌টা ছিল গোবর্দ্ধনদেরই বাড়ীর সামনে, কিন্তু ওটা যে সেলুন্‌ এবং সেলুন্‌ যে কি পদার্থ তা গোবর্দ্ধন জান্‌ত না। সে কাল থেকে নীল কাচের দরজায় নজর রেখেছে এবং ওর অন্তরালে কী ব্যাপার হ'তে পারে তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—সেই নীল কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যে কোন দিন তার জীবনে হবে এ সে প্রত্যাশা করতে পারে নি। নানা চেহারার, নানা বয়সের, নানা সাইজের হরেক রকম লোককে ওই দরজা ঠেলে যেতে-আস্‌তে সে দেখেছে আর ভেবেছে বিশ্ব শুদ্ধ লোকই কি ঐ বাড়ীর বাসিন্দা! কিন্তু এখন

কেবল আর এক মুহূর্ত্তের ব্যবধান—একটু পরেই ঐ রহস্য-লোকের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে! ডিটেক্‌টিভ্‌ বইয়ের শেষ পাতায় এসে কিশোর পাঠকের বুক যেমন কাঁপ্‌তে থাকে গোবর্দ্ধনের এখন সেই অবস্থা।

যবনিকা অনাবৃত হ'লে দেখা যায় ছোট্ট একখানি ঘর মাত্র! তার মধ্যেই কায়দা ক'রে খান ছয়েক চেয়ার সাজানো—ছ'টা বিরাট্‌ আয়নার সামনে; সব ক'টা চেয়ারেই তখন ক্ষুর আর কাঁচির খুব জোর খচ্‌খচ্‌! হর্ষবর্দ্ধন ভাবেন, কি আশ্চর্য্য, এইটুকু ঘরে বিশ্ব-ভারতের আমন্ত্রণ! যাদের মাথা আছে আর মাথায় চুল আছে তাদের কারুই অব্যাহতি নেই এখানে না এসে—সারা দুনিয়ার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এরা! বাহাদুর বটে। গোবর্দ্ধন কি ভাবে বলা যায় না, কী ভাবা উচিত, বোধ করি সেই কথাই সে ভাবে।

যাওয়া মাত্রই কর্ত্তা-নাপিত এসে দুই ভাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে, দু'জনকে দু'টো কুশন-চেয়ারে বসতে দেয়, এক-জোড়া মাথা ও গালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সবিনয়ে জানায় যে ওই দুটি 'চুলহীন ও নির্দাড়ি' হ'তে আর সামান্যই বাকি আছে, তার পরেই তাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

কলকাতায় আসার পর এই প্রথম অভিনন্দন লাভ, হর্ষবর্দ্ধন খুসী হয়ে ওঠেন। গোবর্দ্ধনও রীতিমত বিস্মিত হয়। নীল কাচের নেপথ্য-লোকের যিনি একচ্ছত্র মালিক তাঁর পর্য্যন্ত কী অমায়িক ব্যবহার! হ্যাঁ, সহরের হ'লেও এবং হাতে ধারাল ক্ষুর থাকলেও, এম্‌নি লোকের কাছেই গাল ও গলা (দাড়ি সমেত) নির্ভয়ে বাড়ানো যায়—এমন কি এর কাঁচির তলায় মস্তক দান করাও শক্ত ব্যাপার নয়।

গোবর্দ্ধন অবাক্‌ হয়ে লক্ষ্য করে, সত্যিই, রহস্য লোকই বটে! ওধারের আয়নার ছায়া এধারের আয়নায় পড়েছে, আর কিছুই না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একই আয়নার মধ্যে গোবর্দ্ধন দেখ্‌ছে একশ'টা ঘর, একশ'টা আয়না! ঘরগুলো ক্রমশঃ ছোট হয়ে হয়ে যেন অনন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড! গোবর্দ্ধন ভাব্‌ছে, এখান থেকে বেরিয়েই দাদাকে প্রস্তাব করবে, এম্‌নি এক কুড়ি বড় বড় আয়না বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য। প্রত্যেক ঘরে দু'টো ক'রে মুখোমুখি সাজিয়ে দেওয়া হবে—তাতে ঘরের সংখ্যা বাড়বে, আত্মপ্রসাদও বাড়বে সেই সঙ্গে, অথচ পয়সা খরচ ক'রে ঘর বাড়াতে হবে না। বাড়ীতে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন এখন কেবল আর একটা গোবর্দ্ধনকে মাত্র দেখ্‌তে পায় কিন্তু এই রকম 'পলিসি' করলে তখন একশ'টা গোবর্দ্ধনকে এক সঙ্গে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে—গোবর্দ্ধনের সামনের চেহারা আর পেছনের চেহারা যুগপৎ! কী মজাই না হবে তা' হ'লে!

যাদের চুল-দাড়ির গতি হচ্ছিল, হর্ষবর্দ্ধন বসে বসে তাদের ভাবগতিক দেখ্‌ছিলেন। অবশেষে তিনি ফিস্‌ ফিস্‌ করতে বাধ্য হন—"গোব্‌রা, দেখেছিস্‌, লোকগুলোর মুখের ভাব হাসি-হাসি নয় কিন্তু !"

"চুল-ছাঁটা কি হাসির ব্যাপার, দাদা ?"

"জানি, গুরুতর ব্যাপার ; কিন্তু তাই ব'লে এতখানি গোমড়া মুখ করতে হবে এই বা কি কথা ?"

গোব্‌রা অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করে—"হুঁ, লোকগুলো যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে।"

হর্ষবর্দ্ধন সায় দেন—"যা বলেছিস্‌ ! হাল আর মাথা দুই-ই হ'ল এক জিনিস, দু'টোরই কর্ণ আছে কিনা ! মাঝিকে বলে কর্ণধার—শুদ্ধ ভাষায়, জানিস্‌ ?"

গোবর্দ্ধন গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে—"নাপিতকেও বলা যায় ও কথা। কর্ণধার তো বটেই, তা ছাড়া নাপিতের ক্ষুরেও ধার।"

একটা আয়নার চেয়ার ফাঁকা হয়, হর্ষবর্দ্ধনের আমন্ত্রণ আসে। গোব্‌রা ত্যাগীর ভূমিকা নেয়—"দাদা, তুমিই ছাঁটো আগে। আমার পরে হবে।"

হর্ষবর্দ্ধনের ভাই-অন্ত প্রাণ, ভাইকে ছেড়ে কোন কাজে তাঁর মন সরে না। এক সঙ্গে ট্রেনে উঠেছেন, ট্রেন থেকে নেমেছেন, মোটর চেপেছেন, কলকাতার সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁরা এক সঙ্গে আস্বাদ করেছেন অথচ চুল-ছাঁটার আনন্দ একা তাঁকেই প্রথম উপভোগ করতে হবে ! ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কাঁচুমাচু হয় ; "বেশ, তুই না হয় আগে দাঁত তোলাস্‌।" তারপর কী ভাবেন খনিকক্ষণ,—"আচ্ছা, আমি না হয় দাঁত তোলাবই না।" হ্যাঁ, গোব্‌রার 'দাদ্‌-ভক্তি'র বিনিময় তিনি অবশ্যই দেবেন, দাঁত তোলার আনন্দ থেকে তিনি কঠোর ভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখ্‌বেন। ভাইয়ের জন্য বিরাট ত্যাগ স্বীকার ক'রে তাঁর প্রাণ চওড়া হয়ে ওঠে। গোব্‌রা দাদৃভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃভক্তির তুলনাই কি পৃথিবীতে আছে ?

চেয়ারে ব'সে চুল-ছাঁটানো হর্ষবর্দ্ধনের জীবনে এই প্রথম। চুল-ছাঁটার কথা শুন্‌লেই চিরকাল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে এসেছে, আর দাড়ি কামানোর সময়ে মনে হয়েছে চীনেম্যান্‌রাই পৃথিবীতে সুখী। চীনে দাড়ির প্রাদুর্ভাব কম, হর্ষবর্দ্ধনের ধারণা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসারের এই হচ্ছে একমাত্র কারণ।

হ্যাঁ, দাড়ি কামানোর সময়ে হর্ষবর্দ্ধনের মনে হয়েছে, এর চেয়ে চীনদেশে জন্মানো ভাল ছিল। আসামের গাছ-পালা রেহাই পেত, তিনিও রেহাই পেতেন। দেশী নাপিতকে

যদি বলেছেন, "দাড়িটা আর একটু ভিজিয়ে নাও হে ! বড্ড লাগ্‌ছে।" অম্‌নি তার জবাব পেয়েছেন, "দরকার হবে না বাবু, আপনার নয়ন-জলেই সেরে নিতে পার্‌ব।" বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের দাড়ির উপর অশ্রুবর্ষণ করতে হয়েছে। যদি বলেছেন, "তোমার ক্ষুরটা ভারি ভোঁতা বাপু !" অম্‌নি বাপুর উত্তর—"ডবল খাটুনি হ'ল, তার দ্বিগুণ মজুরি দিন্‌ তবে।" সুতরাং আর এক দফা অশ্রু বর্ষণ। আর চুল-ছাঁটার কথা না তোলাই ভাল। উঁচু হয়ে ব'সে খবরের কাগজের মাঝখানে ফুটো ক'রে মাথা গলিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা সে কী কর্ম্মভোগ ! চুলের সঙ্গে কাঁচির সে কী ঘোরতর সংগ্রাম—আবার অনেক সময়ে ঠিক চুলের সঙ্গেই না, মাথার খুলি, কানের ডগা, খোদ্‌ হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গেও। কাঁচির খোঁচা খেয়ে হর্ষবর্দ্ধন ক্ষেপে ওঠেন ; ইচ্ছা হয় নাপিতকে মনের সাধে দু' ঘা দেন বসিয়ে—কিন্তু দারুণ বাসনা তিনি দমন করে ফেলেন। নাপিতকে মারা আর আত্মহত্যা করা এক কথা, কেননা এমন সুযোগ প্রায়ই আসে যখন নাপিতের ক্ষুর আর তাঁর গলার দূরত্ব খুব বেশী থাকে না। অনেক ভেবে হর্ষবর্দ্ধন নাপিতকে মার্জ্জনা ক'রে ফেলেন। বিবেচক হর্ষবর্দ্ধন।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে পরিত্রাণ পেলেও চুল নিয়ে কি পরিত্রাণ আছে সে সব নাপিতের কাছে ? অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে মাথায়-মাথায় হয়ত রক্ষা পান কিন্তু চুলের অবস্থা দেখে হর্ষবর্দ্ধনের কান্না পায়—আয়নায় যেটুকু স্বচক্ষে দেখা যায় সে ত' শোকাবহ বটেই, আর যে-অংশ পরস্ব চোখে জান্‌তে হয় তার রিপোর্টও কম মর্ম্মভেদী নয়। এ ধারে খপ্‌চানো, ও ধারে খপ্‌চানো, কাকে-ঠোক্‌রানো, বকে-ঠোক্‌রানো—যত দিন না চুল বেড়ে আবার ছাঁট্‌বার মত হয়েছে তত দিন সে মাথা মানুষের কাছে দেখালে মাথা কাটা যায়। এই হেতু কাঁচি হাতে নাপিতের আবির্ভাব দেখ্‌লেই হর্ষবর্দ্ধনের জ্বর আসে, মাথা ধরে, ঘাম হয়, পেট কাম্‌ড়াতে থাকে—ঠিক যে সব উপসর্গ ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাবার সময় অনিবার্য্যরূপে দেখা দিত।

কিন্তু সে চুল-ছাঁটার সঙ্গে এ চুল-ছাঁটার তুলনাই হয় না। এ কেমন চেয়ারে ব'সে সাদা চাদর জড়িয়ে (যাতে একটি মাত্র পলাতক চুলও তোমার কাপড়-জামার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ না করতে পারে) দস্তুরমত আরাম ! ঘণ্টাখানেক চোখ বুজে ঘুমিয়েও নিতে পার, জেগে দেখ্‌বে তোফা চুল ছেঁটে দিয়েছে—ঠিক কচুয়ান্‌দের মত। তুমি কচুয়ান্‌ নও ব'লে যে তোমাকে কম খাতির করবে তা নয়—কোন রকম উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই এ সব সহরে নাপিতের কাছে। যে ঘোড়ার গাড়ী হাঁকায় না তাকেও এরা মানুষ বলেই গণ্য করে। কেন, হর্ষবর্দ্ধনকে কি এরা কম মর্য্যাদা দেখিয়েছে ? ঢোকা মাত্রই কত সাদর সম্ভাষণ—ডেকে চেয়ারে বসানো—সম্বর্দ্ধন কি কিছু কম করেছে এরা ? তবু তো হর্ষবর্দ্ধন

কচুয়ান্ নন্। হর্ষবর্দ্ধন গ্যাঁট্ হয়ে বসে পড়েন চেয়ারে, আরামে গা এলিয়ে দেন। মাথার পরে হু হু ক'রে পাখা ঘুরছে—সম্মুখে নিজের চেহারা দেখ্‌বার স্মুবর্ণ-স্মুযোগ—হর্ষবর্দ্ধন স্বর্গ-স্মুখ উপভোগ করেন। মুখখানা হাসি-হাসি ক'রে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করেন তিনি। নাপিত একটা নতুন ধরণের কাঁচি হাতে নেয়, কাঁচির কলেবর দেখে হর্ষবর্দ্ধন অবাক্ হন। কাঁচি না ব'লে তাকে চিরুনীও বলা যায়, তার মুখের দিকে চিরুনীর মত দাঁত আর হাতলের দিক্‌টা অবিকল কাঁচি! হর্ষবর্দ্ধন বস্তুটির মনে মনে নামকরণ করেন—'কাঁচিরুনী'! নাপিতকে প্রশ্ন করেন—"অদ্ভুত কাঁচি তো?"

"কাঁচি নয়, ক্লিপ্।" নাপিত উত্তর দেয়। "পেছনটা ক্লিপ্-ছাঁটা কর্‌ব তো?"

"যেমন কলকাতার দস্তর তাই কর।"

ঘাড়ের পেছনে ক্লিপ্ চল্‌তে থাকে, হর্ষবর্দ্ধন শিউরে শিউরে ওঠেন। যন্ত্রটা তেমন আরাম-দায়ক নয়। যেন ঘাড়ের চাম্‌ড়া একেবারে চেঁছে নেয়, চুলগুলোকে যেন গোড়া থেকে সমূলে উপ্‌ড়ে তোলে। কখনো ঘাড় কোঁচ্‌কান, কখনো টান করেন, কখনো কাৎ করেন কিন্তু কিছুতেই তিনি স্মুবিধা করতে পারেন না। অবশেষে 'মরীয়া' হয়ে তিনি লাফিয়ে ওঠেন—"থামাও তোমার কিলিপ্! ঘাড় গেল আমার। এ যে দেখ্‌ছি আসামী কাঁচির বাবা!"

নাপিত ঘাড় ধ'রে বসিয়ে দেয়, কোন উচ্চবাচ্য করে না। তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। পাড়াগেঁয়ে যারা প্রথম চুল ছাঁটায় তারা সবাই এই রকমই করে কিন্তু পরে আবার তারাই চেহারার খোল্‌তাই দেখে খুসী হয়ে আশাতীত বখ্‌সিস্ দিয়ে ফেলে। ক্লিপ্ চল্‌তে থাকে, হর্ষবর্দ্ধন একবার কাতরনেত্রে গোবর্দ্ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কি করবেন, ভাগ্যের কবল থেকে কারু কি নিষ্কৃতি আছে? তিনি অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। গোব্‌রা তাকিয়ে দেখে দাদার হাসি-হাসি মুখভাব বেশ কাঁদ-কাঁদ হয়ে এসেছে এখন। নাপিতের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে নীল দরজা ভেদ ক'রে সবেগে প্রস্থান করবে কিনা সে ভাব্‌তে থাকে। আপন মনে গজ্‌রায়—"আসলে হ'ল খুর্‌পী, নাম দিয়েছেন কিলিপ্! তা, খুর্‌পী চালাবে তো বাগানে চালাও গে, পরের ছেলের মাথায় কেন বাপু!"

পেছন শেষ ক'রে সাম্‌নে ছাঁটা স্মুরু হয়, কিলিপের স্থান অধিকার করে কাঁচি। সাম্‌নের চুল যেমন তেমনই থাকে, কেবল ডগাগুলো সামান্য ছেঁটে সমান ক'রে দেওয়া হয়। কাজ সমাধা হয়েছে জানিয়ে, পছন্দ হয়েছে কিনা নাপিত প্রশ্ন করে। হর্ষবর্দ্ধন সেই প্রশ্ন গোবর্দ্ধনের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

গোবর্দ্ধন প্রাণপণে পর্য্যবেক্ষণ করে কিন্তু চুল-ছাঁটাটা কোন্ জায়গায় হ'ল খুঁজে পায় না।

সাম্‌নের চুল তো ছোঁয়াই হয় নি আর পেছনটা দিয়েছে খুর্‌পী দিয়ে একদম্ ন্যাড়া ক'রে। সমান ক'রে আঁচ্‌ড়ালে সাম্‌নে দাড়ি পর্য্যন্ত ঢাকা পড়্‌বে—নাক-মুখই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না আর পেছনে তো মাথার খুলিই বেরিয়ে পড়েছে, তার সাদা চাম্‌ড়া ঢাক্‌তে গেলে পরচুলাই পরতে হয় কিনা কে জানে! গোব্‌রা স্বাধীন অভিমত দেয়—"দাদা, তোমার পেছনে দিয়েছে দাড়ি কামিয়ে আর সাম্‌নে? সাম্‌নে তো তুমি দেখ্‌তেই পাচ্ছ।"

"হুঁ, সাম্‌নেটা একটু কমানো দরকার।" হর্ষবর্দ্ধন মন্তব্য করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর আশঙ্কা হয়, কমাতে বল্‌লে হয়ত কাঁচি ছেড়ে কিলিপ্ দিয়ে কামাতে স্মুরু করে দেবে। ভয়াবহ যন্ত্রটার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ ক'রে তিনি বলেন—"না, থাক্।"

"তা হ'লে হেয়ার ড্রেস্ করি?" নাপিত হর্ষবর্দ্ধনের অনুমতির অপেক্ষা করে। হর্ষবর্দ্ধন মনে মনে আলোচনা করেন, হেয়ার মানে তো চুল, অবশ্য খরগোসও হয় কিন্তু এখানে চুলই হবে, কিন্তু ড্রেস্ করবে—সে আবার কি! চুলে কাপড় পরাবে নাকি? তিনি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন—"কিলিপের ব্যাপার নয় তো?"

"না না, মাথায় গোলাপ-জল দিয়ে—'

"তা দাও, তা দাও।" ঘাড়ের পেছনটা তখন থেকে ভারী জ্বল্‌ছিল, জল পড়লে হয়ত ঠাণ্ডা হতে পারে ভেবে হর্ষবর্দ্ধন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। "আচ্ছা, চুল না ছাঁট্‌লে বুঝি তোমরা গোলাপ-জল খরচ কর না—না?" নাপিত ঘাড় নাড়ে। "কর! বটে? আহা, তা জান্‌লে আমি ড্রেস্ হেয়ারই করাতাম, তা হলে চুল ছাঁট্‌তো কোন্ হতভাগা?"

নাপিত গোলাপ-জল দিয়ে চুলগুলো ভিজিয়ে দেয়, দিয়ে চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙুল চালায়। হর্ষবর্দ্ধনের আরাম লাগে, ঘুম পায়। কিন্তু ক্রমশঃই নাপিতের 'ড্রেস্ হেয়ারের' জোর বাড়তে থাকে, তার আঙুলগুলো যেন হয়ে ওঠে লৌহঘটিত—সে তার সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে হর্ষবর্দ্ধনের খুলির ওপর। হর্ষবর্দ্ধন লাফাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না, লাফাবেন কি করে? পায়ের জোরে মানুষ লাফায় বটে, কিন্তু লাফাতে হলে পা ও মাথা এক সঙ্গে তুল্‌তে হয়। এক্ষেত্রে তাঁর শ্রীচরণ স্বাধীন থাক্‌লে কি হবে, মাথা যে নিতান্তই বেহাত। মাথা বাদ দিয়ে লাফানো যায় না। হর্ষবর্দ্ধন আর্ত্তনাদ করেন—"একি হচ্ছে? একি হচ্ছে? এ কি রকম তোমাদের ড্রেস্ হেয়ার? এ তো ভালো নয়।"

খোট্টারা যেমন প্রবল পরাক্রমে বর্ত্তন্ মলে, গোবর্দ্ধন দেখে, সেই তালে দাদার ড্রেস্ হেয়ার চল্‌ছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করে—"এ কি বেওয়ারিশ মাথা পেয়েছ যে চট্‌কে-মট্‌কে নিচ্ছ?"

নাপিত এ সব বাজে কথায় কান দেয় না, তা'র কাজ ক'রে যায়। সে কখনো রগ্ টিপে ধ'রে, কখনো মাথায় থাপ্‌ড়া মারে, কখনো সমস্ত চুল মুঠিয়ে ধ'রে গোড়া ধরে টানে,

কখনো দু'ধার থেকে টিপে মাথাটাকে চ্যাপ্টা করার চেষ্টা করে, কখনো ঘাড় ধ'রে ঝাঁকুনি দেয়—তার দেহের সমস্ত শক্তি এখন করতলগত। হর্ষবর্দ্ধনের বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমেই ক'মে আসে, তিনি নির্জ্জীব হ'য়ে পড়েন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা যায়—"গোব্রা, তোর বৌদিকে বলিস্ আমি সজ্ঞানে কলকাতা-লাভ করেছি।" এর বেশী আর তিনি বল্তে পারেন না। কিন্তু গোব্রা বুঝ্তে পারে দাদার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, দাদাকে সজ্ঞানে আসাম-লাভ করাতে হ'লে

ক্রমশঃই 'ড্রেস্ হেয়ারের' জোর বাড়তে থাকে।

এই মুহূর্ত্তেই এখান থেকে সট্‌কান্ দিতে হবে। সে যেন ক্ষেপে যায়—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বল্ছি আমার দাদাকে; নইলে ভাল হবে না।"

নাপিত হতভম্ব হয়ে হস্তক্ষেপ থামায়।

"এম্নি ভাবে মাথাটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল্ছ, এর মানে কি?"

"চুলের গোড়া শক্ত হয় এতে।"

"চুলই রইল না ত' চুলের গোড়া! টেনে টেনে তো অর্দ্ধেক চুল ওপ্ড়ালে, মাথায় চুল কোথায়?"

"এ রকম করলে মাথা ছেড়ে যায়।"

"মাথা ছেড়ে যায়?" গোব্রা যেমন অবাক্ হয়, তেম্নি চটে। "ছেড়ে যায়? ছেড়ে গেলে তুমি যোড়া দিতে পারবে?" নাপিত কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। গোব্রা কণ্ঠে আরো জোর দেয়—"যে মাথা তুমি দিতে পার না সে মাথা নেবার তোমার কী অধিকার?"

হর্ষবর্দ্ধন ঘেরাটোপের ভেতর দিয়ে আঙ্গুল বাড়িয়ে ক্লিপ্টা হাতাবার চেষ্ট করেন—"গোব্রা, সহজে না ছাড়ে যদি তা' হ'লে দে এই যন্তরটা ওর ঘাড়ে বসিয়ে। মজাটা টের পাক্।···মাথা ছাড়িয়ে দেবেন—ভারি আব্দার!"

গোব্রা বলে—"না, দরকার নেই ঝগ্ড়াঝাঁটির। এই নাও তোমার মজুরি দশ টাকা। দেশে চুল ছাট্‌তে দশ পয়সা—কলকাতায় না হয় দশ টাকাই হবে, এর বেশী তো না? দাদা আর দেরি কোরো না, উঠে এস। চল পালাই।"

দুই ভাই নাপিতকে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দেয় না, চক্ষের পলকে সেলুন পরিত্যাগ করে।

বাইরে এসে হর্ষবর্দ্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। হতাশভাবে মাথায় হাত বুলান—"সত্যিই তো, টাক ফেলে দিয়েছে দেখ্ছি! যাক্, খুব রক্ষা পাওয়া গেছে। আর একটু হ'লে মাথাটাই ফেলে আস্তে হ'ত।"

গোবর্দ্ধন ঘাড় নাড়ে—"এরা পেছনের চুল দেয় দাড়ি-কামানো ক'রে আর সাম্নের চুল দেয় ছিঁড়ে—একেই কি বলে চুল ছাটা? আজব সহরের অদ্ভুত হালচাল!···য়্যাঁ, এত লোক জম্ছে কেন চারদিকে?"

দুই ভাইকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমশঃই জনতা ভারী হ'তে থাকে। হর্ষবর্দ্ধন ফিস্ ফিস্ করে বলেন—"দু'জনের দু'রকম চুল দেখে অবাক্ হচ্ছে বোধ হয়।"

"উঁহু," গোব্রা অনুচ্চ কণ্ঠে জানায়, "তোমার বোর্খাটা খুলে ফেল নি এতক্ষণও?"

পালাবার মুখে ঘেরাটোপ্ ফেলে আসার অবকাশ সামান্যই ছিল কিন্তু সেটাকে তখন পর্য্যন্ত গায়ে জড়িয়েই রেখেছেন হর্ষবর্দ্ধন। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হ'ল। সত্যি, লোকে যা বলে মিথ্যা নয়, অদ্ভুত কলকাতার হালচাল! ঘেরাটোপ্ খুলে ফেল্‌তেই জনতা আপনা থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কোন উচ্চবাচ্য কর্‌ল না।

চাদরটা গুটিয়ে বগলে চেপে হর্ষবর্দ্ধন বলে—"এই দেখ্!" তাঁর হাতে সেই ভয়াবহ ক্লিপ্টা। "আমি ইচ্ছে ক'রে আনি নি, পালাবার সময় আমার হাতে ছিল। কি কর্‌ব? ফেরৎ দিয়ে আসি?"

"আর যায় ওখানে?" গোব্রা ভয় দেখায়। "আবার যদি সুরু করে?"

"তবে থাক্ এটা। দেশে গিয়ে দীনু নাপিতকে দেখাব। এবার যে বেটা আমার চুল ছাঁটতে আস্‌বে দেব এটা তার ঘাড়ে বসিয়ে—তা কলকাতার নাপিতই কি আর আসামের নাপিতই কি!"

"বেশ করেছ এটা নিয়ে এসে। কলকাতার বহুৎ লোক তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবে। অনেকের ঘাড় বাঁচিয়ে দিলে।"

হর্ষবর্দ্ধন মাথা নাড়েন—"যা বলেছিস্ তুই। একখানা মানুষ-মারা কল।" ক্লিপ্ দিয়ে একবার পিঠ চুল্‌কে নেন্ তিনি। "যাক্, ঘামাচি মারা যাবে এটা দিয়ে।"

"বৌদি কাক তাড়াবে এটা দিয়ে। কাকের উৎপাত থেকে বাঁচা যায় তা' হ'লে। মানুষ এ দেখ্‌লে ভয় খায় আর কাক ভয় খাবে না? কি বল দাদা?"

"তখন থেকে ঘাড়টা কি জ্বালা করছে! মাথাটাও টাটিয়ে উঠেছে। চুল নিয়ে কি কম টানাটানি করেছে? ইস্কুলের সেই যে কি ইস্‌পোর্ট হয় জানিস্, তাই।"

"হুঁ, ওয়ার অব্ টাগ্।"

হর্ষবর্দ্ধন ব্যাখ্যা ক'রে বিশদ করেন—"ওয়ার্ মানে যুদ্ধ, বালিশের ওয়াড়ও হয়, কিন্তু সে আলাদা ওয়াড়—"

গোবর্দ্ধন বাধা দেয়—"কেন, আলাদা হবে কেন? আমরা ছোট বেলায় বালিশ নিয়ে যুদ্ধ করি নি? কত বালিশের তূলো বের ক'রে দিয়েছি।"

"দূর্ মুখ্যু, বালিশের ওয়াড় বুঝি ওকে বলে? বালিশের জামাকে বলে বালিশের ওয়াড়, তাও জানিস্ না? ওয়ার অব্ টাগ্,—অব্ মানে হ'ল 'র' আর টাগ্? টাগ্ মানে কি?"

"কি জানি! টাক ফাক হবে।"

"তাই হবে বোধ হয়। ওয়ারের চোটে প্রায় টাক পড়ে গেল আমার। হ্যাঁ, কথাটা হবে ওয়ার অব্ টাক, বুঝলি? লোকের মুখে মুখে টাক টাগ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

গোব্‌রা মুখখানা গম্ভীর করে—"উঃ, কাল থেকে কি টেকো লোকই দেখ্‌ছি রাস্তায়! কলকাতার লোকের এত টাক কেন হয় এখন বোঝা গেল।"

"কেন?"

"এই সব দোকানে চুল-ছাঁটার জন্য। দু'বার ছাঁট্‌লেই টাক—একদম্ চাঁদি পরিষ্কার! চুল ছাঁটালেই চুল ধ'রে টান্‌তে দিতে হবে—এই হ'ল কলকাতার নিয়ম।"

"বলিস্ কি! ভাগ্যিস্ গোঁফ ছাঁটি নি। তা' হ'লে কি সর্ব্বনাশই না হ'ত!" হর্ষবর্দ্ধন সভয়ে গোঁফ চুম্‌রান। গোঁফ তাঁর ভারী আদরের এবং এই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি যার ভাগ ইচ্ছা থাকৃলেও তাঁর ভাইকে দেবার তাঁর উপায় ছিল না।

পৃথিবীর আর এক রূপ

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

আমাদের পৃথিবী একেবারে বুড়া না হইলেও তার বয়স হইয়াছে। এখন তার প্রৌঢ় অবস্থা বলা যাইতে পারে। পৃথিবী বরাবরই এমনটা ছিল না—ভবিষ্যতেও এ রকম থাকিবে না। অবশ্য দু'-চার-দশ বছরে তার কিছু হইবে এ কথা আমি বলিতেছি না, আমি যে হিসাবের কথা বলিতেছি সেটা ভূতত্ত্ববিদ্‌দের হিসাব—দু'-এক লক্ষ বছর এদিক্-ওদিক্ হওয়াটা তাঁরা "ধর্ত্তব্যের" মধ্যেই আনেন না।

পৃথিবীর জন্মের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত তার উপর দিয়া অনেক পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে। প্রথম যখন তার জন্ম হইল তখন সে ছিল একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা—জ্বলন্ত গ্যাস্ ছাড়া তার মধ্যে আর বিশেষ কিছুই ছিল না। তার পর সে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, তার বাহিরের আগুন নিভিয়া গেল, গ্যাস্ জমিয়া প্রথমে তরল হইল, তার পর আরও জমাট বাঁধিয়া একটা শক্ত মাটী-পাথরের খোলসে আসিয়া দাঁড়াইল—পৃথিবীর ভিতরটা অবশ্য তখনও অগ্নিকুণ্ড। এদিকে পৃথিবীর বাহিরের কুয়াসা আস্তে আস্তে কাটিয়া গেল, সেখানে আসিল বাতাসের আবরণ—যা'কে আমরা বলি 'বায়ুমণ্ডল'।

শৈশবে পৃথিবী দেখিতে কেমন ছিল

তার পর পৃথিবীর বুকে আরও কত না পরিবর্ত্তন হইল! গাছপালা আসিল,

নানা রকম জীবজন্তু আসিল, অবশেষে দেখা দিল মানুষ। মানুষের হাতে পড়িয়া পৃথিবীর চেহারা আবার আরও অনেকখানি বদ্‌লাইয়া গেল—ফলে, ফুলে, সমৃদ্ধিতে পৃথিবী ভরিয়া উঠিল। মানুষের মত অন্যান্য গ্রহদেরও যদি মন থাকিত, ভাবনা-চিন্তা থাকিত, তবে পৃথিবীর এই চেহারা দেখিয়া তাদের নিশ্চয়ই খুব হিংসা হইত।

কিন্তু পৃথিবী বরাবরই এ রকম থাকিবে না। আজ না হোক্, লক্ষ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর চেহারা আবার একেবারে বদ্‌লাইয়া যাইবে, এখনকার পৃথিবীর সঙ্গে তার বিশেষ মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মানুষ হয়তো তখন থাকিবে না—কিংবা এখনকার মানুষের চেয়ে উন্নত ধরণের কোনও মানুষ বা অন্য জীব তখন পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিবে। তার পর তারাও হয়তো এক দিন লোপ পাইবে—পৃথিবী জীবের বাসের অযোগ্য হইয়া যাইবে; এখন চাঁদের যে অবস্থা পৃথিবীর অবস্থাও হইবে সেই রকম। পোড়ো পৃথিবী—মরা পৃথিবী তখন কোন রকমে তার দেহটা টানিয়া লইয়া আকাশের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইবে। কত দিন পরে যে পৃথিবীর এ দশা ঘটিবে তা' পণ্ডিতেরা এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না, কিন্তু সে দিন যে একদিন-না-একদিন আসিবে সে বিষয়ে তাঁদের কারও সন্দেহ নাই।

পৃথিবী ক্রমেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, তার ভিতরকার অবস্থাও তাই। পৃথিবীর উপরকার আগ্নেয়গিরির অধিকাংশই নিভিয়া গিয়াছে—যে ক'টা আছে তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যায়। কিন্তু সেগুলিও আর বেশী দিন নাই, শীঘ্রই সেগুলি নিভিয়া গিয়া চাঁদের আগ্নেয়গিরির মত শুধু নামেই আগ্নেয়গিরি হইয়া থাকিবে।

পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের চার দিকে লাট্টুর মত পাক খাইতেছে তা' তোমরা সবাই জান। এ রকম এক-একটা পাক খাইতে তার এখন লাগে ২৪ ঘণ্টা—তাই আমাদের এক-একটা দিন ২৪ ঘণ্টা লম্বা। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবী যতই ঠাণ্ডা হইতেছে তার এই ঘুরপাক খাইবার বেগও ততই আস্তে আস্তে কমিয়া আসিতেছে। এমন এক দিন আসিবে যেদিন পৃথিবীর ঘুরিবার বেগ এত কমিয়া

যাইবে যে যতটা সময় সে সূর্য্যকে একবার চক্কর দিয়া আসিতে লাগায় নিজের মেরুদণ্ডের চার দিকে একটা পাক খাইতেও সে ততটা সময় লাগাইবে। বুধের এখনই এ অবস্থা আসিয়াছে, শুক্রগ্রহেরও তাই, পৃথিবীরও এক দিন এ অবস্থা আসিবে। তখন পৃথিবীর এক-একটা দিন হইবে এখনকার দিনের চেয়ে ৩৬৫ গুণ বড়।

তোমরা হয়তো ভাবিতেছ, ভারী মজার কাণ্ড তো! অত বড় লম্বা এক একটা দিন পাইলে কত মজাই না করা যাইবে! কিন্তু আসলে ব্যাপারটি কি দাঁড়াইবে তা' বোধ হয় তোমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পার নাই। সূর্য্যকে একবার ঘুরিতে পৃথিবীর যতটা সময় লাগে ততটা সময় যদি সে নিজের চারদিকে পাক খাইতেও লাগায় তবে পৃথিবীর একটা দিক্ আর কখনও সূর্য্যের দিকে ফিরিতে পারিবে না। আমার কথা সত্যি কিনা তা' ইচ্ছা করিলে একটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। টেবিলের উপর একটা ল্যাম্প্ রাখিয়া একটা বল্ লইয়া ল্যাম্পের চারদিকে এমন ভাবে আস্তে আস্তে ঘুরাও যেন বল্‌টা ল্যাম্পের চারদিকে একটা পাক খাইবার সঙ্গে সঙ্গে লাট্টুর মত নিজের মেরুদণ্ডের উপরেও—বেশী নয়, মাত্র একটা পাক খায়। কি ব্যাপার হয় দেখ। দেখিবে, বলের একটা দিক্‌ই সারাক্ষণ ল্যাম্পের দিকে মুখ করিয়া থাকিবে, অপর দিক্ থাকিবে বরাবর অন্ধকারে। মনে কর বল্‌টি হইতেছে আমাদের পৃথিবী আর ল্যাম্প্‌টি সূর্য্য। এবার বিশ্বাস হইল তো? কাজেই দেখ, তখন পৃথিবীর একটা পিঠে, ধর আমাদের দেশে, হইবে চিরকালের মত দিন, আর অপর পিঠে, ধর আমেরিকায়, হইবে চিররাত্রি। এক দিকে থাকিবে ক্রমাগত রোদ, ক্রমাগত গরম; মাটী সব সময়েই এমন তাতিয়া থাকিবে যে তার উপর পা রাখে কার সাধ্য? খাল, বিল, সমুদ্র সে প্রচণ্ড রোদে সব হয়তো শুকাইয়া যাইবে, গাছপালা মরিয়া যাইবে, জীবজন্তু তো আগেই যাইবে। সমস্ত দেশটা যুড়িয়া রহিবে এক বিরাট্ খট্‌খটে শুক্‌না মরুভূমি—আর তার গা যুড়িয়া বিরাট্ বিরাট্ ফাটল। আবার অপর পিঠে হইবে ঠিক উল্টা। এক ফোঁটা রোদ ভুলিয়াও সেখানে যাইবে না, ক্রমাগত ঠাণ্ডা পড়িতে থাকিবে, মাটী হইবে বরফের মত হিম আর তার উপরকার খাল, বিল, সমুদ্র সব জমিয়া

বরফ হইয়া যাইবে। আলো না পাইয়া, শীতে জমিয়া গাছপালা সব মরিয়া যাইবে—জীবজন্তুরও বাঁচিবার কোন আশা থাকিবে না।

শুধু এটুকুতেই নিস্তার নাই। তোমরা জান কোন জায়গা গরম হইয়া গেলে সেখানকার বাতাসও গরম হইয়া হাল্কা হইয়া যায়, তার পর সে বাতাস যায় উপরে উঠিয়া আর অন্য জায়গার ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করিয়া ছুটিয়া আসে তার সেই ফাঁক পূরাইতে। এমনি করিয়াই ঝড় হয়। পৃথিবীর এক পিঠ গরম হইলে তার উপরকার বাতাস মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গরম হইয়া উপরে উঠিয়া যাইবে আর সঙ্গে সঙ্গে অপর পিঠ হইতে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটিয়া আসিয়া তার জায়গা দখল করিবে। কাজেই গোটা পৃথিবী যুড়িয়া সারাক্ষণ যে কী ভীষণ ঝড়-ঝাপ্টা চলিবে তা' আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না।

"পণ্ডিতেরা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলেন। কেউ কেউ বলেন, এমন এক দিন হয়তো আসিবে যেদিন পৃথিবীর আকর্ষণী-শক্তিতে তার উপরকার বাতাসকে আর টানিয়া রাখা যাইবে না। সে বাতাস অস্তে আস্তে পৃথিবীর টান অগ্রাহ্য করিয়া মহাশূন্যে উড়িয়া যাইবে। হয়তো আকাশের অন্য কোনও অধিকতর শক্তিশালী গ্রহ-তারা তা' টানিয়া লইবে কিংবা হয়তো পৃথিবী অত্যধিক ঠাণ্ডা হইলে তার বাতাস জমিয়া তরল কিংবা শক্ত হইয়া তারই বুকে ঝরিয়া পড়িবে। পৃথিবীকে ছাড়িয়া না গেলেও বায়ুমণ্ডলের মত সে বাতাস আর পৃথিবীকে ঘিরিয়া রাখিবে না, সে বাতাস থাকিবে আমাদের পায়ের তলায় মাটীতে—বাতাসের যা যা সুবিধা তার কোনটাই আর পাওয়া যাইবে না।

বায়ুমণ্ডল না থাকিলে মাটীতে পৃথিবীর কি দশা হইবে ভাবিতে পার? প্রথমতঃ বাতাসের অক্সিজেনের অভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া জীবজন্তু, গাছপালা পট্ পট্ মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কোনও রকমে—কোনও অলৌকিক উপায়ে নিঃশ্বাসের অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা যায় তবুও পৃথিবীর অবস্থা বেশী সুবিধার হইবে না। বাতাস আমাদের পৃথিবীর চারদিকে থাকিয়া তাকে কম্বলের মত জড়াইয়া রাখিয়াছে। দিনের বেলা সে সূর্য্যের তাপকে অনেকটা আটকাইয়া রাখে—সবটা পৃথিবীর উপর পড়িতে দেয় না, আবার রাত্রে সে আটকাইয়া রাখে

পৃথিবীর উপরকার তাপকে—পৃথিবীকে চট্ করিয়া জুড়াইতে দেয় না। বাতাস যদি না থাকে তবে দিনের বেলা সূর্য্যের সমস্তটা কিরণই পৃথিবীর উপর পড়িবে, ফলে পৃথিবী একটা আগুনের কুণ্ড বলিয়া মনে হইবে, আবার রাত্রে পৃথিবীর উপরকার সমস্ত উত্তাপই যাইবে চট্ করিয়া চলিয়া, ফলে পৃথিবী হইয়া যাইবে একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা। কাজেই দেখ, বাতাস আছে বলিয়াই আমরা পৃথিবীর উপর সুস্থ হইয়া টিকিয়া আছি। বাতাস না থাকিলে একবার দিনের প্রচণ্ড গরমে আর তার পরেই রাত্রের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বাস করা অসাধ্য হইয়া পড়িবে।

বাতাস না থাকিলে আরও অনেক মজার মজার ব্যাপার হইবে। তোমরা বোধ হয় জান, শব্দের উৎপত্তি হয় বাতাসের সাহায্যে। আমরা যখন কথা বলি তখন বাতাসের মধ্যে একটা ঢেউ উঠে, সেই বাতাসের ঢেউই হইতেছে শব্দ; সেই ঢেউ যখন আমাদের কানে গিয়া লাগে তখনই আমরা সে শব্দ শুনিতে পাই। বাতাস না থাকিলে শব্দ বলিয়া পৃথিবীতে কিছু থাকিবে না—পৃথিবীর সমস্ত লোকই হইয়া যাইবে বোবা আর কালা। তখনও যদি পৃথিবীতে স্কুল থাকে—তবে দেখিবে সেগুলি সবই এক-একটা "ডেফ্ য়্যাণ্ড্ ডাম্ব্" স্কুল (মূক-বধির বিদ্যালয়)। অবস্থা সকলেরই বেশ কাহিল হইবে—না করিতে পারিবে একটু গল্প-গুজব, না করিতে পারিবে একটু গান-বাজনা। কি বিশ্রী ব্যাপার হইবে বল তো? কালোয়াৎ, বক্তা, থিয়েটার-ওয়ালা এদের অন্ন একেবারে যাইবে। তোমাদের এত সাধের 'টকি' উঠিয়া গিয়া আবার হয়তো হইবে সেই "সাইলেণ্ট্ বায়োস্কোপ্। তার পর গন্ধ—সেও আমরা টের পাই বাতাসেরই জন্য। বাতাস না থাকিলে তোমাদের বাগান-ভর্ত্তি ফুল গাছ শুধু চোখে দেখিবার জিনিষ হইবে, পলাশ ফুল আর গোলাপ ফুলে কোনও তফাৎ থাকিবে না। শুধু তাই নয়, বাতাস আমাদের মাথার উপর থাকিয়া দিবারাত্র প্রচণ্ড চাপ দিতেছে, বাতাস না থাকিলে সে চাপও থাকিবে না—আমরা হয়তো ফাটিয়াই মারা যাইব।

আরও অনেক কাণ্ড হইবে। পৃথিবীতে বাতাস না থাকিলে জলও থাকিতে পারে না। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন একটা পাত্রের মধ্যে

জল রাখিয়া তার উপরকার সমস্ত বাতাসটুকু যদি পাম্প্ করিয়া লওয়া যায় তবে সে জল তখনই টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে আর দেখিতে দেখিতে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। পৃথিবীর বাতাস চলিয়া গেলে জলও সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প হইয়া মহাকাশে মিলাইয়া যাইবে। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র শুকাইয়া গিয়া তার জায়গায় পড়িয়া থাকিবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নূনে বোঝাই গর্ত্ত, আর তার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলজন্তুর স্তূপীকৃত মৃতদেহ। নূনের ব্যবসাদারদের অবশ্য খুবই সুবিধা হইবে—তবে দুঃখের বিষয় তখন আর পয়সা খরচ করিয়া কেউ নূন কিনিবে না এবং ব্যবসা করিবার কিংবা নূন কিনিবার মত লোকও পৃথিবীতে কেউ থাকিবে না। বাতাসের অভাবে কোন রকম অলৌকিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি বা কেউ বাঁচিয়া থাকে, জলের অভাবে আবার তাকে মরিতে হইবে।

জলের অভাবে আরও অনেক ব্যাপার হইবে। মানুষ যদি বা আবার কোনও অলৌকিক উপায়ে বাঁচিয়া থাকে তবে পৃথিবীতে তার খাইবার কিংবা পিপাসা মিটাইবার কোনও জিনিষ থাকিবে না। সমুদ্রের মত খাল, বিল, পুকুর সবই খা-খা করিবে। মেঘ থাকিবে না, বৃষ্টি হইবে না। একে বাতাসের অভাবে চারিদিকে গুমোট, তার উপর বাতাসে যে জল-কণা থাকায় আমরা শরীরটাকে একটু ঠাণ্ডা বোধ করি তা'ও না থাকায় মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে তার কি শারীরিক অসোয়াস্তিটাই না হইবে! তবে কাউকে ঘামে ভিজিতে হইবে না এই যা একটা আশার কথা।

জল ও বাতাসের জন্য পৃথিবীর চেহারা দিনরাতই বদ্‌লাইতেছে। জল এক জায়গা ভাঙ্গিতেছে, আর এক জায়গায় মাটী ফেলিতেছে। বৃষ্টির জল আকাশের নানা গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়া পৃথিবীর বুকে নানা রকম রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। বাতাসও তাই করিতেছে, তা' ছাড়া বাতাসে ধূলাবালি উড়াইয়া তাদের ঘর্ষায় ঘষায় পৃথিবীর উপরকার পাহাড়-পর্ব্বত, ঘর-বাড়ী ধ্বংস করিতেছে। এক দিনে নয়, দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে পৃথিবীর বুকে এই পরিবর্ত্তন চলিয়াছে। জল ও বাতাস না থাকিলে পৃথিবীতে এ সব কোন পরিবর্ত্তনই আর হইবে না।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিবে। পৃথিবীর উপর বাতাস না থাকিলে যত

রাজ্যের ধূলা-বালি—যা নাকি সমস্ত বায়ুমণ্ডল ছাইয়া রাখিয়াছে—সব আসিয়া পৃথিবীর উপর জমা হইবে। সে ধূলার নীচে পৃথিবীর ঘর, বাড়ী, সহর, বন সমস্ত একেবারে ডুবিয়া যাইবে।

আকাশে ধূলা না থাকিলে আরও কতকগুলি কাণ্ড হইবে। তোমরা দেখিয়াছ, দিনের বেলা সারা আকাশ কেমন সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করে!

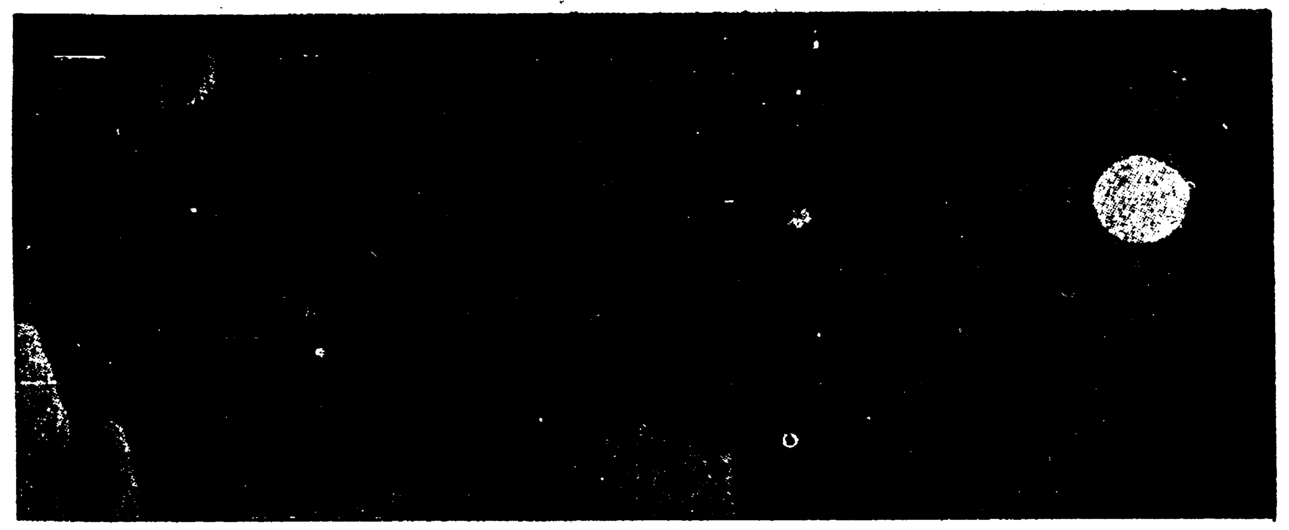

ধূলাহীন পৃথিবীর চেহারা—এক সঙ্গে আকাশে চাঁদ, তারা, সূর্য্য।

কোথায় বা থাকে তারার দল আর কোথায় বা থাকেন চাঁদা মামা! আবার ভোরবেলা যখন সূর্য্য উঠে আর সন্ধ্যাবেলা যখন সূর্য্য অস্ত যায় তখন আকাশটা কেমন লালে লাল হইয়া যায়! অন্য সময়েও আকাশের রং কি চমৎকার নীল দেখায়! এ সবই হয় ধূলার জন্য—ধূলা না থাকিলে ও সব কিছুই হইবে না। তখন আর সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের সময় আকাশ লাল দেখাইবে না—আকাশের নীল রং কোথায় উড়িয়া যাইবে! তখন দিনের বেলাই আকাশটা থাকিবে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, তা'তে চাঁদ, তারা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিবে; আর তারই এক কোণে আমাদের 'সূর্য্যিমামা' তাঁর আগুনের বেড়া লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন—আকাশের সেইখানটা যা একটু ঝক্‌মক্ করিবে।

পৃথিবীর এ অদ্ভুত রূপ কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কল্পনা করিতে গেলেও কৌতূহলের চেয়ে আতঙ্কটাই হয় বেশী। তবে তোমাদের ভয়ের কারণ নাই—কারণ পৃথিবীর যখন এ দশা আসিবে তখন তুমিও থাকিবে না,

আমিও থাকিব না, তোমাদের নাতি-পুতি—তাদের বংশধরেরা কেউই থাকিবে না। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পরে যে পৃথিবীর এ দশা হইবে তা' পণ্ডিতেরা আজও হিসাব করিয়া বলিতে পারেন নাই।

লিফ্‌ট্‌ম্যান্‌

(শ্রীসুকুমার দে সরকার)

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আকাশ-ছোঁয়া দোতলা বাড়ীখানা বেলা দশটা না বাজতে বাজতেই প্রকাণ্ড একটা মৌচাকের মত গুণ-গুণিয়ে ওঠে। যত বেলা বাড়ে মৌমাছির ভিড়ও তত বেশী হয়; মধু আহরণে সকলেই ব্যস্ত। তার পর এই কলরব, এই ব্যস্ততা বিকেল বেলা অবধি পূরোদমে চলতে থাকে—কত যে অফিস বাড়ীটায় বাসা বেঁধেছে তার ইয়ত্তা নেই। দিনের পর দিন চলে টাকার লেন-দেন, টাকার কারবার, টাকার ঝন্‌ঝনানি। হাজার হাজার লোক নিয়মিত আসে আর যায়—কত ব্যস্ত-সমস্ত বড় সাহেব, ভারিক্কি বড় বাবু, ছোট বাবু, কলমপেশা কেরাণীর দল! কলমপেশা কেরাণীর দল ভরা-পেটে সিঁড়ির কাছে এসে ওপর পানে তাকিয়ে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তার পরে ছাতিটা বগলে চেপে ধ'রে ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। তাদের নাকের ওপর দিয়েই প্রায় বড় সাহেব আর বড় বাবুদের নিয়ে লিফ্‌ট্‌ ঘস্‌ ঘস্‌ করে ওপরে উঠে যায়, আবার ঘস্‌ ঘস্‌ করে নেমে আসে। তারা তখনও সিঁড়ি ভাঙ্গছে।

লিফ্‌ট্‌ম্যান্‌ শিউশরণ বেলা ন'টা বাজতেই পোষাক পরে, তকমা এঁটে, মাথায় কালো টুপিটা পরে লিফ্‌টের বাইরে এসে বসে, তার পরে "বড়"রা কেউ এলেই লাফিয়ে উঠে সেলাম করে, লিফ্‌টের মধ্যে গিয়ে কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ লোহার দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে ভিতরকার পেতলের হাতলটায় মৃদু একটা ধাক্কা দেয়, লিফ্‌ট্‌ ঘস্‌ ঘস্‌ করে ওপরে উঠতে থাকে।

কত দিন যে শিউশরণ বাহাল হয়েছে কেউ জানে না। অফিসের লোকেরা বরাবর দেখে আসছে তাকে। শিউশরণ লিফ্‌টেরই একটা অংশ যেন। তাই গত মাসে যখন শিউশরণ ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল আর তার বদলে অন্য আর একজন লিফ্‌ট্‌ম্যান্‌ লিফ্‌ট্‌ চালাচ্ছিল—অফিসের লোকেদের চোখে লেগেছিল সে এক বিস্ময়।

ইষ্ট ব্যাঙ্কের গোল আলুর মত চেহারার বড় বাবু পান চিবোতে চিবোতে ওপরে উঠে এসে বললেন—'বেটা শিউশরণ পাজী হ'লে কি হয়, সেলাম করতে জান্‌ত। নতুন লিফ্‌ট্‌ম্যান্‌ বেটা সেলাম করতে জানে না। পাজী বেটাকে দেখে নেব একবার।'

ইষ্ট ব্যাঙ্কের বড় বাবুর কাছে জগৎ শুদ্ধ সব পাজী।

যাক্‌, সুদূর মুঙ্গের জেলার ক্ষেত, খামার আর খোলা মাঠের মায়া কাটিয়ে শিউশরণ আবার ফিরে এসেছে তার অভ্যস্ত স্থানে আর এবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার বড় ছেলেকে কলকাতার হালচাল দেখাবার জন্য। বয়স ত' প্রায় হ'ল, এবারে রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে বৈকি।

বড় ছেলে বলে তোমরা যেন মনে ক'র না জোয়ান মস্ত এক ছেলে। এই বছর পাঁচেকের ফুটফুটে একটা সুন্দর ছেলে ময়লা ছোট একটা কাপড় পরে বাপের হাত ধরে এসে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সেই আকাশ-ছোঁয়া দোতলা বাড়ীতে আশ্রয় নিল।

সহর দেখে তার বিস্ময়ের কথা আর লিখ্‌ব না কেননা সমস্তই তার কাছে যেন একটা স্বপ্ন। যেন মা'র কাছে শোনা উপকথার কোন দেশে সে এসে পড়েছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীগুলো যেন দৈত্য—কার অভিশাপে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সব চেয়ে অবাক্‌ হ'ল সে লিফ্‌ট্‌ দেখে। এ কি তাজ্জব কল! আপনা-আপনি ওপরে উঠে যায় আবার নেমে আসে!

সহরের বিচিত্রতায় দু-এক দিনেই সে ভুলে গেল মাকে ছেড়ে আসার দুঃখ। সে দেখে কত লোক আসে যায়। কারণে অকারণে সে ছোট্ট হাতটা কপালে তুলে বলে—'সেলাম বাবুজী।'

এটা সে বাপের কাছে শিখেছে।

শিউশরণ বলেছিল—'মহাবীর, বড় বাবুদের দেখলেই সেলাম করবি।' বড় ছোট বিচারের বালাই তার নেই, সে বাবু দেখলেই চটপট সেলাম করে।

প্রথম যখন সে লিফ্‌টে চড়ে বাপের সঙ্গে ওপরে উঠ্‌ল বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে কথা বের হয় নি। ইষ্ট ব্যাঙ্কের বড় সাহেবের পেছনে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। নীচে দেখতে দেখতে সব ছোট হয়ে যাচ্ছে—একবার আলো আর একবার অন্ধকার। দোতলার ওপরে উঠে এসে সে ভয়ে ভয়ে যখন চাতালে পা দিল তখনও তার মনে হচ্ছে চাতালটাই বুঝি এবার হুস হুস করে ওপরে উঠে যাবে। ছাদটা ভেঙ্গে আকাশে সে মিলিয়ে যাবে কোথায় কোন মেঘের ভেতর। জানলা দিয়ে নীচে মানুষের সারিকে ঠিক পিঁপড়ের মত লাগে, মোটরের দল সার বেঁধে ছুটোছুটি করছে। দু' পাশে তার অফিস গম্ গম্ করছে। কিন্তু লিফ্‌টে নামাটা আরও মজার। গাটা কেমন শির শির করে, একটু-একটু ভয়ও করে। সে বাপের জামার পেছনটা চেপে ধরে জুল জুল করে চেয়ে থাকে।

ইষ্ট্ ইনসিওরেন্সের ছোট বাবু নামছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—'ছেলেটা কে রে শিউশরণ?'

'লেড়কা বাবুজি।'

'তোর?'

'জি হাঁ।'

'বেশ বেশ।'

ইষ্ট্ ইন্‌সিওরেন্সের ছোট বাবু তার গাল দুটো টিপে দিয়ে চলে যান।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট গম্‌গম্ ক'রে। তাদের মৌচাকের মধ্যে থেকে চাপা গুণ্‌গুণ্ আওয়াজ ওঠে। বেলা গড়িয়ে চলে। শিউশরণের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে কত প্রশ্নের বোঝা যে তাকে সইতে হয় বলা যায় না।

'এত লোক এখানে কি করে? লিফ্‌ট্ ওঠবার সময় ওটা কি নামে? ওতে লোক চড়ে না কেন?'

হঠাৎ শিউশরণ লাফিয়ে উঠে চাপা গলায় বলে—'সেলাম কর মহাবীর।'

'সেলাম সাহেব।'

ইষ্ট্ ব্যাঙ্কের ব্যস্ত-সমস্ত বড় সাহেবের ও সব দেখবার সময় নেই। তিনি ঝড়ের মত আসেন আর ঝড়ের মত যান। ব্যবসার হাজার হাজার শাখা-প্রশাখা তাঁর মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে আছে, ছোটখাট ব্যাপার চোখে পড়ে না।

ইষ্ট ব্যাঙ্কের বড় বাবুর কিন্তু নজর এড়ায় না।

'আ মর, এ ছোঁড়াটা আবার কোথা থেকে এল?'

'হামার লেড়কা বাবুজী।'

'তবে ত' ধন্য হয়ে গেলাম আর কি! ওকে লিফ্‌টে উঠেয়েছিস কেন? একটা রিপোর্ট করতে হচ্ছে তোর নামে।'

মহাবীরপ্রসাদ তখন ভয়ে কুঁকড়ে গেছে।

বিকেলে ক্লাইভ ষ্ট্রীট ঝিমিয়ে পড়ে, তখন যেন তার অন্য রূপ। থেমে যায় সমস্ত গোলমাল, সব কলরব! কে যেন রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে এক নিমেষে সব ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেল। সব অফিস বন্ধ হয়ে যায়, বিরাট্ দোতলা বাড়ীটা খাঁ খাঁ করে। শিউশরণ লিফ্‌টের দরজায় তালা লাগিয়ে এসে নিজের ছোট্ট ঘরটায় এসে খাটিয়ার ওপর গায়ের পোষাক ছেড়ে ফেলে। রাতেও শিউশরণকে ওখানেই থাকতে হয়, পাহারা দিতে হয় বাড়ী।

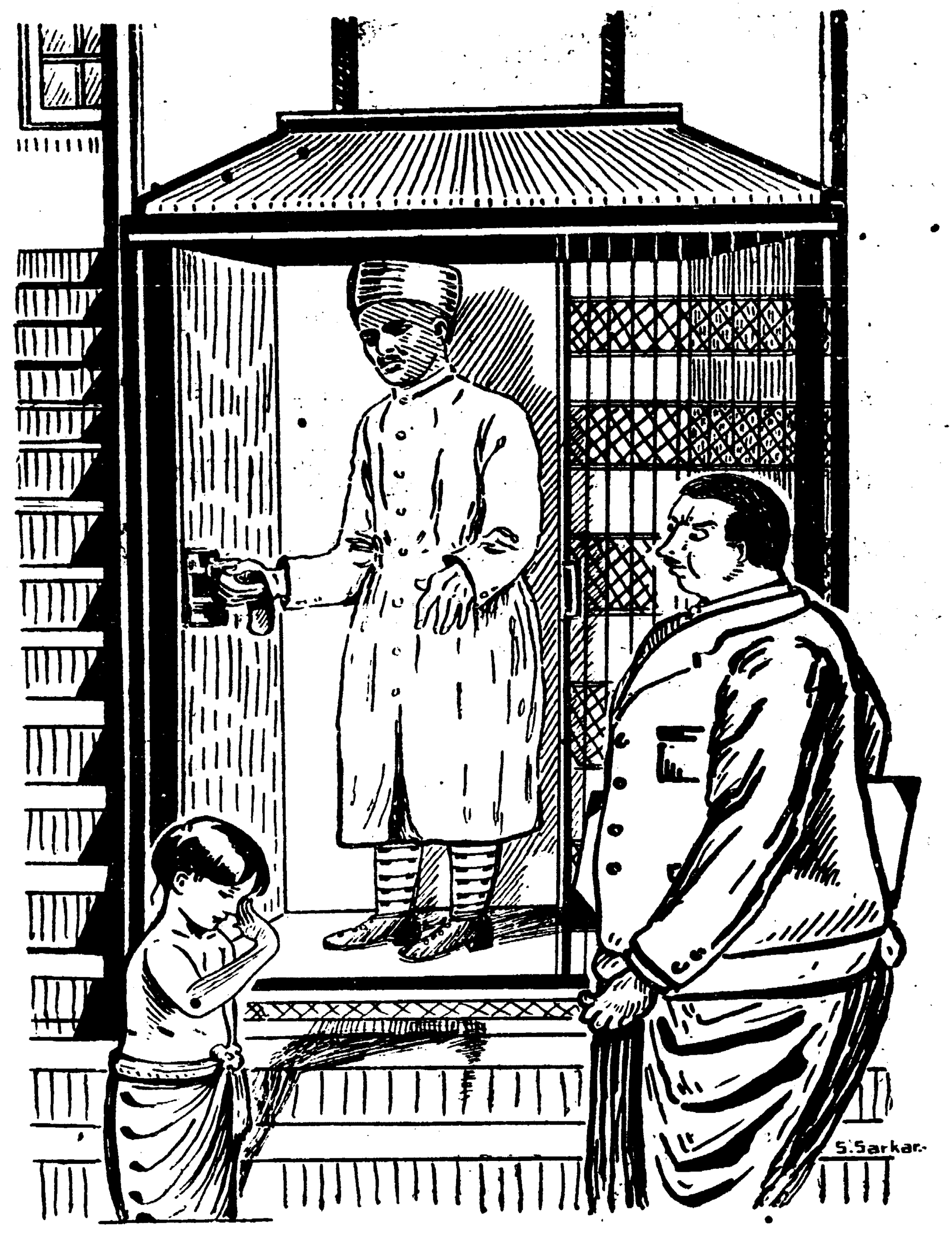

'এ ছোঁড়াটা আবার এল কোথা থেকে?'

চাঁদ ওঠে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মাথায়। সমস্ত রাস্তা রূপোলী লাগে, রাস্তার বাড়ীগুলো মিছেই জ্বলে মরে। রুটি পাকাতে পাকাতে শিউশরণ ছেলেকে শেখায়—'বিশ্বাসের বড় কিছু নেই। বিশ্বাসের খেলাপ করবি না কোন দিন, জান যায় সে ভি আচ্ছা।'

কোন দিন খাওয়া-দাওয়ার পর শিউশরণের ঘরে আরও কয়েক জন দেশের লোক আসে। হারিকেনের স্তিমিত আলোয় সুর করে রামায়ণ পাঠ সুরু হয়। মহাবীর শুন্‌তে শুন্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। চাঁদ তখন হেলে পড়েছে তাদের দোতলা ঘুমন্তপুরীর গায়ে।

ভোর হ'তে না হ'তেই শিউশরণ ডাকে—'মহাবীর, উঠ্ বেটা, উঠ্।' মহাবীর মিটমিটিয়ে চোখ মেলে চায়। বাপ তখন তার তৈরী হ'য়ে গেছে। মহাবীর উঠে মুখ-হাত্ ধুয়ে নেয়। তার পরে ল্যাঙ্গটটা এঁটে পরে বাপের সঙ্গে আখড়ায় যায়। সেখানে খানিক ক্ষণ কুস্তী হয়, কসরৎ হয়। আখড়ার পালোয়ান বলে—'দমাদ্দম ডন লাগা দে মহাবীরপর্‌সাদ, আউর থোড়া বৈঠ্‌কী। বহুৎ আচ্ছা মহাবীরপর্‌সাদ, পালওয়ান্ বন্ যায়গা।' টুকটুকে শরীরে মাটী মেখে ভূত হয়ে মহাবীর ফিরে আসে। স্নানান্তে বাপ রুটি পাকাতে যায়, সে এটা ওটা সাহায্য করে।

বেলা দশটা বাজে, মৌচাক আবার ভরে ওঠে গুণ্‌গুণ্ করে। শিউশরণের পেছনে মহাবীর লিফ্‌টের ধারে এসে দাঁড়ায়।

সেদিন বিকেলে ইষ্ট ব্যাঙ্কের বড় সাহেব নেমে যাচ্ছিলেন, মহাবীর পেছনে দাঁড়িয়েছিল। মহাবীরের পায়ের ওপর টুপ্ করে চামড়ার কি একটা পড়্‌ল। মহাবীর সেটা তুলে নিলে—চক্‌চকে চামড়ার একটা কেস্। শিউশরণ তখন সোজা হয়ে লিফ্‌টের হাতলে হাত দিয়ে তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যস্ত বড় সাহেব হন্ত-দন্ত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে উঠলেন।

শিউশরণের সেলাম তখনও ফুরিয়ে যায় নি। মহাবীর নিজেদের ছোট্ট ঘরটাতে চলে এল, হাতে তার চামড়ার কেস্‌টা। এমন চমৎকার চক্‌চকে জিনিস মহাবীর কখনও দেখে নি। ঘরে এসে সেটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতেই সেটা আবার খুলে গেল। ভেতরে অনেকগুলো কাগজ রয়েছে। সেগুলো মহাবীর

টেনে বার করলে। দশটা এক রকমের কেমন মড়মড়ে কাগজের ছবি। ছবিতে রাজার মুখ, মহাবীর রাজার মুখ চেনে। আরও একটা কাগজ—হিজিবিজি লেখা কেস্‌টার মধ্যে রয়েছে। মহাবীর সব ক'টাকে নেড়ে-চেড়ে দেখলে। হিজিবিজি লেখা কাগজটা একেবারে বাজে, ছবিগুলো মন্দ নয় কিন্তু চক্‌চকে চামড়ার কেস্‌টা চমৎকার; এমন সুন্দর জিনিস মহাবীর কখনও দেখে নি। মহাবীরের নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে ছিল এ কাগজ সে কাগজ থেকে কাটা নানা রকমের ছবি আর দেশলাইয়ের হরেক রকমের লেবেল। কাগজটা আর ছবিগুলো সে সেই দুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে আর চক্‌চকে কেস্‌টা শার্টের পকেটে স্থান পেল। এত সুন্দর আদরণীয় দ্রব্য কি কাছ ছাড়া করা যায়?

পর দিন অফিসে মহা হুলস্থূল ব্যাপার। ইষ্ট ব্যাঙ্কের বড় সাহেবের নোট-কেস্‌শুদ্ধ হাজার টাকা চুরি গেছে। তার চেয়েও বেশী দরকারী একটা দলিলও নোট-কেসে ছিল। সেটা যাওয়ায় সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।

ইষ্ট ব্যাঙ্কের বড় বাবু একবার ওপরে উঠলে অফিস ভাঙ্গবার আগে বড় একটা নামেন না। সেদিন কি কাজে হঠাৎ তিনি অসময়ে লিফ্‌টের বেল টিপলেন। লিফ্‌ট্ ওপরে উঠে এল। শিউশরণের পেছনে রয়েছে মহাবীর। বড় বাবুর যাতায়াতের সময় মহাবীর লিফ্‌টে থাকে না, কিন্তু আজ অসময়ে ধরা পড়ে গেছে।

'আবার চড়িয়েছিস ছোঁড়াটাকে লিফ্‌টে?' বড় বাবু কটমট করে তাকালেন মহাবীরের দিকে। মহাবীর ভয়ে কুঁকড়ে মুখ ফেরাল আর হঠাৎ বড় বাবুর নজর পড়্‌ল মহাবীরের পকেটে কি একটা চক্‌চক্ করছে। খপ্ করে তিনি সেটা তুলে নিলেন, নিয়ে একেবারে স্তম্ভিত।

বড় সাহেবের নোট-কেস্।

লিফ্‌ট্ নীচে নেমে এসেছিল। বড় বাবু উত্তেজনায় ভুলে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে এলেন।

মহা কলরব, হৈ-চৈ উঠ্‌ল। শিউশরণ আর মহাবীরকে ইষ্ট ব্যাঙ্কে ধরে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

'হামি কিসু জানি না বাবু'—শিউশরণ বল্‌ছিল।

বড় বাবু ধমক দিলেন—'থাম্ বেটা। আমি তখনই বলেছিলাম পাজী বেটারা সব চোর! আবার তাই ত' বলি শুধু শুধু ছেলেটাকে লিফ্‌টে চড়ায় কেন? ওইটুকু বয়সে পাকা পকেটমার। এবার বাপ-বেটায় পাঁচটি বছর।'

বড় সাহেব বড় বাবু আর মহাবীরপ্রসাদকে তলব করলেন। শিউশরণও উঠছিল, হুকুম হ'ল—'তুই বস্।'

তার পরে ভেতরে বড় বাবু বড় সাহেবকে বিস্তৃত বিবরণ দিলেন কেমন করে তিনি চোর ধরেছেন ইত্যাদি।

বড় বাবু···বিস্তৃত বিবরণ দিলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—'কিন্তু আসল জিনিস কোথায়?'

'এ চোট্টা, রুপেয়া কাঁহা?' বড় বাবু হাঁকলেন। কাঁদতে কাঁদতে মহাবীর বললে—'কেয়া জানে বাবুজী?'

বাইরে থেকে শিউশরণ শুনলে সে কান্না। তার চোখ ফেটে জল আসতে চায়। সে জানে তার দুধের ছেলে মহাবীর কখনও এ কাজ করবে না।

ওদিকে বড় বাবু মুখ ভেংচে বললেন—'কেয়া জানে বাবুজী! বেটা চোট্টা!'

বড় সাহেব তাঁকে বাধা দিয়ে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন—'নোট-কেস্‌টার মধ্যে রুপিয়া ছিল, কি হ'ল?'

'উস্‌মে ত তস্‌বীর রহা'—কাঁদতে কাঁদতে মহাবীর বললে। 'হাঁ হাঁ, তসবীর!' সাহেব লাফিয়ে উঠলেন।

তার পর বড় বাবুকে তিনি বললেন তিনি নিজেই খোঁজ করছেন, তাঁকে আর দরকার হবে না। বড় বাবু আষাঢ়ের মেঘের মত মুখ করে সাহেবের কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন।

একটু পরে মহাবীরের হাত ধরে সাহেব নিজে বেরিয়ে এলেন। মহাবীরের চোখ তখনও ফোলা ফোলা। শিউশরণ উঠছিল কিন্তু সাহেব তাকে বসতে বললেন।

মহাবীরের হাত ধরে সাহেব নীচে নেমে গেলেন, তার পরে ওপরে উঠে আবার নিজের কামরায় ঢুকলেন।

তার পরে শিউশরণের ডাক পড়্‌ল।

কম্পিত বক্ষে শিউশরণ সাহেবের কামরায় ঢুকে দেখে সাহেব হাসছেন। সাহেব হিন্দীতে বললেন—'তোর লেড়কা আমার মান-ইজ্জত বাঁচিয়েছে শিউশরণ। ওকে লেখাপড়া শেখা। খরচের ভার আমার।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছেলের হাত ধরে শিউশরণ বেরিয়ে এল। লিফ্‌ট্ অনেকক্ষণ আটকে আছে।

বল্লাল সেন

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্)

আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় লোকের অনেক কথা পড়ি কিন্তু নিজ দেশের সাবেক রাজা-রাজড়াদের খবর কয়জন রাখি?

বাংলা দেশের হিন্দু আমলের রাজাদের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে বল্লাল সেনের নাম। বল্লাল সেন বীর ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, সমাজের নেতা ছিলেন। তিনি দেশের—সমাজের উপর যে ছাপ দিয়া গিয়াছেন সে ছাপ এখনও মুছিয়া যায় নাই। কত কালে মুছিবে কে বলিতে পারে?

বল্লাল সেনের পূর্ব্বপুরুষ বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্য হইতে। এই বংশের লোক আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগকে কর্ণাটক্ষত্রিয়ও বলা হইত। কর্ণাটক্ষত্রিয়েরা প্রথমে বাংলার পশ্চিমাংশে—রাঢ়প্রদেশে আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকেন। সেখানে তাঁহারা প্রথমে সামন্ত রাজা রূপে বাস করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে সামন্ত সেন নামক এক ব্যক্তি খুব প্রবল হইয়া উঠেন এবং রাঢ়প্রদেশে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন তাঁহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেন। ইনি শূরবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য এবং পালবংশের রাজ্যের খানিকটা দখল করিয়া লইয়াছিলেন। আবার হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন এত প্রবল হইয়া পড়েন যে তিনি পালরাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া নিজেই তখনকার বাংলা দেশে সকলের বড় হইয়া বসেন। পালরাজ্যের কতকটা তাঁহার সময়েও বাঁচিয়া গিয়াছিল কিন্তু পাল রাজারা তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরেও তিনি বর্ম্মবংশীয় রাজার স্থানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পদ্মার উত্তরে—রাজসাহী জেলায় তিনি এক সহর স্থাপন করিয়া প্রত্যুম্নেশ্বর নামে মহাদেবের এক জম্‌কাল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের প্রাচীরের খানিকটা কলিকাতার যাদুঘরে আছে এবং ইহাতে বিজয় সেনের কীর্ত্তিকথা খোদাই করা রহিয়াছে। ব্যারাক্‌পুর ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকট বিজয় সেনের এক দানপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বিক্রমপুর হইতে দেওয়া হইয়াছিল।

বল্লাল সেন ছিলেন এই বিজয় সেনের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম বিলাস দেবী। বিলাস দেবীর জন্ম বাংলার প্রাচীন রাজবংশে—আদিশূরের বংশে। একবার সূর্য্যগ্রহণের সময় মাতার সোনার ঘোড়া দান উপলক্ষে বল্লাল বর্ত্তমান কাটোয়ার নিকট এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্র ও নানা পূজার দ্রব্য মাটীর তলে পাওয়া গিয়াছে।

ঠিক কোন্ সময়ে বল্লাল সেনের জন্ম হয় তাহা ঠিক করা যায় না কারণ তখন এ দেশে ইতিহাস লেখার নিয়ম ছিল না অথবা যাহা লেখা হইত তাহা এখন

পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাকে লইয়া কোন কোন সংস্কৃত পুস্তক লেখা হইয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে বাজে বা অবিশ্বাস্য কথাই বেশী। মোটামুটী ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি বল্লাল সেন বাংলা দেশ শাসন করিতেন এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্ব অনেক দিন স্থায়ী ছিল।

বল্লালের পিতা খুব বড় রাজা ছিলেন বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে বল্লাল সেন সুখশয্যায় জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, অনেক সামাজিক ঝগড়া-বিবাদে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। বিজয় সেন পালবংশের রাজ্য খাটো করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু বল্লালের সময়েও কিছু দিন উত্তর বঙ্গে ও মগধে সে রাজ্যের খানিকটা রহিয়া গিয়াছিল। বল্লাল নিজে যুদ্ধ করিয়া এই সকল স্থান অধিকার করেন। উড়িষ্যাজয় ও মিথিলাজয় তাঁহার অপর কীর্ত্তি। উড়িষ্যাজয়ের সময়ে তাঁহার পুত্র যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। মিথিলায় লক্ষ্মণ সেনের নামে একটা সন বহু দিন চলিত ছিল।

তখনকার দিনে রেলগাড়ী ও টেলিগ্রাফ্ না থাকায় দেশের সকল স্থানের খোঁজখবর নেওয়া রাজার পক্ষে একটা বিষম ব্যাপার ছিল। বল্লাল এক রাজধানীতে সর্ব্বদা থাকিতেন না। কখন বিক্রমপুরে, কখন গৌড়ে, কখন নবদ্বীপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কেহ কেহ বলেন, সুবর্ণগ্রামেও তাঁহার একটা রাজধানী ছিল। বিক্রমপুরে রামপাল নামক গ্রামে এক প্রকাণ্ড ভিটিকে এখনও লোকে বল্লালবাড়ী বলে। এই রামপাল ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ হইতে ৩।৫ মাইল পশ্চিমে। বল্লাল-বাড়ীর ধার দিয়া যে পরিখা বা খাদ এখনও আছে তাহা প্রায় ২০০ ফুট চওড়া। ইহারই এক পাশে প্রাচীন গজারি গাছ, যাহা স্থানীয় লোকে এক অদ্ভুত জিনিষ মনে করিয়া সিন্দূর দিয়া পূজা করে। প্রবাদ এই যে যখন মহারাজ আদিশূর বর্ত্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এদেশে আনেন তখন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের জোরে এক হাতী-বান্ধা শুষ্ক কাষ্ঠ বাঁচিয়া উঠিয়া এই গজারি বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। গাছটী কিন্তু এখন নিজেই শুকাইয়া গিয়াছে। তোমরা

কেহ এই শুক্‌না কাঠ গজাইয়া উঠার গল্পে বিশ্বাস করিবে কিনা জানি না। আমি করি না কিন্তু অনেক লোক এখনও করে।

বল্লালবাড়ীর পাশে এক প্রকাণ্ড শুষ্ক দীঘি রহিয়াছে, ইহার নাম রামপাল-দীঘি। পাল বংশের বিখ্যাত রাজা রামপাল যখন প্রবল ছিলেন তখন সম্ভবতঃ তাঁহারই নামে এই দীঘি ও রামপাল নগরের নাম হয়। সে বল্লাল সেনের ও অনেক পূর্ব্বে কিন্তু কালে বল্লাল সেনের নামে রাজা রামপালের নাম চাপা পড়িয়া গিয়াছে। লোকে এই প্রাচীন দীঘির সঙ্গেও বল্লাল সেনের নাম জড়াইয়া গল্প রচনা করিয়াছে।

রামপালের প্রাচীন গজারি গাছ

রামপালের কলা বিখ্যাত। কালের কি মহিমা! যে স্থান হয়ত এক সময়ে বল্লাল সেনের ছাউনীর সৈন্যে ভরপূর থাকিত সেখানে এখন মুসলমান চাষী নানা উপায়ে ও পরিশ্রমে উৎকৃষ্ট কলা জন্মাইতেছে। সৈন্যের পরিবর্ত্তে কলা!

পূর্ব্বে যে সকল ভাল ভাল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে শূরবংশের রাজারা হিন্দু ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য নানা স্থানে বসাইয়াছিলেন বল্লাল সেনের সময় তাঁহাদের বংশধরেরা সকলেই যে খুব নিষ্ঠাবান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন এ কথা বলা যায় না। বল্লাল মনে করিলেন, ভাল লোককে সমাজে মর্য্যাদা দিয়া উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাই তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বাছিয়া লইয়া কতক লোককে মুখ্য কুলীন ও কতককে গৌণ কুলীন করিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যেও তিনি শ্রেণীবিভাগ করিয়া মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজে বংশজ ও বারেন্দ্র সমাজে কাপ্ তাঁহার সময়ে ছিল না—ইহাদের উৎপত্তি পরে।

বল্লাল সেন আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ দেখিয়া ভাল লোককে কুলীন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না যে, এই সকল কুলীনের পুত্রপৌত্রেরা নানাদোষগ্রস্ত হইলেও কুলীনই থাকিয়া যাইবে। একবার কতক লোককে তিনি দোষ দেখিয়া সমাজে নামাইয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু কালে হিন্দুরাজত্ব লোপ পাইল এবং এইরূপ বাছাই করার উপযুক্ত লোক না থাকায় কুলীনদিগের নানাদোষযুক্ত সন্তানেরাও সমাজে কুলীন বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। ফলে, সমাজে অনেক কুপ্রথার সৃষ্টি হইল।

সকল লোকই যে বল্লালী সামাজিক শাসন ঘাড় নোওাইয়া মানিয়া লইয়াছিল তাহা নহে। কেহ কেহ উহা স্বীকার করে নাই কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতির আদেশ অমান্য করার যে ফল ইহাতে তাহাই ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অপদস্থ হইয়া দেশে ছিল, কেহ বা দেশ ত্যাগ করিয়া কোনরূপে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিল। ফলে এই বল্লালী কৌলীন্য টিকিয়াই গেল। ইহার প্রভাব এখনও বাংলার হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান।

বল্লাল প্রথমে বৈদিক ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন, পরে তান্ত্রিক হইয়া পড়েন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা এবং তিনি নিজেও শৈব ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল "নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর"। তাঁহার আমলেও বাংলা দেশে অনেক লোক বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিল। তিনি বৌদ্ধদিগকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন না। আবার তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই অর্থের প্রয়োজন হইত। দেশের ধনী প্রজারা টাকা যোগাইতে না পারিলে যে রাজার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই সকল কারণে কোন কোন জাতির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এরূপ শোনা যায় যে বৈশ্য সুবর্ণবণিক্ জাতির বর্ত্তমান সামাজিক মর্য্যাদার জন্য তিনি দায়ী। আবার এরূপও প্রবাদ যে তিনি বাংলা দেশের কতক স্থানে কৈবর্ত্তদিগের 'জল-চল' করাইয়া দিয়াছিলেন।

বল্লাল সেনের এক পত্নীর নাম ছিল রামদেবী। ইনি চালুক্য রাজবংশের কন্যা—লক্ষ্মণ সেন ইহারই পুত্র। বল্লাল সেনের অন্যান্য পত্নীর এবং বিবাহ বিষয়ে

কতকটা স্বেচ্ছাচারিতার কথা আধুনিক কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এগুলি কত দূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা কঠিন। লক্ষ্মণ সেন ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন পুত্রের নাম জানা যায় না।

বড় রাজা হইলেই পরবর্ত্তী কালে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প দেশে রটিয়া যায়। 'বিক্রমাদিত্য' সম্বন্ধে যে কত বাজে গল্প আছে তাহার ঠিকানা করা কঠিন। বল্লাল সেন সম্বন্ধেও ঐরূপ অনেক গল্প আছে। একবার নাকি তাঁহার রাগে লক্ষ্মণ সেন পলাইয়া গিয়াছিলেন; তাহার পর তাড়াতাড়ি নৌকা পাঠাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হয়।

আর একটা গল্প অদ্ভুত রকমের। রামপালে বল্লালবাড়ীতে একটা জায়গা আছে—তাহাকে বলা হয় অগ্নিকুণ্ড। এরূপ প্রবাদ যে বল্লালের বিপক্ষে কোন লোক তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া বায়াতুম্ব বা বাবা আদম নামক এক মুসলমান নেতাকে দলবলসহ বিক্রমপুরে লইয়া আইসে। মুসলমানেরা আসিয়া লম্ফঝম্প আরম্ভ করিলে বল্লাল সকল কথা জানিতে পারেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য বীরবেশে অগ্রসর হন। পুরী হইতে বাহির হইবার সময়ে রাণীদিগকে বলিয়া যান, তিনি সঙ্গে করিয়া যে কবুতর লইয়া যাইতেছেন তাহা যদি উড়িয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া আইসে তবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যুদ্ধে বল্লালই জয়ী হইলেন কিন্তু কবুতরটী তাঁহার অসতর্কতার সময়ে কাপড় হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কবুতর রাজবাড়ী পৌঁছিলে রাণীরা মনে করিলেন, রাজা মারা গিয়াছেন। তাঁহারাও তখন অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। বল্লাল ফিরিয়া আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলেন এবং মনোদুঃখে নিজেও সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

মুসলমানদিগের হাতে পড়িবার ভয়ে রাজপুত-রমণীরা মধ্যে মধ্যে এইরূপ (পুরুষেরা যুদ্ধে গমন করিলে) অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণ দিতেন। ইহাকে রাজপুতানায় বলা হইত 'জহরব্রত'। বিক্রমপুরে কোন ছোটখাটো রাজার আমলে এইরূপ একটা 'জহরব্রত' হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে মুসলমানেরা বাংলা দেশে এত দূর অগ্রসর হয় নাই যে এইরূপ একটা কাণ্ড ঘটিতে পারে। এখানে অন্ততঃ 'উদোর পিণ্ড

বুধোর ঘাড়ে' চাপান হইয়াছে। বল্লাল সেন নামে অপর কোন রাজা যে পরবর্ত্তী কালে বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। বল্লাল সেনের পরেও তাঁহার পুত্রপৌত্রেরা বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। যে বাবা আদমের কথা বলা হইয়া থাকে তাঁহার নামে একটা মস্‌জিদ্ রামপালে এখনও বিদ্যমান আছে। এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে—বল্লাল সেন ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রের বহু পরে।

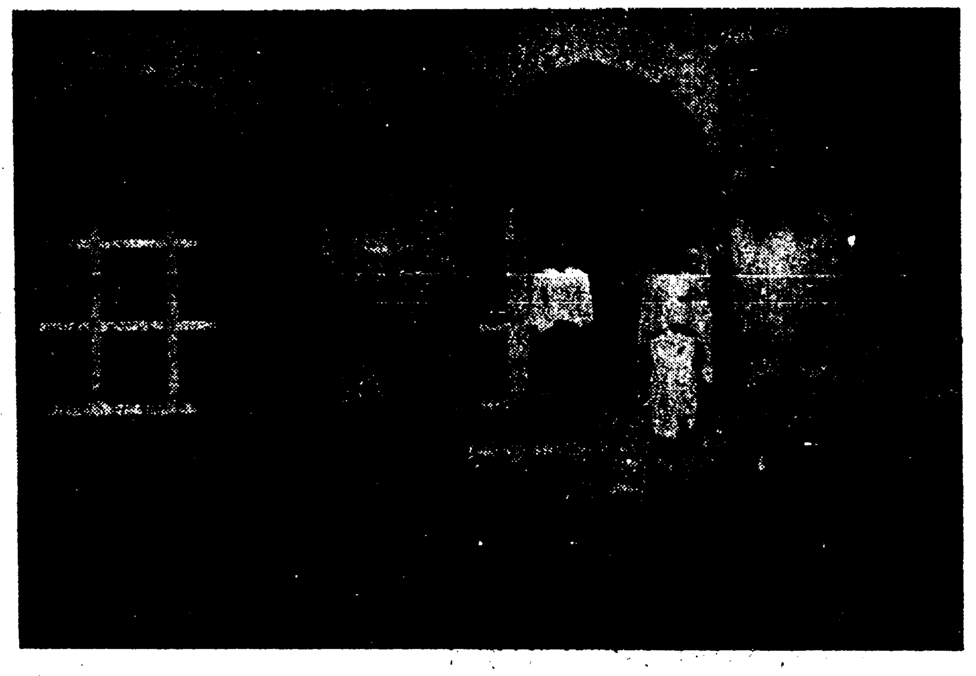
বাবা আদমের মস্‌জিদ্—রামপাল

বল্লাল সেন কেবল যোদ্ধা, প্রজাপালক ও সমাজসংস্কারক ছিলেন না, তিনি গ্রন্থকারও ছিলেন। তাঁহার 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ খুব নাম করা। ইহার একখানিতে স্মৃতির, অন্যখানিতে জ্যোতিষের কথা আছে। 'অদ্ভুত-সাগর' তিনি আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, শেষ করিতে পারেন নাই। উহা শেষ হয় তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময়ে।

বল্লাল সেনের গুরুর নাম ছিল অনিরুদ্ধ। আবার সিংহগিরি নামে এক সাধু তাঁহাকে অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন।

এরূপ জানা যায় যে বল্লাল নিজ রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া শাসনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সকল নাম এখনও প্রচলিত আছে। তাঁহার সময়ে পদ্মা এত বড় নদী ছিল না, উহার প্রবাহ তখন অন্য পথে চলিত। গঙ্গার বেশী জল তখনও ভাগীরথী দিয়াই সাগরসঙ্গমে যাইত বলিয়া মনে হয়। পদ্মা সম্ভবতঃ একটী ছোট নদীরূপে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলা ভেদ করিয়া প্রবাহিত ছিল।

বিক্রমপুর ব্যতীত মালদহের নিকট প্রাচীন গৌড়ে এখনও লোকে

বল্লালের বাসস্থানের চিহ্ন দেখাইয়া থাকে। প্রাচীন নবদ্বীপে এবং দিনাজপুর জেলায় এখনও তাঁহার নামে দীঘির ভগ্নাবশেষ আছে।

গ্র্যাণ্ডসান্ অব্ কং

(শ্রীনিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়)

ওপরের গাল-ভরা নাম দেখে ভেব না যে রাজা 'কং'-এর দৌহিত্র অথবা পৌত্র কলকাতায় আসছেন! তা' হ'লে কিন্তু বেজায় ঠক্‌তে হবে।

তবে?

সেই কথাই বলছি।

যাদব বাবুর বাগানের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছগুলোয় একপাল হনূমান রাতের বাসা বেঁধে থাক্‌ত; সংখ্যায় প্রায় শ' খানেক। মাত্র রাতটুকু; তার পর দিনের আলো ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই পালে পালে চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ত।

পালের যেটা গোদা সেইটার ওপর আমাদের বুড়োর ভীষণ আক্রোশ। পণ্ডিতেরা বলেন, কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ অতি নিকট; বুড়োর রাগেরও অবশ্য কারণ আছে।

সেদিন সকালবেলায় বুড়ো ঘরে ব'সে পড়ছে, পিসিমা এসে জানালেন চাষাপাড়া থেকে পূজোর জন্য এক ছড়া কলা এখনই কিনে আনতে হবে।

বুড়ো সোজা জবাব দিল এ কার্য্য তা'র দ্বারা এখন অসম্ভব। এগ্‌জামিন এসে গেছে—চালাকি নয়।

পিসিমা বুড়োর স্বভাব বিলক্ষণ জানতেন। বল্‌লেন,—"যা বাবা, লক্ষ্মী যাদু আমার, আমি আবার ডাল ভিজিয়ে রেখেছি, তোর জন্যে বড়ী দিতে বস্‌ব—নইলে আমি নিজেই যেতাম"। ব'লে হাসি গোপন ক'রে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বুড়ো হচ্ছে বড়ী-ভাজার ভীষণ ভক্ত। কিছুও যদি না হয়, শুধু বড়ী-ভাজা হ'লেই সে হাসিমুখে এক থালা ভাত সাবড়ে দেবে। বড়ী তার নিত্য চাই। যেদিন পাতে বড়ীর সংস্রব না থাক্‌ত সেদিন আর পিসিমার রক্ষা থাক্‌ত না, খণ্ডপ্রলয় অনিবার্য্য। পিসিমাও বুড়োর এ দুর্ব্বলতার সুযোগ ছাড়তেন না, বড়ীর নাম ক'রে বুড়োকে দিয়ে অনেক সময় তাঁর কাজ করিয়ে নিতেন। পিসিমার কথা শুনে সে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বেরিয়ে পড়্‌ল।

কলা নিয়ে বুড়ো যাদব বাবুর বাগানের মধ্যে দিয়ে শর্ট্‌কাট্ ক'রছিল। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হ'য়েই আসছিল। আপন মনে জ্যামিতির একটা থিয়োরেম্‌-এর সাধারণ সূত্র বিড় বিড় ক'রে আওড়াচ্ছিল: ইন্ এ রাইট্ য়্যাঙ্গল্‌ড্ ট্রায়েঙ্গল দি স্কোয়ার অন দি হাইপটিনিউজ্ ইজ ইকোয়াল টু দি......'

বুড়োর চিন্তায় বাধা পড়্‌ল। কোথা থেকে গোদা হনূমানটা এক লাফে বুড়োর সামনে প'ড়ে একটী বিরাশী সিক্কা ওজনের চড় হাঁকড়ে কলা ছড়াটা নিয়ে দুই লাফে সামনের এক সেগুন গাছের আগায় গিয়ে চ'ড়ে বস্‌ল।

চড় খেয়ে বুড়ো লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে কাদা-জলে ভরা একটা গর্ত্তের ভিতর হুমড়ী খেয়ে পড়্‌ল।

একটু সামলে নিয়ে টলতে টলতে যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন গোদার হাতের ছড়া প্রায় কাবার; নির্ব্বিকার হ'য়ে একটার পর একটা মুখে পুরে যাচ্ছে। রাগে বুড়োর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠ্‌ল। রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে গোদার দিকে ছুঁড়তেই সে মুখ ভেংচে এমন এক হুম্‌কি দিল যে বুড়োকে তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিতে হ'ল।

পিসিমা বুড়োর অবস্থা দেখে চীৎকার ক'রে উঠলেন। বল্‌লেন, "ও কি! প'ড়ে গিছ্‌লি নাকি?···কি ক'রে?"

পিসিমাকে সব ব'লে শেষে বুড়ো বল্‌লে—"গোদাটাকে না মারি তো আমার নাম বুড়ো-ই নয়"।

উদ্দেশে প্রণাম ক'রে পিসিমা বল্‌লেন—"ছিঃ বাবা, শ্রীরামের অনুচরকে আকথা-কুকথা ব'লতে নেই—পাপ হয়"।

মুখ ভেংচে বুড়ো বল্‌লে—"রামের অনুচর না ঘেঁচু। উঃ, গালটা এখনও রি-ম্রি ক'রছে!"

খেতে ব'সে বুড়ো একেবারে স্প্রীংএর মত ছিটকে উঠ্‌ল।

"বড়ী-ভাজা কই?—বড়ী-ভাজা···?"

পিসিমা এতক্ষণ এই আশঙ্কাই ক'রছিলেন। আজ আর উত্তর যোগাতে তাঁর দেরী হ'ল না। বল্‌লেন, "আঃ আমার পোড়াদ্দশা! এক থালা বড়ী রোদ্দুরে দিয়েছিলাম, হতচ্ছাড়া বাঁদরে কি আর একটা তার রেখেছে?"

পিসিমার আক্ষেপ আর শেষ হয় না।

"বাঁদরে বড়ী খেয়েছে! নিশ্চয় সেই ব্যাটা গোদার কাজ; সে ছাড়া আর কারুর এ কর্ম্ম নয়। আচ্ছা দেখেগা······"

বুড়ো রাগে গজরাতে গজরাতে ভাত খেয়ে উঠ্‌ল। আড়াল থেকে পিসিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে মনে মনে বল্‌লেন, 'প্রভু, তোমার অনুচরের নামেই আজ বিপদ্ থেকে মুক্ত হ'লাম। নইলে আজ যে কি অদৃষ্টে ছিল তা' একমাত্র তুমিই জান।' চোখের সামনে তাঁর হাঁড়ী, থালা, গেলাসের দুরবস্থা ভেসে উঠ্‌ল।

ইস্কুলে বুড়োকে দেখে অনিল বল্‌লে,—"তোর গালের এ সাইড্‌টা ফুলেছে যেন! আক্কেল দাঁত-টাঁত বেরুচ্ছে নাকি?"

গালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বুড়ো বল্‌লে, "আক্কেল দাঁত নয়, তবে একেবারে আক্কেল দিয়ে ছেড়েছিল ভাই"। সকালবেলার সব ঘটনা ব'লে বুড়ো বল্‌লে—"কি করি বল্ দেখি? বাংলা-গুলিতে গোদাটার কিচ্ছুই হবে না। থাকৃত একটা বন্দুক ত' ব্যাটার লেজের দফা একেবারে নিকেশ ক'রে ছাড়তাম।"

লেখাপড়ায় না হো'ক, অনিলের এদিক্-ওদিক্ মাথাটা একটু খেলে ভাল। বল্‌লে,—"কুছ্ পরোয়া নেহি। গোটা কতক ধুতরো ফলের বীচি আর নদীর ধার থেকে এক পাঁজা বুনো সিদ্ধির গাছ তুলে আনিস; ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

ব্যবস্থাটা বুড়ো একেবারে জলের মতন বুঝে ফেল্‌লে। ধুতরো ফলের গুণাগুণ জানে না বটে, কিন্তু সিদ্ধির আস্বাদ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে (অনিলের কৃপায়) ওর বেশ একটু জ্ঞান আছে। জিজ্ঞাসা ক'রলে, "ব্যাটাকে খাওয়াব কি ক'রে?"

অনিল একটু মুরুব্বিয়ানা চালে মাথাটা দুলিয়ে বল্‌লে, "তোর পিসিকে আবার বড়ী দিতে ব'ল্ গে যা'। বড়ীর লোভে মক্কেল আবার আসবে,—এ তুই দেখে নিস্"।

বুড়ো বল্‌লে—"তার পর?"

"তার পর কি করা যেতে পারে তুই-ই বল্ দেখি?"

"কাঁচা বড়ীর মধ্যে অনুপানমিশ্রিত সিদ্ধি পূরে দেওয়া তো? এ আমি খু-ব পারব"। ব'লে বুড়ো একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌ল।

"ইয়েস্। সিদ্ধি পূরে মিনিট পনেরো 'ওয়েট্' করিস্, ব্যস্, একেবারে ফ্ল্যাট্'। চ' ঘণ্টা দিল"। ব'লে অনিল ক্লাসের মধ্যে ঢুকে গেল।

বুড়ো আনন্দে গদ্‌গদ হ'য়ে গেল। সযত্নে গালটায় আর একবার হাত লিয়ে অনিলের পেছন পেছন সেও ক্লাসে এসে ঢুকল।

পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই বুড়ো একেবারে সটান নদীর ধারে হাজির হ'ল। চূর্ণীর ধারটা নল-খাগড়া আর বুনো-সিদ্ধির জঙ্গলে ভর্ত্তি। অনিলের উপদেশ মত এক পাঁজা সিদ্ধির পাতা সে তুলে নিল্। ফিরবার পথে একটা ধুতরো ফল ভেঙ্গে কয়েকটা বীচি সংগ্রহ ক'রে বাড়ী ফিরেই হুকুম দিল—"পিসিমা, বড়ী দাও"।

পিসিমা আজ প্রস্তুত ছিলেন। তবু একবার মুখে বল্‌লেন—"আজকেও সাবড়ে দিক্। আগ্‌লাবি তুই?"

"নিশ্চয়ই। আমি আজ লাঠি নিয়ে ছাদে বসে পাহারা দেব। তুমি দাও গে; আমি লাঠিটা নিয়ে ছাদে যাচ্ছি, চল।"

পিসিমা বড়ীর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ছাদে গিয়ে উঠলেন।

মিনিট দশেক পরে ছাদ থেকে পিসিমা হাঁকলেন—"বুড়ো, আয় লাঠি গাছটা নিয়ে। আমার হ'য়ে গেছে যে!"

বুড়োরও এদিকে সিদ্ধি বাটা শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি সিদ্ধির ডেলাটা একটা কাগজে মুড়ে ছাদে এসে উপস্থিত হ'ল।

পিসিমা শূন্য বাটী হাতে নীচে নেমে গেলেন। সুযোগ বুঝে বুড়ো এবার কাঁচা বড়ীর মধ্যে একটু একটু সিদ্ধিবাটা পূরে দিল।

বেলা প্রায় আটটার সময়ে বুড়ো দেখ্‌লে গোদাটা ছাদের সামনের একটা বেল গাছে এসে বসেছে। বুড়ো তাই দেখে সিঁড়ির ঘরের ভিতর আস্তে আস্তে সরে গেল।

তার পর মিনিট দশেকের মধ্যেই সমস্ত বড়ী গোদার পেটের ভিতর আশ্রয় নিল। পর পর আরও কয়েকটা বাঁদর এসে জুট্‌ল বটে কিন্তু সকলকেই নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হ'ল।

বুড়ো চিলে-কোঠার পাশে বসে বসে বেদম হাসতে লাগ্‌ল। এইবার যে কি ব্যাপার হবে তা' সে বেশ জানে। হঠাৎ থিয়েটারী ভঙ্গীতে হাত নেড়ে ব'লে উঠ্‌ল—'প্রতিশোধ—প্রতিশোধ। ক্ষুদ্র বাঁদরের স্পর্দ্ধা! অসহ্য—'।

গোদাটা ভর-পেট বড়ী খেয়ে সেইখানেই বসে রইল। আধ ঘণ্টা পরে একটু একটু যেন ঝিমুনির লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখে বুড়ো রণস্থলে আত্মপ্রকাশ ক'র্‌লে। সদর্পে (দূর থেকেই) লাঠিটা ছুঁড়ে দিল। অন্যান্য বাঁদরগুলো পালিয়ে গেল; কিন্তু গোদাটা গ্রাহ্যও ক'র্‌ল না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরের কথা।

বুড়ো দেখলে মক্কেল একেবারে কাৎ। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, ওর আনন্দ আর ধরে না। একটা লম্বা বাঁশ এনে দূর থেকেই একটা খোঁচা মারলে; —গোদাটা একটু নড়লেও না।

বুড়োর মাথায় চট্‌ ক'রে আর একটা খেয়াল খেলে গেল। সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। খুঁজে খুঁজে একটা ছেঁড়া প্যাণ্ট্‌ আর কোট্‌ যোগাড় ক'রে ছাদে উঠে এল।

আর একবার খোঁচা দিয়ে বুড়ো বুঝলে গোদাটা একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। সে তখন আস্তে আস্তে প্যাণ্ট্‌ আর কোট্‌টা তাকে পরিয়ে দিল। তার পর

খানিকটা খড়ি, কালী আর পাট যোগাড় ক'রে নিয়ে এসে গোদাটার রূপসজ্জা ক'র্‌তে লেগে গেল। মুখের যেখানটা কালো সেখানটায় বেশ পুরু ক'রে খড়ি গুলে লাগিয়ে দিল। পাটের আঁশ কালীতে গুলে ভীমসিংহের মত এক প্রকাণ্ড গোঁফ তৈরী ক'রে আঠা দিয়ে মুখের সঙ্গে বেশ সযত্নে আটকে দিল।

রূপসজ্জা শেষ হ'তে বুড়োর প্রায় ঘণ্টা খানেক লেগে গেল। শেষে নিপুণ পেণ্টারের মত এক দৃষ্টে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সে বল্‌লে,— "অল্‌ রাইট।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে বুড়ো ইস্কুলে চ'লে গেল। ক্লাসে ওর এক দম মন বস্‌ছিল না—মন পড়ে ছিল ছাদের ওপর।

বুড়ো বসে বসে ভাবতে লাগ্‌ল—এতক্ষণ হয়তো শেষ হ'য়ে গেছে, আর না হয় তো উঠে সরে প'ড়েছে। আহা! শেষ না হওয়াই ভাল। প্রাণে মারবার ইচ্ছা তা'র মোটেই ছিল না।

ক্লাসে সে আর বসতে পারলে না। হঠাৎ এমনি পেট-কামড়ানি আরম্ভ হ'ল যে সে ছুটী নিয়ে ফেল্‌লে।

মিনিট খানেক পরে অনিলেরও গা বমি-বমি সুরু হ'য়ে গেল। বার কতক ওয়াক্‌ ওয়াক্‌ ক'রে সেও ছুটী নিয়ে বুড়োর বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল।

ছাদে এসে তা'রা দেখলে গোদাটা উঠে বসেছে আর নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। অনিল জোরসে এক তাড়া লাগাতেই গোদাটা পাশের গাছে উঠে বস্‌ল। বুড়ো আবার এক তাড়া দিল। এবার সে গাছের পর গাছ পার হ'য়ে নিজের দলের খোঁজ ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

তার পর যা' ঘট্‌ল বিহারের ভূমিকম্পেও তা' ঘটে নি। গোদাটা দলের কাছে যেতেই তা'র 'সাহেব-মূর্ত্তি' দেখে দলেরও সব ছুট্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ল।

উৎপাত বেড়েই চল্‌ল। দলও ছোটে গোদাটাও পিছু ছাড়ে না। ষাট-সত্তরটা বাঁদরের দৌড়োদৌড়ি আর চীৎকারে গ্রামের লোক ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। এর ঘর পড়ে, ওর চালা ভেঙ্গে যায়—এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লতে লাগ্‌ল। গ্রামের গরু-বাছুরগুলো সেই ভীষণ দাপাদাপি শুনে খুঁটি উপড়ে, দড়ি ছিঁড়ে

হাম্বা হাম্বা ক'রে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। গ্রামে ভীষণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। যে যার দুয়োর-জানালা বন্ধ ক'রে ঘরে বসে কাঁপতে লাগ্‌ল।

বুড়ো তখন অনিলকে বল্‌লে—"কেয়া মজা বাবা—"

অনিল বল্‌লে—"একটা যদি ফিল্ম্‌ তুলবার ক্যামেরা আমার থাক্‌ত ত' দেখ্‌তিস্‌ 'গ্র্যাণ্ডসান্‌ অব কং' নাম দিয়ে দু'পয়সা গুছিয়ে নিয়ে ছাড়তাম। বিলেত হ'লে কি আর এ সুযোগ ছাড়্‌ত?"

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

(১৫)

চিঠির অংশ

সেই দিন এবং তাহারও পর দিনের অনেকটা সময় মধুপুরে কাটাইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে হুকা-কাশি কলিকাতা ফিরিলেন। শোবার ঘরে গিয়া দেখেন, টেবিলের উপর সযত্নে পেপার-ওয়েট চাপা দিয়া একখানি চিঠি অমৃত রাখিয়া গিয়াছে। ঠিকানার লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন সেখানা রণজিতের চিঠি। চাকরকে এক পেয়ালা চা পরিবেষণ করিতে হুকুম করিয়া চিঠি খুলিতে খুলিতে তিনি ইজিচেয়ারে গিয়া বসিলেন।

সুদীর্ঘ পত্র। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাণ্ডেলের ঘটনা, মধ্যরাত্রে ফটোচুরির ইতিহাস, মোগলসরাইয়ের অভিজ্ঞতা সমস্তই ধারাবাহিক ভাবে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে; জগন্নাথ ঘাটে অশনিকান্তের আবির্ভাব ও তাঁহার লাঞ্ছনা, ব্যাণ্ডেল ছাড়াইবার পর অপরিচিত যুবকের সহিত পরিচয় প্রভৃতিও বাদ পড়ে নাই—পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সে সবেরও বর্ণনা রহিয়াছে। আমাদের পাঠক-পাঠিকার নিকট এ সব তথ্য অজ্ঞাত নয়, কাজেই রণজিতের চিঠি হইতে এই অনাবশ্যক অংশটুকু বাদ দিয়া বেনারস পৌঁছিবার পর কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে কেবল মাত্র সেইটুকুই উদ্ধৃত করিব।

"......রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুম থেকে বার হ'য়ে কাশীর গাড়ীতে গিয়ে চড়্‌লাম। একটা লোক চাদরে সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে ওদিকের জানালায় ঝুঁকে পড়ে কি দেখ্‌ছিল, আমি ঢোকার প্রায় দু' তিন মিনিট বাদে এদিকে ফিরে চাইলে। চম্‌কে উঠে পরের মুহূর্ত্তেই আশ্চর্য্য হয়ে

গেলাম—ইনিই আমার জাগরণের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন, অর্থাৎ ব্যাণ্ডেল-প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের জলার্থী সেই ব্যক্তিটি। ও এ কামরায় উঠেছে জান্‌লে আমি অবশ্যই এটাতে উঠ্‌তাম না, কিন্তু তখন আর গাড়ী-বদ্‌লীর সময় নেই, গার্ড্‌ সাহেব সিটি বাজিয়েছে, গাড়ী মোসান দিয়েছে।

"আমার মনে মনে একটা বদ্ধ ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে মাঝ-রাত্রে সে যুবকটি যখন ফটোখানা সরিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যায় তখন সেই ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে এ লোকটাও লিপ্ত ছিল নিশ্চয়ই। আপাতদৃষ্টিতে লোকটাকে একটু ছিপ্‌ছিপে গড়নের বোধ হলেও একটু নজর করে দেখ্‌লেই বোঝা যেত কি অসম্ভব শক্তিশালী সে। লোহার মত পেটা শরীর, হাতের কব্জি দুটো অসম্ভব রকম চওড়া, আর আঙ্গুলগুলো বেরিয়ে আস্‌ছে যেন পাঁচটা ইস্পাতের সাঁড়াশী। সে গাড়ীর আরোহী ছিলাম মাত্র আমরাই দু'জন, কাজেই বুঝ্‌লাম এ নির্জ্জনতার সুযোগ নিতে ও নিশ্চয়ই কসুর করবে না। যে কোন মুহূর্ত্তেই হয়তো আক্রমণ করে বস্‌তে পারে এই আশঙ্কায় আমিও প্রতি-আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলাম; কিন্তু একটু বাদেই লোকটার রকম-সকম দেখে আমাকে রীতিমত হতভম্ভ হয়ে যেতে হল। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার সমস্ত চিন্তাশক্তিই যেন তালগোল পাকিয়ে গেল, কল্পনায় সমস্ত ব্যাপারটার যে ছবি আমি এঁকে নিয়েছিলাম বাস্তবের সঙ্গে তার আর যেন এতটুকু মিল রইল না। লোকটা প্রশান্ত মনে আমারই সাম্‌নে বসে, আমার ওপর তার যে সন্দেহের বাষ্পটুকুও রয়েছে তার বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া গেল না। আমার উপস্থিতিতে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, প্রসন্নচিত্তে নিজের মনেই গুণ্‌-গুণ্‌ করে গান গেয়ে চলেছে। মনের সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে যে কোন লোকের পক্ষেই ওভাবে গান গাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার।

"বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে গাড়ী এসে থাম্‌বার পরও লোকটির কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। আমি গাড়ীতেই থেকে গেলাম না কি নাম্‌লাম সেদিকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত না করে সে সোজা ফটক পার হয়ে এক্কাওয়ালাদের এলাকায় এসে হাজির হ'ল, আর তার মিনিট কয়েক পরেই একখানা এক্কা ভাড়া করে বেরিয়ে গেল। যত শীগ্‌গির সম্ভব আমিও একখানা টঙ্গা নিয়ে তার পেছন পেছন রওনা হলাম, কিন্তু খানিকটা পথ এগোবার পরই সাম্‌নের গাড়ীখানা একটা মোড় ফিরে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল হাজার অনুসন্ধানেও তার আর কোন কিনারা করা গেল না।

"গোধুলিয়া থেকে খানিক দূরে আমার আলাপী এক ভদ্রলোক কিছু দিন হোল একটা হোটেল খুলেছেন; ইতিপূর্ব্বে বার দুই তাঁর অতিথি হয়েছিলাম, মালপত্র নিয়ে তাঁরই ওখানে গিয়ে হাজির হ'লাম। এ দু'দিনে শরীরের ওপর দিয়ে একটা যেন ছোটখাট ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিয়ে পরিপাটি একটি দিবানিদ্রা

দিয়ে উঠ্‌তে উপদেশ দিলেন। তার পরেও ক্লান্তি যদিবা কিছু অবশিষ্ট থাকে সন্ধ্যার পর একখানা নৌকো ভাড়া করে গঙ্গার বুকের ওপর খানিকটা বেড়িয়ে বেড়ালে নিশ্চয়ই তা একেবারে উবে যাবে। দশাশ্বমেধ-ঘাটে ভাড়াটে নৌকোর অভাব কোন কালেই হয় না, আর দরেও অন্যান্য ঘাটের চাইতে সেখানেই কিছু সুবিধা হয়।

"সন্ধ্যার পর হাঁটতে হাঁটতে দশাশ্বমেধ-ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হতেই সাড়া পেয়ে মাঝির দল পঙ্গপালের মত এসে আমায় ছেঁকে ধর্‌ল—যেন আমি একটা তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পণ্যের সামগ্রী। ওদের ব্যগ্রতা দেখে মনে হ'ল অন্যান্য ব্যবসার গতি যে দিকেই হোক্ না কেন, মাঝির ব্যবসায়ে সম্প্রতি বড়ই মন্দা পড়েছে; প্রতিযোগিতার পাকে পড়ে দর হু হু করে নেমে চল্ল। তারই মধ্যে এক জন মাঝি বড়ই সুব্যবসায়ী, নিরর্থক কথা কাটাকাটিতে সময়ক্ষেপ না করে সে এক রকম বগল-দাবা করেই আমায় তার নৌকোর দিকে নিয়ে এল। আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, 'আরে বাপু রোস, কি ভাড়া চাও সেইটেই তো এখনও খোলাসা হ'ল না।' সে পরম ঔদাস্যের সঙ্গে জবাব দিলে, 'উস্‌সে ক্যা জরুরৎ হৈ বাবুজি, চড়িয়ে তো আপ্‌ নাও পর, পিছে যো আপ্‌ কি মর্জ্জি দীজিয়ে, ম্যায় খুসীসে লে লেঙ্গে।'

"গলুইয়ের ওপর ভর দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়্‌লাম; তার পর সাম্‌নের দিকে আরও একটু এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পাথরের মত ভারী কি একটা জিনিষে হোঁচট্ খেয়েই দড়াম করে এক আছাড়। লোকটার অবিমৃষ্যকারিতায় মর্ম্মান্তিক চটে গিয়ে ধম্‌কে সাধ্যমত হিন্দিতে বলে উঠ্‌লাম 'কোথাকার উজ্‌বুক্ হাঁদারে তুই, সওয়ারী তুল্‌তে এম্‌নি মত্ত যে নৌকোর মালপত্তর-গুলোও সাম্‌লে রাখ্‌তে পারিস্‌নি। জলে যদি পড়ে যেতাম!'

"লোকটা মহা অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি হিন্দিতে কতগুলি কথা উচ্চারণ করে গেল, আমি শুধু তার ভেতর 'কসুর' কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লাম। তার পর নিজের মনেই কি সব বিড়্‌ বিড়্‌ কর্‌তে কর্‌তে পাটাতনের তক্তা তুলে জিনিষটাকে ঠেলে ভেতরে ফেলে দিয়ে আবার পাটাতন বন্ধ করে দিলে।

"বাতাসের দিকে উল্‌টো মুখ করে ধীরে ধীরে আমাদের নৌকো এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে, গঙ্গার প্রশস্ত বুকে রূপালী ঢেউগুলি লুকোচুরি খেল্‌ছে, আর অসংখ্য আলোর মালা গলায় পরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নগরী জলের ভেতর নিজেরই যেন ছবি দেখ্‌ছে। সত্যিই পৃথিবীর আর সমস্ত জিনিষই আমি তখন ভুলে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ এম্‌নি তন্ময় ভাবে কেটে গেল জানি না, হঠাৎ দেখি অসি ঘাট ছাড়িয়ে প্রায় মাইলটাক্ পথ চলে এসেছি। এইবার ফেরা দরকার মনে করে মাঝিকে নৌকোর মুখ ঘোরাতে হুকুম দিলাম; সে ছপাৎ করে দাঁড় তুলে নিলে, তার পরেই পাটাতনের তক্তাগুলো সরাতে আরম্ভ কর্‌ল। মুহূর্ত্ত পরে দেখি

দশাশ্বমেধ ঘাটে যে ভারী জিনিষটাতে পা বেধে হোঁচট্ খেয়ে পড়েছিলাম সেইটে পাটাতনের ভেতর থেকে ওপরে চলে এসেছে। রূপালী জ্যোৎস্নায় নৌকোর চার ধার প্রায় দিনের মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, তারই সাহায্যে লক্ষ্য কর্‌লাম ওটা একটা ভারী পাথর। সেটাকে ফুটো করে কে দিব্যি একটি দড়ি গলিয়ে রেখেছে—মালা গাঁথবার সময় ঠিক যেমন পুঁতির ভেতর দিয়ে সুতো পরান হয়। নৌকো চালাবার উদ্দেশ্যে এ জিনিষটার কি প্রয়োজন হতে পারে সেইটে আমি ভাবতে যাচ্ছি এমন সময় আমার মাঝি বিকট কণ্ঠে একটা অট্টহাসি হেসে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, "এ মালাগাছটা একবার গলায় পরে নাও তো রণজিৎ বাবু।"

"এক মুহূর্ত্তে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে চড়ল, স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লাম যে একান্ত অজ্ঞাতসারে সেই ডাকাত-দলেরই ফাঁদে পা দিয়েছি; নইলে আমার পরিচয় এরা পেলে কোথায়? নির্জ্জন স্থানে ভুলিয়ে এনে গলায় পাথর বেঁধে এখন এরা আমায় নদীতে ডুবিয়ে মার্‌তে চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্‌কে একবার ধন্যবাদ না দিয়েও থাক্‌তে পার্‌লাম না—ভাগ্যিস্ এ কাজের ভারটা ওরা মাত্র এক জন লোকের ওপর দিয়েছে! হয়তো যত সহজ ওরা ভেবেছে আসল ব্যাপারটা তত সহজে সমাধা হবে না। মাথা তুলে আড়চোখে আর একবার লোকটার দিকে চাইতেই দেখতে পেলাম হাত খানেক লম্বা একখানা ভোজালী তার হাতে চাঁদের আলোয় ঝক্‌মক্ কর্‌ছে। সেখানা একটু তুলিয়ে নিয়ে সে ব্যঙ্গচ্ছলে বল্লে, 'ব্যাণ্ডেল থেকে কাশী পর্য্যন্ত ছুটে এয়োছো, একবার গঙ্গাদর্শনটা হবে না? সেও কি হয়?'

"আত্মরক্ষার সব চাইতে বড় উপায় যে আক্রমণ তা আমার জানা ছিল; নিমেষমাত্র চিন্তার সময় না দিয়ে আমি ছোরাশুদ্ধ ওর ডান হাতের কব্জিটা সবলে চেপে ধর্‌লাম আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত ওজন এম্‌নি ভাবে ওর বাঁ হাতের ওপর চেপে দিলাম যে কোন মতে সে সেখানা মুক্ত কর্‌তে না পারে। তার পর কব্জিতে মোচড় দিতেই ওর হাত শিথিল হয়ে এল, মুখ দিয়ে যন্ত্রণাব্যঞ্জক একটা শব্দ করে ছোরাখানা ও জলে ফেলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মনে হ'ল আমার চোখের আধ আঙ্গুল ওপরে ঠিক ভুরুর মধ্যে একটা গোখ্‌রো সাপে যেন ছুঁ মেরেছে। চম্‌কে মাথাটা একটু সরিয়ে নিতেই ছপ্‌ ছপ্‌ করে কপালের ওপর আরো হু'টো ছোবল। চোখ তুলে সাম্‌নের দিকে চাইতেই যা দেখ্‌লাম তাতে আমার বুকের ভেতর পর্য্যন্ত হিম হয়ে এল—আমার সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে পাঁচ-সাত জনা লোক বিপুল বেগে নৌকো চালিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে আর ছোট ছোট ছেলেরা গুল্‌তি ছুঁড়ে যে ভাবে পাখী শিকার করে ঠিক তেম্‌নি ভাবে ওদেরই এক জন আমার চোক তুটি লক্ষ্য করে ক্রমাগত গুল্‌তি ছুঁড়্‌ছে। অব্যর্থ তার সন্ধান, চোখ তুটিকে না গেলে সে বোধ করি নিরস্ত হবে না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দ্বিতীয় নৌকোখানা একেবারে কাছে এসে পড়্‌ল, ভেতরে আরোহীদের

স্পষ্ট কথাবার্ত্তা শুনতে পেল্লাম। এতগুলো লোকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আর গোঁয়ারের মত কামানের সাম্‌নে বুক পেতে দাঁড়ান একই কথা। ‘সুইমিং চ্যাম্পিয়ান্’ রণজিতের কাছে এ ক্ষেত্রে যেটি আপনি প্রত্যাশা কর্‌তেন, তাই আমি আমার কর্ত্তব্য বলে ঠিক করে ফেল্লাম।

“গঙ্গা তখন খরতোয়া। চার পাশে জন-মনুষ্যের সাড়া-শব্দ নেই, আততায়ীর নৌকো দৈত্যের মত হাত বাড়িয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে এগিয়ে আস্‌ছে। মাতৃনাম স্মরণ করে ঝপ্ করে জাহ্নবীর বুকে লাফিয়ে পড়্‌লাম—একেবারে দশ বার হাত জলের নীচে। কাশীর গঙ্গা উত্তর-বাহিনী তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে; প্রবল টান হুহু করে আমায় দশাশ্বমেধের দিকে নিয়ে চল্ল, আর তার সঙ্গে যোগ হল হাতের নৈপুণ্য। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নেবার জন্য মাথা তুল্‌তে হচ্ছিল, সেই অবসরে দেখ্‌ছিলাম ওরা তখনও হাল ছাড়ে নি, তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত নদী চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জলের ভেতর কুমীরের সাক্ষাৎ পাওয়া যদি অসাধ্য ব্যাপার হয়, তবে রণজিৎ রায়ের সন্ধানও তার চাইতে বিশেষ কিছু সুসাধ্য মনে কর্‌বার কারণ নেই.........”

হুকা-কাশি চিঠি পড়া শেষ করিয়া ধীরে ধীরে সেটি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন; ঠিক সেই সময়ে দরজায় পদশব্দ শোনা গেল। ভৃত্য চা আনিতেছে মনে করিয়া হুকা-কাশি সেদিকে তাকাইলেন; ঘরে কিন্তু ঢুকিল অন্য লোক—অমৃত—হুকা-কাশিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, “এজ্ঞে শিরিষপুর থেকে সন্তোষ বাবু এয়েচেন, তেনার সঙ্গে আর এক বাবু রয়েচেন। আমি বল্লুম, বাবু এই সবে ত্যক্ত হয়ে ফির্‌চেন, এখন দেখা হবেন নি। তাতে সন্তোষ বাবু বল্লেন, ‘যাও বলগে আমার ভয়ঙ্কর দরকার, দেখা না কর্‌লেই নয়’। তেনার চেহারাটাও কেমন বেজার বেজার আর কাহিল কাহিল ঠেক্‌চেন।”

“কি বল্লেন তিনি, বিশেষ কাজ আছে?”

“এজ্ঞে হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর দরকার।”

“আচ্ছা যাও বাইরের ঘর খুলে তাঁদের বস্‌তে দাওগে, আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।” (ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন

গত মাসের রামধনুতে ‘কলিযুগের ওজন দাঁড়ি’ প্রবন্ধে অসাবধানতায় একটি মারাত্মক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। ৭৫ পৃষ্ঠায় ১০—১২ পংক্তি এইরূপ হইবে—

‘এক পাউণ্ড্ ওজন বলিতে বুঝায় একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে এবং চাপে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলের যা ওজন তাই (এক ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া এবং এক ফুট উঁচু জলের ওজন ৬২·৩২১ পাউণ্ড্)’।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

খোকার কল্পনা

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

চলে যাব সেই দেশে পৃথিবী ঘুরে
যে দেশে বাঁশরী বাজে মোহন সুরে,
যে দেশে কপালে চাঁদ দিয়ে যায় টিপ,
ঘরেতে যে দেশে জ্বলে আপনি প্রদীপ,
বাদল যে দেশে নামে সোনালী জলে,
যে দেশে রূপালী ফল গাছেতে ফলে,
যে দেশে পরীরা নাচে রুণুঝুণু পায়ে
হাত ধরে ঘুরে ঘুরে ওড়না গায়ে,
চলে যাব সেই দেশে বাতাসে ভেসে;
পরীরাণী যাবে নিয়ে এক নিমেষে।

গৃহহারা

(শ্রীমতী ভারতী দেবী)

শত বরষের মধুমতী যেথা বাঁক ঘুরে গেছে বাঁয়
সেথা চর পরে ছিল মোর ঘর বট-অশথের ছায়।
সপ্তাহ পরে আসিতে হইত মোরে কেনাকাটা তরে
গাঙের ওপারে “দলুইহাটী”র গ্রামটিতে হাট-বারে।

চাষাণীর তরে রাঙা ডুরে শাড়ী, কন্যার তরে জামা,
গরু দুটা তরে আনিতে হইত বিচালীও এক ধামা।
সেই কথাগুলি আজি শুধু ভাই, স্মৃতি হয়ে জাগে মনে,
সবি ছিল মোর, কিছুই যে নাই, সব গেল কোন্ খানে!

ছোটদের চিত্রশালা

আলিপুরের বাগানে

জিরাফ বাবাজীর খানা খাওয়া

আলোকচিত্র-গ্রহীতা—শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র

সন্দেশ

আমরা খালি চোখে আকাশে সাধারণতঃ ৬।৭ হাজার তারা দেখিতে পাই। ইতিপূর্ব্বে গোর নামে এক বৈজ্ঞানিক দূরবীণ দিয়া আকাশে ৭০০০০০০০ তারার হিসাব করিয়াছিলেন। তার পর আরও দু'জন বৈজ্ঞানিক আকাশের তারা গুণিয়া ১০০০০০০০০০ বলিয়া ঠিক করেন। আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের হাতে পড়িয়া আকাশে ১৬০০০০০০০০ তারার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

সম্রাট্ অষ্টম এড্ওয়ার্ড্ শুধু রাজাই নন, তাঁর নিজস্ব জমীদারীও বড় কম নয়—ঐ সম্পত্তি হইতে তাঁর বছরে প্রায় ১২ লক্ষ পাউণ্ড আয় হয়। লণ্ডনে, স্যাস্ দ্বীপপুঞ্জে, উইণ্ডসরে এবং আরো অনেক জায়গায় তাঁর জমীদারী আছে; ওয়েল্স্এ আছে খনি। তা ছাড়া স্কটল্যাণ্ডে তাঁর যে মাছ ধরিবার স্বত্ব আছে তা হইতেও প্রচুর আয় হয়। ব্যক্তিগত অন্যান্য ধনসম্পদ্ও তাঁর বড় কম নয়!

কিছুদিন আগের একটি ঘটনা। সাউথ আফ্রিকার একজন শ্রমজীবী মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা চক্চকে পাথর কুড়াইয়া পায়। পাথরটি আকারে একটা মুরগীর ডিমের মত। তার কিছুদিন পরেই এক দল জহুরী পাথরটি কিনিয়া লইয়াছে—কত টাকায় জান? ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ডলারে। পাথরটা আসলে একটা নিখুঁৎ হীরার টুক্রা। অত বড় হীরা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আর তিনটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রথম মালিকের নাম অনুসারে হীরাটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'জোঙ্কারের হীরা'।

* * *

সম্প্রতি আমেরিকার এক ডিটেক্টিভ এক অদ্ভুত ধরণের বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক খুনী আসামীকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। আসামীটি পিস্তল দিয়া একজন লোককে খুন করিয়া পালাইয়া যাইতেছিল, এমন সময় পুলিশ তাকে সন্দেহ করিয়া ধরে, কিন্তু তখন তার হাতে পিস্তল কিংবা অন্য কোন অস্ত্র ছিল না—এবং খুনের অন্য কোন প্রমাণও ছিল না। ডিটেক্টিভ মহাশয় আসিয়া তার আঙ্গুলে কি একটা রাসায়নিক ওষুধ মাখাইয়া দিলেন, পরক্ষণেই আসামীর আঙ্গুলে একটা আংটির মত কালো দাগ ফুটিয়া উঠিল, ডিটেক্টিভ তাই দেখিয়া তাকে খুনী বলিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। আসামী আঙ্গুলের যে জায়গা দিয়া পিস্তলের 'ঘোড়া' টিপিয়াছিল পিস্তল ছুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অলক্ষিতে অতি সূক্ষ্ম-পরিমাণ গান-পাঁউডারের কণা আসিয়া পড়ে, এবং তারই উপর ওষুধ লাগাইবার ফলে ডিটেক্টিভের এই অদ্ভুত পরীক্ষাটি সম্ভব হয়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১০ সের।

উত্তরদাতাদের নাম

ডলি, তুলতুল, অন্তকণা (ভবানীপুর); নিখিল চৌধুরী (জলপাইগুড়ি); কামাখ্যাপ্রসাদ খাঁ ও দেবীদাস খাঁ (শিলং); নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিন্ ষ্ট্রীট্); সুধীন্দ্র মুখার্জ্জি, দ্বিজেন্দ্র, মৃগেন্দ্র (কলিকাতা); শক্তিপ্রসাদ গর্গ (কলিকাতা); রণেন্দ্র দত্ত, রথীন্দ্র ও বাণী দত্ত (ধুবড়ী); দুর্গাবতী, নির্ম্মাল্য, দীপালি (গোবর্দ্দী—ঢাকা); সুপ্রভা, প্রতিভা, সাবিত্রী প্রভৃতি (কামপুর); লেখা ও লক্ষ্মী-দি (কলিকাতা); বুলি, ময়না, শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি (জেমসেদপুর); বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা—হাওড়া); বিজনকুমার শেঠ (কলিকাতা); প্রতিমা চৌধুরী (পাটনা); কৃষ্ণ ও পাঁচুগোপাল ঘোষ (নওয়াপাড়া); ছায়া দেবী (রতনপুর);

শান্তি, বিলু, মীরা; চাহু, মীহু (বারুইপুর); শৈলেশকুমার বসু (কলিকাতা); নীহাররাণী মুস্তফী, কমলা, রবিদা প্রভৃতি (আরা); পবিত্র, দীপ্তি, অজিত প্রভৃতি (শিলিগুড়ি); সুরমা, প্রতিমা, বেলা প্রভৃতি (পাতিহাল); ইন্দিরা রায় চৌধুরী (কাশীমপুর—ঢাকা); অসিত সরকার (পুরুলিয়া); বলরাম, খগেন্দ্র, অমরেন্দ্র প্রভৃতি (মালখানগর); সুজনকুমার দাস ও চিন্ময়ী দাস (কলিকাতা); গৌরী রায়, পিন্টু, মোহন (চাইবাসা)।

নূতন ধাঁধা

গয়লা এক হাঁড়ী দুধ নিয়ে এসেছে, হাঁড়ীতে ঠিক আট সের দুধ ধরে। গিন্নী বল্লেন, "আজ আর আট সের দুধ নেব না, তুমি চার সের দিয়ে যাও"। গয়লা বল্লে, "মা ঠকরুণ, আমার সঙ্গে তো চার সের মাপবার পাত্র নেই।" গিন্নী ভেতর থেকে দু'টি ঘটি নিয়ে এলেন—তার একটিতে ঠিক তিন সের দুধ ধরে, আর একটিতে ধরে ঠিক পাঁচ সের।

গয়লা বল্ল, "এ দিয়ে কেমন করে মাপ্‌ব?"

গিন্নী বল্লেন, "এ দিয়েই মাপা যাবে।" গয়লা খানিক ভাবলে, তার পর বল্লে, "আচ্ছা, তা হ'লে আর একটা পাত্র নিয়ে আসুন, যার মধ্যে দুধ ঢেলে রাখ্‌ব।"

গিন্নী বল্লেন, "আর পাত্রের দরকার হবে না, ঐ দিয়েই মেপে ওরই মধ্যে দুধ রাখা যাবে।" গয়লা বড় মুশ্‌কিলে পড়্‌ল—সে কিছুতেই ভেবে উঠতে পারল না কেমন ক'রে এ সম্ভব। তোমরা বলে দাও তো।

পুস্তক-পরিচয়

গল্পে গীতা—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত সাহিত্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক এইচ্, চাটার্জ্জি এণ্ড্ কোং, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য।/০

এই বইখানিতে ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে গীতার গল্প বলা হয়েছে। গ্রন্থকার গীতার জটিল বিষয়গুলি বাদ দিয়ে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় গীতার অনুবাদ করেছেন। ছেলেদের জন্য এ ধরণের বই বোধ হয় এই প্রথম। এ বই ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

রামধনু—

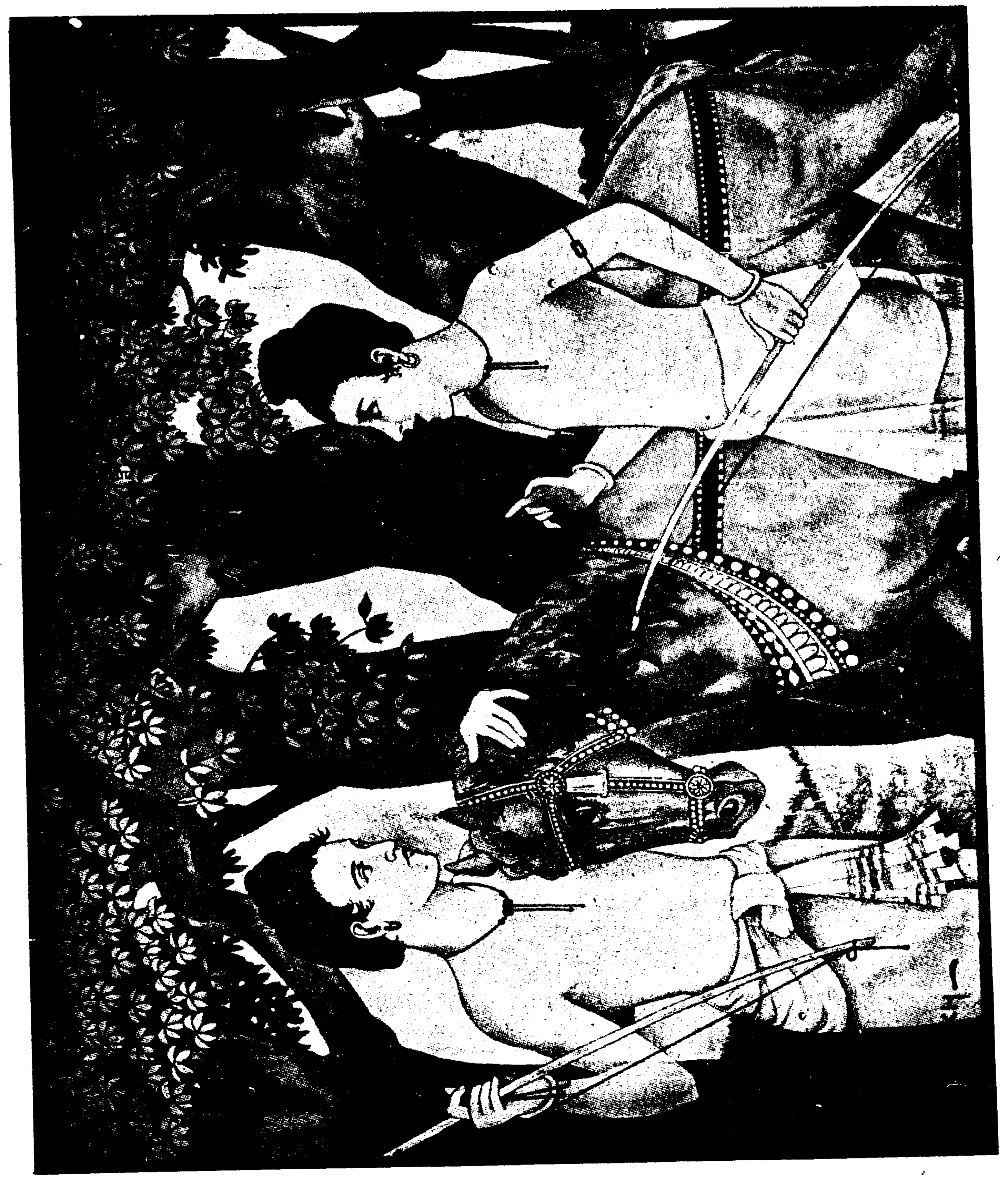

"বাল্মীকির তপোবনে,
দুই ভাই মোরা বাঁধিয়াছি ঘোড়া
কে তোরা এস রণে।"

—লব-কুশ

শিল্পী শ্রীসুমথনাথ মিত্র

৯ম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪৩ { ৪র্থ সংখ্যা

মায়ের ডাক

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

আম-মুকুলের গন্ধে আজি
উতল হ'ল ফাগুন হাওয়া,
ঢাল্‌ছে সুধা পিক্ পাপিয়া—
হয় না যে শেষ তাদের গাওয়া।
আজ্‌কে গোটা ভুবন ভরি'
চল্‌ছে মধুর ছড়াছড়ি,
মিটে গেছে আমারি হায়
মধুরতার দাবী-দাওয়া।

২

ঘুম-পাড়ানে গান গাহিছে
ও বাড়ীতে কৃষক-বধূ।
ছোট ছেলের রাঙ্গা মুখে
ভাঙ্গা কথায় উপ্‌ছে মধু।

কবি কুমুদরঞ্জন

বাঁটেতে দুধ ধর্‌ছে না আর,
ড্যাকে গাভী বৎসেরে তার
ব্যাকুল আমার করছে রে মন
মায়ে-পোয়ের আকুল চাওয়া।

৩

চোখ ফেটে মোর জল যে আসে
মা যে আমার নেইক' রে আজ।
ডাক-নামে মোর ডাকে না মা
বিফল যে সব মিঠে আওয়াজ।
মধুর যে স্বর যেথায় আছে,
হার মানে সে ডাকের কাছে;
শুনতে সে স্বর কান পেতে রই
সে স্বর খুঁজে যায় না পাওয়া!

হাসি-কান্না

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

নব-বরষের প্রাতে,
সোনালী আঁচল লুটায়ে ধরায়,
ঝিকিমিকি হাসি উছসিয়া যায়
নিশীথের শেষে, শুধু হেসে হেসে
রূপালী শিশির-সাথে,
কে আসে
কে হাসে
কে বা কথা কয়,
আজি এ নবীন প্রাতে!

ধরাতল আজি কেঁপে কেঁপে সারা
পাখীর কাকলি-গানে,

হৃদয়ের মাঝে কে গো জেগে উঠে'
কথা কয় কানে কানে !

পুরানো বরষ ঝ'রে প'ড়ে যায়
শুকানো পাতার মত,
তারি ক্রন্দন উঠে মর্ম্মরি,
তারি আঁখিজল পড়ে ঝরি ঝরি
তারি নিঃশ্বাস
তারি হা-হুতাশ
চারিদিকে উঠে কত !

পুরানো বরষ আজি চলে যায়
নবীন বরষ আসে,
পুরানো বরষ কেঁদে হয় সারা
নবীন বরষ হাসে !
বিদায়ের সাথে সাথে,
পুরানো বরষ আঁখিজল ফেলে
সবুজ ঘাসের মাথে !

বীরবাহুর বনিয়াদী চাল

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি)

তখন কলেজে পড়ি। কলেজে অনেক ছেলের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল; কয়েক জনের মধ্যে আলাপটা এতই বেশী জমাটী হয়ে উঠেছিল যে আমাদের একটা আলাদা দলই গড়ে উঠ্‌ল।

দলের মধ্যে এক দিন একটী নতুন ছেলের আমদানী হ'ল। আমরা কলেজের মাঠে একটা কোণে বসে খুব গল্প জমিয়ে তুলেছি এমন সময় সেই ছেলেটী নিজে থেকে এসেই বল্‌লে, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবার খুব ইচ্ছা করে।" তার কথায় বাধা দিয়ে সমীরটা বলে উঠ্‌ল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, আসুন আজ থেকে আপনি আমাদেরই একজন হয়ে যান।"

ছেলেটীর চেহারা ভীষণ রোগা—দেখলে মনে হয় যেন ম্যালেরিয়া দেবীর পোষ্যপুত্র। নাম বল্‌লে—বীরবাহু।

নামটা শুনেই সকলে এক সঙ্গে কি রকম একটা ঢোঁক গিল্‌লে। সকলের মধ্যে থেকে একটা দমকা হাসি বার হয়ে আস্‌ছিল, সকলেই যেন প্রাণপণে সেটাকে গিলে ফেল্‌লে। হাসি বাইরে এল না বলে কোন শব্দ পাওয়া গেল না বটে কিন্তু সেটা পেটের মধ্যে এমন আলোড়ন সুরু করে দিল যে সকলের দেহের উপর দিয়ে হাসির ঢেউ খেলে যেতে লাগ্‌ল। রমেরেন ভুঁড়িটা এত কাঁপতে লাগল যে সে ভুঁড়িকম্প থামাবার জন্য রমেনটা উপুড় হয়ে শুয়েই পড়্‌ল।

উঃ—ঐ ছেলের নাম বীরবাহু? বাপ-মা নাম রেখেছিলেন বটে! ভারী অন্যায় তাঁদের, জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সন্তানের সঙ্গে ঐ রকম ঠাট্টা করে কেউ?

যাই হোক, বীরবাহু ত দলের একজন হয়ে গেল!

প্রথম প্রথম তার মুখ দিয়ে কথা বা'র হ'ত না। কিন্তু মাত্র দশটী দিন, বীরবাহু দলকে দল উড়িয়ে দিতে লাগ্‌ল বচনের চোটে। মুখ নয়ত তুবড়ি, অনর্গল বকে চলেছে। ঢুকেছিল সূচ হয়ে এখন যে ফাল হয়ে দাঁড়াল! অত বড় বিচ্ছু ছেলে অর্দ্ধেন্দু—সেটা পর্য্যন্ত ঘাল হয়ে গেল ওর কাছে? বীরবাহুর চেহারা আর নামের অসামঞ্জস্য দেখে এখন আর কেউ হাসে না। বাহুতে শক্তি না থাক্‌লেও ওর পৌরুষ ত বড় কম নয়। ও না জানে কি? ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, মাছ ধরা, এমন কি তরোয়াল পর্য্যন্ত খেল্‌তে পারে নাকি। কত গল্পই শুনি ওর কাছ থেকে। ঘোড়ায় চড়া? সেবার ওদের জমিদারীর কোন এক মহালে বাধ্‌ল ভয়ানক দাঙ্গা; খবর এল তার বাবার কাছে, রাত তখন একটা। তার বাবা ত ভেবেই আকুল—এই রাত্রে ত মহালে যাওয়ার কোনও উপায় নেই! তাঁদের বাড়ী থেকে সে মহাল প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে; এখন কোনও ট্রেন নেই, কি করা যায়?

বীরবাহু বল্‌লে, "বাবা, আমি যাব।"

তার বাবা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, "তুই কি করে যাবি এই রাত্রে?"

বীরবাহু তখন চলে গেল তাদের অশ্বশালায়, কি যোয়ান যোয়ান ঘোড়া সব! যেন এক একটা চলন্ত রেলের এঞ্জিনকে জোর করে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে যে ঘোড়াটা তেজী সেইটাকে খুলে নিয়ে বীরবাহু চড়ে বস্‌ল তার উপর—তার পর রাইফেল আর তরোয়ালটা

নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তীরবেগে। অন্ধকার রাত্রি, ঘোড়া ছুটেছে, বনজঙ্গল ভেদ করে, খাল-বিল ডিঙিয়ে। চল্লিশ ক্রোশ পথ যেতে তার ঘণ্টা দেড়েক লাগ্‌ল। মহালে পৌঁছাতেই দাঙ্গা গেল থেমে—দু পক্ষ এসেই ভয়ে ছোট বাবুকে কুর্ণিশ করে দাঁড়াল। বীরবাহু তাদের মিটমাট করে দিয়ে ফিরে এল।

শিকারের কথা? বাঘ-শিকারে গিয়েছিল সেবার যেমন সে প্রত্যেক ছুটীতেই যায়। একটা বাঘ মেরে ফিরছে এমন সময় দেখ্‌লে আর একটা বাঘ—মনে হ'ল আগের বাঘটার জোড়া। বীরবাহু সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা ধর্‌ল উঁচু করে। কিন্তু একটী মাত্র গুলি আছে যে—সর্ব্বনাশ! বীরবাহু ভয় পাওয়ার ছেলে নয়। বাঘটা এগিয়ে আস্‌ছে, চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিক্‌রে বার হচ্ছে—এইবার লাফ দেবে। বীরবাহুর সঙ্গের লোকগুলি থর থর করে কাঁপ্‌ছে। বীরবাহু তার রাইফেল বাগিয়ে ধর্‌ল। একটী গুলিতে শেষ কর্‌তে হবে, ঠিক কপালের মধ্যে দুটী ভ্রূর মাঝখানে গুলি করা দরকার। একটা বিকট গর্জ্জন—তার পরেই একটা বন্দুকের গুলির শব্দ। ব্যস্‌, পরের মুহূর্ত্তে সবাই দেখ্‌লে বাঘটা মাটীতে মরে পড়ে রয়েছে।

এই সব গল্প শোনার পর থেকে বীরবাহু আমাদের "হীরো" হয়ে উঠ্‌ল। সব চেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠ্‌ল আমার। কারণ ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া, সাঁতার, মাছ-ধরা সব কিছুই আমি একটু-আধটু জান্‌তাম। কিন্তু বীরবাহুর কাছে কোনও দিন লজ্জায় বল্‌তে পারিনি যে আমি একটু-আধটু জানি। বীরবাহু সকলকেই তাদের দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু অনেক দূর বলে কেউই যেতে রাজি হয়নি। বীরবাহুর মুখে তাদের লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়ার কথা শুনে আমার বহুবার ইচ্ছা হয়েছে একবার ওদের দেশে যেতে। পূজার ছুটীতে অন্যবারের মত সেবারও বীরবাহু সকলকে তাদের দেশে যাওয়ার জন্য অনুরোধ কর্‌লে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কিসে করে যেতে হয়?"

সে বল্লে, "কলকাতা থেকে সোজা ট্রেনে করে গিয়ে নাম্‌ব। আগেই টেলিগ্রাম করে দেব, বাবা ষ্টেশনে ঘোড়া পাঠিয়ে দেবেন—সব চেয়ে তেজী ঘোড়া। বাড়ী পৌঁছাতে ঘণ্টা দুয়েক, কারণ আমার ঘোড়া মোটারের চেয়ে বেশী স্পীডে ছুট্‌বে।"

আমি বল্লাম, "আমি যাব।"

বীরবাহু হেসে উঠ্‌ল, বল্লে, "কেন ঠাট্টা কর্‌ছ?"

আমি হেসে বল্লাম, "না, সত্যিই আমি যাব।"

বীরবাহু আরও হেসে উঠ্‌ল, বল্লে, "আবার ঠাট্টা!"

আমি এবার বেশ গম্ভীর ভাবেই বল্লাম, "ঠাট্টা মোটেই নয়, আমি যাব সত্যিই।"

বীরবাহুর মুখের চেহারাটা কি রকম বদ্‌লে গেল, একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে বল্লে, "বেশ ত, বেশ ত, আমি বাবাকে লিখে দিচ্ছি।"

আমি বাবার কাছ থেকে অনুমতি আর মার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিলাম। যেদিন ছুটী হ'ল সেইদিনই যাত্রা কর্‌লাম। আমি ভাবলাম, জমিদারের ছেলে, নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট্‌ ক্লাশে যাবে; তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "ফার্ষ্ট্‌ ক্লাশের টিকেট করি?"

সে বল্লে, "না।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "তবে সেকেণ্ড ক্লাশের টিকেট কর্‌ব?"

সে এবার গম্ভীর ভাবে বল্ল, "না থার্ড ক্লাশে যাওয়াই ভাল। গান্ধী-মহারাজ স্বয়ং থার্ড ক্লাশে যান, আর আমরা যাব ফার্ষ্ট্‌ সেকেণ্ড ক্লাশে? দেশের লোকের এখন এই দারিদ্র্য, আর আমরা কর্‌ব বিলাসিতা?"

মনটা আমার শ্রদ্ধায় ভরে উঠ্‌ল। আমি ভাবলাম, কি হৃদয় এই বীরবাহুর! এত বড় জমিদারের ছেলে, অথচ গরীবদের প্রতি সহানুভূতিতে ওর বুক ভরা!

যাই হোক, কোনও রকমে থার্ডক্লাশের ভিড় সহ্য করে গিয়ে ত পৌঁছুলাম ষ্টেশনে। ভাবলাম, নিশ্চয় প্রকাণ্ড দুটো ঘোড়া নিয়ে দুটো সহিস দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কোথাও কিছু দেখ্‌তে পেলাম না। আমি বল্‌লাম, "কৈ হে ঘোড়া কৈ?"

বীরবাহু তখন এদিক্‌ ওদিক্‌ তাকাতে লাগ্‌ল; তারপরে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল, "ঐ যে ঐ গাছতলায়।" তাকিয়ে দেখ্‌লাম, দূরে একটা গাছের তলায় দুটো কি বাঁধা রয়েছে। আমি ত ভেবেছিলাম যে ও দুটো গাধা, অত ছোট ঘোড়া হয়! কোথায় প্রকাণ্ড তেজী ঘোড়া আর কোথায় এই গাধার মত ঘোড়া!

যাই হোক, ব্যাপারটা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না; একটা ঘোড়ায় ত চড়ে বস্‌লাম। চড়ে বসে ঘোড়ার পেছনে চাবুকের ঘা লাগাতেই সে পেছন দিকের পা দু'টো একবার শূন্যে ছুড়ে আবার চুপ করে রইল। আবার চাবুক লাগালাম, আবার সেই রকম পা' ছুড়েই থেমে গেল। এবার বেশ দু' চার ঘা একসঙ্গে লাগাতেই খটা খট্‌, খট্‌ খট্‌ কর্‌তে কর্‌তে সে পেছন দিকে হাঁট্‌তে সুরু করে দিল। আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। এ কিরে বাবা! এ রকম ত দেখিনি কখনও। ছোটবেলায় স্কুলে ব্যাক-রেস্‌ কর্‌তাম মনে আছে কিন্তু ঘোড়ায় ব্যাক-রেস করে জানতাম না ত! কি জানি, জমিদারী ঘোড়ার চালই হয়ত এই রকম। আমাদের দেশের ছোট রেলগাড়ীর মত—উত্তর দিকে যেতে হলে দক্ষিণ দিকে খানিক পিছিয়ে না এলে চল্‌তে পারে না। ভাবলাম, এও হয়ত খানিক পিছিয়ে গিয়ে তার পর সম্মুখে ছুট্‌বে। কিন্তু কৈ, এ পক্ষিরাজটী যে কেবলই পেছুচ্ছেন; সর্ব্বনাশ, আর একটু পেছলে যে

একটা প্রকাণ্ড গভীর খানা—খানায় ফেলবে নাকি ? কি সর্ব্বনাশ, প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলাম, "বীরবাহু, ও বীরবাহু, তোমার ঘোড়া যে আমাকে খানায় ফেল্‌ল—এ কি তোমাদের দেশের জমিদারী অভ্যর্থনা, বাবা ?" বীরবাহু এতক্ষণে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল—সে ফিরে এল ; তার ঘোড়া থেকে নেমে আমার ঘোড়ার লাগামটা ধরে ফেল্‌ল। আমার অশ্বপ্রবর তখন ব্যাকরেস থামালেন। আমি চট্‌ করে নেমে পড়লাম ; সারা শরীর দিয়ে তখন ঘাম ঝরছে—ক্লান্তিতে নয়, খানায় পড়ার ভয়ে। বীরবাহু একটু লজ্জিত ভাবেই বল্লে, "কিছু মনে করো না ভাই। আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম—ও ঘোড়াটা সম্মুখ দিকে যেতে চায় না, ও যাবে পেছন দিকে। তাই যেদিকে যেতে হবে তার উল্টো দিকে ঘোড়ার মুখ করে তবে চড়তে হবে। তা' হলেই ও পেছুতে পেছুতে তোমাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে।"

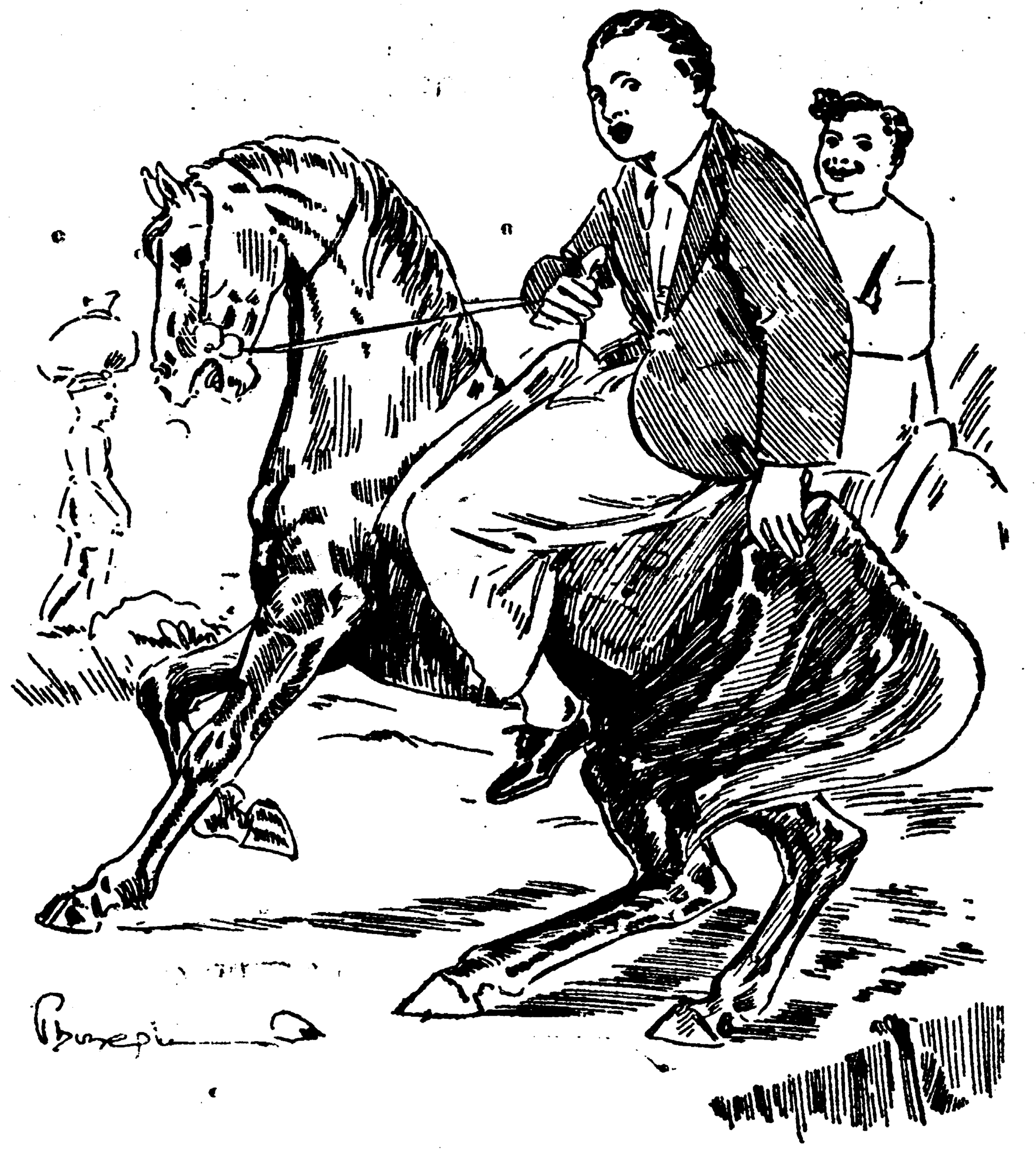

খানায় ফেল্‌বে নাকি ?

অবাক্ হয়ে গেলাম ; অনেক রকম ঘোড়ায় চড়ার গল্প শুনেছি, কিন্তু এ রকম পিছু-হাঁটা ঘোড়ার গল্প কখনও শুনি নি। যাই হোক, বীরবাহু আমার ঘোড়াটায় চড়্‌ল, আমি চড়লাম বীরবাহুর ঘোড়ায়। বীরবাহু ঘোড়ার মুখ উল্টো দিকে করে নিয়ে চড়ে বস্‌ল—ঘোড়াও সমানে পিছু হাঁটতে লাগ্‌ল ; সে এক অদ্ভুত দৃশ্য !

আমিও অন্য ঘোড়াটায় চড়ে বসলাম—ঘোড়াটা চল্‌ল মাঠের উপর দিয়ে। বেশ খানিকক্ষণ চল্‌ল, তার পরেই বাধ্‌ল গণ্ডগোল। মাঠের মধ্যে যেখানে ঘাস দেখ্‌তে পায় সেখানে গিয়ে সে ঘাস খায়, হাজার চেষ্টা কর্‌লেও নড়ে না। অবশেষে দেখলাম ওর কাছে

আত্মসমর্পণ করাই ভাল। আমি লাগাম ধরে বসে রইলাম, ও এদিক্‌-ওদিক্‌ চারিদিকে ঘুরে ঘাস খেতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ পরে বোধ হ'ল পেট ভরেছে। ভাব্‌লাম, যাক্‌ এইবার ঠিক যাবে। দুপুর রৌদ্রে মাঠের মধ্যে মাথার চাঁদি ফাট্‌বার যোগাড়। একটু গিয়েই দেখি আবার মাঠের পথ ছেড়ে পক্ষিরাজ ডানদিকে চলেছে। কি ব্যাপার ? ভাল করে তাকিয়ে দেখি দূরে একটা পুকুর। বুঝ্‌লাম যে গোপাল আমার এবার জল খাবেন। লাগাম ধরে বসে রইলাম, তিনি পুকুরে নেমে জল খেতে লাগ্‌লেন। জল খাওয়া হয়ে গেল, আবার চল্ল। বীরবাহুর ঘোড়া পেছুতে পেছুতে গিয়েও অনেক দূর চলে গিয়েছে। আমার এ আহ্লাদী ঘোড়া পড়েছেন অনেক পিছিয়ে। চলেছি ; এবার অনেকক্ষণ সোজাই চলেছি।… …..সম্মুখে একটা মুদির দোকান—আহ্লাদী সোজা ঢুক্‌ল মুদির দোকানে। একটা প্রকাণ্ড মাটীর গাম্‌লায় ছিল ছোলার ডাল, বোধ হয় পাঁচ ছয় সের। খেতে সুরু করে দিল। দোকানী হৈ হৈ করে ছুটে এল। আগে হ'লে হয়ত চেষ্টা কর্‌তাম যাতে না খায়, হয়ত চাবুক লাগাতাম। কিন্তু এখন জানি, সে সব চেষ্টা বৃথা। যতক্ষণ ওর নিজের ইচ্ছা না হয় ততক্ষণ ও মুখ তুল্‌বে না। দোকানীকে বল্‌লাম, "কিছু বলো না, খেতে দাও ; যা খাবে তার দাম আমি দেব।" ঘোড়া খেতে লাগ্‌ল, দোকানী রইল দাঁড়িয়ে। ভাব্‌লাম কত আর খাবে, এই ত এক পেট ঘাস-জল খেল ; আর ঐ ত চেহারা !

লাগাম ধরে বসে আছি—ও সমানে খেয়ে চলেছে। সর্ব্বনাশ, ওর পেটে কি রাক্ষস আছে নাকি ? এ যে আমাদের পরিতোষের মত। পরিতোষের চেহারা একেবারে দেশলাইএর কাঠি কিন্তু খেতে বস্‌লে মনে হয় যে ওর পেটটী একটী জালা। ঘোড়াটা পরিতোষের কেউ হবে বোধ হয়। বুঝ্‌লাম ওর খাওয়া আজ আর শেষ হ'বে না। ওদিকে বীরবাহুকেও আর দেখা যাচ্ছে না—শেষে পথ চিন্‌ব কি করে ? নিরুপায় হয়ে দোকানীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কত দাম হবে সমস্ত ডালের ?" সে বল্লে, "দেড় টাকা।" আমি তার হাতে দেড় টাকা দিয়ে বল্লাম, "আমাকে যদি একটা লোক দাও ত বড় ভাল হয়—সে ঐ ডালের গাম্‌লাটা ওর সম্মুখে ধরে ধরে নিয়ে যাবে—আর ও খেতে খেতে এগুবে ; নইলে আমার আজ বাড়ী পৌঁছান হ'বে না। সে লোককে আমি বেশ ভাল করে বখ্‌শিষ্‌ কর্‌ব।"

বখ্‌শিষের লোভে একটী ছোকরা ডালের গাম্‌লাটা ঘোড়ার সাম্‌নে ধরে চল্‌তে লাগ্‌ল—আর আমার সাতপুরুষের গুরুদেব সেই ছোলা খেতে খেতে দয়া করে এগিয়ে চল্‌লেন। এমনি করে শেষকালে বাড়ী পৌঁছুলাম।

বীরবাহুদের জমিদারীর ঐশ্বর্য্য দেখে সত্যিই চম্‌কে গেলাম। একটা ভাঙ্গা দোতলা বাড়ী, একটা এঁদো পুকুর, একটী বাঁশবন আর দু'-চারটে ধানের ক্ষেত। লোকলস্কর বল্‌তে একটী খোট্টা চাকর আর অশ্বশালায় তেজী তেজী অশ্ব মানে গাছতলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই পিছু-

হাটা পক্ষিরাজটা। আর আমার আহ্লাদী ঘোড়াটা অন্যের কাছ থেকে আজকের জন্য ধার করে আনা হয়েছে। এই বিশাল ঐশ্বর্য্য দেখে বুঝ্‌লাম গান্ধী-মহারাজের চেলা হওয়ার আসল কারণটা কি !

যাক্, বীরবাহু ঘাবড়াবার ছেলে নয়। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর বল্ল, "ভাই, এবার রাইডিং ত আর চল্‌বে না। শুন্‌লাম কি একটা সংক্রামক ব্যাধি হয়েছিল—সব ঘোড়াগুলি মারা গেছে। তার চাইতে চল, একটু মাছ ধরা যাক—মাছ খেলিয়ে তোলার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। তবে দে'খ, ছোট মাছ ধ'র না—ছোট মাছ উঠ্‌লে আবার ছেড়ে দিও। ছোট মাছ ধর্‌বে ছোট ছোট ছেলেরা ! প্রকাণ্ড রুই-কাত্‌লা—দশ বারো সের ওজন হবে—তবেই ত ?"

ভাব্‌লাম, গেঁয়ো ছেলে, রাইডিং না হ'লেও মাছটা নিশ্চয়ই ভাল ধর্‌তে পারে। আমি যে পারি না তা নয়, তবে খুব বড় মাছ কখনও খেলিয়ে তুলি নি।

দুটো ছিপ নিয়ে যোগাড় করে বসা গেল পুকুরের ধারে। প্রথম প্রথম আমার ছিপে ছোট ছোট মাছ উঠ্‌ল গোটা কতক ; ছেড়ে দিলাম সব ক'টাকে। তার পর প্রায় সের দুয়েকের একটা মাছ উঠ্‌ল। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "এটা ত বেশ বড় আছে, এটা রেখে দেব ?"

বীরবাহু একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লে, "ওটা ত নেহাৎ ছোট—ছেড়ে দাও।" ভাব্‌লাম, হবেও বা ! হয়ত দশ-পনেরো সের মাছ না হ'লে এরা বড় মাছ বলে না।

হঠাৎ বীরবাহুর ছিপের ফাত্‌না উঠ্‌ল নড়ে—টুপ্ টুপ্ টুপ্ চোঁ—ও-ও—ও ফাত্‌না জলের মধ্যে চলে গেল। বীরবাহু দিলে বোঁ করে এক ঝিঁক—সঙ্গে সঙ্গে ছিপের হুইল বোঁ বোঁ করে ঘুরে যেতে লাগ্‌ল। কি বিপদ, হুইল ঘোরে কেমন করে ? ছিপ যে ডাঙ্গায় চলে এসেছে বীরবাহুর পেছন দিকে ! মাছ ত নিশ্চয় মাটীতে। আমরা পুকুরের ধারে বসেছিলাম—পুকুরের পাড় উঁচু। ছিপের সূতো-বড়শী পাড়ের ওপর চলে গেছে, আমাদের দৃষ্টির বাইরে।

হুইল বোঁ বোঁ করে ঘুরে চলেছে এখনও। এ কিরে বাবা, মাছ কি মাঠ বয়ে দৌড়চ্ছে !!

বীরবাহু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বোকার মত হুইলের সূতো ছেড়ে চলেছে।

আমি সমস্ত ফেলে মাঠের মধ্যে ছুট্‌লাম ; ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে দেখি, মাছ নয়, গরুর বাছুর ! লেজে তার বড়শী আট্‌কে গেছে, আর সে প্রাণপণে ছুট্‌ছে। দেখে মাথাটা কি রকম ঘুলিয়ে গেল। কি হ'ল তা হ'লে ব্যাপারটা ? এদের দেশের পুকুরে কি বাছুর থাকে ! ছিপ দিয়ে কি বাছুর ধরে ? অনেক ভাবলাম, শেষে মাথাটা একটু ধাতস্থ হ'ল। তখন ব্যাপারটা আন্দাজ কর্‌তে পার্‌লাম খানিকটা। বাছুরটা পুকুরের মধ্যে ছিল না—ছিল ডাঙ্গাতেই। বীরবাহুর বাহুর টানে মাছ উঠ্‌ল না—শুধু বড়শীই উঠে এল, এবং শুধু উঠে এল না, উঠে এসে সেটা পিছন দিকে গিয়ে বাছুর বেচারার লেজে বিঁধে গেল। বাছুরটার জীবনে হয়ত অনেক রকম

অত্যাচারের অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, কিন্তু লেজে বড়শী বেঁধার অভিজ্ঞতা তার কখন হয়নি ; তাই সে ভয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে সুরু করেছে। সেদিন মাছের বদলে বাছুর ধরেই ফেরা গেল।

এর পর বীরবাহুর উৎসাহ যেন বেশ একটু কমে গেল। আমার কিন্তু ভয়ানক শিকারের সখ, সঙ্গে ক'রে দুটো বন্দুক পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছি। বীরবাহু কিন্তু শিকার সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে না। অনেক পীড়াপীড়ি করায় শেষে বল্‌ল যে তার বন্দুক তার পিশেমশাই নিয়ে গেছেন, কাজেই শিকার অসম্ভব।

আমি বল্লাম, "আমার দুটো বন্দুক আছে, চল"। অত বড় বাঘ-শিকারী, এক-এক গুলিতে এক-একটা বাঘ মেরে ফেলে। ওর শিকারের বহরটা একবার দেখ্‌তেই হ'বে।

বন্দুক হাতে দু'জনে চলেছি বনের মধ্যে দিয়ে ; হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ—ভীষণ শব্দ। দেখ্‌লাম, বন ভেদ করে একটা বুনো শূয়োর তীরবেগে ছুটে আস্‌ছে।

বীরবাহু ছিল সম্মুখে। আমি চীৎকার করে উঠ্‌লাম—"গুলি কর, গুলি কর ; শব্দ হ'ল গুড়ুম, গুড়ুম। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেল—কেঁউ, কেঁউ।

ভাব্‌লাম, একি আবার ? বুনো শূয়োরে কি কেঁউ কেঁউ করে নাকি ?

সাম্‌নে তাকিয়ে দেখ্‌লাম, শূয়োরটা সোজা ছুটে চলে যাচ্ছে ! পিছনে একটা কুকুর শুয়ে ছিল ঝোপের মধ্যে, বীরবাহুর এমনি বাঘা-টিপ্ যে বন্দুক ছুড়েছে সাম্‌নে শূয়োর লক্ষ্য করে, কুকুর মর্‌ল পিছন দিকে।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ওকে গুলি কর্‌তে না বলে নিজে কর্‌লেই হ'ত। এমন শিকারটা ফস্‌কে গেল—মাঝ থেকে নিরীহ কুকুরটা মারা গেল। হতাশ হয়ে ফির্‌ছি, দেখি দূরে একটা নদীর ধারে অনেকগুলি পাখী। ভাব্‌লাম অন্ততঃ পক্ষে দুটো পাখীই মেরে নিয়ে যাই।

ইতিমধ্যে বাঘ-শিকারী বন্দুক তুলেছেন, দড়াম করে হ'ল আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে পাখীগুলি সব উড়ে গেল। এবার আর রাগ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। বল্লাম, "আচ্ছা বুদ্ধি ত তোমার ! ওতে গুলি পোরা রয়েছে—গুলি দিয়ে পাখী মার্‌ছ ? ছট্‌রা দিয়ে পাখী মার্‌তে হয় তাও জান না ! বলিহারি বাঘ-শিকারী !"

তবু দম্‌বার পাত্র নয়। নির্ল্লজ্জের মত দাঁত বার করে বল্ল, "ওঃ তাই ত, আমার খেয়ালই ছিল না। বড় বড় শিকার করে করে গুলি চালাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, ছট্‌রার কথা মনে পড়ে না।"

আমি পরদিনই চলে এলাম। দুঃখ হ'ল যে এবার পূজার ছুটীটা মাঠে মারা গেল।

আমি ভেবেছিলাম এর পর আর সে কল্‌কাতায় ফির্‌বে না ; ফির্‌লেও আমাদের কলেজে আর পড়বে না। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার—পূজার ছুটী শেষ হ'তেই সে কল্‌কাতায় ফিরে এল

এবং আমাদের কলেজেই পড়্‌তে লাগ্‌ল; আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমাদের দলের মধ্যে—আমারই সম্মুখে বসে খাসা বড়াই করে যেতে লাগ্‌ল, তাদের জমিদারী, লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া সব কিছুর। আর তার রাইডিং, শিকার, মাছ-ধরা, সাঁতারের বাহাদুরীর গল্পও সমানে চালাতে লাগ্‌ল।

দন্তচর্য্যা

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এস্‌-সি)

ঝক্‌ঝকে মুক্তার মত সাদা পরিষ্কার দাঁত—দেখিতে কি সুন্দর বল তো! আর তুলনা কর দেখি সে দাঁতের সঙ্গে ছাতায় ভরা খেয়ো দাঁতের, যার ফাঁক্ দিয়া কথা বলিবার সময় ভস্ ভস্ করিয়া বাহির হইতেছে কেবল দুর্গন্ধ! এমন দাঁত যার তার সহিত কথা বলিতে কয় জন লোকের প্রবৃত্তি হয়? বাস্তবিক, দাঁত পরিষ্কার রাখিতে পারিলে মুখের সৌন্দর্য্য যে অনেকখানিই বাড়িয়া যায় এ কথা বোধ করি কেউই অস্বীকার করিবে না।

সৌন্দর্য্যের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, দাঁতের প্রয়োজনীয়তার কথাটাই ধরা যাক্। আমাদের বাংলা ভাষায় একটা চল্‌তি কথা আছে—লোকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না। দাঁতের মর্য্যাদা লোকে বোঁঝে তখন যখন দাঁতে ব্যথা হয়, পোকার দৌরাত্ম্যে অষ্টপ্রহর যন্ত্রণা এবং কট্‌কটানি লাগিয়াই থাকে। ভাল ভাল খাবার জিনিষের আস্বাদ পাওয়া তখন তোমার পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপারই হইয়া পড়ে, কেননা চিবাইতে গেলেই যদি ব্যথা পাও তবে খাবারের আস্বাদ আর পাইবে কোথা হইতে?

কেবল মাত্র এই কারণেই বোধ করি যে কোন লোকের দাঁত সম্বন্ধে বিশেষ হুঁসিয়ার হওয়া দরকার। কিন্তু আজকালকার ডাক্তার-বদ্যিরা যে কথা বলেন তা আরও গুরুতর। তাঁরা নানান্ রকম প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দিতেছেন যে আমাদের সচরাচর যে সব অসুখ-বিসুখ হয় তার অর্দ্ধেকেরই কারণ দাঁত সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকা। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেছ দাঁত ভাল রাখা কতখানি

দরকার—এটিকে দস্তুরমত একটি অভ্যাসে পরিণত করিতে হইবে। আর সব অভ্যাসই ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিতে পারিলেই ভাল হয়।

দাঁতকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখিতে 'হইলে তিনটি বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে—(১) দাঁত পরিষ্কার করা (২) দাঁতের ব্যায়াম করা (৩) দাঁতের স্বাস্থ্য বজায় থাকে এই ধরণের খাবার খাওয়া।

(১) প্রথমে দাঁত পরিষ্কার করার কথাটাই আলোচনা করা যাক্। ইয়োরোপে আজকাল ছেলেদের এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। নীচের এই ছবিখানা দেখ; ভিয়েনা সহরের ইস্কুলের পড়ো'রা কি ভাবে দাঁত মাজিতে হয় তাই শিখিতেছে। এটা কিন্তু বিলাতী প্রথা, আমাদের এই গরীব দেশে কম লোকেই এ ভাবে দাঁত মাজে। দাঁত মাজার জন্য আমাদের দেশে

ভিয়েনা সহরের ইস্কুলের পড়ো'রা দাঁত মাজা শিখিতেছে

ঘুঁটের ছাইএর চল্‌তিই সব চেয়ে বেশী। যে সব ছাইএ খিঁচ্ বা কাঁকর থাকে, দাঁতের পক্ষে সেগুলি তেমন সুবিধার নয়; তার কারণ এই যে, মানুষের দাঁতের উপরে চক্‌চকে একটা জিনিষ আছে, ইংরাজীতে তাকে বলে 'এনামেল'। অনবরত খিঁচের ঘসা খাইলে এই এনামেল আস্তে আস্তে ক্ষয়িয়া যায়। ছেলেবেলায় হয়তো এ দোষটি নজরে আসে না, কেননা ছোট ছেলেদের 'এনামেল' ক্ষয়িয়া গেলেও আবার নতুন করিয়া গজাইতে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু ব্যাপারটি প্রকট হইয়া দাঁড়ায়। দাঁত মাজার পক্ষে আধপোড়া কাল রঙের ঘুঁটের ছাই বেশ ভাল; এতে কয়লা থাকে, আর কয়লা মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে কাঠ-কয়লার গুঁড়াও মন্দ নয়। যাদের দাঁতের ব্যারাম আছে, তামাকের গুল গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়ায় দাঁত মাজিলে তাদের প্রায়ই আরাম পাইতে দেখা যায়;

ইহার কারণ আর কিছুই না—তামাকের মধ্যে নিকোটিন মামে যে এক রকম বিষাক্ত জিনিষ আছে তা বোধ হয় অনেকেই জান। তামাক পুড়িয়া গেলেও গুলের ভিতর সেই জিনিষ খানিকটা পরিমাণে থাকিয়া যায়, আর তারই সংস্পর্শে আসিয়া দাঁতের পোকাগুলি ধ্বংস পায়।

সহর-অঞ্চলের ছেলেরা প্রায়ই ব্যবহার করে মাজন। অধিকাংশ মাজনই তৈরী হয় চা-খড়ির (chalk) গুঁড়া হইতে, অবশ্য জিনিষটাকে রঙ্গীন আর সুগন্ধ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় আরও কোন কোন জিনিষ সেই সঙ্গে মেশান হয়—যেমন ধর কর্পূর। রংয়ের কোনই আবশ্যকতা নাই; গন্ধের জন্য তোমরা খড়ির গুঁড়ার সহিত দু'-চার ফোঁটা ইউক্যালিপ্‌টাস্ অয়েল অথবা কার্ব্বলিক্ এসিড্ মিশাইয়া লইতে পার। এগুলি একদিকে যেমন মাজনে গন্ধ দেয়, অপর দিকে দন্তসংলগ্ন জীবাণু ধ্বংস করে। ডাক্তারখানায় এক রকম তৈরী খড়ির গুঁড়া পাওয়াযায়, তার নাম প্রিপেয়ার্ড্ চক্ (Prepared chalk)। এ জিনিষটা সাধারণ খড়ির গুঁড়ার চেয়ে ভাল। আরও ভাল প্রেসিপিটেটেড্ চক্ (Precipitated chalk)। এতে আদৌ খিঁচ্ নাই। দাম প্রতি সের বার আনা হইতে এক টাকা।

বাঙ্গালী ছেলেপেলেরা বেশীর ভাগই আঙ্গুলের সাহয্যে দাঁত মাজে; অবশ্য টুথ্-ব্রাসের রেওয়াজও কিছু কিছু হইয়াছে। অল্প-দামী টুথ্-ব্রাস্ কখনও ব্যবহার করিবে না; তার চেয়ে বরং আঙ্গুলই ভাল। নতুন-কেনা টুথ্-ব্রাস্‌কে মিনিট দশ-পনেরো ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া রাখা দরকার। সেই জলের মধ্যে দু'চার ফোঁটা কার্ব্বলিক এসিড্ বা একটু কার্ব্বলিক সাবান দিলে আরও ভাল হয়। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ব্রাসের ভিতরকার জীবাণুগুলি নষ্ট করা; টুথ্-ব্রাসের মধ্যে ময়লা জমিলে নানা রকম অসুখ-বিসুখ ঘটার সম্ভাবনা; কাজেই ব্রাস্ পুরানো হইলে সেগুলিকেও ফুটন্ত জলে ফেলিয়া মাঝে মাঝে শোধন করিয়া নেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু সব চেয়ে ভাল আমাদের দেশে যে মামুলী 'দন্তকাষ্ঠ' বা দাঁতন করার পদ্ধতি আছে, তাই। নিয়মিত ভাবে যাঁরা দাঁতন করিয়া আসিয়াছেন, সত্তর-আশী বছর বয়স পর্য্যন্ত তাঁদের দাঁত চমৎকার আছে দেখিয়াছি। কোন রকম

দাঁতের ব্যারামে তাঁদের ভুগিতে হয় নাই। সাহেবদের দাঁতের চেয়ে দাঁতন-ব্যবহারকারী ভারতীয়দের দাঁত যে ভাল তা সকলেই স্বীকার করেন। আঁশশ্যাওড়া, নিম, খয়ের, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি নানা রকম গাছের ডালে দাঁতন তৈরী হয়। এই সমস্ত গাছে হয় খানিকটা গন্ধ তেল (Essential oil) আর নয়তো খানিকটা কষা জিনিষ (Tanin) থাকে বলিয়া দাঁতের জীবাণু সেগুলির সংস্পর্শে আসিয়া মরিয়া যায়। যে সমস্ত জিনিষের জীবাণু-ধ্বংসকারী শক্তি খুব বেশী, দাঁতের অসুখ ছাড়া অন্য সময়ে কিন্তু সেগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়। তার কারণ এই যে, মানুষের শরীরের মধ্যে সর্ব্বদাই কতকগুলি রক্ষি-পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে; বাহিরের জীবাণুর সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া তারা মানুষকে সুস্থ ও সবল রাখে। খুব বেশী উগ্র জীবাণু-ধ্বংসকারী জিনিষ যদি প্রতিদিন ব্যবহার করা যায় তবে এই রক্ষি-পদার্থগুলি ভাল ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। কাজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে তা হানিকর।

দাঁতন ব্যবহারের আর একটা সুবিধা এই যে এর কুচিগুলিকে তোমরা ইচ্ছা মত শক্ত অথবা নরম করিয়া লইতে পার। সব রকম দাঁতের পক্ষেই এক রকমের কুচি হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়—কারো পক্ষে দরকার শক্ত কুচির, কারো বা নরমের। দাঁতনটিকে একটু কম চিবাইলেই তার কুচিগুলি শক্ত থাকিয়া যাইবে, আবার একটু বেশীক্ষণ ধরিয়া চিবাইলেই সেগুলি নরম হইয়া আসিবে। একবার ব্যবহারের পরেই সে দাঁতন ফেলিয়া দিতে হয়, কাজেই জীবাণুহীনভাবে তাকে রক্ষা করিবার জন্য কোনই হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। আর খরচের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে টুথ্-ব্রাস্, টুথ্-পেষ্টের সঙ্গে এগুলির তুলনাই চলে না—অনেক কম খরচে হয়। গৃহস্থের পক্ষে এটা কম কথা নয়! দেশেরও উপকার আছে—গরীব লোকেরা দাঁতন জোগাইয়া বেশ দু' পয়সা উপায় করিতে পারে, গ্রামের চারি পাশের বন-জঙ্গল, আগাছাও অনেকখানি কমিয়া যায়। দাঁতের ব্যায়ামেও দাঁতন সাহায্য করে।

(২) দাঁতের ব্যায়াম:—শরীরের প্রত্যেকটি যন্ত্রের নিকট হইতে ভাল ভাবে কাজ আদায় করিতে হইলে তাদের জন্য রীতিমত ব্যায়ামের ব্যবস্থা

করিতে হয়। মাথা না খাটাইলে বুদ্ধি খোলে না। অনেক সাধু আছেন যাঁরা একটি হাত উঁচু করিয়া 'ঊর্দ্ধবাহু' হইয়া থাকেন। ফলে, সে হাতটি কিছু দিন পরেই শীর্ণ আর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। দাঁতের বেলায়ও ঠিক তাই। দাঁত, দাঁতের মাড়ি, চোয়ালের হাড় এবং সেগুলিকে পরিচালিত করিবার মাংসপেশীকে উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে না দিলে যথা সময়ের অনেক আগেই সেগুলির কাজ করার ক্ষমতা কমিয়া যায়। রক্ত সঞ্চালন তখন আর ঠিক মত হয় না; দাঁত ক্ষয়িতে আরম্ভ করে, মাড়ির গায়ে পূঁযে ভরা ছোট ছোট 'পকেটে'র সৃষ্টি হয়, সেগুলি টিপিলেই পূঁয বাহির হইয়া আসে। তার পর খাওয়ার সময় সেই দূষিত পূঁয পেটের মধ্যে গিয়া নানা রকম অসুখের গোড়াপত্তন করে। এই সমস্ত কষ্টকর রোগের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার এক মাত্র উপায় দাঁতের উপযুক্ত ব্যায়াম করা।

আমাদের চোয়ালের হাড়ের ভিতর যে গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্তের মধ্যে আমাদের দাঁতগুলি সাজান; তলাটা মাড়ি দিয়া ঢাকা। চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে মাংসপেশী জোড়া আছে—টেণ্ডনের দ্বারা সেগুলি মাংসপেশীর সঙ্গে সংযুক্ত। মস্তিষ্ক হইতে আমাদের স্নায়ু বা নার্ভ্ এই মাংসপেশী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। এই নার্ভের সাহায্যেই আমরা মাংসপেশীতে খবর পাঠাই এবং তাদের নিকট হইতে খবর লই। মাংসপেশীগুলি আমরা ইচ্ছামত সম্প্রসারিত বা সংকুচিত করি এবং চিবাইবার সময় যেটা চিবাইতেছি সেটার উপর কতটা জোর দেওয়া দরকার তাহাও নিয়মিত করি। রীতিমত ভাবে দাঁত, হাড় এবং মাংসপেশীগুলির পুষ্টিবিধানের জন্য ও তাদের সংরক্ষণের জন্য উহাদের মধ্যে রক্ত-সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে। দাঁতের ব্যায়াম করিলে এই রক্ত সঞ্চালনের কাজটা খুব জোরে জোরে ঘটিতে থাকে, ফলে অনবরত নতুন রক্ত আসিয়া তাদের পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। শুধু তাই নয়, দাঁতের ভিতর রোগের বীজাণু থাকিলে সেগুলি ধ্বংস পায়। ঠিক তেমনি আবার ব্যায়াম না করিলে ফল হয় উলটা; দাঁত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়া যায়, নানা রকম অসুখের উৎপত্তি হয়।

দাঁতের ব্যায়ামের সময় সর্ব্বপ্রথম একটা বিষয় মনে রাখা দরকার—

খাবার জিনিষ চিবাইবার সময়ে যে যে যন্ত্র কাজ করিতেছে তাদের সকলের কাজের প্রতিই মনোযোগ দেওয়া। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ হাত পা প্রভৃতির ব্যায়ামের সময়ে সেগুলির মাংসপেশীর দিকে যদি খুব ভাল মনোযোগ দেওয়া যায় তবে সে পেশীর উন্নতি হয় খুব তাড়াতাড়ি। দাঁতের পেশী সম্বন্ধেও একথা খাটে। আমাদের দেশের পুরানো আমলের ব্রহ্মচারীরা খাইতে বসিয়া কথা বলিতেন না। এ নিয়ম ভাল ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে খাওয়া একেবারে বন্ধ করা দরকার। এক টুক্‌রা রুটিকে এক মনে কিছুক্ষণ চিবাইলে দেখা যায় তার স্বাদ ক্রমেই যেন মিষ্টি হইতেছে। ইহার অর্থ আর কিছুই না, জিনিষটা জীর্ণ হইতেছে। খাইবার পর মানুষের পাকস্থলীর ভিতর হইতে এক রকম রস বাহির হইতে থাকে, ইংরাজীতে তাকে বলে gastric juice। খাবার যত চর্ব্বিত ও আস্বাদিত হইবে এই রস ততই ভালভাবে ক্ষরিতে থাকিবে। আর এই রস যত বেশী ক্ষরিবে আমাদের পরিপাক শক্তিও ততই বাড়িতে থাকিবে। য়্যামেরিকায় হোরেস্ ফ্লেচার নামে এক ভদ্রলোক প্রথম বয়সে নানা রকম অসুখে ভুগিয়া স্বাস্থ্য একেবারে হারাইয়া ফেলেন। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, কেবল মাত্র চিবাইবার আসল নিয়মটি আয়ত্ত করিয়াই ভদ্রলোক রোগের হাত কাটাইয়া উঠেন, আবার চমৎকার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান। পরে বহু লোককে তিনি রোগের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন—শুধু তাঁর চিবাইবার নিয়মটি শিখাইয়া দিয়া।

দাঁতের ব্যায়ামের জন্য দ্বিতীয়তঃ যে জিনিষটির প্রয়োজন সেটি হইতেছে খাইতে বসিয়া রোজই কিছু না কিছু শক্ত জিনিষ আহার করা। নিয়ত নরম থস্‌থসে খাবার খাইতে থাকিলে ব্যবহারের অভাবে দাঁত অল্প দিনের মধ্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়ায়। মুড়ি, শক্ত ভাজা পাঁউরুটি (toast) বা কড়া রুটি, বিস্কুট, ছোলাভাজা বা ছোলাভিজা, চিঁড়ে, কড়াইশুঁটী বা ছোলার শুঁটী, বড়িভাজা, কাঁচা অথবা ভাজা অবস্থায় ঝুনা নারিকেল, নানা রকমের বড়া, আখ, শাঁখআলু ইত্যাদি শক্ত জিনিষ প্রতিদিনকার খাদ্য-তালিকাতেই কিছু কিছু থাকা উচিত। অনেকের ধারণা শক্ত জিনিষ খাইলে পেটে-ব্যথা হয়। ব্যথা হয়, যদি রীতিমত না চিবাইয়াই তা গিলিয়া ফেলা যায়। উপযুক্ত রকম চিবাইয়া তার পর খাইলে এই সমস্ত খাদ্য

হইতে কোন রকম অপকার তো হইবেই না, বরং দাঁত শক্ত এবং সুস্থ হইয়া নানা রকম অসুখের আক্রমণ হইতে শরীরকে রক্ষা করিবে। যাঁদের অবস্থা খারাপ, দুধ প্রভৃতি বলকারক খাবার প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের দিতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে অল্প বয়স হইতেই ছেলেমেয়েদের খুব ভাল করিয়া চিবাইতে শেখান বিশেষ আবশ্যক। এমন অনেক অল্পদামী খাবার আছে যা ভাল মত চিবাইয়া খাইলে দামী খাবারের মতই শক্তি এবং স্বাস্থ্য আনিয়া দিতে পারে।

কলিকাতা সহরের অনেক মধ্যবিত্ত লোকের খাদ্যই অত্যন্ত নরম ও থস্থসে—যেমন, নরম ভাত, ডাল, তরকারী, দুধ, হালুয়া, পান্তুয়া ইত্যাদি। এই সমস্ত খাদ্যে দাঁতের একেবারেই পরিশ্রম হয় না। মনোযোগ দিয়া চিবাইয়া খাইলে সাধারণ খাদ্য হইতেই যে কি পরিমাণ বল এবং স্বাস্থ্য পাওয়া যায় তা যে কেউ মাত্র কয়েক দিনের পরীক্ষাতেই টের পাইবেন। নিয়ত নরম খাবার খাওয়াই যাঁদের অভ্যাস দাঁতন ব্যবহার তাঁদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। দাঁতনে সময় কিছু ব্যয় হইলেও সেটা একেবারে অপব্যয় নয়। স্বাস্থ্যের দিকের লাভ হইতে তাহা পোষাইয়া যাইবে। আর একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে দাঁতনে সময়ও এমন কিছু বেশী লাগে না।

একই মুখের বিভিন্ন আকারের দাঁত।
উপরের সারিতে সম্মুখ হইতে, মাঝের সারিতে উপর হইতে এবং নীচের সারিতে পাশ হইতে দাঁতগুলি কেমন দেখায় তাহাই দেখান হইয়াছে।

(৩) দাঁত পুষ্ট করার উপযোগী খাদ্যঃ—দাঁত ভাল রাখিতে হইলে

দাঁত, দাঁত যার কোটরে আছে সেই চোয়ালের হাড় এবং দাঁতের সঙ্গে সংলগ্ন অন্যান্য 'টিস্যু'গুলি যা'তে দস্তুরমত পুষ্টি পাইতে পারে সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। এই পুষ্টির জন্য দরকার এমন কতকগুলি খাদ্য যার মধ্যে আছে ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন সি, এবং দাঁত গড়িয়া তোলার উপযোগী কতকগুলি খনিজ পদার্থ। দুধ, মাখন, ঘি, মাংসের ভিতরকার চর্ব্বি, কড্‌লিভার অয়েল, হালিবাটলিভার অয়েল বা অন্যান্য মাছের তেল, বাঁধ-কপি, পালং, নটে, পুঁই শাক এবং আরও নানা রকম সবুজ আনাজে আমরা পাই ভিটামিন এ। ভিটামিন ডি পাই অল্পবিস্তর ভাবে দুধ, মাখন, নানা রকম মাছের, মাংসের এবং উদ্ভিজ্জাত তেলের ভিতর। তবে আমাদের দেশে—যেখানে সূর্য্যের আলোর একেবারেই অভাব নাই, সেখানে ভিটামিন ডি সংগ্রহের জন্য মোটেই ভাবনার দরকার হয় না। সূর্য্যের কিরণ খালি গায়ে যথেষ্ট পরিমাণে পড়িতে দিলে শরীর আপনা হইতেই ভিটামিন ডি প্রস্তুত করিয়া লয়। এই জন্য ছেলেপিলেদের সর্ব্বদা বেশী জামা-কাপড় পরাইয়া রাখিতে নাই—খানিকটা সময় তারা যেন খালি গায়ে সূর্য্যের আলোতে খেলাধূলা করিতে পারে। তবে যে সমস্ত জামার হাত, পিঠ ও শরীরের কতক অংশ খোলা থাকে সে রকম জামায় বেশী আপত্তি নাই।

কাঁচা ফল ও আনাজের মধ্যে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। লেবু, তেঁতুল, আম প্রভৃতি টক ফলেই এই ভিটামিন বেশী। যে খনিজ পদার্থের কথা বলা হইয়াছে তা প্রায় সব খাবারের মধ্যেই অল্পবিস্তর পাওয়া যায়, তবে ফল এবং দুধের ভিতরকার খনিজ পদার্থই দাঁত গড়িয়া তোলার পক্ষে সব চেয়ে বেশী উপযোগী।

উপরে যে সমস্ত খাদ্যের কথা বলা হইল দাঁত ভাল রাখিতে হইলে সেগুলির কিছু কিছু অবশ্যই তোমাদের খাইতে হইবে। যে সমস্ত শিশুর দাঁত ভাল বাহির হইতেছে না বা দাঁত রুগ্ন দেখা যাইতেছে তাদের খাবারের রুটি এবং ভাত কমাইয়া দিয়া দুধ এবং ফলের ভাগ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। আজকাল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে শিশুদের দাঁতের গঠনের পক্ষে দুধ ও ফলই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী।

আজব আরক

(শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী)

শোনা গেল, প্রফেসার আত্মম্ভরী ঘোষ নাকি সম্প্রতি বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন। এও শোনা গেল, তিনি নাকি জার্ম্মেনী, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, রুশিয়া, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের অনেক বড় বড় রাসায়নিক পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে কাজ ক'রে তাঁদের কাছ থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ ক'রে, অনেক নূতন, আজব, অদ্ভুত আবিষ্কারের যন্ত্রপাতি, মালমসলা, আরক, ভস্ম, অরিষ্ট, গ্যাস্ প্রভৃতি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।

চিরকাল তিনি নিরিবিলি থাক্‌তে ভালবাসেন; এখনও আছেন খুবই নিরিবিলি—হরিহরপুরের ময়দানের এক পাশে, প্রকাণ্ড বাগানের মাঝে একটি ছোট্ট বাড়ীতে।

সেখানে দস্তুর মতন একটি অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক 'ল্যাবরেটরি' বা পরীক্ষাগার বসান হয়েছে। আকাশের বিদ্যুৎ ধর্‌বার ব্যবস্থা আছে; প্রকাণ্ড 'টেলিস্কোপ' বা দূরবীণ আছে; খুব ভাল 'মাইক্রোস্কোপ' বা অনুবীক্ষণ আছে—যা'র সাহায্যে রোগের বীজ কিল্‌বিল্ কর্‌ছে দেখা যায়; বৈদ্যুতিক যন্ত্রে গুঁড়ো, পেষাই, ঝাঁকান, বেলা, ঠাসা, চেরা, কাটা, ছেঁড়া, চাঁচা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে; ভীষণ বিষাক্ত গ্যাস্ নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য মুখোস আছে, গ্যাস্ টেনে বাইরে বের ক'রে দেবার জন্য পাম্পের ব্যবস্থা আছে, গ্যাসের আলাধা 'চেম্বার' বা কাম্‌রা আছে; নানা রকম অদ্ভুত 'রে' অথবা আলো জন্মাবার ব্যবস্থা আছে; জিনিষপত্র ঠাণ্ডা করার জন্য 'রেফ্রিজারেটার' আছে, আবার ভীষণ তাপে গলাবার জন্য ইলেক্‌ট্রিক্ উনুন আছে; তা' ছাড়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যে কত শত রকমের আছে তা'র খবর কে রাখে? ওষুধপত্র, আরক ইত্যাদির তো কথাই নাই!

এই 'ল্যাবরেটরি' বা পরীক্ষাগারে বসে প্রফেসার ঘোষ দিনরাত নানা

রকম অদ্ভুত পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। সমনদমন বাবু (যিনি আগে তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাজ কর্‌তেন) নাকি খবর পেয়ে তাঁর কাজে যোগ দিয়েছেন।

কি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা চল্‌ছে কেউ জানে না; তবে, শোনা গেছে, তিনি নাকি দু'-তিনটি বোকা ছেলের উপর কি-জানি-সব পরীক্ষা চালাচ্ছেন। নানা রকমের জানোয়ারের উপরও নাকি পরীক্ষা চল্‌ছে। সেখানে নাকি একটা গোলাপী কাক আছে, একটা বেগুনি ইঁদুর আছে। একটা কুকুর আছে—তিন আঙ্গুল উঁচু, একটা নিরামিষাশী সিংহ আছে, একটা বেড়াল আছে প্রায় গরুর মত উঁচু—কিন্তু সে নাকি একেবারে নিরীহ গো-বেচারি; একটা গরু নাকি আছে

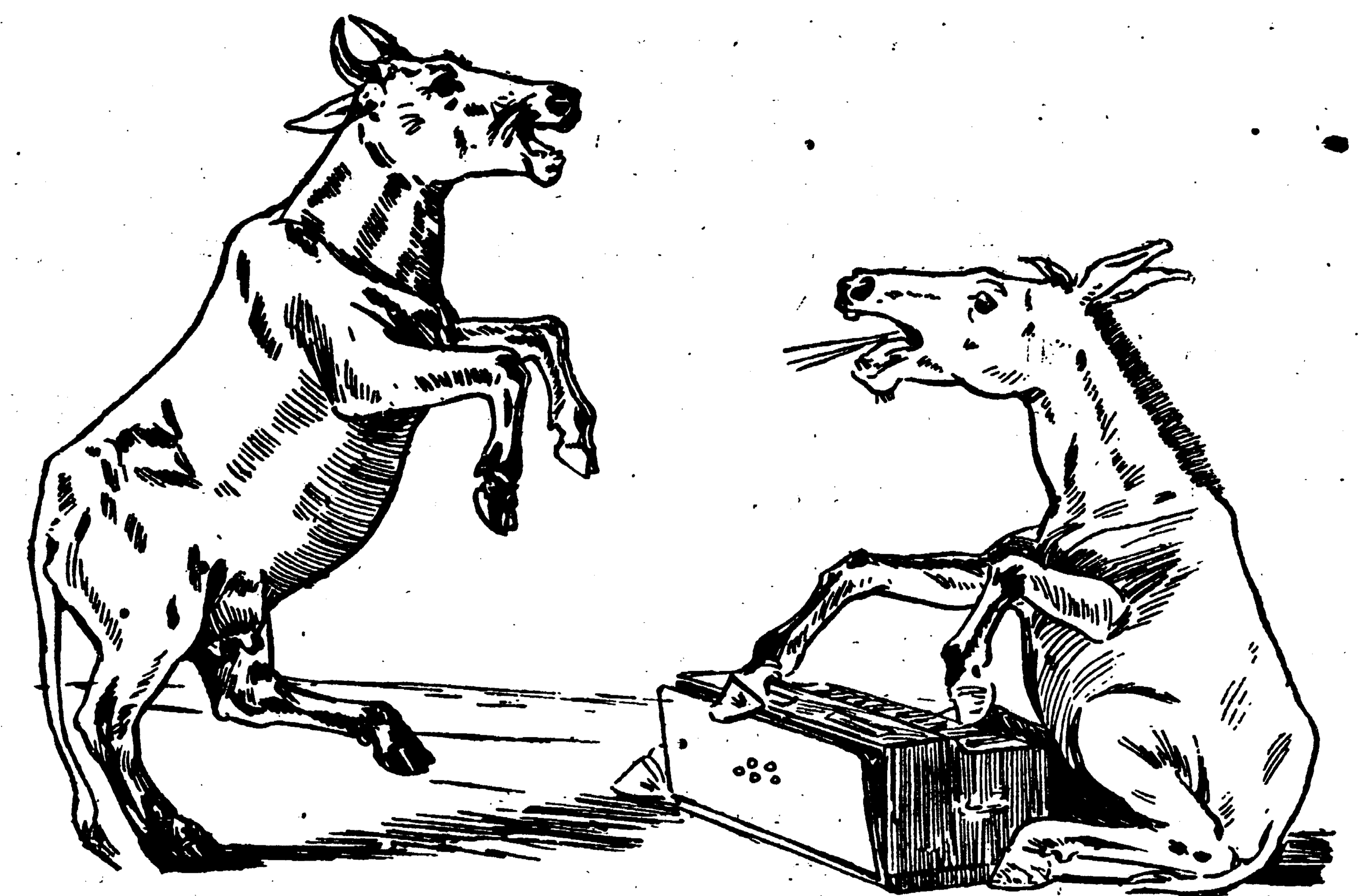

সেখানে, যেটা হাস্‌তে পারে, যোগ কর্‌তে পারে, সামনের পা উঁচু ক'রে নাচ্‌তে পারে; একটা গাধা আছে, সেটা নাকি সুন্দর মিষ্টি গলায় 'সারেগামা' সাধ্‌তে পারে; সেটার নাম দেওয়া হয়েছে 'গামাগাধা'। কথাগুলি কতটা সত্যি তা' এখনও জানা যায় নি; কিন্তু, তিনি যে নানা রকম অদ্ভুত আবিষ্কারে ব্যস্ত আছেন সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

* * * *

খবরের কাগজ চালান কি সহজ ব্যাপার? কত যে হ্যাঙ্গাম, কত যে ফ্যাসাদ্ তা'র কি কোন হিসাব আছে? আজ হয়তো এক দারুণ মোকদ্দমার শুনানি; সম্পাদক ভাব্‌ছেন, কাল একচোট খুব জোর লেখা যাবে—একেবারে দু' কলাম্ ভর্ত্তি! ওমা! সব মাটি! হাকিমের নাকি জ্বর হয়েছে; আজ শুনানি হবেই না। এখন কি করা যায়? খোঁজ্ খোঁজ্ নতুন খবর।

কাগজে হয়তো একটা চিঠি ছাপা হয়েছে—বেশ মজার চিঠি; কাগজের এক কলামের খোরাক। দু'দিন বাদে এক উকিলের চিঠি এসে হাজির;—"আমার মক্কেলের নামে যে সব মানহানিকর কথা আপনাদের কাগজে ছাপা চিঠিতে লেখা হয়েছে তা'র জন্য অবিলম্বে ক্ষমা চাইবেন এবং ৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পত্রপাঠ মাত্র পাঠিয়ে দেবেন—নইলে আপনার নামে নালিশ রুজু করা হবে।"—খোঁজ্ খোঁজ্ পত্রলেখককে। খুঁজে দেখা গেল, তাঁ'র ঠিকানা সব ভুল; ধাব্‌ধাবা গলিতে ১০৩ নম্বরের বাড়ীই নাই; সে রাস্তায় ঐ নামে কোন লোকই থাকে না। তখন আবার ক্ষমা চাওয়া-চাওয়ি ইত্যাদি।

খবর পাওয়া গেল, ওমুক বাবু মারা গেছেন। অমনি তাঁর চেহারার ব্লক করা হ'লো, লম্বা দু' কলাম্ জীবনী লেখা হ'লো, সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হ'লো আধ-কলাম্। শেষ মুহূর্ত্তে খবর এল, তিনি মারা যান্ নি; খবরটা একদম ভুল! তখন যে কি মুস্কিল হ'লো সেটা সহজেই অনুমান কর্‌তে পার।

এর উপর আবার রেষারেষিও আছে। হরিহরপুরে দুটো কাগজ—"হরিহরপুর হরকরা" আর "সরস সমাচার"। দুজনে খবর নিয়ে খুব রেষারেষি চল্‌ছে। আজ হয়তো "হরকরা" একটা খুব জোর খবর চুপিচাপি সংগ্রহ ক'রেছে, তাড়াতাড়ি সেটাকে ছাপিয়ে খুব বাহাদুরি কর্‌বে ভাব্‌ছে। যখন তাদের কাগজ বের হ'লো তা'র আগেই "সমাচার" সেটা ছাপিয়ে বের ক'রে ফেলেছে। "হরকরা"র বড়াই তখন একবার ভেঙ্গে চুর। এইভাবে দু'জনকেই মাঝে মাঝে নাস্তানাবুদ হ'তে হয়।

* * * *

প্রফেসার ঘোষের হরিহরপুরে ফিরে আসাটা খবরের কাগজওয়ালাদের

পক্ষে আনন্দের সংবাদ হ'লো। এবার কাগজের কিছু খোরাক জুটবে। "আত্মম্ভরীর আত্মকথা" একবার "সরস সমাচার" বের ক'রেছিল; এবার তা'র "২নং" বের হবে। "হরকরা" ভাব্‌ছে "আবার আত্মম্ভরী" নাম দিয়ে কত অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য্য, অনির্ব্বচনীয়, অভাবনীয় কাণ্ডই লিখ্‌বে!

"সরস সমাচার"-এর সহকারী সম্পাদক সত্যসখা সরকার সংবাদ সংগ্রহে সিদ্ধহস্ত—এ কথা সকলেই জানেন। আবার "হরিহরপুর হরকরা"র হলধর হাওলাদার হালকায়দায় প্রতিভাপন্ন প্রবন্ধলেখক এবং পত্রিকার প্রারম্ভের প্রথম প্রবল প্রতিযোগী,—এ কথাও সকলে জানেন। এবার প্রফেসার ঘোষের সম্বন্ধে খবর জানার জন্য দু' জনের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে ব'লে সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন। প্রফেসার ঘোষ কা'রও সঙ্গে বড়-একটা দেখাশুনা করেন না; শুধু সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের যা' একটু খাতির করেন। কাজেই, সকলেই "সমাচার" আর "হরকরা"র কাছে খবর পাবার আশায় রয়েছেন।

* * *

প্রফেসার ঘোষের সঙ্গে দেখা করার জন্য হলধর বাবু আর সত্যসখা বাবু ক'দিন ধ'রে চেষ্টা কর্‌ছেন, কিন্তু, দেখা আর হয় না। শেষটায়' ১৮ই চৈত্র তারিখে দু'জনেই চিঠি পেলেন, "আগামী কল্য প্রাতে ৭ ঘটিকায় আমার নিকট আসিলে কথাবার্ত্তা কহিবার সুবিধা হইতে পারে।"

দু'জনেই চিঠি পেয়ে খুব খুসী। আগের দিন সব কাগজপত্র, নোট-বই, পেন্সিল গোছগাছ ক'রে দু'জনেই পরের দিন ভোরে যাবার জন্য তৈরী হ'লেন। সকালে ৫॥টায় উঠে হলধর বাবু রওয়ানা হলেন;—আগে গেলে আগে দেখা পাবেন এই তাঁর চেষ্টা। সত্যসখা বাবু ঠিক সোয়া ছয়টায় রওয়ানা হ'লেন—ঠিক ৭টায় সেখানে যা'তে পৌঁছান।

হলধর বাবু সোয়া ছয়টায় প্রফেসার ঘোষের বাড়ীতে পৌঁছে বেহারাকে নিজের কার্ড্ দিয়ে বল্‌লেন, "সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌ব।" বেহারা কার্ড্ নিয়ে চ'লে গেল, আর ৫ মিনিট বাদে ফিরে এসে বল্‌ল, "একটু বসুন।"

ঠিক সাতটায় সত্যসখা বাবু প্রফেসার ঘোষের বাড়ীতে পৌঁছে

দেখ্‌লেন, হলধর বাবু বস্‌বার ঘরে নাই। হয় তিনি আসেন নি; না হয় প্রফেসার ঘোষ তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেছেন। সত্যসখা বাবুর মনটা যেন দ'মে গেল। তিনি একটু চিন্তিতও হ'য়ে পড়্‌লেন। তাই তো! শেষটায় কি 'হরকরা' হার মানাবে?

সর্ব্বনাশ! এক মিনিট বাদেই হলধর বাবু ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একটা বড় লম্বা খাম; ভিতরে কাগজপত্র রয়েছে ব'লে মনে হয়; মুখে মুচ্‌কি হাসি। পাশ দিয়ে যাবার সময় খাম থেকে কেমন যেন একটা গন্ধ বের হ'লো! হলধর বাবুর মুখের ভাবটাও বেশ হাল্কা-হাল্কা গোছের মনে হ'লো—যেন মনে কোন চিন্তা নাই। শুধু যাবার সময় সত্যসখা বাবুকে বল্‌লেন, "আদায় ক'রেছি! চল্‌লাম এবার ছাপ্‌তে দিতে। বড় অমায়িক লোক; সরবৎটি যা' খাইয়েছেন—খাসা!"

এবার সত্যসখা বাবুর ডাক পড়্‌ল। তিনি পাশের ঘরে যেতেই প্রফেসার ঘোষ এগিয়ে এসে তাঁকে নমস্কার ক'রে অভিবাদন কর্‌লেন। বস্‌তে ব'লেই পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের কর্‌লেন আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিলেন, "রামা! সরবৎ নিয়ে আয়।"

রামা দু' গ্লাস ঠাণ্ডা জল আর "অরেঞ্জ সিরাপ" লেখা বোতল নিয়ে এল। একটি গ্লাসের জল কেমন যেন নীলাভ মনে হ'লো—যেন খুব অল্প নীল রং মেশান হয়েছে। আর একটি গ্লাসের জল পরিষ্কার, স্বচ্ছ। প্রফেসার ঘোষ নিজের হাতে দুই গ্লাসে "অরেঞ্জ সিরাপ" ঢেলে যে গ্লাসের জল নীলাভ ছিল সেটা সত্যসখা বাবুকে দিলেন।

সত্যসখা বাবু চালাক লোক। তিনি হঠাৎ দেয়ালের কাছে টেবিলের উপরের একটা অদ্ভুত পাত্র দেখিয়ে বল্‌লেন, "ওটা কি জিনিষ?" প্রফেসার ঘোষ দেয়ালের দিকে তাকাতেই সত্যসখা বাবু চট্‌ ক'রে গ্লাস বদ্‌লিয়ে নিলেন। প্রফেসার ঘোষ কিছুই টের পেলেন না।

তার পর প্রফেসার ঘোষ সেই কাগজের তাড়াটি নিয়ে নিজের আশ্চর্য্য আবিষ্কার এবং ভ্রমণকাহিনীর অদ্ভুত কথা পড়্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর পড়াটা বড়ই

তাড়াতাড়ি; কিন্তু পড়ার ভঙ্গীটি সুন্দর। পড়্‌ছেন, আর মাঝে মাঝে বল্‌ছেন, "সরবৎ খান্‌।" আর বল্‌ছেন, "নোট লেখার দরকার নাই; আমি সব লিখেই দিয়েছি।"

পড়া শেষ হ'লে কাগজগুলি একটা খামের মধ্যে ভ'রে সত্যসখা বাবুকে দিলেন। খামের মুখটি নিজে যত্ন ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন। তার পর একটু মুচ্‌কি হেসে নমস্কার ক'রে বল্‌লেন, "তা' হ'লে আজ এই পর্য্যন্ত; আশা করি আপনার কাগজের কিছু খোরাক হবে"—ব'লে আবার একটু মুচ্‌কি হাস্‌লেন। সত্যসখা বাবু নমস্কার ক'রে বিদায় নিলেন।

পথে আস্‌তে আস্‌তে তাঁর মনে হ'লো, খামে যেন কি রকমের গন্ধ। শুঁকে দেখ্‌লেন, একটু একটু মিষ্টিগোছের গন্ধ;—আগে কখনও সে গন্ধ শোঁকেন নি। সন্দেহ হওয়ায় খাম থেকে কাগজ বের ক'রে ফেল্‌লেন। ওমা! কাগজের লেখা যে প্রায় উঠেই গেছে! উপরের কয়েকটা পাতা তো একেবারেই সাদা; ভিতরেরটাও প্রায় সাদা—কেবল দু'-চারটা অক্ষর পড়া যায়। তাড়াতাড়ি খামটা ফেলে দিলেন, কিন্তু তা'তে কোন লাভ হ'লো না। বুঝ্‌তে আর বাকী রইল না, খামে মাখান ওষুধের তেজে লেখা সব উঠে গেছে।

কি আর করা যাবে? লেখাটি তো গেছে, এখন তাঁর পড়া থেকে যতটা মনে আছে সেটুকুই কাগজে ছাপা হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। সত্যসখা বাবুর স্মরণশক্তি খুব প্রখর ছিল্‌ তাই রক্ষা; নইলে সেদিন বড়ই মুস্কিল হ'তো।

আপিসে ফিরে তিনি তখনই লিখ্‌তে বস্‌লেন। আধ ঘণ্টায় লেখা শেষ ক'রে ছাপ্‌তে দিয়ে দিলেন।

এদিকে, হলধর বাবু আপিসে ফিরে, পকেট থেকে খাম বের ক'রে, তার ভিতর থেকে কাগজপত্র টেনে বের করে দেখ্‌লেন সব সাদা—একটিও অক্ষর লেখা নাই তা'তে। শুধু একটি কোণায় ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে—"মনে নাই কি, আজ পয়লা এপ্রিল, ১৯শে বৈশাখ?"

হলধর বাবুর তখন আর রসিকতা বুঝ্‌বার মত অবস্থা নয়। মনে কর্‌লেন,

মনে যা' আছে তাই লিখ্‌বেন ; কিন্তু, সেই আশ্চর্য্য সরবতের এমনই গুণ যে সে সময়ের ঘটনা ছাড়া আগের এবং পরের সব ঘটনাই মনে আছে—শুধু মনে নাই আসল কথাগুলি।

রেগে টং হ'য়ে তিনি তখন কাগজপত্র ঘাঁট্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। "আবার আত্মম্ভরী" লেখাটির জন্য যে জায়গা রাখা হয়েছিল সে জায়গাটা তো ভরাট করা চাই! সব চেয়ে মুস্কিল হ'লো, আগের দিন বড় বড় অক্ষরে লিখে দেওয়া হয়েছিল :

"কাল পড়্‌বেন 'আবার আত্মম্ভরী'—অত্যাশ্চর্য্য, অদ্ভুত, অনির্ব্বচনীয়, অভাবনীয়!"

সকালে যে ঘটনা ঘটেছিল তা'র কথাও লেখা যায় না ; কাজেই অপমান হজম করা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না।

সেদিন বিকালে যখন "হরিহরপুর হরকরা" ছাপা হয়ে বের হ'লো, তখন বড় বড় অক্ষরে তা'তে লেখা দেখা গেল : "অনিবার্য্য কারণে আজ 'আবার আত্মম্ভরী' ছাপা হইল না ; শীঘ্রই ছাপা হইরার আশা আছে।"

"সরস সমাচার" সেদিন "আত্মম্ভরীর আত্মকথা"—"২নং" ছেপে বের কর্‌ল ; সকলে প'ড়ে খুব খুসী হ'লেন ; কাগজের বিক্রীও খুব বেশী হ'লো সেদিন।

প্রফেসার ঘোষের কাছে "সরস সমাচার" গেলে তিনি "আত্মম্ভরীর আত্মকথা" পড়ে একটু মুষ্‌ড়ে গেলেন। মনে মনে বল্‌লেন, "সত্যসখা বাবুর পক্ষে দু' ফোঁটা 'ঘুলিয়েক্স্‌' যথেষ্ট হয় নি দেখ্‌ছি। লেখাটা তো মন থেকেই লিখেছেন—কিন্তু লিখেছেন বেশ।" শেষের ক'টি লাইন প'ড়ে তিনি বেশ একটু হাস্‌লেনও। তা'তে লেখা ছিল : "আজব আরকে আত্মকথার আদ্যোপান্ত অতি অল্পকালে অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হইলেও, সরবৎ সেবনে সতেজ সহকারী সম্পাদক সত্যসখা সরকারের সুতীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সঙ্কট-সময়ে সাহায্য করিয়াছে। আজ আত্মম্ভরী আচার্য্যের আঁখির আড়ালে আচম্বিতে আরকমিশ্রিত সরবৎ সরাইয়া সুবুদ্ধিসম্পন্ন সরকার সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ সংবাদ-সংগ্রাহকের সম্মান লাভে সৌভাগ্যবান্‌।"

পড়া শেষ হ'লে প্রফেসার ঘোষ বল্‌লেন, "প্রচ্ছন্ন প্রমাদে প্রতিবন্ধক-প্রতারী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রশংসনীয়!"

তিমি শিকার

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এস্‌-সি)

বাঘ শিকার, সিংহ শিকার, গণ্ডার শিকার—এ সবই শিকারের দিক্‌ দিয়া খুব বড় দরের সন্দেহ নাই,—খুব কষ্টবহুল, বিপজ্জনক তাহাও মানি, কিন্তু তবু বলিব শিকারের মত শিকার হইতেছে তিমি শিকার। তিমি যে খুব দুরন্ত প্রাণী এ কথা আমি বলিতেছি না—বরঞ্চ অনেক সামুদ্রিক জানোয়ারের তুলনায় তাকে বেশ নিরীহই বলা চলে। কিন্তু তবু তার পাহাড়ের মত বিরাট্‌ শরীর লইয়া সে যখন সমুদ্রের জল তোলপাড় করিতে সুরু করে—ঢুঁ মারিয়া মারিয়া জাহাজকে জাহাজ চূরমার করিবার চেষ্টা করে—লেজের ঝাপ্‌টায় নৌকা তো বটেই, সময় সময় জাহাজও উল্টাইয়া দেয়—তখন শিকারীর অবস্থা খুব যে আরামপ্রদ হয় না এ কথা বলাই বাহুল্য। আশী-নব্বই ফুট্‌ বিরাট্‌ যার দেহ সে যে ইচ্ছা করিলেই মানুষ তো ছাড়, রূপকথার সেই রাঘব বোয়ালের মত আস্ত আস্ত নৌকা গিলিয়া ফেলিতে পারিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অনেক তিমির পেটে এমন বিরাট্‌ বিরাট্‌ সব জলজন্তুর দেহ পাওয়া গিয়াছে যাদের কাছে আমাদের ডাঙ্গার হাতীও নিতান্ত শিশু বলিয়া বোধ হইবে।

তিমির চাহিদা নানা কারণে ; শুধু যে শিকারের খাতিরেই লোকে তিমির পিছনে লাগে তা' নয়, তিমির ব্যবসা ক্রমেই একটা বড় দরের এবং প্রচুর লাভের ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইতেছে। তেমন তেমন এক-একটা তিমি ধরিতে পারিলে দশ-পনেরো হাজার টাকা সহজেই উপায় করা যায়। কাজেই মানুষের নজর যে সহজেই এদিকে পড়িবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? মানুষের এই লোভের ফলে হয়তো পৃথিবী হইতে এক সময়ে তিমির বংশই লোপ পাইয়া যাইবে।

তিমি নানা জাতের হয়; মোটামুটি তাদের দু'টি দলে ভাগ করা যায়। এক দলের দাঁত নাই, তার বদলে মুখের মধ্যে আছে প্রকাণ্ড চিরুণীর ঝালরের মত এক রকম জিনিষ—ইংরাজীতে তাকে বলা হয় 'হোয়েল বোন্' (Whale bone)। এই তিমির গলার হাঁ খুব ছোট, বড় জিনিষ কিছু এরা খাইতে পারে না, ছোট ছোট মাছ কিংবা ঐ রকম সামুদ্রিক প্রাণী খাইয়া জীবন ধারণ করে—হাঁ করিয়া জলের সঙ্গে খাদ্য টানিয়া লয়, তার পর ঐ চিরুণীর ঝালরের মত জিনিষটার ফাঁক দিয়া সে জল বাহির করিয়া দেয়, খাবারগুলি ঝালরের ছাঁকনিতে আটকাইয়া যায়। এই চিরুণীর ঝালর মানুষের বড় সৌখীন জিনিষ—শুধু এরই জন্য আগে বহু শিকারী তিমির পিছনে পিছনে ঘুরিত এবং শুধু মানুষের এই উৎকট সখ মিটাইবার জন্যই আজ পর্য্যন্ত বহু তিমি জীবন দিয়াছে। যে সব তিমির দাঁত আছে তারা অবশ্য অত ক্ষুদে খাবারে তুষ্ট নয়—অক্টোপাস্, হাঙ্গর প্রভৃতি হইতেছে তাদের প্রিয় খাদ্য।

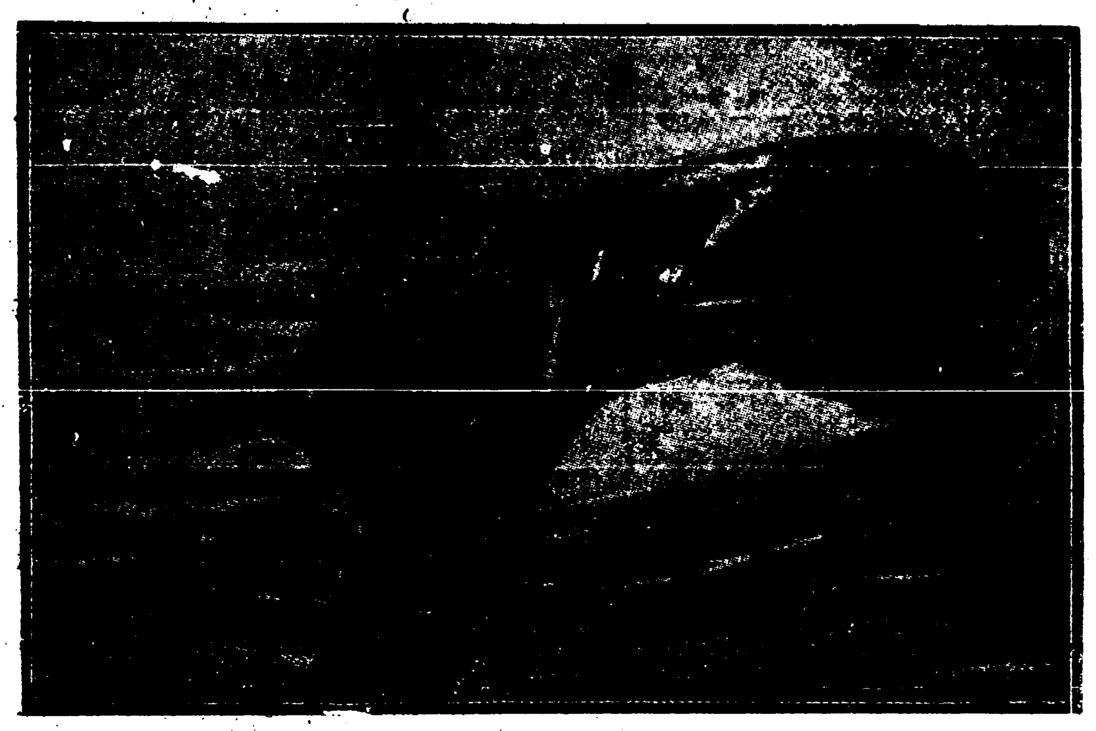

দাঁতওয়ালা তিমি
দেখিতে ঠিক মাথার মত কিন্তু সমস্ত শরীরটাই এই রকম

তিমির মধ্যে মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতেছে তার তেল বা চর্ব্বি। এত চর্ব্বি বোধ হয় আর কোন জানোয়ারেরই নাই। কোন কোন তিমির চামড়ার নীচে প্রায় ২০ ইঞ্চি পুরু চর্ব্বি থাকে। তিমির শরীরটাকে জলে ভাসাইয়া রাখার জন্য এবং ঢুঁ মারিবার সময়ে তিমির শরীরে যা'তে আঘাতে না লাগে, এই জন্যই সম্ভবতঃ ভগবান্ তিমির শরীরে এমন বিপুল পরিমাণ তেল

দিয়াছেন। কিংবা অত বড় শরীরের উপযুক্ত খাবার সব সময়ে না জুটিলে যা'তে তিমিকে খাদ্যাভাবে শুকাইয়া না মরিতে হয় তার জন্যও হয়তো এই ব্যবস্থা—তিমির দেহের সঞ্চিত তেল তার শরীরকে চট্ করিয়া ক্ষয় হইতে দেয় না। কিন্তু ভাল করিতে গিয়া হইয়াছে মন্দ, এই তেলের লোভেই মানুষ প্রধানতঃ তিমির শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক জাতের তিমি আছে তাদের বলা হয় 'মোম-তিমি'। ইহাদের আবার মাথার মধ্যেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ভরা তেল থাকে। মানুষ এই তিমি মারিয়া তার মাথার তেল বা মোম সংগ্রহ করে—তা' দিয়া তৈরী হয় বাতি, সাবান, গ্রীজ্, স্নো—আরও কত জিনিষ!

শুধু তেল আর মুখের 'ঝালর'-এর জন্যই আজকাল তিমি মারা হয় না—আজকালকার লোকেরা তিমির শরীরের সমস্ত অংশই কাজে খাটাইতেছে। তিমির চামড়া হইতে তেলটুকু কলে পিষিয়া লইয়া সে চামড়া দিয়া নানা জিনিষ তৈরী হইতেছে; হাড় দিয়া তৈরী হইতেছে জমির সার, ওষুধ-বিষুধ। তার পর তিমির মাংস। আগে লোকে তিমি মারিয়া তেলটুকু লইয়া মৃতদেহটা সমুদ্রে ফেলিয়া দিত; কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময়ে যখন খাবার—বিশেষতঃ ইয়োরোপীয়দের মত মাংসাশী জাতিদের খাবার সংগ্রহ করা একটা ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইল তখন হইতে তিমির মাংস লোকে খাইতে সুরু করিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে অনেক ব্যবসাদার টিনে করিয়া হাজার হাজার মণ তিমির মাংস চালান দিয়া এক দিকে যেমন সরকারের একটা মস্ত দুর্ভাবনা ঘুচাইয়াছে—অন্য দিক্ দিয়া তেমনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছে। এক-একটা তিমির মাংসে তিন-চার হাজার লোককে বেশ জাঁকাল রকমের একটা ভোজ দেওয়া যায়। ছোট-খাট একটা তিমি মারিলেই প্রায় ৩।৪ শ' মণ মাংস পাওয়া যায়—বড় তিমির তো কথাই নাই। তিমির মাংস খাইতেও নাকি খুব উপাদেয়।

তিমি পৃথিবীর সব সমুদ্রেই কিছু না কিছু আছে তবে সাধারণতঃ পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ অঞ্চলেই বেশী এবং বড় বড় তিমি পাওয়া যায়। তিমি শিকারের বিশেষ এক-একটা সময় আছে। প্রতি বছর ঐ সময়ে শত শত লোক দরকার মত হাতিয়ার ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া তিমি শিকারে রওনা হয়।

আগে তিমি শিকার বেশ একটু বিপজ্জনকই ছিল। নৌকায় চড়িয়া বল্লমের মত এক রকম অস্ত্র (তাকে বলা হয় হার্পুন) দিয়া তিমি মারিতে হইত। তিমি যদি ক্ষেপিয়া যাইবার সময় পাইত তবে নৌকাকে নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া তার পক্ষে মোটেই কষ্টকর হইত না—শিকারীদেরও অনেক সময়ে তিমির পেটে যাইতে হইত। এখন কিন্তু তিমি শিকার অনেক সহজ ও কম বিপজ্জনক হইয়াছে। এখন তিমি শিকারের জন্য আলাদা ছোট ছোট জাহাজ তৈরী করা হয়। ঐ জাহাজ লইয়া সময়ে সময়ে এক সঙ্গে ৩।৪ দিক্ হইতে তিমিকে তাড়া করা হয়। তিমি ক্ষেপিলে এ সব জাহাজেরও যে কিছু করিতে পারে না তা' নয়,

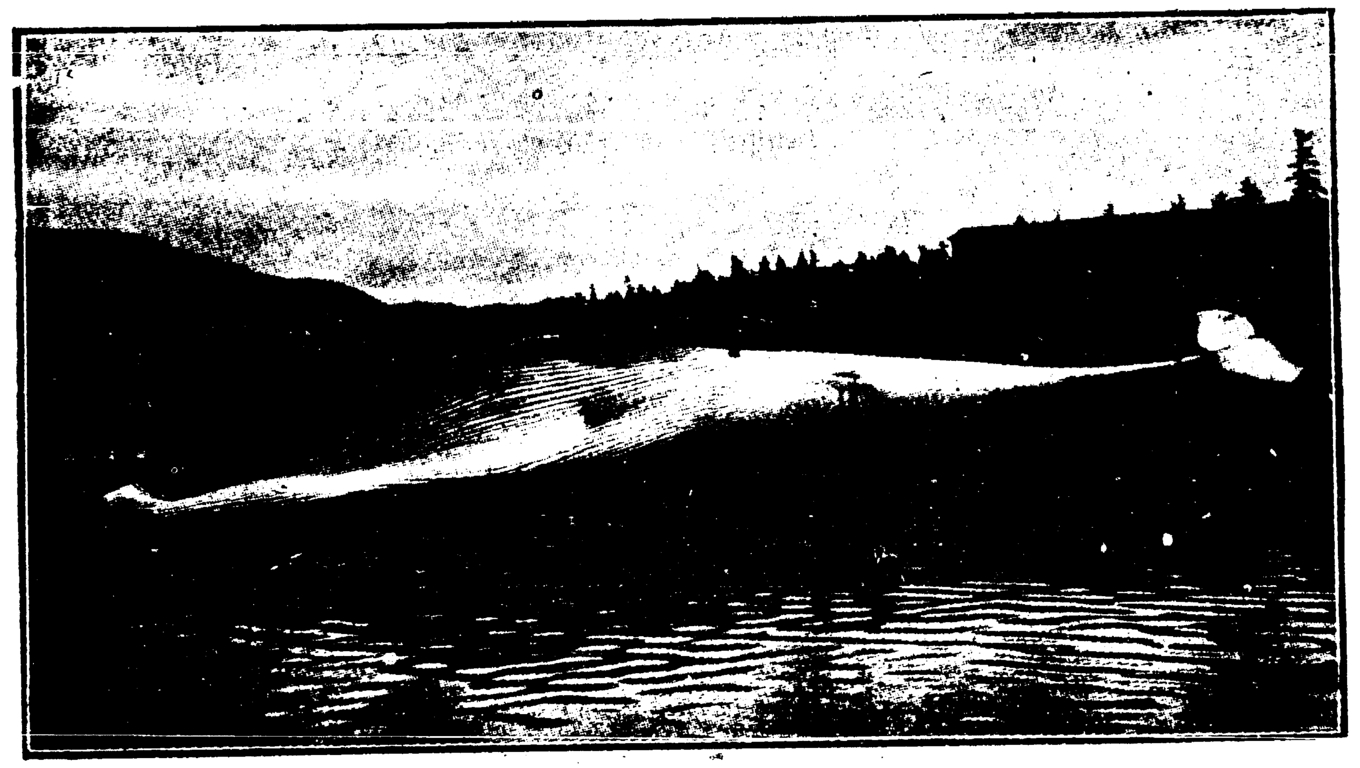

একটি বিরাটকায় তিমিকে ডাঙ্গায় তোলা হইয়াছে।

তবে নৌকার মত অত সহজে পারে না। তা' ছাড়া আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে হার্পুন্ আর হাতে করিয়া ছোঁড়া হয় না। জাহাজের সঙ্গে ছোট ছোট কামান থাকে, সেই কামানের ভিতর দিয়া প্রচণ্ড বেগে হার্পুন্ ছোঁড়া হয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে সে হার্পুন্ তিমির শরীরের মধ্যে (সাধারণতঃ মাথায়) খুব গভীর ভাবে গাঁথিয়া যায়। হার্পুনের সঙ্গে আবার শিকল বাঁধা থাকে—সে শিকল অনেক সময় হাজার ফুট লম্বা হয়, আর তার আর এক মাথা থাকে

জাহাজে আটকান'। সে শিকল ইচ্ছামত কলের সাহায্যে গুটাইয়া ফেলা যায়, আবার ছাড়িয়া দেওয়া যায়—ঠিক যেন হুইলের বঁড়শি। কামানের সাহায্যে হার্পুন্ মারিয়া তিমিকে ঘাল করা হয়, তার পর ইচ্ছামত শিকল গুটাইয়া, ছাড়িয়া, যেমন বঁড়শিতে মাছ খেলাইয়া তোলে সেই ভাবে তিমিকেও হয়রাণ করিয়া ফেলিয়া অবশেষে টানিয়া তোলা হয়। মরিবার আগে হার্পুন্ খাইয়া তিমি যে চীৎকার ছাড়ে, লেজের ঝাপ্টায়, মাথার ঢুঁতে সমুদ্রের মধ্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে—সে নাকি একটা দেখিবার জিনিষ।

তিমিকে লোকে চলতি কথায় তিমি মাছ বলে—তিমি দেখিতেও মাছের মত; আবার মাছ যেমন করিয়া বঁড়শিতে খেলাইয়া তোলা হয় তিমিকেও সে ভাবে শিকার করা হয়। কিন্তু তিমি আসলে মাছ নয়, স্তন্যপায়ী জন্তু। তিমির পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে ডাঙ্গাতেই থাকিত—কবে যে তারা ডাঙ্গা ছাড়িয়া জলে আশ্রয় লইল, তার পর ক্রমে জলজন্তু হইয়া পড়িল তার তারিখ খুঁজিয়া পাওয়া মুশ্কিল। তবে তিমির ডাঙ্গার স্বভাব এখনও যায় নাই। জলের তলায় ২০।২৫ মিনিট—এমন কি সময় সময় ঘণ্টা খানেক থাকিতে পারিলেও তিমি জলের নীচে নিঃশ্বাস লইতে কিংবা ছাড়িতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া তা'কে জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে হয়। তিমির সবই বিরাট্, নিঃশ্বাস ছাড়া ব্যাপারটিও কম নয়। নিঃশ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই হাওয়ায় সমুদ্রের জল ফোয়ারার মত ১০।১২ ফুট উপরে ছিটকাইতে থাকে, আর তাই দেখিয়া শিকারীরা সহজেই বুঝিতে পারে ঐখানে তিমি আছে।

তিমি ধরা হইলে সাধারণতঃ তার পেটে পাম্প্ করিয়া বাতাস ভরিয়া দেওয়া হয়, তা'তে তার শরীরটা ফুলিয়া উঠে আর সহজে ভাসিয়া থাকে। তখন তাকে জাহাজের সঙ্গে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে তিমির কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। আজকাল আবার এক রকম নূতন ধরণের জাহাজ তৈরী হইয়াছে। এগুলির সম্মুখ দিকে থাকে একটা প্রকাণ্ড দরজা—এমন ভাবে সে দরজা তৈরী যে তার ফাঁক দিয়া একটুও জল ঢুকিতে পারে না। তিমি ধরা হইলে তাকে টানিয়া এই দরজা দিয়া জাহাজের খোলের ভিতর পূরিয়া দেওয়া হয়। ফলে তিমিকে আর

জলের ভিতর দিয়া কারখানায় টানিয়া লওয়ার দরকার হয় না—জাহাজের খোলের ভিতরেই তিমি সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। অবশ্য এ জাহাজগুলি খুব বড় হয়।

অনেক সময়ে তিমিরা দল বাঁধিয়া থাকে—তাদের একটাকে মারিলে অপরগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া কি হইল দেখিতে আসে—তখন এক সঙ্গে অনেকগুলিকে মারা যায়। বাচ্চা তিমিরা সব সময়ে মায়ের সঙ্গে থাকে, অনেক সময়ে মা মরিয়া গেলেও তার কাছ ছাড়ে না। ফলে সময়ে সময়ে তিমি'র পাল নিতান্ত অল্প জলে আসিয়া জড় হয়, তখনও তাদের ধরা নিতান্ত সহজ ব্যাপার। অবশ্য এ সব তিমি সাধারণতঃ ছোটখাট তিমিই হয়। যে সব বড় বড় তিমি একা একা সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়ায় তারা সাধারণতঃ একটু বদ্ মেজাজের হয়। এই সব তিমি শিকার করিতে গিয়াই শিকারীরা বিপদে পড়ে—তবে লাভও হয় এই সব তিমি মারিয়াই বেশী।

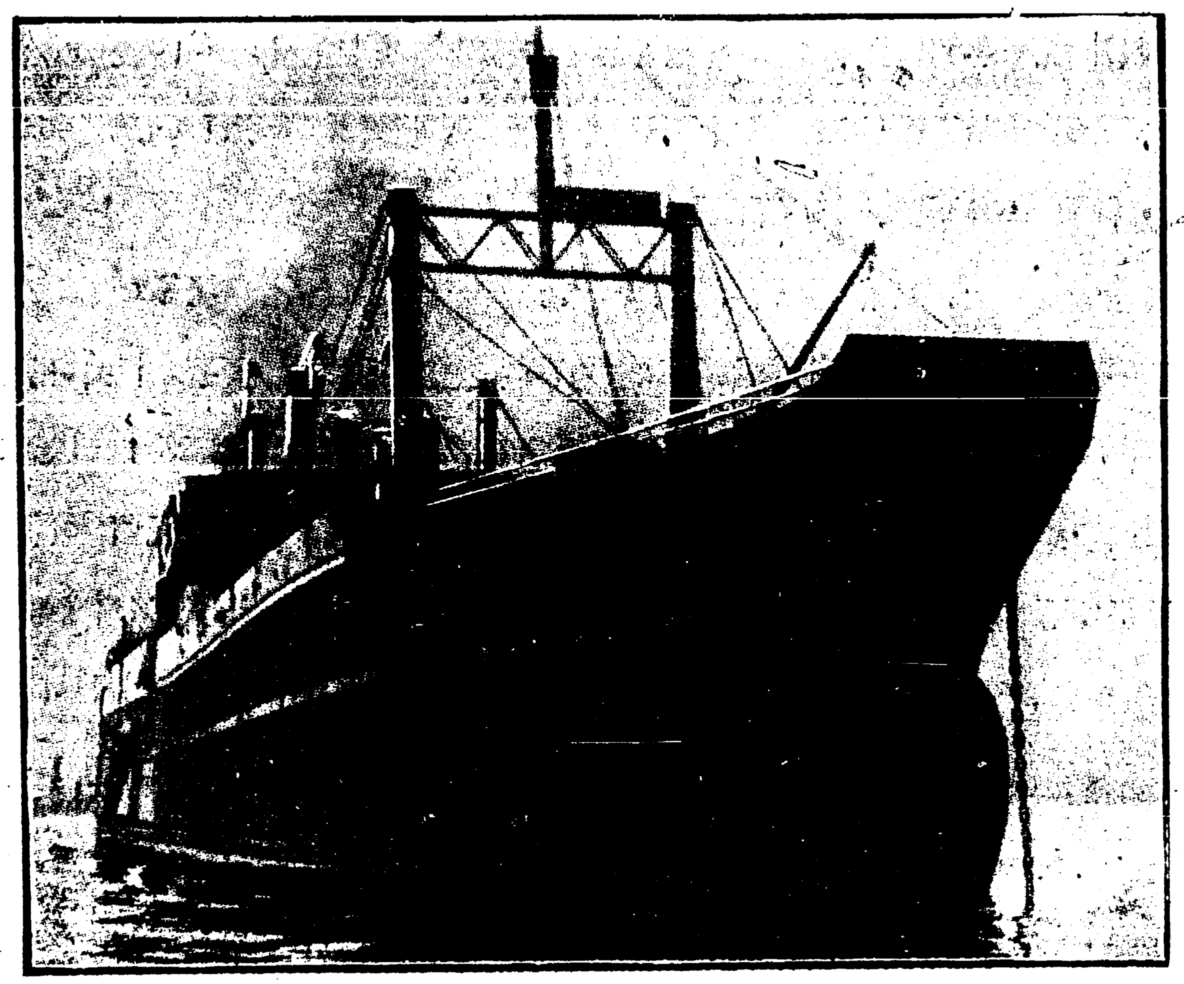

তিমি-ধরা বড় জাহাজ

জাহাজের সম্মুখে যে বিরাট্ দরজা দেখা যাইতেছে উহারই ভিতর দিয়া তিমিকে জাহাজের খোলে ঢুকান' হয়।

সব জানোয়ারই পোষ মানে, পোষা তিমির কথা আমি এখনও শুনি নাই; তবে প্রায়-পোষ-মানা একটা তিমির কাহিনী তোমাদের বলিতেছি। কয়েক বছর আগে নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলে একটা তিমি দেখা যাইত। তিমিটি আকারে

বেশী বড় নয়—কিন্তু তার স্বভাবটা ছিল ভারী অদ্ভুত। সে অঞ্চল দিয়া যখনই কোন জাহাজ যাওয়া-আসা করিত তিমিটি অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিত। অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্য সে জাহাজের সঙ্গে থাকিতই। জাহাজ জোরে চালাইলে সেও জোরে ছুটিত, জাহাজ আস্তে আস্তে চালাইলে সেও গতি মন্থর করিয়া আনিত। শুধু সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া নয়, জাহাজ চলিবার সময়ে দু'পাশের জলে যে ফেনা উঠিত সেই ফেনায় গড়াগড়ি দিয়া, ডিগ্‌বাজি খাইয়া নানা রকম কসরৎ দেখাইতেও সে ছাড়িত না। কোনও জাহাজ সে ছাড়িত না,—

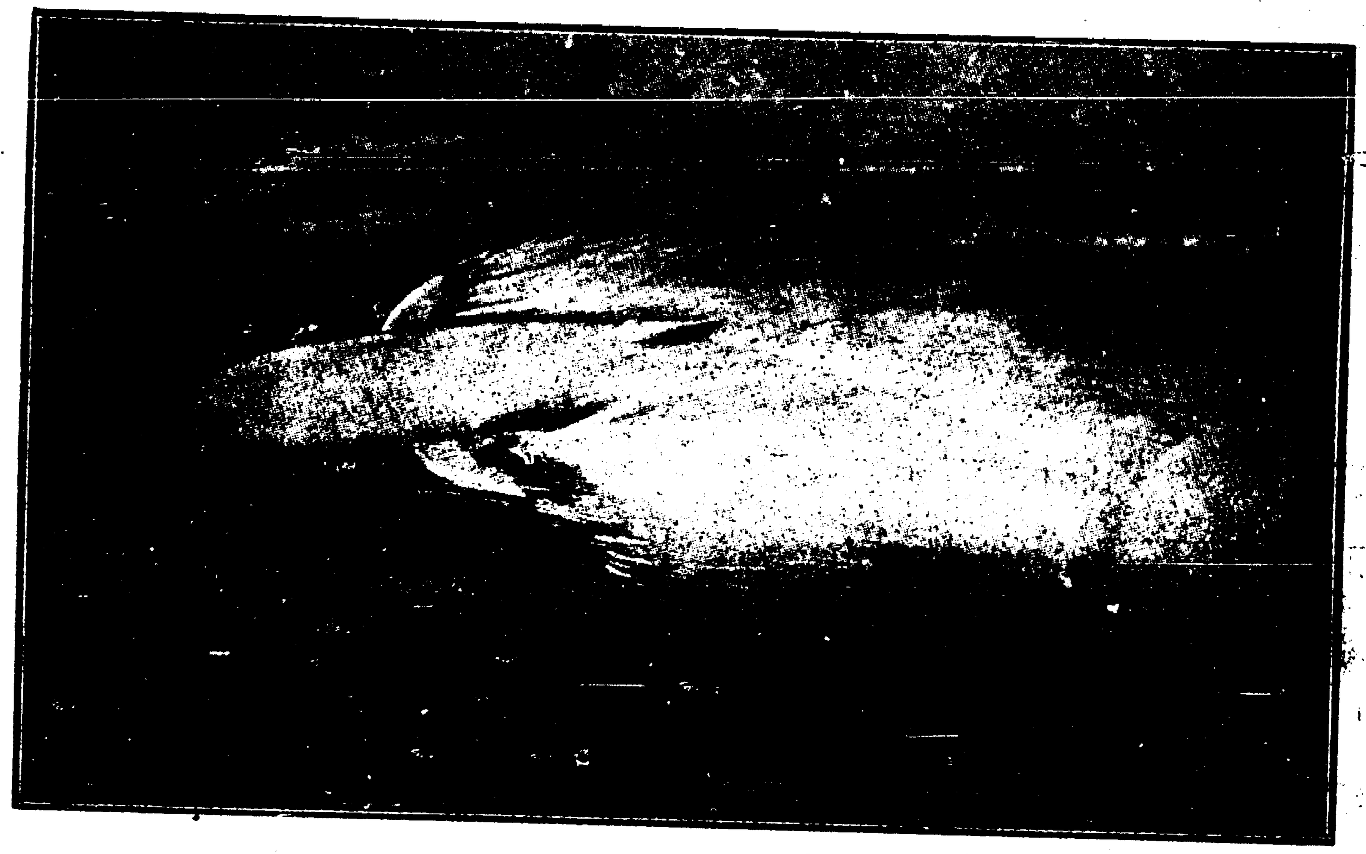

পেলোরাস্ জ্যাক্

কোনও জাহাজের অনিষ্টও করিত না, পোষা বিড়ালের মত শুধু তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত। এই তিমিকে সে অঞ্চলের সমস্ত নাবিকেরাই চিনিত—তারা এর নাম দিয়াছিল "পেলোরাস্ জ্যাক্"। পেলোরাস্ সেই জায়গাটার নাম। জ্যাক্‌কে সবাই স্নেহ করিত, সে অঞ্চলের বাসিন্দাদের তো ধারণা ছিল জ্যাক্ কোনও দেবতা-টেবতা হইবে। এমন কি, সেখানকার সরকার হইতে আইন করিয়া সবাইকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেউ যেন জ্যাকের কোনও ক্ষতি না

করে। শুধু একবার কোন্ এক জাহাজ হইতে নাকি জ্যাক্‌কে গুলি করা হয়। সেই হইতে কিছু দিনের জন্য সে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিং তার কিছু দিন পরেই সে আবার আসিয়া দেখা দেয়—আবার জাহাজের দেখা পাইলেই তার সঙ্গ নিতে থাকে। তবে যে জাহাজটা হইতে তাকে গুলি করা হইয়াছিল সে জাহাজটা সে চিনিয়া রাখিয়াছিল, সেটার কাছে সে আর ভুলিয়াও কখনও ঘেঁষিত না। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে জ্যাক্‌কে আর দেখা যায় নাই—হয়তো সে আর বাঁচিয়া নাই।

পতিতপাবনের প্রতিভা

(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

সম্প্রতি আমাদের কত বড় যে একটা ক্ষতি হয়ে গেছে তা তোমরা বোধ হয় কল্পনাই করতে পারবে না। বাঙলা দেশ—না বাঙলা দেশ কেন, ভারতবর্ষ,—ভারতবর্ষই বা বলার দরকার কি, সমস্ত পৃথিবী যা হারিয়েছে তার তুলনা হয় না। হারিয়েছে কথাটা ব্যবহার করা বোধ হয় ঠিক হ'ল না, বলা উচিত—বঞ্চিত হয়েছে। হ্যাঁ, সমগ্র পৃথিবী পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে সৌভাগ্য যে কি তা আমরা কেমন করে বলব—জানবই বা কেমন করে! সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হ'লে আজ হয়ত মঙ্গল গ্রহের ১৮ আপ্ গ্রহ-এক্সপ্রেসে বসে তোমরা পৃথিবীকে দূর আকাশে ছোট থেকে আরো ছোট সবুজ একটা তারা হয়ে যেতে দেখতে। কিংবা রিফ্রিজারেটারের মত একটা যন্ত্রের বাক্সে এক ধারে একতাল মাটি ভরে দিয়ে আর এক ধার থেকে একেবারে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব কিছু বার করে নিতে পারতে, কিংবা···কিন্তু সে সব কথা যত ভাববে আফশোষ তত বাড়বে। আসল কথা আমাদের দারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে, কারণ—

কারণ পতিতপাবনের বাবা রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে তার মূল্যবান্ খাতাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে সজোরে তার কান মলে দিয়েছেন। ভাবছ একটা খাতা ছেঁড়া গেলে কি আর এমন হয়! কিছুই তা হ'লে জান না। পতিতপাবনের খাতা ছিঁড়ে দেওয়া মানে আমাদের সব আশা নির্ম্মূল করে দেওয়া, পতিতপাবনের কান মলে দেওয়া মানে পৃথিবীর অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিককে মুকুলে বিনষ্ট করা।

পতিতপাবন অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক যে হবে এই আশাই আমরা করেছিলাম, আমরা কেন তার বাবাও করেছিলেন। তিনি শুধু আশা করবেন কেন, নিশ্চিত জানতেন যে পতিতপাবন নিউটন, আইনষ্টাইন, মেঘনাদ সাহার নাম ডুবিয়ে দেবে।

কেমন করে তিনি জানলেন? জানা আর আশ্চর্য্য কি? সূর্য্য উঠলে কি জানতে বাকি থাকে যে দিন হয়েছে?

পতিতপাবন হামাগুড়ি দিতে শিখেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। হামাগুড়ি দিতে দিতে সে একদিন কঠিন এক সমস্যার সামনে উপস্থিত হয়েছিল। সমস্যাটা কালির একটা দোয়াত।

আর কোন ছেলে হ'লে কি করত এ সমস্যার সামনে এসে? আমরা জানি কিছুই তারা করত না। কারণ তাদের কৌতূহল নেই, বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উন্মেষ তাদের ভেতর হবার নয়। তারা কালির দোয়াতকে উপেক্ষা করেই হামাগুড়ি দিয়ে চলে যেত। কিন্তু পতিতপাবন ত' আর সাধারণ ছেলে নয়। সে প্রথমে দোয়াতটির সামনে থমকে বসে পড়ল, তার পর সেটাকে ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করে হাত বাড়িয়ে সেটা ধরবার চেষ্টা করল। হাত ও দোয়াতের সংযোগ হ'তে একটু বিলম্ব হ'ল অবশ্য কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা আঙ্গুল দোয়াতের মধ্যে গলে গেল। পতিতপাবন তার পর সে আঙ্গুল তুলে নিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে নিজের পেটে একটু বুলিয়ে দেখলে এবং ফল দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সর্ব্বাঙ্গে সে কালি লেপন করে শেষ পর্য্যন্ত আঙ্গুলটি মুখে পূরে দিলে। তার পর কালির দোয়াতটি উল্টে ফেলে সে কীর্ত্তি শেষ করেছে এমন

সময়ে পতিতপাবনের মা দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে তা'কে তুলে ধরে বিরক্ত স্বরে বল্লেন—"কি রকম আক্কেল তোমার বল ত', ছেলেটা কালি মেখে ভূত হচ্ছে আর তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছ!"

আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল পতিতপাবনের বাবা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নিদর্শন লক্ষ্য করছিলেন। লক্ষ্য করা পতিতপাবনদের বংশের ধারা। তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "দেখব না! তোমার ছেলের কি অসাধারণ প্রতিভা হবে তা জান?"

মা পতিতপাবনকে কোলে তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে বিরক্ত মুখে বল্লেন—"বালাই ষাট, ও সব শত্তুরের যেন হয়! যত সব অলুক্ষুণে কথা শুনলে হাড় জ্বলে যায়!"

কিন্তু পতিতপাবনের সত্যই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ প্রতিভার উন্মেষ দেখা যেতে লাগল। হামাগুড়ি ছেড়ে সে হাঁটতে শিখল এবং হাঁটতে হাঁটতে সে একদিন অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। কাণ্ডটা আর কিছু নয়, একটি শব্দ।

পতিতপাবনের বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ত্রীকে বল্লেন—"শুনলে! কি বল্ল শুনলে!"

স্ত্রী রাগের স্বরে বল্লেন—"আহা, এর আবার আদিখ্যেতা কিসের! কথা ফুটলে অমন কত আবোল-তাবোল বলে!"

পতিতপাবনের বাবা এবার চটে উঠলেন,—'স্পষ্ট বল্লে 'বাবা,' আর তুমি বলছ আবোল-তাবোল!"

মা বল্লেন—"তা যদি বলেই থাকে ত' কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে! এই বয়সে এমন স্পষ্ট করে 'বাবা' বলতে শুনেছ কাউকে?"

মা বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"আহা, কত ছেলে যে এ বয়সে গালাগাল শেখে!" এবার পতিতপাবনের বাবা হতাশ ভাবে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যে গেলেন তা বোধ হয় বুঝতেই পারছ।

পতিতপাবন আরও বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে আরও যে সব অদ্ভুত কীর্ত্তি করতে

সুরু করল তার বিবরণ সামান্য এ গল্পে দেওয়া সম্ভব নয়। এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে দু বছর বয়সে সে গাড়ীকে বল্লে 'গগ' এবং মুড়িকে বল্লে 'হুড়ুম'। 'গগ' বলতে পতিতপাবন যে গম্ ধাতুই ব্যবহার করছে তা আবিষ্কার করলেও তার বাবা 'হুড়ুম' নিয়ে একটু যে ফাঁফরে পড়েছিলেন তা ঠিক। 'হুড়ুম' যে ঠিক কি ধাতু থেকে উৎপন্ন তা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা তা এখনও জানা যায় নি।

পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ি হবার পর পতিতপাবনের প্রতিভাকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। মাত্র পাঁচখানা প্রথম ভাগ ছিঁড়ে ছ' বারের বার শুধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবিটুকু উড়িয়ে দিয়েই সে 'ক্ষ' ছাড়া স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ সমস্তই আয়ত্ত করে ফেললে। 'ক্ষ' টি নিয়ে গোলযোগ হবার কারণ অবশ্য তার বাবা ও মায়ের মধ্যে মতভেদ। মা শেখালেন তাকে 'খীয়' বলতে, বাবা শেখালেন শুদ্ধ উচ্চারণ 'ক্ষ'। এ দুইএর মাঝখানে পড়ে 'ক্ষ' ও পতিতপাবন উভয়ের অবস্থাই একটু কাহিল অবশ্য হয়েছিল।

কিন্তু তা হ'লেও আকাশের শশীকলা ও গাছের কাঁদির কলা-র মত পতিতপাবনের বুদ্ধি দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। তার বাবা বিখ্যাত সমস্ত প্রতিভাবান্ লোকের ছেলেবেলার গল্প খুঁজে খুঁজে পড়ে দেখলেন পতিতপাবনের সঙ্গে তাঁদের আশ্চর্য্য মিল আছে। পতিতপাবন একটু পেটুক, সে যা পায় তাই খায়, যা পায় না তাও সুবিধে পেলেই চুরি করে খায়। নিউটনের বাল্যজীবনে খাদ্য সম্বন্ধে এই উদারতা যে ছিল না এমন কথা তাঁর জীবনীতে লেখা নেই। সুতরাং এইখানেই নিউটনের সঙ্গে পতিতপাবনের মিল। পতিতপাবন রেগে গেলে হাত-পা ছোড়ে ও দাঁত দিয়ে কাপড় ছেঁড়ে। গ্যালিলিওর ছেলেবেলাতেও ঠিক এই রোগ ছিল। তাঁর ছেলেবেলার কোন জীবনী নেই বলেই সে কথা সাধারণ লোকে জানে না। পতিতপাবন কাতুকুতু দিলেও হাসে না, সেক্সপীয়ার কিন্তু হাসতেন। সেক্সপীয়ার ত' বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। না, যেদিক্ দিয়েই দেখা যায় পতিতপাবনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অস্বীকার করা অসম্ভব।

তার বাবার যেটুকু খুঁত মনে ছিল তাও একদিন অসাধারণ এক ঘটনায় দূর হয়ে গেল। পতিতপাবনের অসামান্যতার নির্ভুল প্রমাণ তিনি সেইদিনই পেলেন।

সময়ে পতিতপাবনের মা দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে তা'কে তুল্লে ধরে বিরক্ত স্বরে বল্লেন—"কি রকম আক্কেল তোমার বল ত', ছেলেটা কালি মেখে ভূত হচ্ছে আর তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছ!"

আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল পতিতপাবনের বাবা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নিদর্শন লক্ষ্য করছিলেন। লক্ষ্য করা পতিতপাবনদের বংশের ধারা। তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "দেখব না! তোমার ছেলের কি অসাধারণ প্রতিভা হবে তা জান?"

মা পতিতপাবনকে কোলে তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে বিরক্ত মুখে বল্লেন—"বালাই ষাট, ও সব শত্তুরের যেন হয়! যত সব অলুক্ষুণে কথা শুনলে হাড় জ্বলে যায়!"

কিন্তু পতিতপাবনের সত্যই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ প্রতিভার উন্মেষ দেখা যেতে লাগল। হামাগুড়ি ছেড়ে সে হাঁটতে শিখল এবং হাঁটতে হাঁটতে সে একদিন অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। কাণ্ডটা আর কিছু নয়, একটি শব্দ।

পতিতপাবনের বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ত্রীকে বল্লেন—"শুনলে! কি বল্ল শুনলে!"

স্ত্রী রাগের স্বরে বল্লেন—"আহা, এর আবার আদিখ্যেতা কিসের! কথা ফুটলে অমন কত আবোল-তাবোল বলে!"

পতিতপাবনের বাবা এবার চটে উঠলেন,—'স্পষ্ট বল্লে 'বাবা,' আর তুমি বলছ আবোল-তাবোল!"

মা বল্লেন—"তা যদি বলেই থাকে ত' কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে! এই বয়সে এমন স্পষ্ট করে 'বাবা' বলতে শুনেছ কাউকে?"

মা বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"আহা, কত ছেলে যে এ বয়সে গালাগাল শেখে!" এবার পতিতপাবনের বাবা হতাশ ভাবে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যে গেলেন তা বোধ হয় বুঝতেই পারছ।

পতিতপাবন আরও বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে আরও যে সব অদ্ভুত কীর্ত্তি করতে

সুরু করল তার বিবরণ সামান্য এ গল্পে দেওয়া সম্ভব নয়। এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে দু বছর বয়সে সে গাড়ীকে বল্লে 'গগ' এবং মুড়িকে বল্লে 'হুড়ুম'। 'গগ' বলতে পতিতপাবন যে গম্ ধাতুই ব্যবহার করছে তা আবিষ্কার করলেও তার বাবা 'হুড়ুম' নিয়ে একটু যে ফাঁফরে পড়েছিলেন তা ঠিক। 'হুড়ুম' যে ঠিক কি ধাতু থেকে উৎপন্ন তা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা তা এখনও জানা যায় নি।

পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ি হবার পর পতিতপাবনের প্রতিভাকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। মাত্র পাঁচখানা প্রথম ভাগ ছিঁড়ে ছ' বারের বার শুধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবিটুকু উড়িয়ে দিয়েই সে 'ক্ষ' ছাড়া স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ সমস্তই আয়ত্ত করে ফেললে। 'ক্ষ' টি নিয়ে গোলযোগ হবার কারণ অবশ্য তার বাবা ও মায়ের মধ্যে মতভেদ। মা শেখালেন তাকে 'খীয়' বলতে, বাবা শেখালেন শুদ্ধ উচ্চারণ 'ক্ষ'। এ দুইএর মাঝখানে পড়ে 'ক্ষ' ও পতিতপাবন উভয়ের অবস্থাই একটু কাহিল অবশ্য হয়েছিল।

কিন্তু তা হ'লেও আকাশের শশীকলা ও গাছের কাঁদির কলা-র মত পতিতপাবনের বুদ্ধি দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। তার বাবা বিখ্যাত সমস্ত প্রতিভাবান্ লোকের ছেলেবেলার গল্প খুঁজে খুঁজে পড়ে দেখলেন পতিতপাবনের সঙ্গে তাঁদের আশ্চর্য্য মিল আছে। পতিতপাবন একটু পেটুক, সে যা পায় তাই খায়, যা পায় না তাও সুবিধে পেলেই চুরি করে খায়। নিউটনের বাল্যজীবনে খাদ্য সম্বন্ধে এই উদারতা যে ছিল না এমন কথা তাঁর জীবনীতে লেখা নেই। সুতরাং এইখানেই নিউটনের সঙ্গে পতিতপাবনের মিল। পতিতপাবন রেগে গেলে হাত-পা ছোড়ে ও দাঁত দিয়ে কাপড় ছেঁড়ে। গ্যালিলিওর ছেলেবেলাতেও ঠিক এই রোগ ছিল। তাঁর ছেলেবেলার কোন জীবনী নেই বলেই সে কথা সাধারণ লোকে জানে না। পতিতপাবন কাতুকুতু দিলেও হাসে না, সেক্সপীয়ার কিন্তু হাসতেন। সেক্সপীয়ার ত' বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। না, যেদিক্ দিয়েই দেখা যায় পতিতপাবনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অস্বীকার করা অসম্ভব।

তার বাবার যেটুকু খুঁত মনে ছিল তাও একদিন অসাধারণ এক ঘটনায় দূর হয়ে গেল। পতিতপাবনের অসামান্যতার নির্ভুল প্রমাণ তিনি সেইদিনই পেলেন।

প্রতিদিন সকালে তিনি নিয়মিত ভাবে একটু করে ব্যায়াম ও একটু করে পড়াশোনা করেন।

দৈনিক খবরের কাগজ দিয়েই তাঁর এ দুটি কাজ অবশ্য এক সঙ্গে সারা হয়ে যায়। খবরের কাগজ বাগিয়ে ভাঁজ করে ধরতে এবং এক পৃষ্ঠা শেষ করে আর এক পৃষ্ঠা উল্টে গুছিয়ে নিতে রীতিমত 'মুলার্‌স্‌' একসারসাইজের কাজ যে হয়ে যায় এ কথা আর কে না জানে? সেদিন তিনি সবে মাত্র অনেক চেষ্টার পর খবরের কাগজটি বাগিয়ে ধরেছেন এমন সময়ে ভাঁড়ার-ঘরে শোনা গেল গোলমাল। পতিতপাবনের মা উচ্চস্বরে তাকে শাসাচ্ছেন।

"হতভাগা ছেলে! এই গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়ে আবার চিনি চুরি করতে এসেছ!"

পতিতপাবনের বাবাকে এবার উঠে দেখতেই হ'ল ব্যাপারখানা কি! তিনি ভাঁড়ার-ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর স্ত্রী গলার স্বর আরও চড়িয়ে দিলেন—

"আস্কারা দিয়ে ছেলেটির মাথা যে খেলে! দেখ দিকি কাণ্ডখানা, কোথায় কুলুঙ্গির ভিতর চিনির শিশি লুকিয়ে রেখেছি···"

পতিতপাবনের বাবার স্ত্রীর অভিযোগটা এবার অসহ্য হ'ল। এগিয়ে গিয়ে তিনি পতিতের কান ধরে বল্লেন—"কি করছিলি হতভাগা!"

পতিতপাবনের প্রতিভার সত্যকার পরিচয় এবার পাওয়া গেল,—অনুনাসিক স্বরে সে বল্লে—"আমি ত' পিঁপড়ে দেখছিলাম!"

"পিঁপড়ে!" আঁৎকে উঠে বাবা তার কান ছেড়ে দিলেন।

কার কানে তিনি হাত দিয়েছিলেন! ভবিষ্যতের কোন আইনষ্টাইন বা মেঘনাদ সাহার জীবনীতে শেষে লেখা থাকবে যে তার বাবা তার প্রথম বৈজ্ঞানিক উৎসাহ এমনি করে নিভিয়ে দিয়েছেন!

পতিতপাবনের মা অবশ্য একবার ধমকে উঠলেন,—"পাজি! তুমি পিঁপড়ে দেখেছিলে, ত' তোমার মুখে কেন চিনি লেগে?"

কিন্তু বাবা সে কথা কানে না তুলেই উৎসাহ ভরে বল্লেন—"কোথায় পিঁপড়ে? কি রকম পিঁপড়ে? কি দেখছিলি?"

মুক্তকর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পতিতপাবন একটু ভয়ে ভয়েই বল্লে, "ওই যে চিনি চুরি করে পালাচ্ছে!"

দেয়াল বেয়ে এক সার পিঁপড়ে যে পতিতপাবনের মতই চিনির শিশির সন্ধানে এসেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাবার চোখ মুখ রীতিমত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। "দেখলে! কি বলেছিলাম আমি!"

"বলবে আবার কি, আমি অনেক দিন জানি! তোমার ছেলে আর কি হবে!" বলে মা রাগ করে বেরিয়ে গেলেন। সপ্রশংস ভাবে বাবা পতিতপাবনের দিকে ও পতিতপাবন সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে পিঁপড়েদের দিকে চেয়ে রইল।

পিপীলিকা-দর্শন থেকেই পতিতপাবনের সত্যিকার বৈজ্ঞানিক-জীবন সুরু হ'ল। তার বাবা একেবারে গোড়া থেকেই তাকে শক্ত করে গড়ে তুলতে চান। তার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এখন থেকেই বাড়িয়ে তোলা দরকার; যখন তখন পতিতপাবনের তাই ডাক পড়ে। গাছপালা, পশুপাখী, পোকামাকড় যা কিছু সুবিধে মত সামনে পড়ে পতিতপাবনকে পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়। শুধু পর্য্যবেক্ষণ নয়, তন্নতন্ন করে দেখে খুঁটিয়ে সব বিবরণ ও মন্তব্য এখন থেকে লিখে রাখাও দরকার। বাবা তাই পতিতপাবনকে একটা খাতা কিনে দিয়েছেন। এই খাতাতেই পতিত-পাবনের বৈজ্ঞানিক দিগ্বিজয়ের সূত্রপাত।

* * * *

একটা মাস কোন রকমে কাটিয়ে আমরা একেবারে খাতা পরীক্ষার দিন গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারি। পৃথিবীর অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার প্রথম স্ফূরণ দেখবার সাধ কার না হয়? পতিতপাবনের বাবা তাই সেদিন আগ্রহ ভরে পতিতের খাতাটা খুঁজে বার করেছেন। প্রথম পাতাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা,—'কাক'। সঙ্গে কাকের একটা ছবিও আছে তবে সেটা গাড়ু বা হুঁকোরও হ'তে পারে। পতিতপাবনের বাবা পড়তে আরম্ভ করলেন—"কাক হিন্দুস্থানী পাখী। বাড়ীতে মাছ কোটা হইলেই সে কি কি বলিয়া খোঁজ লইতে আসে,

এবং বাংলা জানে না বলিয়া কা কা বলে। মা হিন্দুস্থানী জানেন না বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। তাহাকে তাড়ান উচিত নয়। কারণ রঙ খুব কালো হইলেও তাহারও দুইটা পা আছে। মেজ মামারও ত' রঙ কালো এবং দুইটা পা আছে। মা মেজ মামা আসিলে তাড়াইয়া দেন না।" স্ত্রীর এই ভ্রাতাটির প্রতি বাবার বিশেষ অনুরাগ নেই। খুসী হয়েই তিনি পাতা উল্টে গেলেন। এবার—গ্যাসপোষ্ট। পতিতপাবন লিখেছে;—"গ্যাসপোষ্ট সকল প্রকার গাছের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গায়ে পাতা গজায় না বলিয়া তাহাকে গাছ বলিয়া সকলে চিনিতে পারে না। মাথায় লাল পাগড়ী ও গায়ে জামা না থাকিলে যেমন পাহারাওয়ালাকে চেনা যায় না। জঙ্গলে জন্মাইলে বাঘ-ভালুকের অসুবিধা হইবে বলিয়া গ্যাসপোষ্ট শুধু সহরেই জন্মায়..."

বাবা আবার পাতা উল্টে গেলেন..."ছারপোকা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ জীব। ছাগল ঘাস খায়, ঘাস অপেক্ষা ছাগলের বুদ্ধি বেশী। মানুষ ছাগল খায়, ছাগলের তুলনায় অধিকাংশ মানুষের বুদ্ধি বেশী। ছারপোকা মানুষ খায় অর্থাৎ তার রক্ত খায়। সেইজন্য তার বুদ্ধি সব থেকে বেশী। তাহাদের ধরা শক্ত, ধরিলেও মারা শক্ত, কারণ তারা এমন দুর্গন্ধ ছাড়ে!..."

তার পর আরশুলা..."আরশুলার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ দেশে আরশুলা না থাকিলে জুতা এত সস্তা হইত না। চীন দেশে আরশুলা নাই, চীনারা সব খাইয়া ফেলিয়াছে। আরশুলার খোঁজে এ দেশে আসিয়া চীনারা জুতা তৈরী করে এবং আমরা পাঁচ টাকার জিনিষ পাঁচ সিকায় পাই।"

পতিতপাবনের বাবার মাথা একটু ঘুরছিল, এত বড় প্রতিভার পরিচয়ের সামনে ঘোরা একটু স্বাভাবিক। হঠাৎ পাতা উল্টে তাঁর চক্ষু একেবারে স্থির হয়ে গেল। পাতার ওপরে লেখা...'বাবা'।

'বাবাকে কোন্ প্রকার জীব বলা উচিত আমি ঠিক জানি না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তিনি লজ্জা পাইবেন। তিনি বোধ হয় ঠিক জানেন না, মাও জানেন না। মা ত' তাই বলেন, "তুমি কী বল ত'! দুনিয়ায় যদি তোমার জোড়া থাকে!" মা কিন্তু আমাদের স্কুলের জলওয়ালা রামভকতকে দেখেন নাই।

তার গোঁফ বাবার মত। তবে তার গায়ে জামা নাই আর মাথায় টাক আছে। তাই তার বুদ্ধিও বাবার চেয়ে বেশী। মা বলেন, বাবাকে সব দোকানদারেরা ঠকায়। রামভকত কিন্তু আমাদের ঠকায়, দুই পয়সার লজঞ্চুষ আনিতে বলিলে দেড় পয়সার আনে। বাবার মাথায় টাক না পড়িলে আর বুদ্ধি হইবে না..."

পতিতপাবনের বাবা আর পড়্‌তে পারলেন না। খাতাটা দু' হাতে ছিঁড়ে ফেলে একেবারে আগুন হয়ে ডাকলেন—"পতিত্!"

এর পর কি হ'ল তা তোমরা অনুমান কর্‌তেই পার। বাঙলা দেশ কেন, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-প্রতিভা এমনি করেই মুকুলে বিনষ্ট হয়ে গেল।

রামধনুর শততম সংখ্যা

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্, বি-সি-এস্)

রামধনুর সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট আজ তাঁহাদের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন—একটি শুভ মুহূর্ত্ত—কেননা এই পত্রিকার শততম সংখ্যা আজ প্রকাশিত হইল। প্রথম সম্পাদক-হিসাবে এই সুযোগে আমি রামধনুর সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, বন্ধু এবং লেখক-মণ্ডলীকে অন্তরের শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

রামধনুর প্রথম সম্পাদক

আজ হইতে আট বছরেরও কিছু আগে রামধনুর পরিচালকগণ আমাকে সম্পাদকের আসনে বসাইয়া পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশ করেন। দুই বৎসর পত্রিকা সম্পাদনার পর তৃতীয় বৎসর হইতে সে ভার আমি বর্ত্তমান সম্পাদকের উপর অর্পণ করি, কেননা তখন বর্ত্তমান সম্পাদকের পক্ষেই এই কার্য্য অধিকতর শোভন হইবে মনে করিলাম।

এই দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া নানা রকম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রামধনুকে অগ্রসর হইতে

হইয়াছে। আমাদের দেশে পত্রিকা পরিচালনা করা যে কি কঠিন কাজ তাহা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। তাহা সত্ত্বেও রামধনু আজ যে বাংলা-সাহিত্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, শ্রেষ্ঠ শিশু-মাসিকগুলির নাম করিতে লোকে 'রামধনু'রও যে উল্লেখ করে তাহা বিশেষ গৌরবের কথা। রামধনুর অভিযানকে এই ভাবে জয়যুক্ত করিতে যে সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমস্ত প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কথাই আমার মনে পড়িতেছে।

রামধনু কার্য্যালয়

নানা প্রকার সুপরামর্শ দিয়া, অকুণ্ঠিত ভাবে রচনা পাঠাইয়া পত্রিকাখানাকে উন্নত করিয়া তুলিতে তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আশা করি রামধনু কোনদিনই তাঁহাদের এই করুণা হইতে বঞ্চিত হইবে না। রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণও আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ—আশা করি তাঁহাদের স্নেহদৃষ্টিও রামধনু সমভাবেই লাভ করিতে থাকিবে। সর্ব্বশেষে ভগবানের কাছে রামধনুর সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

রামধনুর প্রতিষ্ঠাকালে (১৩৩৪—৩৫)

পত্রিকার কর্ম্মিগণ ও কয়েকটি বন্ধু

চৌকি নিয়েই গোলমাল

(শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু)

চৌক চতুষ্পদ বটে কিন্তু ওকে জানোয়ারের মধ্যে গণ্য করা যায় না। কিন্তু এই নিয়েই যূঁইএর সঙ্গে আমার প্রবল তর্ক। দু'জনের মধ্যে যে ভয়ানক একটা প্রভেদ আছে, রাত দেড়টা বাজতে চলে, তবু সে কথা কিছুতেই তাকে বোঝানো যায় না।

কেবল্ বলে—"কেন নয়, বুঝিয়ে দাও। চতুষ্পদ মানেই তো জানোয়ার!"

আমি বলি—"বেশ! অনেক জানোয়ারের একটা পা ভেঙে গেলেও তিন পায়েই তারা ছুট্‌তে পারে। তোমার চৌকির একটা পা ভেঙে দাও, কেমন ছুটুক্ ত দেখি! ভেঙেছ কি উনি কাৎ হয়েছেন!"

সে বলে—"কিন্তু জানোয়ারে যেমন মানুষকে বহন করে চৌকিও তেম্‌নি বহন করে—তবে কেন হবে না?"

আমি বলি—"বাঃ! অনেক জানোয়ারের মাংস আমরা খাই, যেমন ছাগল প্রভৃতি, খেতেও তারা মন্দ না; কিন্তু চৌকির মাংস কি খুব সুস্বাদু বলে তোমার মনে হয়? তুমিই বলো।"

যূঁই বলে—"খেতে ভালো নাই হ'ল তবু যেমন অনেক জানোয়ারের গায়ে পোকা থাকে তেম্‌নি চৌকিরও তা নেই কি? তার কামড় তো রোজ রাত্রেই টের পাও বাপু!"

এমন এঁড়ে তর্ক কর্‌লে আর কাঁহাতক্ পারা যায়? আমি বলি—"এইবার আমার শেষ জবাব। তুমি তা হ'লে বল্‌তে চাও যে যদি আমি চৌকির ওপর একটা রশুন্ রাখি অম্‌নি ওটা রশুন্‌চৌকি হয়ে যাবে? আর বাজ্‌তে থাক্‌বে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।" সে অটল-বিশ্বাসে বলে।

অগত্যা রশুন্ আন্‌তে সেই গভীর রাত্রে তখনই আমাকে রান্নাঘরে যেতে হয়—ভুত, ইঁদুর এবং আরশোলাকে কেয়ার না ক'রে।

রশুন-প্রতিষ্ঠা করেছি-কি-করিনি অম্‌নি যূঁই দু'হাতে তুমুল্ উদ্যমে—ধপাধপ্ ধপাধপ্—চৌকি বাজাতে সুরু ক'রে দিয়েছে।

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিই আমি। "এই বুঝি তোমার রশুন্‌চৌকির বাজনা? মেজমামার বিয়েতে কি এই বেজেছিল?"

ওর তরফ থেকে উত্তর আস্‌বার আগেই সদর রাস্তা থেকে হুঙ্কার আসে। লেপ মুড়ি দিয়ে অকাতরে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি তৎক্ষণাৎ।

"জমিদার বাবুর বাড়ীতে এত গোলমাল কিসের?" বাহিরের আওয়াজ।

নীচে থেকে গোমস্তা মশাই গলা-খাঁকারি দেন—"কে ডাকে?"

"এজ্ঞে, আমি চৌকিদার।"

ওর সম্পত্তি নিয়েই যে আমাদের গোলমাল বেধেছে এ কথা আর ওকে জানাতে সাহস হয় না।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(১৬)

সন্দেহের 'জের'

বাহিরের ঘরে আসিয়া হুকা-কাশি দেখিলেন, সন্তোষ এবং অপর একটি অপরিচিত ভদ্রলোক সোফার উপর, বসিয়া আছেন; উভয়েরই মুখের ভাব বেশ উদ্বেগাকুল। তাঁকে ঢুকিতে দেখিয়া দু'জনাই নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্তোষ পরিচয় করিয়া দিল, "ইনি আমাদের কর্ত্তার মেজ ভাই। আমেরিকা থেকে আজই দেশে এসে পৌঁছেছেন।......"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হুকা-কাশির সৌজন্যের বন্যায় তা ভাসিয়া গেল; তিনি আন্তরিকতার সহিত নবাগতের সঙ্গে হাণ্ড্‌সেক্ করিতে করিতে বলিলেন, "লেট্ মি ওয়েল্‌কাম্ ইউ ব্যাক্ টু ইওর ওন্ কান্‌ট্রি, মিষ্টার বাসু। একযুগ পরে নিজের দেশে ফেরায় যে কি আনন্দ তা আমি কিছু কিছু জানি—আমার নিজের জীবনেও ও জিনিষটা দু' এক বার ঘটেছে কিনা!" বিলাত অথবা আমেরিকায় গিয়া এখনও অনেক বাঙ্গালী যে 'রায়'কে 'রয়,' 'দাস'কে 'ডস্' এবং বসুকে 'বাসু' নামে চালান হুকা-কাশি তা জানিতেন, এবং নবাগত ভদ্রলোকটিও যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম নন্ ইতিপূর্ব্বেই তিনি তা জানিতে পারিয়াছিলেন।

মিষ্টার বাসু বলিলেন, "বাস্তবিক, বাড়ী এসে আনন্দ যা পেয়েছিলাম তা অপরিসীমই বটে, কিন্তু ভগবান্ সে আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে দিলেন না। আমার ছোট ভাই সলিল

দিন দুই হ'ল হঠাৎ মধুপুর রওনা হয়ে যায়। আমি বাড়ী এসে পৌঁছোবার ঘণ্টাখানেক বাদেই খবর এসেছে, সেখানে তাকে নাকি কি জন্যে থানায় নিয়ে গেছে। বড়দা তাই তাড়াতাড়ি আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

হুকা-কাশি একটু যেন চম্‌কাইয়া উঠিলেন, সন্তোষকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "থানায় নিয়ে গেছে? কিন্তু কেন?"

সন্তোষ চুপ করিয়া কিছুক্ষণ মাটীর দিকে তাকাইয়া রহিল, বার কয়েক ইতস্ততঃ করিল, তার পর কহিল, "আপনি কি বাস্তবিকই কিছু বুঝ্‌তে পারছেন না মিষ্টার হুকা-কাশি? সোনার হরিণ চুরি যাওয়ার কথা যে চাপা নেই তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সমস্ত দেশময় তা ছড়িয়ে পড়েছে—নানা জায়গার পুলিশের কর্ত্তাদের কানে তা তোলা হয়েছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমার মুখ দিয়ে কোন রা' বার হয় নি, হয়তো এখনও বার হওয়া শোভন হচ্ছে কিনা জানি না, কিন্তু তবুও কর্ত্তব্যের খাতিরে আজ আর আমি এ কথা না জানিয়ে থাক্‌তে পারছি না যে এই চুরির পর থেকেই সলিল যেন—যেন—কেমন একটু আলাদা মানুষ হয়ে গেছে; তার ধরণ-ধারণ যেন—এঁ—ইয়ে—কেমন একটু অস্বাভাবিক মত হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে মধুপুরের পুলিশ যদি....."

সন্তোষ কথাটা শেষ করিল না বটে, কিন্তু তার ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট। এই চুরির ব্যাপারে সলিল যে নিতান্ত সাধু-পুরুষটি নয় ইহাই যেন সে ভাবে-ভঙ্গীতে বুঝাইতে চায়। হুকা-কাশি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এ ছেলেটির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু ধৈর্য্য হারাইলেন মিষ্টার বাসু। সোনার হরিণের সমস্ত কথাই তিনি শুনিয়াছেন, সলিল—তাঁরই নিজের ছোট ভাই, নির্ম্মল, নিষ্কলুষ সলিল—তার বিরুদ্ধে একি জঘন্য অভিযোগ! রাগে তাঁর চোখ মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সন্তোষের দিকে ফিরিয়া কঠোর স্বরে তিনি বলিলেন, "এক মাত্র তোমার অনুমান ছাড়া সলিলের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ তুমি পেয়েছ সন্তোষ, যাতে করে এত বড় একটা দুর্নামের বোঝা তার ওপর চাপাতে তুমি সাহস করছ? সলিলকে আমরা চিনি, তোমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী চিনি; আর চিনি বলেই জোর করে বল্‌তে পারি তার মত সৎ ছেলে লাখ্‌ করা একজনও মেলে না। তুমি অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম, নিশ্চয়ই তার প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছ, কাজেই তার ঘাড়ে এত বড় একটা বদ্‌নামের বোঝা চাপাতে উঠে পড়ে লেগেছ। কিন্তু দাঁড়াও, আমিও সহজে তোমায় রেহাই দিচ্ছি না, আজই গিয়ে বড়দা'কে জানাব যে দুধ-কলা দিয়ে কি কালসাপ তিনি ঘরের ভেতর পুষ্‌ছেন।" উত্তেজনায় তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন, আর তাঁর চোখ দু'টি জ্বলিতে লাগিল ঠিক যেন দুই খণ্ড জ্বলন্ত কয়লা।

সন্তোষ বেচারা একেবারে 'থ' হইয়া গিয়াছিল। আজ এ বাড়ীতে ঢুকিবার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বেও সে একটি বারের তরেও ভাবিতে পারে নাই যে, যে কথাটা এত দিন ধরিয়া তার মনের আনাচে-কানাচে অনবরত উঁকি মারিতেছিল আজ এম্‌নি ভাবে বাহিরে তা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হুকা-কাশি ওভাবে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া না বসিলে কথাটা যে প্রকাশও পাইত না তাও ধ্রুব সত্য। কিন্তু নিজের মনের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে এমন লোক পৃথিবীতে কয়জনই বা মেলে? ঝোঁকের মাথায় কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া সন্তোষের যেন অনুশোচনার আর অবধি রহিল না, অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া সে বসিয়া রহিল।

হুকা-কাশি এতক্ষণ ভাল মন্দ কোন কথাই বলেন নাই, এইবার সন্তোষের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "সলিল বাবুকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে যে খবর এসেছে—কোথায় সে চিঠিখানা? একবার আমায় দেখাতে পারেন?"

সন্তোষ পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া হুকা-কাশির দিকে বাড়াইয়া দিল; তিনি সে খানা হাতে তুলিয়া ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁর ঠোঁটের কোণায় একটু যেন চাপা হাসি দেখা দিল; সে হাসি আরও ফুটাইয়া তুলিয়া শেষে তিনি কহিলেন "ঙুঃ, বোঝা গেল এবার আসল ব্যাপার!" তার পর মিষ্টার বাসুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আমি কথা দিচ্ছি, কালকেই সন্ধ্যের পর সলিল বাবু সুস্থ মনে বহাল তবিয়তে আপনাদের শ্রীপুরের বাড়ীতে ফিরে যাবেন। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। অমৃত!—টেলিফোন্‌-ডিরেক্‌টারীটা একবার নিয়ে এসো তো!"

বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল; অমৃত আসিতেছে মনে করিয়া সেই দিকে তাকাইতে তিন জনেই বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্‌ হইয়া গেলেন। অমৃত নয়, ঘরে ঢুকিতেছে সলিল।

মিষ্টার বাসু সোফা হইতে তড়াক্‌ করিয়া উঠিয়াই দুই হাতে সলিলকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন; প্রায় এক যুগ পরে দুই ভাইএর প্রথম মিলন, সে বড় অপূর্ব্ব দৃশ্য!

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে হুকা-কাশিই প্রথম কথা আরম্ভ করিলেন, সলিলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাতালটার খোঁজ পাওয়া গেল পূরো একদিন পরে? বিস্তর তাড়ি খেয়েছিল বলুন! নাকি মদ? কোথায় পড়ে ছিল, থানায় নাকি?"

"আপনি সে কথা কি করে জান্‌লেন মিষ্টার হুকা-কাশি?" সলিল সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল।

"বাঃ রে, আপনি লিণ্টন নার্সিং-হোমে গিয়ে ঢুক্‌তে পার্‌লেন আর আমার সে কথা জান্‌তেই যত দোষ? তবে তো আপনি এ কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, নার্সিং-হোমে আপনি

গিয়ে ঢোক্‌বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চার দিক্‌কার দোর-জান্‌লা বন্ধ-করা আরও একটা ঘোড়ার গাড়ী যে সেই বাড়ীরই ফটকের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, সে খবরই বা আমায় দিলে কে ?”

স্তম্ভিত হইয়া সলিল হুকা-কাশির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল—লোকটা কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা জানে নাকি ? নতুবা এ ব্যাপার কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? তার মনের ভাব হুকা-কাশি বুঝিতে পারিলেন, হাসিয়া কহিলেন, “না না, এখন পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যার কোন পরিচয় আমি দিই-নি, কেননা এ পর্য্যন্ত ঘটনাটা বাস্তবিকই আমার জানা আছে—কি করে জেনেছি তা নাই বা শুন্‌লেন ! তবে এইবার যে ঘটনাগুলো বল্‌তে সুরু করব তা আমার আদৌ জানা নেই ; জ্যোতির্ব্বিদ্যার সাহায্যে নয়, ন্যায়শাস্ত্রের সহায়তায় এগুলো আঁচ্‌ছি। আমি বলে চলি, যদি কোথাও ভুল হয় তো আপনি সঙ্গে সঙ্গে শুধ্‌রে দেবেন।

“দোর-জানালা-বন্ধ গাড়ী থেকে যে লোকটা নাম্‌ল তাকে দেখে তার নিজের কোচ্‌ম্যান্‌ই অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল—এ যে সম্পূর্ণ নতুন লোক ; তার সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি করে গাড়ীতে যে উঠেছিল এ তো সে নয় ! কোন একজন ওস্তাদ্ লোকের হাতের কাছে—সুট্‌কেসের ভেতর—যদি তার আবশ্যকীয় সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত থাকে, আর সে যদি নিরিবিলিতে মিনিট পনেরো সময় পায়, তবে এই বিজ্ঞানের যুগে তার নিজের চেহারাটা সম্পূর্ণভাবে বদ্‌লে ফেলা তার পক্ষে যে সম্ভব, এ কথা কোচ্‌ম্যানের জানা ছিল না। সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাব্‌লে—দিনে দুপুরে বন্ধ গাড়ীর ভেতর থেকে একটা জল-জ্যান্ত মানুষ কোথায় উড়ে গেল ! তার পর যখন এক টাকার জায়গায় পাঁচ পাঁচটা টাকা বক্‌শিস্ পেলে তখন আপনা-হতেই একটা বিশ্রী সন্দেহ তার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠ্‌ল। সে নিশ্চয়ই ভাব্‌লে টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ কর্‌বার চেষ্টা হচ্ছে—আসলে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই কোন মারাত্মক রকম ষড়্‌যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, যার উদ্দেশ্য কোন জীবন্ত লোককে কৌশলে গুম্ করে ফেলা। কিন্তু এদিকে পাঁচটি কড়্‌কড়ে টাকা হাতে পড়ায় তার তাড়ি-পিপাসা বা ওই রকমেরই একটা কিছু বোধ হয় দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছিল। আস্তাবলে যেতে যেটুকু সময় লাগ্‌ল তারই ভেতর সে তার সঙ্গের সহিসটিকে নিজের ধারণা-অনুযায়ী সমস্ত ‘রহস্য’টা বোধ করি বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিলে। আস্তানায় পৌঁছে ঘোড়া দু’টোকে মুক্তি দিয়ে অম্‌নি সে বেরিয়ে পড়্‌ল তাড়ির তল্লাসে। সহিস ভায়া বোধ করি তার দোস্তের চাইতে একটু বেশী হুঁশিয়ার—ভাব্‌লে, এ রকম সাংঘাতিক চক্রান্ত যখন চলেছে তখন আজ বাদে কাল নিশ্চয়ই ভীষণ একটা কিছু-না-কিছু ঘট্‌বেই। জোর তদন্ত একটা তখন হতে বাধ্য, আর তা হ’লেই সে এবং কোচ্‌ম্যান্‌ও যে জেনে শুনে এ ব্যাপারটাতে সংশ্লিষ্ট ছিল সে কথাও বেরিয়ে পড়্‌বার ষোল আনাই সম্ভাবনা। তার চাইতে আগে হ’তেই পুলিশে একটা খবর দিয়ে রাখা ভাল।

পুলিশে খবর গিয়ে পৌঁছাল ; অম্‌নি একজন পুলিশ-অফিসার কর্ত্তব্যবোধে চলে এলেন লিণ্টন নার্সিং-হোমে—খোঁজ নিতে আজ অমুক সময় ষ্টেশন থেকে গাড়ী করে কে কে এসেছে। খুব সম্ভব ভিজিটিং বুকের তলব তখন পড়ে থাকবে—সেটা খুল্‌তে শুধু আপনারই নাম বার হ’ল ; অপর লোকটি বিশেষ ওস্তাদ, এ সব ভজঘটের ভেতর আদবেই যায় নি।

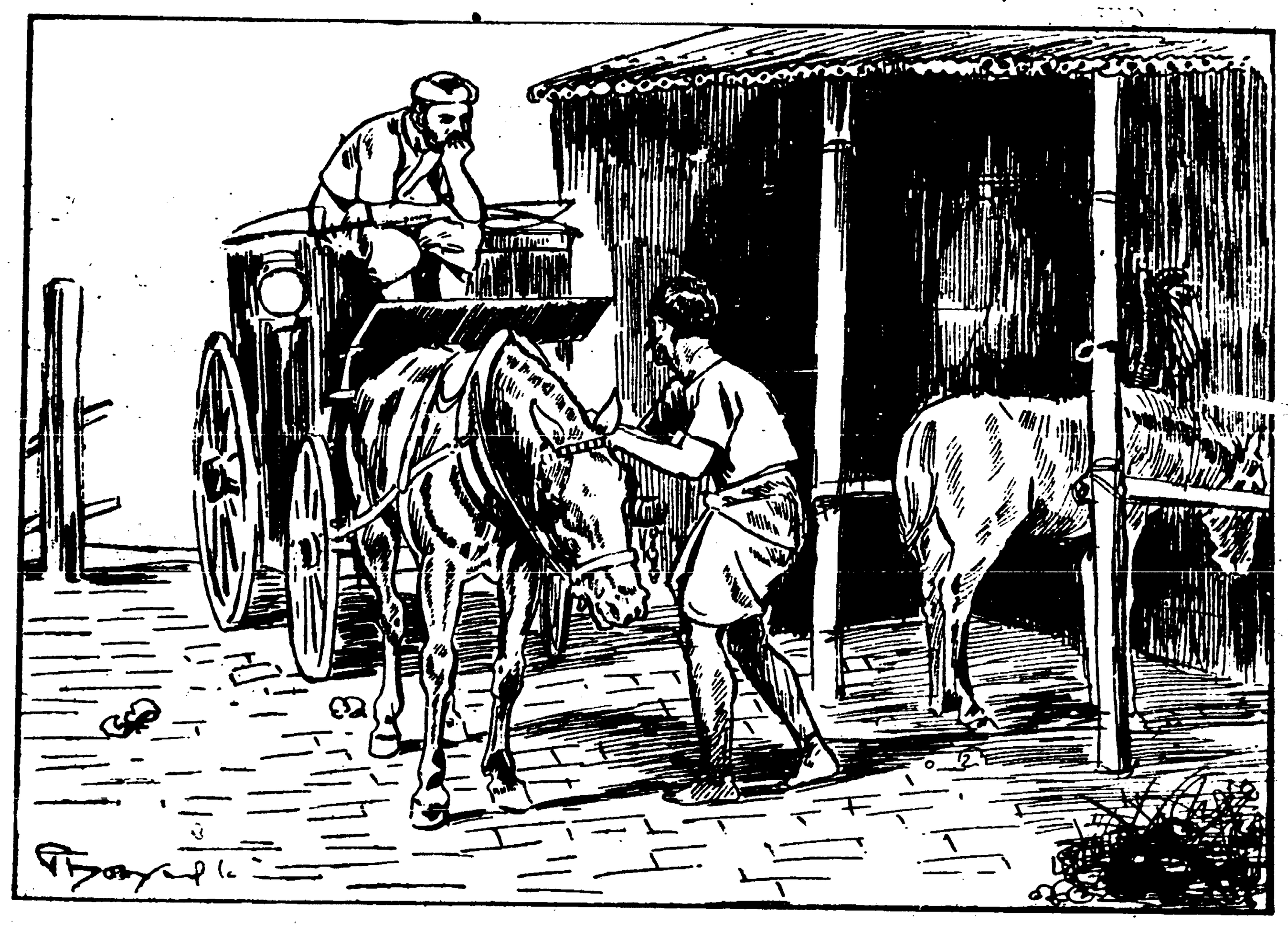

হুঁসিয়ার সহিস্

তার পর আরও একটু সবিশেষ অনুসন্ধান নিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে আপনাকে বার কর্‌তে ভদ্রলোকের বেশী বেগ পেতে হয় নি।

“সকলে মিলে থানায় ফিরে এলে বোধ করি তখন তলব পড়্‌ল সেই সহিসের। নিশ্চয়ই সে আপনাকে দেখে হাঁ-না কিছুই সঠিক বল্‌তে পারে নি—পার্‌লে আপনার কল্‌কাতা এসে পৌঁছাতে একদিন দেরী হবার কথা নয়, কালকেই এসে পৌঁছাতে পার্‌তেন। সকলে বুঝ্‌লে, একমাত্র গাড়ীর কোচ্‌ম্যানই আপনাকে সনাক্ত কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু ঠিক সেই দিনই আপনাকে সনাক্ত করা হ’ল না কেন ? মধুপুরে আপনার কাজ ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আরও একদিন অপেক্ষা করার কি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাক্‌তে পারে ? আমি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখ্‌ছি সে কোচ্‌ম্যান্‌টির সন্ধান সেদিন পাওয়া যায় নি, সে ব্যাটা তখন নেশায় টং হয়ে কোথাও পড়ে ছিল। এ ধরণের লোকেদের সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে—মুফ্‌ত পাঁচ টাকা

লাভ হলে এভাবেই তারা তা জলে ফেলে। এর পর ঘটে মাত্র দু'টো ঘটনা, আপনার কাছে সেই লজ্জিত অফিসারের দুঃখ-প্রকাশ এবং আপনার মধুপুর পরিত্যাগ। অবশ্য আমার ভুল হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, কেননা অনেকখানিই অনুমানের ওপর নির্ভর করে ঘটনাটা আমায় খাড়া করতে হয়েছে। কিন্তু আগেই আমি বলে নিয়েছি, ভুল যদি হয় আপনি তা শুধ্‌রে দেবেন।"

(১৭)

'মেজ্জাজী' পার্শী

সলিল, সন্তোষ এবং মিষ্টার বাসু নিষ্পলকভাবে এতক্ষণ হুকা-কাশির বর্ণনা শুনিতেছিলেন, তিনি থামিতেই সলিল কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সত্যি বল্‌ছেন আপনি গুণ্‌তে জানেন না, মিষ্টার হুকা-কাশি? সমস্ত ঘটনার যে বিবরণ আপনি দিলেন তা একেবারে হুবহু ঠিক, কোথাও এতটুকু ভুলচুক্ হয় নি। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে এ সিদ্ধান্তে আসা কি সম্ভব?"

হুকা-কাশি সংশোধন করিয়া বলিলেন, "উঁহু, শুধু অনুমান নয়, যুক্তিতর্কের সাহায্যে একটা সিদ্ধান্ত থেকে অপর একটা সিদ্ধান্তে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে।"

জবাব দিলেন মিষ্টার বাসু, কহিলেন, "তা হলেও বল্‌ব, এ বাস্তবিকই অদ্ভুত ব্যাপার। কোন লোকেরই যে এতখানি ক্ষমতা থাক্‌তে পারে নিজে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ না কর্‌লে তা কিছুতেই আমি বিশ্বাস কর্‌তাম না। আমি এসে পৌঁছাবার পর এরই মধ্যে বড়দার মুখে আপনার শক্তির কথা কিছু কিছু শুনেছি বটে, কিন্তু সে ক্ষমতা যে কি পরিমাণ অলৌকিক তার নমুনা পেলাম এই মাত্র। বাস্তবিক, এ একটা অনুপ্রেরণার বিষয়। আমি জোর করে বল্‌তে পারি, আমেরিকা হলে সেখানকার উৎসাহী যুবকদের ভেতর আপনার জীবনচরিতকার হবার জন্য দস্তুরমত রেষারেষি পড়ে যেত। প্রত্যেকটি য়্যাড্‌ভেঞ্চারে আপনার নিত্যকার সঙ্গী হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সমস্ত ঘটনা পর পর তারা লিখে রাখ্‌ত, তার পর য়্যাড্‌ভেঞ্চার শেষ হয়ে গেলে বইএর আকারে তা প্রকাশ করে, সমস্ত জগতের সঙ্গে আপনার প্রতিভার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তবে তারা ক্ষান্ত হত। অবশ্য এ বয়সে আর সম্ভব নয়, নইলে আমার নিজেরই যেন উৎসাহ হচ্ছে।"

হুকা-কাশি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তো, নেমেই পড়ুন না তা হ'লে! বয়স আর আপনার এমন কি-ই বা হয়েছে? আমার চাইতেও কি বড় হবেন?"

"অনেক দিন বাদে দেশে ফিরেছি, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে বাস কর্‌তে ইচ্ছে করে বই কি! কিন্তু তা হোক্, বড়দার সোনার হরিণের কিনারা কর্‌তে

একটুও যদি আপনার কাজে লাগ্‌তে পারি, তবে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যটা না হয় নাই দেখ্‌লাম! আমি রাজী।"

হুকা-কাশি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কিন্তু গোড়াতে একটা কথা পরিষ্কার করে আপনাকে বলা দরকার বোধ কর্‌ছি; আমাদের বোঝাপড়া চল্‌বে কিন্তু অতি দুর্দ্দান্ত বেপরোয়া এক দস্যুদলের সঙ্গে। এ দলটা কতখানি পুরু তা এখনও আমি ভাল করে ঠাহর করে উঠ্‌তে পারি নি, কাজেই আমার নিজেরও একটু দলবৃদ্ধি করে নেওয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে যোগদানে বিপদের সম্ভাবনাটা যে কতখানি তা প্রথমেই বলে রাখা ভাল; মানুষের প্রাণকে কিন্তু এরা প্রাণ বলেই গ্রাহ্য করে না—পিঁপ্‌ড়ের মত মানুষকেও টিপে মার্‌তে এরা সর্ব্বদাই অভ্যস্ত।"

হুকা-কাশির এ কথায় সলিলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু মিষ্টার বাসু তাহা লক্ষ্যও করিলেন না, হাসিয়া কহিলেন, "সে ভয় আমায় কি দেখাচ্ছেন, মিষ্টার হুকা-কাশি? পাঁচ বছর আমি আমেরিকার শিকাগো সহরে কাটিয়ে এসেছি; শিকাগোর গুণ্ডাদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের দস্যুরই কি তুলনা চলে? এখানকার দস্যুদের তো ছ্যাঁচ্‌ড়া বল্লেই হয়, বুদ্ধির কোন বালাই-ই নেই। সেখানে তারা চলে পদে পদে বিজ্ঞানের সাহায্যে। বেপরোয়া দস্যু যদি বিজ্ঞানের বলে বলী হয় তবে মানুষের যে তারা কি ভীষণ অভিশাপ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে তা প্রত্যক্ষ করেছি শিকাগোতে—ডিলিঞ্জার প্রভৃতির লীলাভূমি শিকাগো সহরে।"

হুকা-কাশি প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন, "বেশ, তা-ই তবে কথা রইল, সময় হ'লেই আপনাকে খবর দেব।"

রাত বাড়িয়া চলিতেছিল, সকলে উঠিবার উপক্রম করিল; সলিল একটু উস্‌খুস্ করিতেছে দেখিয়া হুকা-কাশি তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন "যে খবরের জন্য উৎসুক হয়ে আপনি সোজা শ্রীপুর না গিয়ে আমার এখানে এসেছেন তার উত্তর হল—'পেয়েছি।' কেমন, ঠিক তো?"

বিমূঢ়ের মত সলিল হুকা-কাশির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, দেখিয়া হুকা-কাশি এইবার হাসিয়া বলিলেন, "মধুপুর থেকে সে মোড়কটা ঠিকমতই এসে পৌঁছেছে,—ভাবনার কারণ নাই। কাল গোটা দুয়েকের সময় আপনি একবার আমার এখানে আস্‌তে পার্‌বেন কি?"

সলিল শূন্যদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ হুকা-কাশির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, "বেশ, আস্‌ব।"

পর দিন বেলা দুইটা বাজিতে না বাজিতেই সলিল হুকা-কাশির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, কেননা সে জানিত পূর্ব্ব হইতে কারো সঙ্গে দেখা করিবার কোন সময়

নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় তিনি তা পালন করেন। কিন্তু আজ বাড়ীর ফটকে ঢুকিতেই বেহারা তাকে সেলাম জানাইয়া কহিল, বাবু তার কোন্ জরুরী কাজে রাহির হইয়া গিয়াছেন, সলিল আসিলে বৈঠকখানা ঘরে তাহাকে বসাইবার জন্য তার উপর নির্দ্দেশ রাখিয়া। বেহারা অমৃতের পিছন পিছন সে আসিয়া ড্রইং রুমে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে কিন্তু বিশেষ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল এই দেখিয়া যে, সে ছাড়া আরও এক ভদ্রলোকের সহিত ঠিক সেই সময়টিতেই হুকা-কাশি 'এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্' করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সেই লোকটিও তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া এইবারে রীতিমত উস্‌খুস্ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। লোকটি একজন আধা বয়সী পার্শী, দেখিলে মনে হয় বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যবসাদার। সলিল ঘরে ঢুকিতেই সেই পার্শী ব্যবসাদারটি আড়চোখে একবার তার মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

দেখিতে দেখিতে আরও প্রায় পনেরো মিনিট সময় কাটিয়া গেল, পার্শী ব্যবসাদারটির মুখে বিরক্তির চিহ্ন এইবার যেন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল, বাহিরেও সেই বিরক্তিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে সে হাঁকিল, "বেয়ারা, এ বেয়ারা, ইধার আও। সাহেব কো ঘুম্‌নেমে আউর কেৎনা দের হোগা? পচিশ মিনিট্ তো কাবার বিতগিয়া আউর কেৎনা ঠারেঙ্গে?"

লোকটার কণ্ঠস্বরে কানে যেন পীড়া দেয়, মনে হয় কেহ যেন সজোরে একটা ভাঙ্গা কাঁসর বাজাইতেছে। তার এই মধুর আহ্বান শুনিয়া অমৃত আগাইয়া আসিল, কুণ্ঠিত ভাবে দুই হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে জানাইল, আজিকার এ ব্যাপার বাস্তবিকই বিস্ময়কর, কেননা তার মনিবকে বহু দিন যাবৎ সে জানে, কথায় এবং কাজে মিল রাখিতে এরূপ লোক বাস্তবিকই দেখা যায় না। কেন যে তিনি কথা দিয়া আজ তা' রাখিতে পারিতেছেন না তা তার কল্পনারও বাহিরে।

নীরবে সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল; পার্শী সাহেব বোধ করি একবার ইতস্ততঃ করিল, তার পরেই সলিলকে লক্ষ্য করিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "মাপ করবেন, আপনার নামই কি সলিল বাবু?"

"আজ্ঞে হাঁ", বিস্মিত সলিল জিজ্ঞাসুভাবে তার মুখের পানে তাকাইল।

"ওঃ, আপনাকে আর আমাকেই তবে সঙ্গে নিয়ে মিষ্টার হুকা-কাশি ডায়মণ্ড্ করপোরেশনে যাবেন, কথা ছিল।"

"কোথায় যাবেন?" অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত সলিল প্রশ্ন করিল।

"ডায়মণ্ড্ করপোরেশনে। কেন, ও জায়গাটার নাম এর আগে আপনি আর শোনেন নি নাকি?"

"এই আপনার কাছেই প্রথম শুন্‌ছি।"

"বাঃ, মিষ্টার হুকা-কাশি যে বল্‌লেন সেখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার বিশেষ জানাশোনা আছে! মিষ্টার এ—এ—কি তো যেন নামটা?"

"কি করে বলি বলুন, জায়গাটার নামই জানি না শুন্‌ছেন তা ম্যানেজারের নাম জান্‌ব কি করে?"

"ওঃ; কেন তবে অমন কথা হুকা-কাশি বল্লেন তিনিই জানেন। কিন্তু কি আন্‌পাংচুয়াল্ লোক বলুন দেখি! পৌনে দু'টোয় এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্ করে........বেয়ারা! এ বেয়ারা!"

নাঃ লোকটা জ্বালাইল দেখিতেছি, গলার আওয়াজে মাথার পোকা বাহির হইয়া আসিতে চায়! সলিল অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিল। তার এ বিরক্তির ভাবটুকু কিন্তু পার্শী সওদাগরের নজর এড়াইল না, সলিলের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "সত্যিই আমার গলার আওয়াজটা ভারী কন্‌কনে, কিন্তু আপনি কি সত্যিই বল্‌তে চান, সলিল বাবু, যে এই রকম গলার আওয়াজ বাস্তবিকই আর কখনও আপনি শোনেন নি! সত্যিই কি এ কথা বল্‌তে চান?" তার চোখের কোণে একটু ধূর্ত্ত চাহনি আর ঠোঁটের পাশ দিয়া একটু বাঁকা হাসি যেন খেলিয়া গেল।

এক মুহূর্ত্ত সলিল যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না কিন্তু ঠিক তার পরক্ষণেই সমস্ত শরীর যেন তার কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত মুখে কে যেন তার কালির ছোপ বুলাইয়া দিল। (ক্রমশঃ)

ভাবীসাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

নূতন বছর

(শ্রীরামপ্রসাদ সিং)

১

কালের ভেরী বাজিয়ে গেল
বর্ষ-বিদায় গান,
ধরার আলোয় নতুন সুরে
জাগ্‌ল নব প্রাণ।
ঝরা পাতার বিদায়-গানে,
মৌমাছিদের উদাস তানে
বেদন জাগে সকল প্রাণে
এ কার অবসান!

২

নতুন বছর এগিয়ে এলো
নিত্য কালের রথে;
পুরাতনের সকল স্মৃতি
রইল পড়ে পথে।

এ জীবনের চলার মাঝে
সকাল সাঁঝের শতেক কাজে
অসীম কালের চরণ বাজে
ধরার আঙিনাতে।

৩

নতুন বছর আন্‌ল বয়ে
নতুন আশার আলো,
স্রোতের বুকে এই যে ভাসা—
এই আমাদের ভালো।
ছয়টি ঋতুর মিলন-সুরে
সে গান জাগে হৃদয়-পুরে,
নিত্য কালের বর্ষভোরে
সে পথ পানে চলো।

সন্দেশ

এই সংখ্যায় রামধনুর একশত সংখ্যা পূর্ণ হইল। রামধনুর জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা রামধনুর পাঠক-পাঠিকা ও বন্ধুবান্ধবদিগকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

* * *

পৃথিবীর কোন্ মহাদেশ আকারে কত বড় এবং কোথায় কত লোক আছে জান কি? নীচে দেখ—

এশিয়া—১৭০০০, ০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১০১৩০০০০০০। আফ্রিকা—১১৫০০০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৪৩০০০০০০।

ইয়োরোপ—৩৭৫০০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪৭৫০০০০০০ উত্তর আমেরিকা—৮০০০০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৪৬০০০০০০। দক্ষিণ আমেরিকা—৬৮০০০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৬৪০০০০০০। ইহা ছাড়া মেরুর কাছাকাছি দেশগুলিও আছে।

* * *

ভারতবর্ষের বড় বড় রেল লাইন্‌গুলির নাম দেখ—

এন্-ডব্লিউ-আর, ই-আই-আর, জি-আই-পি-আর; বি-বি-সি-আই-আর, এম্-এস্-এম্-আর, বি-এন্-আর, বি-এন্-ডব্লিউ-আর, এস্-আই-আর, বার্ম্মা-আর, ই-বি-আর, এ-বি-আর, নিজাম্‌স্-জি-এস্-আর।

* * *

আমরা খাবারের আস্বাদ নিই জিভ দিয়া, কোন কোন পোকা-মাকড় নেয় শুঁড় দিয়া, কিন্তু প্রজাপতি আস্বাদ নেয় পা দিয়া। অদ্ভুত নয় কি?

* * *

আমেরিকার যোসেফ লং নামে এক ভদ্রলোক বাজী রাখিয়া তিন দিন ধরিয়া অনবরত সিগারেট্ ফুঁকিয়াছেন। এ তিন দিন তিনি অন্য কিছুই খান নাই, অন্য কোন কাজই করেন নাই। আজকাল নিত্য নূতন "এন্‌ডিওরেন্সের" হুজুগ উঠিয়াছে—এও একটা নূতন ধরণের এন্‌ডিওরেন্স।

* * *

আকাশের ধূমকেতু এক-একটা লক্ষ লক্ষ মাইল লম্বা হয়—কিন্তু সেগুলি এত পাৎলা জিনিষ দিয়া তৈরী যে তেমন ভাবে ঘন করিতে পারিলে একটা ছোট ক্যাশবাক্সের মধ্যেই তাদের এক-একটাকে পূরিয়া রাখা যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

প্রথমে ৮ সেরী হাঁড়ি থেকে ৩ সেরী ঘটি ভর্ত্তি ক'রে দুধ ঢাল্‌তে হবে। তার পর সে দুধ ৫ সেরী ঘটিতে ঢালতে হবে। ৫ সেরী ঘটিতে এখন ৩ সের দুধ রইল। আবার ৮ সেরী হাঁড়ি থেকে ৩ সেরী ঘটিতে দুধ ঢালতে হবে। তার পর এই ৩ সের দুধ থেকে দুধ নিয়ে ৫ সেরী ঘটি ভর্ত্তি করতে হবে। ৩ সেরী ঘটিতে এখন ১ সের দুধ রইল, কারণ ৫ সেরী ঘটিতে আর ২ সেরের বেশী দুধ ধরবে না। ৫ সেরীর ঘটির সমস্ত দুধ এবার ৮ সেরী হাঁড়িতে ঢেলে ফেলতে হবে; তার পর সেই ৫ সেরী ঘটিতে ৩ সেরী ঘটির দুধটা ঢালতে হবে—অর্থাৎ ৫ সেরী ঘটিতে ১ সের দুধ রইল। এবার ৩ সেরী ঘটি ভর্ত্তি করে হাঁড়ি থেকে দুধ ঢাললেই ৩ সের দুধ পাওয়া যাবে। এই দুধ ৫ সেরী ঘটিতে ঢাললেই তার মধ্যে ৪ সের দুধ হ'ল। বাকী ৪ সেরও গয়লার হাঁড়িতেই থাকবে।

উত্তরদাতাদের নাম

দিলীপকুমার ও ধীরাজকুমার ব্যানার্জ্জি; সুধীর দা', ছোট কাকীমা (জলপাইগুড়ি); তড়িৎ, সত্যেন, মঞ্জু প্রভৃতি (ভবানীপুর); বটু দা', যামিনী, পাঁচু (নওয়াপাড়া); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ); রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর); কালিপদ কাঞ্জিলাল (নীলফামারি); সাণ্ডেল ব্রাদার্স্ (কলিকাতা); রামপ্রসাদ সিং (বেহালা); তরুণকুমার রায় (ময়মনসিংহ); প্রবোধেন্দু, অমলেন্দু, নির্ম্মলেন্দু প্রভৃতি (বর্দ্ধমান); বিমলকুমার চক্রবর্ত্তী, দীপ্তি (মালদহ); গুণেন রায়, রণেন রায় (ভবানীপুর); সুমুখনাথ মিত্র, মা, ছোটমামা প্রভৃতি (দিনাজপুর); সুপ্রভা, অমল, প্রতিভা (কানপুর); গীতা ও পরিমল (যশোহর); রামেন্দু দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); ছায়া দেবী (রতনপুর); নিখিল চৌধুরী (জলপাইগুড়ি); সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা); মতিলাল বসাক (কলিকাতা); গৌরী রায়, পিণ্টু, মোহন (চাইবাসা); প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর); মৃণীন্দ্রকুমার চৌধুরী (হবিগঞ্জ); অজিত ও কল্যাণকুমার চট্টোপাধ্যায় (কাঁকে—রাঁচী); সাধনা, কাকীমা, ছোড়দি (যশোহর); সাটীরপাড়া স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ; সুনীলকুমার গোস্বামী (দানাপুর); পুষ্পলতা, বনলতা, প্রীতিলতা গোস্বামী প্রভৃতি (বেতিয়া); সবিতা ও তপন (রেঙ্গুন); ক্ষেত্রগোপাল ধর (জামতারা); আবদুল মতিন খাঁ (শিকারপুর); বাণী, কিকি, চেপু প্রভৃতি (চাইবাসা); নির্ম্মল, বিপদ্‌ভঞ্জন

(হবিগঞ্জ) ; অরুণা সেন (কলিকাতা) ; রুবী চাটার্জ্জী (ভাগলপুর) ; সুরমা, প্রতিমা, বেলা প্রভৃতি (পাঁতিহাল) : নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিকাতা) ; রবীন্দ্রনাথ দে (মধুবনী) ; অসিতকুমার সরকার (পুরুলিয়া) ; ব্রতেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) ; ডলি, তুলতুল, অন্তকুণা (ভবানীপুর) ; শিমুলিয়া স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (দেবীসহর) ; শুভেন্দু, শান্তনু প্রভৃতি ; কুমারী যূথিকা (পাটনা) ; প্রতিভা দেবী (মঙ্গলদহ) ; অক্ষয় বিশ্বাস, শান্তি মিত্র (কলিকাতা) ; অমল, মান্তা, ঊষা প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা) ; বুলি, ময়না, শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি (জামসেদপুর) ; অখিলকুমার বিশ্বাস (শিকারপুর) ; প্রশান্ত, প্রতাপ, শুভ্রা (সীতারামপুর) ; প্রসিত ও প্রদ্যোতকুমার বাগ্‌ছী (বালুভরা) ; ষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত (শালকিয়া) ; মোহাম্মদ মোজাম্মল হোসেন (রৌমারি) ; জ্যোতির্ম্ময়, চিনু, খোকন প্রভৃতি (বাঁকীপুর) ; বিমলা দে ও শতদল দে (ডেহ্‌রি অন্‌ শোন) ; রঘুনাথ দাশগুপ্ত (ভাঙ্গা) ; জগদীশচরণ বক্সী (কিরকেন্দ-কোলিয়ারি) ; ছবিরাণী রায় (নিউদিল্লী) ; প্রতীপকুমার সরকার (মেদিনীপুর) ; প্রতিমা চৌধুরী (পাটনা) ; জ্যোৎস্না সেন (কলিকাতা) ; কামাখ্যাপ্রসাদ খাঁ ও দেবীদাস খাঁ (শিলং) ; দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডস্থ কর্পোরেশন্ স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ (কলিকাতা) ; দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা) ; খোকা, বোচা, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি (ঢাকা) ; লীলা দাস (কুমিল্লা) ; সবিতা রায় (বিটঘর) ; ধীরেন্দ্রনাথ কর (দক্ষিণ নরোত্তমপুর) ; কালিপদ, তৃপ্তি, দিলীপ (আসানসোল) ; জ্যোতিঃকণা বসু (ঢাকা) ; বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা) ; মনোতোষ রায় (ভবানীপুর) ; রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (বার্থী, বরিশাল) ।

নূতন ধাঁধা

আমি নেহাৎ সামান্য লোক নই। দেখ্‌তে আমি সাধারণ মানুষ কিন্তু আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক ভীষণ দানব। তা ছাড়া আমার সঙ্গে এই যে দেখ্‌ছ বিষ-ভরা অস্ত্র এও বড় সামান্য নয়—আর মনে রেখ, এ অস্ত্র সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে।

তবে আমি কারও অনিষ্ট করি না, কারণ আমার বাবা তা করতে আমায় নিষেধ করেছেন। আমার বাবাকে তোমরা বোধ হয় চেন! পৃথিবীর প্রায় সকলেই তাঁকে চেনে এবং সম্মান করে। আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ কি?

প্রসাধন

৯ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ { ৫ম সংখ্যা

মর্ণিং ইস্কুল

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

মর্ণিং ইস্কুল হাসি-ভরা মুখটী—
ফুল-বনে যেতে তার দেখি নব রূপটী।
তার দেশ হ'তে হাওয়া ভেসে আসে মন্দ,
রঙনের ডালে তাই জাগে রাঙা ছন্দ।
তার গান শুনে আজি সারা ধরা ঝলমল,
কোকিলের সাথে তাই ভোম্‌রারা চঞ্চল।
মর্ণিং ইস্কুল এলো নব হর্ষে—
ভোরে আজ সারা ধরা মধু যেন বর্ষে।

মর্ণিং ইস্কুল—করবীর বোঁটাতে—
ছুটির গানটী গেয়ে পারে ফুল ফোটাতে।
দুপুরের বনে আলোছায়া-নাচা খেলাটী—
বিকালের সোনা-ঝরা ঝিকিমিকি মেলাটী—
সন্ধ্যায় চাঁদ-ওঠা তাল-বনে মাঠে দূর—
চাঁপা-বনে পাখী-ডাকা ভালো লাগে তার সুর।
মর্ণিং ইস্কুল এলো মন-ভোলানো,
কনক চাঁপার ফুল দুল্ দুল্ দোলানো।

আমি হ'তে চাই ভাই, তার চিরসঙ্গী,
ভালোবাসা-ভরা তার সুমধুর ভঙ্গী।
ফুল-নদীকূলে তার তুলতুলে দেশটী—
সেখানে সে থাকে একা চিরশ্যাম বেশটী।
আকাশের পথ বেয়ে আসে নব ছন্দে—
মাতায় ভোরের হাওয়া নেবু ফুল-গন্ধে।
ঠোঁটে তার হাসি দোলে, চোখে নব দৃষ্টি,
ইস্কুলে যাওয়া সে যে করে দেয় মিষ্টি।

আছে শুধু ভাব সেথা, আড়ি করা নাই রে—
বাঁশী বাজে তার দেশে শুনি শুধু তাই রে।
কত খেলা জানে সে যে নাই তার ঠিকানা,
হাতছানি দিয়ে ডাকে কোন্ দেশে অজানা।
ও কি ভাই নীল পাখী, নীল দেশে ঘর তার,
ঘর-ভোলা মন-দোলা খেলাদের সর্দ্দার ?
দু'হাতে এনেছে ভরে কালোজাম, জামরুল,
দু'কানে নিয়েছে গুঁজে সোনামাখা চাঁপা ফুল।

ছুটি তার ছোট ভাই, তারে ভাল লাগ্‌লো,
তার সাড়া পেয়ে আজ মন মোর জাগ্‌লো।
আশ্বিনে কাশবনে তার দেখা পেয়েছি,
তার সাথে শিউলির বনে গান গেয়েছি।
কৃষ্ণচূড়ায় আজ সে কি চোখ মেল্‌ছে—
আলোছায়া সাথে ভোরে লুকোচুরি খেল্‌ছে ?
তার সাথে ভাব হ'লে গান গাবে বুল্‌বুল,
রূপকথা নিয়ে এলো মর্ণিং ইস্কুল।

"হঠাৎ—"

(শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্-সি)

সেদিন হঠাৎ মোটর চাপা পড়ে খুকুর টেবি কুকুরটার একটা ঠ্যাং ভেঙ্গেছে; খুকু ত' কেঁদেই খুন। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে কতকটা ঠাণ্ডা করা গেছে।

এ রকম কাণ্ড ত' আজকাল লেগেই আছে। এই ত' সেবার ট্রেনে কলিশন হওয়ায় অমির কাকা মরেই গেলেন। কেন বাপু, ট্রেনে কত লোকই ত' চাপে আর ক'টা লোকই বা মরে ? এর মধ্যে বেছে বেছে অমির কাকাই বা মরতে গেলেন কেন ? সেই ট্রেনেই ছিলেন আমাদের রমেশ বাবু,—কিন্তু কই তার গায়ে আঁচড়টীও দেখা যায় নি। এ সব দেখে-শুনেই আমাদের বলতে হয় যে 'হঠাৎ' একটা কলিশন হয়ে অমির কাকা মারা গেছেন—মানে ও রকম হওয়া নিতান্ত বে-আইনী, কিন্তু হঠাৎ সেটা ঘটে গেছে।

এগুলো ত' নেহাৎ ছোটখাট ব্যাপার তাই লোকে এগুলো দেখে আজকাল আর বড় একটা আশ্চর্য্য হয় না। কিন্তু আমি যদি বলি যে আমাদের চারদিকে যা কিছু জিনিষ দেখ্‌ছ—'চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা' থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃথিবী, এমন কি আমরা পর্য্যন্ত—এদের সকলেরই সৃষ্টি হয়েছে পর পর কতকগুলি দুর্ঘটনা

হয়ে, তবে তোমাদের তখনকার হাঁ গুলির ভেতর দিয়ে নিশ্চয় আস্ত আস্ত টেনিস্ বল্ ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।

বিশ্বাস কর আর নাই কর, পণ্ডিত লোকেরা আজকাল এ রকম গল্পই করে বেড়াচ্ছেন। সেকালের মুনি-ঋষিদের মত আজকালকার পণ্ডিতেরাও সৃষ্টির কথা অনেক সময়েই ভাবেন। তাঁরা ভেবে যা ঠিক করেছেন সে ভারী অদ্ভুত। প্রথমে নাকি একেবারে কিছুই ছিল না, ছিল একটা বিরাট শূন্য—যা কত বড় তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না—আর ছিল গভীর অন্ধকার। শূন্য বল্‌লাম বটে কিন্তু সেই শূন্যের মধ্যেই এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মাল-মশলা লুকান ছিল। এই মাল-মশলাটা আর কিছুই নয়, শুধু ইলেক্‌ট্রন আর প্রোটন। ইলেক্‌ট্রন আর প্রোটন কি মনে আছে ত'? না থাকে ত' ১৩৪১ সালের ভাদ্রের রামধনুটা একবার দেখে নিও। এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল যে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে পরমাণু বা এটম্—কিন্তু নীল বোর (Niels Bohr) এবং আরও অনেক বড় বড় পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে আমাদের এ বিশ্বাস ভুল। পরমাণু ভাঙ্গ্‌লে আমরা ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন পাই। সীসা, সোনা এবং অন্যান্য সমস্ত মৌলিক পদার্থই গোড়ায় এক। এদের সকলেরই পরমাণু ঐ ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন দিয়ে তৈরী—শুধু কতগুলো ইলেক্‌ট্রন বা প্রোটন দিয়ে ঐ পরমাণু তৈরী তার উপর নির্ভর করে পদার্থটা সোনা কি সীসা। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনগুলি থাকে এবং তার চারদিকে ইলেক্‌ট্রনগুলি, সূর্য্যের চারদিকে পৃথিবী যে রকম ভাবে ঘোরে সেই রকম ভাবে, ঘুরতে থাকে। একটী হাইড্রোজেন-পরমাণুতে একটী প্রোটন-কেন্দ্র আছে এবং তার

নীল বোর

চারদিকে একটী ইলেক্‌ট্রন ঘুরছে। সোনার পরমাণুতে ৭৯টা ইলেক্‌ট্রন ঘুরছে, পারাতে ৮০টা। তা হ'লে দেখ্‌ছ, সমস্ত পরমাণুই মোটামুটী ফাঁপা। এত ফাঁপা যে একটা আস্ত মানুষের শরীরের সমস্ত পরমাণুগুলো একত্র করে তাকে পিটিয়ে যদি ফাঁকা জায়গাগুলি ভরাট করে দেওয়া যায় তবে সেগুলো—অর্থাৎ ঐ আস্ত মানুষটা—একটা মটরের দানার চেয়েও ছোট আকার নেবে। এই ইলেক্‌ট্রন আর প্রোটন যে আকারে কত ছোট তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এই রকম একটা পরমাণুও সৃষ্টির প্রথমে ছিল না। অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত পরমাণু আছে তার প্রত্যেকটীর ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন চারদিকে ছড়িয়ে ছিল—তখনও তারা একত্র হয়ে কোথাও পরমাণুর সৃষ্টি করে নি। এই ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনগুলি পরস্পর থেকে বহু দূরে দূরে (হয়ত বহু কোটী মাইল দূরে) সেই বিরাট শূন্যে ছড়িয়ে ছিল কাজেই প্রকৃত পক্ষে এদের অস্তিত্ব কোন রকমেই বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু ইলেক্‌ট্রন প্রোটন যদি আল্‌গা আল্‌গা ভাবে থাকে তবে তারা কখনও স্থির থাকে না—সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুট্‌তে থাকে। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে যে ইলেক্‌ট্রনে বিয়োগাত্মক এবং প্রোটনে যোগাত্মক বিদ্যুৎ আছে। এর ফলে এরা কাছাকাছি এলেই একটা আর একটাকে টেনে নেবে। তখনই একটা পরমাণুর সৃষ্টি হবে।

এখন ধর, একটা বিরাট শূন্যের মধ্যে অসংখ্য ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন বিরাট বেগে ছুটোছুটী করছে। এ রকম করতে করতে হঠাৎ হয়ত একটা প্রোটনের ঘাড়ের উপর একটা ইলেক্‌ট্রন চলে এল। এই আমাদের প্রথম 'দুর্ঘটনা'। এতে সৃষ্টি হ'ল একটা পরমাণু।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ? প্রত্যেক জিনিষ প্রত্যেক জিনিষকে টানে এবং এই টানের জোর নির্ভর করে সেই জিনিষের ওজনের উপর। একটা ঢিলের উপর পৃথিবীর টান খুব বেশী কেননা পৃথিবীটা ঢিলটা থেকে অনেক—অনেক বড়; তাই ঢিলটাকে যেদিকেই ছুঁড়ে মার না কেন সে আবার পৃথিবীর টানে মাটীর উপর এসে পড়বেই। এখন সেই বিরাট শূন্যের মধ্যে যখন একটা পরমাণুর সৃষ্টি হ'ল তখন সে নিশ্চয় অন্য সব কণার চেয়ে ওজনে ভারী।

হয়ে পড়্‌ল এবং আশ-পাশের ইলেক্‌ট্রন, প্রোটনকে টেনে নিল। সে যতই বড় হ'তে লাগ্‌ল ততই তার ক্ষমতা বাড়তে লাগ্‌ল এবং ক্রমে সে একটা বিরাট্ তারায় পরিণত হ'ল। এই রকম তারা অনেকগুলিই হয়েছিল কেননা প্রথমে ত' সেই বিরাট্ শূন্যের অনেক জায়গায়ই পরমাণু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল। তা হ'লে দেখ, কি রকম করে আমরা একটা বিরাট্ শূন্য থেকে সেই প্রথম যুগের 'চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা' পেলাম।

তার পর এই সমস্ত বিরাট আকারের তারাগুলির মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হ'তে থাকায় ক্রমে আমাদের বর্ত্তমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পেলাম এবং কেমন করে আর একটা দুর্ঘটনায় আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি হ'ল তা তোমরা পুরানো রামধনুতে পড়েছ। এই বিরাট শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা বিরাট তারা আর একটার প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়ে। তখন সুরু হয় একটা প্রকাণ্ড রকমের টানাটানি—টাগ্-অফ-ওয়ার—কে কাকে টেনে আটকিয়ে রাখতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত দুটোর কেউ অন্যকে হারাতে পারে না, তারা দু'দিকে পালিয়ে যায় কিন্তু এক টুক্‌রো অংশ একটা তারার গা থেকে ভেঙ্গে পড়ে। এই তারাটাই আমাদের সূর্য্য এবং এই ভাঙ্গা টুক্‌রোটা তখন তার চারদিকে ঘুরতে থাকে, তাই থেকেই আমাদের পৃথিবী ইত্যাদি অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এই রকম করেই নাকি আমাদের এই সৌরজগতের সৃষ্টি। পৃথিবীর যখন প্রথম সৃষ্টি হ'ল তখন সে ছিল ঐ সূর্য্যেরই মত গরম। সে গরমে এ পৃথিবীতে জলমাটী যা কিছু দেখতে পাও সবই তরল বা বায়বীয় অবস্থায় ছিল। ক্রমে ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে আমাদের প্রথম মাটী ও প্রথম সমুদ্রের সৃষ্টি হ'ল।

এই সময় হঠাৎ বোধ হয় আর একটা 'দুর্ঘটনা' ঘটেছিল, কিন্তু কি করে সে দুর্ঘটনাটা ঘট্‌ল তা কেউ বলতে পারে না—তবে খুবই সম্ভব সেটা ঘটেছিল। যে কারণেই হোক এই সময়ে কতকগুলি মৌলিক পদার্থের (element) রাসায়নিক সংযোগে একটা অদ্ভুত জিনিষ সৃষ্টি হ'ল যা এর আগে দেখা যায় নি। এই জিনিষটাই হ'ল আমাদের সেই "প্রথম সৃষ্ট জীবন-পদার্থ" বা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (protoplasm)। একজন পণ্ডিত বলেছেন যে চুম্বকের গুণ যেমন লোহাকে টানা সেই রকম এই প্রোটোপ্লাজ্‌মের গুণ হচ্ছে জীবনীশক্তি। চুম্বক কি দিয়ে তৈরী

তা আমরা জানি এবং কেন সে লোহাকে টানে তাও আমরা জানি; তাই আমরা চুম্বক তৈরী করতে পারি। কিন্তু প্রোটোপ্লাজ্‌মের কেন জীবনীশক্তি আছে তা আমরা এখনও জানি না, এমন কি প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে কত পরিমাণে কি কি মৌলিক পদার্থ আছে তাও আমরা ঠিক করতে পারি না; তাই আমরা এখনও প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ তৈরী করতে পারি নি।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ যখন আমরা তৈরী করতে পার্‌ব তখন ডাক্তারী শাস্ত্রটা হয়ে যাবে জলের মত সোজা—মানুষ আর মরবে না—যখনই সে বুড়ো হয়ে যাবে অমনি তার পুরানো প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ বদলিয়ে নতুন প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু মনে ক'র না প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ তৈরী করলেই অমনি ল্যাবরেটরী থেকে মানুষ তৈরী হতে থাকবে। মনে রেখ, প্রথম প্রোটোপ্লাজ্‌মের সৃষ্টি হয়েছিল কোটী কোটী বছর আগে—আর তা থেকে মানুষ সৃষ্টি হ'তে এত দিন লেগেছে। কে জানে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ তৈরী হ'লে এই কয়েক কোটী বছরের কাজও তখন কয়েক মিনিটে শেষ করে দেওয়া যাবে কিনা!

মাছ থেকে আরম্ভ ক'রে একটু একটু বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে কেমন করে মানুষে এসে ঠেকেছে ছবিতে তাই দেখান হয়েছে।

তার পরে এই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ থেকে কি করে ক্রমে ক্রমে আজকালকার সব জীবজন্তুর সৃষ্টি হ'ল তাও তোমরা রামধনুতে পড়েছ। তা হ'লে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কতকগুলি 'দুর্ঘটনায়' এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল, আর একটা

'দুর্ঘটনায়' এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, আর শেষ দুর্ঘটনায় সৃষ্টি হয়েছে সব জীবজন্তু এবং আমরা। তা হ'লে আমরা নেহাৎই 'হঠাৎ' এ পৃথিবীতে এসে পড়েছি, কি বল?

বাড়ী-বদল

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

বাড়ীটা বদল না করলেই আর চলছে না। অসুখ লেগেই রয়েছে। বড়-বৌদি তো হার্টের ধড়ফড়ানিতে এখন-তখন। ছোট ভাইটার জ্বরের কামাই নেই। তা ছাড়া, বাড়ী-শুদ্ধ সকলের বেরি-বেরি—খোট্টা চাকরটার শুধু হয় নি, কি হ'লেও বোঝা যায় নি। বছরখানেক ধ'রে এই চলেছে। শেষটায় ডাক্তারেরা বললেন: 'বাড়ীটারই কোনো দোষ আছে নিশ্চয়ই, বাড়ী-বদল করুন।'

কথাটা শুনে আমাদের সকলেরই এমন হৃৎকম্প উপস্থিত হ'লো যে ভাবলুম বেরি-বেরি বুঝি জাঁকিয়ে বসলো এবারে। এ পর্য্যন্ত তিনবার বাড়ী-বদল করেছি, আরো একবার করতে হবে, এবং যদি বেরি-বেরি সত্ত্বেও আপাততঃ বেঁচে থাকি, মরবার আগে আরো বহুবার করতে হবে নিশ্চয়ই। ভেবে দেখছি, সুযোগ পেলে রাজ্য-জয় করা অসম্ভব ছিলো না আমাদের পক্ষে। কেননা, এই কল্‌কাতায় বাড়ী খুঁজে বার করতে যে সব গুণ না হ'লেই নয়, তা হচ্ছে: (১) সাহস (২) শক্তি (৩) অপরিমিত ধৈর্য্য (৪) কিছুতেই ঘাবড়ে না যাওয়া, কিছুতেই বিরক্ত না হওয়া ইত্যাদি। তোমরা ইতিহাসে প'ড়ে দেখো, যাঁরা রাজ্য-জয় ও সাম্রাজ্য-স্থাপন করেছেন, তাঁরা ঠিক ঐ গুণগুলোর জন্যই প্রসিদ্ধ।

যা-ই হোক্, বাড়ী-বদল যখন করতেই হবে তখন পকেটে কিছু ছোলাভাজা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া যাক্। কিন্তু কী ক'রে বেরুই? এদিকে আপিসের তাড়া রয়েছে, রবিবার ছাড়া সময় হয় না। একটি পারিবারিক মিটিং-এ ঠিক করা

গেলো যে আমরা যে যখনই একটু সময় পাবো, তখনই ধাঁ ক'রে দুটো-একটা বাড়ী দেখে আসবো। আর এদিকে আত্মীয় ও বন্ধু, আত্মীয়ের আত্মীয় ও বন্ধুর বন্ধু সকলকেই বলা রইলো বাড়ীর খোঁজ যেন আমাদের দেয়।

খোঁজ আসতে লাগলো বিস্তর, খোঁজাখুঁজিও কম চললো না। কিন্তু দেখা গেলো, কলকাতায় সব রকম বাড়ীই তৈরী হয়েছে, শুধু আমাদের থাকবার মত কোনো বাড়ীই তৈরী হয় নি। হয় ভাড়া বেশী, নয় বাড়ী ছোট। হয় বাস্ থেকে বহু দূর, নয় অন্ধকূপ। আর নয় তো—অন্য সব রকম সুবিধে যদি জুটলো, হয় তো বাথ্‌রুম্ই নেই। এমনি ক'রে পুরো তিনটি মাস কেটে গেলো, বৌদি হতাশ হ'য়ে বাপের বাড়ী চ'লে গেলেন, আর হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরিতে আমাদের সকলেরই হার্টের প্যালপিটেশন বেড়ে গেলো।

শেষটায়, যখন বাড়ী-শুদ্ধ লোকের পাগল হ'তে বাকি আছে, তখন আমি এক অখ্যাত গলির মধ্যে এক বাড়ী খুঁজে বার করলুম। মন্দ নয় বাড়ীটি। মনোহরণ কিছু নয়, কাজ চ'লে যায়। যা-ই হোক্, আপাততঃ আমাদের এমনই অবস্থা যে ও-বাড়ীর বিষাক্ত হাওয়া ছেড়ে বেরোতে পারলে বাঁচি।

বাড়ীওয়ালার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে চাইলুম। মস্ত কালো একজন বেরিয়ে এলেন—ঝাঁটার মত গোঁফ, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখ প্রায় দেখাই যায় না। যাক্ গে, বাড়ীওয়ালার চেহারা দেখে ভড়কালে চলে? বিনীত ভাবে নমস্কার ক'রে বললুম—'আজ্ঞে এই বাড়ী আপনি ভাড়া দেবেন?'

ভদ্রলোক স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—'মশায়ের কি করা হয়?'

—'আজ্ঞে আমি হাইকোর্টে—'

—'মাপ করবেন, উকিলকে বাড়ি ভাড়া দিতে পারবো না।' ব'লে ভদ্রলোক আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করেন আর কি!

আমি তাড়াতাড়ি দু' হাতে দরজা ঠেলে বললুম: 'আরে শুনুন মশাই, শুনুন, আমি উকিল নই, আমি হাইকোর্টে চাকরি করি।'

ভদ্রলোক একটুখানি দরজা ফাঁক ক'রে ঠিক গোঁফের ঝাঁটাটুকু আমার দিকে

বাড়িয়ে দিলেন। খানিক পরে একটা হেঁড়ে শব্দ হ'লো : 'না, মশাই, পারবো না।' তার পর দরজা বন্ধ।

হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু পরে চিন্তা ক'রে অবশ্য বুঝতে পারলুম যে ভালোই হ'লো। এমন চামার যে বাড়ীওয়ালা যে আমার মুখের কথাটা বিশ্বাস করলে না, তার বাড়ীতে উঠে কি এক মাসও টিঁকতে পারতাম ?

কত ভালো যে হ'লো সেটা বুঝতে পারলুম দু'দিন পরে যখন হাজরা রোডে একটি বাড়ীর খোঁজ পাওয়া গেলো। চুপে-চুপে বলছি, বাড়ীটি আমাদের পক্ষে একেবারে আইডিয়েল। একতলা থেকে তেতলায় গুটি আষ্টেক ঘর, বারান্দা, ছাদ, চার-চারটে বা্ রু—ওঃ, স্প্লেন্‌ডিড্। আর বাড়ীওয়ালা—পাশেই থাকেন তিনি—অতি অমায়িক ভালোমানুষ, বয়স ষাটের কাছাকাছি, সারা জীবন বহু অর্থ সঞ্চয় ক'রে এবার ধর্ম্মে-কর্ম্মে মন দিয়েছেন। আগাম ভাড়া দিয়ে যেদিন সব ঠিক ক'রে এলুম, সেদিন আমাদের মনে যে আনন্দ হ'লো, আমেরিকা আবিষ্কার ক'রে কলম্বাসের মনে সেই রকম আনন্দই বোধ হয় হয়েছিলো। তার পর এক রবিবার বাড়ী-বদলের পালা। হাঙ্গামা কি কম! সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত এলো জিনিসপত্র—লরিতে, ঠেলাগাড়ীতে রিক্‌শাতে। বাড়ীওয়ালা বুড়ো শ্রীগোপাল বাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখলেন—কিসে আমাদের একটু সুবিধে হবে, তাই নিয়ে তিনি ব্যস্ত।

নতুন বাড়ীতে বিছিয়ে বসতে-বসতেই দিন সাতেক গেলো। তার পর আমাদের মনে যে শান্তি আর শরীরে যে আরাম এলো তা বলবার নয়। বাড়ীটি সকলেরই চমৎকার লাগছে, শরীরও যেন ভালো হ'য়ে উঠেছে সকলের। বৌদি ফিরে এলেন পিত্রালয় থেকে। আর সাত বছরের মধ্যে যেন বাড়ী-বদল করতে না হয়, রোজ সকালে উঠে একবার আর রাত্রে শুতে যাবার সময়ে আর একবার এই প্রার্থনা করি।

বাড়ী-বদলেই যে হাওয়া-বদল হয়, এবং হাওয়া বদলালেই যে বেরি-বেরি সারে, এই নিয়ে এক দিন আমরা সকলে মিলে পরমোৎসাহে আলোচনা করছি, এমন সময় ডাকে দু'খানা চিঠি এলো। একখানা গম্ভীর চেহারার টাইপ-করা

রেজিষ্টার্ড্ খাম, আর একখানা অপরিচিত ও সেকেলে হস্তাক্ষরের লেফাফা। চিঠি দু'খানা খুলে ও পড়ে আমাদের সকলের মুখ নিমেষে ব্লটিং কাগজের মত ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো।

হাতের লেখা চিঠিখানা বাড়ীওয়ালা শ্রীগোপাল বাবুর। তিনি অনেক দুঃখ ক'রে জানিয়েছেন যে তাঁর পক্ষে এ-বাড়ী ভাড়ায় খাটানো আর সম্ভব নয়, সুতরাং আমরা যদি দয়া ক'রে এক মাসের মধ্যে অন্য বাড়ী খুঁজে নিই তা হ'লে তিনি বিশেষ উপকৃত হন।

রেজিষ্ট্রি খামের মধ্যে শ্রীগোপাল বাবুরই উকিলের চিঠি; তিনি তাঁর মক্কেলের হ'য়ে লিখেছেন যে আজ থেকে এক মাসের নোটিশ দেয়া হচ্ছে…

আকাশ থেকে পড়লুম। এ আবার কি পরিহাস অদৃষ্টের! তখন আপিসের সময়—দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে যার মনে নেয়ে-খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সারাদিন মনের এমন অবস্থা যে চোখ দিয়ে জল এই পড়ে কি সেই পড়ে।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরেই বড়-দা' আর আমি দু'জনে গেলুম শ্রীগোপাল বাবুর সমীপে। বুড়ো ভদ্রলোক আমাদের দেখেই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন: 'এই যে আসুন বিমলবাবু, আসুন কমলবাবু। আসুন, আসুন। বসুন। দয়া ক'রে পায়ের ধূলো দিলেন এই অভাজনের গৃহে।'

শ্রীগোপাল বাবুর এই বৈষ্ণবোচিত বিনয় মোটে আমাদের ভালো লাগলো না।

বড়-দা' বললেন—'আপনি দুটা চিঠি পাঠিয়েছেন—'

আমি তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললুম—'আপনার মনে যদি এই ছিলো—'

বড়-দা' বললেন—'কেন, আমরা কি ভাড়া দেবো না?'

আমি বললুম—'এ-রকম ভাড়াটে এনেই তুলে দেবার রাইট্ই নেই আপনার।'

এতক্ষণে একটু ফাঁক পেয়ে শ্রীগোপাল বাবু বললেন: 'আহা, একটু বসুন না।'

আমরা উপবেশন ক'রে বললুম—'আপনি এ-রকম ব্যবহার করবেন জানলে—'

শ্রীগোপাল বাবু বললেন: 'দেখুন, আমার এক আত্মীয় পীড়িত হ'য়ে চিকিৎসার জন্য কল্‌কাতায় আসছেন—তাঁর জন্য একটা ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। আপনাদের কষ্ট দিতে হ'লো ব'লে কত যে দুঃখিত আমি—'

আমি চটে গিয়ে বললুম: 'দুঃখিত-টুঃখিত রেখে দিন—আসল ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

শ্রীগোপাল বাবু অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। আমি আবার বললুম—'আত্মীয়-টাত্মীয় কোনো কথা নয়, সে তো বুঝতেই পারছি। আসল ব্যাপারটা কি বলুন না?'

শ্রীগোপাল বাবু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন: 'দেখুন—ইয়ে—আসল কথাটা তা হ'লে বলি। মানে হ'লো গিয়ে—এই আপনাদের জিনিষপত্র তো কম নয়!'

বড়-দা' সরল ভাবে বললেন—'তা সংসার পেতে বসবাস করতে গেলে জিনিষ-পত্র তো কিছু লাগেই।'

শ্রীগোপাল বাবু বলতে লাগলেন: 'আমি সেদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম—বাস্‌রে, খাট, টেবিল, চেয়ার, আলমারি কত কী—গাড়ীর পর গাড়ী আসছেই। সবগুলো নিয়ে ঐ বাড়ীতেই তুলেছেন তো?'

আমি বললুম—'বাড়ীতে তুলবো না তো কি রাস্তায় ফেলে দেবো?'

'হ্যাঁ, সে-কথাই বলছি। দেখুন, অনেক সখ করে'ই বাড়ীগুলো করে-ছিলুম—আপনাদের আশীর্ব্বাদে অবস্থা আমার এমন নয় যে ভাড়া না-পেলেই চলে না। আপনাদের অত জিনিষ—আমার বাড়ী যদি ভেঙ্গে পড়ে তো কী উপায় হবে!'

কথাটা শুনে যদি একেবারে বজ্রাহত হ'য়ে না যেতুম, তাহ'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠতুম নিশ্চয়ই। বড়-দা' একবার ঢোঁক গিলে বললেন—'আপনি বলছেন কি! আপনার বাড়ী ভেঙ্গেই যাবে?'

—'বলা তো যায় না, মশাই, বলা তো যায় না। যা আপনাদের খাট-টেবিলের বহর! অনেক সখ ক'রে বাড়ীগুলো করেছিলুম—'

—'এর আগে যাঁরা ভাড়াটে ছিলেন তাঁদের বুঝি কোনো জিনিষই ছিলো না?'

—'ছিলো, মশাই, কিন্তু এত ছিলো না।'

—'আমাদেরও এমন কিছু নয়—আপনি নিজে গিয়ে দেখবেন চলুন। আচ্ছা, আমরা খাটে শোবো না? আয়নায় মুখ দেখবোঁ না? চেয়ারে বসবো না?' বড়-দা' রীতিমত যুক্তিতর্কসহকারে বোঝাতে প্রবৃত্ত হলেন। 'কোন্‌টা আপনি বেশী দেখলেন, বলুন? আমরা তো এ পর্য্যন্ত অনেক বাড়ীতেই থেকে এলুম, মশাই, কোনো বাড়ীই তো ভেঙে পড়ে নি।'

কিন্তু শ্রীগোপাল বাবু মাথা নেড়ে বললেন: 'সবই তো বুঝি, মশাই, কিন্তু এত জিনিষ! বলবো কি আপনাদের, কাল আমার সারা-রাত ভাবনায় ঘুম হয় নি।'

অগত্যা আমাদের এক ভাগনে—সে বিলেত-ফেরৎ মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, তাকে ডেকে পাঠালুম। সে এসে শ্রীগোপাল বাবুর মোকাবিলায় সমস্ত বাড়ী ঘুরে-ঘুরে দেখলে, টিপে দেখলে জিনিষগুলো, গম্ভীরমুখে মাপজোঁক নিলে, তার পর শ্রীগোপাল বাবুর দিকে তাকিয়ে বললে—'অল্ রাইট্।'

শ্রীগোপাল বাবু ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কেমন দেখলেন?'

—'কিছু ভয় নেই আপনার, সব ঠিক আছে।' ব'লে ইঞ্জিনিয়ার ভাগনে ঘষ-ঘষ ক'রে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিলে যে এ-বাড়ীতে যা জিনিষ আছে তার ফলে বাড়ীর একখানা ইট খ'সে পড়বারও আশঙ্কা নেই।

সেই থেকে সে বাড়ীতেই আছি, এবং বাড়ীও এখন পর্য্যন্ত ভেঙে পড়ে নি। তবে শ্রীগোপাল বাবুর এখনো মাঝে-মাঝে রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয় কিনা তা অবশ্য ঠিক বলতে পারি নে।

মাতৃভক্ত

(শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়)

মা গো, তোমার কি হয়েছে বলো ?
চোখ দু'টী আজ কেন তোমার কর্‌ছে ছলো-ছলো ?
জ্বালাচ্ছে কি খোকা পাজি,
বড্ড বেশী তোমায় আজি ?
মা না,—সে তো ঘুমিয়ে গেছে অনেকক্ষণই হোলো।
তবে কিসের তরে
নিরিবিলি একলাটী মা বসে মেজের 'পরে ?

মা গো, আজি সারা বিকেল ধ'রে
মলিন মুখে রইছ কেন ব'সে এমন ক'রে ?
আমিও ত' দুপুর বেলা
করি নি কো শুধুই খেলা ;
লিখেছি মা 'অজ' 'আম' খাতার পাতা ভ'রে।
মা গো তবে বল—
মনের মাঝে এমন কি আজ কষ্ট তোমার হ'ল ?

মা গো, তুমি দুঃখ কিসের কর ?
রাগ করে কি বাবা তোমায় বকেছে আজ বড় ?
তাই যদি গো হয়,—
তোমায় নিয়ে বনে যাব—এতই কিসের ভয় ?
সেখানে এক নদীর তীরে,
গাছ-পালা আর লতায় ঘিরে
কুটীর বেঁধে থাকবো মোরা—আর এখানে নয়।

আমরা হ'ব 'লব-কুশ' আর তুমিই হ'বে 'সীতে',
দুই ভা'য়েতে দেশ মাতা'ব রামায়ণের গীতে।
তারপরেতে বাবার সনে
সেইখানে এক তপোবনে,
ঘোড়া নিয়ে বাধিয়ে দেব লড়াই আচম্বিতে।
হ'বে বিষম রণ—
চোখা বাণের বৃষ্টি মা গো,—অসির ঝনা-ঝন্ !
কারো কথা শুন্‌ব না কো,
মার্‌ব সৈন্য লাখো লাখো !
বীরত্ব মোর দেখে—
বাবা তখন নেবেন কোলে তরা'ল ফেলে রেখে।

—তা' যেন মা হোলো,
পেয়েছে যে বড্ড ক্ষিধে, খাই কি এখন বলো ?
ও-বেলাকার কলা লিচু,
ঘরে কি আর আছে কিছু ?
পায়ে পড়ি—আঁচল ভ'রে দেবে আমায় চলো।

ক্যালেণ্ডারের কাণ্ড !

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

ক্যালেণ্ডারে আমার উৎসাহ হয় না। গত বছরের সূত্রপাতেই আমার এক পাব্‌লিশার, অনুগ্রহ কিংবা নিগ্রহ কি করবার জন্য জানি না, আমাকে একখানা ক্যালেণ্ডার উপহার দিয়েছিলেন। আমি সেটাকে অনেক বিপদ্‌-আপদ্

বাঁচিয়ে এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা অতিক্রম ক'রে অতি কষ্টে বাড়ীতে নিয়ে এসে আমার বস্‌বার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়েছিলাম।

সেই আসবার সময়েই দেখেছি ছেলেদের কি রকম একটা দুর্নিবার লালসা আছে নতুন ক্যালেণ্ডারের দিকে! রাস্তায় তিন গণ্ডা চেনা, তিন ডজন প্রায়-চেনা, এবং কম-বেশী তিন শ' তেয়াত্তরটি একদম-অচেনা ছেলে ঐ ক্যালেণ্ডারটি করতলগত করার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু অনেক কায়দায় তাদের মায়া-পাশ থেকে ওকে উদ্ধার ক'রে এনেছি। সে জন্য কম কৌশল করতে হয় নি আমাকে।

এনে দেয়ালে টাঙিয়েছিলাম এবং তার পরেও অনেক উৎসাহী ছেলের খপ্পর থেকে ওকে রক্ষা করতে হয়েছে, এক রকম পিতৃস্নেহেই ওকে পালন ক'রে এসেছি এতদিন, কিন্তু দেখ্‌লাম হাওয়ার সঙ্গে ওর একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। কলকাতার হাওয়া আদপেই ওর সহ্য হয় না। এবং এ-বিরোধ এক দিনের নয়, প্রত্যেক বারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই ওকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে আমি দেখেছি।

ঘরের মধ্যে হাওয়ার সঞ্চার হওয়া মাত্র দেখেছি ওর ব্যবহার এক নিমেষে বদ্‌লে যায়। বেশ অভিনিবিষ্ট হয়েই ওর তখনকার ভাবগতিক আমি বরাবর লক্ষ্য কর্‌তাম। হাওয়ার আবির্ভাবেই উনি কাঁপতে সুরু করতেন এবং সেই কম্পান্বিত কলেবরেই একবার ডান দিকে এবং একবার বাঁ দিকে—এবং এ দু'দিকে না কুলালে দিগ্বিদিকে পালাবার প্রয়াস পেতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পেরেকের সঙ্গে টিকি বাঁধা থাকায় বিশেষ সুবিধা হ'ত না। তবু আমি দেখেছি, প্রথম ধাক্কাটায় ডান দিকে এবং তার পরের ধাক্কায় বাঁ তরফে ঝোঁক্ দেওয়ারই ওঁর সাধারণ বদভ্যাস ছিল—এবং তৃতীয় ধাক্কায় দেখেছি উনি একেবারেই উল্টে গেছেন।

আজ কোন্ বার কিংবা আজকের কি তারিখ যখনই জান্‌বার দরকার হয়েছে এবং ওঁর দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়েছি, দেখেছি উনি সে-সমস্ত তখন বেমালুম চেপে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। আবার ওঁকে সোজা ক'রে দিয়ে টেবিলের কাছে এসেছি, হয়ত চেয়ারে বসেছিও, কিন্তু পুনরায় দৃক্‌পাত করলেই দেখা গেছে উনি আবার গা-ঢাকা দিয়েছেন—বিনা বাক্যব্যয়ে। আবার ওঁকে সিধে

করেছি, এবার ভালো করেই করেছি, কিন্তু একটু পিছন ফিরেছি কি উনিও পশ্চাদ্‌পদ হয়েছেন।

এই কারণেই ক্যালেণ্ডারের ওপর আমার আর চিত্ত নেই। ছেলেরা এমন চীজ্ যে কেন পছন্দ করে তা এখনও আমার বোধগম্যতার বাইরে, ছেলেরাই কেবল তা জানে! বোধ হয় ক্যালেণ্ডার-চর্চ্চাকে ওরা ব্যায়াম-চর্চ্চার অঙ্গীভূত মনে করেছে। তা' দৌড়-ঝাঁপ্ এবং ওঠ্-বসের ব্যাপার ওদের পক্ষে দৈহিক হিতকর হ'তে পারা হয়ত সম্ভব—আমার কিন্তু ক্যালেণ্ডারের পেছনে লেগে থাকার হরদম্ পরিশ্রম মোটেই পোষায় না।

এর পর যখনই চিঠি লিখ্‌তে ব'সে দেখেছি উনি মুখ ঘুরিয়ে ব'সে আছেন এবং আজকের তারিখটা না জান্‌লেও নয়, তখন ক্যালেণ্ডারের আর মিথ্যে খোসামোদ না ক'রে সটান্ আমি চলে গেছি পাশের বাড়ীতেই। তারা খবরের কাগজ নেয় আর খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রোজ্‌কার তারিখ থাকে। যদি সেদিনকার কাগজ তখনও না পৌঁছে থাকে তা হ'লে তারও পাশের বাড়ী যেতে হয়—সেখানে আছে গুপ্তপ্রেস্ পাঁজি। পাঁজি রাখা তাদের অনেক কালের বদ্ধমূল ব্যায়রাম।

কিন্তু ওরাও এক-এক সময়ে ভারী অভদ্রতা করে—প্রায় আমার ক্যালেণ্ডারের মতনই, বল্‌তে গেলে। একবার বারের সঙ্গে তারিখ কিছুতেই মেলাতে পারছি না, এবং যখন ক্লাস্-রুমের ব্ল্যাক্‌বোর্ডের অঙ্ক মেলানোর মতই গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠেছি তখন আবিষ্কার করলাম যে ওটা তিন বছর আগেকার গুপ্তপ্রেস্। এক-এক বার পাশের বাড়ীর ছেলেটাও আগের দিনের খবর-কাগজ এনে দেয়—আমি অবাক্ হয়ে যাই, তাতে আজকের তারিখ কি ক'রে পাওয়া যেতে পারে? এত বোকাও হয় মানুষে! কিংবা মানুষ বলেই এত বোকা হয়? বাড়াবাড়ি দেখ্‌লে কে না অবাক্ হয়? এই সব পরিহাস আর বোকামির জন্য ওদের ওপর মনে মনে ভারী চটে আছি, যদিচ মুখে কিছু বলি না। কাচের ঘরে বাস ক'রে পরকে ঢিল মারা যায় না তো! যে রকম ক্যালেণ্ডার নিয়ে হয়েছে আমার ঘর-করা, তাতে সময়ে অসময়ে তারিখ-বেতারিখ জান্‌তে কখন কার দ্বারস্থ হ'তে হয় কে জানে!

এবার জানুয়ারীর প্রথম দিবসে আমার বন্ধু নতুন এক ক্যালেণ্ডার এনে দিতেই ভাব্‌লুম তাঁকে গিয়ে বেশ ক'ষে এক ঘা বসিয়ে দিই। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে বল্‌লুম, "বন্ধুবর, আরো পাকা তিন মাস পরে তোমার উপহারটা পৌঁছলেই ভালো হ'ত না কি? অর্থাৎ পয়লা এপ্রিল্ তারিখে। তা হ'লে আর এমন ক'রে বন্ধুবিচ্ছেদটা আজ ঘট্‌ত না।"

বন্ধু বুঝতে পারেন না, কিন্তু ভারী মুষ্‌ড়ে যান। আমি সান্ত্বনার সুরে বলি—"তখনই না হয় দিও। তত দিন প্রথমকার তিন মাসে তোমার দাড়ি কামানো চল্‌বে।"

বন্ধুবর তথাপি কিছু না বোঝার ভান করেন। আমি গুম্ হয়ে ব'সে থাকি, শত্রুর মত বন্ধুর ওপরও যে মানুষ প্রতিশোধ তোলার প্রচেষ্টা করে এ ধারণা আমার আগে ছিল না। আর একটা দীর্ঘ দুর্ব্বসরের আসন্ন কর্ম্মভোগ আমাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে, মনে মনে সংকল্প করি, নাঃ, এ রকম করলে সোজা লেকেই চলে যাব। আত্মহত্যাই ক'রে বস্‌ব কোন্ দিন!

কিন্তু না, বন্ধু চলে যাবার পরই আমি এবার ওটাকে উল্‌টো করেই টাঙ্গিয়েছি। অতঃপর যখনই ঘরের মধ্যে হাওয়া আসে, ও সোজা হবার জন্য হুটোপাটি লাগিয়ে দেয়—তখন ওর কি দারুণ ছট্‌ফটানি! আমি তখন মজা দেখি! শপথ ক'রে বল্‌ছি আমার দিক্ থেকে সাহায্য করার এবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই—নিজেকে সোজা ক'রে আনার যা কিছু সৎচেষ্টা তা সমস্ত ওর নিজের প্রেরণা থেকেই। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই, তাই অনেক সময়েই দেখি ও সোজা হয়ে এসেছে—কিন্তু এবার আমি বদ্ধপরিকর, তখনই আমি গিয়ে ওকে আবার উল্‌টে দিয়েছি। প্রতিজ্ঞা করেছি যে কিছুতেই আর প্রশ্রয় দেব না ওকে, তাতে প্রাণ যাক্ আর থাক্।

বারংবার এই রকম শাসনের ফলে ওর স্বভাব আশ্চর্য্য রকম শুধ্‌রেছে। এখন চিঠি লেখার সময়ে—এবং তা ছাড়া অনেক সময়ে-অসময়েই—ওকে সোজাসুজিই দেখ্‌তে পাই। আর আত্মগোপনের আব্‌দার নেই, আমার সম্মুখীন হতে দ্বিধা-সঙ্কোচও নেই; আর—প্রায় সর্ব্বদাই উন্মুক্ত হয়েই আছেন। তারিখ, বার, মাস

ঠিক ঠিকই জানা যায় আজকাল—পাশের বাড়ী ছুটোছুটির প্রয়োজন হয় না। ওদের স্বভাব এখন আমি ধর্‌তে পেরেছি। যদি তোমার ঘরে হাওয়ার প্রাদুর্ভাব থাকে তা হ'লে ক্যালেণ্ডারকে যখনই সোজা দেখেছ তখনি অমনি গিয়ে উল্টে দেবে—সব সময়ে ওকে সোজা পাবার ওই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

(শ্রীহেমলতা দেবী)

আজ থেকে ঠিক এক শ' বছর আগে আমাদের দেশে এমন একজন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল যার নাম তোমরা সকলেই জান। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বল্‌ছি; তাঁর এবং তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম আর কে না জানে? কোথায় আমেরিকা আর কোথায় ইটালী—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় বড় দেশে আজ এঁদের শিষ্যদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। সুদূর আমেরিকার শিকাগো সহরে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়ে দিয়ে এসেছিলেন হিন্দুধর্ম্ম কত বড়! সে বক্তৃতার কথা ইয়োরোপ, আমেরিকা এখনও ভোলে নি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এ সমস্ত শিক্ষা পেয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, অর্থাৎ তার পর ঠিক একশ' বছর চলে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মমত যে কত সুন্দর ছিল তা তোমরা বড় হয়ে পড়্‌বে। আজ এই মহাপুরুষের জীবন থেকে কয়েকটা ছোটখাট ঘটনা তোমাদের শোনাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের আসল নাম হচ্ছে গদাধর চট্টোপাধ্যায়। ইনি অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের কঠিন কঠিন কথা তিনি অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে একেবারে জলের মত করে বুঝিয়ে দিতে পার্‌তেন। এত বড় জ্ঞানি-পুরুষের কিন্তু স্কুল-কলেজের বিদ্যা মোটেই ছিল না। ছেলেবেলায় তাঁকে পাঠশালায়

দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পড়াশুনা না করে খেলা করে বেড়াতেই তিনি ভাল-বাসতেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত শুনে খুসী হবে যে অঙ্কের নামে

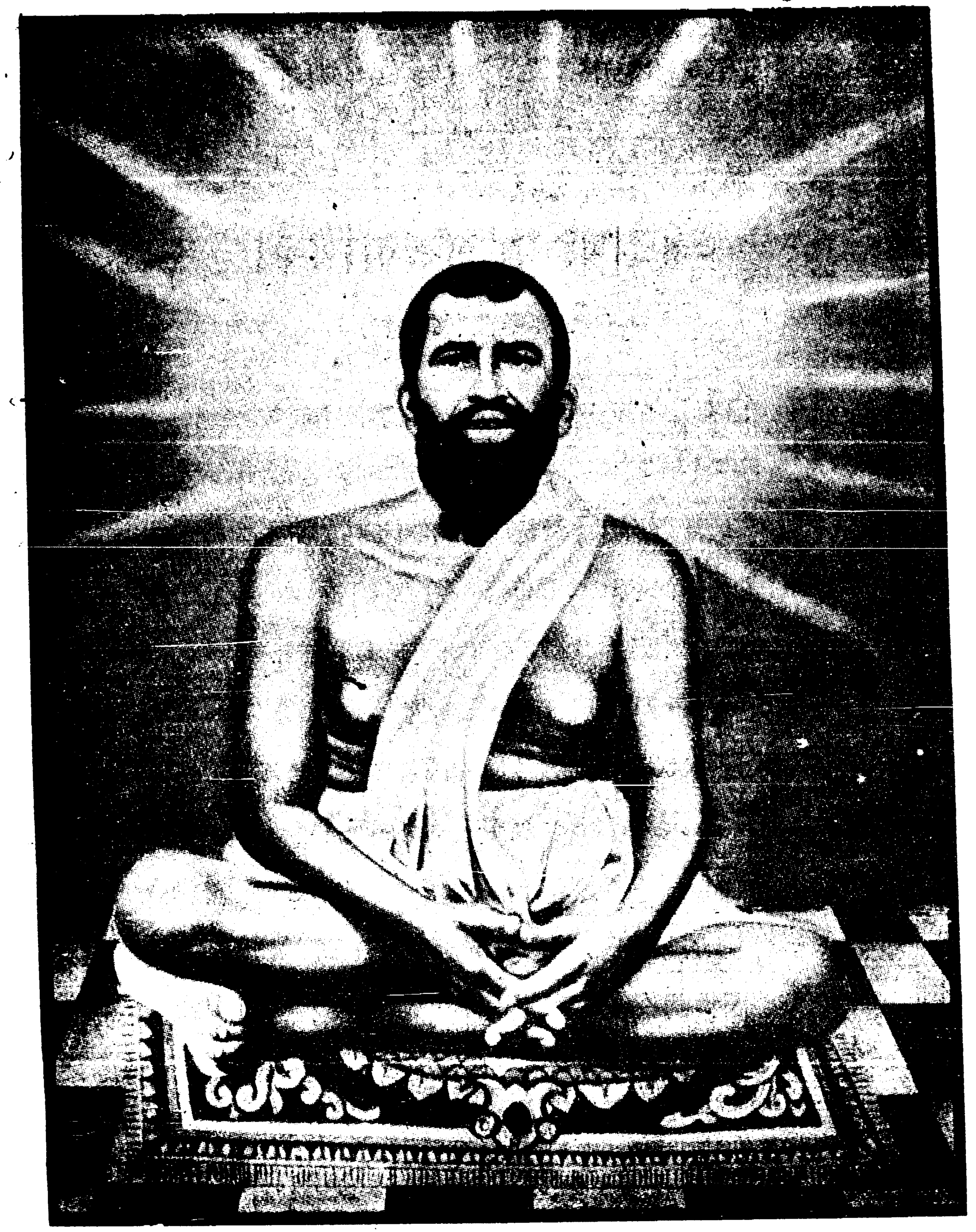

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

তাঁর নাকি রীতিমত গায়ে জ্বর আস্ত! ছেলেবেলা তিনি খুব একগুঁয়ে ছিলেন।

কোন কাজ করা অন্যায় বলে তিনি নিজে যতক্ষণ না বুঝ্তেন ততক্ষণ সে কাজ থেকে কেউ তাঁকে থামাতে পার্ত না। মিথ্যা কথা কিন্তু তিনি প্রাণ গেলেও বল্তেন না—দোষ করে কখনও তা অস্বীকার করেন নি। তাঁর ধাত্রী ছিল একজন কামারের মেয়ে। তিনি তাকে কথা দেন যে, পৈতার সময় ব্রহ্মচারী অবস্থায় তিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁর ঐ ধাই-মার কাছ থেকেই ব্রতভিক্ষা নেবেন। পৈতার সময়ে কিন্তু তাঁর গুরুজনেরা বলে বস্লেন, তা হতেই পারে না, কেননা ব্রতভিক্ষা নিতে হবে কেবল ব্রাহ্মণেরই কাছ থেকে। বালক শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু বেঁকে বসলেন—তিনি যে কথা দিয়েছেন তা রাখ্বেনই। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কথামতই কাজ হ'ল।

এত বড় তত্ত্বজ্ঞানীর স্বভাব ছিল কিন্তু একেবারে শিশুর মত সরল। একবার তিনি লুচি, পায়েস ইত্যাদি ঠাকুর-পূজার সমস্ত ভোগ ঠাকুরকে না দিয়ে একটা বিড়ালকে খাইয়ে দেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "কেন, সমস্ত জীবেই ত ভগবান্ আছেন—ভোগ দেবতাকে নিবেদন করাও যা বেড়ালকে খাওয়ানও তা।"

টাকা-পয়সার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। টাকাকে তিনি কোন অংশে মাটীর ঢেলার চেয়ে বড় মনে কর্তেন না। একবার তাঁর মন্দিরের বিষ্ণুবিগ্রহের গায়ের সমস্ত অলঙ্কার চুরি যায়। মন্দিরের মালিক এসে দুঃখ করলে তিনি বলেন—"এ তোমার কি কথা! তুমি যাঁর গহনা গহনা কর, তাঁর পক্ষে এগুলো তো মাটীর ডেলা!"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের মত ছিল অত্যন্ত উদার। একবার তাঁর ইচ্ছা হ'ল সমস্ত ধর্ম্মই ভাল করে পরখ্ করে দেখ্বেন। মুসলমান ধর্ম্ম পরখ করবার সময়ে তিনি রীতিমত মুসলমানী বেশে নমাজ পড়তে সুরু করলেন, আর মুসলমানের খাবার খেতে আরম্ভ করলেন। আবার কিছু দিন পর রীতিমত খৃষ্টানদের মত যীশুখৃষ্টের ভজনা করে ঠিক তাদেরই মত চল্তে সুরু করলেন। তিনি বল্তেন, যে কোন ধর্ম্মমতে ভগবানের আরাধনা কর্লেই ভগবান্কে লাভ করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়্ল তখন অনেক লোক, এমন কি স্কুল-কলেজের ছাত্র পর্য্যন্ত, তাঁর সঙ্গে দেখা কর্তে যেত। বাংলাদেশের বড় বড় লোকদের অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক কেশব সেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে একজন কলেজের ছাত্র এই অদ্ভুত মহাপুরুষটীকে দেখতে আসেন। নরেন্দ্রনাথ এই সময় প্রায় নাস্তিক হয়ে উঠেছিলেন—কোন ধর্ম্মমতই আর তিনি সহজে বিশ্বাস করে উঠ্তে পার্ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এই যুবকটীকে দেখেই এঁর মধ্যে একজন মহাপুরুষের সন্ধান পান এবং সবাইকে তা জানিয়ে দেন। এমন কি তিনি একদিন বলেন—'এই নরেন্দ্রনাথকে তৈরী কর্তে কয়েক শ' সূর্য্য গালাতে হয়েছে'। তখন কিন্তু অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে মনে মনে হেসেছিল, কিন্তু পরে দেখ্ল তিনি নেহাৎ ভুল বলেন নি।

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন নেহাৎ কৌতূহলে পড়ে—তিনি সহজে এবং খুব ভাল করে পরীক্ষা না করে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কথা মেনে নিতেন না। যখন তিনি শুন্লেন এ সন্ন্যাসী টাকাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন তখন মনে মনে ঠিক করলেন এঁকে একটু পরীক্ষা করা দরকার। একদিন তিনি কতকগুলো টাকা শ্রীরামকৃষ্ণের বিছানার নীচে রেখে দিলেন—দেখা যাক্, শ্রীরামকৃষ্ণ এ টাকা দেখে কি করেন! তার পর যে ব্যাপার ঘট্‌ল তা এতই অদ্ভুত, এমনই অলৌকিক যে তোমাদের হয়তো বিশ্বাস কর্তেই কষ্ট হবে, কিন্তু কয়েক জন সজ্জন এ ব্যাপারটি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে শুনেছি। বিশ্রামের জন্য রামকৃষ্ণ শুতে চলেছেন, যেই তাঁর হাত বিছানার সংস্পর্শে এল অম্‌নি বিদ্যুতের ধাক্কা খেলে মানুষ যেমন চম্‌কে পিছিয়ে যায় ঠিক তেম্‌নি ভাবে রামকৃষ্ণ পিছিয়ে এলেন। তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপ্তে লাগ্‌ল, আকুল-কণ্ঠে তিনি বলে উঠ্‌লেন, "তোমরা দেখ, শীগ্‌গির দেখ, বিছানায় কি আছে!"

তখন তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে সবাই দেখে তার তলায় টাকা লুকানো রয়েছে। অবাক্ হয়ে সকলে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌ল। রামকৃষ্ণ

শেষটায় নরেন্দ্রনাথের দিকে চাইতেই তাঁর আর বুঝ্তে বাকী রইল না যে সেই কলেজে-পড়া নাস্তিক ছেলেটা তাঁকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই এ কাণ্ডটি করেছে।

কিছু দিনের মধ্যে কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য হয়ে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথকে একদিন না দেখ্‌লেও তখন শ্রীরামকৃষ্ণ টিঁকতে পারতেন না। নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সত্য হয়েছিল তা তোমরা তখনই বুঝ্‌তে পারবে যখন আমি বল্‌ব যে এই নরেন্দ্রনাথই পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন। উত্তর কালে এই জগজ্জয়ী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে এসিয়া, আমেরিকা ও

স্বামী বিবেকানন্দ

ইয়োরোপ—তিন মহাদেশের লোক যখন সম্ভ্রমে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল, তখনও তিনি ছল ছল চোখে বল্‌তেন—"If there has been curses falling from my lips, if there has been hatred coming out of me, it is all mine and not his. All that has been weak has been mine and all that has been life-giving, strengthening, pure and holy, has been his inspiration, his words and he himself. Yes, my friends, the world has yet to know that man!" অর্থাৎ—"যদি আমার মুখ থেকে কখনও কোনও অভিশাপ বেরিয়ে থাকে, যদি আমার ভেতর থেকে কখনও

কোন ঘৃণা প্রকাশ পায়, সে সমস্তই আমার জন্য, তার জন্য দায়ী তিনি নন্। (আমার মধ্যে) যা কিছু দুর্ব্বল সব আমার, যা কিছু প্রাণোদ্দীপক, বলোদ্দীপক, নিষ্পাপ এবং পবিত্র—সব তাঁরই অনুপ্রেরণা—তাঁরই কথা—সে সব তিনিই। হ্যাঁ, বন্ধুগণ, এ লোকটিকে এখনও পৃথিবীর চিন্‌তে বাকী আছে।" বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর আজ অনেক বছর কেটে গেছে, আজ কিন্তু বাস্তবিকই পৃথিবী চিন্‌তে পেরেছে এই মহাপুরুষকে। ইয়োরোপের ঋষিকল্প মনীষী রমঁ্যা রলাঁর নাম তোমরা হয়তো সকলেই জান—রবি বাবুর পরের বছর যিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ্ পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করে ইনি মোহিত হয়ে যান। পরে তাঁর সম্বন্ধে একখানা অপূর্ব্ব বই তিনি লিখেছেন। সে বই পৃথিবীর নানা দেশে অসংখ্য ছড়িয়ে গেছে। এ থেকেই বোঝা যায় দক্ষিণেশ্বরের সেই আপন-ভোলা মহান্ পুরুষটিকে বুঝ্‌বার জন্য গোটা দুনিয়ার আজ কি আকুল আগ্রহ!

দেশের সমস্ত বড় বড় লোকদের সঙ্গে কথা বল্‌বার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে অত্যন্ত ছোট বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে গিয়ে যাঁরা দেখা করে আসতেন না তিনি ছুটে যেতেন তাঁদের বাড়ীতে দেখা কর্‌বার জন্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে প্রায় ষোল বছরের বড় ছিলেন। এই সময়ে তাঁর অসাধারণ দয়ার কথা জান্‌তে বাংলা দেশের আর কারও বাকী ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনলেন তাঁর এক শিষ্য বিদ্যাসাগরের স্কুলে মাষ্টারী করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ধরলেন—'আমাকে একবার বিদ্যাসাগর দেখাতে হবে।' বিদ্যাসাগর রাজী হলেন; তিনি মনে করেছিলেন বুঝি এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী তাঁর কাছে এসে হাজির হবে—কিন্তু তিনি শুনে অবাক্ হ'লেন যে এ সন্ন্যাসী মোটেই গেরুয়া পরেন না। ঠিক সময় মত শ্রীরামকৃষ্ণ একখানি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী করে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে নামলেন। গায়ে একটী লং ক্লথের জামা, পরনে লাল-পেড়ে কাপড়, তার আঁচলটী কাঁধে ফেলা, পায়ে বার্নিশ করা চটীজুতো। এত বড় একজন্ লোকের সঙ্গে দেখা করতে শিষ্যেরা তাঁকে অনেক সাহস দিয়ে এনেছেন কিন্তু বাড়ীর উঠানে ঢুকে এই অসাধারণ সরল মহাপুরুষটীর আবার ভয় হ'ল—কি

জানি চাল-চলনে কোথায় কি খুঁৎ বেরিয়ে পড়্‌বে! এক-একবার জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ কর্‌লেন, "জামার বোতাম খোলা রয়েছে—এতে কিছু দোষ হবে না?"

যা হোক্, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপের পর শ্রীরামকৃষ্ণ বল্‌লেন—"আজ সাগরে এসে মিল্‌লাম। এতদিন খাল, বিল, হ্রদ, নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখ্‌ছি।"

বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, "এসে পড়েছেন, আর ত' উপায় নেই, দু'-এক ঘটি নোনা জল তুলে নিয়ে যান; এ সাগরে নোনা জল ভিন্ন আর কিছু পাবেন না"।

শ্রীরামকৃষ্ণও ছেড়ে কথা বলেন না, তিনি বল্লেন, "না গো, সাগর ত' কেবল লবণের নয়, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্র, আরও ত' অনেক সমুদ্র আছে। তুমি ত' অ-বিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তোমাতে রত্ন লাভই হয়ে থাকে, যখন এসেছি তখন রত্নই নিয়ে যাব। নোনা জল কেন তুল্‌ব?" তার পর বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করে বল্‌লেন, "তুমি ত' সিদ্ধ পুরুষ।"

বিদ্যাসাগর—"মহাশয়, কেমন ক'রে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আলু-পটল সিদ্ধ হ'লে তা নরম হয়, তুমিও ত' খুব নরম! তোমার অত দয়া!"

যে দেশে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে দেশের গৌরব ততই বাড়ে। আমরা যখন ভাবি শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষ আমাদেরই দেশে জন্মেছিলেন তখন আমাদের বুক গৌরবে ফুলে ওঠার কথা নয় কি?

ছুটীর খেলা

(শ্রীজয়ন্তকুমার বসু, বি-এস্-সি)

এবার তোমরা সবাই গরমের ছুটী খুবই সরগরম করে তুলবে ভাই-বোনদের নিয়ে, কেমন? আমি তোমাদের সেই আমোদ আরও জমাট ক'রে

তোল্‌বার জন্য কয়েকটা খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি শুধু কয়েকটা খেলার নৌকো বানানোর কথা বল্‌ব।

কর্পূরের নৌকো

সিগারেটের টিনের মুখে যে পাৎলা টিন দেওয়া থাকে তার একটী কারও কাছ থেকে যোগাড় করে ফেল। ঐ টিন থেকে একটা সম-দ্বিবাহু ত্রিভুজের আকারে খানিকটা তিন-কোণা টিন কেটে নিয়ে সরু দিক্‌টা সামান্য কেটে ফেল। তার পর ঐ টিনের দু' ধার বাঁকিয়ে সেটাকে দেখতে নৌকোর এক দিকের মত কর। এবার একটা ম্যাচের কাঠি নৌকোর সামনের দিকে বেশ করে আঠা দিয়ে যুড়ে দাও। তার পর ঐ কাঠিতে একটা কাগজের পাল তুলে দাও। জিনিষটা এবার দেখ্‌তে ১নং ছবির মত হবে। একটা বিষয় সব সময়েই লক্ষ্য রাখ্‌বে

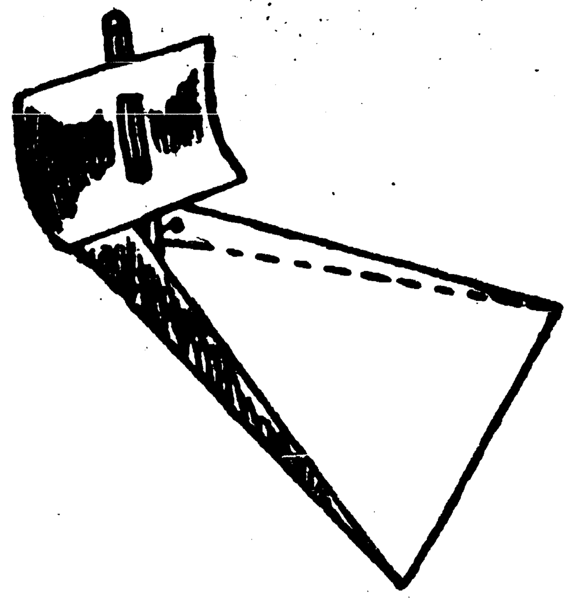

১

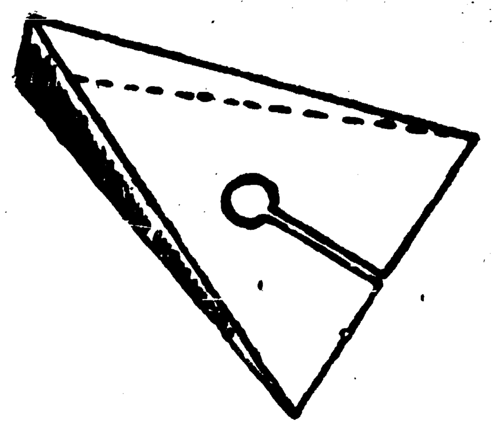

২

যাতে ঐ নৌকোর কোথাও এতটুকু তেল বা চর্ব্বি (grease) না লাগে। তা হ'লে সব খেলা পণ্ড হ'য়ে যাবে। এখন, বেশ বড় একটা জলভরা গামলা নাও। দেখো, যেন গামলাতেও কোনমতে তেল বা চর্ব্বি না লাগে (গামলা চর্ব্বিশূন্য করতে প্রথমতঃ সোডা আর পরিষ্কার জল দিয়ে ধু'য়ে ফেলতে হবে)। এখন ছোট চৌকো এক চাকতি কর্পূর এনে ঐ নৌকোর পেছনের দিকে মাঝামাঝি জায়গায় এমন ভাবে রেখে দাও যেন কর্পূরের কতকটা নৌকোর বাইরে থাকে।

নৌকোটা এখন আস্তে আস্তে গামলার ভিতর জলে ছেড়ে দাও। দেখ, নৌকো গদাইলস্করী চালে কেমন চল্‌ছে! নৌকো যদি গামলার পাশে ঠেকে যায় তবে ও নিজেই আবার অন্য দিকে চল্‌তে থাকবে। কর্পূরের টুক্‌রো যদি এক পাশে গিয়ে পড়ে তবে নৌকো ঘুরতে থাকবে। কর্পূরের চাকৃতি যতই গল্‌তে থাকবে, ততই নৌকোর গতি কমে আসবে।

তেল-চালানো নৌকো

তেল দিয়েও নৌকো চালানো আজকাল সম্ভব হয়েছে। অনেক ভাল আর বড় বড় জাহাজ তেল দিয়েও চালানো হয়ে থাকে। পোষ্টকার্ড দিয়ে আগের মত ছোট্ট ক'রে একটা নৌকো বানিয়ে ফেল। এখন ২নং ছবির মত করে নৌকোর পেছনের দিকের মাঝখান থেকে নৌকোর ভেতরের দিকে ছোট্ট সরু একটী নালা কেটে নাও। আর ঐ নালার ভেতরের দিকের মুখে একটী ছোট গোল করে ফুটো কেটে ফেল। এই ফুটোটাই জলের উপর তেলের ট্যাঙ্কের কাজ করবে। এখন নৌকোটা জলের ওপর ভাসিয়ে অল্প একটু তেল সাবধানে ট্যাঙ্কের ভেতর ঢেলে দাও। দেখ্‌বে তেল সঙ্গে সঙ্গে নালা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে ছড়িয়ে পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকো সামনে এগিয়ে চল্‌বে। জলপাই-এর তেল (olive oil), কেরোসিন তেল কিংবা কোন পিচ্ছিল তেল (lubricating oil) নৌকো চালানোর পক্ষে ভাল। তবে জলপাই-এর তেলই সব চেয়ে ভাল।

এ নৌকোর চলার সঙ্গে বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ সব নৌকো কেন চলে তা' বড় হয়ে ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পারবে। ভবিষ্যতে আরও খেলা ও বিজ্ঞানের কথা বলবার ইচ্ছা রইল।

পৃথিবীর সব চেয়ে পুরানো রাজবংশ কোন্‌টা জান? জাপানের রাজবংশ। বুদ্ধদেবের জন্মেরও পূর্ব্বে হইতে—অর্থাৎ প্রায় ২৫০০ বছর কাল ধরিয়া এই বংশ জাপানে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। জাপানের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্‌ মুৎসোহিতো—যিনি আধুনিক জাপানকে গড়িয়া তুলিয়াছেন—তিনিও এই অতি প্রাচীন বংশের লোক। জাপান-সম্রাট্‌ হিরোহিতো এই বংশের ১২৪তম সম্রাট্‌। জাপানীরাই পৃথিবীর এক মাত্র সভ্য জাতি যারা এখনও রাজাকে ভগবানের অংশ বলিয়া মনে করে। রাজার বিরুদ্ধে কোন রকম বিদ্রোহের কথা তারা কল্পনাও করিতে পারে না।

সম্রাট্‌ মুৎসোহিতো—আধুনিক জাপানের জন্মদাতা

* * *

ডেভিড্‌ এচিসন্‌কে এক দিনের জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের কাজ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে আগের দিন খুব বেশী পরিশ্রম হওয়ায় ও দিনটা তিনি ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন—জাগ্রত অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট্‌ হওয়া তাঁর কপালে ছিল না।

ছবিতে যে বিরাট্‌ গর্ত্তটি দেখিতেছ এটি আছে আমেরিকার উইন্‌স্লো মরুভূমির মধ্যে। এই গর্ত্তটির ব্যাস ৪০০০ ফিট,গভীরতা ৬০০ ফিট্‌। গর্ত্তটি কিসের তা' লইয়া বহু দিন যাবৎ পণ্ডিত-মহলে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। অবশেষে কিছু দিন হইল পণ্ডিতেরা একমত হইয়াছেন—গর্ত্তটির জন্য দায়ী আকাশ হইতে খসিয়া-পড়া একটি উল্কা। এই উল্কাটি অবশ্য আজকালকার দিনে পড়ে নাই, পণ্ডিতেরা গবেষণা করিয়া ঠিক করিয়াছেন সম্ভবতঃ হাজার পঞ্চাশেক বছর আগে পৃথিবীতে এই উল্কাপাত হইয়াছিল। এত বড় উল্কার কথা এ পর্য্যন্ত আর শোনা যায় নাই! এই উল্কাপাতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে—অন্ততঃ আশ-পাশের কয়েক শ' বা কয়েক হাজার মাইল জায়গা যুড়িয়া কি প্রলয় কাণ্ডই না হইয়াছিল তা' কল্পনা করাও দুঃসাধ্য!

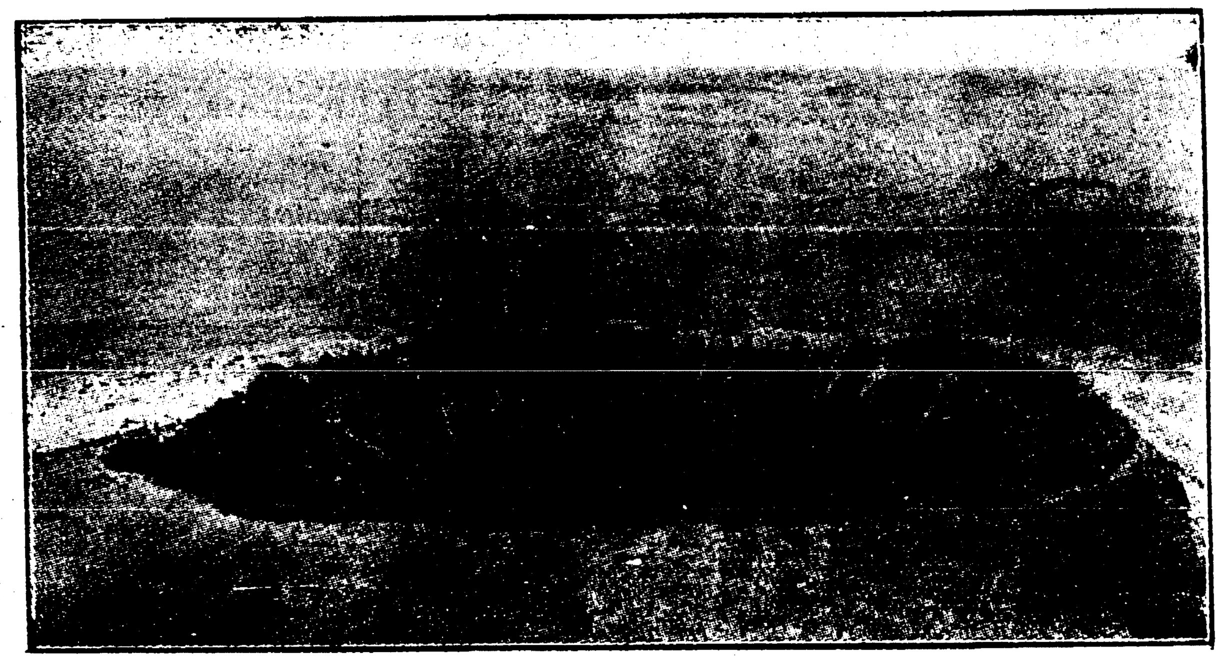
উইন্‌স্লো মরুভূমির বিরাট্‌ গর্ত্ত

যাই হোক্‌, আপাততঃ বৈজ্ঞানিকেরা এই বিরাট্‌ গর্ত্তটিকে কোন লাভজনক কাজে লাগান যায় কিনা তারই চেষ্টা করিতেছেন। উল্কার মধ্যে নানা রকম ধাতু থাকে—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উল্কাটিকে এখন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। নানা রকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়া, তাকে ভাঙ্গিয়া, ফুঁড়িয়া, বৈজ্ঞানিকেরা উল্কাটির সন্ধান করিতেছেন এবং ক্রমশঃই নাকি আশান্বিত হইতেছেন।

* * *

জান কি? লেড্‌ পেন্সিলের শীষে একটুও লেড্‌ (সীসা) নাই! পেন্সিল তৈরী হয় গ্র্যাফাইট নামে এক রকমের অঙ্গার-(carbon) হইতে। আবার সোডা-ওয়াটারে একটুও সোডা থাকে না—তা'তে থাকে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস্‌, আর জল।

* * *

লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজের হাসপাতালের কর্ম্মকর্ত্তাদের সভার সভাপতি হইতেছেন জেরেমি বেন্‌থাম্‌—এবং চিরকাল তিনিই ঐ সভার সভাপতি থাকিবেন, যদিও তিনি আজ একশ' বছরেরও উপর মারা গিয়াছেন। জেরেমি বেন্‌থাম্‌ মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুর সময়ে এই সর্ত্তে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়া যান যে চিরকাল তিনিই থাকিবেন উহার সভাপতি।

তাঁর মৃত্যুর পর সভার ঘরে সভাপতির চেয়ারে তাঁর কঙ্কালের উপর তাঁর মূর্ত্তি তৈরী করিয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছে। সমস্ত বিষয়ে এখনও তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়—অবশ্য তিনি উত্তর দিতে পারেন না। তখন সভার রিপোর্টে লেখা হয়—"সভাপতি উপস্থিত, কিন্তু ভোট দিবেন না"।

*   *   *

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে খটমট শব্দওয়ালা ভাষা বোধ হয় জার্ম্মান্। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ রাজনীতিবিদ্ বিস্‌মার্ক্ রাগিয়া গেলেই নাকি বলিয়া উঠিতেন—"হিম্‌মেল্‌হের্‌র্ গোট্‌ক্রয়ৎ-স্‌মিলিয়োনেন্‌ডোন্নেরভেট্টের"।

"লেপাডো-টেমাচো-গেলাচো-গেলিও-ক্র্যানিও-লাইপ্‌স্যানো-ড্রিম্-হাইপো-ট্রিমাটো-সিলফিও-কা-রাঁচো-মেলিটো-ক্যাটাকেচিমেনো-কিখ্‌লেপিকসা-ইফো-ফ্যাট্রোপেরিষ্টের-আলেক্‌ট্রাইওন-অপ্টো-কেফালিও-কিংক্‌লো-পেপাইও-লেগোইও-সিরা-ইও-বাফেট্র্যাগানো-টেরিগন।" এতে অক্ষর আছে ১৮৪টা।

*   *   *

নীচে যে অদ্ভুত চেহারার জানোয়ারটি দেখিতেছ এটিকে কিছু দিন আগে ফ্রান্সের Cherbourg অঞ্চলের সমুদ্রতীরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। জানোয়ারটি লম্বায় বিরাটাকার—২৫ ফিট্। চেহারায়ও আমাদের পরিচিত

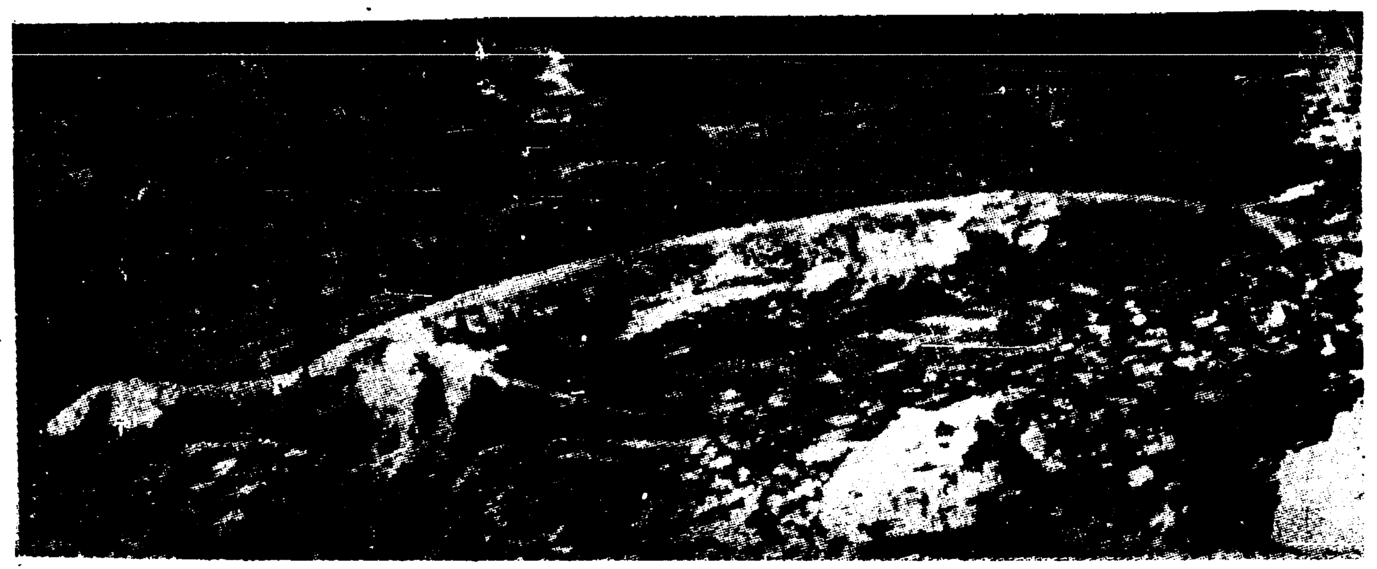

বৈজ্ঞানিকের অপরিচিত অতিকায় জলজীব

কোনও জানোয়ারের সঙ্গে এর মিল নাই—মাথাটা উটের মত, গলাটা লম্বা, ডানা এবং লেজও অদ্ভুত ধরণের। এই জন্তুটিকে লইয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে; অনেক পরীক্ষা করিয়াও তাঁরা এই অদ্ভুত জীবটিকে কোন্ বিশেষ শ্রেণীর জীবের দলে ফেলিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। জন্তুটি কোনও প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলজীবের শেষ বংশধর বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন।

একজন ডাক্তারকে তিনি আদর করিয়া ডাকিতেন— "গেস্থুণ্ট্‌হাইট্‌স্‌ভিডেরহের্স্ট্‌এ-লুংস্‌মিট্টেলৎস্থজাম্মেন্‌মিশুংস্‌ফেরহেইন্ট্‌নিস্‌কুণ্ডি-সের"।

*   *   *

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় শব্দ কিন্তু পাওয়া যায় গ্রীক্ ভাষায়—এরিষ্টোফেনিস্ নামক একজন বড় নাট্যকারের বইতে—

*   *   *

পাশের ছবিতে দেখ এক ভদ্রলোক কেমন হাসি হাসি মুখে অথচ নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া বসিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন। তাঁর বাঁ-দিকের ছবিটায় দেখ একখানা বইএর খোলা পাতা, আর নীচের ছবিতে দেখ এক রাশ বই সাজান রহিয়াছে। এই ভদ্রলোকটি একজন মস্ত বড় পুরাতত্ত্ববিদ্—প্রফেসর হের্‌মান্ গ্র্যাপো, বাড়ী জার্ম্মেনীতে। তোমরা বোধ হয় জান, প্রাচীন মিশরে যে অক্ষর ব্যবহার করা হইত তা ছিল ছবির অক্ষর—তাকে ঠিক মত আয়ত্ত করা নেহাৎ সহজসাধ্য নয়। অথচ বড় ঐতিহাসিক হইতে হইলে এই মিশরীয় অক্ষর বেশ ভাল করিয়া জানা থাকা দরকার—মিশরের ইতিহাসের অধিকাংশ খোরাকই এই ছবির অক্ষরে পাথরের গায়ে লেখা আছে। ঐতিহাসিকদের এই অভাব দূর করিবার জন্য গ্র্যাপো সাহেব একখানা মিশরীয় ছবির ভাষার অভিধান তৈরী করিতেছেন। দীর্ঘ দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁকে এই কাজ করিতে হইতেছে। অভিধানখানি হাতে লেখা—এ পর্য্যন্ত ১০০

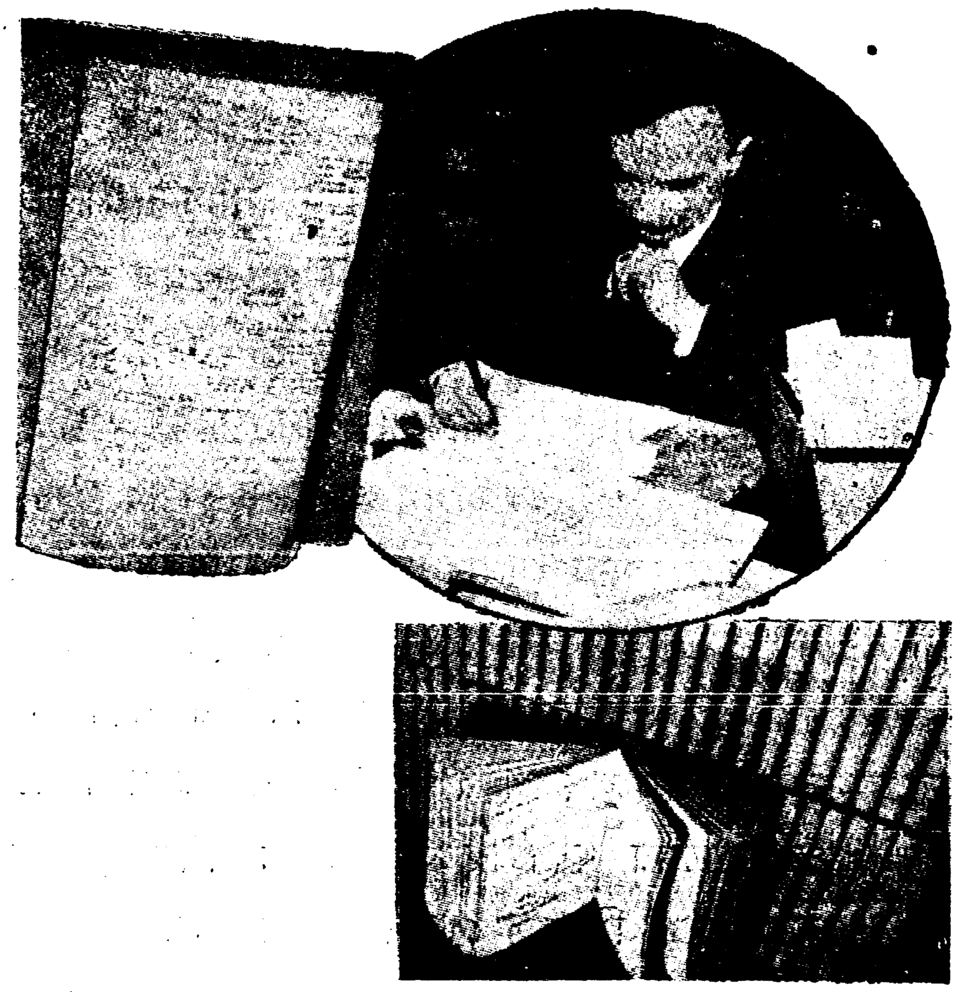

প্রফেসার গ্র্যাপো ও তাঁর অদ্ভুত অভিধান

খণ্ডেরও বেশী লেখা হইয়াছে। ছবির বইগুলি এই অভিধান। গ্র্যাপোর এই অভিধান শেষ হইলে পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের বহুদিনের একটা বড় অভাব দূর হইবে, সন্দেহ নাই।

পৃথিবীতে প্রত্যেক মিনিটে ৬৮ জন লোক মারা যাইতেছে; অর্থাৎ প্রত্যেক দিনে মারা যাইতেছে ৯৭৯২০ জন এবং প্রত্যেক বছরে ৩৫৭৪০৮০০ জন।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(১৮)

সলিল-চরিত

সন্ধ্যার কিছু আগে বাড়ী ফিরিয়া সলিল দেখিতে পাইল মিষ্টার বাসু খুব ব্যস্ত ভাবে নিজের সুট্‌কেসে কাপড় জামা, আয়না চিরুণী, সাবান প্রভৃতি গুছাইতে লাগিয়া গিয়াছেন—যেন এখনই কোথায় বাহির হইয়া পড়িবেন, মরিবারও ফুরসুৎ নাই। সলিল ঘরে ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই যে সলিল এসেছিস্ ভালই হ'ল, আমি মনে কর্‌ছিলাম হয় তো যাওয়ার আগে তোর সঙ্গে আর দেখাই হবে না। একটু আগে মিষ্টার হুকা-কাশি ফোন্ করেছিলেন, ঠিক ন' টার সময়ে হাওড়ার সাত নম্বর প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে তল্পিতল্পা নিয়ে আমায় হাজির থাক্‌তে, আজকে রাত্রেই নাকি আমাদের বেনারস বেরিয়ে পড়া দরকার। দুপুর বেলা তোর সঙ্গে যে এন্‌গেজমেণ্ট করেছিলেন তা রাখ্‌তে না পারায় মাপ চেয়েছেন। তাঁর বিশেষ দোষ নেই এতে, কেননা ওঁর কাজের ধরণটাই এই রকম কিনা! যে কাজে হাত দিয়েছেন দৈবাৎ হয় তো তার একটা সূত্র মিলে গেল; তখন আর সমস্ত কাজকর্ম্ম পণ্ড করে তক্ষুণি সেই সরু সুতোটুকু ধরে ধরে এগোন ছাড়া আর উপায় থাকে না। এই রকমই একটা সূত্র মিলে যাওয়ায়—ওকি, তুই অমন কর্‌ছিস্ কেন?"

বাস্তবিক, সলিলের চোখমুখের অবস্থা যেন আর স্বাভাবিক ছিল না। পার্শী সওদাগরের কথায় ইতিমধ্যেই তার বুকের ভিতর তুফান উঠিয়াছিল, তার পর ঘরে ঢুকিয়াই যখন শুনিল মিষ্টার বাসু হুকা-কাশির সহিত একযোগে সোনার হরিণ উদ্ধার করিতে কাশী রওনা হইয়া যাইতেছেন তখন সে যেন একেবারেই মুষড়াইয়া পড়িল।

মিষ্টার বাসু আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোর কি কোন অসুখ করেছে সলিল?"

"না।" তার পর একটু থামিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "তুমি এ ব্যাপারের মধ্যে যেও না মেজদা'। এ দস্তুর মত আগুন নিয়ে খেলা - পদে পদে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।"

মিষ্টার বাসু হাসিলেন, "নারে, না, তুই নিশ্চিন্ত থাক্। এ ছ্যাচড়া গুণ্ডাদের সাধ্য কি আমার কোন রকম ক্ষতি করে? শিকাগো-ফের্‌তা আমি সেটা ভুলে যাচ্ছিস্! আর তা ছাড়া ভেবে দেখ্, আমরা সব জলজ্যান্ত উপস্থিত থাকৃতে শুধু ধাপ্পাবাজীর জোরে কেউ

দাদার এত সাধের এত দামী জিনিষটা বেমালুম হজম করে ফেল্‌বে, একি সহ্য করা সম্ভব? অহিভূষণ চৌধুরী বাস্তবিকই নিজে থেকে দাদার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, নাকি তার পেছনে দাঁড়িয়ে অন্য কোন মাথা-ওয়ালা লোক কলের পুতুলের মত তাকে চালিয়েছে, সে সমস্ত খুঁটি-নাটি একটী একটী করে বার করে তবে আমি ছাড়্‌ব। জানিস্ তো আমার গোঁ!"

সলিলের মুখে এবার যেন রক্তের আর বাষ্পটুকুও অবশিষ্ট রহিল না। তার বুকের ঢিব্ ঢিব্ যেন বাহির হইতে স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। মিষ্টার বাসু সলিলের এই অস্বাভাবিক ভাবান্তর স্পষ্ট লক্ষ্য করিলেন। গুণ্ডার কবলে পড়িবার তাঁর সম্ভাবনা আছে এবং সেইজন্য ভাইয়ের একটা স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু বাস্তবিকই কি শুধু তাই? তাহা হইলে বিশেষ করিয়া তাঁর শেষ কথাগুলি শুনিবার পরই সলিলের মুখ অমন কাগজের মত সাদা হইবার মানে কি? যেমন করিয়াই হোক্ অহিভূষণ চৌধুরীর রহস্য তিনি ভেদ করিবেন এ কথা বলায় অমন ধারা আঁৎকাইয়া ওঠার কি আছে? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বার কয়েক সলিলের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলেন, তার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাইলেন। সলিল মুখে কি একটা কথা উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল, কেননা ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পাশের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিলেন স্বয়ং দ্বারকানাথ।

"ডক্টর মৈত্র কাল বেলা তিনটের সময় আস্‌বেন বলেছেন, না?" মিষ্টার বাসুর দিকে তাকাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিষ্টার বাসু সুট্‌কেসে আবার হাত দিয়াছিলেন, জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, সেই রকমই কথা আছে বটে, তবে আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অপারেশনটা বন্ধ রাখ্‌তে হবে—সন্তোষকে সব বুঝিয়ে বলে রেখেছি।"

"বুঝিয়ে বলে রেখেছিস্? তার মানে তুই কোথাও বাইরে বেরোচ্ছিস্ নাকি?"

"হ্যাঁ, একবার কাশী যেতে হবে।"

"কাশী যেতে হবে কেন?"

অসুখে মানুষের মনের তেজ অনেকখানি নিভাইয়া আনে; তাঁর এই অসম্ভব রকমের তেজী দাদাটি যে বহু দিন রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া বর্ত্তমানে খানিকটা 'ভেতো' স্বভাব পাইতে বসিয়াছেন, দেশের মাটীতে পা দিয়াই বোধ করি মিষ্টার বাসু তাহা বুঝিয়াছিলেন। পাছে গুণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযানের কথা শুনিয়া তিনিও ভড়্‌কাইয়া যান এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তিনি কহিলেন, "হুকা-কাশি সঙ্গে নিতে চাইছেন, আমি গেলে তাঁর নাকি কিছু উপকার হবে। ডক্টর মৈত্র বলেছেন, অপারেশনের খুব বেশী তাড়াতাড়ি নেই, কাজেই আমি ফিরে এলেও তা হতে পার্‌বে। যাতে

খুব বেশী দিন বাইরে থাকৃতে না হয় তারই চেষ্টা করা যাবে'খুন।" শেষের কথাটুকু অবশ্য তিনি যোগ করিলেন দ্বারকানাথকে প্রবোধ দিবার জন্য।

হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া মিষ্টার বাস্থ যখন পৌঁছিলেন ট্রেন ছাড়িবার তখন মাত্র মিনিট পনেরো দেরী আছে। ভিতরে ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি তিনি এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্ম্মটা একবার ঘুরিয়া লইলেন, তার পর প্রত্যেকটি কামরার কাছে আসিয়া উঁকি মারিয়া মারিয়া দেখিতে লাগিলেন—নাঃ, মিষ্টার হুকা-কাশি এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। তবে 'বার্থ্' যথারীতি রিজার্ভ্ হইয়াছে বটে।

যে গাড়ীখানায় 'বার্থ রিজার্ভ্' হইয়াছিল তারই সামান্য একটু দূরে প্ল্যাটফর্ম্মে আঁটা রেল কোম্পানীর একটা বেঞ্চি দেখিতে পাইয়া মিষ্টার বাস্থ সেইখানে গিয়া বসিলেন। বেঞ্চিটা যে একেবারে খালি ছিল তা নয়, অপর প্রান্তে আর একটি লোক বসিয়া ছিল; পরনে তার খাকি রংয়ের শর্ট্ এবং শার্ট, পায়ে স-পট্টি বুট্ আর হাতে এক গাছা শক্ত বাঁশের পুরুষ্টু লাঠি। সবচেয়ে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সে তার মাথার ফেল্ট্ হ্যাট্টা সাম্নের দিকে প্রায় ভ্রূর কাছাকাছি পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। মিষ্টার বাস্থ জানিতেন, এ ভাবে টুপি পরে সাধারণতঃ কেবল তারাই যারা কোন কারণে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখিতে চায়। স্বভাবতঃই তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন; অস্বস্তির ভাব তাঁর ক্রমে আরও বাড়িয়া গেল যখন তিনি স্পষ্ট টের পাইলেন যে লোকটা টুপির আড়াল হইতে তাঁর পানে ঘন ঘন চোরা কটাক্ষ হানিতেছে।

এদিকে গাড়ী ছাড়িবার সময়ও কাছাইয়া আসিল—ঢং ঢং করিয়া পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িয়া গেল—অথচ হুকা-কাশির তখন পর্য্যন্ত দেখা নাই। মিষ্টার বাস্থ এইবার দস্তুরমত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কী যে তাঁর কর্ত্তব্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। হঠাৎ দেখেন শর্ট্ পরা সেই লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; তার পর মিষ্টার বাস্থর একেবারে কাছে আসিয়া খাটো গলায় তাড়াতাড়ি বলিল, "কোন জবাব না দিয়ে সটান গাড়ীতে উঠে পড়ুন গে'। গাড়ী মোশান দিলে তবে আমি চাপ্ব। অন্যান্য কথা পরে হবে—আমি হুকা-কাশি।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে পর মিষ্টার বাস্থ বলিলেন, "আমি কৌতূহলে মারা যাচ্ছি মিষ্টার হুকা-কাশি, আমায় শীগ্গির খুলে বলুন হঠাৎ আপনার এ রকম ভোল বদ্লাবার মানে কি? আমি তো দূরের কথা, আপনার মা জীবিত থাক্লে তিনি পর্য্যন্ত এ বেশে আপনাকে চিন্তে পার্তেন কিনা বিশেষ সন্দেহ।"

তুইজন সাহেব ছাড়া গাড়ীতে আর কেউ ছিল না, হুকা-কাশি তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত

হইয়া বলিলেন, "অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন! যাকে চোখে দেখ্তে পাচ্ছি কৌশলের জালে ফেলে তাকে কাবু করে আনা সম্ভব, কিন্তু যে শত্রু কেবল ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে থেকেই বাণ ছোড়ে তাকে বাগে আন্তে হলে নিজেকেও মেঘের আড়ালে নিয়ে যাওয়া দরকার নয় কি? আজকে সারাদিনে আমার ওপর ক'বার আক্রমণ হয়েছে জানেন? তু' তু' বার।"

মিষ্টার বাস্থ সবিস্ময়ে তুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "সে কি কথা!"

"হ্যাঁ। আক্রমণের উদ্দেশ্য অবশ্যি প্রাণে মারা নয়, যাতে আমি মাসখানেকের ভেতর কিছুতেই কল্কাতার সহর ছেড়ে যেতে না পারি তারই ব্যবস্থা করা। তাদের চোখে খুব জোর ধূলোটা দেওয়া গেল, কি বলেন?"

"তা বটে, কিন্তু আপনার ওপর ওরা যদি খুব কড়া নজর রেখে থাকে তবে তো কালকেই টের পাবে যে পাখী শিক্লি কেটে উড়ে গেছে!"

"না, তা পাবে না।"

"পাবে না?"

"না। আমার বাড়ীর সাম্নে উপস্থিত হলে তারা দেখ্তে পাবে অমৃত ওষুধের শিশি, তূলো-ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ঘন ঘন ঘরবার করছে, ডাক্তারের পোষাকে একজন দিনে তু'বার করে আস্ছেন—মোটর থেকে নাম্বার এবং মোটরে ওঠ্বার সময় তাঁর ষ্টিথস্কোপ আর ব্যাগটা যাতে কারো নজরই না এড়ায় সে রকম উপদেশও দেওয়া হয়েছে। সকালে বিকেলে উদ্বিগ্ন মুখে তু'চার জন বন্ধুবান্ধবও খবরাখবর নিতে আস্বে; এক কথায় পাড়াময় রটে যাবে, কাল রাত্তিরে হুকা-কাশির একটা সাংঘাতিক মোটর-অ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়ে গেছে, বেশ কিছু দিনের জন্য তিনি এখন শয্যাশায়ী। অমৃত খুব হুঁসিয়ার আছে, সব ঠিকমত ম্যানেজ্ করে নেবে।" বলিয়া হুকা-কাশি চোখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। মিষ্টার বাস্থও হাসিলেন, কহিলেন, "রহস্য তবে খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছে বলুন!"

"দারুণ। কিন্তু আর কথা নয়, এবার শুয়ে পড়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখুন। কাল্কে কত ঝড়-ঝাপ্টা সইতে হবে, ঘুমোবার সময়ই আদবে পাবেন কিনা, কে জানে? কাজেই আজকে যেটা সহজলভ্য সেটাকে মাটী কর্বার কোন মানে হয় না; শুয়ে পড়ুন।"

পরদিন বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে তাঁরা পৌঁছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সেদিন ষ্টেশনে একখানিও ট্যাক্সি ছিল না, অনেকক্ষণ এদিক্ ওদিক্ করিয়া শেষে তাঁরা একটি টঙ্গা লইলেন। আপাততঃ ভেলুপুরার "সুমিত্র নিকেতনে" তাঁরা উঠিবেন, কাজেই ভেলুপুরা যাইবার জন্যই টঙ্গাওয়ালাকে আদেশ দেওয়া হইল। গাড়ী মাত্র বিশ পঁচিশ গজ গিয়াছে এমন সময় হাত

তুলিয়া একটা লোক গাড়োয়ানকে থামিবার ইঙ্গিত করিল। গাড়োয়ান্ থামিলে তার সহিত লোকটার গুটিকয়েক কথা হইল, তারপরেই হুকা-কাশি দেখেন, টঙ্গার সাম্‌নে চালকের পাশে যে খালি আসনটুকু আছে লোকটা সেইখানে উঠিবার উপক্রম করিতেছে। হুকা-কাশি টঙ্গাওয়ালাকে ধম্‌কাইয়া উঠিলেন, গোটা গাড়ী তাঁরা ভাড়া লইয়াছেন, কেন সে 'জিয়াদা সোয়ারী' লইতেছে। জবাবে সে হিন্দিতে কহিল, "হুজুর, এ লোকটা শিবালা যাবে, সেয়ারে গেলে ভাড়া অনেক কম পড়্‌বে তাই উঠ্‌তে চায়; আর আমিও গরীব লোক, ছুটো পয়সা যদি বেশী পাই...আপনাদের তো 'তখ্‌লিফ্' কিছু নেই!"

"তখ্‌লিফ্ টখ্‌লিফ্ বুঝি না বাপু, শীগ্‌গির নামিয়ে দাও, ওসব চল্‌বে না।"

খানিকক্ষণ বাদে ভেলুপুরা রোডে গাড়ী মোড় ফিরিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ যেন বিদ্যুতের খোঁচা খাইয়া হুকা-কাশি সজাগ হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, বিস্ময়ের যেন তাঁর আর অবধি রহিল না। শিবালা যাইবে বলিয়া যে লোকটা একটু আগেই টঙ্গায় উঠিতে চাহিয়াছিল, শিবালায় সে মোটেই যায় নাই, ভেলুপুরাতেই একটা গলির মোড়ে চোখ-কান সজাগ করিয়া ঠিক যেন 'ওঁৎ' পাতিয়া আছে; তার পাশেই একটা বাইসিকেল। হুকা-কাশির সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই নিমেষের মধ্যে কোথায় যে সে মিলাইয়া গেল তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না।

ব্যাপারটা মিষ্টার বাসুও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, হুকা-কাশির গায়ে একটু মৃদু ঠেলা দিয়া তিনি বলিলেন, "একটা জিনিষ দেখ্‌তে পেলেন কি?"

হুকা-কাশি চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুখে শুধু বলিলেন, "হুঁ।" হাজারো রকমের চিন্তা তখন তাঁর মনের কোণে উঁকি দিতেছিল। তাঁর সমস্ত চাতুরি, সমস্ত কৌশলই কি তবে ব্যর্থ হইয়া গেল? তা যদি হয় তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে লোকগুলি সর্ব্বজ্ঞ, নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ।

'সুমিত্র নিকেতন' একটা বাঙ্গালী-পরিচালিত বোর্ডিং-হাউস; সেখানে পৌঁছিয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দু'জনে স্নানাহার সারিয়া লইলেন, তার পরেই হুকা-কাশি বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। মিষ্টার বাসু প্রশ্ন করিলেন, "এখন কোথায় যেতে হবে?"

"পাঁড়ের হাউলি।"

"কেন, সেখানে কি?"

"একটু বাদেই বুঝ্‌তে পারবেন।"

পাঁড়ের হাউলি অঞ্চলে পৌঁছিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট নম্বরের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হুকা-কাশি ঘন ঘন কড়া নাড়িতে লাগিলেন। উপর হইতে প্রশ্ন আসিল, "কে?"

"একবার নীচে আস্‌বেন?"

"কাকে চাই আপনার বলুন না!"

"রণজিৎ বাবু বাড়ী আছেন?"

মনে হইল এক সঙ্গে তিন চারিটা সিঁড়ি লাফাইতে লাফাইতে কে যেন নীচে নামিয়া আসিতেছে। একটু পরেই কুড়ি বাইশ বছরের এক ছোক্‌রা দরজা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোত্থেকে আস্‌ছেন আপনারা?" ঠিক সেই সময়ে এক বৃদ্ধা মহিলাও গঙ্গাস্নান সারিয়া এই বাড়ীরই দরজার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হুকা-কাশি বলিলেন, "রণজিৎ বাবুকে ডেকে দিন, তিনি সমস্তই বুঝ্‌বেন।"

ছেলেটি সন্দিগ্ধ ভাবে একবার তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া শেষে কহিল, "আপনি কি কোন খবরই তবে জানেন না?......কাল বিকেল থেকে তাঁর কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি তিনি বেঁচে আছেন কিনা—"

তুই কোথা গেলি রে!

ছেলেটির কথা শেষ হইতে পারিল না, উপস্থিত বৃদ্ধাটি একেবারে মড়াকান্না তুলিয়া দিলেন, "ওরে রণজিৎরে, তুই কোথা গেলিরে! দিদিকে আমি কি বল্‌ব রে! সেদিন তুই কচুরি খেতে চাইলি, ঘরে ময়দা ছিল না রে! ওরে আমি হতভাগী কেন দোকানে ময়দা আন্‌তে পাঠালুম না রে!......"

হুকা-কাশি রুমাল দিয়া ঘন ঘন কপাল মুছিতে লাগিলেন, মিষ্টার বাসু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

জীবন ও মরণের বিচিত্র দোলায়

(লেখক ও শিল্পী—শ্রীসত্যগোপাল)

ঘটনাটা ঘটেছিল খারাবাদে—অনেক দিন আগে। এমন বিচিত্র ব্যাপার এর আগে আমি তো শুনিই নি, অন্য কেউ শুনেছে ব'লেও জানি না। মনে প'ড়লে এখনো স্তম্ভিত হ'য়ে পড়ি। এক সঙ্গে হু হু ক'রে টিপের কথা, 'ওপাল' বসানো আংটির কথা, টিপের কীর্ত্তি আর মিঃ জিজিভাই-এর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ভেসে ওঠে। সেই কথাই আজ সবিস্তারে বল্‌ছি। বোম্বাই আর পুণার মধ্যে ঘাটপর্ব্বতের পশ্চিম পদপ্রান্তে খারাবাদ। বোম্বাই থেকে এইখানে আমি বদলি হ'য়ে আসি। বেশ চমৎকার জায়গা। এইখানেই মিঃ ফ্রামজী জিজিভাই-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর বাড়ীটা ছিল আমার বাসার কাছেই। তিনি জাতে ছিলেন পার্শী, এবং বেশ মিশুক ভদ্রলোক। আলাপ হওয়ার পর থেকে পরস্পরের সংস্পর্শে যাতায়াত কর্‌তে কর্‌তে কিছু দিনের মধ্যেই আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'য়ে উঠ্‌লাম। তাঁর বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙ্গুলে একটা আংটি সর্ব্বদাই দেখ্‌তাম। আংটিটা ছিল সোনার, খুব সুন্দর কারুকার্য্য খচিত, আর তার মাঝখানে একটা অত্যন্ত সুন্দর বড় রকমের 'ওপাল' (opal) বসানো ছিল। আমি পাকা জহুরী, নই তবু এ ধরণের যত রত্ন দেখেছি তার মধ্যে এটিই সব থেকে সুন্দর;—আর এটা খুব ঠিক কথা যে, মিঃ জিজিভাই-এর ক'ড়ে আঙ্গুলটির দাম কয়েক হাজার টাকার কম ছিল না! গল্পের মধ্যে এই আংটিটার প্রভাব খুবই বেশী, তাই এ সম্বন্ধে এত কথা বল্‌লাম।

একদিন চমৎকার এক সন্ধ্যেবেলায় আমার বাংলোর বারান্দায় ব'সে আমি আর তিনি জলযোগ কর্‌তে কর্‌তে গল্প ক'রছিলাম। তখন কথায় কথায় আমি আংটিটার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করলাম। তিনি আংটিটার ইতিবৃত্ত খুব সংক্ষেপে বল্‌লেন। কোন এক রাজকুমারীর ফরমাস্‌মত একটি অদ্ভুত রকমের কাজ ক'রে দেওয়াতে রাজকুমারী খুসী হ'য়ে তাঁকে ঐ আংটিটি উপহার দেন। জিজিভাই আংটিটাকে এত ভালবাসতেন যে, তিনি ব'ললেন, এ আংটি আমার সঙ্গে থাকে এবং থাকবে। আমি ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি,—এপারের দেনা শোধ ক'রে ওপারে যখন যাব, তখনও এটি আমার এই আঙ্গুল থেকে খুলে নেওয়া হবে না। আমার সঙ্গে 'দোখমা'য় যাবে। ('দোখ্‌মা' হচ্ছে পার্শীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জায়গা। ইংরেজীতে নাম—'টাওয়ার অব. সাইলেন্স' (Tower of Silence)। এর ভিতরে অনেকখানি জায়গা থাকে।

মাঝখানে একটা গর্ত্ত থাকে, সেটাকে বলে 'ভাণ্ডার'। ছাদের থেকে কয়েক ফুট নীচে কয়েকটি উঁচু পাথরের নিরেট বিছানা থাকে, তাদের নাম 'পাভি'। পার্শীরা মারা গেলে তাদের দাহ করা হয় না, কবরও দেওয়া হয় না। এই গুলির ওপর মৃত পার্শীদের দেহগুলি শুইয়ে দেওয়া হয়। বৃষ্টির জল ব'য়ে যাবার জন্য এগুলির গায়ে নালীর ব্যবস্থা আছে। শকুনিরা সমস্ত মাংস খুলে নিয়ে যাবার পর হাড়গুলো ঐখানে থেকেই রোদে শুকোয়। তার পর সেগুলোকে নীচের 'ভাণ্ডারে' ফেলে দেওয়া হয়। সেগুলি সেখানে ক্রমে ক্রমে ধূলিতে পরিণত হয়।) সেখানে শকুনিরা হাড়ের থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন ক'রে নেবার সময় হয়ত ভাগ্যক্রমে রত্নটি নিয়েই উড়ে যাবে—কোথায় তা কেউ জানে না!"

যদিও যথেষ্ট রোমাণ্টিক আইডিয়া, তবু সে সময়ে আমার মনে হ'ল এমন একখানা মূল্যবান্ সম্পত্তি ওরকম ভাবে নষ্ট করাটা নিতান্ত বেকুবী কাজ। কিন্তু আমার এ কথায় থাকবার কোন দরকার দেখলাম না, তাই আমি কোন মন্তব্যও প্রকাশ ক'রলাম না।

আমার ঠিক মনে প'ড়ছে না—সে সময়ে আমার খানসামা 'টিপ্‌' বারান্দায় ছিল কি না। তবে পরবর্ত্তী ঘটনাগুলোতে বোধ হয় সে সে সময়ে সেখানে ছিল, অন্ততঃ কাছাকাছি কোথাও থেকে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনেছিল। সে ব্যাটা ছিল এক নম্বরের চোর আর বদ্‌মাস্‌, কিন্তু কখনও সে শাস্তি পায়নি। তার আসল নাম যে কি তা-ও আমি জানতাম না। তার ভয়ানক চুরির চোটে আমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম, কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে দিতে পারিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে বোম্বাইয়ে এক দুর্ঘটনার সময়ে সে আমার প্রাণরক্ষায় সাহায্য ক'রেছিল। এই ঘটনা আমার মনে ছিল, নইলে অনেক আগেই তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যেত। যখনই সে ধরা প'ড়ত, তখনই সে ভয়ানক ভাবে প্রতিজ্ঞা ক'রত যে, এর পর সে সম্পূর্ণ ভাবে শুধ্‌রে যাবে। আর আমি যে তার কাছে কতটা ঋণী সে কথাটা সে এমন ভাবে মনে করিয়ে দিত যে, আমার প্রতিজ্ঞাও টিক্‌ত না। এইবারই শেষবার, এই কথা বুঝিয়ে দিয়ে আবার আমার কাজে সে বাহাল রইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় টিপ্‌ শোধ্‌রায় নি। কয়েক সপ্তাহ পরে আবার ঐ দৃশ্যের পুনরাভিনয় হ'ত, ফলাফলও হ'ত একই। যা'হোক পরে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াতে আমি সত্যিই খুসী হ'য়েছিলাম।

কিছু দিন—মানে কয়েকমাস পরে সেটা ঘ'ট্‌লো। একদিন সকালে বিশেষ কাজের কথায় মিঃ জিজিভাই-এর আসবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সেদিন এলেন না। এ ঘটনায় আমি যথেষ্ট আশ্চর্য্যান্বিত হ'লাম, কারণ কাজ-কর্ম্মের ব্যাপারে তিনি ভয়ানক 'পাংচুয়াল্‌' ছিলেন। পূরো একটি ঘণ্টা আমি অন্য কাজ ফেলে তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রলাম। তার পর একটি লোক এসে জানাল—মিঃ জিজিভাই মারা গেছেন। শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম।

লোকটির কথায় আরো জানা গেল,—সেইদিনই সকালে তিনি এমন হঠাৎ মারা গেছেন যে, 'দস্তুর' (পুরোহিত) রা মুমূর্ষুর জন্য প্রার্থনার পুনরুক্তি ক'রবার সময়ও পান নি। পার্শীরাও মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে খুব কম সময়ই রাখে। সূর্য্যাস্তের কিছু আগে মিঃ জিজিভাই-এর মৃতদেহ তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল টাওয়ার অফ্ সাইলেন্সে নিয়ে যাওয়া হ'ল। খারাবাদের একটু বাইরে একটা নির্জ্জন উঁচু জায়গায় এই টাওয়ারটি ছিল। তার আশেপাশে ছিল ঝুড়ি-জঙ্গল। টাওয়ারে যখন মৃতদেহ পৌছল তখন সূর্য্য ঠিক পশ্চিম দিগ্‌চক্রবালকে স্পর্শ ক'রছে। তার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আনুষঙ্গিক কাজগুলি ক'রে আত্মীয়-স্বজনেরা শোকাকুলচিত্তে খারাবাদে ফিরে এল। শকুনির দলও টাওয়ারে নাম্‌ল।

এক ঘণ্টা পরে চাঁদ উঠ্‌ল। তখন আমি আমার বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নালোকে দোখ্‌মাটা দেখতে পেলাম। জ্যোৎস্নায় সেটাকে একটা ভয়ানক—কালো দৈত্যের মত মনে হ'চ্ছিল।

আরো এক ঘণ্টা পরে টিপ্‌কে ডেকে তার খোঁজ পেলাম না। জান্‌লাম—সে প্রায় দেড় ঘণ্টা হ'ল বাড়ীতে নেই। পরে শুনেছিলাম—সেদিন এই সময়টায় একজন আফগান মেষপালক সেই নির্জ্জন পাহাড়ের পাশের ঝুড়ি-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল। তার মর্ম্ম এই :—একজন লোক পিঠের ওপর একগাছা পাকানো দড়ি নিয়ে গাছের ছায়ার আড়ালে থেকে—টাওয়ারটির চারদিকে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেইখানে খুব সতর্ক ভাবে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি সে চারদিক্ দেখে নিলে—কেউ তাকে দেখতে পেয়েছে কি-না। তার পর দোখমার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতের দড়িটার একপ্রান্ত আলসের ওপর ছুঁড়ে দিল। দড়িটার সেই প্রান্তে একটা বাঁকানো লোহার টুক্‌রো ছিল। প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, দড়িটা টানতেই হুক্‌টা মাটিতে এসে প'ড়ল। দ্বিতীয় আর তৃতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। চতুর্থবার হুকটা কোনো এক জায়গায় আটকে গেল। তার পরের মিনিটে লোকটা দড়ি বেয়ে উপরে উঠে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কয়েক মিনিট পরেই আবার আবির্ভূত হ'য়ে দড়ি বেয়ে নেমে প'ড়ল। তার এই কাজের কোন চিহ্ন না রাখবার জন্যেই সে অনেক চেষ্টা ক'রে হুকটা ছাড়িয়ে নিল। দড়িটা আবার পাকিয়ে নিয়ে লোকটা অন্তর্হিত হ'ল। যে সব শকুনিগুলো তার আবির্ভাবে উড়ে গেছ্‌ল তারা আবার তাদের উৎকট ভোজের জায়গাটিতে নেমে এল। ঘটনা-ধারায় স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারবে সে লোকটা কে।

টিপ্ যখন আমার বাংলোয় আবার দেখা দিল আমি তখন তার অনুপস্থিত থাকার কৈফিয়ৎ চাইলাম। সে যেন খুব বিপদে প'ড়ে গেছে অথচ ধৈর্য্য ধ'রে র'য়েছে—এমনি ভাবে

ব'লল, "আমার বাবা বড় অসুস্থ হ'য়ে সহরতলীতে প'ড়ে আছেন, তাঁকে আমি দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।"

তখন আমি আসল ব্যাপার কিছুই জানতাম না, তাই তার কথা বিশ্বাস হ'ল। সে রাত্রে আমার হাতে কতকগুলি জরুরি কাজ ছিল, শেষ করতে অনেক রাত হ'ল। কাজ শেষ করে আমি টিপ্‌কে ডাক্‌লাম।

আমি যে ঘরটায় ব'সে লিখ্‌ছিলাম সে ঘরে দুটো দরজা দিয়ে ঢোকা যেত, একটা বাইরের বারান্দা থেকে, আর একটা ভিতরের বারান্দা থেকে। টিপ্ আমার ডাকের জবাবে ভিতরের বারন্দার দরজায় দেখা দিল। আমি তার পানে মুখ রেখে ব'সেছিলাম, তাই, সে যখন ঘরের দরজায় দেখা দিল তখন তার সমস্ত চেহারাটাই আমার চোখে প'ড়ল। চৌকাঠ পেরিয়ে এক পা ঢুকেই সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়ল। তার মুখে চোখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠ্‌ল। তার চোয়াল ঝুলে প'ড়ল, চোখ গোল হ'য়ে উঠ্‌ল, আর, যে 'ট্রে'টা সে নিয়ে আসছিল সেটা তার কম্পমান হাত থেকে ঝন্‌ঝন্ ক'রে প'ড়ে গেল। সে রীতিমত থরথর ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল! তার আতঙ্কের কারণ যা-ই হোক—সেটা যে আমার পিছনে রয়েছে তা বুঝলাম, কিন্তু সেটা যে কি তা দেখবার জন্যে আমি ঘুরবার সময় পাবার আগেই একটি মনুষ্যাকৃতি পাগলের মত আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে টিপের গলা টিপে ধ'রল! তার আকৃতি ও গঠন ঠিক আমার মৃত বন্ধু মিঃ ফ্রামজী জিজিভাই-এর মতন!

প্রথমে আমি ভাবলাম ভূত। সন্দেহ নেই টিপ্‌ও ভেবেছিল তাই। কিন্তু বাস্তবিকই এ কুসংস্কারটা আমার ছিল না, তাই সে কথা তৎক্ষণাৎ মন থেকে ঝেড়ে দিলাম। ভূতের পক্ষে এতটা সম্ভব নয়, হতভম্ব হ'য়ে দেখ্‌লাম—তিনি জীবন্ত রক্ত-মাংসে সেই পার্শী বন্ধু! তাঁর গায়ে ছিল কেবলমাত্র সেই সামান্য পোষাক যা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তাঁকে পরানো হ'য়েছিল। তাঁর হাতের কব্জির কতকগুলো বিকৃত ক্ষত থেকে রক্ত মেঝেতে পর্য্যন্ত গড়িয়ে প'ড়ছিল। তাঁর মুখখানা ভীষণ বিবর্ণ হ'য়ে গেছ্‌ল আর চোখ দুটো রাগে জ্বল্‌ছিল। কব্জির যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা সত্বেও তিনি এমন শক্তভাবে টিপের গলা টিপে ধ'রেছিলেন যে তার চোখ দু'টো যন্ত্রণায় আর আতঙ্কে কোটর থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল!

তিনি ভয়ানক স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আমার আংটি কই? বদ্‌মাস—ডাকাত, আমার আংটি কই?"

টিপ্ উত্তরে কি যেন ব'লতে চেষ্টা ক'রল, কিন্তু তার গলা থেকে কেবল একটা অস্ফুট ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল। কাঁপতে কাঁপতে পাগড়ীর ভিতরটা হাতড়িয়ে সে সেই ওপাল-বসানো আংটিটা (যেটা মিঃ জিজিভাই-এর হাতে আমি সর্ব্বদাই দেখেছি)—বের ক'রল। মিঃ জিজিভাই

টিপের গলা ছেড়ে দিয়ে ছোঁ মেরে তাঁর হৃত সম্পত্তিটি হস্তগত ক'রলেন। টিপ্ যেই টের পেল সে মুক্ত হ'য়েছে; অম্নি সে বাইরের বারান্দার দিকের দরজা দিয়ে চট্ ক'রে বেরিয়ে প'ড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে ছুট দিল।

বন্ধুর উত্তেজনা নিভে যাওয়া মাত্র তিনি নিতান্ত অসহায় ভাবে একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়লেন। আমার মনে হ'ল তিনি হয়ত অত্যন্ত অবসাদ-বশতঃ মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়বেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে কিছু ব্রাণ্ডি আর খাবার খাওয়ালাম, তাঁর আহত কব্জি দুটোতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম, একটা পোযাকও পরিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি সুস্থ হ'য়ে উঠ্লেন। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পাইপ ধরিয়ে তাঁর কাছ থেকে এই অদ্ভুত কাণ্ডগুলোর মর্ম্ম স্পষ্ট করে জানতে চাইলাম।

দৌড়ে গিয়ে টিপের গলা টিপে ধর্‌ল

মিঃ জিজিভাই তখন তাঁর সেদিনকার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা ব'লতে সুরু ক'রলেন—

"আজ সকালে যখন আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমাকে মৃত মনে ক'রেছিল, তখন আমি 'ক্যাটালেপ্সি' রোগে আক্রান্ত হ'য়ে এক অদ্ভুত অবস্থায় প'ড়ে ছিলাম। (ক্যাটালেপ্সি এক রকম অবসাদ যার আক্রমণে মানুষকে মৃত বলে ভুল হয়। আক্রান্ত ব্যক্তিকে মৃত ব'লে মনে হ'লেও বাস্তবিক পক্ষে সে ব্যক্তি বেঁচে থাকে এবং তার অনুভব-শক্তি থাকে। অবশ্য অনেক সময় আক্রান্ত রোগী ম'রেও যায়।) আমি এর আগে কখনো ও রোগের সামান্য ছোঁয়াচও পাইনি। যদিও বাইরে থেকে আমাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে আমি মারা গেছি কিন্তু বাস্তবিকই আমার চারদিকে যে সব ব্যাপার চ'লছিল সেগুলো সব আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। আমার অত্যন্ত কষ্ট

হচ্ছিল। আর আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পার্‌ছেন, যখন ডাক্তার আমার নাড়ী দেখে ব'লে দিলেন—প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে, তখন আমি কি দারুণ আতঙ্ক আর ব্যথা পেলাম। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জোগাড়যন্ত্রও হ'য়ে গেল। শকুনিরা আমাকে জ্যান্ত থাকতে ছিঁড়ে খাবে, এই যন্ত্রণাদায়ক ভয়ানক দৃশ্য মনে মনে বিকট রঙে রঙ্গীন ভাবে দেখতে লাগ্‌লাম। কিন্তু বাস্তবিকই আমি—কথা বলা দূরের কথা—আমার চারদিকে যারা ভিড় ক'রে ছিল তাদের উদ্দেশে কোন ইঙ্গিত ও ক'রতে পারলাম না। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে স্নায়ু আর পেশীর যে সংযোগটুকু থাকে সেটুকু তখন অবশ হয়ে গেছ্‌ল—বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন। স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারলাম এমনি অসহায় ভাবে মরা ছাড়া আর উপায় নেই। যখন দোখ্‌মায় ব'য়ে নিয়ে গিয়ে 'পাভি'র ওপর রেখে দিল তখন মনে মনে আমি সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিলাম। আমি জান্‌তাম—শরীর থেকে সমস্ত মাংস ছিঁড়ে নিতে মাত্র এক ঘণ্টা লাগে। আমার বন্ধুরা আমাকে সেই ভীষণ নির্জ্জনতার মধ্যে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। তার আগে শকুনিগুলো ওপরে ঘুরে ঘুরে উড়ছিল, এবার তারা সব নেমে এল,—এক দঙ্গল। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—প্রথমে তারা আমার শরীরের কোন্ অংশটাকে আক্রমণ ক'রবে। অনেক আগেই আমি বাঁচবার সমস্ত আশাই ত্যাগ ক'রেছিলাম, এখন কেবল প্রার্থনা ক'রতে লাগলাম, মৃত্যু শীগ্‌গির আমাকে গ্রাস করুক, শকুনিগুলো এমন কোন অংশে ভোজ লাগিয়ে দিক যাতে ধীরে ধীরে অসীম কষ্ট ভোগ ক'রে—মৃত্যুর কবলে না পড়ি। তখন মনে হচ্ছিল যত শীগ্‌গির মরণ হয়, ততই ভালো।

"কিন্তু আমার প্রার্থনা পূর্ণ হ'ল না। কে জানে—হয়ত শিকারী পাখীগুলো জান্‌তে পেরেছিল যে আমার বুকের মধ্যে জীবনের দীপ তখনও সম্পূর্ণ ভাবে নিভে যায় নি; কিংবা হয়ত সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা কোন উপায়ে তাদের আট্‌কে রেখেছিলেন। যা-ই হোক, এটুকু আমি জানি যে, যদিও শকুনিগুলো আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ঝট্‌পটিয়ে উড়ে বস্‌ছিল, এমন কি সময় সময় তাদের পাখার ঝাপটার হাওয়া আমার গায়ে লাগ্‌ছিল, তবু যতক্ষণ আমি 'পাভি'র ওপর আমার অসাড় শরীরটা নিয়ে প'ড়েছিলাম ততক্ষণ আমার চুলের ডগাতেও আমি কোন আঘাত পাইনি।

"রাত্রি হ'ল, চাঁদ উঠ্‌ল, আমি তখনও সেখানে সেইভাবে প'ড়ে। শকুনিগুলো প্রহরীর মত আল্‌সের ওপর সারে সারে ব'সে ছিল। মাঝে মাঝে ঝট্‌পট্ ক'রে উঠে চারদিকে ঘুর্‌ছিল। আমার প্রাণশক্তিটুকু চ'লে যাবার অপেক্ষাতেই তারা ব'সেছিল। সে এক অবর্ণনীয় ভয়ানক ভাব। হঠাৎ শকুনিগুলো এক সঙ্গে আকাশে উড়ে গেল; পরমুহূর্ত্তে কে একজন একটা দড়ি ছুঁড়ল, আবার টেনেও নিল। তিনবার এই রকম হ'ল। চতুর্থবার কে জানে কি ক'রে দড়িটা আট্‌কে গেল। তার খানিকপরেই আপনার ঐ বদমাস্ চাকরটার মাথা আর কাঁধ দেখ্‌তে

পেলাম। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক যেখান দিয়ে সে দোখ্‌মায় উঠ্‌ছিল সেখানটা আমার চোখের সামনেই প'ড়ছিল। নয়ত আমি জানতেও পারতাম না ডাকাতটিকে। কারণ, আমার অন্যান্য অঙ্গের মত আমি চোখও নাড়তে পারছিলাম না। লাফ দিয়ে এসে টিপ্ আমার আঙ্গুল থেকে ছোঁ মেরে আংটিটা খুলে নিয়ে সেই পথেই নেমে গেল।

"সে যাওয়ার কিছু পরেই শকুনিগুলো আবার নেমে এল। একটা প্রকাণ্ড শকুনি আমার বুকের ওপর দিয়ে এমন ঝাপ্‌টা মেরে এলো যে, আমি মনে ক'রলাম সে বুঝি এই দিল আমার চোখদুটো উপ্‌ড়ে। কিন্তু ঘুরে গিয়ে আল্‌সের ওপর ব'স্‌ল।

"কয়েক ঘণ্টা সেই ভাবেই কেটে গেল। হঠাৎ—একেবারে অত্যন্ত অকস্মাৎ আমি টের পেলাম আমার স্বাভাবিক শক্তি আমি ফিরে পেয়েছি। আঃ, আমার মুক্তির সময় এসে প'ড়েছে বুঝ্‌তে পেরে কি আনন্দই না হ'ল!—বাস্তবিক, খুব তাড়াতাড়ি আমি সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লাম, তবে অবসাদে বেশ দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছি বুঝতে পারলাম। আমি লাফিয়ে উঠে আনন্দে পায়চারি ক'রতে লাগ্‌লাম। শকুনিগুলো আমার সেই অপ্রত্যাশিত পুনর্জ্জীবন-লাভে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমার কষ্টের শেষ তখনও হয় নি। দোখ্‌মার থেকে বেরুবার উপায় একমাত্র টিপ্ যা ক'রেছিল সেই ভাবেই হ'তে পারে। দোখ্‌মাটার দেওয়ালও প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু, কোথাও কোন খোঁজ্-খাঁজ্ নেই,—একেবারে মসৃণ। লাফিয়ে নীচে প'ড়তে হ'লে ঘাড়টি নির্ঘাৎ ভেঙ্গে যাবে। কি করা যায় তাহ'লে!

"আমি একেবারে 'মরিয়া' হ'য়ে উঠেছিলাম। সেই ভয়ঙ্কর জায়গায় কিছুতেই থাকতে পারা যায় না। পালাবার চেষ্টা ক'রতেই হবে—ক'রতেই হবে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে সৌভাগ্যক্রমে সমস্যাটার মীমাংসা হ'য়ে গেল। চমৎকার একটা ফন্দী মগজে এসে প'ড়ল। তৎক্ষণাৎ সেটা কাজে খাটাবার জন্য প্রস্তুত হ'লাম।

"আগেকার জায়গাটিতে আমি ঠিক সেই ভাবে সোজা হ'য়ে প'ড়ে রইলাম। শীগ্‌গিরই আবার শকুনিগুলো ফিরে এসে আমার চারধারে ঘিরে ব'স্‌ল। ভালো রকম একটা সুযোগের জন্যে খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা ক'রে আমি একটা প্রকাণ্ড শকুনির পা দুটো হঠাৎ ধ'রে ফেল্‌লাম। সেটা খুব কাছে ছিল ব'লেই আচম্‌কা ধ'রে ফেল্‌তে পারলাম। কিন্তু পাখীটা ভয়ানক ঝট্‌পট্ ক'রতে ক'রতে ছাড়া পাবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল। কি ভীষণ ভাবে কব্জিতে ঠুক্‌রেছে—তা' তো দেখ্‌লেনই আপনি। কিন্তু তাতেও আমি ছাড়ি নি, শক্ত ক'রে হাতে তার দু'পা ধ'রে আলসের ধারে গিয়ে লাফ মারলাম।

"আমার মনে হ'ল মাটিতে প'ড়তে যেন অনেকখানি সময় লাগ্‌ল। তবু—আমার পরীক্ষাটা ঠিকই খাট্‌ল। প্রকাণ্ড পাখীটা উড়বার জন্য ঝট্‌পট্ ক'রে যে চেষ্টাটা ক'রছিল

তার দরুণ পতনের পূর্ণ বেগ রইল না। আমি একেবারে সোজা মাটিতে প'ড়লাম। প'ড়েই শকুনিটাকে ছেড়ে দিলাম, সেটা আকাশে উঠে উধাও হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে, ডাকাতটা বমালশুদ্ধ স'রে পড়ার আগেই তাকে পাকড়াও ক'রবার জন্যে আমি সটান এইখানেই এসে প'ড়লাম। ভগবান্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ যে সে কাজটাতেও তাঁর দয়ায় সফলকাম হ'তে পেরেছি। এ অভিজ্ঞতা জীবনে ভুলবার নয়!"

* * *

বলা বাহুল্য টিপের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।*

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

এল কালবোশেখীর ঝড়

(শ্রীভারতী দেবী)

এলো রে ঐ আকাশ ছেয়ে কালবোশেখীর ঝড়,
মেঘের গুরুধ্বনি মাঝে
কোন্ সে ক্ষ্যাপার ডঙ্কা বাজে!
প্রলয়-নাচন নাচ্‌ছে যেন রুদ্র ভয়ঙ্কর!

আকাশ-মাঝে এলিয়ে দিল মেঘের জটা কার?
তড়িৎ-শিখা চিক্‌মিকিয়ে চম্‌কে বারম্বার।

---

* সত্য ঘটনা বলিয়া বিবৃত একটা ইংরাজী কাহিনী হইতে। বর্ণনাকারী নিজের পরিচয় দেন নাই—লেখক

উতল হাওয়ার হাহা-স্বনে
শঙ্কা জাগে পাখীর মনে,
নিভ্‌ল প্রদীপ ঘরের কোণে, শঙ্কিত অন্তর !
এল কালবোশেখীর ঝড় ।

এক রাত্রের অতিথি

(শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

শিলং পাহাড় ।

আজ ক'দিন থেকেই বেশ বৃষ্টি নেমেছে, সন্ধ্যের আগেই মনে হয় রাত হল বুঝি ! নীচের ঝর্ণাটা ফেনিয়ে উঠেছে—পাইন্ বনে ঝড় !

খাসিয়াপল্লীতে আজ আবার ভূতের পূজো। তাদের কড়কড়ে বাজ্‌না দুর্য্যোগকে যেন আরও বাড়িয়ে তোলে। এম্‌নিতেই ব'লে বেশ ভয় ভয় করে, তার ওপর আবার শোবার সময় ননী, কমল আর রাণু ভূতের গল্প শুনেছে—ওদের গা বেশ ছম্‌ছম্ কর্‌ছিল, কিন্তু তারপর ওরা যে কখন ঘুমিয়ে পড়্‌ল তা' আর মনে পড়ে না।

রাত তখন অনেক ।

কি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে রাণুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কোথাও জনপ্রাণী জেগে নেই—কেবল পাইন্ বনে ঝড়ের ফোঁসফোঁসানি, নীচে ঝর্ণার হাহাকার। ভীষণ ভয় হওয়া সত্ত্বেও রাণু কমল বা ননীকে ডাক্‌তে সাহস কর্‌ল না—এই মাঝ-রাতে ঘুম ভাঙ্গালে ওরা যে খুব খুসি হ'বে ব'লে ত' মনে হয় না। কিন্তু ঘুম আর কোনমতেই আসে না, যত রাজ্যের ভূতের গল্প কি এই অসময়েই মনে পড়ে !

এমন সময় হঠাৎ ঘরের কোণায় কি যেন একটা হ'ল—একটা খুব জোরে শব্দ !

হাউমাউ করে ও চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—পাশের ঘর থেকে মা বাবা এসে আলো জ্বালিয়ে ফেল্লেন, কমল উঠ্‌ল, ননী ভ্যাবাচাকা খেয়ে চোখ রগ্‌ড়াতে আরম্ভ কর্‌ল ! ঘটনাটাকে রাণু দশগুণ বাড়িয়ে বল্ল ; তাই শুনে কমল বল্ল যে ভূতের নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তার গায়ে পড়েছে—ননীও নাকি ওদের চাপাগলার ফিস্‌ফিস্ করে কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পেয়েছে !

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা আবিষ্কার কর্‌তে বেশী দেরী হ'ল না—ঘরের কোণায় 'কলে' ইঁদুর পড়েছে ! মা বাবা হাস্‌তে হাস্‌তে শুতে গেলেন !

কমল রেগে বল্লে "আচ্ছা ভীতু ত তুই রাণু ! ইঁদুরকে মনে করিস্ ভূত !"

রাণু হেসে বল্লে, "তবুও যদি না নিজের গায়ে ভূতের নিঃশ্বাস পড়্‌ত !"

ভালমানুষ গোছের ছেলে ননী দেখ্‌লে মহা মুস্কিল, এদের ঝগড়া বাধে বুঝি ! তাই ব্যাপারটা সে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিলে—যত নষ্টের গোড়া ঐ ইঁদুরটা। এতে কমলেরও অমত নেই, রাণুরও না, অবশ্য ইঁদুরটার আছে কি না বোঝা গেল না।

দোষ যখন ইঁদুরটা করেছে তখন শাস্তি তাকে পেতে হবেই—তিনজনে কলটাকে ঘিরে বসে পরামর্শ সুরু কর্‌ল কোন্ ধরণের শাস্তি ওর পাওয়া দরকার।

অনেকক্ষণ আলোচনার পর হঠাৎ ননী বলে উঠ্‌ল—"আহা ! বেচারা কি রকম মুখটা কাঁচুমাচু করে বসে আছে দেখেছিস্ ?" "তাই ত" রাণু করুণায় যেন উথ্‌লে উঠ্‌ল, "আহা, বড় ভাল মানুষ গোছের ওর মুখ !"

ননী বল্লে, "বেশ বুড়ো হ'য়ে পড়েছে রে !"

রাণু বল্লে, "তবু এই শীতের রাতে বোধ হয় ওর পুঁচ্‌কে পুঁচ্‌কে ছেলেপুলেদের জন্যে খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে !"

ননী ভারী গলায় বল্লে, "কি সহ্য-গুণ !"

এতক্ষণে কমলেরও করুণা হ'য়েছে, সে বল্ল, "ওর বোধ হয় বড় শীত কর্‌ছে, না রে রাণু !"

"বোধ হয়, কিন্তু বেচারার ক্ষিদেও খুব পেয়েছে !"

"পাবে না ? কতক্ষণ ঘর থেকে বেরিয়েছে বল্ ত' !"

বিস্কুটের টিন্ খুলে ইঁদুরটার ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করা হ'ল। কমল হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—"আমার সঙ্গে ওর ভারী ভাব হ'য়ে গেছে রে, দেখ্‌বি বার ক'রে আদর কর্‌ব !" এই বলে সে ইঁদুরটাকে বার কর্‌তে গেল।

রাণু আর ননী তখন তর্ক কর্‌ছে ওর কি নাম রাখা হবে এই নিয়ে, এমন সময় মাথায় প্রবল চাঁটি খেয়ে তারা ফিরে তাকাল, শুন্‌লে কমল বল্‌ছে—"আগেই বলেছিলাম ব্যাটার মৎলব খারাপ !" অকৃতজ্ঞ ইঁদুরটা নাকি ছাড়া পেয়েই কমলের হাতে অভদ্রোচিত কামড় দিয়ে পালিয়ে গেছে। কখন যে কমল এ কথা বলেছিল, রাণু বা ননী তা শোনে নি, তবু ননী মুখটা ভার করে বল্ল, "আহা, বেচারার বোধ হয় বাড়ীর জন্যে বড় মন-কেমন কর্‌ছিল—কতক্ষণ ছেলেপুলে ছেড়ে আছে বল্ দেখি !..."

কিন্তু কথা আর তাকে শেষ করতে হ'ল না—কমল হাতে ফুঁ দিতে দিতে দাঁত খিঁচিয়ে উঠ্‌ল, "যাঃ, শুগে যাঃ!"

রাণুর কিন্তু অনেকক্ষণ আর ঘুম হয় নি—বারবার সে ননীকে চুপিচুপি বলেছে—আহা, বেচারাকে ত' বলে দেওয়া হয় নি যে বাগানের দিকে তাদের শেষ সিঁড়িটা ভাঙ্গা আছে, বেচারা যদি মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে! একে এই দুর্যোগের রাত!

খোকার কথা

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ)

সাঁঝের আঁধার নেমে এল, আয় মা, আমার কাছে
কতই কথা, কতই ব্যথা আমার মনে আছে;
বল্‌ব খুলে সকল কথা, মনের কথা আজ,
আয় না মাগো, বস্ না কাছে, রাখ্ না সকল কাজ।

রূপার মত চাঁদ উঠেছে নীল আকাশের গায়,
তারার দলে কর্‌ছে খেলা, ডাকছে মোরে "আয়,
মোরা যেমন আলোক দিয়ে জগৎ করি আলো
তুমি তেমন ভালবেসে মুছাও সবার কালো!"

গাছের মাথায় ফুল ফুটেছে, বন করেছে আলো,
সুবাসেতে বাতাস ভরা—দেখ্‌তে কেমন ভালো
আমার দিকেই চেয়ে যেন বলছে আমায় তারা,
"মোদের মত দাও ছড়িয়ে মনের সুবাস-ধারা।"

বাড়ীর পাশে ওই যে নদী চাঁদের আলোয় নেয়ে
কুল-কুলিয়ে যাচ্ছে মহান্ সাগর পানে ধেয়ে,
চলার গানে কি বলে যায় রোজই আমায়, মাগো,
"মহান্ পথের পথিক হবি, বসে থাকিস না কো!"

ফুল, নদী, চাঁদ আকাশ তারা সবাই আমায় বলে,
"অলস হ'য়ে থাকিস্ নাকো মিছে খেলার ছলে।"
ওদের কথায় জাগ্‌ছে বুকে আর যে কথা কত,
জগৎ মাঝে হ'তেই হবে আমায় ওদের মত।

ছোটদের চিত্রশালা

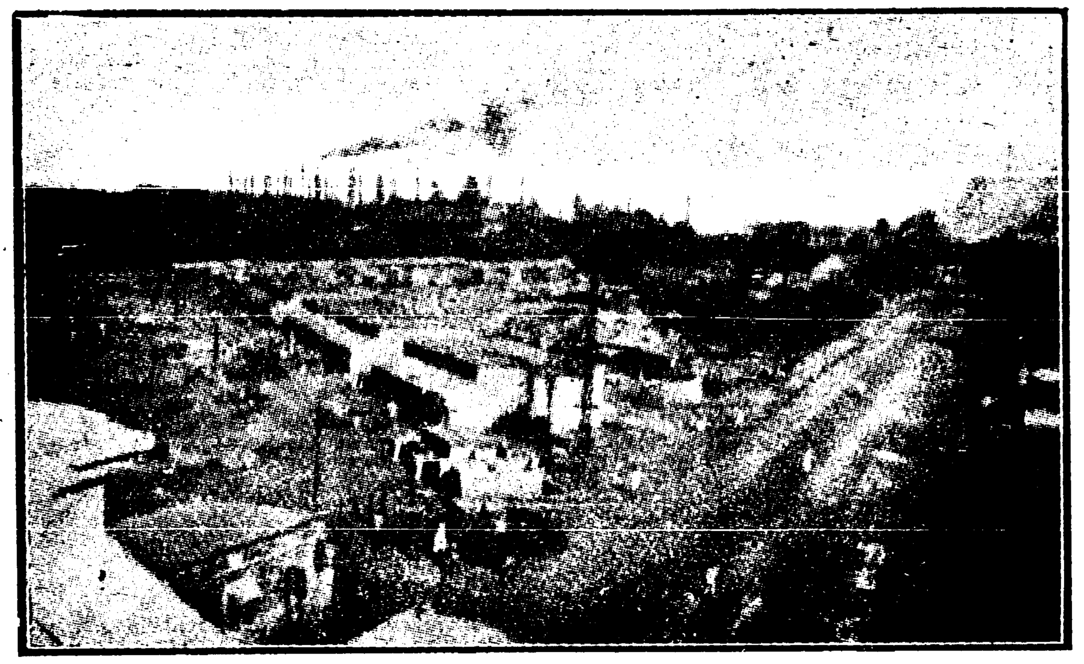

জামসেদপুরের সাধারণ দৃশ্য

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

রাহুল

উত্তরদাতাদের নাম

অখিলকুমার বিশ্বাস (শিকারপুর); খোকন ও সাধনা (যশোহর); হীরেন, কাটু, কল্যাণী; কার্ত্তিক, বলাই, রামপ্রসাদ (বেহালা)।

নূতন ধাঁধা

কাকাবাবু একটা অঙ্ক কষতে দিয়েছেন আর বলেছেন যে যে ওটা নির্ভুলভাবে কষে দিতে পারবে তাকে আজ বায়স্কোপে নিয়ে যাবেন। আশু, সুধীর, রেবা, মীরা সবাই প্রাণপণে অঙ্ক কষ্‌ছে। সাধারণ যোগ অঙ্ক—আশুরই সব চেয়ে আগে শেষ হ'ল। কিন্তু কাকাবাবু তখন কোথায় যেন গিয়েছিলেন তাই তাঁকে সেটা দেখান গেল না। এদিকে সুস্থির হয়ে বসে থাকা আশুর ধাতে নেই, সে একপাক ঘুরে আস্‌বে ঠিক কর্‌ল। হঠাৎ তার মনে হ'ল তার অনুপস্থিতিতে কেউ যদি অঙ্কটা টুকে নেয়? সে মাথা খাটিয়ে এক উপায় বার কর্‌ল। অঙ্কের প্রত্যেকটা সংখ্যার জন্য সে এক-একটা অক্ষর ঠিক করে নিল। তার পর মাঝে মাঝে সংখ্যাগুলো বদ্‌লে সেই সেই অক্ষর বসিয়ে দিল।

খানিক বাদে কাকাবাবু এসে অঙ্ক চাইলেন। সবাই দেখাল, আশুও তাড়াতাড়ি অক্ষরগুলো পাল্‌টে সংখ্যা বসাতে গিয়ে দেখে, যে কাগজে সে অক্ষর আর সংখ্যা 'নোট্‌' করে রেখেছিল সেটা সে হারিয়ে ফেলেছে। এখন উপায়? মূল অঙ্কটাও নেই যে আবার কষে দেবে। তোমরা দেখ তো, কোন্‌ অক্ষরের জায়গায় কোন্‌ সংখ্যা বসালে অঙ্কটা মেলে? মনে রেখ, এক-একটা নির্দ্দিষ্ট অক্ষরের জন্য কিন্তু এক-একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বসাতে হবে।

```
 ৪ ক ৮ খ ৫
 ২ গ ৪ ঘ ৭
 গ ৬ ঠ ২ গ
 ট ৯ চ ৮ ছ
 ৪ জ ৭ ঝ ২
 ২ গ ০ খ ০
-----------
গ ৯ খ চ ৪ চ
```

রামধনু—

ছেড়ে দে না ভাই,
খেলতে ছুটে যাই।

৯ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মা'র চিঠি

(কাদের নওয়াজ)

আজকে মাগো, তোমার চিঠি পেলাম অবেলায়,
দেখ্‌ছি তাহার বক্ষে স্নেহের মন্দাকিনী ধায়।
আঁখর ভাল কিংবা খারাপ বলুক যে যা বলে,
ভাষাতে নেই রং ফলানো কিন্তু পলে পলে—
দেখ্‌ছি আমি উহার মাঝে বুকের আশীর্ব্বাদ
ফুলের মতই ঝর্‌ছে শিরে, চাইছে সুসংবাদ।
রবি ঠাকুর বিশ্ব-কবি তাঁর কবিতার মাঝে
পাই নি যাহা দেখ্‌ছি তাহা এই চিঠিতেই রাজে।

"ইতি"র পরে ঐ যে তব নামটী আছে লেখা,
ওকি শুধুই হিজিবিজি কলম-কালির রেখা ?
কালির আঁচড় নয় গো, সেথা বদ্ধ আছে প্রাণ,
সন্তানেরি কুশল লাগি করছে সে আন্‌চান্।
দূর-প্রবাসে মাগো, আমি তোমার চিঠি আজ
মাথায় করে নিলুম্ ফেলে অন্য সকল কাজ।

বাজার করা সোজা নয়!

(শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু)

ফুটবল খেল্‌তে গিয়ে হাফ্‌প্যান্টটা ছিঁড়েছি, কিন্তু মেজ মামাকে সে দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দিতেই তিনি আগুন হয়ে ওঠেন—"আমার সময় নেই বাপু! তোমার সঙ্গে বাজারময় টো টো করা আমার কর্ম্ম না। পার গিয়ে দেখে শুনে নিজে কেন গে।"

আমি তা'তেই রাজী হই। দশ টাকার একখানা নোট্ দিয়ে তিনি বলেন—"জানি ঠিক ঠকিয়ে নেবে। দুনিয়াশুদ্ধ লোকই তোমায় ঠকায়। কিন্তু করব কি, এখন আমার একটা চকোলেট্ চাখবারও সময় নেই।"

সময় থাক্‌লেই যেন সবাই ওঁকে চাখ্‌তে দিচ্ছে! এ কেবল আমাকে রাগিয়ে দিয়ে চকোলেট্ আদায়ের ফন্দী, তা আমি বেশ বুঝেছি।

"হ্যাঁঃ, অম্‌নি ঠকালেই হ'ল! আমি কি অত কাঁচা ছেলে? আমাকে ঠকাবে এমন তো কাউকেও দেখি না ভবানীপুরে! আমাকে কি তুমি যুঁই পেয়েছ?" প্রবল প্রতিবাদ করি আমি। "আমিই না কাউকে ঠকিয়ে ফেলি এই আমার সর্ব্বদা ভয়।"

"তবে যুঁইকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। টু হেড্‌স্ আর্ বেটার্ দ্যান্ ওয়ান্,

টু নেগেটিভ্‌স্ মেক্ ওয়ান্ পজিটিভ্, টু চিল্‌ড্রেন্ মেক্ ওয়ান্—মেক্ ওয়ান্—মেক্ ওয়ান্‌টা কি মনে আস্‌ছে না তো?"

তিনি হতাশনেত্রে মামীমার দিকে তাকান। মামীমা বলে দেন—"মেক্-ওয়ান্ ম্যাড্। বেশ, ওরা দুজনেই যাক্, ক্ষেপে গেলে ঠকাবার কথা ভুলে যাবে দোকানদার।"

নামজাদা একটা পরিচ্ছদ-ভবনের ঠিকানা বাৎলে দিয়ে মেজ মামা আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করেন—"দেখিস্, দাম যা বল্‌বে তার অর্দ্ধেক বল্‌বি। নইলে ঠকে যাবি, মনে থাকে যেন।"

দোকানদার অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসে হাসিমুখে। "কি চাই খোকাবাবু? কি চাই তোমার খুকী?"

খোকাবাবু শুনেই আমি চটে গেছ্‌লাম—কেন, আমি কি খোকা? থার্ড্ ক্লাসে পড়ছি মিত্র ইস্কুলে—খোকা এখনও? অপেক্ষায় ছিলাম, যুঁইকে খুকীবাবু বল্লেই ঠাস্ ক'রে এক চড় কষিয়ে দেব। হাসিমুখ ফাঁসির মুখ হয়ে যাবে তখন।

কিন্তু না, খুব সাম্‌লে নিয়েছে লোকটা। খুকীবাবু আর বলে নি। বড্ড বাঁচা বেঁচে গেল আজ।

"একটা হাফ্‌প্যান্ট্ কত পড়বে? বেশ ভালো হাফ্‌প্যান্ট্ একটা চাই আমার।"

"কত আর! টাকা চারেক।" দোকানদার বলে।

"বড্ড বেশী দাম যে হে! অত পার্‌ব না। দু টাকা দেব আমি।" জানিয়ে দিই।

দোকানদার বলে—"দু টাকা! দু টাকায় হয় কখনও? তবে তুমি ছেলেমানুষ সেই কারণে তিন টাকা হয় তো বল।"

"অত শত আমি জানি না। দেড় টাকায় দিলে তো দিলে, নইলে এই চল্লুম।" আমি সাফ্ ব'লে দি।

"দেড় টাকা!" লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ে। "দেড় টাকায়

হাফ্প্যাণ্ট্—খুব কম হচ্ছে না কি ? তুমিই বিবেচনা কর।" লোকটা একটু ঢোঁক গিলে নেয়,—"কিন্তু খদ্দের ছেড়ে দেওয়া আমি পছন্দ করি না, বেশ ঐ দু' টাকাই দাও, তুমি নিজ মুখেই যা বলেছ। হাফ্প্যাণ্ট্টা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।"

অনুরোধে প'ড়ে আমি বিবেচনা করি—"না বাপুঃ, এক টাকা হবে, ওর বেশী নয়।"

"ও বাবা! তুমি যে ভারী শক্ত খদ্দের দেখ্ছি! যাক্, ওই দেড় টাকাতেই রফা হ'ল—প্রথম বার তোমার কাঁছে লাভ নাই করলুম্।" দোকানদার বলে।

"উঁহু, বারো আনায় হয়তো দাও।" আমি দারুণ গম্ভীর হয়ে যাই।

"য়্যাঁ ? বারো আনা! তুমি বার বার আমার পিলে চমকে দিচ্ছ।" লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়ে। "পঁচিশ বছর দোকান কর্ছি, কিন্তু এমন কঠিন বালকের পাল্লায় পড়ি নি।" দোকানের মাথায় টাঙানো দণ্ডায়মান পরমহংসদেবের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে তাঁর হাতের ভঙ্গীর অনুকরণ করে বলে—"কিন্তু কি আর করা! বউনির সময়ে এসে পড়েছ, তোমাকে তো ফেরান যায় না। বারো আনার সঙ্গে আর চার আনা বাড়িয়ে দাও কেবল। ওই এক টাকাতেই তোমাকে দিয়ে দেব ওটা।" দীর্ঘনিঃশ্বাস দিয়ে সে উপসংহার করে।

"এ-ক-টা-কা! বল কি! আট আনা হ'লে বরং দেখা যেতে পার্ত।" আমাকে ঠকাবার সুযোগ কিছুতেই ওকে দেব না, আমি একদম্ 'মরিয়া'।

যূঁই ফিস্ ফিস্ করে—"নিয়ে নে গোরা; এক টাকা তো সস্তাই হ'ল!"

আমি উচ্চকণ্ঠেই উত্তর দিই—"পাগল হয়েছিস্ তুই! দেখ্ছিস্ না ওর বিক্রীর মৎলব নেই।" যূঁইকে নিয়ে আমি প্রায় পা বাড়াই আর কি।

"আহা, থাম থাম। বউনির সময়ে খদ্দের ফেরান নিয়ম নয়—তা হ'লে মা লক্ষ্মীই ফিরে যান্। আচ্ছা, বারো আনাই বার কর তুমি।"

এ-পকেট ও-পকেট হাত্ড়ে খুচরো-খাচরা মিলিয়ে ছ' আনা মোট হয়। "দেখ, এই ছ' আনাই আছে। এতে হবে তো বল ?"

"আট আনাও নেই ?" দোকানদার করুণস্বরে প্রশ্ন করে।

"উঁহু, এই ছ' আনাই। তবে এর মধ্যে একটা অচল দুয়ানি—সে কথা

বলেই দিচ্ছি। সুতরাং তোমার আসলে দাঁড়াচ্ছে চার আনা।" হ্যাঁ, আমি আগেই জানিয়ে দিই, ওকে ঠকানোর অভিপ্রায় আমার নেই।

"চার আনা! চার আনায় হাফ্প্যাণ্ট্! চার টাকার জিনিস চার আনায়! না, তুমি আমায় পাগল ক'রে দেবে।" দোকানদার হতাশ ভাবে সর্ব্বাঙ্গ আন্দোলিত করে। "না, তার চেয়ে বরং অম্নিই তোমাকে দেব। বউনির সময়ে এসেই মাটি করেছ,—মাথা খেয়েছ আমার।"

ওর যে ঠকাবার মৎলব তা বেশ বুঝ্তে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিই—"অম্নি দিলে দু'টো নেব। তার কমে নয়।"

যূঁই আবার মুখ খোলে—"তা হ'লে দু'রকম দু'টো নেওয়া যাক্। দু'টো হাফ্প্যাণ্ট্ নিয়ে তুই একা কি করবি ? আমার একটা ফ্রক্ নেওয়া যাক্ বরং।"

বাড়ী ফেরার পথে যূঁই বলে—"ফ্রক্টা বেশ চমৎকার পাওয়া গেছে, কি বলিস্ গোরা ? খাসা মানাবে কিন্তু আমায়!"

"আমার হাফ্প্যাণ্ট্টাই বা এমন মন্দ কি!" আমি মুরুব্বিয়ানা চালে মাথা চালি, "কিন্লাম তো, এখন ঠক্লাম কিনা তা মেজ মামাই জানেন।"

নক্ষত্রের কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

পরিষ্কার মেঘহীন রাত্রে একবার আকাশের দিকে তাকাইলে চোখ যেন আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না—অসংখ্য তারায়-ভরা আকাশটাকে কি সুন্দরই না দেখায়! এই তারাগুলির সম্বন্ধে আমরা কত গল্পই না শুনি! কেউ বলে—ওগুলি স্বর্গের দেবতাদের বাড়ীর প্রদীপ, আমাদের পথ দেখাইবার জন্য জ্বালান হইয়াছে; কেউ বলে—মানুষ মরিলে ঐ রকম নক্ষত্র হইয়া আকাশের গায়ে বাস করে—এই রকম আরও কত কি! এ সব আজগুবি কথা, তা' তোমরা সবাই

জান; ইহাও বোধ হয় তোমাদের অজানা নাই যে এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র আমাদের প্রতিবেশী গ্রহ—সূর্য্যের প্রজা, বাকী সকলেই এক-একটি মহাসূর্য্য—আমাদের সৌর জগতের বাহিরে দূরে—অতি দূরের আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আচ্ছা, আকাশে সর্ব্বসমেত কয়টি নক্ষত্র আছে বলিতে পার? তোমাদের যদি গুণিতে বলি তোমরা হয়তো আমাকে পাগল বলিয়াই উড়াইয়া দিবে, কিন্তু তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, এ পর্য্যন্ত অনেক বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ্ই আকাশের নক্ষত্র গুণিবার চেষ্টা করিয়াছেন—এবং তাঁদের সকলেই প্রায় এক রকম ফল পাইয়াছেন। তাঁরা কি বলেন জান? তাঁরা বলেন, সাধারণ চোখে আকাশে এক সঙ্গে তিন হাজারের বেশী নক্ষত্র দেখা যায় না। সহর অঞ্চলে—যেখানে রাস্তায়, বাড়ী-ঘরে আলোর একটু বাড়াবাড়ি সেখানে আরও কম—এই মাত্র হাজার দু'য়েক নক্ষত্র দেখা যায়। আমরা এক সময়ে পৃথিবীর একটা দিকের আকাশই দেখিতে পাই, কাজেই মোটমাট খালি চোখে দেখা যায় এমন নক্ষত্র আকাশে ৬০০০-এর বেশী নাই। কিন্তু একটা অপেরা গ্লাস্ যোগাড় করিলে দেখা যায় এই তারার সংখ্যা ৬০০০ হইতে একেবারে লাখের কাছে গিয়া হাজির হইয়াছে। কিন্তু আকাশে তারার সংখ্যা তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী। বড় বড় দূরবীণ দিয়া আজ পর্য্যন্ত আকাশে প্রায় দশ কোটি তারার সন্ধান মিলিয়াছে, ভাল ফটোগ্রাফের প্লেটে ধরা পড়িয়াছে আরও বেশী; কিন্তু পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে যত তারা ছড়ান আছে তাদের তুলনায় এ সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

নক্ষত্রদের সংখ্যা সম্বন্ধে একটু আভাস দিলাম, তাদের দূরত্ব সম্বন্ধে একটু বলি। সূর্য্যিমামা আমাদের কাছ হইতে কত দূরে আছেন তা তোমরা জান—প্রায় ৯৩০০০০০০ মাইল্। আর নক্ষত্রদের মধ্যে যেটি আমাদের সব চেয়ে কাছে সেটির দূরত্ব কত জান? পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত দূর তার ২৭২০০০ গুণ।

আর একটা মজার মাপের কথা বলিতেছি। মাকড়ষার জাল খুব পাৎলা তা তোমরা জান। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন এক পাউণ্ড (প্রায় আধ সের) মাকড়ষার জাল লম্বায় হয় প্রায় ২৫০০০ মাইল্। আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে একটা

লম্বা মাকড়ষার জাল বাঁধিয়া সে জালের আর এক কোণা যদি আমাদের সব চাইতে কাছের এই তারাটিতে লইয়া যাওয়া যায় তবে দেখিবে এ জন্য সব শুদ্ধ ৫০০০০০০ টন্ (প্রায় ১৪০০০০০০০ মণ) জালের দরকার হইতেছে।

সব চাইতে কাছের তারাই যদি এই রকম হয় তবে দূরের গুলি না জানি কত! সাধারণ মাইলের হিসাবে সেগুলি মাপিতে গেলে এক-একটা হিসাবের জন্য এক-একখানা মোটা মোটা খাতার দরকার হইবে। কাজেই পণ্ডিতেরা নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপিবার জন্য একটা সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। আলোর গতি খুব বেশী তা তোমাদের আগেই বলিয়াছি—সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল্। অর্থাৎ আলো এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে সাত বার 'চক্কর' দিয়া আসিতে পারে। সূর্য্য হইতে এই আলোর পৃথিবীতে আসিতে সময় লাগে ৮ মিনিট, কাজেই সেই হিসাবে আমরা পৃথিবী হইতে সূর্য্য কত দূরে তা সহজেই ধারণা করিতে পারি। নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপিতেও পণ্ডিতেরা এই আলোর সাহায্যই লইয়াছেন—কোন্ নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে কত দিন লাগে তাই ধরিয়া তাঁরা তাদের দূরত্বের হিসাব কষিয়াছেন। এই হিসাবে দেখা যায় আমাদের সব চাইতে কাছের যে তারাটি, সেখান হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে লাগে সওয়া চার বছর। এমন অনেক তারার কথাও জানা গিয়াছে যাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে হাজার হাজার বছর কাটিয়া যায়। অর্থাৎ আমরা হয়তো আজ যে তারাটির আলো দেখিতেছি আসলে সেটি সে তারার কয়েক হাজার বছর আগেকার আলো। অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি?

অত দূরে থাকা সত্ত্বেও যে জিনিষ আমাদের চোখে ধরা পড়িতেছে সেগুলি আকারে যে অত্যন্ত বিরাট্ হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বাস্তবিকই তাই। এই নক্ষত্রগুলি আসলে এক-একটি বিরাট্ সূর্য্য—কোন কোনটা আমাদের সূর্য্যের চাইতে শত শত—হাজার হাজার গুণ বড়। সেগুলির এক-একটার চারদিকেও না জানি আমাদের সৌর জগতের মতই কত না গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সেই সব গ্রহ-উপগ্রহেও আমাদের মতই না জানি কত প্রাণী বাস করিতেছে, কে তার সন্ধান দিবে? এই সব বিরাট্ সূর্য্য আকারে যেমন বড়, আলো আর

তাপও ছড়ায় তেমনি ভীষণ রকমের। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যদি আমাদের সূর্য্যের জায়গায় পৃথিবীর সব চাইতে কাছের যে তারাটির কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—তাকে আনিয়া বসাইয়া দেওয়া যায় তবে আমরা আরও তিন হাজার গুণ আলো আর তাপ পাইব। অথচ এটির চাইতেও বড় তারা আকাশে বিস্তর আছে।

কিন্তু যত বড়ই হউক্ না কেন, দূরত্বও তো বড় কম নয়! কাজেই এই সব নক্ষত্রদের সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই। তবে চেষ্টার ত্রুটি তাঁরা করিতেছেন না। দূরবীণ দিয়া দেখিলে সব নক্ষত্রকে সমান উজ্জ্বল দেখায় না। উজ্জ্বলতার কম বেশী ধরিয়া পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত ২১ রকমের নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ২১ তম ভাগের নক্ষত্র এত অস্পষ্ট যে তাদের মত ১ কোটি নক্ষত্র একত্র করিলে তবে ১ম ভাগের একটি নক্ষত্রের সমান হইবে। নক্ষত্রগুলি আবার সব এক রংএর নয়, দূরবীণ দিয়া দেখিলে সাদা, লাল, হল্‌দে, সবুজ—নানা রংএর নক্ষত্র দেখা যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন নক্ষত্রদের রং-এর এই বিভিন্নতার কতকটা কারণ তাদের বয়স। সাদা নক্ষত্রগুলির অবস্থা প্রায় আমাদের সূর্য্যের মতই। সেগুলি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। লাল, হল্‌দে প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি আর একটু প্রাচীন—তাদের ভিতরকার গ্যাস্ সম্ভবতঃ আরও জমাট বাঁধিয়া কতক তরল কিংবা শক্ত অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

নক্ষত্রগুলি কি দিয়া তৈরী যন্ত্রের সাহায্যে পণ্ডিতেরা তারও কিছু কিছু খোঁজ লইয়াছেন। আমাদের পৃথিবীতে যে সব মৌলিক পদার্থ আছে—যেমন ধর হাইড্রোজেন, কার্ব্বন্ (অঙ্গার) প্রভৃতি, নক্ষত্রদের ভিতরও প্রায় সেই সব জিনিষই আছে—তবে ২।৪টা এমন জিনিষও আছে যা নাকি আমাদের পৃথিবীতে এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

দূরবীণ দিয়া আকাশে আর এক রকম মজার নক্ষত্র দেখা গিয়াছে। আমি যমজ নক্ষত্রের কথা বলিতেছি। আকাশে অনেক সময়ে পাশাপাশি নক্ষত্র দেখা যায়, কিন্তু তাদের সবই পাশাপাশি থাকে না, একটা আর একটার পিছনে—হয়তো লক্ষ লক্ষ মাইল্ দূরে থাকে, শুধু আমাদের চোখে ঐরূপ দেখায়। কিন্তু মাঝে

মাঝে এমন এক-এক যোড়া নক্ষত্র দেখা যায় যেগুলি সত্যিসত্যিই পাশাপাশি থাকে এবং শুধু তাই নয়, একটি অপরটির চারদিকে পাক খাইয়া বেড়ায়। এ রকম যোড়া নক্ষত্র আকাশে অনেক আছে। তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কিনা জানি না, আকাশে মাঝে মাঝে এ ব্যাপারটি দেখা যায়—একটা নক্ষত্র বেশ উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, হঠাৎ ২।১ দিন পরেই সেটা একেবারে ম্লান—এমন কি অদৃশ্যই হইয়া গেল। আবার হয়তো কয়েক দিন পরে সেটি দেখা দিল, আবার তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পণ্ডিতেরা বলেন, এর কারণও ঐ যোড়া নক্ষত্র। তোমরা জান, গ্রহ-উপগ্রহগুলি প্রাচীন হইলে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তাদের উত্তাপ, তাদের জ্যোতিঃ কমিয়া যায়—তেমন বুড়া হইলে একেবারেই নিভিয়া যায়। তখন পড়িয়া থাকে তাদের মরা কঙ্কাল—তেজ-হীন, জ্যোতিঃহীন অবস্থায় সেগুলি আকাশের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। নক্ষত্রদের বেলাও তেমনি দেখা যায়। নক্ষত্রগুলিও বুড়া হইলে ঠাণ্ডা হইয়া আলো, তাপ হারাইয়া ফেলে, তাদের মরা দেহ কিন্তু তখনও আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—যদিও অন্ধকার বলিয়া তাদের আর দেখা যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে সব নক্ষত্রের আলো বাড়ে কমে তারা সবই যমজ তারা—এবং শুধু তাই নয়, তাদের একটি মরা নক্ষত্র, অপরটি জ্যান্ত অর্থাৎ আলোয় উজ্জ্বল। ঘুরিতে ঘুরিতে মরা নক্ষত্রটি মাঝে মাঝে জ্যান্ত নক্ষত্রটিকে ঢাকিয়া ফেলে, তখনই সেটাকে ম্লান—এমন কি সময়ে সময়ে একেবারে অদৃশ্য দেখায়। এই ধরণের নক্ষত্রও আকাশে অনেক আছে, তবে তাদের এই পরিবর্ত্তন সবটার এক রকম সময়ে হয় না—কোনটার ২।৪ দিন পর পরই হয়—কোনটার বা দশ, বিশ এমন কি ৫০।৬০ বছর পর্য্যন্ত লাগিয়া যায়।

গ্রহদের মত নক্ষত্রদের ঘরের কথা জ্যোতিষীরা এখনও বেশী কিছু জানিতে পারেন নাই তবে তাদের অনেককেই তাঁরা চিনিয়া রাখিয়াছেন। ভূগোলে তোমরা পৃথিবীর নানা জায়গার মানচিত্র দেখিয়াছ—সেই মানচিত্র দেখিয়া তোমরা যে কোনও দেশের যে কোনও সহর, নদী, পাহাড় দেখাইয়া দিতে পার। কত কষ্ট করিয়া এই মানচিত্র তৈরী করিতে হয় তা বোধ হয় তোমরা জান। জ্যোতিষীরা আকাশেরও ঐ রকম মানচিত্র তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন। কত দীর্ঘ দিনের সুদীর্ঘ

পরিশ্রমের ফলে এ কাজ সম্ভব হইয়াছে ভাবিতে পার? তার উপর আকাশের মানচিত্র আবার সব সময়ে এক রকম থাকে না—সারা বছর ধরিয়া প্রত্যেক ঋতুতে, প্রত্যেক মাসে, এমন কি প্রত্যেক দিনেই খানিকটা করিয়া বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। জ্যোতিষীদের তারও হিসাব রাখিতে হয়। কেমন করিয়া তাঁরা ব্যাপারটাকে আয়ত্ত করিয়াছেন জান? আকাশের তারাগুলি সাধারণতঃ এক-এক জায়গায় ঝাঁক বাঁধিয়া থাকে। জ্যোতিষীরা এই সব ঝাঁকগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করিয়াছেন। এই ঝাঁকগুলিকে বলা হয় তারাপুঞ্জ বা রাশি। এই সব তারাপুঞ্জের আকৃতি দেখিয়া তাদের মধ্যে এক-একটা কাল্পনিক রেখা টানিয়া আমাদের দেশের এবং ইয়োরোপের সেকালকার জ্যোতিষীরা তাদের এক-একটা মন-গড়া ছবি গড়িয়াছিলেন—কোনটা ভালুক, কোনটা মকর, কোনটা দৈত্য, কোনটা বৃশ্চিক এই রকম সব মূর্ত্তি। এই সব ছবি অনুসারে তারাপুঞ্জ বা রাশিগুলির এক-একটা নাম দেওয়া হইয়াছিল। তার পর আবার এই সব তারাপুঞ্জের কোন্‌টার ভিতরে কোন্ কোন্ তারা আছে তারও হিসাব রাখা হইয়াছিল। তারাপুঞ্জগুলি কখন ঘুরিয়া বা সরিয়া গেল তাও তাঁরা লক্ষ্য রাখিতেন। কাজেই কোনও বিশেষ দিনে কোনও বিশেষ তারা খুঁজিতে হইলে তাঁদের 'বিশেষ' বেগ পাইতে হইত না। নক্ষত্র চিনিবার এই সহজ উপায় এখনও চলিয়া আসিতেছে; তোমাদের দু'-চারটির কথা বলিতেছি,

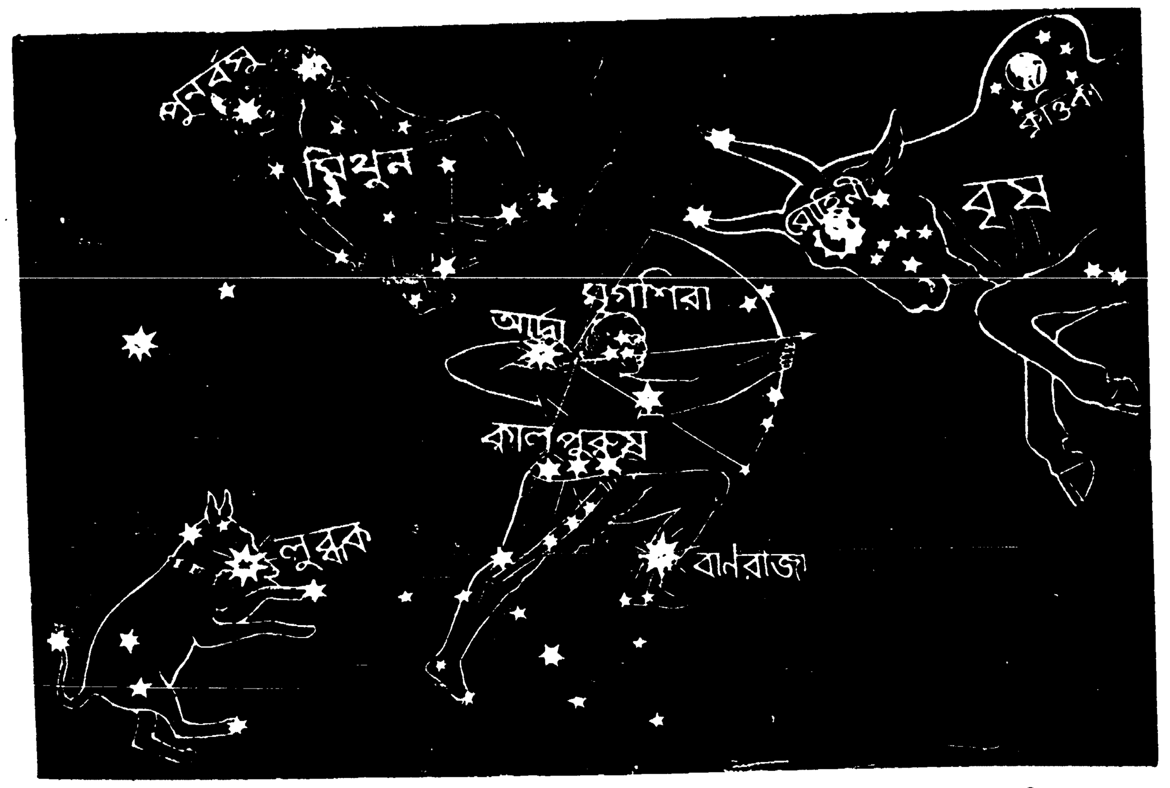

তারাপুঞ্জদের মধ্যে কাল্পনিক রেখা টানিয়া কেমন করিয়া কালপুরুষ, বৃষ প্রভৃতি রাশির চেহারা কল্পনা করা হইয়াছিল।

দেখিবে, তোমরাও একটু চেষ্টা করিলে কতকগুলি নক্ষত্র বেশ সহজেই চিনিতে পারিবে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম আকাশে একটা বড় নক্ষত্রের ঝাঁক চোখে পড়ে—সমস্ত আকাশের রাজ্যে এমন সুন্দর নক্ষত্রপুঞ্জ বোধ হয় আর নাই। এই ঝাঁকগুলির মধ্যে কয়েকটা কাল্পনিক রেখা টানিলে মনে হয় যেন ধনুক হাতে এক দৈত্যাকার মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। তার হাতে শুধু ধনুকই নাই, কোমরে কোমরবন্ধ আছে, তা'তে তলোয়ার ঝুলান। এই তারাপুঞ্জটির নাম কালপুরুষ। সাহেবেরা বলেন ওরায়ন্। এই কালপুরুষকে খুঁজিয়া লইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে এই কালপুরুষ রাশিকে সন্ধ্যাবেলা পূব আকাশে দেখা যায়, তার পর মাঘ মাসে সে সরিয়া চলিয়া আসে মাথার উপর।

কালপুরুষের পায়ের কাছে এক ঝাঁক নক্ষত্র আছে, তার মধ্যে একটি তারা অত্যন্ত উজ্জ্বল—আকাশে অত উজ্জ্বল তারা আজ পর্য্যন্ত আর দেখা যায় নাই। এই তারাটির ইংরাজী নাম 'সিরিয়াস্', আমাদের দেশী নাম লুব্ধক। অত উজ্জ্বল দেখাইলেও লুব্ধক কিন্তু খুব কাছের তারা নয়—তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে লাগে আট বছর। প্রাচীন গ্রীক্-পুরাণে ওরায়ন্‌কে (কালপুরুষ) কল্পনা করা হইত এক মস্ত শিকারী বলিয়া, আর তার পায়ের কাছের তারাপুঞ্জটিকে (যার ভিতর লুব্ধক আছে) মনে করা হইত তার শিকারী কুকুর বলিয়া।

কালপুরুষের কাছে এক ঝাঁক নক্ষত্র খুব ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই ঝাঁকে সাতটি তারা আছে কিন্তু আমাদের চোখে সাধারণতঃ ছয়টি ধরা পড়ে। এগুলির নাম কৃত্তিকা। গ্রীক্-পুরাণের মতে এরা ডায়না দেবীর সখী, ওরায়নের ভয়ে পায়রা হইয়া আকাশে ছুটিতেছে, আর ওরায়ন্ মজা দেখিবার জন্য কুকুর সহ তাদের পিছু পিছু 'ধাওয়া' করিয়াছে। কৃত্তিকাদের ঠিক নীচেই একটা খুব উজ্জ্বল লাল রংএর নক্ষত্র আছে—এটির নামের সঙ্গে সম্ভবতঃ তোমরা পরিচিত, আমি "রোহিণী" নক্ষত্রের কথা বলিতেছি। কৃত্তিকা, রোহিণী এবং আরও কতকগুলি নক্ষত্র একত্র করিয়া কতকগুলি কাল্পনিক রেখা টানিলে দেখিতে অনেকটা

ষাঁড়ের মত হয় ; তাই এগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে 'বৃষ রাশি'। কালপুরুষের উপরে আরও কতকগুলি নক্ষত্র আছে, তাদের বলা হয় মিথুন রাশি (Twins)। মিথুন মানে যুগল। কতকগুলি কাল্পনিক রেখা টানিলে এই তারাগুলিকে যোড়া মানুষ বলিয়া মনে হয়—তাই এই নাম।

বৈশাখ মাসে তোমরা যদি উত্তর আকাশের দিকে মুখ ফেরাও তবে দেখিবে এক জায়গায় সাতটি নক্ষত্র কেমন পর পর দাঁড়াইয়া আছে—দু'টি অবশ্য অন্য রেখায় আছে। ইহাদের বলা হয় সপ্তর্ষি। আমাদের পুরাণের মরীচি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই সাত জন ঋষির নাম হইতে এদের নামকরণ হইয়াছে। যাদের চোখ খুব ভাল তারা বশিষ্ঠের পাশে আরও একটি ছোট্ট তারা দেখিতে পাইবে। এটির নাম অরুন্ধতী—বশিষ্ঠের স্ত্রী। সপ্তর্ষি রাশির নাম সাহেবেরা কিন্তু দিয়াছেন "গ্রেট্ বেয়ার" (বড় ভালুক)—এই রাশির কয়েকটি তারাকে তাঁরা ভালুকের লেজ বলিয়া মনে করেন—যদিও ভালুকের আকৃতির সঙ্গে এই তারাপুঞ্জের কোন মিল খুঁজিয়া বাহির করা বেশ কঠিন। সপ্তর্ষি কিন্তু সব সময়ে এক জায়গায় থাকে না—জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে সে একটু একটু করিয়া পশ্চিমে সরিতে থাকে, তার পর কয়েক মাস আর তাকে দেখাই যায় না। তার পর আবার পৌষ মাস হইতে সন্ধ্যাবেলা সে পূব দিকে উঁকি মারে।

সপ্তর্ষির যে দু'টি তারা অন্য লাইনে আছে তাদের ঐ লাইনটিকে যদি একটু বাড়াইয়া দাও তবে দেখিবে সেটি একটি মাঝামাঝি রকমের উজ্জ্বল তারার পাশ দিয়া যাইতেছে। এই তারাটির সঙ্গে সকলেরই পরিচিত থাকা উচিত। কারণ এটিরই নাম ধ্রুবতারা। এই নক্ষত্রটি কখনও নড়ে না, বরাবর উত্তর আকাশে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার হইবার আগে এই ধ্রুবতারা দেখিয়াই লোকে—বিশেষতঃ জাহাজের নাবিকেরা দিক্ ঠিক করিত। ধ্রুবতারা অবশ্য বহু দূরের তারা। ধ্রুবতারার আলো পৃথিবীতে আসিতে ৪৬৬ বছর কাটিয়া যায়। এই ধ্রুবতারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সাহায্য করে বলিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডলও খুব দরকারী রাশি। সপ্তর্ষি-মণ্ডল যখন আকাশে থাকে না তখন ধ্রুবতারাকে খুঁজিয়া

বাহির করিতে হয় ক্যাসিওপিয়া তারাপুঞ্জ দেখিয়া। ধ্রুবতারার যেদিকে সপ্তর্ষি, এই তারাপুঞ্জ সব সময়ে তার উল্টা দিকে থাকে আর দেখিতে এটি অনেকটা ইংরাজি W অক্ষরের মত ; কাজেই চিনিতে বেশী কষ্ট হয় না। সপ্তর্ষি যে সময়ে আকাশে অনুপস্থিত, ক্যাসিওপিয়া সেই সময়ে দেখা যায়, আবার ক্যাসিওপিয়ার অনুপস্থিতির সময়ে সপ্তর্ষি ফুটিয়া উঠে। পরিষ্কার রাত্রিতে ক্যাসিওপিয়ার ঠিক নীচে একটা মজার জিনিষ দেখিবে—আকাশের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত নদীর মত একটা বিশাল জিনিষ চলিয়া গিয়াছে—তার সারা শরীরটা যেন তারার গুঁড়া দিয়া তৈরী। এটির নাম 'ছায়াপথ'। অসংখ্য—অগণিত ছোট ছোট তারা মিলিয়া এই ছায়াপথের সৃষ্টি করিয়াছে। আকাশে এমন সুন্দর জিনিষ খুব কমই আছে।

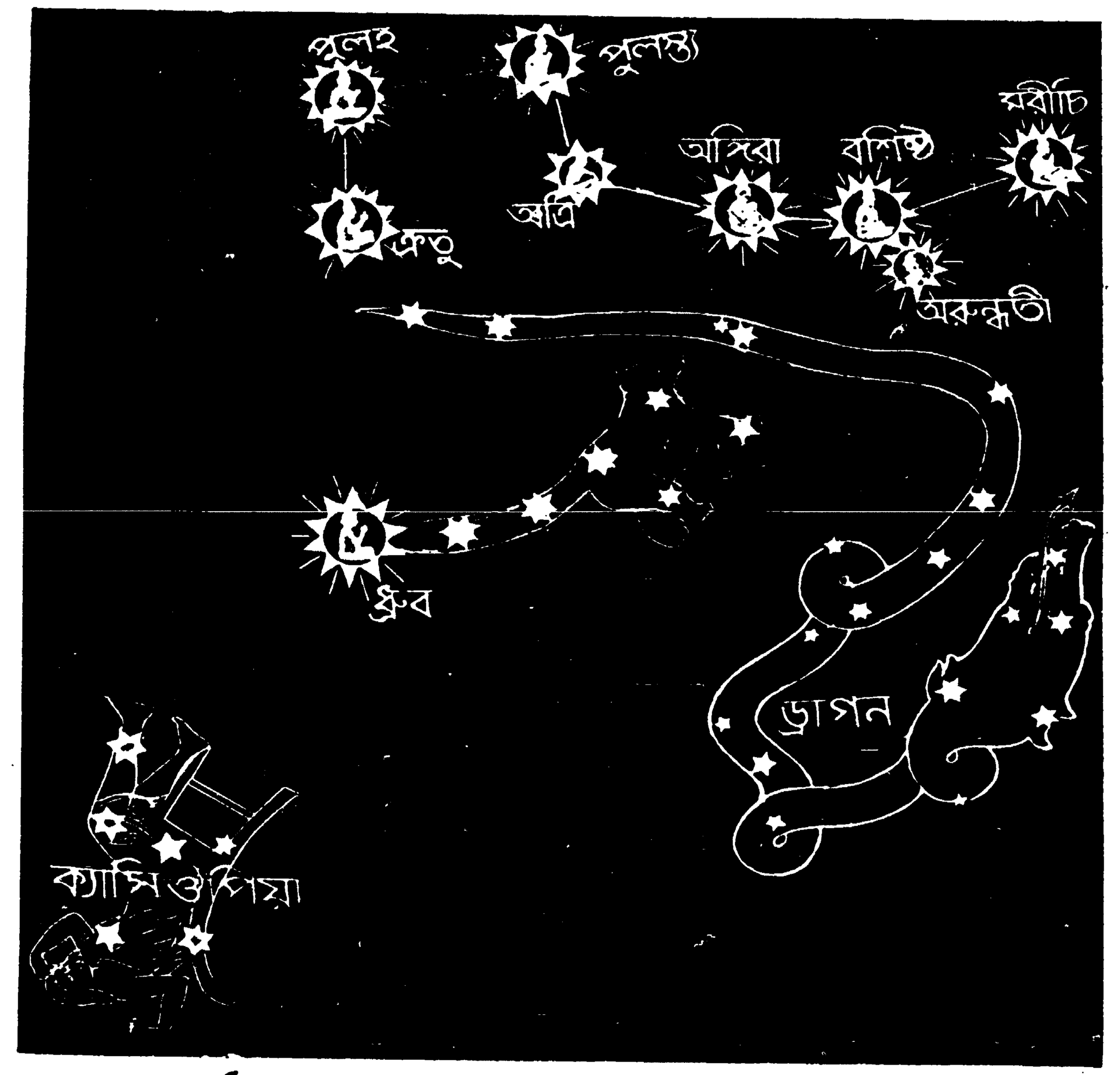

সপ্তর্ষি-মণ্ডল, ধ্রুবতারা, ক্যাসিওপিয়া, ড্রাগন প্রভৃতি

ছায়াপথের ইংরাজী নাম "মিল্কি-ওয়ে"—পুরাণের মতে এটি স্বর্গে দেবতাদের যাতায়াতের রাস্তা।

ধ্রুবতারার কাছাকাছি আর কয়েকটা তারাও উল্লেখযোগ্য। এগুলিকেও একত্র করিয়া প্রাচীন বিলাতী জ্যোতিষীরা একটা ভালুক বলিয়া কল্পনা করিতেন, তাই নাম দিয়াছিলেন 'লিট্‌ল্ বেয়ার' অর্থাৎ 'ছোট ভালুক'। আবার লিট্‌ল্

'বেয়ারের' কাছে এক ঝাঁক নক্ষত্র আছে, সেগুলিকে কাল্পনিক রেখা দিয়া যুড়িলে মনে হয় একটা 'ড্রাগন'।

শ্রাদ্ধের ভোজ

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি)

সেদিন সকালে উঠে শুনলাম যে আগের দিন শেষ রাত্রে শ্যামরতন মুখুয্যে মহাশয়ের পিতা অকালে দেহত্যাগ করেছেন। অকালে মানে অবশ্য অতি অল্প বয়সে নয়, অতি বেশী বয়সে—অর্থাৎ অকালে মানে যে সময়ে তাঁর পিতার মরা উচিত ছিল তার বহু দিন পরে তিনি পরলোক গমন করেছেন। শ্যামরতন বাবুরই বয়স এখন প্রায় পঁয়ষট্টি, এবং তাঁর পিতা দেহরক্ষা করলেন প্রায় পঁচানব্বই বছর বয়সে।

শ্যামরতন বাবুর বাবার নামটা কি ছিল তা ঠিক মনে নেই; কারণ তাঁর নাম ধরে কেউ তাঁকে কখনও ডাক্‌ত না, সকলেই বল্‌ত—"উপোসী মুখুয্যে।" তাঁর নাম করলে বা তাঁর মুখ দেখ্‌লে নাকি সেদিন অদৃষ্টে অন্ন জুট্‌ত না, উপোস করে দিন কাটাতে হ'ত। এত বড় কৃপণ—তাই নাম তাঁর উপোসী মুখুয্যে।

কত গল্পই না শুনতাম তাঁর কৃপণতা সম্বন্ধে! শুনেছি তাঁর বাড়ীতে আট-হাতী কাপড়ের বেশী বড় কাপড় কেউ কখনও পরে নি। ওঁদের বাড়ীর লোকে যখন ছোটবেলায় কাপড় পরে তখন তার মাপ থাকে আট হাত। তার পর তাদের বয়স বেড়ে যায়, দেহের মাপও বেড়ে যায় কিন্তু কাপড়ের মাপ বাড়ে না। ভদ্রলোকের এক কথা—সেই আট হাত। বাড়ীর কর্ত্তা পরছেন আট হাত, গিন্নী পরছেন আট হাত, ছেলে পরছে আট হাত, মেয়ে পরছে আট হাত। একেবারে ওজন হিসাবে আট-হাতী কাপড়ের গাঁটরি কেনা হয়, বৎসরের পর বৎসর চলে তা'তে।

কুচো চিংড়ী আর পুঁটী মাছ ছাড়া কখনও ওদের বাড়ীতে বড় মাছ ঢোকে নি।

একবার নাকি ওদের বাড়ীর ছোট্ট একটা ছেলে কি কারণে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল; রাস্তার ধারে আর এক ভদ্রলোকের বাড়ীর রোয়াকে তখন একটা জেলে ইলিশ মাছ বিক্রী করছিল। ছেলেটা অনেকক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থেকে থেকে বাড়ীর মধ্যে ছুট্টে চলে গিয়ে চেঁচাতে লাগ্‌ল—"মা, ওমা, দেখ্‌বে চল, মাছের মত দেখ্‌তে কিন্তু খুব বড় এক রকম কি জানোয়ার এনেছে একটা লোক!"

আর একটা গল্প শুনি। শ্যাম বাবু তখন বড় হয়েছেন, কাজেই তিনিই বাজারে যান। তাঁর বাবা যা যা বলে দেন তাই ঠিক ঠিক নিয়ে আসেন তিনি। একবার তখন নতুন পটল উঠ্‌ল বাজারে। শ্যাম বাবুকে উপোসী বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "হ্যাঁরে, পটলের সের বাজারে কত?"

শ্যাম বাবু বল্লেন, "আজ্ঞে আট আনা।"

উপোসী বাবুর মুখ দিয়ে কোন কথা বার হ'ল না, শুধু মুখটা তিন ইঞ্চি ফাঁক হ'য়ে গেল, আর চোখের মণি দুটো অচল হয়ে এক ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর যেন জ্ঞান ফিরে এল, বল্লেন, "আট আনা! কি বলিস্ রে? সোনার পটল নাকি—য়্যাঁ? উঃ, এর চেয়ে টাকা খেলেই হয়!"

তার পর দিন যায়, পটলের দামও নামে। শ্যাম বাবুকে প্রায়ই তাঁর বাবা পটলের দর জিজ্ঞাসা করেন, খবর পান আজ ছয় আনা, কাল পাঁচ আনা, তার পর দিন হয়তো চার আনা—এমনি করতে করতে পটলের দাম খুব নেমে এল। লোকের তখন পটল খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, পটল খাওয়া তারা ছেড়েই দিয়েছে, গরু-বাছুরে খায় তখন, এমন সময়ে একদিন শ্যাম বাবুকে উপোসী বাবু আবার পটলের দর জিজ্ঞাসা করায় শ্যাম বাবু বল্লেন, "আজ্ঞে—দু' পয়সা।"

উপোসী বাবু এবার বোঁ করে ট্যাঁক থেকে একটী পয়সা বার করে বল্লেন, "নিয়ে আয় আধ সের পটল, যায় যাবে সব টাকা-কড়ি যাবে, তা বলে বছরের নতুন ফল উঠেছে—সেটা খেতে হ'বে ত'?"

এম্‌নি কত কি গল্প! শুধু কি গল্প? আমরা চোখেও ত' দেখেছি, সেবার একটা বাল্‌তি কিনে আনলেন; সকালবেলা তিনি বাল্‌তি কিন্‌তে বার হয়েছিলেন, সমস্ত দোকান ঘুরে ঘুরে সব চেয়ে সস্তায় বাল্‌তি কিনে যখন বাড়ী ফিরলেন তখন

এত বেলা হয়ে গেছে যে ঐ বাল্‌তি করেই তাঁর মাথায় জল ঢালতে হ'ল। যাই হোক্, ঐ বাল্‌তি-ওয়ালাকে যত রকম দেবদেবী আছে তাদের নামে শপথ করিয়ে নিয়ে এলেন যে বাল্‌তি ফুটো হ'বে না ; হ'লে দাম ফেরৎ দেবে সে।

সাত বছর পরে সেই বাল্‌তিতে ছোট একটী ফুটো হ'ল। ছুট্‌লেন উপোসী বাবু সেই বাল্‌তির দোকানে। চোখ-মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। দোকানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তিনি বোমা ফাটার মত হঠাৎ ফেটে বল্‌লেন, "বেটা মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর, দে দাম ফিরিয়ে দে বাল্‌তির। আমাকে ভালমানুষ পেয়ে ঠকাবে ? বেটা ! বল্‌লে—ফুটো হ'বে না, দু'দিন না যেতেই ফুটো হয়ে গেল ? দে, দাম ফিরিয়ে দে।"

দোকানের চারিদিকে তখন ভীড় জমে গেছে।

বাল্‌তি-ওয়ালা একদম অবাক্ হয়ে গেছে। সে বল্‌লে, ""দু'দিন কি বল্‌ছেন মুখুয্যে মশায় ? এ বাল্‌তি কিনেছেন সে তো প্রায় সাত-আট বছর হ'ল—"

মুখুয্যে মশায় দাঁত খিঁচিয়ে বল্লেন, "সাত আট বছর ! সাত আট বছর তা হয়েছে কি ? সাত আট বছর কি খুব বেশী দিন হ'ল নাকি ? দে বেটা, দাম ফিরিয়ে দে।"

উপোসী মুখুয্যে সেদিন শেষ পর্য্যন্ত দাম আদায় করে তবে ফিরে এলেন।

এই ত' সেদিন। দেখি, মুখুয্যে মশায় রাস্তা দিয়ে আস্‌ছেন, মুখখানা তাঁর এমনি হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে তাঁর বুকের কল্‌জে বোধ হয় কে খসিয়ে নিয়েছে।

সকলে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"কি হয়েছে মুখুয্যে মশায় ?"

তিনি হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবা।"

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর কাছে গেলাম—ভাব্‌লাম, বোধ হয় তাঁর কোন অতিপ্রিয় নিকট আত্মীয় মারা গেছেন।

অনেক সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করার পর শুনলাম—সুদ আদায় কর্‌তে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন। বড় বেশী রৌদ্র হওয়ায় আর পথ চল্‌তে না পারায় সেকেণ্ড

ক্লাস ট্রামে চড়ে বাড়ী এসেছেন। দু'টো পয়সা ভাড়া দিতে হবে, ভাঙ্গান পয়সাও ছিল না, শুধু ছিল সুদের কয়েকটা টাকা। তার মধ্যে একটী ভাঙ্গিয়ে দু'টো পয়সা দিয়েছিলেন। পরে কোন একটা দোকানে এক পয়সার কি একটা কিনে একটী দু'আনি দেন ; দোকানীটি দু'আনিটী ফেরৎ দিয়ে বলে "এটী অচল"।

পর পর তিন চারটী দোকান ঘুরেছেন, সবাই দু' আনিটী অচল বলেছে। একটা দু'আনি যদি অচল হ'ল তা হলে তাঁর সংসারে রইল কি ? সবই ত গেল ! সত্যিই ত এ মহা-সর্ব্বনাশ ছাড়া আর কি ?

যাই হোক, এ-হেন উপোসী মুখুয্যে দেহরক্ষা কর্‌লেন ; আমাদেরও প্রাণরক্ষা কর্‌লেন এবং শ্যাম বাবুর জন্য বহুৎ পয়সারক্ষা করে গেলেন, সাদা কথায় টাকা রেখে গেলেন।

মহানন্দে তাঁকে শ্মশানে পুড়িয়ে এলাম ; শ্মশান-খরচটা পাড়ার এক ভদ্রলোক দিয়ে দিলেন ; বল্লেন, "ওঁর পয়সায় ওঁকে পুড়িও না। ওঁকে পোড়াবার জন্য অত পয়সা খরচ কর্‌লে উনি হয়ত আবার বেঁচে উঠে বস্‌বেন চিতার উপর। উনি একেবারে পুড়ে ছাই না হ'লে ওঁর এক পয়সাও খরচ কোরো না।"

উপোসী বাবু মারা যাওয়ায় পাড়ায় রীতিমত আমাদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। সেদিন অর্দ্ধেন্দু বল্‌লে, "কত টাকা রেখে গেল রে বুড়ো ?"

শ্যামল বল্‌লে, "শুন্‌ছি, লাখ দু'য়েক হ'বে।"

রমেশ হেসে বল্‌লে, "শ্যাম বাবু তো প্রায় ওঁর বাপের মৃত্যুর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। উনি বোধ হয় ভাবতেন যে ওঁকে আর ওঁর বাপের শ্রাদ্ধ কর্‌তে হ'বে না, ওঁর বাপই ওঁর শ্রাদ্ধ কর্‌বেন।"

কমলেশ একটা হাই তুলে বল্‌ল, "যাক্, শ্যাম বাবু জীবনের শেষ ক'টা দিন খুব আমোদে আর আরামে কাটাবেন !"

বিনয় বল্লে, "শ্রাদ্ধটা হয়ে গেলেই নিশ্চয় একটা মোটর কিন্‌বেন !

তখন মহা তর্ক বেধে গেল—কি মোটর কিন্‌বেন। কেউ বলে মরিস, কেউ বলে বুইক, কেউ বলে ডেমলার।

এ ক'দিন শ্যাম বাবুর সঙ্গে যখনই আমাদের দেখা হয় তখনই তিনি আমাদের হাসিমুখে আপ্যায়িত করেন। পূর্ণটা বল্লে সেদিন, "শ্যাম বাবু, শ্রাদ্ধটা বেশ জাঁকিয়ে কর্‌ছেন, নিশ্চয়? আমাদের কিন্তু ভীষণ খাওয়াতে হ'বে!"

শ্যাম বাবু একেবারে যেন গ'লে গেলেন, বল্লেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমাদের খাওয়াব না? আমার পিতৃদেবের সৎকার করে এলে তোমরা অত সুন্দর করে; নিশ্চয়, তোমাদের পরমতৃপ্তি যাতে হয় তা নিশ্চয় কর্‌ব।"

আমরা আন্দাজ কর্‌লাম, হাজার দু-তিন নিশ্চয় খরচ হবে। পূর্ণটা শ্রাদ্ধের খাওয়ায় কেমন ঠিক আনন্দ পায় না, বলে, "মাছ-মাংসই থাক্‌বে না, কি খাব ছাই!" কিন্তু তা হ'লেও সন্দেশ, রসগোল্লা দই, রাবড়ি, লুচি, তরকারী যা খায় তাতেই অস্থির। ওর খাওয়া সে এক বিরাট্ ব্যাপার; বকরাক্ষস বোধ হয় ওর পূর্ব্বপুরুষ ছিল।

শ্যামল বল্‌লে, "আরে, শ্রাদ্ধের খাওয়াটাই তো আর শেষ নয়, এখনও তো শ্যাম বাবুর দুটী নাতির পৈতা, তিনটে নাতনীর বিয়ে বাকী রয়েছে। এতদিন তো কোনও বিয়ে-পৈতায় ও বাড়ীতে কেউ মাথা গলাতে পারে নি, এবার তার শোধ তোলা যাবে। শ্যাম বাবু এ সব বিয়ে-পৈতা ছাড়া দোল-দুর্গোৎসবও কর্‌বেন নিশ্চয়।"

কমলেশটা বল্‌লে, "রিয়ালি, বাপ কৃপণ হওয়ায় সুখ আছে, বেশ 'টু পাইস্' রেখে যায়; মনের সাধে ওড়াও।"

অর্দ্ধেন্দু বল্‌লে, "শ্যাম বাবু হয়ত ওর বাবার ঠিক উল্টো হবেন, সব টাকা দেবেন উড়িয়ে। ওর ছেলেপেলেগুলি হয়তো পথে বস্‌বে।"

বিনয় বাধা দিয়ে বল্ল, "না না, তা কখনও হয়?"

অর্দ্ধেন্দু চটে উঠে বল্‌ল, "না, হয় না? ডি. এল রায়ের 'পুনর্জ্জন্ম' পড়িস নি? মহাকৃপণ যাদব চক্রবর্ত্তী বুড়ো মরেছে শুনে তার ছেলে দুটোর কি স্ফূর্ত্তি! অমনিই হয়, একজন না খেয়ে খেয়ে টাকা জমিয়ে রেখে যায়, আর উড়িয়ে দেয় আর একজনে।"

যাই হোক, দিন ক্রমশঃ এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, এবং শেষ পর্য্যন্ত দিন

এসেও গেল। পূর্ণটার সেদিন আনন্দ দেখে কে? আমরা সকলেই সকালে যেমন খাবার খাই তেমনি খেয়ে নিলাম। পূর্ণ কিন্তু এক ফোঁটা জলস্পর্শ কর্‌ল না সারা সকালটা। ও ঐ রকমই করে। কোনও দিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাক্‌লে সকালে পেটটাকে দেয় বিশ্রাম। তার পর যখন সময় আসে তখন সুরু করে বাঘের খেলা। আজকেও ঠিক তাই।

বেলা তখন প্রায় বারোটা—আমরা সকলে গিয়ে শ্যাম বাবুর বাড়ী হাজির হ'লাম, দেখলাম বাইরের ঘরে বোধ হয় সবশুদ্ধ জন কুড়ি লোক বসে আছেন। দেখেই সকলের মনের মধ্যে কি রকম একটা ধাক্কা লাগ্‌ল। পূর্ণ আমার দিকে একবার তাকাল, তার পর আস্তে আস্তে বল্ল, "ওঃ, বুঝেছি, শ্যাম বাবু বোধ হয় আজকে মাত্র শ্মশানবন্ধু ক'জনকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন; এর পর নিশ্চয় মাছ-মাংস করে শীগ্‌গিরই বড় একটা ভোজ দেবেন।" অদূর ভবিষ্যতে এত বড় একটা আশার আলো দেখ্‌তে পেয়ে পূর্ণর মুখটা হাসিতে ভরে উঠ্‌ল।

আমরা বসেই আছি, কেউ আর ডাকেই না। দু-একটা ছোট ছেলে দু'-একবার সামনে এল বটে কিন্তু কিছু বল্‌বার আগেই তা'রা ছুটে পালা'ল।

একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, ক্ষিধেয় সব ছট্‌ফট্ কর্‌ছি; পূর্ণটার তো রাগে ও যন্ত্রণায় চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে! একবার একটা ছোট্ট মেয়ে যাচ্ছিল, পূর্ণ চীৎকার করে উঠ্‌ল, "এই খুকী, শ্যাম বাবু কোথায়?"

মেয়েটা একবার ফিরে তাকা'ল, বল্লে, "জানি না"; তার পরেই বল্লে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি জানি, বাজারে গেছে সেই অনেকক্ষণ।"

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তে দেখা গেল শ্যাম বাবু বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুক্‌ছেন; পিছনে দুটো মুটে প্রকাণ্ড দুটো ঝুড়ি মাথায় ক'রে চলেছে।

অন্য সময় হ'লে পূর্ণটা আনন্দে ফেটে যেত, কিন্তু এখন ক্ষিধের জ্বালায় তার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছে। রাগে গজ্‌গজ্ কর্‌তে লাগ্‌ল, "শ্যাম বাবুর এ সমস্ত টাকার জাঁক! দশ দিন ধরে খাওয়ার জোগাড় করে সাধ আর মেটে না। এত জোগাড় করেও আবার ছুটেছেন আর একটা কি আন্‌তে! দেখাতে চান যে

মাছ-মাংস না থাক্‌লেও কত রকম খাওয়ার আয়োজন করা যেতে পারে। ক্ষিধেয় আমাদের নাড়ী বাপান্ত কর্‌ছে আর উনি এখন বনিয়াদী চাল দেখাচ্ছেন। সব র'য়ে স'য়ে কর্‌তে হয়! বাপ ছিল হাড়-কিপ্‌টে, উনি একদিনে একেবারে দাতাকর্ণ হবেন!"

যাই হোক্‌, বেলা তিনটার সময় শ্যাম বাবু গলায় কাপড় দিয়ে এসে অনুরোধ কর্‌লেন, "সবাই তা হ'লে চলুন, জায়গা হয়েছে।"

সবাই উঠ্‌লাম। পূর্ণটার রাগটা এবার একটু পড়েছে মনে হচ্ছে। সে আস্তে আস্তে বল্‌লে, "আজ ওকে ফতুর করে ছাড়ব, কি রকম খাই একবার তোরা দেখিস্‌! মাছ-মাংস না থাকুক গে—লুচির ঝুড়ি, ডাল তরকারীর বালতি, দই-ক্ষীর-রাবড়ির হাঁড়ি, আর সন্দেশ-রসগোল্লা, পান্তুয়া-ক্ষীরমোহন, সরপুরিয়া-সরভাজার পাত্র সব ফাঁক করে ছেড়ে দেব। যা ক্ষিধে পেয়েছে—শেষ পর্য্যন্ত শ্যাম বাবুর গায়ে না কামড় মারি!"

আমার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না ক'দিন থেকে। অত বেলায় খেলে অসুখ কর্‌বে বলে আমি শ্যাম বাবুকে বল্‌লাম যে আমার বড় পেটের অসুখ করেছে কাল থেকে, আমি আর খাব না। শ্যাম বাবু দু' একবার অনুরোধ কর্‌লেন, আমি রাজী হ'লাম না, তিনিও আর বিশেষ পীড়াপীড়ি কর্‌লেন না। আমি আর ওদের সঙ্গে উপরে উঠ্‌লাম না, ওরা সকলে ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে উপরের ছাদে চলে গেল।

খানিক পরেই দেখি, মহা হৈচৈ; সব চেঁচামেচি কর্‌তে কর্‌তে নেমে আস্‌ছে। সিঁড়ির নীচে শ্যামরতন বাবু দাঁড়িয়ে, অতি বিনীত ভাবে হেসে হেসে বল্‌ছেন, "বাবা সব, বেশ তৃপ্ত হ'য়ে আহার করেছ? বেশ আনন্দ পেয়েছ?"

প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, "বাবা, আনন্দ? বাবা আনন্দ?"

কেউ কিছুই বল্‌ছে না, চুপ করে বার হয়ে যাচ্ছে। এইবার দেখি আমাদের বন্ধুর দল নাম্‌ছে। পূর্ণটা সকলের আগে নামছে; ওর চোখে আগুন জ্বল্‌ছে, ও বোধ হয় এখন মানুষ খুন কর্‌তে পারে!

পূর্ণ কাছে আস্‌তেই শ্যাম বাবু অতি বিনীত ও সুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বাবা, আনন্দ?"

পূর্ণ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "আনন্দ? মজা পেয়েছেন? এই আপনার পরিতৃপ্ত করে খাওয়ান?"

শ্যাম বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, "কেন বাবা, আমি নিজে গিয়ে সেই সমস্ত সকাল ঘুরে ঘুরে সব চেয়ে ভাল চিঁড়ে মুড়্‌কি, গুড়, দই কিনে এনেছি…"

পূর্ণর ইচ্ছা হ'ল যে একটী ঘুষিতে বুড়োটার নাকটা ফাটিয়ে দেয়! উঃ,

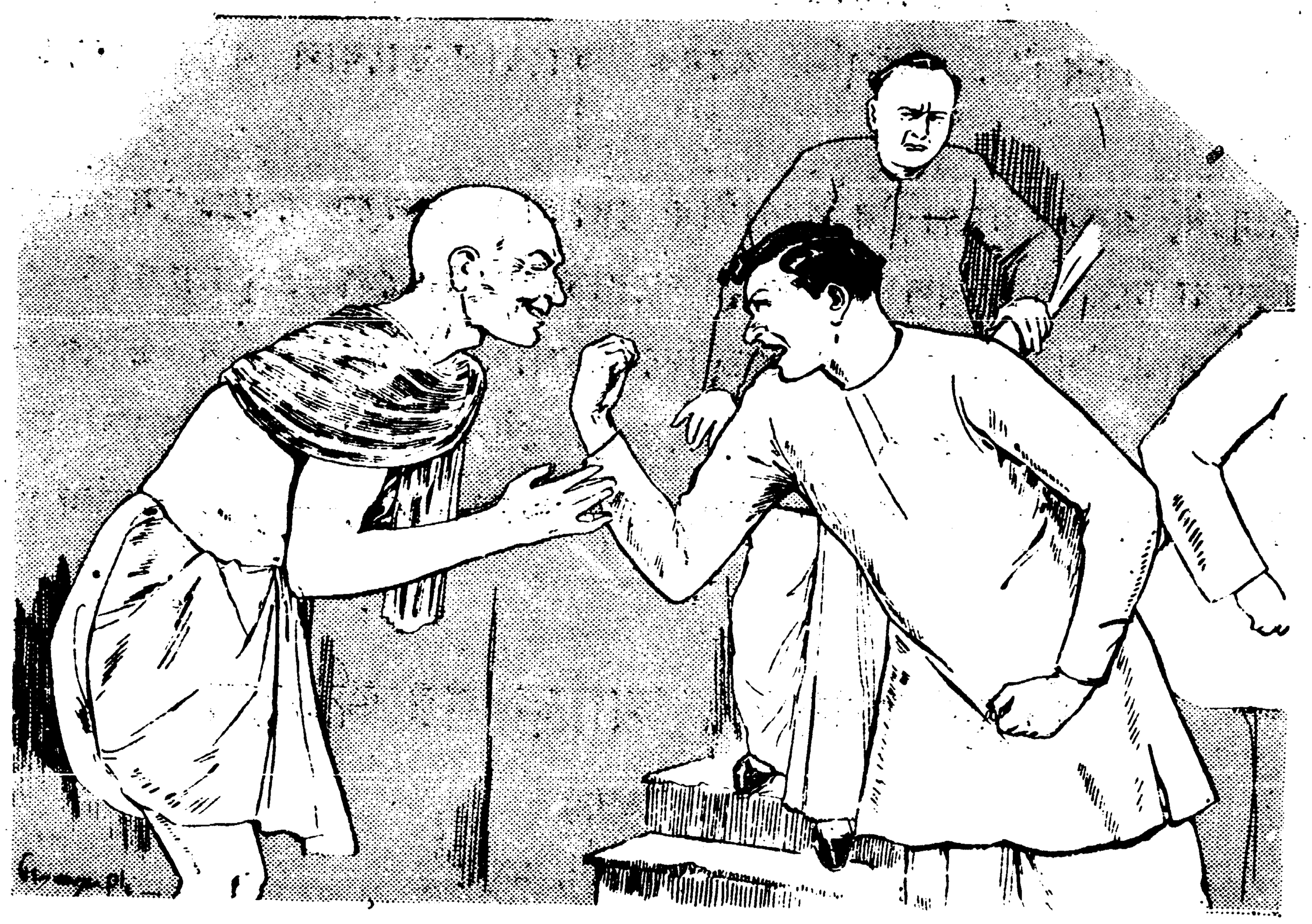

"বাবা আনন্দ?"

কোথায় লুচি, ডাল-তরকারী, দই-ক্ষীর-রাবড়ি, সন্দেশ-রসগোল্লা, পান্তুয়া-ক্ষীরমোহন, সরপুরিয়া-সরভাজা, আর কোথায় চিঁড়ে-মুড়কি? রাগে, দুঃখে, যন্ত্রণায় তার চোখে জল এল।

সে এবার ক্ষেপে উঠে শ্যামরতন বাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে

দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে, "কাঙ্গালী-ভোজন পেয়েছেন? ভদ্রলোকের ছেলেদের এই বেলা তিনটার সময় চিঁড়ে-মুড়কির ফলার খেতে দিতে একটু লজ্জা করল না?"

শ্যাম বাবু অতি নিঃসহায় ভাবে বল্লেন, "কেন বাবা, চিঁড়ে তো অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর জিনিষ! চিঁড়ে খেলে শরীর সবল হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে—"

পূর্ণর তখন শরীর সবল হওয়া দূরে থাকুক, সারাদিন না খেয়ে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে। সে বল্লে, "হয় কখনও? কিপটেমি, কঞ্জুষগিরি ওর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে? ও বেটারা বংশ-পুরম্পরায় না খেয়ে থাক্‌বে। ও বেটা মরুক, ওকে কে পোড়ায় দেখ্‌ব। ওকেও কাল থেকে উপোসী মুখুয্যে দু-নম্বর বলে ডাক্‌ব।" ও এম্‌নি অনেক আবোল-তাবোল ব'কে যেতে লাগ্‌ল রাগের মাথায়।

সম্মুখে একটা পাঞ্জাবীর পরোটার দোকান দেখ্‌তে পেয়ে সে পাগলের মত সেইটার মধ্যে ঢুকে পড়ে বল্‌ল, "দশঠো পরোটা আউর দো ডিস্ মাংস।"

দেখ্‌লাম, সকলে তাদের এত দিনের আশা ভঙ্গ হওয়ায় ভীষণ চটেছে। আমার কিন্তু ভারী হাসি পাচ্ছিল। কেবল যেন কানে ভেসে আস্‌ছিল, "বাবা, আনন্দ? চিঁড়ে খেলে শরীর সবল হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে,—বাবা, আনন্দ?"

উড়ো-জাহাজে আফ্রিকার জঙ্গলে

[সত্য ঘটনা]

(শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, এম্-এ)

মিঃ দালাল ও মিঃ পোচ্‌খানওয়ালা দুইজন ভারতীয় বৈমানিক। তাঁহারা বিমানপথে আফ্রিকা-অভিযানের একটী লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়াছেন। ১লা আগষ্ট্ তাঁহারা করাচী হইতে একখানি পুস্‌মথে আফ্রিকা যাত্রা করেন; পথে বুশায়ার, বসরা, জেরুসালেম, কায়রো, খার্টুম, মালাক্কা, জুবা, জিঞ্জা, কিসুখু, নাইরোবি প্রভৃতি পার হইয়া, কিলিমাঞ্জারো পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া অবশেষে তাঁহারা ম্‌বায়ায় আসিয়া পৌঁছেন। ইহার পর হইতেই তাঁহাদের আসল এড্‌ভেঞ্চার সুরু হয়। সে কাহিনী তাঁহাদের ভাষাতেই বলিতেছি—

"ম্‌বায়া হইতে আমরা ম্‌পিকা যাইব। পথের খবর লইয়া শুনিলাম সেখানকার হাওয়ার গতি অত্যন্ত এলোমেলো। যাহা হউক সেখানকার বিমান-ঘাঁটির অধ্যক্ষকে ম্‌পিকার বিমান-ঘাঁটিতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইতে বলিলাম যে, আমাদের সঙ্কেতের জন্য যেন সেখানে উপযুক্ত পরিমাণ আলোর ব্যবস্থা থাকে, কারণ বায়ু অত্যধিক পরিমাণে বাষ্পে পূর্ণ হওয়াতে আমাদের দেখিবার অত্যন্ত বাধা হইতেছিল। কিন্তু কি কারণে জানিনা, ম্‌পিকার বিমান-ঘাঁটির অধ্যক্ষ আমাদের জন্য আলোর বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা করেন নাই। এজন্য আমরা যখন ম্‌পিকার উপরেই ছিলাম তখন ঐ স্থান হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে এক বনের মধ্যে আগুন দেখিয়া আমরা প্রতারিত হইয়া বিপথে চালিত হইয়া পড়িলাম। আমরা ঐ বনের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, ঐ আগুন দাবানল ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ, উপত্যকার ভূমিতে গাঢ়

ভারত-গৌরব বৈমানিকদ্বয়

অন্ধকার সঞ্চারিত হইতেছিল। আমরা সঙ্কেতালোকের জন্য বৃথাই উড়িতেছিলাম। অবশেষে তাহার কোন চিহ্ন না দেখিয়া আমরা স্থির করিলাম যে সম্পূর্ণ অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে কোথাও নামিয়া পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া আমরা অদূরস্থিত একটী নদীর তীরে উপযুক্ত নামিবার জায়গা দেখিয়া সেইদিকে আমাদের বিমানপোত চালিত করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া নামিবার চেষ্টা করা গেল। নামিতে নামিতে আমরা যখন মাটী হইতে মাত্র পঞ্চাশ ফিট উপরে তখন পাশের ঝোপ হইতে প্রকাণ্ড দাঁতওয়ালা এক দল বিরাট্‌কায় হাতী খড়্‌খড়্ করিতে করিতে বাহির হইল। এই দৃশ্যে আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম এবং নামিবার আশা ত্যাগ করিয়া সঙ্কেতালোক দেখিবার আশায় পুনরায় পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিয়া

গেলাম। কিন্তু অদৃষ্ট আমাদের সুপ্রসন্ন ছিল না—আমরা আলো দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে খানিকটা পোড়াজমি দেখিয়া তথায় নিরাপদে নামিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। এইরূপে নামিতে নামিতে যখন আমরা মাটী হইতে ছয় ফিট মাত্র উপরে তখন আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী গাছের পোড়া গুঁড়ির সহিত আমাদের বিমানপোতের দক্ষিণ দিকের পক্ষখানির নীচের দিক্‌টার সহিত ভীষণ সংঘর্ষ হওয়ায় আমরা বেগে আন্দোলিত হইলাম। এই সংঘর্ষণের ফলে বিমানপোতের নীচে যে দোলনাটী ছিল তাহা সম্পূর্ণ ভাবে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গেল, এবং আমাদের বিমানপোতখানি সম্পূর্ণ ভাবে অচল হইয়া পড়িল।

"সেই রাত্রি আমরা ভাঙ্গা বিমানপোতেই কাটাইলাম। তার পর দিন হইতেই আমাদের যথার্থ বিপদ্ আরম্ভ হইল। আমাদের কাছে সামান্য জল ছিল। সুতরাং আমরা জলের জন্য বিমানপোত ছাড়িয়া বাহির হইলাম এবং হাঁটিতে হাঁটিতে প্রায় তিন মাইল পথ অগ্রসর হইয়া গেলাম। কিন্তু কোথাও এক বিন্দু জল পাওয়া গেল না। তখন আমরা ফিরিলাম, কিন্তু ফিরিবার মুখে পথ হারাইয়া ফেলিলাম। আফ্রিকার সেই ভীষণ বনভূমির মধ্যে এক ফ্লাস্ক জল, একটী বেড়াইবার লাঠি এবং একটী টর্চ্চ মাত্র আমাদের সম্বলের মধ্যে ছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে আমরা প্রায় কুড়ি মাইল চলিয়া গেলাম কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে বিন্দুমাত্র জলেরও চিহ্ন পাওয়া গেল না। চলিতে চলিতে আমরা তিনটী ছোট ছোট শুষ্ক নদী পার হইয়া আসিলাম—ঐ নদীগুলির একটীর ভিতর দুইটী সিংহের বাচ্চা দেখিতে পাইলাম। তাহারা খেলা করিতেছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, কেননা আমাদের আশঙ্কা হইল যে বাচ্চা যখন এখানে তখন তাহাদের মাও নিশ্চয়ই নিকটেই কোথাও আছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমরা তখন বিশ্রামের জন্য একটী খোলা জায়গা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। কিন্তু রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত উপস্থিত হইল; আমরা গাছের ডাল ভাঙ্গিবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। ঐ শব্দ যেদিক্ হইতে আসিতেছিল সেদিকে আমরা টর্চ্চের আলো ফেলিলাম। আলোতে আমাদের সম্মুখে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুকের রক্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ঠিক আমাদের সম্মুখেই একপাল বড় বড় দাঁতওয়ালা বুনো হাতী! তন্মুহূর্ত্তেই আমরা দৌড়াইয়া কতগুলি গাছের পিছনে লুকাইয়া পড়িলাম। সৌভাগ্যক্রমে হাতীর দল যেদিকে আসিতেছিল, কি কারণে সেদিকে না আসিয়া অন্যপথে ঘুরিয়া চলিয়া গেল। আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ইহার পর সে রাত্রিটা যথাসম্ভব নিরুদ্বেগেই কাটান গেল।

"পর দিন প্রত্যুষে লোকালয় এবং জলের অন্বেষণে পুনরায় বাহির হওয়া গেল। এই কয় দিনের অনিয়মে আমাদের জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমাদের ওষ্ঠ ফাটিয়া গিয়াছিল। এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা অপরিষ্কার জলে পূর্ণ একটী ক্ষুদ্র ডোবা দেখিতে

পাইলাম। ডোবার ভিতর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ভোঁ ভোঁ করিতেছিল। জলের উপর কোন প্রাণীর চর্ব্বি এবং লোম ভাসিতেছিল। জলের রং একেবারে সবুজ হইয়া গিয়াছে। আমরা আমাদের একখানা রুমাল চারি ভাঁজ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই সবুজবর্ণ জল কোন রকমে পান করিলাম। তার পর মনে হইল ফ্লাস্কেও খানিকটা জল ভরিয়া লইলে মন্দ হয় না। এই স্থির করিয়া আমরা ফ্লাস্কে জল ভরিতে লাগিলাম। আমরা যখন ফ্লাস্কে জল ভরিয়া লইতেছি হঠাৎ তখন একটা শব্দে চমকিয়া সম্মুখে তাকাইলাম। দেখিলাম আমাদের নিকট হইতে প্রায় ৪০ ফিট দূরে, ঠিক সম্মুখে এক ভীমকায় গণ্ডার আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উদ্দেশ্য বোধ হয় আমাদের আক্রমণ করা। আমরা তখন আর অন্য দিকে না তাকাইয়া দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া

হাতীর পাল এই রকম দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

সোজা দৌড় দিলাম। আমাদিগকে হঠাৎ এইরূপ দৌড়াইতে দেখিয়া গণ্ডারটীও বোধ হয় ভয় পাইয়া থাকিবে, নিকটেই যে ঝোপ ছিল তাহার ভিতর দিয়া সে দৌড়াইয়া পালাইল। এদিকে আমরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রায় এক মাইল চলিয়া আসিয়াছি। সে রাতটা আমাদিগকে একটী খোলা জায়গাতেই কাটাইতে হইল। রাত্রে দুরন্ত শীত পড়িল।

"তৃতীয় দিন হাঁটিতে হাঁটিতে চলিয়াছি। চলিতে চলিতে কিছু দূর গিয়া আমরা একটী নদী দেখিতে পাইলাম। নদী দেখিয়া আমাদের খুব আনন্দ হইল—ধীরে ধীরে নদীতে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলাম। স্নান করিতে করিতে হঠাৎ ওপারে তাকাইতেই দেখি আবার একপাল হাতী! তাড়াতাড়ি আমরা সাঁতার দিয়া নদীর অন্য পারে চলিয়া গেলাম। নদীর অন্য পারে উঠিয়াই আমাদের খেয়াল হইল যে তাড়াতাড়িতে আমাদের সমস্ত কাপড়, পোষাক ইত্যাদি ঐ পারে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন হাতীর পাল ওখান হইতে সরিয়া না গেলে আমরা তো কিছুই করিতে পারিব না! সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাতীর পাল চলিয়া না গেল ততক্ষণ একটী

মোটা গাছের গুঁড়ির পিছনে লুকাইয়া আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। উহারা চলিয়া গেলে আমরা আবার সাঁতার দিয়া ওপারে গিয়া কাপড়চোপড় লইলাম। এদিনও কোন আশ্রয় খুঁজিয়া না পাওয়ায় খোলা জায়গাতেই রাত্রি কাটাইতে হইল। এদিকে আমাদের খাদ্যেরও কোন সংস্থান নাই। ক্ষুধায় প্রাণ যায়! আমরা স্থির করিলাম, বাঁশ দিয়া ধনুক তৈরী করিয়া পশুপক্ষী প্রভৃতি শীকার করিতে হইবে। তাহা না করিলে আমাদের অনাহারে মৃত্যু ছাড়া গতি নাই। এই স্থির করিয়া আমরা ধনুক তৈরী করিতে লাগিয়া গেলাম। অনেক কষ্টে ধনুক প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই ধনুক দিয়া আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না, কারণ আমরা যে তীর তৈরী করিলাম সেগুলি তেমন শক্ত হইল না। এখন আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কাজেই সেদিনও আমাদের বিশেষ কিছু খাওয়া হইল না। তার উপর অনবরত ঝোপে-ঝাড়ে চলিতে চলিতে আমাদের হাত-পাও নানা রকমের কাঁটায় ছড়িয়া রক্তাক্ত হইয়া গেল।

"আমাদের বিমানপোত অচল হইবার চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা নদীতে একটী ডোঙ্গা দেখিতে পাইলাম। তখন কোন গ্রাম কিংবা লোকালয় দেখিতে পাওয়া যায় কিনা এই আশায় অগ্রসর হওয়া গেল। চলিতে চলিতে একটা গাছের নিকটে আসিলাম। সেই গাছে উঠিয়া চারদিক্ দেখিতে দেখিতে নদীর ওপারে দূরে একটী গ্রামের মত বস্তু নজরে আসিল। সেই গ্রামে পৌঁছিবার জন্য আমরা তখন সেই ডোঙ্গায় করিয়া নদী পার হইয়া ওপারে গেলাম। তীরে পৌঁছিয়া সেখানেও একখানা ডোঙ্গা দেখা গেল। ডোঙ্গাখানি কোন একটী গাছের গুঁড়ি দিয়া নির্ম্মিত এবং অতি সাধারণ রকমের। যাহা হউক, আমাদের ডোঙ্গাখানি সেখানে রাখিয়া আমরা যেদিকে গ্রাম দেখিতে পাইয়াছিলাম সেই দিকে চলিলাম। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট এবারেও শুভ হইল না—গ্রামে পৌঁছিয়া একজন লোকও দেখিতে পাইলাম না। জনমানবহীন পরিত্যক্ত গ্রাম। যাহা হউক, গ্রামের ভিতর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একখানি কুটীরের ভিতর দেখিতে পাইলাম একটী শুক্‌নো লাউ। লাউটী ভাঙ্গিয়া প্রথমেই বীচিগুলি খাইয়া ফেলিলাম, তার পর খাইলাম শক্ত খোলাটী। খোলাটী খাইতে কতকটা শক্ত বিস্কুটের মত বোধ হইল। পাঁচ দিন উপবাস করার পর এই লাউ খাওয়াই আমাদের প্রথম আহার। ইহার পর আমরা নদীতীরে ফিরিয়া আসিলাম; তার পর ডোঙ্গায় চাপিয়া ভাসিয়া চলিলাম নদীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে। এই প্রকারে প্রায় বারো মাইল ডোঙ্গা বাহিয়া চলিবার পর মনে হইল যেন মানুষের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছি। তখনই আমরা নদীতীরে ডোঙ্গা ভিড়াইয়া উহা বাঁধিয়া ফেলিলাম। একদল জংলী মত লোক চোখে আসিল; উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমাদের এই চীৎকারে লোকগুলি ঝোপের ভিতর হইতে তাহাদের

মুখ বাহির করিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। আমরা আমাদের হাত পা নাড়িয়া ভাবভঙ্গীদ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে আমরা বড়ই ক্ষুধার্ত্ত। কিন্তু বহু দিন ক্ষৌরকার্য্য না করাতে আমাদের মুখ গোঁফ-দাড়িতে ভরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এরূপ গোঁফদাড়ি-সংযুক্ত মুখ এবং রক্তাক্ত হাত-পা দেখিয়া ঐ জংলী অসভ্যগণ আমাদিগকেও বোধ হয় নরমাংসভুক্ জংলী বলিয়াই মনে করিল। ফলে আমাদের এই চেহারা এবং এ প্রকার অঙ্গভঙ্গীতে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল এবং আমাদের নিকট হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। গ্রাম পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিব আমরাও এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। আমাদিগকে অনুসরণ করিতে দেখিয়া একজন জংলী হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং আমরা যদি আর বেশী দূর তাহাদের অনুসরণ করি তাহা হইলে বর্শাবিদ্ধ করিয়া আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে এই ভাবে সে আমাদের অভিমুখে একটা তীক্ষ্ণ বর্শা নিক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে উদ্যত করিল। ইহার পর আর অগ্রসর হওয়া অনুচিত বোধে আমরা বাধ্য হইয়াই নদীর ধারে ফিরিয়া আসিলাম। ঐ লোকগুলি ফিরিয়া গিয়া তাহাদের গ্রামের অধিপতিকে খবর দিল যে দুইজন শ্বেতাঙ্গ লোক নদীতে মাছ মারিতেছে! ঐ 'শ্বেতাঙ্গ' দুইটি নাকি তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং তাহারা বহু কষ্টে নাকি উহাদের হাত এড়াইয়া পালাইয়া আসিয়াছে। গ্রামপতি তীরধনু-সজ্জিত প্রায় পঁচিশ জন বালকের সহিত হঠাৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমরা দলপতিকে বুঝাইয়া

বুনো গণ্ডার—নিরস্ত্র অবস্থায় এ মূর্ত্তি বিশেষ আনন্দদায়ক নয়।

দিলাম যে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত—কোন প্রকার অনিষ্ট-সাধন আমাদের অভিপ্রায় নহে। ভাগ্যক্রমে দলপতি কিছু কিছু ইংরাজী বলিতে এবং বুঝিতে পারিত। সে সম্ভবতঃ আমাদের কথা বুঝিতে পারিল। তাহারা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের গ্রামে লইয়া চলিল। গ্রামে পৌঁছিয়া তাহারা আমাদের ক্ষত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া বাঁধিয়া দিল; তার পর আমাদের খাইবার জন্য দিল এক প্রকার যবের মণ্ড। সে মণ্ডে না ছিল চিনি, না ছিল লবণ! যাহা হউক, আমরা এতই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম যে আলুনী ও বিস্বাদযুক্ত ঐ অপূর্ব্ব মণ্ডই পরম তৃপ্তি ও আনন্দের সহিত শেষ করিয়া দিলাম। ইতিমধ্যে আমরা সেখানে কতগুলি মোরগ দেখিতে পাইয়া দলপতিকে জানাইলাম যে ঐ গুলি দিয়া আমাদের আহার চলিতে পারে। দলপতি কয়েকটী মোরগ লইয়া তাহাদের নিজেদের প্রথায় বিনা লবণে অগ্নিতাপে ঝলসাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিল। উহাতে আমাদের সেদিনের আহারটী বেশ ভালই হইল।

"অতঃপর আমরা সেখান হইতে একজন লোকের দ্বারা ম্‌পিকা জেলার কমিশনারের নিকট আমাদের খবর পাঠাইলাম। আমরা পথ হারাইবার সাত দিন পরে ঐ খবর তাঁহার নিকট পৌঁছিল। সংবাদ পাইবামাত্র উপযুক্তপরিমাণে খাদ্যদ্রব্য লইয়া আমরা যে গ্রামে ছিলাম সেই গ্রামে বিমানপোতে করিয়া তিনি আসিলেন। তিনি যে সমস্ত খাদ্য লইয়া আসিয়াছিলেন বিমান হইতেই তাহা নীচে নিক্ষেপ করিলেন। আমরাও মহানন্দে সে সব খাবার গ্রহণ করিলাম। সেগুলি আমাদের নিকট মনে হইল ঠিক যেন অমৃত। তিনি আরও সংবাদ দিলেন যে আমাদিগকে বহুসিংহসঙ্কুল তিনটী পর্ব্বত পার হইতে হইবে—এজন্য তিনি জিনিষপত্র লইবার ঝুড়ি, বাহক, রাইফ্‌ল্ এবং একটী তাঁবু শীঘ্রই আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেছেন এবং যাহাতে আমরা নিরাপদে সেখানে পৌঁছিতে পারি সেজন্য নানা প্রকার সুবিধার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এইরূপে আমরা নবম দিনে ম্‌পিকায় পৌঁছিলাম এবং যেদিন ম্‌পিকায় পৌঁছিলাম সে রাত্রির জন্য একটী বনের মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া থাকিতে হইল। বনের মধ্যে রাত কাটাইতে হইলেও তাহাতে আমাদের আরাম কম হয় নাই, কারণ আমাদের তাঁবুটী ছিল চমৎকার। কমিশনার সাহেব আমাদের জন্য একটী আরামদায়ক শয্যাও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

"আমাদের এই দারুণ বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য আমরা কমিশনার সাহেব মিঃ ফক্স-পিট এবং তাঁহার পত্নীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহারা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটী বাজারে গেলেন। সেখানে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পোষাকপরিচ্ছদাদি কিনিয়া লইলাম। কেনাকাটা শেষ করিয়া আমরা একটী হোটেলে গেলাম।

"অতঃপর ম্‌পিকা হইতে ইম্পীরিয়াল এয়ারপথে আমরা ব্রোক্‌ন্‌হিলে আসিলাম। ব্রোক্‌ন্‌হিল হইতে স্যল্‌স্‌বেরী এবং স্যল্‌স্‌বেরী হইতে রেলে চাপিয়া জোহান্‌স্‌বার্গে গেলাম। স্যল্‌স্‌বেরীতে

আমরা সেখানকার মেয়র এবং ভারতীয় সমিতি-কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলাম। জোহান্‌স্‌বার্গের পথে আমরা যে সমস্ত স্থানে নামিয়াছি তাহার প্রত্যেক স্থানেই আমাদের স্বদেশীয় লোকজনের সহিত দেখা হইয়াছে। ডারবানেও আমরা ভাল-ভাবেই অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম।

আমরা স্বদেশে ফিরিয়া আমাদের দেশবাসিগণকর্ত্তৃক যেভাবে অভিনন্দিত হইয়াছি এবং আফ্রিকায় স্বদেশীয়সমাজ ও ইয়োরোপীয়গণ কর্ত্তৃক যেভাবে উৎসাহিত হইয়াছি সেজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সর্ব্বশেষে আমরা আফ্রিকা-বিজনে পথভ্রষ্ট হইলে আমাদের অন্বেষণের জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করার এবং আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য আমরা দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ ভারতসরকারের প্রতিনিধি (এজেণ্ট্) স্যর সৈয়দ রেজাআলি মহোদয়কে আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।" *

চূণবর্ণ শ্রীদাম-কথা

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

সামান্য ছোট ছোট ঘটনা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ডের উদ্ভব হয়, এ কথা কানেও শুনেছি, চোখেও প্রত্যক্ষ করেছি। কানে-শোনা ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্য নাকি কিছু নাই, তাই তা না বলে একটা স্বচক্ষে-দেখা কাহিনীই আজ তোমাদের কাছে বিবৃত কর্‌ব।

রসা রোড্ দিয়ে একটা প্রোসেসন্ যাচ্ছিল; সেটা যে কিসের প্রোসেসন্ সে সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আমার অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় নি। সাধারণতঃ এ সব ব্যাপারে যা হয় এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, অর্থাৎ দুই ফুট্-পাথ্ জুড়ে, ব্যস্ত পথিকদের যাতায়াতের অসুবিধা ঘটিয়ে, নিষ্কর্ম্মা লোকের দল সার বেঁধে হাঁ করে প্রোসেসন্ গিল্‌ছিল। হঠাৎ একটা দুষ্টু লোক অযথাই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "আরে

* অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে—লেঃ।

সার্জ্জেণ্ট ধর্‌লে, পালা পালা!" অথচ প্রসেসনের সঙ্গে যে ক'টি সার্জ্জেণ্ট্ ছিল কারোই যে 'ধর্‌বার' বিশেষ আগ্রহ ছিল তা মনে হ'ল না।

অবাক্ হয়ে দেখ্‌লাম, এই চীৎকারের ফলে রমেশ মিত্তির রোড্ দিয়ে একেবারে টু হাণ্ড্রেড্ ইয়ার্ড্‌স্ ফ্ল্যাট্ রেস্ সুরু হয়ে গেছে। স্কুলে পড়্‌বার সময় শ্রীদাম ভায়াকে বহু চেষ্টাতেও কেউ স্পোর্ট্‌সে নামাতে পারেনি, আর সে জন্য যে মারাত্মক রকমের কোন ভুল হচ্ছে এ কথাও আমাদের কারোই মনে আসেনি। এইবার সকলে যুগপৎ উপলব্ধি কর্‌লাম—স্কুল-স্পোর্ট্‌সে রেকর্ড্ তোল্‌বার কত বড় একটা সুযোগ আমরা হেলায় হারিয়েছি, কেননা সবাই স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম 'সেকেণ্ড্'কে অবলীলাক্রমে পঞ্চাশ হাত পেছনে রেখে শ্রীদাম ভায়া আমাদের বিদ্যুদ্বেগে ফার্ষ্ট্ ছুটে চলেছে। অরেঞ্জ্ উইলিয়মও কোন দিন এতখানি বাহাদুরী দেখাতে পারেনি, মেজর সিগ্রেভের মোটর গাড়ী পেরেছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

হঠাৎ একটা বিপদ্‌পাত হয়ে গেল।

আমরা বরাবর বলে এসেছি কল্‌কাতা কর্পোরেশন থেকে একটা আইন হওয়া উচিত যাতে ফুট্‌পাথের ওপর কেউ কলা অথবা কমলা লেবুর খোসা ফেল্‌তে পার্‌বে না; তাতে নানা রকম অনর্থের সৃষ্টি হয়, যেমন এক্ষেত্রে হল—পৃথিবীর একটা নতুন রেকর্ড্-স্থাপনের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল। সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে ব্যাপারটা ঘট্‌ল এই রকম। রাস্তার পাশে একটি বাড়ী মেরামৎ হচ্ছিল, গাড়ী দু'তিন চূণ তাই রাখা হ'য়েছিল ঠিক ফুট্‌পাথের ধারে। কোন বেরসিক (অথবা সুরসিক) একটু আগে তারই কাছে একটী কলাভক্ষণ করে ছোব্‌ড়া-মোচন করে গেছে। আমরা সপ্রশংসভাবে শ্রীদামের রেস্ দেখ্‌ছি, পা দু'টী তার মাটী ছোঁয় কি ছোঁয় না। সেই জন্যই বোধ করি কলার খোসাটি তারা একটু বেশী মাত্রাতেই ছুঁয়ে ফেল্‌ল। পরমুহূর্ত্তেই দেখি শ্রীদাম আর রাস্তায় নাই, চূণের গাদায় অবগাহন কর্‌ছে। যে ভুঁড়িবান্ মাড়োয়ারীটি 'রেসে' সেকেণ্ড্ আস্‌ছিল সে শ্রীদামকে প্রায় ধরে আর কি! কিন্তু শ্রীদাম আমাদের সংকল্পে অটল, রেসে ফার্ষ্ট্ তাকে হ'তেই হবে। নিমেষ মধ্যে চূণের গাদা থেকে তাই শ্রীদামের নবমূর্ত্তি

বেরিয়ে এল। দেখে কি চেন্‌বার আর উপায় আছে? আগে শ্রীদামের রং ছিল ঠিক তোমার চুলের মত, এখন হ'য়েছে তোমার দাঁতের মত। (আমরা ধরে নিচ্ছি রামধনুর কোন পাঠক-পাঠিকারই চুল এখনও পাকেনি এবং তাদের "অকালপক্কতা" দোষও নেই। আর 'দন্তচর্য্যা' পড়্‌বার পর থেকে তারা প্রত্যহ দাঁত মাজে, কাজেই দাঁতগুলো তাদের ঝক্‌ঝকে সাদা, হল্‌দে নয়।) শ্রীদাম ভায়া বিলেত না গিয়েই সাহেব হয়ে গেছে! স্বয়ং হিট্‌লের পর্য্যন্ত তাকে অসঙ্কোচে আর্য্য বলে মেনে নেবে।

ঘণ্টাখানেক বাদে পাড়ায় ফিরে শুন্‌লাম শ্রীদাম শুধু 'টু হাণ্ড্রেড্ ইয়ার্ড্‌স্ ফ্ল্যাট্ রেসেই' ফার্ষ্ট্ হয়ে ক্ষান্ত হয়নি, 'ওয়ান্ মাইল ক্রস্ কান্‌ট্রি রেস'ও শেষ করেছে। একটু বিশদ ক'রে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া ভাল। আমাদের পাড়ায় একটী বিখ্যাত ষাঁড় ছিল, তার ধরণটা একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের। নতুন কিছু দেখ্‌লে সে তার পেছু-তাড়া কর্‌বেই। তার দৌরাত্ম্যে আমাদের ওদিকে মোটর সাইকেল চালাবার জো ছিল না। শ্রীদামকে কাছে আস্‌তে দেখে সে বোধ করি তার পরিচিত সমস্ত সচেতন পদার্থগুলিরই মনে মনে একবার ধ্যান করে নিল; তার পর কারো চেহারার সঙ্গেই শ্রীদাম-মূর্ত্তির মিল না পেয়ে বৃষভপ্রবর উঠে দাঁড়ালেন। একটা গম্ভীর আওয়াজ হ'ল "ম্-ম্-ম্-স্বা"! শ্রীদামের মুখ আর বেশী সাদা হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু শুকিয়ে গেল ভয়ে একেবারে আমসীর মত, কেননা পাড়ার সবাই জান্‌ত এটা হ'চ্ছে বৃষভ-বরের যুদ্ধ-ঘোষণা। এর পরেই মাথা নীচু করে, শিং বাগিয়ে সুরু হবে 'চার্জ্জ অব্ দি লাইট্ ব্রিগেড্'; এবং তা চল্‌বে কেবল হাফ্-এ-লীগ্ পর্য্যন্ত নয়, অন্ততঃ হাফ্-এ-মাইল্!

হ'লও তাই। যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষে আর ষাঁড়ের এই রেসা-রেসি ('বাসে'র ভাষায়) দেখেছিল তাদের কাছে শুনেছি শ্রীদামের তখনকার অবস্থা। বেচারার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না, সাম্‌নে যে রাস্তা, যে গলিঘুঁজি পাচ্ছে তারই ভেতর ঢুকে পড়্‌ছে। ভাগ্যিস্ আমাদের পাড়ায় ব্লাইণ্ড্‌লেন নেই!

এ রকম একটা ঘটনা ঘট্‌বার পর শ্রীদামের পাড়ায় বাস যে ঠিক স্বর্গবাসের মত আরামজনক মনে হবে না, তা বোধ হয় তোমরা কতকটা আন্দাজ কর্‌তে পার্‌ছ। সমবয়সী ইয়ার-বন্ধুবান্ধব, আর অ-সমবয়সী ডেঁপো ছোকরার তো আর

অভাব নেই! যারা একটু ভাল মানুষ গোছের তারা বল্লে, "আমরা আগাগোড়া ওখানে দাঁড়িয়ে, দিব্যি শান্তশিষ্ট প্রোসেসন, ধর-পাকড়ের নামগন্ধ নেই! কে বলে উঠ্‌ল 'পালা' আর অম্‌নি তুই লেজ গুটিয়ে দিলি ছুট! আচ্ছা ভীরু তো তুই!" যারা ঠিক অতটা ভাল মানুষ নয় তারা কণ্ঠে খানিকটা শ্লেষ ঢেলে বল্লে, "তা শ্রীদাম দা, এ আর এমন কি মন্দ হয়েছে! কয়েক মিনিটের জন্য অন্ততঃ একজনও তো তোমাকে ফর্সা ভেবেছিল, তা হ'লই বা সে মানুষ না হয়ে ষাঁড়! তোমার কিন্তু ওকে ভাল করে একদিন চাল-কলা খাওয়ান উচিত। কিন্তু সব চাইতে বদ্‌রসিক বল্‌তে হবে আমাদের নিখিলকে। সে কাগজ-কলম নিয়ে দিব্যি এক ছড়া তৈরী করে ফেল্লে; তার গোড়াটা এই রকমের

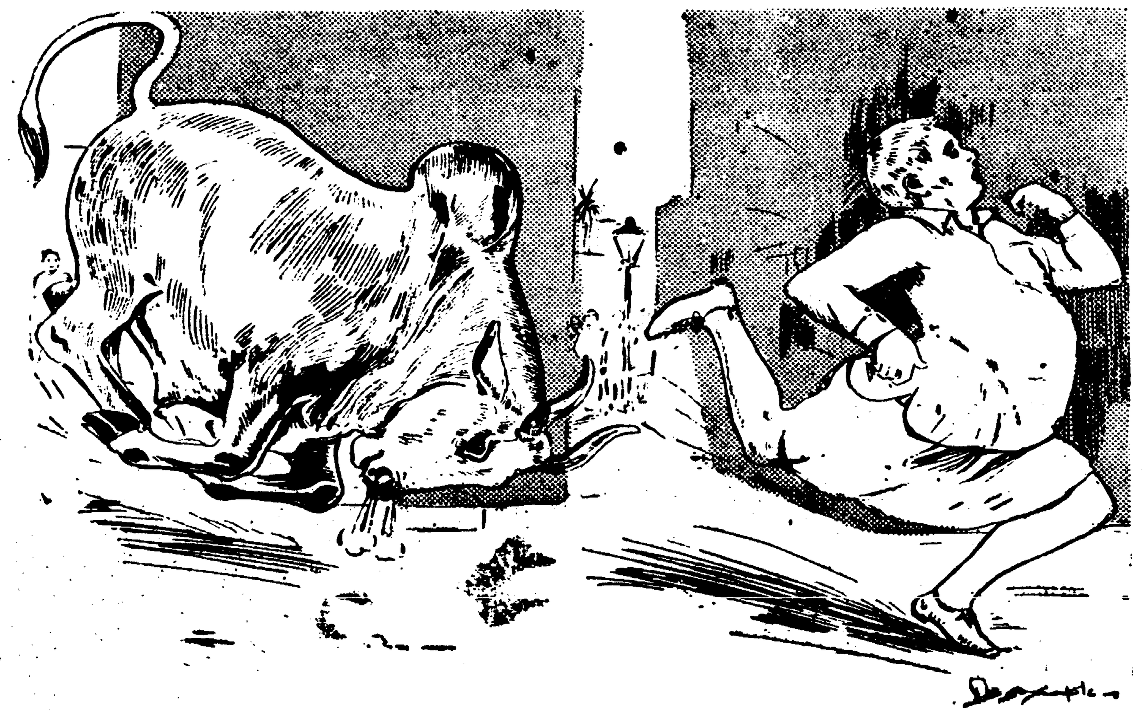

ভাগ্যিস্ ব্লাইণ্ড্ লেন নেই!

চূণবর্ণ শ্রীদাম-কথা

প্রোসেসনে আছে শুনে ক'টি গোরামূর্ত্তি,
শ্রীদাম বেদম ভীত, নাই মনে ফূর্ত্তি!

এর পর থেকে শ্রীদাম বেচারার রাস্তায় বার হওয়াই যেন দায় হয়ে উঠ্‌ল। যখন তখন আড়াল-আব্‌ডাল থেকে ফচ্‌কে ছোক্‌রার দল বলে ওঠে, "চূণবর্ণ শ্রীদাম বসু।" একদিন দেখি বছর পাঁচেক বয়সের এক পুঁচ্‌কে ছেলে শ্রীদামের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে; সে সবে বলেছে "চূণ..." অম্‌নি শ্রীদাম বসিয়ে দিয়েছে তার গালে ক'ষে এক চড়। বেচারার 'ব' আর বলা হ'ল না, একটা দীর্ঘ টানা "ব্যা..." করে সে সরে পড়্‌ল।

সে রাত্রেই চুপি-চুপি শ্রীদাম এসে আমার কাছে উপস্থিত; সতর্ক-দৃষ্টিতে চারদিক্ একবার দেখে নিয়ে খাটো গলায় বল্লে, "ভাই অম্বুজ, আমার বড় বদ্‌নাম রটে গেছে..."

সংশোধন করে আমি বল্লাম, "সুনাম বল্; লোকে এত দিন পরে তোকে ফর্সা বল্‌তে সুরু করেছে এটা তো তোর পক্ষে আর অগৌরবের কিছু নয়!"

"ঠাট্টা রাখ্, লোকে এখন চরম ভীরুর কথা বল্‌তে গেলে আমার উপমা দেয় সে খবর তুই রাখিস্?"

"অর্থাৎ তুই একটা হিষ্টরিক্যাল্ ফিগার হয়ে পড়েছিস্! তা এও তো ভাই কম কথা নয়, লোকে কত খড়কাঠ পুড়িয়েও দেশের ইতিহাসে নাম তুল্‌তে পারে না, আর একটু চূণকাম হ'য়েই তুই তা ক'রে ফেল্লি! বাস্তবিক, তোকে তো আমার হিংসে হচ্ছে!"

"ফের ঠাট্টা! এলাম তোর কাছে কোথায় তুই একটা উপায় ঠাওরাবি তা না সুরু করে দিয়েছিস্ ফাজ্‌লামি।"

"কি উপায় ঠাওরাই বল্! বছর দুই আগে হলে তবুও যা হোক্ একটা কিছু করা যেত, কিন্তু এখন সে আর হয় না।"

"কেন, বছর দুই আগে হ'লে কি হ'ত? আর এখনই বা তা হবে না কেন?"

"বছর দুই আগে তোরা থাক্‌তিস্ ভাড়াটে বাড়ীতে, কোন ছুতোয় বাড়ী আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পাড়া বদ্‌লে ফেল্লেই সব চুকেবুকে যেত। কিন্তু এখন যে ও বাড়ীটা তোরা কিনে নিয়েছিস্!"

শ্রীদাম খুব গম্ভীর হয়ে বল্লে, "না ভাই, আমি মনে মনে একটা মৎলব এঁটেছি, কিন্তু একা একা সেটা করা একেবারেই অসম্ভব। তোকে আমার সহায় হতে হবে।"

মাথা হেলিয়ে বায়োস্কোপি ঢংএ বল্লাম, "শূট।"

শ্রীদাম বল্লে, "যারা আমায় ভীরু অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের মুখ বন্ধ কর্‌বার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে খুব একটা সাহসিকতার কাজ সম্পন্ন করা, অন্ততঃ

করেছি বলে বাইরে প্রকাশ করা। তাই আমি ঠিক করেছি একদিন রাত্তির বেলা তুই আর আমি হেষ্টিংসের দিকে গঙ্গার পারে বেড়াতে যাব। ও জায়গাটা বড়ই নিরিবিলি, একটু বেশী রাত্তিরে জনপ্রাণীও থাক্‌বে না। আস্তে আস্তে কোমর জল পর্য্যন্ত নেমে দু'জনে দু'টো ডুব দিয়ে ডাঙ্গায় উঠে আস্‌ব। তার পর ট্যাক্সি চেপে সটান তোদের বাড়ী এসে উপস্থিত হওয়া। তুই একটু এলিয়ে পড়্‌বার ভান করে ধীরে ধীরে বল্‌বি, 'আমরা নৌকো ভাড়া ক'রে গঙ্গায় বেড়াচ্ছিলাম, একটু হাত ধোয়ার জন্যে যেই উপুড় হয়েছি অম্‌নি তাল সাম্‌লাতে না পেরে একেবারে উল্টে পড়্‌লাম নদীর ভেতর। বর্ষার গঙ্গা প্রলয়-নাচন নাচছে; মনে হ'ল ক্রমাগত চাপের ওপর চাপ দিয়ে আমায় বুঝি পাতাল-পানেই নিয়ে চল্ল। ঠিক সেই সময়ে এক-জোড়া বলিষ্ঠ হাত সজোরে আমার গলা জড়িয়ে ধর্‌ল; তার পরেই মনে হ'ল কে যেন আমায় স্রোত ভেঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে। একটু পরেই পারে এসে পৌঁছুলাম; অবসাদে তখন আমার প্রায় মূর্চ্ছা হবার গতিক, কিন্তু তবুও তারই মধ্যে বুঝ্‌তে পার্‌লাম আমার উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীদাম।' ব্যস্‌, এর পর কে আর এ পাড়ায় ঠাট্টা কর্‌তে সাহস করে দেখ্‌ব।"

আমি অবাক্ হ'য়ে শ্রীদামের বক্তৃতা শুন্‌ছিলাম, সে থাম্‌তেই বলে উঠলাম্ "শ্রীদাম তোর প্রতিভা নষ্ট হচ্ছে, তুই নাটক লেখ্, নভেল লেখ্—আমি পাব্‌লিশ্ কর্‌ব, টাকা দিয়ে পাব্‌লিশ্ কর্‌ব! উঃ, কি কল্পনা!"

শ্রীদাম আপ্যায়িত হয়ে বল্লে, "তবে তুই রাজী?"

"না।"

"না?" শ্রীদাম যেন একেবারে নিভে গেল।

"না। এমন একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা কি করে সত্যি বলে রটাই তুই-ই বল্। আর তা ছাড়া তুই সাঁতার তো জানিস্ আমারই মত, কোন্ সাহসে এত বড় একটা ঘটনা জাহির কর্‌তে যাচ্ছিস্?"

"সে হবে'খন, তাতে আট্‌কাবে না। শুধু তুই একবারটি রাজী হ ভাই।"

ঠিক এম্‌নি সময় রাজেন এসে আমাদের ঘরে ঢুক্‌ল। আমার মত সেও শ্রীদামের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

রাজেন ছেলেটা একটু ভাবপ্রবণ, অতি সামান্য কারণেই একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়ে, আবার সামান্য কারণেই উৎসাহে জ্বলে ওঠে। কেউ কোন রকম দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে দেখ্‌লেই তার চোখে অশ্রুর ফোয়ারা ওঠে, আবার কেউ অন্যায় ভাবে অন্যের ওপর অত্যাচার কর্‌ছে দেখ্‌লে সেই চোখেই ফের বিসুভিয়াসের মত আগুন হানে। শ্রীদামের মুখে আর এক দফা মৎলবটা আনুপূর্ব্বিক শুনে সে হাঁটু চাপ্‌ড়ে ব'লে উঠ্‌ল, "কুছ্‌পরোয়া নেই, আমি রাজী! কারো এতে এতটুকু ক্ষতি নেই, অথচ বন্ধু হ'য়ে বন্ধুর এ সামান্য উপকারটুকু যদি না করি তো অমন বন্ধুত্ব কপ্‌চাই কোন্ মুখে?" ব'লে সে আমার দিকে একটি নয়ন-বাণ হান্‌লে।

ব্যস্‌, শ্রীদাম-রাজেন প্যাক্ট 'সীলমোহর' হয়ে গেল, একটা নির্দ্দিষ্ট দিন আর নির্দ্দিষ্ট সময়ও তারা ঠিক করে ফেল্লে।

সেদিন রাত পৌনে এগারটায় খাওয়া দাওয়া সেরে সবে ওড্‌হাউসের একখানা নতুন বইএ মনঃসংযোগ কর্‌তে যাচ্ছি এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ এল, "অম্বুজদা বাড়ী আছেন? অম্বুজদা!" জানালার দিকে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কি ব্রজেন, খবর কি? এত রাত্তিরে?"

"ছোড়্‌দার কোন খবর জানেন? আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে তাঁর?" ব্রজেনের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা উপ্‌চে পড়্‌ছে।

"না তো! কেন, এখনও রাজেন বাড়ী ফেরেনি নাকি?"

"উঁহুঁ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে গেছেন, তার পর আর কোন খবরই নেই। বাড়ীতে সব মহা চিন্তিত।"

হঠাৎ মনে পড়ে গেল শ্রীদাম-রাজেন প্যাক্ট, এবং সেদিনকার তারিখটার কথা। ঠোঁটের কোণে হাসি প্রায় এসেছিল আর কি, কোন মতে তা চাপা দিয়ে বল্লাম, "ভয় নেই, হয়তো কোথাও আট্‌কে পড়েছে, এখুনি এসে পড়্‌বে। চল আমিও বরং তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

রাজেনদের বাড়ী এসে দেখি সেখানে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড লেগে গেছে। ভাবপ্রবণতা ওদের বাড়ীর একটা বংশগত দোষ—সবাই বলে রাজেন তার বাবার কাছে থেকেই নিজের স্বভাব পেয়েছে। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হল তিনি

নেপোলিয়ন এবং একটু আগেই ওয়াটারলুর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। লাফিয়ে, চীৎকার করে, সমস্ত বাড়ী তিনি মাথায় করে তোল্‌বার জোগাড় করেছেন; মেডিকেল কলেজ, বেলগাছিয়া, ক্যাম্বেল কোথাও টেলিফোন কর্‌তে বাকী রাখেন নি।

ঠিক সেই সময়ে একখানা ট্যাক্সি এসে দরজার সাম্‌নে দাঁড়াল, দেখা গেল গাড়ীর পেছনের সীটে রাজেন আধমড়ার মত এলিয়ে পড়ে আছে; শ্রীদামের অবস্থাও বড় ভাল নয়। তাদের গা মাথা কাপড়চোপড় একেবারে ভিজে। রাজেনের বাবা প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লেন, ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "পাঁয়জি, ক্যা হুয়া, কাঁহাসে আতে হো?"

এলিয়ে পড়ে আছে

"দরিয়া সে বাবুজী, গঙ্গাজীসে" বলে ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে দিলে। ড্রাইভারের ঘাড়ে ভর রেখে রাজেন কোন মতে টল্‌তে টল্‌তে রকের ওপর উঠে, মাটীতেই বসে পড়্‌ল। শ্রীদামও পেছন পেছন এল—পা যেন তার আর সরে না, পরিশ্রমে সারা অঙ্গ ভেঙ্গে পড়্‌ছে—এম্‌নি ধারা ভাব। হাসি চেপে রাখা আমার পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হ'ল।

রাজেনের বাবা কণ্ঠস্বরের উৎকণ্ঠা সম্পূর্ণ বজায় রেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "একি রাজু, কি হ'য়েছে তোমাদের?"

রাজেন দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "হুঃহুঃ, নৌকো ভাড়া করে হুঃহুঃ, গঙ্গায় একটু বেড়াচ্ছিলাম, হুঃহুঃ, হাত ধুতে গিয়ে হুঃহুঃ, টাল সাম্‌লাতে না পেরে হুঃহুঃ, এক্কেবারে নদীর ভেতর...।" তার পর প্রচুর 'হুঃহুঃ'র ভেতর দিয়ে শ্রীদাম কী অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়ে নিজের প্রাণ উপেক্ষা ক'রে তাকে বাঁচিয়েছে

তার এম্‌নি একটা বিবরণ সে দিলে যে তা শুনে আমারই সমস্ত ব্যাপারটা সত্যি ব'লে বিশ্বাস কর্‌বার প্রবৃত্তি জন্মাছিল। শ্রীদাম লাজুকের মত চমৎকার একটী ভঙ্গী করে বসে ছিল। এমন সব জলজ্যান্ত 'প্রতিভা' থাক্‌তেও শুনি নাকি বাংলার সিনেমা-ওলারা ভাল অভিনেতা খুঁজে পান না। এরা যে ব্যারিমোর-চ্যাপ্‌লিন্-এমিল্ জেনিংসের দলকেও লজ্জা দিতে পারে!

রাজেনের বাবা একেবারে প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌লেন, দু'হাতে শ্রীদামকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বল্লেন, "ব্রেভ্ বয়, আই শ্যাল নেভার ফর্‌গেট্ ইট! কালই আমি আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, এড্‌ভান্স, বসুমতী, হিতবাদী সমস্ত কাগজে আগাগোড়া ব্যাপারটা ছাপিয়ে দেব। তোমার হালের ফটো আছে? না থাকে কালই আমি ফটোগ্রাফার পাঠিয়ে দেব তোমাদের বাড়ীতে। সমস্ত বাংলাদেশকে আমি দস্তুরমত জানিয়ে দিতে চাই, কত বড় একটা মহান্ প্রাণ রয়েছে আমাদেরই এই পাড়াতে।"

এর পর শুক্‌নো কাপড় এল, গরম চা এল; পাছে বেশীক্ষণ অপেক্ষা কর্‌লে বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। আমি তো আর ব্যারিমোর-চ্যাপ্‌লিন্-এমিল্ জেনিংস্ নই!

মানবচরিত্রে শ্রীদামের যে দখল আছে এ কথা বল্‌তেই হবে। এই ঘটনার পর পাড়ায় তার 'খ্যাতিপ্রতিপত্তির' গতি সম্পূর্ণ অন্যদিকে ফিরে গেল। চ্যাংড়ার দল আর তাকে 'চূণবর্ণ শ্রীদাম' বল্‌তে সাহস পায় না, উল্টে যথেষ্ট সমীহ করে। বন্ধুমহলে তার ইজ্জৎ অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। কোন্ একটা মিটিংএ সে নাকি সেদিন সভাপতিত্বও ক'রে এসেছে। এক কথায় বল্‌তে গেলে শ্রীদাম এখন শ্রীরাম-রাজত্বে বাস কর্‌ছে।

কিন্তু শীগ্‌গিরই একটা নতুন ধরণের বিপদের ধোঁয়া ধীরে ধীরে আকাশ-কোণে দেখা দিল। শ্রীদামদের বাড়ীতে সেদিন রাজেন, আমি আর শ্রীদাম ব'সে আছি, হঠাৎ দেখি জনা তিনেক ভদ্রলোক সস্মিতবদনে ঘরে এসে ঢুক্‌লেন; শ্রীদামকে নমস্কার করে বল্লেন, "আপনিই বোধ হয় শ্রীদাম বাবু! নাঃ, আমাদের চিন্‌তে পার্‌বেন না, আমরা ঠিক আপনার পাড়ার লোক নই, তবে কাছাকাছিই থাকি

বটে ! লেক্ "শরীর চর্য্যাসমিতির" নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমরা সেখানকারই সভ্য। আস্‌ছে কাল গঙ্গায় আমাদের সভ্যদের ভেতর একটা আঠার মাইল সাঁতার-প্রতিযোগিতা হবে, আপনাকে তাই…"

শ্রীদামের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল, "আমি—আমি তো আজকাল আর প্রতিযোগিতায় নামিনা, অনেক দিন হ'ল ওসব ছেড়ে দিয়েছি।"

ভদ্রলোক মৃদু হেসে জিব কেটে বল্লেন, "না না, আপনাকে প্রতিযোগিতায় নাম্‌তে বল্‌ব কেন, আমাদের সভ্যরা কখনো আপনার মত সাঁতারুর সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা ভাব্‌তে পারে ? তা নয়, ব্যাপারটা কি জানেন, প্রতিযোগিতায় নাম্‌লে ছেলেদের কেমন একটা রোখ্‌ চেপে যায়, হাত-পা এলিয়ে শরীর অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে, তবু তারা থাম্‌বে না। অনেক সময় তাই তারা কপ্‌ ক'রে ডুবে যায়; সে সময় ঝপ্‌ করে জলে লাফিয়ে পড়ে খপ্‌ ক'রে তাদের ধরে তুল্‌তে হয়। এই জন্য কয়েক জন ভাল সাঁতারুর দরকার; ছেলেদের পেছু পেছু আমাদের সঙ্গে নৌকোয় তাঁরা থাক্‌বেন, দরকার বুঝ্‌লেই জলে নেমে পড়্‌বেন। পাড়ার কাছে আপনিই আছেন এত বড় সাঁতারু তাই সভ্যদের ইচ্ছা, আপনি আমাদের সঙ্গে চলেন। প্রফুল্ল ঘোষ-টোষও আছেন বটে, তবে তাঁরা থাকেন দূরে, সব সময় তাঁদের পাওয়ার সুবিধা হয় না, কিন্তু আপনার ওপর আমাদের একটা দাবী আছে তা'তো অস্বীকার করতে পার্‌বেন না !"

শ্রীদাম যে এত বড় নামজাদা লোক হ'য়ে পড়েছে তা জান্‌তাম না, কিন্তু তাকিয়ে দেখি সে নামজাদা লোকটির চেহারা বড়ই বিশ্রী হ'য়ে গেছে। মুখ কাঁচুমাচু করে মিনতিমাখা কণ্ঠে সে বল্লে, "আমায়—আমায় আপনারা মাপ করুন, আমার শরীর আজকাল ভাল যাচ্ছে না।"

কিন্তু ভদ্রলোকেরা একেবারে নাছোড়বান্দা, তাকে রাজী না করিয়ে কিছুতেই উঠ্‌বেন না। শেষ পর্য্যন্ত 'ভেবে দেখা যাবে' ব'লে বহু কষ্টে তাঁদের বিদায় করা গেল।

তাঁরা চলে যেতেই রাজেন বল্‌লে, "তুই যা ওদের সঙ্গে শ্রীদাম, নইলে আবার

নানা রকম কথা উঠ্‌তে পারে। গঙ্গায় আঠার মাইল রেস্‌ দেবার সাহস যারা রাখে তারা আর কিছু টপ্‌ ক'রে ডুবে যাবে না। আর তা ছাড়া তুই তো আর একা থাক্‌বিনি, রক্ষক হিসাবে আরো কয়েক জন সাঁতারু নিশ্চয়ই যাবে, তাদেরই কাউকে ঠেলেঠুলে নামিয়ে দেওয়া যাবে'খন। আমরাও বরং সঙ্গে যাব।"

শেষ পর্য্যন্ত তাই ঠিক হ'ল, অর্থাৎ প্রতিযোগিতার দিন 'রক্ষক' শ্রীদামের রক্ষক হ'য়ে রাজেন আর আমিও তার সঙ্গ নিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘট্‌ল না, কিন্তু খড়দ' ছাড়াতেই মনে হল একটি ছেলে যেন অবসন্ন হ'য়ে তলিয়ে যাচ্ছে। একজন সভ্য অম্‌নি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "এই রে, ঘোঁতা ডুবে যাচ্ছে, শ্রীদাম বাবু আপনি নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।" তার পর শ্রীদামকে কোন উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই সে দিলে এক ঠেলায় তাকে জলে নামিয়ে—চ'ক্ষের নিমেষে। আমি প্রমাদ গণ্‌লাম; হয় তো আর এক মিনিট্‌ দেরী হ'লে পর দিন ডায়মণ্ড্‌ হারবারের জেলেরা সাঁতারু শ্রীদামকে তাদের জালের ভেতর আবিষ্কার কর্‌বে মনে করে আমিও এক নিমেষে জলের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লাম।

মনে হ'ল জলের ভেতর কে যেন খুব শক্ত করে আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রেছে। বহু কষ্টে পা ছাড়িয়ে নিয়ে চুলের মুঠো ধ'রে শ্রীদামকে নৌকোর ওপর তুলে ফেলা গেল। ততক্ষণে ঘোঁতাকেও অপর একজন রক্ষক উদ্ধার ক'রেছে। দু'জনাই নৌকোর ওপর শুয়ে পড়ে খাবি খেতে লাগ্‌ল।

"শরীরচর্য্যা-সমিতির" সভ্যরা শ্রীদামের কাণ্ডে একেবারে অবাক্‌ হয়ে গিয়েছিল। রাজেন মাথা নেড়ে মুরুব্বিয়ানা চালে বল্লে, "এ রকম যে একটা কিছু আজ হবে আমি তা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। সকালবেলা ওর বাড়ী গিয়ে দেখি, কলিক্‌ পেনে ও নীল হয়ে গেছে। নেহাৎ আপনাদের কথা দেওয়া হ'য়েছিল বলেই ওকে আস্‌তে হয়েছে।"

নানা রকম জবাবদিহি দিয়ে সসম্মানেই সে যাত্রা আমরা সশ্রীদাম ফিরে এলাম।

দু'দিন যেতে না যেতেই আবার এক নতুন বিপদ্‌ এসে উপস্থিত। কি একটা বড় স্নানের যোগ ছিল; অনেক লোক গঙ্গাস্নান কর্‌বে, আমাদের পাড়ার

ছেলেরা তাই একটা 'রেস্কুপার্টি' গড়ে ফেল্লে। তাদের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হ'ল যে পাড়ার এই ভলান্টিয়ার দলের অধিনায়ক হবে শ্রীদাম।

শ্রীদামকে খবরটা যখন জানান হল'তখন সত্যি সত্যিই সে চোখে একেবারে সর্ষে ফুল দেখে ফেল্লে। বাস্তবিক, ব্যাগারটা বড় সোজা নয়; বাছা বাছা সাঁতারুর দলকে সেদিন পাঁচ-সাত ঘণ্টা ধরে অনবরত গঙ্গায় সাঁতার কেটে বেড়াতে হবে, যদি কেউ হঠাৎ ডুবে যায় সেই মুহূর্ত্তেই তাকে উদ্ধার কর্‌বার উদ্দেশ্যে। অত লোকের ভেতর নৌকো অথবা মোটর-বোট চালানর নাকি সুবিধা হবে না।

রাজেন বল্লে, "তা বেশ, শ্রীদামকে না হয় আদি-গঙ্গার ডিউটিতেই রাখা যাবে, কি বল!"

ওদের মধ্যে একজন বলে উঠ্‌ল, "ছোঃ, আদি-গঙ্গায় তো ডিউটি দেবে মেয়েরা! শ্রীদামদার মত সাঁতারুকে আমরা ওখানে নষ্ট হ'তে দিতে পারি! তিনি থাক্‌বেন সব চাইতে বিপজ্জনক যে জায়গাটা সেইখানে।"

সেদিন বিকালে দেখি শ্রীদাম একরাশ কাঁচা কামরাঙ্গা কিনে নিয়ে আস্‌ছে: এগুলো খেলে নাকি নির্ঘাৎ জ্বর হবে। যদি তা না হয় তো সে ঠিক করেছে হঠাৎ হরিপালে তার ভয়ানক দরকার পড়ে যাবে। সেই হরিপাল যাকে শরৎ চাটুয্যে মশাই পর্য্যন্ত বলেছেন "ম্যালেরিয়ার ডিপো।"

যা হোক্, অসুখ-বিসুখের দোহাই পেড়ে সে যাত্রা শ্রীদামকে স্নানযাত্রার ডিউটি থেকে আমরা রেহাই পাইয়ে দিলাম। কিন্তু এভাবে আর কত দিন চলে! নিত্যিই আমন্ত্রণ আস্‌ছে—আজ এখানে এই ব্যাপার, কাল সেখানে সেই ব্যাপার, পরশু আর এক জায়গায় আর এক ব্যাপার। শ্রীদামকে তারা চায়। শ্রীদাম প্রায় পাগল হবার উপক্রম হ'য়ে শেষে একদিন বলে ফেল্লে "আমি খবরের কাগজে প্রতিবাদ ছাপ্‌ব—সবাইকে জানিবে দেব রাজেনকে জল থেকে উদ্ধার আমি করিনি, করেছিল নৌকোর মাঝি। আমি নিজে অথৈ জলে সাঁতার কাট্‌তে পারি না। রাজেনের জ্ঞান ছিল না বলে ভুল খবর সে রটিয়েছে।"

আমি বল্লাম, "সর্ব্বনাশ. বলিস্ কি! রাজেনের বাবা মনে মনে কি ভাব্‌বেন?"

শ্রীদাম প্রায় কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে বল্লে, "আর আমার ভাবনাটা বুঝি কিছুই নয়! এক একটা জায়গা থেকে ডাক আসে আর পাঁচ দিন ধরে ভাব্‌নায় আমার ঘুম হয় না। এর চাইতে 'চূর্ণবর্ণ শ্রীদাম'ও যে ভাল ছিল।"

সেদিন শ্রীদামদের বৈঠকখানায় ব'সে আমাদের ভেতর এই ধরণের আলাপ-আলোচনা হ'চ্ছে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুক্‌লেন, বল্লেন, "শ্রীদাম বাবু বাড়ী আছেন?"

এই ধরণের ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ কি প্রস্তাব নিয়ে আসেন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা তা জান্‌তে পেরেছিলাম, কাজেই বেশ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌লাম। শ্রীদাম বলে উঠ্‌ল, "না তিনি আধঘণ্টা টাক হ'ল বেরিয়ে গেছেন।"

কিন্তু ঠিক সেই সময় রসভঙ্গ (অথবা রসসৃষ্টি) করে বস্‌ল, শ্রীদামের সাত বছর বয়সের ভাইপো; সে এসে বল্লে, "ছিদাম কাকা, দাদু তোমায় ডাক্‌ছেন।"

ভদ্রলোকটি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শ্রীদামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু শ্রীদাম কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হ'য়ে বল্লে, "আমি এখন 'নট্ য়্যাট্ হোম'; সাহেবরা বাড়ীতে যে 'নট্ য়্যাট্ হোম্' লট্‌কে রাখে তার মানে এ নয় যে তারা বাড়ী নেই। ওর মানে এই যে এখন তাঁরা কারো সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌বেন না।"

ভদ্রলোকটি বল্লেন, "আমি অনেক দূর থেকে আস্‌ছি, আপনার বেশী সময় নষ্ট কর্‌ব না, এক মিনিটেই আমার বক্তব্য শেষ হ'য়ে যাবে।"

"তবে এক মিনিট্ অপেক্ষা করুন, আমি একটা জরুরী কাজ সেরেনি···ওহে অম্বুজ, খবরের কাগজের প্রতিবাদটা লিখে ফেল তো—'সেদিন আপনার পত্রিকায় একটি ভুল সংবাদ বাহির হইয়াছে। রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের উদ্ধার-কর্ত্তা শ্রীদাম বসু নহে'······"

ভদ্রলোকটি হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "আপনি নন্?"

শ্রীদাম সগর্ব্বে জবাব দিলে, "আজ্ঞে না, নৌকোর মাঝি।"

"ওঃ, তা হ'লে আমি উঠি, আমার কাজ হ'য়ে গেছে। আমি এসেছিলাম 'বঙ্গগৌরব-সমিতি'র তরফ্ থেকে; আপনার অসামান্য বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা

আপনাকে একটা মানপত্র আর সোনার মেডেল দেবেন ঠিক করেছিলেন। তা আপনি যখন নন, তখন তো সে কথা আর উঠ্‌ছেই না। আচ্ছা চলি, নমস্কার।”

আজ পর্য্যন্ত জান্‌তে পারিনি শ্রীদাম এ ব্যাপারে সুখী হয়েছিল কি দুঃখিত হ'য়েছিল।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(১৯)

রণজিতের চিঠি পাইয়া পর দিনই হুকা-কাশি জবাব দিয়াছিলেন টেলিগ্রামে; তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন যে গোধূলিয়ার হোটেলে তার পক্ষে আর আদৌ নিরাপদ্ হইবে না, পাঁড়ের হাউলিতে তার মাসীমার যে বাড়ী আছে, পত্রপাঠ মাত্র সেখানে চলিয়া যাইতে সে যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে। যত শীঘ্র সম্ভব—দু'য়েক দিনের মধ্যেই—তিনি স্বয়ং কাশী রওনা হইয়া আসিতেছেন; তিনি আসিয়া না পৌঁছা পর্য্যন্ত সোনার হরিণের ব্যাপারে সে যেন আর এতটুকুও অগ্রসর না হয়। রণজিৎ স্থান-পরিবর্ত্তন করিয়া কোথায় যাইতেছে সে কথা সে যে বাহিরে প্রকাশ করিবে না হুকা-কাশি তা জানিতেন। এই জন্যই সুমিত্র নিকেতনে উঠিবার পর সর্ব্বপ্রথম হুকা-কাশি পাঁড়ের হাউলিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু কি অদ্ভুত ক্ষমতা এই দস্যুদলের: সকালে টেলিগ্রাম করিয়া রাত্রির গাড়ীতেই তিনি রওনা হইয়া আসিয়াছেন, অথচ এই অতি অল্প সময়টুকুর মধ্যে তারা যে শুধু রণজিতের নূতন ঠিকানাই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে তা নয়, কৌশলে তাকে নিজেদের খপ্পরে আনিয়া পর্য্যন্ত ফেলিয়াছে। রণজিৎ এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে কিনা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন। কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া পড়া হুকা-কাশির একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু তবুও এই শেষের কথাটুকু ভাবিতে গিয়া তাঁর অন্তরটা যে একবারও কাঁপিয়া উঠিল না, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। মাথা নীচু করিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে তিনি মাটীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অবশ্য বেনারস পর্য্যন্ত দস্যুদলের পেছু ধাওয়া করিয়া আসিতে রণজিৎকে একবারও তিনি বলেন নাই, সুরযমল নগরচাঁদ লেনের বাড়ী খানার উপর একটু

নজর রাখিতে বলিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তবুও বাস্তবিকই যদি এমন একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াই থাকে তবে নিজে তিনি তার নৈতিক দায়িত্ব এড়াইবেন কি ভাবে?

“আপনি সুমিত্র নিকেতনে ফিরে যান মিষ্টার বাসু, আমার মানসিক অবস্থা বোধ হয় কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌ছেন, ফির্‌তে আমার কিছু দেরী হবে। তবে একটা কথা, আমি বোর্ডিংএ ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ঘর থেকে কোথাও বার হবেন না যেন! আর যাবেন খুব সাবধানে লোকালয়ের ভেতর দিয়ে।” মিষ্টার বাসুকে উদ্দেশ করিয়া হুকা-কাশি কহিলেন।

মিষ্টার বাসু বিদায় লইলে হুকা-কাশি ধরিলেন সোজা গোধূলিয়ার রাস্তা। প্রসিদ্ধ মোড়টার কাছে আসিয়া সামান্য একটু জিজ্ঞাসা-বাদের পরেই রণজিৎ-বর্ণিত সেই হোটেলটির সন্ধান মিলিয়া গেল। হুকা-কাশি ‘অফিসে’ ঢুকিলেন।

হোটেলের ম্যানেজার তখন টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া পরম আনন্দে এক বাটী চায়ের রসাস্বাদন করিতেছিলেন, হুকা-কাশিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া এবং পোষাকপত্রে তাঁকে একটু সম্ভ্রান্তশ্রেণীরই ভদ্রলোক মনে করিয়া তাড়াতাড়ি পদযুগল নামাইয়া লইলেন; তার পর সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি চাই আপনার, বলুন!”

হুকা-কাশি ইহারই মধ্যে অপাঙ্গে সমস্ত ঘরটা দেখিয়া লইয়াছিলেন, ধারে-পাশে কোনও লোক আছে কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, কহিলেন, “আমি রণজিৎ বাবুর খোঁজে এসেছি।”

“তিনি তো এখানে নেই! উঠেছিলেন বটে আমাদেরই হোটেলে, কিন্তু কাল বেলা এগারোটার সময় সমস্ত পাওনা-পত্তর চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন তা কিছু বলে যান নি।”

“কিন্তু কাল তার পর থেকে তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না, সে কথা জানেন কি?”

“সে কি কথা মশাই! যোয়ান-মরদ ব্যাটাছেলে কাশীর রাস্তা থেকে উবে গেল?” ম্যানেজারের চক্ষু গোলাকৃতি হইয়া উঠিল।

“দেখুন, আপনি রণজিৎ বাবুর খুব হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তা আমি জানি; তাই গুটিকয়েক প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই। আশা করি তা'তে আপনি মনে কিছু কর্‌বেন না, অথবা বিরক্ত হবেন না!”

“না না, তা কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে যা খুসী জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন।”

“রণজিৎ বাবু যেদিন প্রথম কাশী এসে পৌঁছান, আমি খবর পেয়েছি সেদিনই তিনি সন্ধ্যার সময় নৌকো ক'রে গঙ্গায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কখন্ তিনি ফিরে এলেন, এবং কি অবস্থাতেই বা ফিরে এলেন?”

"তা ফির্‌তে রাত হ'য়েছিল বেশ! যখন ফিরে এলেন, কাপড়-চোপড়, গা-মাথা—সমস্ত শরীরই দেখ্‌লাম তাঁর ভিজে। জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলেন, গলুইয়ের কাছে বসে হাত ধুচ্ছিলেন, হঠাৎ নৌকো দুলে ওঠায় তাল সাম্‌লাতে না পেরে জলের ভেতর পড়ে গেছ্‌লেন।"

"আচ্ছা আর একটা কথা। সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো ভাড়া ক'রে গঙ্গায় বেড়াবার পরামর্শ দিয়েছিলেন কে?"

"সেটা বলেছিলাম আমিই; উনি যখন হোটেলে এসে পৌঁছুলেন, গা হাত-পা তখন যেন ওঁর এলিয়ে পড়্‌ছে। রাত্তিরে বোধ হয় ট্রেনে অসম্ভব ভীড় হয়েছিল, ঘুমোনো তো দূরের কথা বস্‌বারও জায়গা বোধ হয় পান্‌নি। তাই আমি বল্লাম, তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন, সন্ধ্যার সময় বরং দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় একটু বেরিয়ে আস্‌বেন!"

"হুঁঃ। তার পর তিনি খেয়ে-দেয়ে শুতে যাবার পর বাইরের এই অপিস-ঘরে আর একজন অতিথির আবির্ভাব হ'ল এবং কোন রকমে সে এই খবরটা সংগ্রহ কর্‌লে যে সন্ধ্যার সময় নৌকো ভাড়ার উদ্দেশ্যে রণজিৎ বাবু দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হবেন! কেমন, ঠিক বলিনি?"

"আপনি দেখ্‌ছি সব ঘটনাই তবে জানেন! বাস্তবিকই তাই। আমার একবার জান্‌তে হবে, কাশীর গাড়ীগুলোতে সেদিন এমন কি কাণ্ড ঘটেছিল যাতে সব ক'টি যাত্রীই অমন হেঁদিয়ে পড়্‌ল। রাত জেগে যাওয়া-আসা আমরাও তো হর্‌দম্ কর্‌ছি, কিন্তু কই, এমন ধারা তো হয় নি! রণজিৎ বাবু তো তবু পদে ছিলেন, এ নতুন লোকটির মুখের দিকে যেন আর চাওয়াই যায় না! তাকেও ওই একই পরামর্শ দিলাম—আপাততঃ খেয়ে-দেয়ে ঘুম; তার পর সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে খানিকটা বেড়ান। কথাটাতে জোর দেওয়ার জন্য আরও জানিয়ে দিলাম যে, খানিক আগে কল্‌কাতা থেকে আমার এক পরিচিত বন্ধু এসেছেন, সন্ধ্যার সময় তিনিও ওই উদ্দেশ্যে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাবেন; ইচ্ছে হ'লে তাঁর সঙ্গে একত্রও যেতে পারেন।"

"কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে আপনার হোটেলে ভর্ত্তি হ'ল না, আপনার রেট্ বড় বেশী—এই ছুতো ধরে চলে গেল; নয় কি?"

"সে খবরও আপনার কানে উঠেছে? কিন্তু রেট্ আমার সত্যিই বেশী নয়। দু'বেলা চা-জলখাবার আছে, রাত্রে লুচি দিচ্ছি; তা ছাড়া যে মাগ্যির বাজার—চাকর-বাকরের মাইনে আছে, বাড়ীভাড়া……"

হুকা-কাশি ম্যানেজারের ক্রন্দনে একেবারেই কান দিলেন না, নিজের মনেই বলিয়া চলিলেন, "লোকটির চেহারা বেশ সুন্দর, যাকে বলে সুপুরুষ; কেমন?"

"তা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে।"

"মাথার চুলগুলো ব্যাক্‌ব্রাস্ ক'রে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া?"

"সবই যখন জানেন তখন অনর্থক কেন আর প্রশ্ন কর্‌ছেন?"

হুকা-কাশি এ কথা বলিলেন না যে এতক্ষণ যে কথাগুলি তিনি বলিয়া গেলেন তার কিছুই প্রায় তাঁর জানা ছিল না, সমস্তই একটির পর একটি ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তিতর্কের সাহায্যে বাহির করিতে হইয়াছে। এ-হেন সরলপ্রকৃতির ভালোমানুষের কাছে সব কথা খুলিয়া বলিতে নাই; সোনার হরিণ উদ্ধারের মত জটিল ব্যাপারে তা হইলে নানা প্রকারের বাধা জন্মিতে পারে। তাই আগের কথাটারই জের টানিয়া তিনি আবার বলিলেন, "গায়ের রংটা ফুট্‌ফুটে ফর্সা, নয় কি?"

"হুঁ,"

"নাকের ডগাটি টিকল, আর ডান ভ্রূর ওপরে মস্ত একটা তিলের মতন কি রয়েছে; লক্ষ্য করেছেন তা?"

"যত দূর মনে পড়ে আছে বলেই তো আমার ধারণা। তবে জীবনে একবারটি কয়েক-মিনিটের জন্য দেখা বই তো নয়, ভুল হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।"

"হ্যাঁ সে তো বটেই, সে তো বটেই, তাকে আর দেখ্‌বেন কোত্থেকে? সে তো আর কাশীর লোক নয়! আচ্ছা তা' হলে উঠি আজ, খানিকটা বিরক্ত ক'রে গেলাম, মনে কিছু কর্‌বেন না। দরকার পড়্‌লে হয় তো আবারও আস্‌তে হ'তে পারে।" বলিয়া হুকা-কাশি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক পা আগাইয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া আবার তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, ম্যানেজারকে প্রশ্ন করিলেন, "এখানে বায়োস্কোপ মোট ক'টা আছে বল্‌তে পারেন? সাম্‌নেই তো দেখ্‌ছি একটা। নতুন একখানা বই আজ থেকে দেখান হবে—বাজনা বাজিয়ে তাই সহরময় জানিয়ে দিচ্ছে—আপনার এখানে আস্‌বার সময় পথে দেখে এলাম।"

"কি জানি মশাই, বায়োস্কোপ-মায়োস্কোপের ধার ধারিনে। যে মাগ্যির বাজার, ছাঁ-পোষা লোক আমরা, কোন মতে খেয়ে পরে দিন কাটাতে পার্‌লেই বেঁচে যাই, তা আবার বায়োস্কোপ!"

মুখে কোনরূপ ভাবপ্রকাশ না করিলেও মনে মনে এ জবাবে হুকা-কাশি খুসীই হইলেন। ছোট্ট একটু নমস্কার করিয়া তিনি ম্যানেজারের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, তার পর সতর্ক-দৃষ্টিতে এদিক্-ওদিক্ চাহিতে চাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন একটা বাড়ীর ফটকের সম্মুখে। ফটকটি সেই সিনেমা-হলের যেটির কথা একটু আগেই ম্যানেজারকে তিনি বলিতেছিলেন। তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র রণজিৎ আজ দু'দিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ, বাঁচিয়া আছে কিনা তা পর্য্যন্ত জানা নাই, অথচ হুকা-কাশি করিতেছেন সিনেমায় ঢুকিবার উপক্রম! পাঠক-পাঠিকারা বিস্মিত হইতেছেন বিশেষ, সন্দেহ নাই। হুকা-কাশির চরিত্র বাস্তবিকই বড্ড দুর্জ্ঞেয়—সংস্কৃত ভাষায় বলিতে গেলে "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?"

ফটক পার হইয়া কয়েক পা যাইতেই কিন্তু তিনি একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইলেন—এতটা তিনি আশা করেন নাই, সত্যিই করেন নাই। যে কদাকার গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকটাকে ফটোতে দেখিতে পাইয়া রণজিৎ এতখানি কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে, সিনেমা-চত্বরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই লোকটাই অপর এক জনের সহিত নিভৃত-আলাপ করিতেছে। আর এই দ্বিতীয় লোকটিও হুকা-কাশির একেবারে অপরিচিত নয়, পূর্ব্বে ইহাকেও তিনি দেখিয়াছেন। দু'জনে কথাবার্ত্তায় এমনই নিমগ্ন যে কোন কিছুরই হুঁস্ নাই।

অপরে আমাকে দেখিতে পাইবে না, অথচ আমি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তার সমস্ত কথাবার্ত্তাই শুনিয়া লইব—এভাবে দাঁড়াইতে পারা যে একটা উঁচুদরের 'আর্ট' তা অস্বীকার করি না; কিন্তু হুকা-কাশি ও তো 'আর্টিষ্ট্' বড় কম নন্! কাজেই তিনি শুনিতে পাইলেন দু'জনার কথাবার্ত্তা হইতেছে এই ধরণের :—দ্বিতীয় লোকটা বলিল, "কাল ষ্টেশনে গাড়ী থেকে ওকে নাম্‌তে দেখে আমি বাস্তবিকই স্তম্ভিত হ'য়ে গেছি। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত ও যে কাশী এসে পৌঁছোতে পার্‌বে এ আমি ভাব্‌তেও পারিনি।"

"আরে আনে দেও! ও যদি হয় বুনো ওল্ তবে আমরাও বাঘা তেঁতুল, সেটি ভু'ল না!

"আচ্ছা রামদয়াল, সঙ্গের ওই অন্য লোকটা কে? ওকে তো কখনো দেখিনি আর! ওটা এসে আবার কে জুট্‌ল? হুকা-কাশির......।"

"আরে হ'তে দাও যে খুসী সে। কল্ পেতে এসেছি; যেই হোন্ কলে ধরা পড়্‌বেনই।"

"যাক্ সকালেই তা' হলে তুমি আস্‌ছ?"

"উঁহুঁ সকালে হ'য়ে উঠ্‌বে না। এক পুরানো যাত্রী এসেছে, তাকে একবার বাবার মন্দিরটা দেখাতে হবে।"

নিভৃত-আলাপে মন্দা পড়িয়াছে লক্ষ্য করিয়া হুকা-কাশি আর সেখানে থাকা নিরাপদ্ মনে করিলেন না, গুটিগুটি ফটক পার হইয়া প্রথমে রাস্তায় এবং পরে একেবারে ভেলুপুরার হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখেন মিষ্টার বাসু এক মনে চিঠি লিখিতেছেন। "কোথায় চিঠি লিখ্‌ছেন, বাড়ীতে?" হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

"হ্যাঁ," বলিয়া মিষ্টার বাসু চিঠিখানি হুকা-কাশির হাতে বাড়াইয়া দিলেন। হুকা-কাশি চিঠিখানার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়াই সেখানি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, মুখে বলিলেন, "খুব সাবধানী তো দেখ্‌ছি আপনি, পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখ্‌ছেন! ফিরে লিখুন খামে, আর বাড়ীর লোকদের জানিয়ে দিন, 'দু'দিন অন্তর আপনার কুশল-সমাচার তাঁরা পাবেন, কিন্তু আপনাকে যেন কেউ চিঠি না লেখেন। এখানকার ঠিকানা ওঁদের দিয়ে কাজ নেই। আমার

সঙ্গে আবার আপনি কে এসে জুট্‌লেন এই তথ্যটি বার কর্‌বার জন্য শত্রুপক্ষে রীতিমত আলোড়ন পড়ে গেছে সে খবর রাখেন? তারা নাকি কি কল্ পেতেছে!" (ক্রমশঃ)

ভাবীসাহিত্যিকের বৈঠক

চিত্রশালা—১

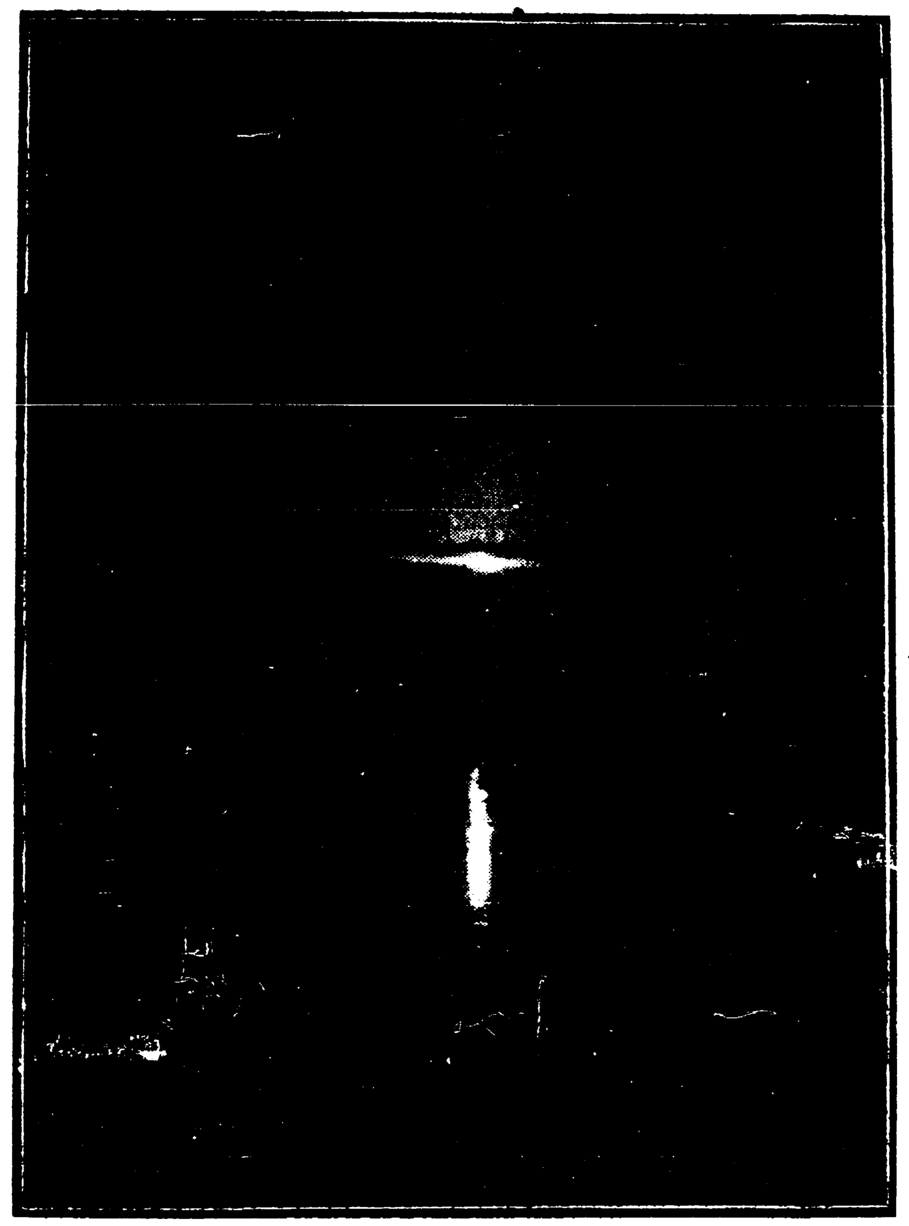

সূর্য্যাস্ত

আলোক-চিত্রগ্রহীত্রী—কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায়

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বাদল

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

সহসা আকাশে আজি বাজিল মাদল,
করুণার গান গেয়ে,
ধরণীর পানে চেয়ে,
দূরের আকাশ ছেয়ে,
ঝরিল বাদল।
কোথা তোরা আয় ছুটে, আয় শিশুদল,
দেখ্ চেয়ে কোন্ খানে
সুদূর মাঠের পানে
অফুরান্ ঝরা গানে,
ঝরিল বাদল।

জানা উচিত!

(শ্রীঅমিয়কুমার দাস)

(ক) আমাদের সকলের বিশ্বাস "ঈশপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স" বইখানা Æsop (ঈশপ্)ই রচনা করেছিলেন। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। বইখানা রচনা করেছেন 'বাব্রিয়াস' (Babrius) নামে একজন গ্রীক্-ইটালিয়ান্।

(খ) আমরা জানি, নাবিকগণের দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্রের কাঁটা সব সময়েই উত্তরমেরু-মুখো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। সেটা উত্তর মেরু থেকে ১৫০০ মাইল পশ্চিমে (Slagnetic pole) ঝুঁকে থাকে।

(গ) যীশু খৃষ্ট প্রথম খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তরিখে জন্মান নি। তিনি প্রথম খৃষ্টাব্দের চার বৎসর পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

(ঘ) শেক্‌স্‌পিয়ার অত বড় প্রতিভাবান্ লেখক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর কন্যা একেবারেই মূর্খ ছিলেন।

(ঙ) ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জর্জ্জ ইংরাজী কিছুই জান্‌তেন না।

(চ) "এক মণ লোহা ভারী না এক মণ তূলা ভারী" এটা প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে জিজ্ঞাসা করি। এটার উত্তর হবে "দুটোই সমান"।

চিত্রশালা—২

সন্ন্যাসী

শিল্পী—শ্রীপুষ্পেন্দু সেন (বয়স ১১ বছর)

কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, "এক পাউণ্ড সোনা ভারী, না এক পাউণ্ড পাখীর পালক (feather) ভারী ?"

এর উত্তর হবে, "এক পাউণ্ড পালক বেশী ভারী"।

কেন ?

পালক ওজন করা হয় 'avoirdupois' (এভয়রডুপয়) ওজন দিয়ে ; এই ওজনে ১৬ আউন্সে এক পাউণ্ড হয়। কিন্তু সোনা ওজন করা হয় Troy (ট্রয়) ওজন দিয়ে। এতে ১২ আউন্সে পাউণ্ড হয়।

তা হ'লেই ১ পাউণ্ড পালক ১ পাউণ্ড সোনার চেয়ে ভারী হ'ল। এটা জিজ্ঞাসা ক'রে আমরা অনেককে ঠকাতে পারি।

সন্দেশ

আমরা শোক-সন্তপ্তচিত্তে জানাইতেছি যে বাংলার স্বনামধন্য পুরুষ স্যর রাজেন্দ্রনাথ (আর্, এন্, মুখার্জ্জি) পরলোকগমন করিয়াছেন। স্যর রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন নব্য-বাংলার এক আদর্শ ক্ষণজন্মা ব্যক্তি। ব্যবসার ক্ষেত্রে এতখানি কৃতিত্ব ইংরাজ-আমোলে আর কোন বাঙ্গালী দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আগামী বারে তাঁর বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলা হইবে ও তাঁর প্রতিকৃতি প্রকাশিত করা হইবে।

* * *

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত শব্দ শোনা গিয়াছে তার মধ্যে ১৮৮৩ সনের ২৭শে আগষ্ট্ ক্রাকাতোয়া দ্বীপের আগ্নেয়গিরি ফাটিবার যে আওয়াজ হইয়াছিল তার মত জোর বোধ হয় কোনটারই নয়। এই আওয়াজ তিন হাজার মাইল্ দূরের আর একটা দ্বীপ হইতেও শোনা গিয়াছিল।

যে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এই আওয়াজ তার একটু বিবরণ দিলে তোমরা আওয়াজটির 'ভীষণত্ব' সম্বন্ধে হয় তো অত অবাক্ হইবে না। অগ্ন্যুৎপাতের আগে ঐ দ্বীপটির আয়তন ছিল প্রায় ১৫ বর্গ মাইল্—কিন্তু এই ব্যাপারের পর সেটি আকারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। যে ধোঁয়া বাহির হইয়াছিল তা' বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে সমস্ত পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিয়া আসিয়াছিল—এবং তা' তিন বছর ধরিয়া দূরদূরান্তরের দেশেও সূর্য্যাস্তের সময়ে আকাশের রং বদ্‌লাইয়া দিয়াছিল।

বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টোর হুগো একবার তাঁর "লে মিজারেব্‌ল্‌স্" বইখানি সম্বন্ধে প্রকাশকের কাছে নীচের চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন—

?

প্রকাশক জবাব দিয়াছিলেন—

!

পৃথিবীতে এত ছোট চিঠির আদান-প্রদান বোধ হয় আর হয় নাই।

* * *

কলম্বিয়ায় Purace' আগ্নেয়গিরির কাছে একটা নদী আছে তাকে বলা হয় ভিনিগার নদী। এই নদীর জলে প্রচুর পরিমাণে সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ ও হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ মিশান আছে। ফলে নদীর জল এত টক যে কোনও মাছ তার মধ্যে টিকিতে পারে না। নদীটি আগ্নেয়গিরির অত কাছে বলিয়াই এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে।

* * *

চ্যাল্‌কাস্ নামে একজন গ্রীক্ ভদ্রলোককে এক জ্যোতিষী বলিয়াছিল—"তুমি অমুক দিন মারা যাইবে।' নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল, কিন্তু চ্যালকাসের মরিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তখন তার এত হাসি পাইল যে সেই হাসির চোটে দম বন্ধ হইয়াই সে সেদিন মারা গেল।

* * *

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ক=৬, খ=৪, গ=১, ঘ=০, চ=৭,
ছ=২, জ=৮, ঝ=৫, ট=৩, ঠ=৯

উত্তরদাতাদের নাম

নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিন্ ষ্ট্রীট্); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা, হাওড়া); বিজনকুমার শেঠ (কলিকাতা); জগদীশ, নিতাই, নন্দদুলাল (করকেন্দ কোলিয়ারি); ছায়া তরফদার (ময়মনসিংহ); অনিল, হরেন্দ্র, সুধীর প্রভৃতি (হাইলাকান্দি); বটুদা' ও পাঁচুগোপাল ঘোষ (নওপাড়া); কামাখ্যা, সনৎ, দেবীদাস খাঁ (শিলং) মনতোষ রায়, কমলদি', ফুলদি' প্রভৃতি (ভবানীপুর); বাণীপ্রসাদ দত্ত (ভবানীপুর); গৌরী রায় ও কানু (চাইবাসা); গণপতি মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া); রণেশচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা); কাটু, হীরেন, রামপ্রসাদ প্রভৃতি (বেহালা); প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর); মায়া পাল (পাবনা); শৈলেশ-কুমার বসু (কলিকাতা); রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর); কালী, তারা, রাখাল প্রভৃতি (নীলফামারী); রবীন্দ্রকুমার (মৌলবীবাজার, ১৭৪৬); মামা, মঞ্জু, রুবী চাটার্জ্জী (ভাগলপুর): অরুণা সেন (কলিকাতা); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল, খোকন প্রভৃতি (বালিগঞ্জ, কলিকাতা); বাসন্তী দত্ত, কল্যাণী দত্ত, নীহার দত্ত (শ্রীহট্ট); বিষ্ণুপদ স্মৃতি-পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা, হাওড়া); সবিতারাণী রায় (বিটঘর); অরুণকুমার বসু (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

```
রা ম ধ নু ) সা গ্র হে প ড়ি ছে ( নু ধ ধ
            রা ম ধ নু
            ─────────────
            নু নু রা ছে ড়ি
            নু প নু গ্র ধ
            ─────────────
               নু নু সা ধ ছে
               নু প নু গ্র ধ
                  ──────────
                  নু নু ড়ি ম
```

উপরের ভাগের অঙ্কটিতে ১ হইতে 0 পর্য্যন্ত দশটি সংখ্যার বদলে এক একটি অক্ষর বসান হইয়াছে। অঙ্কটি কি?

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৯ম বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৩ { ৭ম সংখ্যা

শ্রাবণ-সাঁঝে

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রাবণ বেলা পোহালো রে,
ঘরের মাঝে আয়—
অঝোর-ঝরন বাদল ঝরে—
দূরের ও পাড়ায়।
তোরা ঘরের মাঝে আয়।

মেঘলা সাঁঝের অন্ধকারে
বিষ্টি নামে নদীর পারে

বাদল-মাদল শুনে কারা
নাচ্ছে পায়ে পায় !
তোরা ঘরের মাঝে আয় ।

বাদ্‌লা-বাতাস বকুল-বনে
বইছে তালে তালে,
ভিজে পাখা কাঁপায় পাখী
ফল্‌সা গাছের ডালে ;
মেঘ অঝোর ধারা ঢালে ।

ভরা নদীর নিটোল কোলে
কালো-বরণ ঢেউরা দোলে,
দূরের ডিঙা যায় বহিয়া
ঢেউয়ের তালে তালে ;
মেঘ অঝোর-ধারা ঢালে ।

ঝম্‌ঝমাঝম্ বিষ্টি ঝরে
মিষ্টি লাগে সুর—
এ গাঁ থেকে যায় বিষ্টি
ও গাঁয় অনেক দূর ।
শুনি ঝম্‌ঝমাঝম্ সুর ।

কোন্ সে ছেলে মন-উদাসী
তালের বনে বাজায় বাঁশী,
বাদল-হাওয়া বইছে যূথীর
গন্ধে ভরপুর ।
শুনি ঝম্‌ঝমাঝম্ সুর ।

ঝাপ্‌সা আলো ওই মিলালো
অনেক দূরের দেশে—
যুঁই-ফোটানো বিষ্টি ঢেলে
মেঘ যেথা যায় ভেসে,
সেই অনেক দূরের দেশে ।

জোনাকিরা অন্ধকারে
খুঁজে বেড়ায় বল্ না কারে !
ঘন-ধারায় নিবিড় বাদল
নাম্‌ল দিনের শেষে,
মেঘ যায় সুদূরে ভেসে ।

যন্ত্রহীন ব্যায়াম

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি, বি-ই-এস্)

বর্ষা কাল, মাঠঘাট সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে, আর নয় তো পাঁকে এমন কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে যে তার উপর দিয়া হাঁটিতেও প্রবৃত্তি হয় না। খেলাধুলা সমস্তই বন্ধ। এ ক্ষেত্রে ঘরে চুপ্‌চাপ বসিয়া থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু ও কাজটি তোমরা কদাচ করিও না ; ইচ্ছা থাকিলে ঘরে বসিয়াও অতি চমৎকার চমৎকার ব্যায়াম করা যে সম্ভব আজ আমি তোমাদের তাহাই বুঝাইয়া দিব।

ব্যায়াম করা শরীরের পক্ষে কি জন্য যে দরকার, অল্প কথায় গোড়াতে সেইটিই বলিয়া নেওয়া যাক্। ব্যায়ামের আসল উদ্দেশ্য শরীরের মাংসপেশীগুলিকে পরিপুষ্ট, শক্ত এবং কর্ম্মঠ করিয়া তোলা ; গৌণ উদ্দেশ্যও একটা আছে—ব্যায়াম করিলে শরীরটি হয় দেখিতে সুন্দর এবং সুডৌল, আর প্রত্যেক কাজেই আপনা হইতেই কেমন একটা স্ফূর্ত্তি আসে।

আমরা কখন কি করিব না করিব, শরীরের কোন্ অংশটিকে কখন কি ভাবে চালাইব, এ সমস্তই স্থির করিবার ভার আছে আমাদের মস্তিষ্ক নামক যন্ত্রটির উপর। মস্তিষ্ক হইতে বহু স্নায়ু (nerve) মাংস-পেশী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে; এ গুলির ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক তার হুকুম শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পাঠাইয়া দিতেছে—ঠিক যেমন টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া আমরা দূর-দূরান্তরে খবর পাঠাই। খবর ঠিক মত যথাস্থানে পাঠাইতে হইলে টেলিগ্রাফের তারগুলি যাতে ভাল অবস্থায় থাকে তা দেখা নিতান্তই আবশ্যক। তেম্‌নি মস্তিষ্কের হুকুম স্নায়ুর ভিতর দিয়া ঠিক মত পাঠাইতে হইলে স্নায়ুগুলিকেও বেশ সুস্থ রাখা দরকার। নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিলে শুধু যে মাংসপেশীগুলিই শক্ত হয় তা নয়, এই স্নায়ুমণ্ডলীও বেশ সুস্থ থাকে, মস্তিষ্ক যন্ত্রটির অবস্থাও ভাল হয়।

আরও কথা আছে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, ব্যায়ামের সময় আমাদের খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে। ইহাতে ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রগুলি তো সবল হয়ই, শরীরের ভিতর দিয়া রক্তও চলাচল করিতে থাকে খুব জোরে জোরে। ফলে, রক্ত-সঞ্চালক যন্ত্রগুলি—যেমন হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহী নল—এগুলিও পুষ্ট হয়। পরিপাক-যন্ত্রগুলি নানান্ মাংসপেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণের ফলে দোল খাইয়া, মর্দ্দিত হইয়া এদিক্ ওদিক্ সঞ্চালিত হইয়া, অনবরত নতুন রক্ত পাইয়া সঞ্জীবীত হইয়া উঠে। তা ছাড়া ব্যায়ামের সময় শরীরের ভিতর নতুন খাদ্যের দরকার হয়, কাজেই ক্ষুধারও উদ্রেক হয়।

যারা ব্যায়াম করিতে নারাজ, অথচ আহারের সময় ভোজন করে প্রচুর, দরকারের বেশী খাবার তাদের অন্ত্র বা নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পচিয়া শীঘ্রই বদ্‌হজমের সৃষ্টি করে—নানান্ রকম ব্যারামের সুরু হয়। মানুষের শরীরের মধ্যে অনবরত ক্লেদ জন্মিতেছে; দেহের মধ্যে কতগুলি যন্ত্র আছে যাদের কাজই হইতেছে এই ক্লেদগুলিকে ক্রমাগত বাহির করিয়া দেওয়া—ঘামের আকারে, প্রস্রাবের রূপে। এই যন্ত্রগুলিকে আমরা এক কথায় বলিতে পারি "ক্লেদনিঃসারণকারী যন্ত্র" (কিড্‌নী প্রভৃতি)। ব্যায়াম করিলে এগুলির নিয়মিত কাজে যথেষ্ট সুবিধা হয়, নিয়মিত রক্ত পাইয়া শরীরকে ইহারা ক্লেদহীন করিয়া তোলে। এক কথায় শরীর সুস্থ এবং সবল হয়।

কিন্তু কোন জিনিষেরই বাড়াবাড়িটা ভাল নয়, ব্যায়ামেরও নয়। লোকে কথায়ই বলিতে বলে, "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্।" যারা পালোয়ানদের অনুকরণে দিনে দু'-পাঁচশো ডন-বৈঠক দেয়, নিয়ত কুস্তি করে, তাদের মাংসপেশীগুলি বেশ পরিপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেটা হয় মস্তিষ্কের খরচায়। যে রক্তের উচিত ছিল সমস্ত মস্তিষ্ককে পরিপুষ্ট করিয়া তোলা, সেটা তখন খরচ হয় শুধু মাংসপেশী আর মাংসপেশীর নিয়ামক মস্তিষ্কের অংশমাত্রকেই পুষ্ট করিতে। এই কারণেই অসম্ভব পালোয়ান এবং অসামান্য-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এক সঙ্গে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর একটি কথা। ব্যায়াম ভাল বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে এবং সব সময়েই যে ব্যায়াম ভাল তা যেন মনে করিও না। অতি-দুর্ব্বল লোকের পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। যাদের হৃৎপিণ্ডের (heart) কিংবা ফুস্‌ফুসের (lungs) দোষ আছে, অথবা যারা সবেমাত্র রোগ হইতে উঠিয়াছে, তাদেরও ডাক্তারের অনুমতি ভিন্ন কখনই ব্যায়াম করা উচিত নয়। ভর'পেট খাওয়ার অব্যবহিত পরেও ব্যায়াম করা বারণ, কেননা তখন রক্তের দরকার পেটে; সেখানে রক্তের অভাব হইলে সহজে হজম হইবে না। তেম্‌নি পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত ব্যায়াম ভাল নয়; কারণ রক্তের প্রয়োজন তখন মস্তিষ্কে, মাংস-পেশীতে নয়।

প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীযুক্ত জগৎকান্ত শীল (জে. কে. শীল) যন্ত্রহীন ব্যায়াম করিতেছেন।

ব্যায়াম সম্বন্ধে একটি মূল কথা যদি তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখ তবে নিজের প্রয়োজন মত ব্যায়াম বাছিয়া লইতে তোমাদের কোনই কষ্ট হইবে না। কথাটা হইতেছে এই—সংসারে টিকিয়া থাকিবার জন্য আমরা প্রত্যহ নানান্ রকমের কাজ করি, এবং সেই কাজ করিবার সময়ে আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানান্ রকম গতিভঙ্গী হয়। এই গতিভঙ্গী সাধারণতঃ চার রকমের—যেমন (১) আকুঞ্চন, অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কুঁচ্কাইয়া যায় (২) প্রসারণ, অর্থাৎ সোজা হইয়া ছড়াইয়া পড়ে ; (৩) মোচড়, অর্থাৎ প্রত্যঙ্গগুলি দুই দিকে মোচড় খায়—ঘড়ির কাঁটা যেদিকে চলে সেইদিকে এবং তার বিপরীত দিকে ; (৪) বাঁকান, অর্থাৎ শরীর সম্মুখে এবং পিছনে, ডাইনে এবং বাঁয়ে বাঁকিয়া যায়। ব্যায়ামের অর্থ আর কিছুই না, কেবল শরীরের এই স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলির অনুকরণ করিয়া যাওয়া। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—পায়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া—চলা, দৌড়ান, লাফ মারা, নৃত্য করা, লাথি ছোঁড়া। কোমরের ক্রিয়া—কোদালপাড়া, উপ-ড়ান, মাটী হইতে ভার তোলা ; ধড়ের কাজ—ঠেলা, টানা, মাথায় ভার বওয়া ; বাল্তি করিয়া জল আনিবার সময় শরীর ডাইনে এবং বাঁয়ে কিছু বাঁকিয়া যায়, যাঁতা-ঘুরাইবার সময় ধড়টা কিছু মোচড় খায়। এই রকম হাত, গলা, মুখের মাংসপেশী, চোখের মাংসপেশী, শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্যকারী

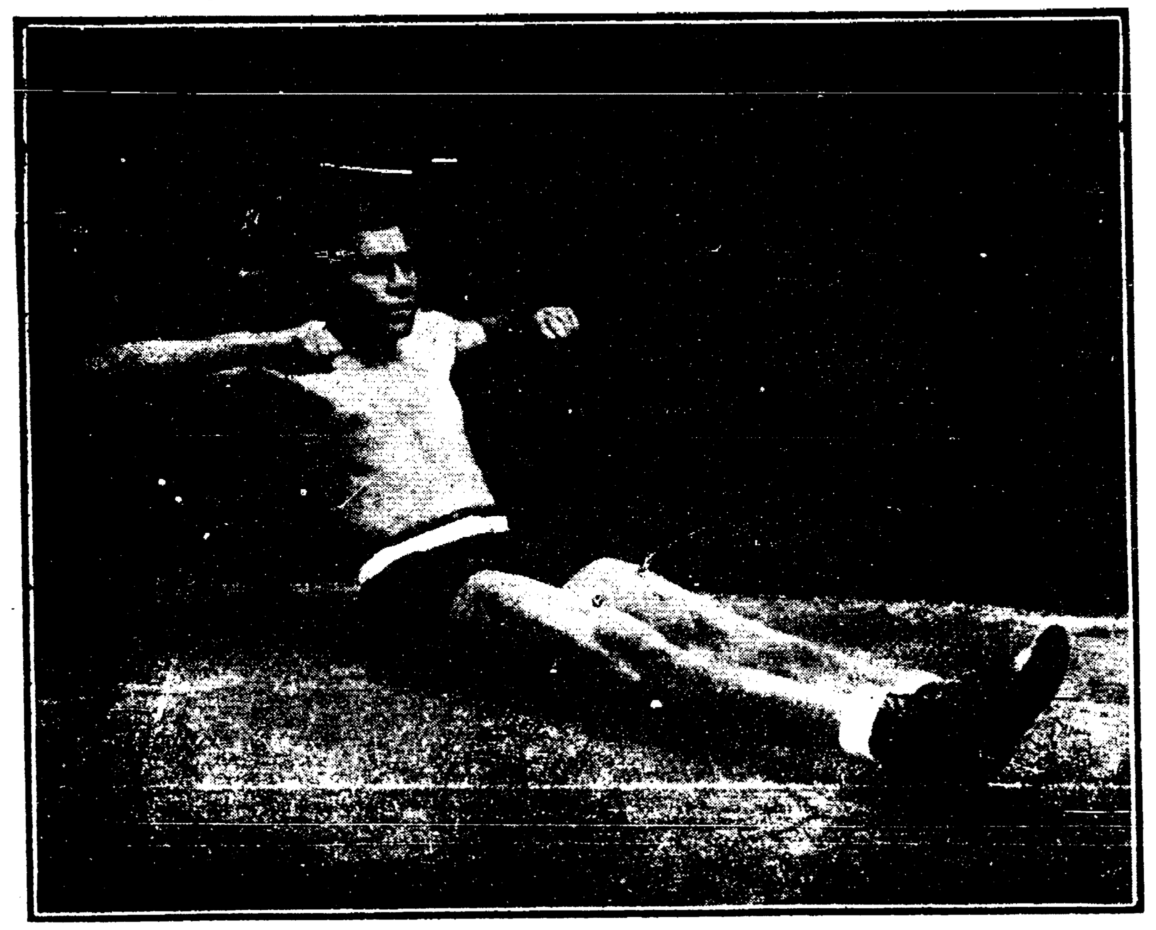

শ্রীযুক্ত শীল শরীরের সাধারণ গতিভঙ্গীর অনুকরণ করিতেছেন।

মাংসপেশী প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই স্বাভাবিক কতগুলি ক্রিয়া আছে। ব্যায়ামের অর্থ এই স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিরই অনুকরণ করিয়া যাওয়া।

শুধু হাতে ব্যায়ামের প্রথা সব দেশেই অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল, আমাদের দেশেও ছিল। এখনও পশ্চিম এবং মধ্যভারতের লোকে আর কোনও ব্যায়াম করিবার সুযোগ না পাইলে সকালে বিকালে বিশ-পঞ্চাশটি ডন ও বৈঠক দিয়া লয়। তা ছাড়া আমাদের দেশের তেল-মাখা প্রথাতেও বেশ ব্যায়াম হয়—হাত পা ও ধড়ের আকুঞ্চন-প্রসারণ হয়, বাঁকিয়া, মোচড় খাইয়া তারা সবল হইয়া উঠে।

ইয়োরোপেও আজকাল Swedish drill, Muller's free hand exercises, Sandow's free hand exercises প্রভৃতির চলন হইয়াছে। আমাদের যোগিঋষিদের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসঘটিত নানা রকম ব্যায়ামের চলন ছিল ; শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম যে কত ভাল ইয়োরোপের লোকেরা আজকাল তা বুঝিতেছে। চোখের ব্যায়ামেরও চল্তি হইতেছে।

এইবার কতগুলি সহজ ব্যায়ামের বর্ণনা করা যাক্।

(১) ডন :—এটি আমাদের স্বদেশী ব্যায়াম, অতি সহজসাধ্য। মাটীতে হাত রাখিয়া ডন করিতে অসুবিধা বোধ করিলে দু'খানা চেয়ার পাশাপাশি রাখিয়া তার উপর ভর দিয়া ডন করিতে পার। প্রথমে দু'তিনটি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ব্যাপারটা অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, সপ্তাহে সপ্তাহে ডনের সংখ্যা দু'একটি করিয়া বাড়াইয়া লইবে। ডনে হাত ও বুকের বেশ পরিশ্রম হয়।

(২) বৈঠক :—এটিও স্বদেশী ব্যায়াম—বসিয়া উঠিতে হয়, ফলে পায়ের এবং হাঁটুর জোর বাড়ে। আর এক রকম বৈঠক আছে তা'তে পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া গোড়ালি মাটী হইতে তুলিয়া বৈঠক করিতে হয়। পায়ের, বিশেষতঃ পায়ের আঙ্গুলের মাংসপেশী সবল করিতে এটি বেশী কার্য্যকরী।

(৩) স্কিপিং (Skipping) নাচের অনুকরণ। দড়ির সাহায্যে অথবা দড়ি-ব্যতিরেকেও স্কিপিং করিতে পার। আসল যেটি দরকার সেটি হইতেছে পায়ের আঙ্গুলের উপর দাঁড়াইয়া এবং গোড়ালি মাটী হইতে তুলিয়া নৃত্য করা।

স্কিপিংএর বদলে আর একটি জিনিষও করিতে পার—শুধু পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর রাখিয়া গোড়ালি একবার মাটিতে নামাইয়া যথাসম্ভব উঁচুতে তুলিতে পার। দু' পায়ের গতিই এক সঙ্গে হওয়া চাই। সকল ব্যায়ামই মুক্ত বাতাসে করিতে পারিলে ভাল হয়; যেখানে সে সুবিধা নাই সেখানে খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া এবং দরকার হইলে পাখার বাতাসে ঘরের হাওয়া যথাসম্ভব বদ্‌লাইয়া নিয়া ব্যায়াম করা যাইতে পারে।

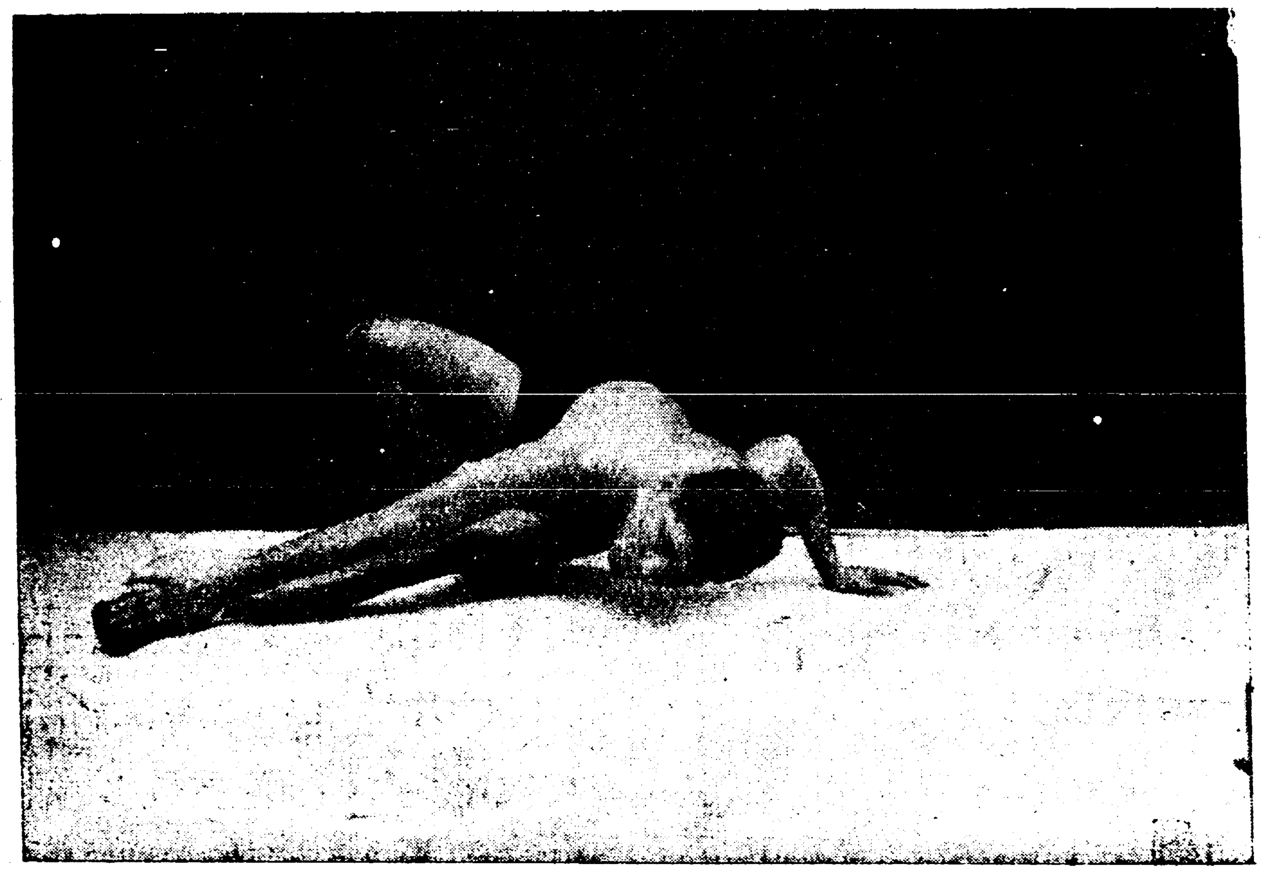

শ্রীযুক্ত শীল 'ডন' দিতেছেন; এটি কিছু কঠিন ডন—প্রথম প্রথম তোমরা পারিবে না।

(৪) আর একটি ভাল ব্যায়াম বাঁ পায়ের উপর ভর করিয়া ডান পাকে শরীরের সহিত সমকোণ করিয়া তোলা। পরে ডান পায়ের উপর ভর রাখিয়া বাঁ পা তুলিতে হইবে। প্রথম প্রথম এটি বেশ শক্ত বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু কিছু দিনের অভ্যাসের ফলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। যাদের কোমরে বা কোমরের নীচে বেশী চর্ব্বি জমিতেছে এই ব্যায়ামটি নিয়মিত করিয়া গেলে শীঘ্রই তারা বিশেষ উপকার যে পাইবে তা জোর করিয়া বলা যায়।

(৫) এইবার যে ব্যায়ামগুলির কথা বলিব, এক কথায় এগুলিকে বলা যায়

শরীর বাঁকাইবার ব্যায়াম। প্রথমে সোজা দাঁড়াইয়া হাত দুটিকে সরল ভাবে উপরে তুলিয়া দাও। তার পর নিঃশ্বাস নিয়া বুক এবং পেট ভরিয়া ফেল; এইবার আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কোমর বাঁকাইয়া হাতের আঙ্গুল দিয়া পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ কর। কোদাল পাড়িবার সময় শরীর যে রকম ভঙ্গী করে এটি অবিকল সেইরূপ ভঙ্গী; কয়েক দিনের অভ্যাসেই এটি বেশ আয়ত্ত হইয়া যায়। এই ব্যায়ামের ফলে পেটে চর্ব্বি জমিয়া ভুঁড়ি বাড়িতে পারে না, পরিপাক করিবার যন্ত্রগুলি নাড়াচাড়া পাইয়া সুস্থ এবং পুষ্ট হইয়া উঠে। তোমাদের মধ্যে যাদের ভুঁড়ি গজাইবার উপক্রম হইতেছে অথবা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় কষ্ট পাইতেছ, তারা প্রতিদিন এই ব্যায়ামটি করিয়া দেখিও কেমন সুফল পাওয়া যায়।

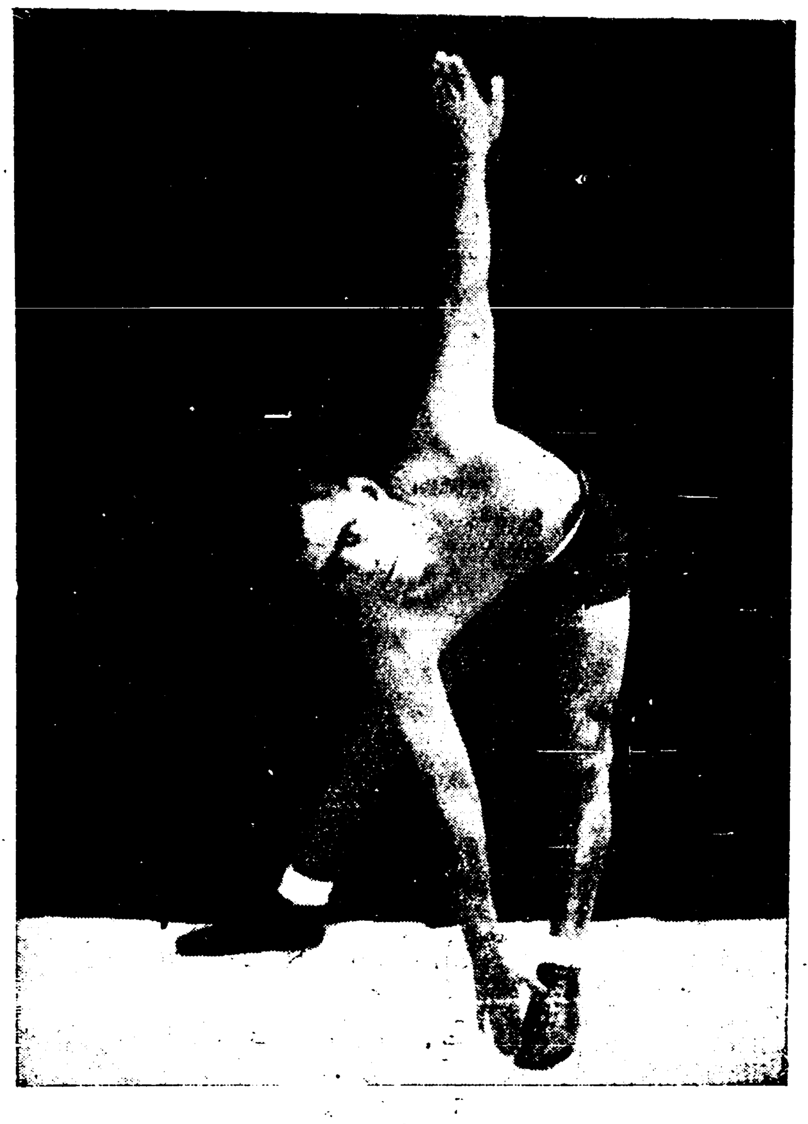

শ্রীযুক্ত শীল শরীরকে ডাইনে বাঁয়ে বাঁকাইতেছেন।

বাল্‌তি করিয়া লোকে যে ভাবে জল তোলে ঠিক সেই রকম ভঙ্গীতে ডান দিক্ হইতে বাঁ দিকে এবং বাঁ দিক্ হইতে ডান দিকে শরীর বাঁকান আর একটি ব্যায়াম। দু'টি হাত উপরে তুলিয়া এক হাতের আঙ্গুলে অপর হাতের আঙ্গুল ধরিয়া সহজেই দেহকে ডাইনে বাঁয়ে বাঁকাইতে পার। ঠিক ওই ভাবে শরীরকে মোচ্‌ড়ানও সম্ভব। এই ব্যায়ামগুলিতে ধড়ের সহিত সংলগ্ন মাংসপেশীগুলি খুব দৃঢ় এবং পুষ্ট হয়, শরীরও ঘাতসহ এবং শ্রমসহিষ্ণু হয়।

হাতের ব্যায়ামের সময়েও মূল কথাটি মনে রাখিতে হইবে—সাধারণ অবস্থায় হাত দিয়া আমরা যে সব কাজ করি ব্যায়ামে সেগুলিরই অনুকরণ করা চাই।

দুই হাতে যেন একটা ভারী জিনিষ বুক হইতে মাথার উপর সোজা করিয়া তুলিতেছ এম্‌নি ভাবে দুই হাত একবার নামাইতে ও একবার মাথার উপর সোজা ভাবে উঠাইতে থাকে। কনুই দুটিকে পিছন দিক্ পর্য্যন্ত আনিয়া হাতের মুঠো সজোরে সম্মুখ দিকে বাড়াইয়া দাও—যেন ঘুষি ছুড়িতেছ। দুই হাত প্রসারিত করিয়া তালি দেওয়ার ভঙ্গীতে সাম্‌নের দিকে লইয়া আস—যেন চড় মারিতেছ। এই ভাবে কব্জি এবং হাতের আঙ্গুলগুলিকে বাঁকাইয়া সোজা করিয়া মোচ্‌ড়াইয়া উহাদের স্বাভাবিক গতিভঙ্গীর অনুকরণ কর।

যারা নিয়মিত পড়াশুনা করে চোখের ব্যায়াম তাদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। দেখা যাক্, মাথা স্থির রাখিলে চোখের কি কি গতিভঙ্গী হয়। চোখের তারা দুইটি এক সঙ্গে ডান দিক্ হইতে বাঁ দিকে যায়, আবার বাঁ দিক্ হইতে ডাইনে ফিরিয়া আসে, উপরে ওঠে, নীচে নামে। কখনও কখনও ঘড়ির কাঁটার মত কখনও বা তার বিপরীত দিকে সেগুলি মোচড়ের ভঙ্গীতে ঘুরিতে থাকে। ব্যস্, প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য এই ভঙ্গীগুলির অনুকরণ কর, চোখের চমৎকার ব্যায়াম হইবে। একটা কথা কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—এ ব্যায়ামের সময় মাথা নাড়াইলে চলিবে না। প্রথম অভ্যাসের সময় একটা কাজ করিতে পার; টেবিলের উপর পর পর কয়েকখানি বই সাজাইয়া তার উপর নিজের চিবুকটি রাখ; তার পর ডান কানের এক হাত দূরে ডান হাতের তর্জ্জনী আঙ্গুলটি এবং বাঁ কানের এক হাত দূরে বাঁ হাতের তর্জ্জনী আঙ্গুলটি উঁচাইয়া ধর। শেষে মাথা স্থির রাখিয়া একবার এ আঙ্গুল আর একবার ও আঙ্গুল দেখিতে চেষ্টা কর। চোখের তারা দুইটি আপনা হইতেই ডাইনে বাঁয়ে নড়িতে থাকিবে। এই ভাবে উপরে, নীচে, আঙ্গুল রাখিয়া চোখের তারাকে উপরে নীচে, চালানও সম্ভব। মোচড়ের ভঙ্গীতে পাক দেওয়ার কথাও ভুলিও না। এই ব্যায়ামগুলির ফলে চোখের মধ্যে রক্তসঞ্চালন খুব ভাল ভাবে হয়, কাজেই চোখের স্বাস্থ্য বজায় থাকে। আমেরিকার এক ডাক্তার এগুলির সাহায্যে অনেকের চোখের অসুখ আরাম করিয়াছেন।

এইবার ফুস্‌ফুসের ব্যায়ামের কথা বলা যাক্; সাধুভাষায় ইহাকে বলে প্রাণায়াম্। আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রাণায়ামের চলন হইয়াছে।

আমরা যে আহ্নিকের সময় পূরক, কুম্ভক ও রেচক করি তা প্রাণায়াম ছাড়া আর কিছুই নয়। ইয়োরোপের লোকেরা আজকাল প্রাণায়ামের গুণ বুঝিতে পারিয়াছে তাই সেখানেও আজকাল প্রাণায়ামের খুব রেওয়াজ। কয়েকটি সহজ দেশী ও বিদেশী প্রাণায়ামের কথা বলিতেছি।

সন্ধ্যা-আহ্নিকের প্রাণায়াম :—প্রথমে ডান হাতের বুড়া আঙ্গুল দিয়া ডান দিকের নাসারন্ধ্রটি বন্ধ করিয়া বাঁ দিকের নাসারন্ধ্র দিয়া ধীরে ধীরে দশ সেকেণ্ড কাল বাতাস টানিয়া পেট ও বুক বাতাসে পূর্ণ কর। তার পর দশ সেকেণ্ড কাল উহা দেহের মধ্যে রাখিয়া আঙ্গুল দিয়া বাঁ দিকের নাসারন্ধ্রটি বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে দশ সেকেণ্ড ধরিয়া ঐ বাতাস ছাড়িয়া দাও। পরে ডান দিকের নাসারন্ধ্র দিয়া বাতাস টানিয়া বাঁ দিকেরটা দিয়া সে বাতাস ছাড়িও। হঠাৎ দম্‌কা বাতাস ছাড়িও না। ভারতবর্ষের বহু লোক এই প্রণালীতে প্রাণায়াম করেন। নিজের যোগ্যতা-অনুসারে ঐরূপ প্রাণায়াম দুইটি, চারিটি বা আটটি অভ্যাস করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রাণায়াম :—ডান দিকের নাসারন্ধ্রটি আঙ্গুলের সাহায্যে বন্ধ করিয়া বাঁ রন্ধ্রটি দিয়া ধীরে ধীরে বাতাস টানিতে আরম্ভ কর। প্রথমে পেট, * তার পর বুকের নীচেকার অংশ এবং সর্ব্বশেষে বুকের উপরের দিক্ বাতাসে পূর্ণ করিতে হইবে (হঠাৎ অতিরিক্ত ফুলাইও না)। তার পরেই বাতাস না ধরিয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দাও। হঠাৎ বাতাস কখনই ছাড়িবে না। সর্ব্বশেষে উদরটি বেশ সঙ্কুচিত হইয়াছে কিনা দেখ। এই সঙ্কোচনের ফলে পেটের ভিতরকার যন্ত্রগুলির মধ্যে সুন্দর ভাবে রক্তসঞ্চালন হইবে, কাজেই শরীর ভাল থাকিবে।

এবার যে দু'টির কথা বলিতেছি সে দু'টি পাশ্চাত্য প্রাণায়াম।

মাঠে বেড়াইবার সময়ে চার পা আগাইতে আগাইতে ওই সময়টুকুর মধ্যেই নিঃশ্বাস টানিয়া পেট ও বুক ভরিয়া ফেল; পরে নিঃশ্বাস চাপিয়া না রাখিয়া আগের চাইতে আস্তে আস্তে পাঁচ পা কিংবা সাত পা হাঁটিয়া যাও, আর সেই

* পেটের ভিতর ঠিক বাতাস প্রবেশ করে না। স্ফীত ফুস্‌ফুস্ ডায়াফ্রামকে নীচের দিকে ঠেলিয়া পেটের কিছু স্থান ভর্ত্তি করে।

সময়টুকুর মধ্যে সমস্তখানি নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দাও। পেটটি সঙ্কুচিত হইয়াছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য অবশ্যই থাকিবে। প্রথম প্রথম তিন চার বারের বেশী প্রাণায়াম করিবে না, পরে অবশ্য ক্ষমতামত বাড়াইতে পার।

মূলার সাহেব প্রাণায়াম-ব্যায়ামের এক নতুন প্রণালী বাহির করিয়াছেন, তাকে বলা হয় Muller's System ; ইহাতে ব্যায়ামের প্রত্যেকটি গতি এক-একটা প্রাণায়ামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ব্যায়ামে কাজ দেয় বেশী। এক কথায় মূলসূত্রটি হইতেছে এই,—শরীর যখন সোজা ভাবে থাকিবে তখন বাতাস টানিতে হইবে ; শরীরের কোন অংশ যখন সঙ্কুচিত হইবে তখন নিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে। বাতাস বা নিঃশ্বাস টানার নিয়ম আগেই বলিয়াছি—প্রথমে বুকের তলার দিক্‌টা, তার পর সমস্ত বুকের পাঁজরা বাতাসে পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। মূলার সাহেবের মতে ব্যায়ামের সময়ই শরীরে খুব বেশী বাতাসের দরকার ; কাজেই ব্যায়ামের সময় ঠিকমত বাতাস টানিতে শিখিলে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ বলিষ্ঠ হইয়া খুব গুরুতর পরিশ্রমের সময়ও সমস্ত দেহে তারা প্রচুর বাতাস জোগাইতে পারিবে।

পড়িবার সময়, বক্তৃতা, আবৃত্তি অথবা গান করিবার সময় শ্বাসযন্ত্রের নিয়মনের দ্বারা এক রকম প্রাণায়াম অভ্যাস করা যাইতে পারে। তাতে বক্তৃতা এবং আবৃত্তি করার ক্ষমতা বাড়ে। ভাল করিয়া এগুলি বুঝাইয়া বলিতে গেলে এ প্রবন্ধটি প্রকাণ্ড হইয়া পড়িবে, কাজেই বারান্তরে সে চেষ্টা করা যাইবে। তেল মাখার মধ্যে যে ব্যায়াম-তত্ত্ব আছে তাও সেদিনই বুঝাইয়া বলিব।*

মকরধ্বজের ধাক্কা !

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

আকস্মিক উত্তেজনার বশে একবার এক বেড়ালকে পদাঘাত করেছিলাম। বেড়ালটা আমার সঙ্গে পায়ে-পায়ে 'করমর্দ্দনের' অভিপ্রায়ে ঘুর্‌ঘুর্ করছিল, ওরা পা-কেই হাত ব'লে গণ্য

* এই প্রবন্ধের ছবিগুলি শ্রীযুক্ত জে. কে. শীল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

করে কিনা ! ওদের চতুষ্পদ না ব'লে চতুর্ভুজও বলা যায়, কিন্তু আমাদের তো আর তা নয়, হাত পা আমাদের আলাদা আলাদা—তাই ওর আস্পর্দ্ধার বহর দেখে আমি ভারী চটেছিলাম। তা' ছাড়া ইতর প্রাণীকে আমি মোটেই আমল দিই না। কুকুর বেড়াল—এ সব দিকে বিনির পছন্দ বটে, আমার কিন্তু আদপেই ভালো লাগে না ওদের।

বেড়ালটাও আমার পায়ে আঁচ্‌ড়ে দিয়েছে। তদবধি পায়ের কেমন একটা অস্বস্থতা অনুভব করছি। আজ সকালে তো দেখলাম পা-টা বেশ ফুলেই উঠেছে। ডান পা-টা। শুনেছি, বেড়াল ভারী ছোঁয়াচে ব্যায়রাম—এখন, কি যে করি ?

নাঃ, এখনই গিয়ে একটা কবিরাজকে দেখিয়ে আসি। কবিরাজেই আমার বেশী আস্থা। আস্থা হবার কারণও আছে। আমাদের পাড়ার হারাধন বাবুর জানিত এক কবিরাজ আছেন, তিনি সেই কবিরাজকে এবং সেই কবিরাজের পরিচয়-সূত্রে কবিরাজী-চিকিৎসাকে ভারী বাহবা দেন। বলেন, "অদ্ভুত ট্রিট্‌মেণ্ট্, শাস্ত্রীয় ওষুধ কিনা, কেন যে কি হ'চ্ছে কিছু বোঝ্‌বার উপায় নেই। অথচ সারছে, হ্যাঁ, একটা না একটা রোগ সেরে যাচ্ছেই—। অদ্ভুত !"

হারাধন বাবু তাঁর কাছে চুল-ওঠার তেল কিনেছিলেন—মহাভৃঙ্গরাজ না কি একটা উৎকট নামের, এবং ফলও পেয়েছিলেন, অল্পদিনেই তাঁর সমস্ত চুল উঠে গিয়ে চমৎকার টাকের চাকচিক্য প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌ল। এবং কেবল হারাধন বাবুই না, তাঁর এক বন্ধুও বেশ উপকার পান। বহুকালের বাতে তিনি কাত্ হয়েছিলেন, সেই তৈলাবশেষ মালিশেই দাঙ্গা করবার মত চাঙ্গা হ'য়ে তিনি ওঠেন। অদ্ভুত নয় কি ?

সেই বন্ধুটি নাকি বলেন, "অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ যদি বল্‌তে হয় তো হ্যাঁ—কেবল সেই কবিরাজকেই।"

হ্যাঁ, তাঁকেই দেখাব। ডাক্‌লে হাঁক দেয়, এম্‌নি তাঁর সব দাবাই !

আনুপূর্ব্বিক সমস্তই গিয়ে বলি। খানিকক্ষণ তিনি গুম্ হ'য়ে থাকেন, তার পরে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলেন—"আর কিছু না মশাই। বেরিবেরি হ'য়েছে আপনার !"

আমার আত্মাপুরুষ পর্য্যন্ত চম্‌কে ওঠে—"য়্যাঁ, বেরিবেরি ! বলেন কি !"

"কি আর বল্‌ব মশাই ! আজকাল ওই এক ব্যায়রাম। পা ফুলেছে কি বেরিবেরি ! ভদ্র-সমাজের ফ্যাশান্‌ই দাঁড়িয়ে গেছে বল্‌তে গেলে।" তিনি অম্লানবদনে ব'লে দেন।

"কিন্তু বেড়ালের আঁচড় থেকে বেরিবেরি—"

আমার সন্দেহ-প্রকাশের মধ্যপথেই বাধা আসে : "বেড়াল থেকে ডিপ্‌থিরিয়া হয় তা জানেন ?"

"শুনেছি বটে।"

"তা হ'লে বেরিবেরি হবে না কেন বলুন তো? দুটো ব্যায়রামে তফাৎ কোথায়?" কবিরাজ মশাই আমাকেই প্রশ্ন ক'রে বসেন।

আমি নিরুত্তর থাকি, নিজের অজ্ঞতা আর জাহির করতে চাই না।

"বেরিবেরি হয় পায়ে আর ডিপ্‌থিরিয়া গলায়, এই তো?" কবিরাজ-মশাই রোগের রহস্য-ভেদ করেন। "একজন প্রথমে এসেই পায়ে পড়ে আর একজনের গলা জড়িয়ে ধ'রে আদর! এই তো?"

কবিরাজের উচ্চহাস্য অন্যান্য রোগীর সাম্‌নে আমাকে এতটুকু ক'রে দেয়। তবু আমি শেষবার বেড়ালের পক্ষ সমর্থন কর্‌তে চাই—"কিন্তু বেড়াল থেকে বেরিবেরি হ'তে শুনি নি তো কখনো!"

"বেরিবেরি একটা ছোঁয়াচে রোগ * এটা মানেন তো? মানেন? বেশ। এখন, ঐ বেড়ালেরই যে বেরিবেরি হয়নি কি ক'রে জান্‌লেন? সংক্রামক রোগ—সকলেরই হতে পারে। তা বেড়ালই কি আর বাঁদরই কি! ব্যায়রাম কি আর মানুষ গরু বাছে নাকি? তা হ'লে গরুর বসন্ত হয় কেন মশাই? কুকুরের কেন কনষ্টিপেশন্ লেগে থাকে? ভালুক কেন জ্বরে ভোগে? তা হ'লে? তা হ'লে আপনিই বলুন!"

'তা হলের' জবাব আমি কি দেব? আমি ঘাড় হেঁট ক'রে পায়ের দিকে তাকাই। নিজের পায়ের দিকে।

"ভালো ক'রে দেখুন গে আপনার সেই বেড়ালেরও চার পা ফুলে রয়েছে। ঐ বেরি-বেরিতেই। তা হ'লে তা থেকে আপনার আস্‌বে না কেন? বেড়ালের আঁচড়ে তো আর বি-ভিটামিন্ নেই মশাই!" কবিরাজ এবার দ্বিতীয় চোট্ উচ্চহাস্য করবার সুযোগ পান।

"তা বটে। কিন্তু—" আমি আম্‌তা আম্‌তা করি—"তা হ'লে একটা পা-ই বা ফুল্‌ল কেন? এক পায়ে কি বেরিবেরি হয়?"

"কেন হবে না? কত লোকের যে এক চোখে ছানি পড়্‌তে দেখ্‌লাম! তা ব'লে কি তাকে ছানি-পড়া বল্‌ব না?"

এর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দারুণ ভীত হয়ে উঠি—"তা হ'লে তো এ থেকে জলাতঙ্কও হ'তে পারে আমার? সে সম্ভাবনা আছে বলে কি আশঙ্কা হয়?"

"আশ্চর্য্য কি! রোগস্য কুটিলা গতি। কিছু কি বলা যায়? সবই সম্ভব।" কবিরাজ মশাই গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়েন। "আচ্ছা—একটা কথা, দুধ খেতে কি বেশ ভালো লাগে আপনার?"

* বেরিবেরি যে ছোঁয়াচে শিবরাম বাবুর কবিরাজই তা আমাদের শোনালেন, ডাক্তারেরা কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কিছুই বলেন নি।—রাঃ সঃ

"না, না, একদম্ না।" আমি প্রবল প্রতিবাদ করি—"ও তো বালকের আর বাছুরের খাদ্য!"

"তবে আর আপনার ভয় কি?" তিনি আমাকে উৎসাহ দেন।

ভরসাটা যে কোথায় ঠিক পেলেন আমি ঠাহর কর্‌তে পারি না। পরমুহূর্ত্তেই তিনি পরিষ্কার ক'রে দেন,—"কুকুর থেকেই জলাতঙ্ক হয় কিনা! বেড়াল থেকে বড় জোর আপনার দুধাতঙ্ক হ'তে পারে। তা, দুধের আতঙ্ক তো আপনার গোড়াগুড়ি রয়েছেই—ওর আর বেশী কি হবে? তবে হ্যাঁ—"

তিনি থেমে যান, এদিকে আমার হৃদ্‌স্পন্দনও যেন থেমে আসে। "তবে হ্যাঁ। আপনার আওয়াজ বদ্‌লে যাবার একটা আশঙ্কা রয়েছে বটে। তা, এমন কি আর মারাত্মক তা!"

"কি রকম, কি রকম?" আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি।

"বিশেষ কিছু না, দুধাতঙ্কের ফলে বেড়াল-ডাকের একটা ভয় এই যা! আওয়াজ বদ্‌লে গিয়ে দিন কত হয়ত ম্যাও ম্যাও করতে পারেন। এই বড় জোর।"

"য়্যাঁ-া-া-া?"—আমি চম্‌কে উঠি, ঠিক যেন "ম্যাও" বলেই ডাক ছেড়েছি এই রকম আমার কানে এসে লাগে। তবে কি এখন এবং এখান থেকেই সূত্রপাত কর্‌লাম নাকি?—"বলেন কি?" 'বলেন কি?' শুনে তবে আমি বল পাই।

"ভয় খাবেন না, সব রোগেরই ওষুধ আছে আমার। ডিপ্‌থিরিয়ার, বেরিবেরির আর ওই দুধাতঙ্কের। আপনার ম্যাও-ডাকও আমি সারিয়ে দেব। ওষুধ বল্‌লে খাটো করা হয় মশাই, আমার প্রত্যেকটিই মহৌষধ—আপনার হারাধন বাবুকেই না হয় জিজ্ঞাসা করবেন।"

আমার সমস্ত অভ্যন্তর সকৃতজ্ঞ হ'য়ে ওঠে—কবিরাজের প্রতি, হারাধনের প্রতি, আমি এবং বেড়াল এই দু'জন বাদে দুনিয়ার আর সকলের প্রতিই আমার চিত্ত ধন্যবাদমুখর হয়।

কবিরাজ মশাই বলেন, "কই, দেখি তো একবার?"

পা বাড়িয়ে দিই। কবিরাজ মশাই হঠাৎ ভারী খাপ্পা হয়ে ওঠেন—"পা? পা কি হবে? পায়ে কি নাড়ি থাকে কখনো? আর থাক্‌লেও পায়ে কি নাড়ি দেখার নিয়ম? যদি নিয়মও হয়, ডাক্তার ব্যাটারাই তা দেখে থাকে,—যেমন তাদের নাড়িজ্ঞান! না বাপু, পা টিপে নাড়ি দেখার বাহাদুরি নেই আমাদের। আম্‌রা কব্‌রেজ।"

অগত্যা হাত বাড়াই। আমারই অন্যায় হ'য়েছে, কবিরাজদের হাতুড়ে ব'লে 'বিখ্যাতি' আছে তা জানতাম কিন্তু হাত নিয়ে কারবার বলেই যে সেই বিশেষণ তা আমার জানা ছিল না।

নাড়ি-দর্শন সমাধা হবার পর, ওষুধের ব্যবস্থা তিনি করেন—"এই এক বোতল, পাচন

আর ভরিখানেক মকরধ্বজ দিচ্ছি আপনাকে—এতেই আরাম হবেন। একমাসও লাগ্‌বে না। অনেক রুগী সেরেছে মশাই আমার হাতে।"

সেরেছে বল্লেন কি সরেছে বল্লেন তিনিই জানেন—কিংবা তিনিও না, একমাত্র বিধাতার তা জানা থাকার কথা। পাঁচন, মকরধ্বজ আর ব্যবহারের বিধি-ব্যবস্থা জেনে আমি বাড়ী ফিরি।

ঘুর্‌তে ফিরতে কেবল কবিরাজের ধ্বনি কানে বাজে—"যা দিয়েছি আপনাকে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদে এমন মহৌষধ আর দু'টি নেই। যেমন হৃদ্য তেমনি বৃষ্য, তেমনি রসায়ন! মশাই, মৃত্যুমুখ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনে মকরধ্বজে। ডাক্তার ব্যাটারাও এটা চালাচ্ছে আজকাল। না চালিয়ে উপায় কি!"

পা তো ভারী ছিলই, মনও ভারী হয়ে আসে ক্রমশঃ। বুঝ্‌তে পারি, মৃত্যুমুখের খুব কাছাকাছিই এসে পৌঁছেছি, তা না হ'লে এই মহৌষধের বন্দোবস্ত হ'ল কেন? এমন রাগ হয় পাজি বেড়ালটার ওপর! এবার তাকে দেখ্‌তে পেলে এইসা কসে এক লাথি ঝাড়্‌ব যে বাছাধন—! মরতে যখন বসেছি তখন আর মার্‌তে দোষ কি? মেরেই মর্‌ব।

কিন্তু না, ওকে দেখ্‌লে আমার সহানুভূতিই হয় এখন। আমার সঙ্গে ও-ও তো সেই এক পথেই চলেছে। দু'জনেই আমরা মৃত্যুর পদধ্বনি শুন্‌ছি—মৃত্যুর গোদা পায়ের ধ্বনি! (বেরিবেরি আর গোদে যারা মরে তাদের কাছে পদক্ষেপ গোদা হবারই কথা।)

এক পায়ে বেরিবেরি হওয়াতেই আমি কাহিল আর চার পায়ে বেরিবেরি নিয়ে ওর যন্ত্রণা কি আমার চেয়ে কিছু কম? ওর যা হ'চ্ছে ও নিজেই তা টের পাচ্ছে। কিংবা নিরক্ষর ব'লে তাও পাচ্ছে না হয় তো। 'ইগ্‌নরান্স্‌ ইজ্‌ ব্লিস্‌' এইজন্যই বলে বোধ হয়। হতভাগ্য!

ভেবে ভেবে ওর ওপর আমার মায়াই হয়। এক পথের পথিক—আমার রুগ্ন সহযাত্রী বেচারা! যুধিষ্ঠির এক চতুষ্পদকে সঙ্গে নিয়ে যমালয়ে গেছলেন, আমি আর একটাকে—। কিংবা ওই আমাকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে এই কথা বল্‌লেই বোধ হয় বেশী ঠিক হবে।

হ্যাঁ, কিন্তু যাত্রাটা যতদূর বিলম্বিত করতে পারা যায়, সে-চেষ্টাও তো দেখ্‌তে হবে। তাই আজ সকালেই একবার হয়ে গেছে, এখন আর একবার মকরধ্বজ-পানের আয়োজন করছি।

মহৌষধটা খেতে নেহাৎ মন্দ না। ডাক্তারি ওষুধের মত অখাদ্য নয় একেবারে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। না, খাবার কোনই কষ্ট নেই, ওকে খাদ্য ক'রে তুল্‌তেই যা হাঙ্গাম। এখন বুঝ্‌তে পারছি এই হুজ্জতের জন্যই মানুষ কবিরাজ-খানার কাছ ঘেঁষে না, সোজা ডাক্তার-খানার দিকে দৌড়্‌ মারে—কারণ সেখানে একটু ফুঁড়ে দিল, ব্যস, ফুরিয়ে গেল—আর এদিকে ওষুধ নিয়ে রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ নয় কেন? কবিরাজ-মশায়ের কথামত, প্রথম তো মকরধ্বজকে 'মার', তার পরে মধু মেশাও, মিশিয়ে আবার খানিকক্ষণ মার—তার পরে পাঁচনটাকে মিলিয়ে নাও ওর সঙ্গে,—তার পরেই তোমার গলাধঃকরণের পালা। এতটা কি সহজ কাণ্ড, বাপু? এই রকম দিনে দু'বার—প্রাতে এবং বৈকালে।

কবিরাজমশাই বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন মারার ব্যাপারে যেন কোন গল্‌তি না হয়। ও ওষুধটা যেন ভারী দুর্দ্দান্ত ছাত্র, না মারলে ওর থেকে সুফল আদায় করা শক্ত। অনতিপিষ্ট মকরধ্বজে কোন কাজ হয় না। আমি—আমি কি আর বল্‌ব? প্রাতে তো কোন রকমে কায়দায় আনি, বৈকালে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হ'য়ে আসে। মাষ্টারি কিংবা গাড়োয়ানি করার অভ্যাস নেই—মহৌষধের সঙ্গে মারামারিতে পেরে উঠ্‌ব কেন? হাতে পায়ে আমার খিল্‌ ধরে যায়।

পাঁচনের বেলা কোন অসুবিধা নেই, ওকে মেলাতে বেগ পেতে হয় না; আপ্‌নিই ও মিলে যায়। পাঁচন-বাড়ির প্রবচন থাক্‌লেও পাঁচনের বেলা কোন বাড়াবাড়ি নেই। কেবল ওই মকরধ্বজকে নিয়েই হ'য়েছে মুস্কিল। প্রথম তো ওর খানিকটা টেবিলের ওপর ঢালি, তার পরেই প্রহারপর্ব্ব। ওটাকে দশ মিনিট মার্‌তে হবে কবিরাজের এম্‌নি হুকুম! কি করি, ফাউণ্টেন্‌ পেন্‌ দিয়েই ঠুক্‌তে হয়। পেন্‌টার সর্ব্বনাশ হচ্ছে বেশ বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু প্রাণের চেয়ে ফাউণ্টেন্‌ কিছু বড় নয়। ম'রে গেলে কে ফাউণ্টেন্‌, কার ফাউণ্টেন্‌, কেন ফাউণ্টেন্‌? ফাউণ্টেন্‌ কি সঙ্গে যাবে?

এর পরে টেবিলের ওপর অয়েল্‌ক্লথ্‌ পাড়্‌তে হবে, নইলে অন্য কাপড়ে কি কাগজে মধু শুষে নেয় কিনা! তার পর আর কি, খানিকটা মধু ঢেলে দাও, দিয়ে মকরধ্বজকে আবার খানিকক্ষণ ক'সে ঠেঙাও! সে এক মহামারি কাণ্ড! এই ক্ষেপ্‌টাতেই যা একটু খিট্‌কাল্‌—মধু ছিট্‌কে ছিট্‌কে আসে, এসে গায়ে লাগে, মাথায় লাগে, দাড়িতে এবং নাকে লাগে, কাপড়-চোপড় সব খারাপ ক'রে দেয়—কত আর বল্‌ব? কবিরাজকে এবার জিজ্ঞাসা করতে হবে, খুব লম্বা একটা ছড়ি দিয়ে দূর থেকে পিট্‌লে হয় না কি? ওষুধের কি আর এমন অপগুণ হবে তাতে? মারা নিয়ে হ'ল আসল।

এত সব লাগালাগি না থাক্‌লে মকরধ্বজকে ভালো ওষুধই আমি বল্‌তে পার্‌তাম। এতে শরীর সবল করবে কি, আরো বরং কাহিল ক'রে দেয়। আধ ঘণ্টার খণ্ড প্রলয়ে মকরধ্বজ ও আমি দু'জনেই প্রায় অর্দ্ধমৃত হয়ে পড়ি। ওই গলদ্‌ঘর্ম্মযোগটা না যদি থাক্‌ত, তা হ'লে, এমন কি, ওকে চমৎকার ওষুধ বল্‌তেও আমার কোন বাধা ছিল না। এত ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে ওষুধ খাওয়া কি মানুষের পোষায়?

অবশ্য ওর পরের কর্ত্তব্যটা খুব সংক্ষিপ্ত। কেবল সংক্ষিপ্ত নয়, সহজ ও সুখসাধ্য। একটা গেলাসে পাঁচনটা ঢেলে তাইতে মকরধ্বজামৃতটা মিশিয়ে নিলেই হ'ল। আপ্‌নিই ওরা মিলে যায়—সেজন্য হাতাহাতি কর্‌তে হয় না। মধুসহযোগে সমস্তটাই তখন অমৃততুল্য হ'য়ে উঠেছে, ভারী খাসা জিনিস! তোমাদের সকলকেই অন্ততঃ একবার ক'রে চাখ্‌তে বলি আমি—সেই কবিরাজের কাছ থেকে নি'য়ে। অবশ্য এও ব'লে রাখি যে চাখ্‌বার আগে দস্তুরমত মরিয়া হ'তে হবে। ভয়ানক প্র্যাক্‌টিস্ করার ক্ষমতা থাকা চাই—মকরধ্বজ আর ম্যাথেমেটিক্‌স্ সহজে কৃপা করেন না! পরিশ্রমের পর্ব্বত যদি ডিঙোতে পার তা হ'লেই মকরধ্বজের সর্‌বৎ পানের ভরসা রেখো।

তৃতীয় দিনে কবিরাজের কাছে যেতেই তিনি চোখ কপালে তোলেন—"সে কি? এর মধ্যেই সব ফুরিয়ে গেল?"

"ফুরোবে না?" আমি কবিরাজকে বোঝাবার চেষ্টা করি—"একটু বেশী করেই তো নিতে হয়, কিছু এদিক্ ওদিক্ যায় কিনা! আপনি ব'লে দিয়েছেন, আপনার আর কি! আপনি তো ব'লেই খালাস, কিন্তু মশাই, যা বল্‌ব সাফ্ কথা, আপনার ও-জিনিসকে মারা বড় সহজ নয়।"

"এদিক্ ওদিক্ যায় কি রকম?" তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন,—"আপনি ঠিক মত মাড়্‌তে পারেন না বোধ হচ্ছে।"

"মাড়্‌তে প্যারি না মানে?" র-কে ড় বলা বাঙাল্‌দের বদভ্যাস, তা আমার জানা ছিল, সেজন্য ওঁকে মনে মনে মার্জ্জনা করি, "আপনি তা বল্‌তে পারেন বটে কিন্তু গায়ের সমস্ত জোর লাগাই আর ঠিকমত হয় না! কি যে বলেন আপনি! যেগুলো ছিট্‌কে নাকে মুখে এসে লাগে কি দাড়িতে এসে ধাক্কা মারে, তা অবশ্য আমি নষ্ট হ'তে দিই না, জিভ্ দিয়ে চেটেই নিই; কিন্তু দেয়ালের-টাও কি আপ্‌নি চাট্‌তে বলেন?" আমি জিজ্ঞাসু হই।

কবিরাজ কিছু বলেন না, মাথায় হাত দিয়ে ভাবেন। কি আর বল্‌বেন! মকরধ্বজের দুর্ব্ব্যবহার তো ওঁর আর অজানা নয়—ওঁর নিজেরই জিনিস, কত দিন থেকে এক সঙ্গে ঘর কর্‌ছেন! ওঁকে ও সম্বন্ধে বেশী বল্‌তে যাওয়াই আমার বাহুল্য মাত্র।

কবরাজমশাইকে কে একজন ডাক্‌তে আসে, আমি সেই ফাঁকে তাঁর কম্পাউণ্ডারের (কম্পাউণ্ডার তো ডাক্তারের, কবিরাজের বেলা বেশী-পাউণ্ডার হবে বোধ হয়। তা, সে যাই হোক্, সেই অধিকন্তুর) কাছ থেকে এবার ভরি-দু'য়েক মকরধ্বজ, আর দু' বোতল পাঁচন বাগিয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরি। রাস্তা থেকে মোটা দেখে এবং বেশ লম্বা দেখে একটা লাঠি কিনে আন্‌তেও ভুল হয় না। আর আমায় পায় কে! রসায়ন-পারাবার এবার ডিঙিয়েই আমি পার হব!

প্রথমে শুধু দেয়ালে লেগেই ক্ষান্ত ছিল, এখন লাঠির চোটে কড়িকাঠে গিয়ে লাগে

মকরধ্বজ। এ রকম দিন কত চল্‌লে বাড়ীটারও স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে আশা করা যায়। দু' ভরি শেষ হ'তে দু'দিনও লাগে না। আবার কবিরাজখানায় যেতে হয়।

কবিরাজকে দেখ্‌তে পাই না, সেই বেশী-পাউণ্ডার বা কবি-মন্ত্রী—কি বল্‌ব ওঁকে?—দেখি একাই ঘর অন্ধকার ক'রে বসে আছে। আমাকে দেখে ক্ষীণস্বরে বলে, "কি? চাই নাকি আরো?"

আমি একটু কিন্তু কিন্তু করি—"হ্যাঁ চাই ত। কিন্তু কবিরাজমশাইকে একটু জিজ্ঞাসা করবার ছিল। আগে এ রকম কড়ি-কাঠে লাগ্‌ত নাতো!"

"কোথায় লাগ্‌ছে? কড়িকাঠে?" সেই কি-বল্‌ব-ওকে, ভারী অবাক্ হয়ে যায়; বলে "সেটা শরীরের কোন্ জায়গা?"

"আমার শরীরের কোন জায়গা নয়, বাড়ীর মাথার দিকে থাকে। সেই মাথায় কিংবা কড়িকাঠে যাই বলুন, সেইখানে গিযে লাগ্‌ছে। মকরধ্বজের এ খুব অত্যাচার নয় কি?"

"বটে? মাথায় লাগ্‌ছে? বেরিবেরিতে তো মাথায় লাগে না?" সে আরো আশ্চর্য্য হয়। "যন্ত্রণাটা কি রকম বোধ হ'চ্ছে?"

"বাড়ীর যন্ত্রণা? তা সে বাড়ীই জানে,—হ'চ্ছে কিনা সে-ই বল্‌তে পারে। দামী ওষুধ বর্‌বাদ্ হ'চ্ছে, পয়সা যাচ্ছে, এই আমার যন্ত্রণা। কবিরাজমশায়ের আপত্তির পর থেকে দেয়ালেরটাও যথাসাধ্য আমি চাট্‌ছি, কিন্তু কড়িকাঠ পর্য্যন্ত তো আমার জিভ্ যাবে না। আমার হাতের নাগালেরও বাইরে। লাফিয়েও ধরা যায় কি না সন্দেহ। এখন কি করা, সেই কথাটাই ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌ব।"

"দেখুন, কবিরাজ মশাইকে তো আপাতক দিনকত পাচ্ছেন না, তবে কিছু যদি না মনে করেন এবং আমার ব্যবস্থা নেন্ তা হ'লে আমি বলি, আপনি দিনকত ঐ সঙ্গে একটা তেল মাখুন। মধ্যমনারায়ণ তেল, বেশ উপকার পাবেন। মাথায় ব্যবহার করতে হয়।"

"বাড়ীর মাথায়? বলেন কি আপনি?"

"বাড়ীশুদ্ধ সবার মাথায় হ'লেই ভালো হয়। অনেক সময়েই এটা বংশগত কিনা!"

বাড়ীর মাথায় তেল মাখালে আমার বেরিবেরি সারবে, এ যেন বাড়াবাড়ি বলেই মনে হ'ল। তবে হারাধন বাবু বলেছিলেন বটে, কবিরাজি ওষুধের কেন যে কি হ'চ্ছে কিচ্ছু বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু তা বলে কি এতটাই হবে?

"তা বেশ, কবিরাজমশাই যদি বলেন, তাই না হয় মাখানো যাবে।"

"কিন্তু কবিরাজকে তো এখন পাচ্ছেন না?"

"কেন, কি হ'য়েছে তাঁর? কোথাও কলে গেছেন্ নাকি?"

"কল্ নয় একেবারে বিকল হয়েছেন। তাঁকে রোগে ধরেছে।"

আমি আকাশ থেকে পড়ি—"কবিরাজের ব্যামো, সে আবার কি মশাই? তা হয় না কি আবার?"

"রোগে তো ধরেছে ওঁকে বহু কাল, কেবল পরশু থেকে বড্ড বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। হৃৎকম্পটা বেড়েছে।" কবি-মন্ত্রী বলে।

"এ তো ভারী ভয়ানক কথা!" আমি সহানুভূতি জ্ঞাপন করি, "তা, অসুখটা কি?"

"ওই একই ব্যায়রাম—আপনারও যা, ওঁরও তাই। বেরিবেরিই বলুন, আর বাড়াবাড়িই বলুন!"

"য়্যাঁ? বেরিবেরি?" আমার দম আট্‌কাবার যোগাড় হয়, "এর মধ্যে আবার ধর্‌ল কখন?"

"প্রায় পাঁচ ছ'মাস থেকেই ত ভুগ্‌ছেন।" বেশী-পাউণ্ডার প্রকাশ করে।

"পাঁচ—ছ—মাস!" আমার চোখ কপালে ওঠে, "তা এতদিন চিকিৎসা করান্ নি কেন? বাড়ীর মাথায় কি ছাদে তেল ফেল সব লাগানো হ'য়েছিল? আর মকরধ্বজ? তিনশো পঁয়ষট্টি রকমের ব্যাধি যাতে সারে ইন্‌ক্লুডিং বাত-পিত্ত-কফ?" আমি কৈফিয়ৎ চাই।

"সার্‌লে কি হবে! ওঁকে কিছুতেই খেতে রাজী করানো যাচ্ছে না যে।"

কবিমন্ত্রী আর বিরক্তি চাপ্‌তে পারে না। আমি মনে মনে ভাবি, রাজী করানো যাবে কি করে? সহজ ব্যাপার নয় তো! লাঠালাঠি ক'রে ওষুধ খাওয়া কাঁহাতক্ পোষায় ভদ্রলোকের—বিশেষ ক'রে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান্ নয় যারা? লাঠিখেলার অভ্যাস রীতিমত থাকা চাই, নইলে মকরধ্বজের সঙ্গে লাঠালাঠি কি চারটিখানি কথা?

বাড়ী ফিরেই আমি ঘরের চতুর্দ্দিকে তাকাই। কোনদিকেই তাকানো যায় না—লাঠির অত্যাচারে খুব কম জায়গাই মকরধ্বজ-না-লাগা আছে। মনে করি, বাকী মকরধ্বজটা দিয়ে—না হয় আর দু'ভরি আনাতে হয় তাতেও রাজী—চার ধারের দেয়ালে মায় কড়িকাঠের ফাঁকে অবধি ভালো ক'রে পোঁচ্ লাগিয়ে দেব—যাকে বলে মকরধ্বজের চুণকাম্। যে ওষুধ খেতে স্বয়ং কবিরাজের নিজের সাহসে কুলোয় না, আমার তা খেতে যাওয়া দারুণ দুঃসাহসিকতা। না, ও কাজ আমি করতে পারব না, দরকার হয় বরং য়্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প পড়্‌ব, কিংবা লিখ্‌ব, সেও ভালো। কিন্তু ওই মারাত্মক মহৌষধ—আর না!

মকরধ্বজ-কাম্-করা বাড়ীতে বাস করাও গৌরবের বিষয়। সোনার বাড়ীতে না হোক্, স্বর্ণঘটিত বাড়ীতে আছি দশজনকে ডেকে বল্‌বার মত কথা এ। কেউ না শুন্‌তে চাইলেও চুপ্‌চাপ্ একাকী ভাব্‌তেই কেমন আরাম!

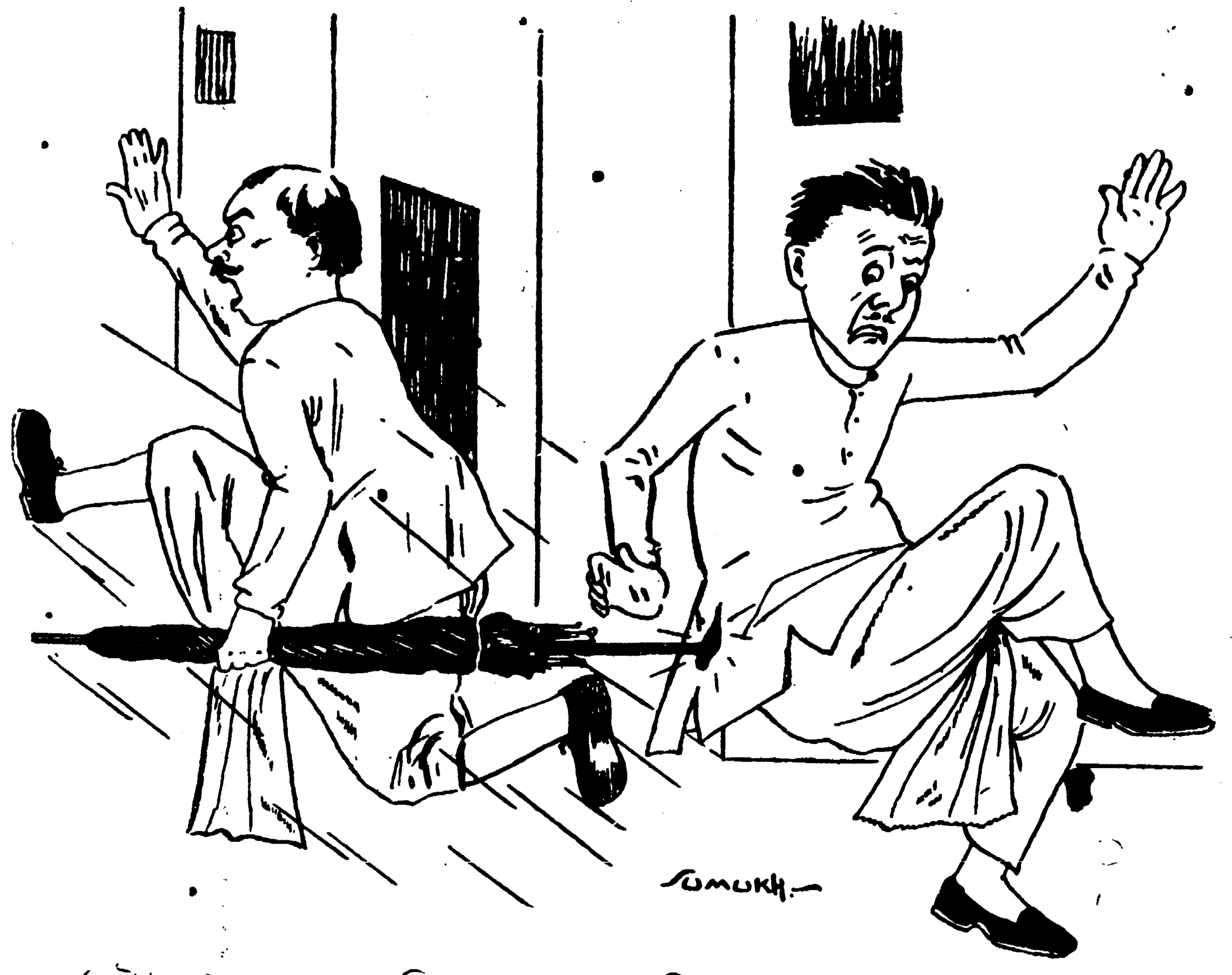

(ট্রাম) ধর্‌তে গিয়ে তাড়াতাড়ি—
পথের লোকের বিপদ্ ভারী!

শিল্পী—শ্রীসুমুখনাথ মিত্র। (রামধনুর গ্রাহক)

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

কেবলমাত্র স্কুলের নির্দ্দিষ্ট বই ক'খানি পড়িলেই যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না তা' তোমরা নিশ্চয়ই জান। এই জন্যই আমরা রামধনুখানিকে কেবল কতকগুলি গল্প এবং ছোটদের উপন্যাসেই ভরিয়া দিই না, যাতে তোমাদের বাহিরের জ্ঞান বাড়িতে পারে এই ধরণের নানা রকম প্রবন্ধও প্রকাশ করি। দুনিয়ার খবরাখবর তোমরা কে কতটা রাখ সে সম্বন্ধে নিজেরাই নিজেদের পরীক্ষা করিতে পার। নীচে কতকগুলি প্রশ্ন দিলাম; এগুলি লোক-ঠকানো প্রশ্ন নয়, স্কুলের

ছাত্রছাত্রীদের এগুলির মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি জানা উচিত। প্রশ্নগুলি দেখিয়া প্রথমে নিজেরাই জবাব ঠিক কর, তার পর রামধনুর শেষের পৃষ্ঠায় দেওয়া উত্তরগুলির সঙ্গে মিলাইয়া লও। আগেই উত্তর দেখিও না।

১। নীচে যাঁদের নাম দেওয়া হইল তাঁদের মধ্যে একজন 'স্বর্ণলতা' নামে বিখ্যাত বইখানি লিখিয়াছিলেন। কে তিনি?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়কুমার বড়াল, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু।

২। নূরজাহানের সমাধিমন্দির

আগ্রায়, ফতেপুর-শিক্রিতে, দিল্লীতে, লাহোরে, আজমীড়ে—এগুলির মধ্যে কোন্ জায়গায়?

৩। গত মহাযুদ্ধের শেষের দিকে এবং সন্ধিতে স্বাক্ষর করার সময়ে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন—

মিঃ উইনষ্টন্ চার্চ্চিল, মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ, লর্ড্ ব্যালফোর, মিঃ অষ্টেন্ চেম্বারলেন, লর্ড্ রোজবেরি—কোন্ জন?

৪। জাপানের ওশাকা সহর প্রসিদ্ধ

কাচ তৈরীর জন্য, কাগজ তৈরীর জন্য, কাপড় তৈরীর জন্য, যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য, শুঁট্কি মাছ চালান দিবার জন্য;—আসলে এগুলির কোন্‌টির জন্য?

৫। নীচে যে সব কথা লেখা হইল তার মধ্যে যদি ভুল থাকে তবে সেগুলিকে শুদ্ধ কর—

(ক) টিল্‌ডেন—অষ্ট্রেলিয়াবাসী, বিখ্যাত ক্রিকেটার (খ) পেরি—আমেরিকাবাসী, মুষ্টিযুদ্ধে চ্যাম্পিয়ান্ (গ) পন্স্‌ফোর্ড্—ইংল্যাণ্ডবাসী, বিখ্যাত টেনিস্-খেলোয়াড় (ঘ) কার্পেন্‌টিয়ার—ফ্রান্স্‌বাসী, বিখ্যাত এভিয়েটার (বৈমানিক) (ঙ) লিণ্ড্‌বার্গ্—জার্ম্মেনীবাসী, বিখ্যাত কুস্তিগীর (চ) বীঠোফেন (Beethoven)—ইটালীবাসী, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক (ছ) হানিবল্—গ্রীস্‌বাসী, বিখ্যাত কবি (জ) ফ্যারাডে—হল্যাণ্ড্‌বাসী, বিখ্যাত সেনাপতি।

৬। বার্ণার্ড শ, ম্যাক্‌সিম্ গোর্কি, টলষ্টয়, এইচ্. জি. ওয়েল্‌স্,

রম্যা রঁল্যা, ভিক্টর হুগো, নুট্ হাম্‌সুন—এঁদের মধ্যে কে কে নোবেল-প্রাইজ্ পাইয়াছেন?

কেন? কি? কোথায়?—ইত্যাদি

(বছর কয়েক আগে রামধনুতে 'কেন? এবং কি?' নামে একটি বিভাগ বাহির হইত, নানা রকমের জানিবার কথা তাহাতে ছাপা হইত। বিভাগটি আবার খোলা হইল।)

ডিক্টেটরী শাসন কাহাকে বলে?

তোমরা প্রায়ই লোকের মুখে শুনিতে পাও মুসোলিনি ইটালীর ডিক্টেটর, হিট্‌লের জার্ম্মেনীর ডিক্টেটর, ষ্ট্যালিন রাশিয়ার ডিক্টেটর। কিন্তু ডিক্টেটরী শাসনটা যে কি সে সম্বন্ধে তোমাদের কতখানি সুস্পষ্ট ধারণা আছে জানি না।

'ডিক্টেটর' নামটি রোমের ইতিহাস হইতে ধার করা, যদিও প্রাচীন গ্রীসেও এই ধরণের চলন ছিল। দেশে যখন একটা বড় রকমের বিপদ্ দেখা দিত তখন লোকের ভোট নিয়া আলোচনা-পরামর্শ করিয়া, এক কথায় 'সভা করিয়া' দেশ-শাসন সম্ভব হইত না: দেশের সমস্ত ক্ষমতা তখন কিছু দিনের জন্য দেওয়া হইত একজন পাকা লোকের হাতে। তিনি দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিলে আবার 'সভা করিয়া' দেশ-শাসন চলিত।

আজকাল পৃথিবীর নানান্ দেশে যে ডিক্টেটরী শাসন চলিতেছে এটার কিন্তু সৃষ্টি এক রকম গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই। মহাযুদ্ধের আগে লোকের ঝোঁক ছিল গণতন্ত্রের উপর। গণতন্ত্র বস্তুটা কি এক কথায় বুঝাইয়া দিতেছি। ধর, একটা দেশে তিন কোটী লোকের বাস; তিন কোটী লোকে মিলিয়া 'সভা করিয়া' তো আর দেশ-শাসন চলে না, তাই তাদের বলা হইল, তোমরা (অবশ্য ছেলেমেয়েরা নয়) তোমাদের ভিতর হইতে দু'শ' লোক বাছিয়া দাও, তারাই তোমাদের হইয়া দেশ শাসন করিবে। সকলে তখন ভোট্ দিয়া লোক বাছিয়া দিল। এঁরা হইলেন সভা বা **Parliament**এর সভ্য। রাজ্যশাসনের সমস্ত ভারই রহিল এঁদের হাতে। যুদ্ধের আগে লোকের ধারণা ছিল এর চাইতে রাজ্যশাসনের ভাল বন্দোবস্ত বুঝি আর হইতেই পারে না।

যুদ্ধের পরই কিন্তু লোকের মনে নানা রকমের সন্দেহ হইতে লাগিল। অনেকে বলিতে লাগিলেন গণতন্ত্রের যুগ চলিয়া গিয়াছে, ও জিনিষ আর চলিবে না। রাজ্যশাসন ব্যাপারটা আজকাল ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে; এক দেশের অবস্থা আজকাল নির্ভর করে অপর

দেশগুলির অবস্থার উপর। জাপানের কাপড়ের কলে হয়তো ধর্ম্মঘট হইল, তার ফলে বিলাতের অনেকের আয় গেল বন্ধ হইয়া। দেশ-শাসনের এই সব জটিল ব্যাপার সাধারণ লোকের মাথায় একেবারেই ঢোকে না; কাজেই উপযুক্ত লোক বাছাই করা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—যারা খোসামুদে তারাই আমোল পায়, যারা পাকা লোক, হক্ কথা বলে, তাদের কেউই চায় না। কাজেই পাকা লোকের উচিত্ দরকার হইলে জোর করিয়াই নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করা। সভা বা Parliamentএর মধ্যে অনেক দল থাকে, কাজেই কাজের চাইতে সেখানে কথা-কাটাকাটিই হয় বেশী। ফলে আসল দরকারী কাজগুলি হয় বাদ পড়ে নয়তো নিতান্ত ঢিমে-তেতালায় চলিতে থাকে। তা' ছাড়া গণতন্ত্র ঠিক মত চালাইতে হইলে যে সব জিনিষের দরকার, ক্রমেই সেগুলির অভাব হইয়া পড়িতেছে।

সব চেয়ে বড় কথা হইল যে, যুদ্ধের পর ইয়োরোপের অনেক দেশই দুর্দ্দশা এবং অশান্তির চরমে আসিয়া ঠেকিল। গণতন্ত্র এ সমস্তের কোনই প্রতিকার করিতে পারিল না। তখন, অসুখ হইলে ডাক্তার যেমন সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেন, ঠিক সেই রকমই কয়েকটি দেশে কয়েকজন দক্ষ নেতা এক রকম জোর করিয়াই নিজেদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া লইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে ফলও দেখাইলেন আশ্চর্য্য রকমের। এঁদের বলা হয় ডিক্টেটর। রাশিয়া, তুরস্ক, ইটালী, জার্ম্মেনী, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও চীনে আজকাল ডিক্টেটরী শাসন চলিতেছে। হাঙ্গেরিতেও প্রায় তাই।

ডিক্টেটরী শাসনে **Parliament** বা 'মহাসভা' নামে একটা থাকে বটে, কিন্তু আসলে যা করার সবই করেন নেতা এবং তাঁর দল। নেতার দল ভিন্ন অন্য কোন দল তিষ্ঠিতেই পারে না। নেতার দল যা একবার ঠিক করিবে তার বিরুদ্ধে অপর কেউ কথাটি পর্য্যন্ত বলিতে পারিবে না—সে রকম সমালোচনা করিলেই গুরুতর শাস্তি পাইতে হইবে। দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এম্‌নি ভাবে ঠিক করা হইবে যেন তারা নেতার দলেরই সহায়ক হইতে পারে। স্কুল-কলেজে, পাঠ্য-পুস্তকে কি শিখাইতে হইবে, খবরের কাগজে কি রকম মতামত বাহির হইবে, দেশে কি সামগ্রী কি ভাবে তৈরী হইবে সমস্তই বলিয়া দিবেন নেতার দল।

ডিক্টেটরী শাসনের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কিছুই বলিবার আছে, কিন্তু সেগুলি আলোচনা করিতে গেলে একখানি বড় পুঁথি হইয়া পড়ে। তা ছাড়া অনেক জটিল কথা বলিতে হয় যা তোমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মোটামুটি জিনিষটার ধারণা তোমাদের দিলাম।

গাছের পাতা সবুজ কেন?

এর উত্তর দুইবারে দিতে হইবে। গাছের পাতার মধ্যে সবুজ রংএর একটা জিনিষ আছে, তাকে বলে ক্লোরোফিল্। এই ক্লোরোফিলের কাজ হইতেছে—সূর্য্যের আলোর সাহায্যে বাতাসের 'কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্' গ্যাস হইতে গাছেদের উপযোগী খাবার তৈরী করা। এই সবুজ ক্লোরোফিলের জন্যই গাছের পাতাও দেখিতে সবুজ।

এখন, তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে—ক্লোরোফিলের রংই বা সবুজ হইল কেন, নীলও তো হইতে পারিত! তোমরা বোধ হয় জান, সূর্য্যের কিরণ সাত রকম রংএর আলো দিয়া তৈরী—এই সাত রংএর সবগুলি একত্র করিলে সাদা দেখায়। এখন, এই সাদা আলো কোন জিনিষের উপর পড়িলে সে জিনিষ সাধারণতঃ সে আলোর কতকটা শুষিয়া লয়, কতক লইতে পারে না। এক-এক জিনিষের এই আলো শুষিয়া লইবার ক্ষমতা এক-এক রকম। ক্লোরোফিল সূর্য্যের সব ক'টা রংএর আলোই শুষিয়া লয়, শুধু সবুজটা ফিরাইয়া দেয়, তাই ক্লোরোফিলকে সবুজ দেখায়। ক্লোরোফিলের মত প্রত্যেক রঙ্গিন জিনিষই এই একই কারণে তাদের ভিন্ন ভিন্ন রং পাইয়াছে।

হাঁসের ডিম পচা না ভাল কেমন করিয়া জানিবে?

বর্ষা কালে প্রায়ই দেখা যায়—বাজার হইতে ডিম কিনিয়া আনা হইল, তার পর তা' ভাঙ্গিয়া দেখা গেল তার অনেকগুলিই পচা! ডিম ভাল না পচা চিনিবার একটা সহজ উপায় হইতেছে এক বাল্‌তি জলের মধ্যে ডিমটা ফেলিয়া দেওয়া। ডিম ভাল হইলে তা' একেবারে জলের তলায় চলিয়া যাইবে, কিন্তু পচা হইলে উপরে ভাসিয়া উঠিবে। এই ভাবে পরীক্ষা করিয়া ডিম কিনিলে আর ঠকিতে হইবে না।

ডিম চিনিবার উপায় তো শুনিলে, এখন বলিতে পার ও রকম কেন হয়? ডিমের মধ্যে দু'টি অংশ আছে এক—সাদা অংশ—য়্যালবুমেন্, আর এক হল্‌দে অংশ—যাকে আমরা কুসুম বলি—যেটা আসল পাখীর ছানা। য়্যালবুমেন্ আর কুসুম জলের চেয়ে ভারী, তাই ডিম ঠিক থাকিলে তা' জলে ফেলিলেই ডুবিয়া যায়। কিন্তু ডিম পচিয়া গেলে য়্যাল্‌বুমেন্ আর য়্যাল্‌বুমেন্ থাকে না, কুসুমও নষ্ট হইয়া যায়। রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে এ দু'টি জিনিষ তখন অন্য জিনিষে গিয়া দাঁড়ায়—যার ওজন জলের চেয়ে কম। তাই জলে ফেলিলেই পচা ডিম ভাসিয়া উঠে।

বিয়োগান্ত জলযোগ !

(শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু)

আমরা ওঁকে "একাদশী মুখুয্যে" ব'লেই জান্‌তাম: 'শ্রাদ্ধের ভোজ' খেয়ে এসে রবিবাবু গত সংখ্যার 'রামধনুতে' যাঁর গল্প তোমাদের শুনিয়েছেন।

ওঁর এ হেন নাম-ডাকের কারণ এই, কেবল দু'টো দিন বাদ দিয়ে সারা মাসটাই উনি একাদশী করতেন। একাদশী মানে, একবেলা খেয়ে থাক্‌তেন। এ বিষয়ে ওঁর রেকর্ড্ ছিল—পূরো আশী বছরের পাকা রেকর্ড্। শুধু একাদশীর দু'টো দিন বাদ যেত, সে-দু'দিন ছিল তাঁর 'অনাদশী', মানে একেবারে অনাহার।

উনি বল্‌তেন ওতেই ভালো থাকা যায়। সুখে থাকা না হোক্ বেঁচে থাকার ওই যে প্রশস্ত উপায় তার প্রতিবাদের দুঃসাহস কে করবে? কেননা তার জ্বাজ্বল্যমান উদাহরণ উনি নিজেই। যদিচ সে অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আর বর্ত্তমান নেই, আমরা হারিয়েছি—এখন অতীতের গর্ভে। কিন্তু পঁচানব্বই বছর তো বেঁচেছিলেনই, আকস্মিক দুর্ঘটনাটা না ঘট্‌লে, আরও পঁচানব্বই বছর যে কায়ক্লেশে বাঁচ্‌তেন না এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না।

শ্যামরতন বাবুর বাবা 'অকালে' মারা গেছেন, রবিবাবু শুদ্ধ এই খবরটাই পেয়েছেন, কিন্তু কি দুঃখে এবং কোন্ দুর্ঘটনার ফলে যে তিনি অকস্মাৎ দেহরক্ষা করলেন, যে মর্ম্মন্তুদ কাণ্ড না ঘট্‌লে তিনি কিছুতেই অমন করতে যেতেন না, তা কেবল আমিই জানি। আমি আর ঘুন্‌টু। ঘুন্‌টু ওদের পাশের বাড়ীর—আমার সঙ্গে এক কেলাসে পড়ে—আলাদা ইস্কুলে। ওর কাছেই আমার শোনা।

যে জলের ছোঁয়াচ্ থেকে তিনি সর্ব্বদা সাবধানে আত্মরক্ষা ক'রে চল্‌তেন নিদারুণ সঙ্কট-কালে সেই জলস্পর্শ ক'রেই তিনি মারা গেলেন! জলের আস্বাদ জলের চেয়ে ভালো হওয়াই তাঁর অপমৃত্যুর কারণ।

জল তিনি যে একেবারেই পান করতেন না তা নয়, করতেন সামান্যই—কিন্তু স্নান? একেবারেই না। স্নান করতে হ'লে জল ছাড়া আরও একটা জিনিষ

লাগে। তেল। তেল মাখ্‌তে হয়। জলে পয়সা খরচ নেই বটে, কিন্তু তেলে আছে। এই জন্যই তিনি স্নান বর্জ্জন করেছিলেন।

এই জন্যই যে, সেটা অবশ্য আমাদের আন্দাজ। তাঁর ব্যাখ্যা অন্য রকম ছিল। সেটা জেনেছিলাম যেদিন রাস্তায় আমাকে ধ'রে তিনি প্রশ্ন করলেন—"গোরা, তুমি কি চান্ কর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"প্রত্যেক মাসেই?"

'মাসে? হ্যাঁ, মাসে তো বটেই। সকালে নেয়ে খেয়ে ইস্কুলে যাই, আবার ইস্কুল থেকে ফিরেই চান্ করি।"

তাঁর চোখ দুটো প্রকাণ্ড হ'য়ে ওঠে—"বল কি?"

"বিকেলে ফুট্‌বল্ খেলে এসে আবার চান্ করি।"

"য়্যাঁ?" চোখ দু'টো বেরিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়।

"তবে রাত্রে আর করি না, কিন্তু ভোরে উঠেই আবার যাই লেকে সাঁতার কাট্‌তে। তাতেও অনেক সময়ে চান্ করা হ'য়ে যায়। কি কর্‌ব?"

বহুক্ষণ তাঁর মুখ থেকে বাক্যস্ফুট হয় না। অবশেষে তিনি বল্লেন,—

"কূপের দড়ি দেখেছ?"

আমি ঘাড় নাড়ি।

"দু'টো দড়ি কেনো; কিনে একটা তুলে রাখ আর একটা দিয়ে অনবরত জল তোল। দেখ্‌বে যেটা নির্জ্জলা তোলা আছে সেটার অখণ্ড পরমায়ু, আর যেটা অনবরত কূপে চোবানি খাচ্ছে তার আর দেখ্‌তে হবে না—এই হ'য়ে এল বলে! আমি মোটেই চান্ করি না, দেখ্‌চ ত পঁচানব্বই বছরেও কেমন তাজা টন্‌কো র'য়েছি! আর তোমরা? তার ঢের আগেই তোমরা পচে যাচ্ছ। কত বয়স তোমার? বার? এই বারতেই যা বাড়াবাড়ি সুরু করেছ তাতে টিক্‌লে হয়! বিরাশী পর্য্যন্তই পৌঁছবে কিনা সন্দেহ!"

স্নানাহার বাঁচিয়ে এই ভাবে তিনি বেঁচে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে সেই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘট্‌ল।

সেদিন, কি কারণে বলা যায় না, তিনি একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, ইত্যবসরে তাঁর সেই প্রসিদ্ধ পদস্খলন ঘট্‌ল। অনিবার্য্য পদস্খলন—কিছুতেই তাঁকে থামাতে পারা গেল না। ঘুন্‌টিদের আশ্রম থেকে কোন্ মহাপ্রভু কলা খেয়ে খোসাটি দয়া ক'রে একাদশীর বাড়ীর দিকেই নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই খোসা থেকেই এই দশা।

মাথায় চোট্ লেগে একাদশী তো অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ গেল, অনেক চেষ্টা হ'ল, জ্ঞান আর হয় না। অগত্যা শ্যামরতন ভয়ে ভয়ে প্রস্তাবটা পাড়লেন—"ডাক্তার ডাক্‌ব নাকি?"

শ্যামরতনের মা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন—"সর্ব্বনাশ! তা হ'লে আর ওঁকে বাঁচানো যাবে না শ্যামু! ডাক্তার এসেছে, ভিজিট্ দিতে হবে জান্‌লে আর ওঁর জ্ঞান হ'তে চাইবে না। তোমার বাবাকে কি চেন না বাবা?"

বাবাকে ভালোই চেনে শ্যামু। নিজেকে চেনে তারও বেশী। কাজেই পিতৃহত্যা-পাতকের ভাগী হ'বার জন্য সে বেশী পীড়াপীড়ি করল না।

একাদশী-গিন্নী বল্লেন, "তার চেয়ে এক পয়সার চিনি কিনে আন বরং! সরবৎ ক'রে একটু খাওয়ালেই জ্ঞান হবে। এক পয়সার,—বেশী নয় কিন্তু!"

পয়সার কথাটা কানে যাবার জন্যই সম্ভবতঃ একাদশীর জ্ঞান অবশেষে ফির্‌ল। গিন্নী বল্লেন, "এইটুকু ঢক্ ক'রে গিলে ফেল তো! গায়ে বল পাবে, সেরে উঠ্‌বে এক্ষুণি।"

একাদশী চম্‌কে উঠ্‌লেন—"কি ও? দুধ নাকি?"

"রামচন্দ্র! দুধ দেব তোমায়? কী যে বলো তুমি!" গিন্নী হেসে উড়িয়ে দেন।

"তবে কি? বেদানার সরবৎ?"

"ছি ছি! অমন কথা মুখেও এন না।" গিন্নী এবার রাগ করেন।

"বার্লি নয় তো?"

"ভয় খাচ্ছ কেন? তোমার পয়সা জলে দেব তেমন মেয়ে পেয়েছ আমায়?

এখন ঢক্ ক'রে গিলে ফেল দিকিন্। সামান্য একটু জল মাত্র।" গিন্নী অভয় দেন।

ভরসা পেয়ে একাদশী এক ঢোঁক্ খান—"কি রকম মিষ্টি লাগ্‌ছে যেন! জল কি এমন মিষ্টি হয়? জল তো এ নয় গিন্নী!"

"ও কিছু না। শ্যামু একটু চিনি মিশিয়েছে জলে।" গিন্নী দুঃসংবাদটা আস্তে আস্তে ভাঙ্‌তে চান।

"য়্যাঁ? কি বল্‌লে? কি বল্‌লে গিন্নী? জলে চিনি? এইবার তোমরা আমায় পথে বসা'লে! এইবার আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'লুম! জলে চিনি! কি সর্ব্বনাশ! য়্যাঁ? জলে চিনি? কর্‌লে কি! গিন্নী? জলে চিনি? য়্যাঁ? জলে চি-চি-চি—"

বল্‌তে বল্‌তে একাদশী নিজেকে উদ্‌যাপন করলেন।

সেই প্রথম শ্যামরতন বাবুর বাড়ী চিনি এল, কিন্তু চিনির সঙ্গে যে বাপকেও জলাঞ্জলি দিতে হবে, সামান্য জলযোগ যে এমন প্রাণান্তকর ব্যাপার হ'য়ে পড়্‌বে এ কথা শ্যামরতনও ভাব্‌তে পারেন নি। আমরা তো নয়ই।

কর্ম্মবীর স্যর রাজেন্দ্রনাথ

(শ্রীচণ্ডীচরণ দে)

আমাদের এই সোনার বাঙ্‌লার সোনার ছেলে রাজেন্দ্রনাথ আর নাই! গত ১লা জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ১১।৩০ মিনিটের সময় তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবকের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করিতেন এবং প্রত্যেকটি কাজ করিতেন ঘড়ি ধরিয়া। বাঙ্গালী সময়ের মূল্য বোঝে না এই অপবাদ তিনি দূর করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

রাজেন্দ্রনাথ ১৮৫৪ সনের ২৩শে জুন ২৪ পরগণার ভ্যাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ

করেন। এ গ্রামটি কলিকাতা হইতে ৪৩ মাইল দূরে। তাঁহার পিতা ভগবান্‌চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বসিরহাটে মোক্তারী করিতেন। ৭ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রনাথের বাবা মারা যান, সেই সময় হইতেই তাঁহার জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। একে পিতৃহারা বালক, তাহার উপর বাল্যকালে আবার তাঁহার শরীর খুব খারাপ ছিল। তাই রাজেন্দ্রনাথের মা তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন। অবশেষে তিনি পুত্রকে আগ্রায় কোনও আপনজনের বাড়ী বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য লইয়া গেলেন।

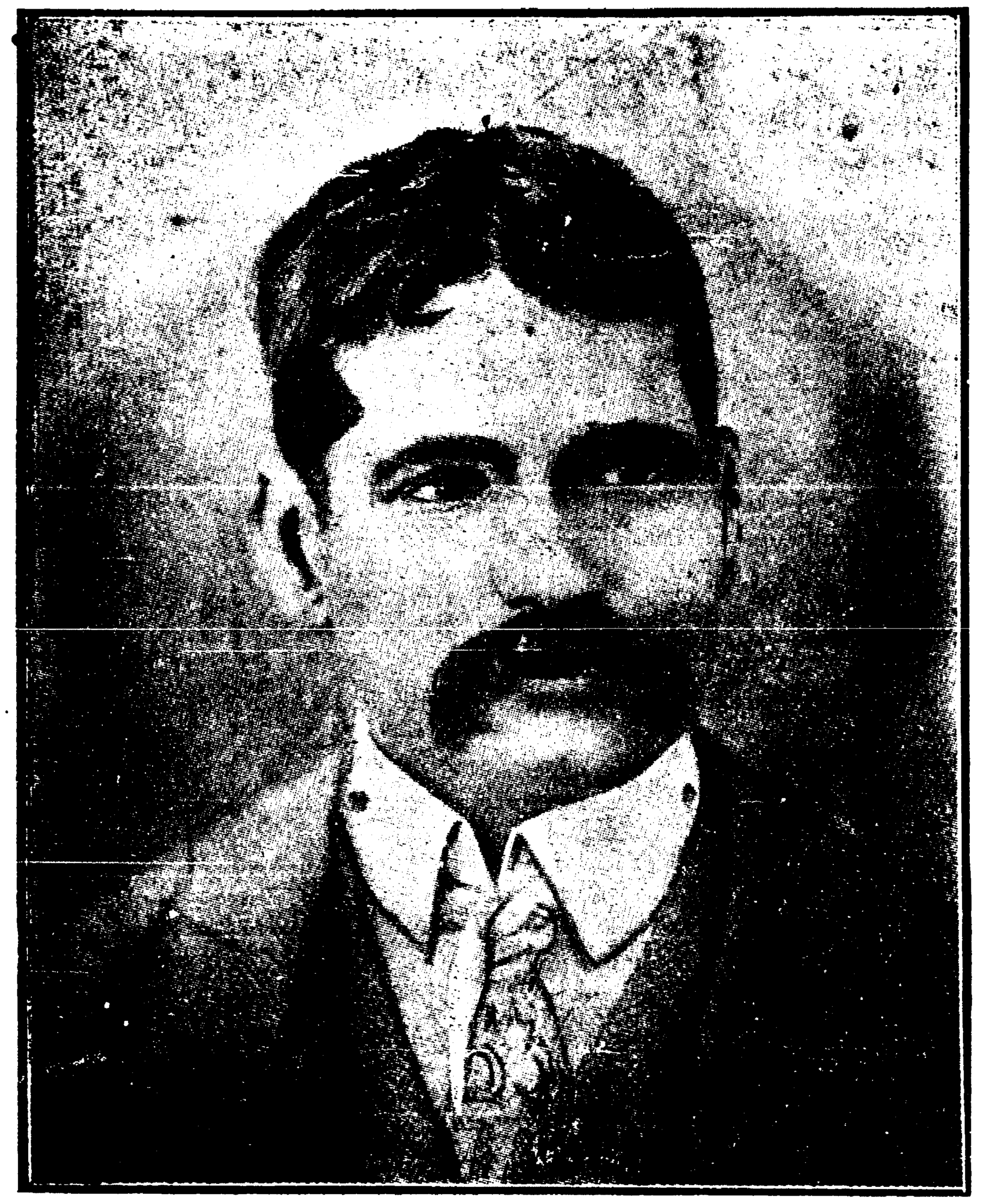

যৌবনে রাজেন্দ্রনাথ

কলিকাতায় ফিরিয়া রাজেন্দ্রনাথ আবার দারিদ্র্যের সহিত লড়াই করিয়া অতি কষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন। তার পর তিনি পূর্ত্তবিদ্যা শিখিবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইলেন—কিন্তু টাকার অভাবে পড়া শেষ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি এত বুদ্ধিমান্ এবং বিচক্ষণ ছিলেন যে যদিও পূর্ত্তবিদ্যায় কোনও উপাধি পান নাই তবুও ও বিদ্যাটি চমৎকার শিখিয়া লইয়াছিলেন।

এক দিন তিনি তাঁহার বন্ধু আলিপুর পশুশালার পরিদর্শক ৺রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন যে একজন সাহেব একটি

সেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য মিস্ত্রীকে কাজ বুঝাইতেছেন। কিন্তু মিস্ত্রী সাহেবের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া রাজেন্দ্রনাথ তাহাদের কাছে আসিলেন; তার পর সাহেবের অনুমতি লইয়া মিস্ত্রীকে সব কাজ চমৎকার বুঝাইয়া দিলেন। ইহাতে সাহেব যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইয়া পর দিন তাঁহাকে পল্‌তার বিখ্যাত জলের কলে কাজের জন্য যাইতে বলিলেন। পরে জানা গেল যে এ সাহেবটি বড় কেউ-কেটা নন্, তখনকার কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার স্যর ব্র্যাডফোর্ড লেস্‌লি—যিনি হাওড়ার ভাসমান সেতুর পরিকল্পনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এত দিন রাজেন্দ্রনাথ দুঃখের-সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া কোন কূলকিনারা পাইতেছিলেন না, এইবার ভাগ্যলক্ষ্মী হাসিমুখে তাঁহার দিকে চাহিলেন। ঐ হৃদয়বান্ সাহেবের কৃপায় তিনি কিছু ঠিকাদারীর কাজ পাইলেন এবং বেশ সন্তোষজনক ভাবেই সেগুলি শেষ করিলেন। কলিকাতার পানীয় জল পল্‌তা জলের কল হইতে আসে। পল্‌তা গ্রামটি বারাকপুরের কাছে। সেখান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত জল আসিবার জন্য যে বড় নল (pipe) আছে তাহা আমাদের রাজেন্দ্রনাথেরই কীর্ত্তি। এইরূপে সামান্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তিনি এক কারবারের অংশীদার হইলেন।

ঠিক এই সময় একটী ঘটনা ঘটায় রাজেন্দ্রনাথের নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। এলাহাবাদের জলের কল তৈরী করিবার জন্য তাঁহার ডাক আসিয়াছিল; কাজটি তিনি এত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিলেন যে স্বয়ং বড়লাট লর্ড্ ল্যান্স্‌ডাউন পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখনকার বিখ্যাত ইংরাজ সওদাগর মার্টিন সাহেব রাজেন্দ্রনাথের কার্য্যদক্ষতা, অধ্যবসায় প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মার্টিন এণ্ড্ কোম্পানীর অংশীদার হইতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন।

এখানে আসিয়া যোগ দিবার পরই, সকাল বেলাকার সূর্য্যের কিরণ যেমন প্রখর হইতে প্রখরতর হইতে থাকে, রাজেন্দ্রনাথের প্রতিভাও তেম্‌নি প্রদীপ্ত হইতে প্রদীপ্ততর হইয়া উঠিতে লাগিল। হু হু করিয়া ব্যবসায়ে তিনি উন্নতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে কলিকাতা এবং ভারতের নানা জায়গায় মার্টিন

কোম্পানীর চমৎকার চমৎকার সব অট্টালিকা উঠিতে লাগিল। কলিকাতার ময়দানে যে সুবিখ্যাত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্ রহিয়াছে সেইটিও মার্টিন কোম্পানীর তৈরী। মার্টিন কোম্পানীর অধীনে বহু বিভাগ আছে—তাহার মধ্যে রেল্ওয়ে বিভাগ বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। হাওড়া-আম্‌তা, হাওড়া-সেয়াখালা, বারাসত-বসিরহাট, বক্তিয়ারপুর-বেহার, এবং দিল্লী-[illegible]াদরা রেল্ওয়ে এই কোম্পানী দ্বারাই পরিচালিত। এগুলি হইতেই বুঝিতে পারিবে কি বিরাট্ এই কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্র—প্রত্যহ হাজার হাজার লোক এখানে নানা বিভাগে কাজ করিতেছে। পৃথিবীর কত জায়গার সহিত এ কোম্পানীর কারবার! মার্টিন সাহেবের মৃত্যুর পরই এই কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা—সিনিয়র পার্ট্‌নার—হইলেন আমাদের রাজেন্দ্রনাথ। একজন বাঙ্গালীর ছেলে এতদিন ধরিয়া এতখানি সুখ্যাতির সহিত এত বড় একটা ব্যাপার চালাইতেছিলেন এ কথা ভাবিলেও কি মন আনন্দে ভরিয়া উঠে না?

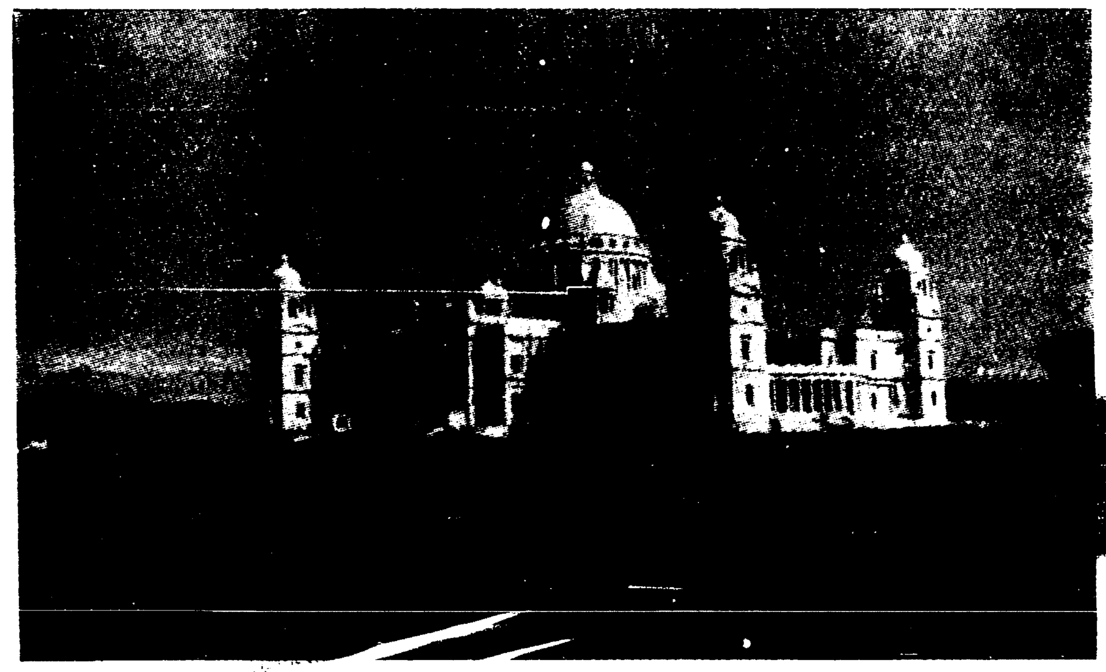

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্—শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে।

রাজেন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত, সম্মানার্হ এক বিরাট্ পুরুষ ছিলেন। জীবনে নানা রকমের বহু সম্মান তিনি পাইয়াছেন। বাহিরে সাহেবী চাল-চলন বজায় রাখিলেও ভিতরে তিনি ছিলেন পূরাদস্তুর বাঙ্গালী, এবং একজন প্রকৃত নিরহঙ্কার ব্যক্তি। ভদ্রলোক হিসাবে তাঁহার স্থান ছিল বহু উচ্চে। গরীব কেরাণীরা দশটায় খাইয়া কাজে আসে, টিফিনের সময় কিছু না খাইতে পাইলে তাহাদের বড়ই কষ্ট হয়—মহাপ্রাণ রাজেন্দ্রনাথ তাই কোম্পানীর খরচেই

কর্ম্মচারীদের জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অতুল সম্পত্তির মালিক হইয়াও জন্মভূমি ভ্যাব্‌লা গ্রামের জন্য তাঁহার কোমল প্রাণ কাঁদিত, বহু টাকা খরচ করিয়া তাই তিনি সেখানে একটী স্কুল এবং স্কুল চালাইবার জন্য অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন; চলাচলের কষ্ট দেখিয়া রাস্তা তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন, রোগযাতনার কথা শুনিয়া চিকিৎসালয় এবং জলের কষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া পুকুর কাটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাই আজ ভ্যাব্‌লা গ্রাম হায় হায় করিতেছে।

আমাদের দেশের বড়লোকেরা প্রায়ই যুবকদের বলেন, তোমরা সহরে ভীড় [illegible]িয়া পাড়াগাঁয়ে ফিরিয়া যাও। তাঁহারা যদি রাজেন্দ্রনাথের মত নিজ নিজ [illegible]নিকে আধুনিক লোকের বাসের উপযুক্ত করিয়া দেন তবে দেশের একটা [illegible] অভাব ঘুচিয়া যায়।

রাজেন্দ্রনাথের জীবন হইতে তোমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। প্রত্যেক বছরই আমাদের দেশ হইতে বহু ছাত্র লেখাপড়া শিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে। প্রত্যেকেই যদি চাকরী করিতে চায় তবে প্রতি বছর হাজার হাজার নূতন চাক্‌রীর বন্দোবস্ত করিতে হয়। তাহা তো সম্ভব নয়! তাই লেখাপড়া শিখিয়া রাজেন্দ্রনাথের মত তাহারা যদি ব্যবসার দিকে মন দেয়, সেই রকম ধৈর্য্য এবং কষ্টসহিষ্ণুতা শিখিতে অভ্যাস করে, তবে বাংলা দেশ আবার সোনার বাংলা হইয়া দাঁড়াইবে। লেখাপড়া শিখিয়া ব্যবসায়ে ঢুকিলে ব্যবসা তাহারা আরও ভাল ভাবে চালাইতে পারিবে। এ বিষয়ে রাজেন্দ্রনাথ সমস্ত জাতিকে এক নূতন প্রেরণা দিয়াছেন। তাই তাঁহার অভাবে আজ দেশময় শোকের বন্যা বহিতেছে।

মাষ্টার মশাই—(ডাক্তারের ছেলেকে) দেখ দুলাল, তুমি পড়াশুনায় বড্ড ফাঁকি দিচ্ছ। ফের এমন করলে তোমার বাবাকে ডেকে পাঠাব।

ডাক্তারের ছেলে—কিন্তু তিনি তো কোথাও চার টাকা ভিজিটের কমে আসেন না!

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আজব দাওয়াই

(শ্রীরসোদর শর্ম্মা)

এ-কি কাণ্ড ! কী প্রচণ্ড গ্রীষ্ম এবার আইল রে !
উঃ কি কষ্ট ! প্রাণ অতিষ্ঠ, সৃষ্টি যে লোপ পাইল রে !
থার্ম্মোমিটার করবে কি আর ? উচ্চে উচ্চে উঠ্‌ছে রোজ,
হাঁকছে চাষা, সর্ব্বনাশা মেঘের কিন্তু নাইক' খোঁজ।
জান্‌লা, দরজা, সার্সি, কব্জা রৌদ্রে ফেটে সব চৌচির,
কুলুপ-তালা গল্‌বে এবার— বাড়বে কার্য্য ঠক্-চৌরির।
ধর্ তুই কলম, দিচ্ছি লিখে ঘটবে এই এই অতঃপর,
কই মাছ হয়ে থাক্‌তে হবে, এইবার থেকে তোড়-জোর কর।
নদীর চড়ায় উনুন ছাড়াই খই-চালভাজা ভাজবি হায় !
পল্‌তে গাছে তেল ঢাল্‌লে পর পটল ভাজা ফল্‌বে তায়।
কোন্ দিক্ যাব, কোন্ দিক্ যাব, চার ধারেতে হৈ-হৈ রব,
আণ্ডা-বাচ্চার কাণ্ড দেখে প্রাণ-মন কেমন করছে সব।
আন্না কাঁদছে, পান্না কাঁদ্‌ছে, ঠাণ্ডা কর্‌বার উপায় কই ?
বাঁটকুল রাগে ওপড়াচ্ছে চুল, ভুল্লু মামা চীল্লায় ওই !
কান্না ছেড়ে তিন মণ বরফ আন্ না ছুটে পান্না ভাই,
হরদম্ ঢাল্‌রে ঠাণ্ডা সরবৎ, কস্‌রৎ করবার দরকার নাই।
কি বল্‌ছিস্ তুই, নাই আর বরফ এত্ত বড় সহরটায় ?
কব্‌রেজকে ডাক্, পেটের মধ্যে ফিটের মত হচ্ছে হায় !
এস এস কব্‌রেজ দাদা, বাংলাও দাওয়াই তাগ্ করে,
নইলে পরে যোয়ান মরদ্— ফেল্‌ব কেঁদে ভ্যাঁক্ করে।
কি বল্‌ছ ? ও, কাচ্চা-বাচ্চায় ঢুকিয়ে দেব চৌবাচ্চায় ?
আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি না হয়, জল্‌দি বল, প্রাণটা যায়।

মাথায় মাখ্‌ব চ্যবনপ্রাশ ? বেশ, ডল্‌ব বুকে দই-মাখম ?
বেশ বেশ, তার পর ? চোখটি বুঁজে একবার মাত্র গাঁজায় দম্ ?

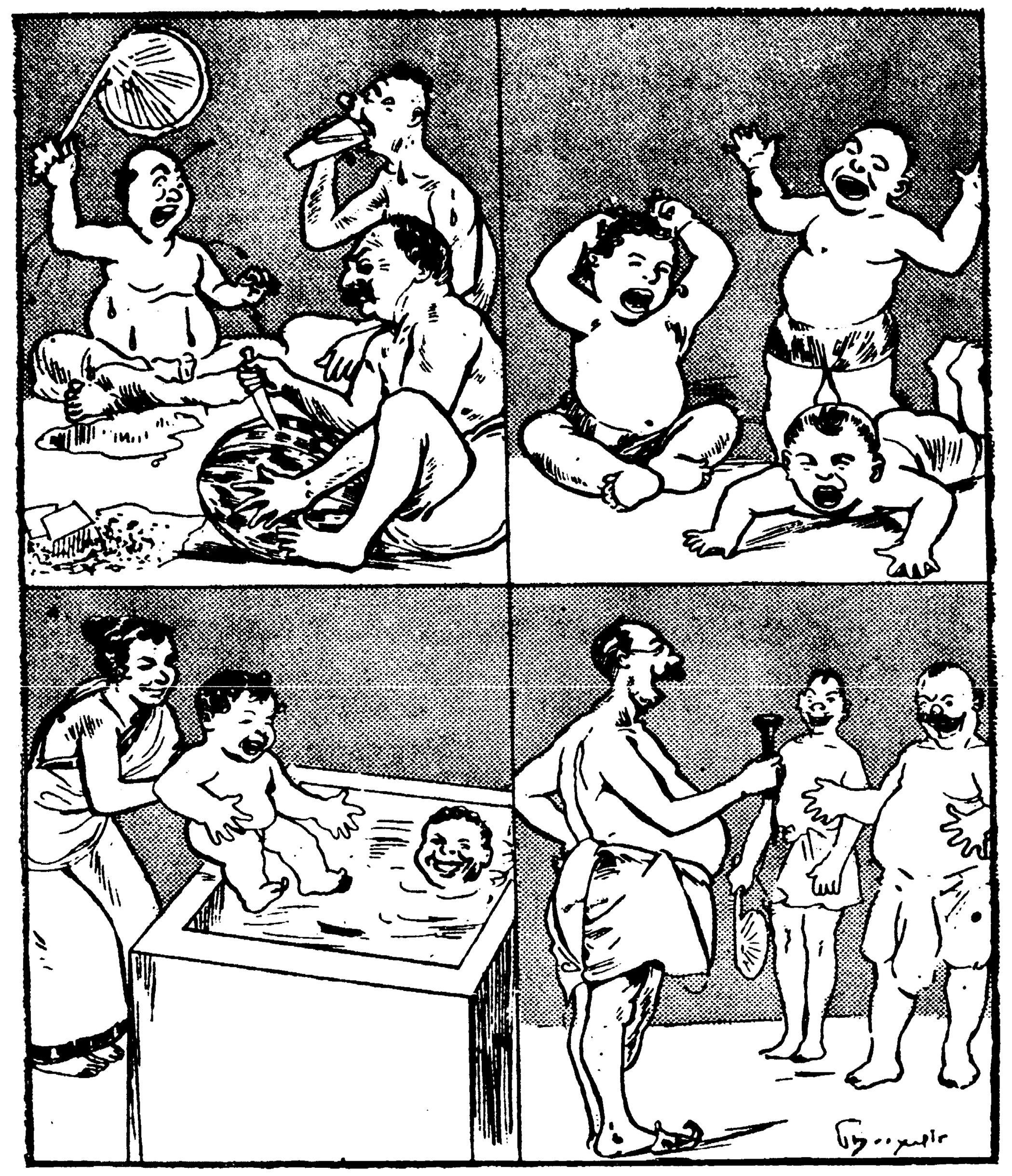

আস্তে আস্তে টান্‌ব নিঃশ্বাস— সাম্‌নে ঘুরবে এ বিশ্ব,
বিট্‌কেল্ গ্রীষ্ম ফুস্‌মন্তরে অম্‌নি হবে অদৃশ্য ?
তার পরেতেই একেবারে "টুপ্, ভুজঙ্গ" অবস্থা ?
বেশ বেশ, দাদা, দীর্ঘায়ু হও, খা-সা তোমার ব্যবস্থা !

খেলাধূলা

ক্রিকেট

এ বছর ভারতবর্ষ হইতে বাছাই-করা একদল খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছেন সে খবর তোমরা সবাই জান। ভিজিয়ানাগ্রামের (বিজয়-নগরম্) কুমার এই দলের ক্যাপ্টেন হইয়া গিয়াছেন। তা' ছাড়া ভারতের অন্যান্য বড় বড় ক্রিকেট-খেলোয়াড়—যেমন সি. কে. নাইডু. ওয়াজির আলি, অমর সিং, মার্চ্চেণ্ট, নিসার, মাস্তাক আলি, জয়, হুসেন, বাকা জিলানী, রামস্বামী, হিণ্ডলেকার, পালিয়া প্রভৃতিও এ দলে আছেন। বাংলা দেশ হইতে গিয়াছেন এস্, ব্যানার্জ্জি। ইনি বোলিং এবং ব্যাটিং দুই দিক্ দিয়াই খুব নাম করিয়াছেন। পাঞ্জাবের বিখ্যাত খেলোয়াড় অমরনাথও এই সঙ্গে গিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেকটি খেলাতেই বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়া—বিশেষতঃ কয়েকটি সেঞ্চুরি করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে দলের শৃঙ্খলা নষ্ট ও অবাধ্যতা প্রভৃতি দোষের জন্য তাঁকে ভারতবর্ষে ফেরৎ পাঠান হইয়াছে। ঠিক তার আগে এরোপ্লেনে সি. এস্. নাইডুকে বিলাতে পাঠান হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর খাঁ বিলাতেই ছিলেন, তিনিও অনেক খেলায় যোগ দিতেছেন।

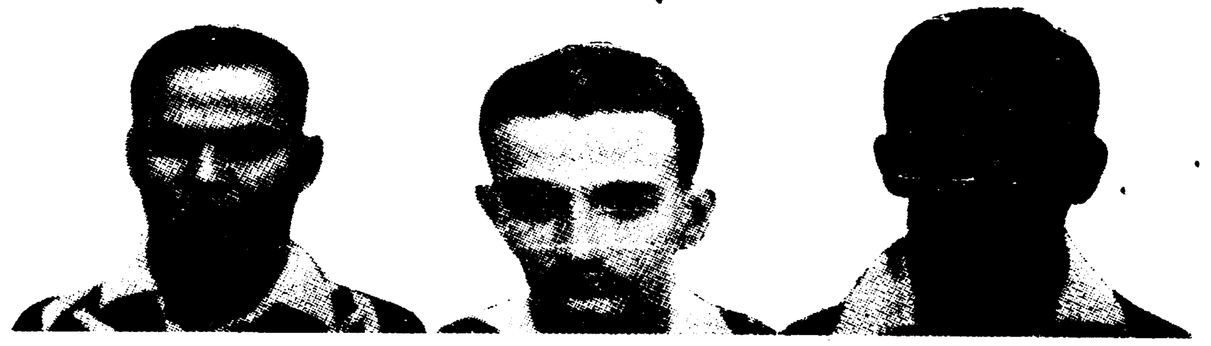

ভারতের বিখ্যাত বোলার অমর সিং — ভারতের বিখ্যাত ব্যাট্স্‌ম্যান্ মার্চ্চেণ্ট্ — বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি এস্, ব্যানার্জ্জি

ভারতীয়দের মধ্যে বোলিংএ অমর সিং, নিসার এবং ব্যানার্জ্জি খুব কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। ব্যাটিংএও মার্চ্চেণ্ট্, ওয়াজির আলি, নাইডু ও ব্যানার্জ্জি বেশ প্রশংসনীয় খেলা দেখাইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয়েরা এক 'মাইনর কাউন্টি' দল ছাড়া আর কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত হারাইতে পারেন নাই—তবে অনেকের সঙ্গেই ড্র গিয়াছে, অনেকগুলিতে পরাজিতও হইয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত প্রথম টেষ্ট্ ম্যাচ্ হইয়া গিয়াছে। এই খেলার সময় বৃষ্টির জন্য মাঠের অবস্থা বড়

খারাপ ছিল। প্রথম ইনিংস্এ ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ডের চেয়ে ভাল খেলিয়াছিলেন এবং তাদের চেয়ে ১৩ রান্ বেশী করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই; ফলে ইংল্যাণ্ড্ ৯ উইকেটে জয়লাভ করিয়াছে। ভারতীয় দলের হিণ্ডলেকার অতি চমৎকার উইকেট্ কিপিং করিতেছেন।

বর্জ্জিত অমরনাথ — আমন্ত্রিত সি. এস. নাইডু

ফুটবল্

কলিকাতার ফুটবল্ লীগ্ শেষ হইয়াছে। গত বারের মত এবারেও মহামেডান্ স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ান্ হইয়াছেন। এইবার লইয়া তাঁরা উপর্য্যুপরি তিনবার চ্যাম্পিয়ান্ হইলেন, ইহা বড় কম গৌরবের কথা নয়। এক মাত্র ডারহাম্স্ ছাড়া এ পর্য্যন্ত আর কোনও টিমের এ সৌভাগ্য হয় নাই। এবার মহামেডান্ স্পোর্টিং একমাত্র ব্ল্যাক্ওয়াচের কাছে পরাজিত হইয়াছেন, এবং কাষ্টম্স্এর সহিত দুইবার ও ই-বি-আর, ক্যাল্কাটা, মোহনবাগান, পুলিশ—এই কয় দলের সহিত একবার করিয়া ড্র করিয়াছেন; বাকী সবগুলিতেই তাঁরা জিতিয়াছেন।

লীগে দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছেন ব্ল্যাক্ ওয়াচ্। তার পর মোহনবাগান, ক্যাল্কাটা ই-বি-আর, কালীঘাট, এরিয়ান্স্, ইষ্ট্ বেঙ্গল, কাষ্টম্স্, ডালহৌসি, পুলিশ ও সর্ব্বনিম্নে এটাচ্‌ড্ সেক্সন। শেষোক্তটি মিলিটারী টিম্, কাজেই পুলিশকেই আগামী বারে দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া যাইতে হইবে। দ্বিতীয় বিভাগে এবার চ্যাম্পিয়ান্ হইয়াছেন ভবানীপুর। ইঁহারা আগামী বারে প্রথম বিভাগে খেলিবেন।

লীগের পর কলিকাতায় এবার এক মস্ত খেলা হইয়া গিয়াছে। চীন দেশ হইতে বাছাই-করা দল অলিম্পিক্ খেলায় যোগ দিবার জন্য ইয়োরোপে যাইতেছিলেন, তাঁদের সহিত ভারতীয়দের এবং সিভিল ও মিলিটারীদের দু'টি ম্যাচ্ হয়। ভারতীয়দের সহিত চীন দলের ১—১ গোলে ড্র হইয়াছে, সিভিল-মিলিটারী দল ২—১ গোলে পরাজিত হইয়াছেন। ভারতীয়দের সহিত চীনা দলের যে ম্যাচ্

হইয়াছিল সেদিনকার মত ভীড় কলিকাতার মাঠে এ পর্য্যন্ত কোন দিন হয় নাই। খেলাটিও খুব উঁচুদরের হইয়াছিল। চীনা দলের ক্যাপ্টেন, সেণ্টার ফরোয়ার্ড্ লি-ওয়াই-টংএর খেলা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। এমন উঁচুদরের সেণ্টার ফরোয়ার্ড্ ভারতবর্ষে আর দেখা যায় নাই; শট্‌গুলি যেন বন্দুকের গুলি! চীনা দলের গোল-কীপারটিও আশ্চর্য্য রকম নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকা লিখিয়াছেন—"He is a great little man."

টেনিস্

উইম্ব্‌ল্‌ডন্ টেনিস-প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। পুরুষদের সিঙ্গ্‌ল্‌স্‌এ চ্যাম্পিয়ান্ হইয়াছেন গ্রেট্ ব্রিটেনের পেরি। ইনি ফাইনালে জার্ম্মেনীর ফন্ ক্র্যাম্‌কে ৬—১, ৬—২, ৬—০ গেমে পরাজিত করিয়াছেন। তিনি পর পর তিন বার এই "বিশ্ববিজয়ী" সম্মান পাইলেন। অবশ্য খেলিবার সময় হাঁটু ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই ফন্ ক্র্যামের এতখানি দুর্দ্দশা—নতুবা ফ্রান্সে পেরিকে তিনি হারাইয়াছিলেন।

মেয়েদের সিঙ্গ্‌ল্‌স্‌এ চ্যাম্পিয়ান্ হইয়াছেন মিস্ হেলেন জেকব্‌স্ (ইউ, এস্,এ)। ইনি ডেনমার্কের মিসেস্ স্পার্লিংকে ৬—২, ৪—৬, ৭—৫ এ পরাজিত করিয়াছেন। এর আগে মিস্ জেকব্‌স্ চার বার ফাইনালে উঠিয়াও জয়ী হইতে পারেন নাই।

ডাব্‌ল্‌স্ (পুরুষদের ও মেয়েদের) খেলায়ও গ্রেট্ ব্রিটেন্ জয়ী হইয়াছেন।

সাঁতার

বিখ্যাত বাঙ্গালী সাঁতারু রবীন চাটার্জ্জি এন্‌ডিওরেন্স্ সাঁতারে এক নতুন রেকর্ড্ করিয়াছেন। হাতে হাতকড়া লাগাইয়া ইনি ক্রমান্বয়ে ৬৩ ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়া বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের রেকর্ড্ (৬২॥ ঘণ্টা) ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তোমরা বোধ হয় জান, পৃথিবীর 'এন্‌ডিওরেন্স-সাঁতারে'ও রবীন বাবুর রেকর্ড্‌ই সব চেয়ে বেশী—৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট। প্রফুল্ল বাবু নিজেই রবীন বাবুকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। রবীন বাবু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতার-শিক্ষক।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

৭ই পৌষ

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত)

পৌষের দু' তারিখ। ক্লাসের শেষে কমন-রুমে বসে বন্ধুরা মিলে মহা জটলা সুরু করে দিয়েছি। হঠাৎ কোথা থেকে খেয়াল ভায়া এসে আমাদের মাথায় এক খেয়াল চাপিয়ে দিয়ে গেল। সামনে বড় দিনের ছুটী—ঠিক হ'ল সাইকেলে কয়েক জন মিলে শান্তিনিকেতন যাব। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে মস্ত বড় উৎসব হয়। কাজেই এক সঙ্গে এড্‌ভেন্‌চার, শান্তিনিকেতন দেখা আর উৎসব-পর্ব্ব—অনেক কিছুই হবে।

৫ই পৌষ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আমরা পাঁচ বন্ধু—প্রফুল্ল, যতীন, বঙ্কিম, শিবব্রহ্ম ('মামা) ও আমি—মহা উৎসাহে দ্বি-চক্রযানের ওপর সমস্ত বেঁধে শান্তিনিকেতনের পথে যাত্রা করলাম।

৫৪ মাইল অতিক্রম করে মেমারীতে এসে দেখ্‌তে পেলাম আমাদেরই মত আর একদল যাত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে। এক দলেই রক্ষা নেই, একেবারে এক সঙ্গে যোড়া দল! আমাদের চীৎকার আর আনন্দ-ধ্বনিতে মেমারীর বাজার মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল।

পরিচয় নিয়ে জানতে পেলাম তাঁরা আরও সুদূর পথের যাত্রী—যাচ্ছেন এলাহাবাদ। তাঁরা ছিলেন সাত জন, আর আমরা পাঁচ জন। এইবার একত্র হয়ে যাত্রা সুরু কর্‌লাম। ওঁদের ভেতর একজন খুব ভাল বিগ্‌ল্ বাজাচ্ছিলেন; তার সুমধুর ধ্বনি আমাদের প্রাণে এক নূতন আনন্দের উৎস ছুটিয়ে দিল।

দু' পাশে জঙ্গল, পর পর ১২ খানি সাইকেলের মন্থর গতি, আর সাম্‌নে চলেছে বিগ্‌লের সুর। মাঝে মাঝে খোড়ো চালার লোকগুলো দৌড়ে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ছিল।

...আমরা বর্দ্ধমান সহরে গিয়ে ঢুকলাম। বর্দ্ধমান ষ্টেশনের পাশেই "গুরু নানক ...ক হ'ল সেইখানেই রাত কাটাব।

পর দিন পানাগড়ে এসে তুই দল পৃথক্ রাস্তা ধরলাম। আমরা যে রাস্তা ধরে এগুচ্ছি সে রাস্তা বড্ড খারাপ। তু'ধারের মাটি পাঁজা করে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে—আর সেই মাটি শুকিয়ে হাঁটু পরিমাণ ধুলো জমে উঠেছে। এই রাস্তার ওপর দিয়ে সাইকেলের চাকা গড়িয়ে নিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর মাত্র ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করে অজয় নদের তীরে এসে পৌঁছুলাম। অজয়ের এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত বালিতে ভরপূর—এর ওপর দিয়ে নিজের পা তুটোকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই মুস্কিল। এইবার প্রায় এক মাইল পথ বাইক্ মশায়রা আমাদের কাঁধে উঠলেন।

যাত্রার প্রারম্ভে—গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডের একটি দৃশ্য

সূর্য্যের আলো ক্রমে কমে এল। আমরা ব্যস্ত হ'য়ে পথিকদের জিজ্ঞাসা করি—"বোলপুর আর কতটা পথ গো ?"

উত্তর আসে—"নিকটেই বটেক্।"

এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত যাকেই জিজ্ঞাসা করি সেই উত্তর দেয়—"নিকটেই বটেক্।" আচ্ছা মুস্কিলে পড়লাম—এ 'নিকটেই বটেক্' যে আর কিছুতেই আমাদের কাছ হ'তে চায় না !

মনে হ'ল—আমাদের জীবনে যদি ঐ রকম "নিকটেই বটেক্" বলে পথ দেখাবার একজন অবুঝ্ লোক থাকৃত তা হ'লে হয়তো সংসারের অনেক কাজই আজ এগিয়ে থাকৃত।

যা হোক, বহু কষ্টে, ভয়ে ভয়ে ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করে সাঁঝের বেলায় দূর থেকে বোলপুরের দেখা পেয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম।

সন্ধ্যা বেলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে উঠলাম। শান্তিনিকেতনের ব্রতী বালক আমাদের থাকবার যায়গা দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে আমাদের তত্ত্বাবধানে রত হ'ল। বালক বেচারী তার ছোট্ট দেহ ও মন দিয়ে আমাদের স্থখ-স্থবিধার জন্য মহা ব্যস্ত হয়ে উঠ্ল। তার এই ব্যবহার সত্যিই প্রশংসনীয়।

একটা কথা আপনাদের জানাতে ভুলে গিয়েছি ; আমাদের সাথী শিবব্রহ্ম, ওরফে মামা হচ্ছে এখানকার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। কাজেই এখানকার প্রতি অণু-পরমাণ ছিল মামার নিতান্ত পরিচিত ও আপনার। তাই সে আমাদের রেখে, পথের ক্লান্তিকে দূরে সরিয়ে ফেলে পরিচিতদের কাছে ছুটে গেল।

কিছুটা পর মামা এসে খবর দিলে,—"ওরে সব, পয়সা দে, টিকিট কিনে আনি।"

জিজ্ঞাসা করলাম,—"কোন্ সিনেমার রে ?"

মামা হেসে উত্তর করলে,—"সিনেমার নয় রে, রাতের বেলায় খাবি যে, তার টিকিট আন্তে হবে।"

রাত প্রায় নটার সময় ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠ্ল। ব্রতী বালকটী কোথা থেকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে এসে বল্লে,—"চলুন, খাবার ঘণ্টা পড়েছে।"

খাওয়ার পালা শেষ করে যখন শুতে যাচ্ছি ঠিক এমনি সময় বৈতালিক গানের স্থর উঠ্ল। ভারী চমৎকার লাগছিল তাদের সেই স্থমধুর গান।

* * * *

৭ই পৌষ। আজ থেকেই উৎসব স্থরু হ'ল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ওদেরই গানের স্থরে আমাদের ঘুমের আঁধার কাট্‌ল।

এইবার দিনের আলোয় নিকেতনের সম্পূর্ণ ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠ্ল। কল্পনায় অনেক কিছুই ভেবেছি, আজ চাক্ষুষ দেখে তৃপ্ত হলাম।

ভোরে চায়ের পালা সেরে মন্দিরে গিয়ে উঠলাম। এইখানে গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ) আজ উপদেশের বাণী শোনাবেন। মন্দিরের দ্বারের পাশেই একজন চন্দনের বাটী নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা দরজার সামনে আসতেই তিনি একটী ফুলে সেই চন্দন মাখিয়ে মাখিয়ে আমাদের কপালে পরিয়ে দিতে লাগলেন।

গুরুদেবের বক্তৃতা স্থরু হ'ল। তার সার অংশটুকু এই—

"ঈশ্বরের হাস্য মুখ দেখিবারে পাই
ভাইকে দেখিতে পায় যে আলোকে ভাই।"

বক্তৃতা শেষ হ'লে পর আমরা উত্তরায়ন, শ্যামলী (কবির বাড়ী), কলাভবন—এই সমস্ত দেখে বেড়ালাম।

৭ই, ৮ই, ৯ই—এই তিন দিন নিকেতনের সামনে মস্ত বড় মেলা হয়। এই মেলা 'পৌষের মেলা' নামে প্রসিদ্ধ। বিকেলের দিকে আমরা এই মেলার ভেতরে ঘুরে বেড়ালাম, জিনিষপত্তর কিনলাম, হৈ-হৈও ক'রলাম। শেষ পর্য্যন্ত বঙ্কিম আর প্রফুল্লর তুষ্ট বুদ্ধি আমাদের নাগরদোলায়

পর্য্যন্ত ঘুরপাক খাওয়াল। মেলার একটা জিনিষ আমাদের বড্ড আকর্ষণ করছিল—সেটা হচ্ছে দল বেঁধে সাঁওতালদের নাচ।

৯ই পৌষ। আমরা মিঃ বি, এম্, সেনের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। তাঁদের মধুর ব্যবহার চিরকাল মনে থাকবে।

১০ই পৌষ। ভোরের বেলা শান্তিনিকেতনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার আমাদের দ্বিচক্রযানের আশ্রয় নিলাম।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(২০)

মানুষ-কল, না জাঁতি-কল ?

হুকা-কাশির কথা মত মিষ্টার বাসু আবার নূতন করিয়া চিঠি লিখিলেন; তার পর সেখানা খামে ভরিতে ভরিতে বলিলেন, "চিঠি পোষ্ট বোধ হয় আমাদের নিজের হাতেই করা উচিত হবে! কি বলেন?"

"নিশ্চয়, সে বিষয়ে কি আর মতদ্বৈধ আছে? কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা জিনিষ দেখাতে চাই; একটু কষ্ট করে দরজাটা একবারটি ঠেলে দেবেন কি?"

মিষ্টার বাসু পা বাড়াইয়া দরজার পাল্লাটা জোরে ঠেলিয়া দিলেন, খট্ করিয়া কপাট বন্ধ হইয়া গেল। এ হোটেলের সমস্ত দরজাই প্রায় সাহেববাড়ীর অনুকরণে তৈরী; একখানা করিয়া প্রকাণ্ড পাল্লা—মোটর গাড়ীর দরজার মত জোরে ঠেলিয়া দিলেই সেখানা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। আবার হাতল ঘুরাইয়া খুলিতে হয়। ল্যাচ্ কীর বন্দোবস্ত আছে—ভিতর বাহির দুদিক্ হইতেই চাবি ঘুরাইয়া কপাট বন্ধ করা চলে।

ঘরের চারিদিক্ বেশ নিরাপদ্ হইয়াছে দেখিয়া এইবার হুকা-কাশি তাঁর সুটকেশ্ খুলিয়া চৌকামত একখানা কার্ড্বোর্ড্ বাহির করিলেন, তার পর সেখানা মিষ্টার বাসুর হাতে দিয়া কহিলেন, "বেশ করে এটা একবার দেখুন দেখি!"

মিষ্টার বাসু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানান্ ভাবে সেটিকে দেখিয়া নিয়া কহিলেন, "আপাতঃ-দৃষ্টিতে এটা তো দেখ্ছি একখানা ফটো! অদৃশ্য আর কিছু লুকোন আছে নাকি এতে? সাম্নে

একটা লোককে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার আশপাশে বড় বড় মুখ-বাঁধা বস্তার মত ওগুলো কি?"

"ওগুলো লক্ষ্য কর্বার কোন দরকার নেই আপনার, যেটা দেখ্তে পাচ্ছেন বলে বল্ছেন, সেইটের দিকেই আরো ভাল করে নজর দিন, কেননা…"

হুকা-কাশির সবগুলি কথা মিষ্টার বাসুর কানে বোধ হয় ঢুকিল না—দেখিতে দেখিতে তাঁর চোখের তারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মিষ্টার হুকা-কাশি, এ লোকটি যে আমার একেবারে অচেনা, তা তো নয়, একে তো আমি দেখেছি—আজই—এই বেনারস সহরেই।"

হুকা-কাশি হাসিয়া বলিলেন, "তাতে কিছুই আশ্চর্য্য হবার নেই মিষ্টার বাসু। যে সব মহাবীরের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধঘোষণা করেছি ইনি তাঁদেরই একজন। ওদের পরিচয় পেতে আমাদের যেমন আগ্রহ, আমাদের খবরাখবর পেতেও ওদের যে তার চাইতে কিছু মাত্র কম আগ্রহ নেই, তা তো এরই মধ্যে টের পেয়েছেন! তা, কোথায় দর্শন মিল্ল এ পুণ্যাত্মাটির?"

"এই বাড়ীরই সাম্নেকার রাস্তায়। রণজিৎ বাবুর দুঃসংবাদ পাওয়ার পর আপনি-তো আমার হোটেলে ফের্বার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়্লেন! আমি ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিছানায় পড়ে রইলাম, কিন্তু মনে অশান্তি, বিছানা ভাল লাগ্ল না; পাইচারি কর্বার উদ্দেশ্যে বারান্দায় উঠে গেলাম। খানিক বাদেই দেখি এই মহাপ্রভু হোটেলের আশপাশে উঁকিঝুঁকি মার্ছেন। ভিতরে ঢোক্বার ইচ্ছা পূরোমাত্রায়, অথচ ভরসা পেয়ে উঠ্ছেন না। আঃ, তখনই গিয়ে যদি ধর্তাম ব্যাটার টুঁটি চেপে! কি ভুলই না হয়ে গেছে!"

"দোহাই মিষ্টার বাসু, ও কাজটি কখনও কর্বেন না, কক্ষণো নয়! রণজিৎ বাবুর বেঁচে থাক্বার আশা যদি বা কিছু থেকে থাকে, এর পর তা' হলে আর তাঁকে কোন রকমেই ফিরে পাব না। আর তা' ছাড়া আপনার দাদার সোনার হরিণ উদ্ধারের আশাও একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হবে। সেটাকে হজম কর্তে যদি এরা নাও পারে, গঙ্গার জলে যে ফেলে দেবে সে কথা নিশ্চিত জান্বেন। আদালতে গ্রাহ্য হতে পারে এমন কি প্রমাণ আছে আপনার এদের বিরুদ্ধে বলুন দেখি!"

মিষ্টার বাসু কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ চোখ টিপিয়া তাঁকে থামিতে বলিয়াই হুকা-কাশি উচ্চস্বরে হাঁকিলেন, "কে"?

হুকা-কাশি এতক্ষণ কথা বলিয়া যাইতেছিলেন বটে, কিন্তু চোখ দুইটি তাঁর সারাক্ষণই পড়িয়া ছিল দরজার গায়ে চাবি গলাইবার ছোট্ট ফোকরটির উপর। সেই ফাঁক দিয়া এতক্ষণ বাহিরের আলো দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ সে আলো ঘুচিয়া গেল, পরিবর্ত্তে দেখা দিল অন্ধকার।

স্পষ্টই বোঝা গেল, বাহিরের কোন লোক রন্ধ্রপথে ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা পাইতেছে। অবশ্য, ইচ্ছা করিলে সে পথে চাবি লাগাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখার একমাত্র পথটুকু আগে হইতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিত, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই হুকা-কাশি এ চাতুরীটুকু খেলিয়াছিলেন। বাস্তবিকই রন্ধ্রপথে কোন লোক উঁকি দিতে আসে কিনা সেইটিই পরীক্ষা করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

হাতে একটা জাঁতি-কল

মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকার চলিয়া গেল, দেখা দিল আবার আলোর রেখা। দু'তিন মিনিট কাল চারিদিক্ নিস্তব্ধ, তার পরেই দরজায় ধীরে ধীরে কয়েকটি ঘা পড়িল। হুকা-কাশি উঠিয়া গিয়া আস্তে আস্তে দরজাটা খুলিয়া দিয়াই একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন—হোটেলের যে চাকরটার উপর তাঁদের খবরদারি করার ভার পড়িয়াছিল, ঘরে সে-ই ঢুকিতেছে—তার হাতে একটা জাঁতি-কল। মিষ্টার বাসু কিছুই টের পাইলেন না, কিন্তু হুকা-কাশির অভ্যস্ত চক্ষু আরও লক্ষ্য করিল, কোন একটা অপকর্ম্ম করিতে আসিয়া হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেলে লোকের মুখে যে কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব ফুটিয়া ওঠে, চাকরটার মুখে তার স্পষ্ট আভাসই রহিয়াছে।

হুকা-কাশি বাহিরে কিন্তু কোনই বিরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন না, বরং সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—অবশ্য হিন্দিতে—"কি চাই হে? জাঁতিকলে কি হবে?"

চাকর হিন্দুস্থানী ভাষায় উত্তর দিল, "হুজুর, এ ঘরটায় বড় ইঁদুরের উৎপাত, তাই এ কলটা পেতে রাখ্‌তে এসেছি; নইলে আপনাদের জিনিষপত্র সব কেটেকুটে একাক্কার করে দেবে।"

"ওঃ, ম্যানেজার বাবু বুঝি তাই কল পেতে রাখ্‌তে বলে দিয়েছেন?"

"আজ্ঞে না, তিনি নতুন করে কিছুই বলেন নি। এ ঘরে যখনই কোন যাত্রী আসে তখনই আমরা ইঁদুর-মারা কল পেতে রেখে যাই। বরাবরই এ রকম ধারা চলে আস্‌ছে।"

"আচ্ছা, পেতে রাখ কল কোথায় পাত্‌বে।"

চাকর কল পাতিয়া, দরজা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। হুকা-কাশি একটু হাসিয়া মিষ্টার বাসুকে বলিলেন, "কেমন, একটু আগেই বল্‌ছিলাম না যে আমার সঙ্গে আপনি কে এলেন সে খবর বার কর্‌বার জন্য ওরা কি একটা কল পাত্‌বার কথা বলাবলি কর্‌ছিল! দেখ্‌লেন তো সে কলের নমুনা?"

"কি, এই জাঁতিকলটির কথা বল্‌ছেন? এরই সাহায্যে আমার নাম-ধাম গোত্র-বৃত্তান্ত সব জেনে ফেল্‌বে? বেজায় সায়েন্টিফিক্ শত্রু বলুন!" মিষ্টার বাসু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"রসুন, জাঁতি-কল, কি মানুষ-কল, আসল কল কোন্‌টা তা জান্‌তে এখনও বাকী আছে।···উঠে পড়ি, চায়ের অপেক্ষায় বসে থাক্‌লে আর চল্‌বে না, এক্ষুণি একবার বেরিয়ে পড়্‌তে হবে। বাস্তবিক, রণজিৎ বাবুর একটা খোঁজ না মেলা পর্য্যন্ত কোন কাজেই যেন আর মন বস্‌তে চাইছে না।"

(২১)

পুনশ্চ

হোটেলে ফিরিয়া আসিতে হুকা-কাশির বেশ কিছু রাত হইল; শরীর এবং মন কোনটার অবস্থাই তখন তাঁর বিশেষ সুবিধার নয়। রণজিতের সন্ধানে বাহির হইয়া এক নতুন সন্দেহের আভাস তিনি পাইয়া আসিয়াছেন. সেই কথাই নানান্ ভাবে তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় উপস্থিত করিয়াছে। তা ছাড়া দেহে শ্রান্তিরও সীমা নাই। রাত্রে যৎসামান্য কিছু খাইয়াই তিনি শুইয়া পড়িলেন, ঘুম ভাঙ্গিল পর দিন বেলা আটটায়। মুখ-হাত ধুইয়া এককাপ চা খাওয়ার পরও শরীর বেশ সুস্থ হইল না, ইজিচেয়ারের উপর চুপচাপ তিনি পড়িয়া রহিলেন।

দুপুরে আঁচাইয়া উঠিয়া একটা চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বাসু বলিলেন, "আপনার হ'ল কি, মিষ্টার হুকা-কাশি, সেই সকাল থেকে পড়ে পড়ে খালি ঝিমুচ্ছেন; নাইলেন না, ভাতও খেলেন না, ব্যাপার কি? জ্বরটর হয়নি ত?"

হুকা-কাশি ঘরের কোণ হইতে জাঁতিকলটি আনিয়া নানা ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটি দেখিতেছিলেন, জবাব দিলেন, "না,' বিকেলবেলা দিয়েই সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌ব আশা করি।—কল্‌টায় কোন যাদুমন্ত্র পড়া আছে নাকি ভাব্‌ছি।"

মিষ্টার বাসু চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে "দেখি" বলিয়া জাঁতিকল্‌টা নিজের হাতে

তুলিয়া লইলেন। হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তেই এক বিষম বিপত্তি ঘটিয়া গেল; কলের মধ্যে যেখানে খাবার রাখিয়া ইঁদুরকে প্রলুব্ধ করা হয়, আল্‌গোছে সেখানে যেই তিনি একটুখানি আঙ্গুল ঠেকাইয়াছেন, অম্‌নি দু'ধার হইতে জাঁতিকলের দুইটি ধার আসিয়া তাঁর হাতখানা অসম্ভব জোরে চাপিয়া ধরিল।

"উঃহুঃ হুঃ" বলিয়া মিষ্টার বাসু যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন; দরদর করিয়া রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। হুকা-কাশি লাফাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি জাঁতিকলের দুই ধার দু'হাতে ফাঁক করিয়া ধরিলেন, মিষ্টার বাসু হাত উঠাইয়া আনিলেন। পকেট হইতে পরিষ্কার রুমাল বাহির করিয়া বাসুর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে হুকা-কাশি বলিলেন; "কি ভীষণ অবস্থাতে কলটা রয়েছে দেখেছেন, হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার! রাত্রে বেশ যন্ত্রণা হবে। তা ছাড়া হোটেলের কল, কত ইঁদুর মারা পড়েছে কে জানে? তাদের রক্তও সব সময়ে ঠিকমত ধোয়া হয়েছে কিনা তাই বা কে বল্‌বে? এ অবস্থায় কোন ডিস্‌পেন্সারীতেই একবার যাওয়া উচিত মনে কর্‌ছি; চলুন বেরিয়ে পড়া যাক্‌।"

ডিস্‌পেন্সারী হইতে ফিরিবার সময় সারাটি পথই হুকা-কাশিকে বিশেষ চিন্তামগ্ন বলিয়া মনে হইল। বেলা একেবারে পড়িয়া আসিতেছিল, হোটেলে ফিরিয়াই তিনি বলিলেন, "সন্তোষ বাবুকে একখানা চিঠি লিখে দেব মনে কর্‌ছি—সলিল বাবুর সম্বন্ধে।"

"কেন, সলিলের কি হয়েছে? তার সম্বন্ধে সন্তোষের কাছে চিঠি কেন?" মিষ্টার বাসু সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমার কেমন মনে হচ্ছে হয়তো সলিল বাবু হঠাৎ একদিন সশরীরেই এখানে এসে উপস্থিত হয়ে পড়্‌বেন। তাই সন্তোষকে লিখে দেওয়া—পাঁচ-সাত দিন আমাদের কোন খবরাখবর না পেলেও ওখানে কেউ যেন ব্যস্ত না হয়ে ওঠেন। বেশ, আমি না লিখ্‌লাম, আপনার জবানীতেই চিঠি লিখে দেওয়া যাক, অর্থাৎ আমি লিখে দিই, আপনি সই করে দেবেন'খন।"

শেষের এই প্রস্তাবটি কিন্তু মোটেই কার্য্যকরী হইল না, কেননা মিষ্টার বাসু বাঁ হাতে নাম লিখিতে গিয়া এমনই চমৎকার লিখিলেন যে হুকা-কাশি হাসিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন, "এ চিঠি না পাঠানই ভাল; বাড়ীর সবাই ভাব্‌বে আপনার হাতখানা বুঝি এরা বারুদ দিয়েই উড়িয়ে দিয়েছে। তার চাইতে আমিই লিখি।"

হুকা-কাশি আবার নূতন করিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন; চিঠির শেষে কেবলমাত্র সন্তোষেরই উদ্দেশ্যে একটা নিতান্ত গোপনীয় "পুনশ্চ" রহিল। এই "পুনশ্চ"টুকু এতই গোপনীয় যে মিষ্টার বাসুর কাছেও সেটুকু প্রকাশ করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না। চিঠিখানা খামে

মুড়িয়া কহিলেন, "আমি যাই, এখানা নিজে হাতে ডাক-ঘরে ফেলে দিয়ে আসি গে'। আপনি ইচ্ছে কর্‌লে একটু বাইরে ঘুরে আস্‌তে পারেন, কিন্তু সর্ব্বদা মূল কথাটি মনে রাখ্‌বেন—গলিঘুঁজি এড়িয়ে সর্ব্বদা বড় রাস্তায় চল্‌তে হবে, এটি ভুল্‌বেন না। ছ্যাঁচ্‌ড়া গুণ্ডা বলে এদের তাচ্ছীল্য কর্‌বেন না একেবারেই। মাথা-ওয়ালা লোক যে এদের চালাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। আর বাইরে না বেরিয়ে যদি পারেন সে তো ভালই; ম্যানেজার বাবু সময় কাটাবার জন্য কতগুলো বই পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওই সেল্‌ফের ওপর সেগুলো আমি তুলে রেখেছি—ইচ্ছে কর্‌লে ওগুলো ওল্‌টাতে পারেন! কিন্তু" হুকা-কাশি গলার স্বর খাটো করিয়া আনিলেন, "জাঁতিকলবাহী চাকর নাথ্‌নি সম্বন্ধে খুব হুঁসিয়ার।"

হুকা-কাশি ফিরিলেন খুবই তাড়াতাড়ি। ঘরের কপাট বন্ধ ছিল। নাথ্‌নি-প্রভুর আবির্ভাব হয় নাই তো! চাবি গলাইবার ফোকরে তিনি চোখ লাগাইলেন—তা নয়, মিষ্টার বাসু একাই ঘরে রহিয়াছেন। একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি দরজায় ঘা দিলেন, মুখে বলিলেন, "দোর খুলুন মিষ্টার বাসু, আমি হুকা-কাশি। খুব জরুরী একটা খবর আছে।"

ঘরে ঢুকিয়াই হুকা-কাশি অতিমাত্রায় ব্যস্ততার সহিত বাসুকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে এক্ষুণি একবার বার হতে পারবেন মিষ্টার বাসু, এই মুহূর্ত্তেই, কাপড়-জামা যেমন পরা আছে সেই অবস্থাতেই?"

"নিশ্চয়ই, কেন পারব না?"

"তবে চলে আসুন" বলিয়া বাসুর হাত ধরিয়া তিনি একেবারে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তার পর তাঁর কানের কাছে মুখ আনিয়া খুব আস্তে আস্তে বলিলেন, "দু'জনার এক সঙ্গে বার হওয়া চল্‌বে না। হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে যে তৃতীয় ল্যাম্প্‌-পোষ্টটা পড়্‌বে তারই তলায় আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন গে'; মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই কোন ছুতোয় আমি বেরিয়ে আস্‌ছি।"

মিষ্টার বাসু সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেলেন, হুকা-কাশি দরজা বন্ধ করিয়া মিনিট দুই কাল চুপ করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর নীচে নামিয়া এমন একটা ভাব দেখাইলেন যাতে হোটেলের সকলে মনে করিতে পারে, বুঝি তিনি বাড়ীর বাহির হইয়া গেছেন। আসলে কিন্তু তখনই তিনি বাড়ীর বাহির না হইয়া সিঁড়ির পিছনে জুতাজোড়া খুলিয়া রাখিয়া খালি পায়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

কিন্তু উপরে আসিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন, তাঁদের ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা, ভিতরে পূরামাত্রায় অন্ধকার, তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া চাকর নাথ্‌নি বইয়ের শেল্‌ফের উপর ঘন ঘন টর্চ্চের আলো ফেলিতেছে। হুকা-কাশি মনে মনে হাসিলেন, নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন; "বাছা,

কোন্ বইয়ের সন্ধানে তুমি এসেছ তা আমার অজানা নেই—উঁহুঁ, উঁহুঁ, ওটা নয়, ওই লালটা : হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে এবার।”

নাথ্‌নিও লাল বইয়ে হাত দিল, সঙ্গে সঙ্গে হুকা-কাশিও তার ঘাড়ে হাত রাখিলেন। হঠাৎ ভূতের স্পর্শ পাইলে লোকে যেমন চম্‌কাইয়া ওঠে ঠিক সেই ভাবেই একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া নাথ্‌নি ধপাস্ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

বড়ই জটিলতার সৃষ্টি হইল দেখিতেছি!

(ক্রমশঃ)

সন্দেশ

এবারকার “খেলাধূলা” প্রবন্ধে তোমাদের বিলাতে ক্রিকেট-ম্যাচে ভারতীয়দের একটি মাত্র জয়ের কথা বলা হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ ছাপা হইবার পর সম্প্রতি আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত খেলায়ও ভারতীয় দল দশ উইকেটে জয়লাভ করিয়াছেন। খেলার ফল এইরূপ হইয়াছে—আয়ার্ল্যাণ্ড—১ম ইনিংস্‌এ ১৬১, ২য় ইনিংস্‌এ ১১৯। ভারতবর্ষ—১ম ইনিংস্‌এ ১৫০, ২য় ইনিংস্‌এ একজনও আউট্ না হইয়া ১৩১।

* * *

১৯২৭ সনে উত্তর আফ্রিকার একটি মরূদ্যানে আবহাওয়ার উত্তাপ ১৫৮'৮ ডিগ্রী হইয়াছিল। সেখানকার লোকেরা কিন্তু তাহাতেও টিকিয়া ছিল।

* * *

শ'খানেক বছর আগেকার কথা। ফরাসী দেশে পল্ হিউবার্ট্ নামে একটি লোক খুনের দায়ে পড়ে। বিচারে প্রথমে তার হয় প্রাণদণ্ড, তার পর পুনর্ব্বিচারে সেটা বদ্‌লাইয়া করা হয় যাবজ্জীবন্ কারাদণ্ড।

২১ বছর জেল খাটিবার পর জানা গেল বেচারা নিজেকেই খুন করার দায়ে জেল খাটিতেছে—অর্থাৎ যাকে খুন করা হইয়াছে সে এবং আসামী একই লোক। বলা বাহুল্য অতঃপর কর্ত্তারা তাকে জেল হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন।

* * *

তোমাদের মধ্যে যারা একটু বেশী অঙ্ক জান তারা এই অঙ্কটির উত্তর লেখ তো—

$৯^{৯^{৯}}$ = কত?

অঙ্কটি খুবই সহজ, কিন্তু যাঁরা যাঁরা উত্তরটি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁরা বলেন উত্তরটি পাশাপাশি লিখিতে ১১৬৪ মাইল্ লম্বা একখানি কাগজের দরকার।

* * *

‘সোডিয়াম্’ ধাতুর নাম তোমরা অনেকেই হয়তো শুনিয়াছ। অনেক জিনিষের মধ্যেই সোডিয়াম্ আছে, আমরা যে নূন খাই তার মধ্যেও আছে। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

স্যর হাম্‌ফ্রী ডেভি প্রথম এই ধাতু আবিষ্কার করেন। এই সোডিয়াম্ বড় অদ্ভুত ধাতু। কেরোসিনের মধ্যে যদি ইহাকে ডুবাইয়া রাখ, দেখিবে দিব্যি রহিয়াছে কিন্তু কখনও যদি জলের মধ্যে ডুবাইয়া দাও অমনি এই ধাতু দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে!

* * *

ভারতবর্ষের মধ্যে আকারে সব চেয়ে বড় জেলা হইতেছে মান্দ্রাজের ভিজাগাপট্টম্ জেলা; বাংলাদেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় জেলা ময়মনসিংহ। এই জেলার লোকসংখ্যা সমস্ত অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী।

* * *

ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বড় দেশীয় রাজ্য হইতেছে কাশ্মীর ও জম্মু, সব চেয়ে ছোট রাজ্য ‘লাওয়া’ (রাজপুতানায়)।

* * *

জন্তুদের মধ্যে কচ্ছপ খুব দীর্ঘায়ু—অনেক কচ্ছপ ৩০০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় দু'টি খুব প্রাচীন কচ্ছপ আছে। কুমীর এবং তিমি মাছও ঐ রকম দীর্ঘায়ু। হাতীও সময়ে সময়ে ২০০ বছর বাঁচে দেখা গিয়াছে। ঘোড়া সাধারণতঃ ১৫ হইতে ৩৫ বছর বাঁচে; কুকুর ১০ হইতে ১৫, বিড়াল ১০ হইতে ১৫, ছাগল ১২ হইতে ১৫, খরগোস ৭ হইতে ১২ এবং ইঁদুর ৩ হইতে ৪ বছর বাঁচে। এমন অনেক পোকা আছে যাদের আয়ু কয়েক দিন, বা কয়েক ঘণ্টা, এমন কি কয়েক মিনিট।

* * *

প্রসিদ্ধ রুষ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম্ গোর্কির মৃত্যু হইয়াছে। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে গোর্কির আসন খুবই উঁচুতে। তাঁর ‘মা’ প্রভৃতি বই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলির অন্যতম।

* * *

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর বীরবল সাহ্‌নি সম্প্রতি বিলাতের রয়াল সোসাইটির ফেলো হইয়াছেন (F.R.S.)। তাঁর আগে আর চার জন মাত্র ভারতবাসীর ভাগ্যে এই সম্মানলাভ ঘটিয়াছে—প্রথম পাইয়াছেন রামানুজম্, তার পর স্যর জগদীশ বসু, স্যর সি, ভি, রমন এবং ডাঃ মেঘনাদ সাহা।

* * *

আজকালকার দিনে চলাফেরার জন্য যত রকম যানবাহন আছে তার মধ্যে এরোপ্লেন্ সব চেয়ে দ্রুতগামী। এরোপ্লেনের বেগ যা'তে আরও বাড়ান যায় অনেক দিন হইতেই পণ্ডিতেরা সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। বাতাসের চাপ এরোপ্লেন্ তাড়াতাড়ি চালাইবার একটা বড় বাধা, তাই বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন, আকাশের অনেক খানি উপরে—যেখানে বাতাসের চাপ খুব কম—এমন জায়গা দিয়া চলিতে পারে এই ভাবে তাঁরা এরোপ্লেন্ তৈরী করিবেন। অবশ্য উহাতে একটা অসুবিধা আছে; আকাশে যত উপরে উঠা যায় ততই বাতাসের অভাবে নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাঁরা ঠিক করিয়াছেন তাঁদের এরোপ্লেন্ সম্পূর্ণ ভাবে ‘এয়ার টাইট্’ রাখিবেন, আর ভিতরেও অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখিবেন। এ রকম একখানি এরোপ্লেন্ নাকি ৬।৭ ঘণ্টায়ই নিউ-ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে উড়িয়া যাইতে পারিবে।

ডক্টর স্যামুয়েল ব্রোডি নামে একজন লাগে। তিনি বলেন, বেশী পরিশ্রম করিতে আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক নানা পরীক্ষার পর না দিলে একটা হাতীকে দু'টি বলিষ্ঠ ঘোড়ার ঠিক করিয়াছেন যে, যে প্রাণী আকারে উপযুক্ত খাবার দিলেই বেশ সবল ও সুস্থ রাখা যত বড় তার খাবার সেই অনুপাতে তত কম যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

রা=২, ম=৫, ধ=৪, নু=১, সা=৩, গ্র=৬, হে=৭,
প=০, ড়ি=৮, ছে=৯

প্রথমেই '১'টি বাহির করা যায়, কারণ, 'রামধনু'কে ১ দিয়া গুণ করিলে 'রামধনু' হয়। 'নু' অক্ষরের বদলে '১' বসাইয়া '৯' বাহির করা সহজ হইবে (ছে)। এই ভাবে সহজেই অঙ্কটির অক্ষর বাহির করা যাইবে।

উত্তরদাতাদের নাম

রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর) : সুমিত্রা, সুলেখা, সুজাতা (রংপুর) ; অনিল ও অরুণেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (রাজসাহী) ; বিজনবিহারী হার (ফরিদপুর) ; বেলা, পচু, জুলি প্রভৃতি (কলিকাতা) ; রামপ্রসাদ সিং, বলাই, কাটু প্রভৃতি (বেহালা) ; বিষ্ণুপদ স্মৃতিপাঠাগারের সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দ (শালিখা) ; মা, পাঁপড়ি, নির্ম্মল সেন (গোপালগঞ্জ) ; অরুণা সেন (কলিকাতা) ; সুজাতা, মালতী, পার্ব্বতী প্রভৃতি (বাগবাজার) ; কালী, তারা রাখাল প্রভৃতি (নীলফামারি) ; রবীন্দ্রনাথ দে (মধুবনী) ; অরুণকুমার মজুমদার (চাইবাসা) ; রত্না দেবী (পাটনা) ; প্রমথ, সত্য, যোগেন প্রভৃতি (নডিহা) ; শৈলেশকুমার বসু (কলিকাতা) ; বাসন্তী, কল্যাণী ও নীহার দত্ত প্রভৃতি (শ্রীহট্ট) ; ভবানী, বাণী, কল্যাণী প্রভৃতি (ধুবড়ী) ; মৃতুলানন্দ দাশগুপ্ত (কুষ্টিয়া) ; প্রতাপকুমার রায় (মেদিনীপুর) ; অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাণীমন্দির, মুড়াগাছা) ; হরেন্দ্র, অমরেন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতি (হাইলাকাঁদি), সিদারাণী, পুষ্পিতা, কুসুমিতা মিত্র প্রভৃতি (লক্ষ্ণৌ) ; নীরদ ও অমলবরণ রায় (সাটীরপাড়া) ; লীলা দাস, বেলা গাঙ্গুলী (কুমিল্লা) ; যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (পাটনা) ; ছায়া দেবী (খুলনা) ; সুনীলকুমার গোস্বামী, রেণু, মলিনা (গয়া) ; সিতেন্দু গুপ্ত (স্বর্ণাসন, পাটনা) ;

অমলেন্দু, কাজল, নির্ম্মল প্রভৃতি (বালিগঞ্জ) ; জগদীশচরণ বক্সী (করকেন্দ কলিয়ারি) ; প্রমোদ, প্রভাত, প্রতুল প্রভৃতি (জামসেদপুর) ; মনোতোষ রায় (ভবানীপুর) ; যামিনী, পুষ্পলতা, পাঁচুগোপাল ঘোষ (শ্যামনগর) ; ডলি, তুলতুল, কাজল (রংপুর) ; প্রতিমা চৌধুরী (পাটনা) ; বিমলেন্দু ও শৈলেন্দুনারায়ণ রায় (জেমো রাজবাটী, মুর্শিদাবাদ) ; বিদ্যাপীঠের বালকবৃন্দ (দেওঘর) ; সনু, মনু, মোহন প্রভৃতি (কলিকাতা) ; নির্ম্মলকুমার দাস (ক্লাক্ ষ্ট্রীট্) ; মণি দাস (ডিব্রুগড়) ; বাণীপ্রসাদ দত্ত (ভবানীপুর) ; দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা) ; আভা, অরুণ ও গোপাল (হাসনাবাদ) ; চিত্তরঞ্জন, মনোরঞ্জন, বিবেকরঞ্জন (বর্দ্ধমান) ; ধীরেন্দ্রনাথ কর (নরোত্তমপুর) ; নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিন ষ্ট্রীট্) ; শীলা দেবী, সুপ্রভা, দুর্গা প্রভৃতি (কলিকাতা) ; রতনকুমার ও প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর) ; কালীকুমার ইন্‌ষ্টিটিউশনের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (সাটীরপাড়া) ; অনিলকুমার জোয়ারদার (বাণীমন্দির, যশোহর) ; অরুণকুমার গোস্বামী, অশ্বিনী, অমিয় (বাণীগ্রাম) ; ছবিরাণী রায় (সিমলা) ; বেণু, নীলকমল, বিমলেন্দু প্রভৃতি (যোড়হাট) ; অনিলকুমার ও সুধীরকুমার দাস (ভবানীপুর) ; পারুল, ননী, বলাই প্রভৃতি (কুড়িগ্রাম) ; প্রীতিময় ও রেণুকা কর (শ্রীহট্ট) ; সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্ম্মীগণ (বালি) ; নিখিল চৌধুরী (জলপাইগুড়ি) ; সত্যচরণ দত্ত (ভবানীপুর) ; অমলেন্দুনারায়ণ বিশ্বাস, বিমল, বেণু প্রভৃতি (কালীঘাট) ; খোকা, বোচা, কানু প্রভৃতি (ঢাকা) ; অজিতকুমার রায় চৌধুরী (বানিয়াখামার) ; দীনেশ ও সুবোধ (সৈদপুর) ; দিদা, মঞ্জু, রুবী চাটার্জ্জি (ভাগলপুর) ; করুণাময় কাঞ্জিলাল, মহাদেব, রেণু প্রভৃতি (হকড়া) ; দি ভৌমিক্‌স্ (কলিকাতা) ; অক্ষয় বিশ্বাস, শান্তি মিত্র (কলিকাতা) ; গণপতি মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) ; প্রফুল্ল, সুমুথনাথ ও রাণী মিত্র (কলিকাতা) ; তপন ও সবিতা (রেঙ্গুন) ; রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) ; প্রতাপকুমার রায় (মেদিনীপুর) ; গোপাল, পৈলী ও কালিদাস খাঁ (শিলং) ।

নূতন ধাঁধা

বাচ্চুকে তার মা দশ আনা পয়সা দিয়ে বল্লেন, "এ দিয়ে বাজার থেকে ফল কিনে নিয়ে আয়। ৪০টার কম যেন না হয়।" বাচ্চু বাজারে গিয়ে দেখ্‌ল নানা রকম ফল আছে, তাদের নানা রকম দাম। বাচ্চু আপেল, কলা আর গোলাপ জাম পছন্দ কর্‌ল। আপেল এক-একটার দাম দু' আনা, কলা এক-একটা এক পয়সা, গোলাপ জাম এক পয়সায় দুটো। বাচ্চু দোকানদারকে

বল্‌ল, "এই তিন রকম ফল মিশিয়ে আমায় ৪০টা ফল দাও, কিন্তু দাম যেন ঠিক দশ আনা হয়।" বল তো দোকানদার কোন্ ফল ক'টা দেবে?

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

(১) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২) লাহোরে (৩) মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ (৪) কাপড় তৈরীর জন্য (৫) (ক) টিল্‌ডেন—আমেরিকাবাসী, বিখ্যাত টেনিস্ খেলোয়াড় (খ) পেরি—ইংল্যাণ্ড্‌বাসী, টেনিস্ চ্যাম্পিয়ান্ (গ) পন্স্‌ফোর্ড্—ক্যানাডাবাসী, বিখ্যাত ক্রিকেট্ খেলোয়াড় (ঘ) কার্পেনটিয়ার—ফ্রান্সবাসী, বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা (ঙ) লিণ্ড্‌বার্গ—আমেরিকাবাসী, বিখ্যাত বৈমানিক (চ) বেটোফেন (Beethoven)—জার্ম্মেনীবাসী, বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা (Composer) (ছ) হানিবল—কার্থেজবাসী, বিখ্যাত সেনাপতি (জ) ফ্যারাডে—ইংল্যাণ্ড্‌বাসী, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। (৬) বার্ণার্ড্ শ, রম্যা রলাঁ, ন্যুট্ হাম্‌সুন্।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

রামধনু কার্য্যালয় (১৬, টাউনসেণ্ড্ রোড্) ঠিক ব্যবসায়-পল্লীতে নহে বলিয়া আমরা গত কয়েক বৎসর মেসার্স্ এইচ্, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং এ (শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট) রামধনুর বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা এবং চিঠিপত্র হাতে জমা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমরা ১বি, রসা রোডে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ) রামধনুর একটি শাখা কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছি। কাজেই এখন হইতে আর এইচ্ চাটার্জ্জি এণ্ড্ কোংএ রামধনুর চাঁদা বা চিঠিপত্র লইবার ব্যবস্থা রাখা হইল না। এইচ্ চাটার্জ্জি এণ্ড্ কোংএ গ্রাহকগণ যে সব সুবিধা পাইতেন তাহা তাঁহারা এখন হইতে রামধনুর শাখা কার্য্যালয়েই (১বি, রসা রোড্) পাইবেন। ডাকযোগে সমস্ত কারবার কিন্তু বরাবরকার মত রামধনুর মূল কার্য্যালয়েই (১৬নং টাউন্‌সেণ্ড্ রোড্) করিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, **রামধনু**

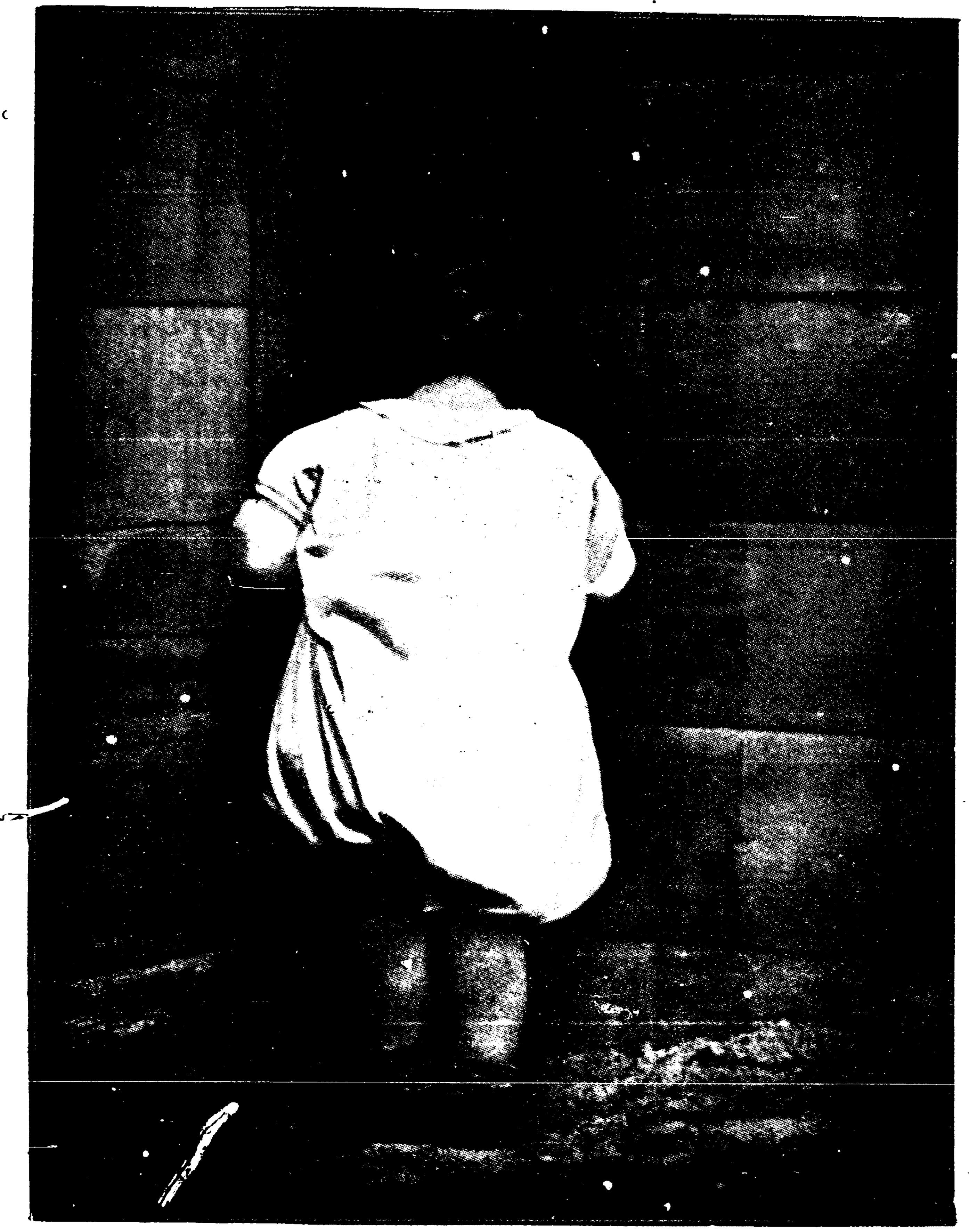

অভিমান

৯ম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৩ | ৮ম সংখ্যা

মেঘলা দিনে

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

উপন্যাসের দেশের লাগি
মনটা কেমন করছে আজ,
যোগাড় যদি করতে পারি
অশ্বটা ভাই পক্ষিরাজ,
যাব তেপান্তরের মাঠে
বুড়ী যেথায় কাট্‌না কাটে,
বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী—
ডাকিনীদের সেই সমাজ।

মন-পবনের ঘাটে যেথা
হিজল গাছে বাঁধ্‌ছে 'না',
রাজার ছেলে রাক্ষসীদের
চিন্‌তে মোটেই পারছে না।
হাতী-শালে কম্‌ছে হাতী,
কম্‌ছে সেনা, কম্‌ছে জ্ঞাতি,
সিন্দূরেতে পড়ছে না আর
লক্ষ্মী দেবীর স্বর্ণপাঁজ।

উপকথার সোনার সে দেশ
ক্রমেই উবে যাচ্ছে ভাই,
ইচ্ছা করে কোথায় গেলে
মধুর সে দেশ দেখ্‌তে পাই—
প্রভেদ হারায় সত্য, স্বপন,
সবই প্রকাশ, সবই গোপন,
অলীকের হায় অলকলতা
পরে কল্পলতার সাজ।

হিস্‌ট্রি রিপীট্‌স্—

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

আমার দাদা বিয়েতে অনেক জিনিস পেয়েছিলেন। খাট, টেবিল, লেপ-তোষক ইত্যাদি ছেড়েই দিলুম, খুচরো উপহার যা এসেছিল তাও অগুণ্‌তি। দাদার অনেক বন্ধু কিনা! বৌদি কলেজে-পড়া মেয়ে, তাঁরও জনা কুড়ি বন্ধু; কেউ

একটা ফুলদানি, কেউ একখানা আয়না অন্ততঃ দিয়েছিল তো! আস্ত একটা বেঙ্গল ষ্টোর্স খোলা যেতো, আছো কোথায়!

ঐত জিনিসের মধ্যে একটা টয়লেটের কাস্‌কেট থাকবে সে আর আশ্চর্য্য কি? সেই যে পুরু মখ্‌মলের বাক্সয় সিল্কের কাপড়ে খোপ-কাটা গর্ত্তে সাবান, এসেন্স্‌, চুলের তেল থাকে—এ ছাড়া তো আজকাল বিয়েই হয় না। বন্ধু-বান্ধব বেশী থাকলে ও-জিনিস একটার বেশীই পড়া সম্ভব।

দাদা তো রেগে আগুন! 'দূর করো, দূর করো ওটা আমার চোখের সামনা থেকে', এ ছাড়া তাঁর মুখে কথাই শোনা যায় না।

পিসিমা বলেন, 'আহা—তোকে কামড়াচ্ছে নাকি ওটা? বেশ তো সুন্দর, লাল রঙের আছে। বাবুগিরির ঘটা তো এদিকে কম নেই, ছেলের মেজাজ দেখো!'

'হ্যাঁঃ—ও তেল দিলেই মাথার সব চুল উঠে আসবে, আর সাবান যদি মাখো তো গায়ের চুলকোনিতে রাত্রে ঘুম হবে না। নিয়ে যাও তোমরা ওগুলো—অতই যখন পছন্দ তোমাদের!'

'কথা শোন ছেলের! আমি বুড়োমানুষ এখন তেল সাবান মাখতে যাই আর কি!'

কিন্তু দাদা ছাড়লেন না, ও জিনিসটা কাউকে দিয়ে দেবার জন্য রীতিমত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন তিনি। তাঁকে হঠাৎ যেন দানশীলতার ভূতে পেল। মনে আছে একবার বাড়ীতে আর সাবান ছিল না ব'লে তাঁর সাবান দিয়ে নেয়েছিলুম—কী প্রচণ্ড চোটপাট তার জন্যে! যেন আমাদের মত সাধারণ মানুষের গায়ে লেগে তাঁর সাবানখানা অস্পৃশ্যই হয়ে গেলো। আর সেই দাদা আজ একে ওকে সেধে বেড়াচ্ছেন—দরকার হ'লে পায়েও ধর্‌তে পারেন, এমনি ভাব।

অবশ্যি প্রথমে আমাকেই বেজায় পীড়াপীড়ি করেন।—'নে না, নে না নন্তু, এটা তোর ঘরে নিয়ে রাখ্‌। দেখ্‌, কত জিনিস আছে এতে, ফূর্ত্তিসে পাকা একটি মাস মাখতে পারবি।'

ইস্‌, ব'য়ে গেছে আমার নিতে! উনি যা ব্যবহারের যোগ্য মনে করেন, না,

তা-ই পেয়ে আমরা যেন ধন্য হবো! কেন, এম্-এ পাশ না-হয় এখনও করিনি, তাই ব'লে মানুষ তো! যত বোকা ভাবো তত বোকা নই। ঐ কাস্‌কেটগুলো ক'ড়ে আঙুল দিয়েও একদিন ছুঁয়ে দেখিনি।

বাড়ীতে লোক এসে বস্‌তে পারে না। এ কথা ও কথার পর দাদা বলবেনই: 'একটা কাস্‌কেট নেবে ভাই, ভারী সুন্দর। হাসছো? না, ফাজলেমি নয়—তুমি যদি নাও তা হ'লে আমি খুব খুসী হই, সত্যি।'

তার পর দাদা সত্যি-সত্যি কাস্‌কেটটা এনে ভদ্রলোকের হাতে দেন। ভদ্রলোক সেটা পাশে রেখে দিয়ে অন্য নানা রকম গল্প করেন। কিন্তু ওঠবার সময় ওঠেন খালি হাতেই।

—'এ কী! আপনার কাসকেট! কাসকেট!'

উত্তরে শুধু একটু হাসি, যার মানে ঠিক বোঝা যায় না। কে জানে, বাজে সাবান মাখলে তাঁরও হয়তো গা চুলকোয়। দাদা তো অপ্রস্তুত!

হতাশ হ'য়ে দাদা ওটা চাকরদের মধ্যেই চালাতে চান। ভেবেছিলেন ওরা লুফে নেবে, এবং এই আশাতীত সৌভাগ্যে জন্মের মত কৃতজ্ঞ থাক্‌বে। কিন্তু ওরাও দেখি কেউ কিছু বলে না। ভয় পেয়ে গেলো নাকি বোকারা? দাদাবাবুর এ আবার কোন্ ধরণের খেয়াল!

কথাটা বাবার কানে পৌঁছালো। তিনি দাদাকে বল্‌লেন: 'তোর কি একটু বুদ্ধি নেই অমু, চাকরদের সঙ্গে রসিকতা করিস্!'

দাদা মুখ আমসী ক'রে সেখান থেকে উঠে গেলেন। হুঁ-হুঁ, আমরাই শুধু বোকা! বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আমাকে দেখতে পেয়ে দাদা হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দিলেন: 'এই নন্তু, কী করছিস ওখানে দাঁড়িয়ে?'

আমি নির্ভয়ে জবাব দিলুম: 'কিছু না।'

'কিছু না! হাসছিস যে বড়? বেয়াদবি শিখছিস, না?'

তা হাসবো না তো কাঁদবো নাকি? আমাদের সবটাতেই দোষ—আমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, মুখ্যু মানুষ!'

এর পর দাদা প্রতিজ্ঞা করলেন ওটাকে জানলা দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন—

যাচ্চলে। কিন্তু বৌদিকে সে কথা বলতেই তিনি বল্‌লেন, 'তুমি কি পাগল? ভালো না লাগে কাউকে দিয়ে দিলেই তো পারো।'

'ওহো, তোমার পরামর্শ শুনে ধন্য হলাম! তোমার এই উপঢৌকন নেবার জন্য দেশশুদ্ধ লোক পাগল কিনা! যত সব বাজে ভাল্‌গার ইডিয়টিক জিনিস—'

দাদা আরো অনেক বড় বড় ইংরিজি শব্দ আওড়ালেন। তার পর বল্‌লেন: 'সঙ্গে একটা টাকাও দিতে পারি। বিজ্ঞাপন দেবো কাগজে।'

পরের দিন বেলা যখন সাড়ে ন'টা ক্রিং ক'রে দরজার বেল্ বেজে উঠলো। আওয়াজখানাই যেন অচেনা গোছের। এমনিতে তো বাড়ীতে লোক গিস্‌গিস্ করে, তবু আমাকেই কিনা ছুটতে হ'ল দরজা খুলতে। গিয়ে দেখি গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক!

—'দেখ তো খোকা, এ জিনিসটা তোমাদের নাকি?'

খোকা! ভারী তো নাকের তলায় গোঁফ একটু উঠেছে, অমন গোঁফ দু'দিন বাদে আমারও কি না হবে! পৃথিবীতে কতগুলো লোক থাকে, কাণ্ডজ্ঞানেরই অভাব।

জিনিস্‌টা আর কিছু নয়, লাল রঙের একটা কাস্‌কেট।

ওটার উপর চোখ পড়তেই একগাল হেসে ফেল্লুম।—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের ব'লেই তো মনে হচ্ছে।'

'কোন রকমে পড়ে-টড়ে গিয়ে থাক্‌বে; এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় পড়ে আছে দেখলাম।'

'হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

জিনিসটি বগলদাবা ক'রে লাফাতে-লাফাতে চ'লে গেলুম তিন-তলায়। শ্রীযুক্ত দাদা তখন স্নানের পরে টেড়ি বাগাচ্ছেন। তাঁর আয়নার টেবিলে ওটা রেখে গম্ভীর ভাবে বললুম: 'কে যেন এটা তোমাকে দিয়ে গেলেন দাদা।'

বস্তুটার উপর একবার মাত্র দৃক্‌পাত ক'রে দাদা গর্জ্জন ক'রে উঠলেন: 'ফাজিল, হতভাগা, রাস্কেল, ইয়ার্কি পেয়েছো তুমি! ফেলে দিলাম এটাকে রাস্তায়

ছুঁড়ে, কোন্ দয়াবান্ আবার কুড়িয়ে পোঁছে দিয়ে গেলেন। নাঃ, শান্তি নেই, শান্তি নেই আমার জীবনে!'

সমস্তটা দিন দাদা রাগে গজ্‌গজ্‌ করলেন।

এক দিন যায়, দু'দিন যায়, এমনি ক'রে ক'রে অনেকদিন কাটলো। ও বিষয়ে আর কিছু শোনা যায় না বাড়ীতে। ভাবলুম, দাদা ভুলেই গেলেন বুঝি। বৌদি কাস্‌কেটটা লুকিয়ে রেখেছিলেন কোন এক আলমারীর দেরাজে—দাদার চোখেই আর পড়ে না।

এরই মধ্যে একদিন আমাদের বাড়ীতে এক বিয়ের নেমন্তন্ন। বৌদির কে এক পিসতুতো বোন। বৌদির সঙ্গে আমাদের মধ্যে কে-কে যাবে এ নিয়ে বাড়ীতে যখন জটলা হচ্ছে হঠাৎ দাদা চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন: 'হয়েছে, এইবার হয়েছে!'

কী হ'ল? আর্কিমিডিসের ভূতে পেলো নাকি দাদাকে?

'ঐ কাস্‌কেটটা এ বিয়েতে আমরা উপহার দেবো। চমৎকার!' দাদা হাসলেন, মনে হ'ল তাঁর এমন হাসি বহুকাল দেখিনি।

মা বল্‌লেন: 'যাঃ, সে কি হয়? বাড়ীর জিনিস কি দেয়া যায়?'

দাদা তারস্বরে বললেন: 'কেন যাবে না? কেউ তো আর জানতে আসছে না যে আমরা কিনিনি। আর বিয়েতে এ উপহার অতি প্রশস্ত বলেই তো সকলে জানে!'

কোন কথা শুনলেন না দাদা, সেই আলমারী থেকে নিয়ে এলেন ওটা বার ক'রে। 'দেখ মা, এক্কেবারে নতুন রয়েছে। আমরা তো ছুঁইওনি। টাকা খরচ ক'রে দোকান থেকে কিনলেই বুঝি বেশী হ'ল। কত খুসী হবে ওরা সবাই, দেখো। বাঃ!'

ওদের হ'য়ে দাদাই অতিমাত্রায় খুসী হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু কাস্‌কেটটা খুলতে দেখা গেলো ডালার গায়ে বৌদির নামের প্রথম অক্ষর খোদাই করা। আমাকে চুপি চুপি ডেকে বল্‌লেন, 'পারবি না ওটা ছুরি দিয়ে তুলে দিতে? আট আনা দেবো।'

হুঁঃ, কাজের বেলায় নস্তু, আর মুখে তো পাজি হতভাগা ছাড়া বুলি নেই। মানুষ এই রকমই। একবার মনে হ'ল রেগে গিয়ে বলি, পারবো না ও-সব করতে। কিন্তু একটু ভেবে বললুম: 'এক টাকা দেবে?'

'আচ্ছা যা, এক টাকাই দেবো। খুব পালিশ করবি, বোঝা না যায়।'

তেতলার চিলেকোঠায় গিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাজ শেষ করলুম। জাঁক করবো না, কিন্তু কাজটা সত্যি এত ভালো হ'ল যে খুব লক্ষ্য ক'রে না দেখলে কিছু বোঝাই যায় না। হাতে-হাতে এক টাকা। গুণ থাকলে এমনিই হয়।

বৌদির সঙ্গে আমিই গেলুম, এবং হাতে ক'রে কাস্‌কেটটা নিয়ে গেলুম আমিই। তার পর কয়েক দিন দাদা নস্তু ছাড়া আর কিছু জানেনই না।

পরের বছর ছোড়দির বিয়ে। এই তো সেদিনের কথা। ছোড়দির বিয়েতে আমাকে কাজে নিতে হ'ল, নস্তু না হ'লে কোন্‌টা হয় শুনি? তা ছাড়া, তখন তো আমি আর ছেলেমানুষ নই, মস্ত লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে আটচল্লিশ ইঞ্চি কাপড় পরি, মাঝে মাঝে দু' একটা পান খাই। জামাইবাবুর সঙ্গে তাঁর যে সব বন্ধু এসেছিলেন আমাকে রীতিমত 'আপনি' বল্‌লেন।

আমি ছিলুম উপহার-বিভাগের কর্ত্তা। একটা টেবিলের উপর কত রকম জিনিস সাজানো হচ্ছে—আমিই সাজাচ্ছি আর পাহারা দিচ্ছি। ইস্কুলের প্রাইজের মত—ওঃ, তার চেয়েও কত বেশী জমকালো! পাশাপাশি তিনটে ফাউণ্টেন পেনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি, ছোড়দির তো এতগুলো কলম লাগ্‌বে না, আর কলেজে ঢুকে আমার তো ফাউণ্টেন পেন চাই-ই! এমন সময় আমার হাতে আরো একটা উপঢৌকন এসে পৌঁছলো।

টক্‌টকে লাল একটা টয়লেটের কাস্‌কেট। দাদার সেই ব্যাপার মনে ক'রে হাসি পেলো। উপরে একটা কাগজ আঁটা, তাতে নাম দেখলুম, শোভনা। শোভনা কে? কে জানে, কত শোভনা আছে জগতে। যা-ই হোক্, কাস্‌কেটটা দাদাকে একবার দেখাতেই হবে।

পরের দিন খুঁজে খুঁজে ওটা বার ক'রে ঠিক নিয়ে গেলুম দাদার কাছে। —'দেখেছো দাদা?'

‘ফের ফ্যাজলেমি! কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি, এখন যা এখান থেকে, ভাগ্।’

আমি তবু বল্লুম; ‘শোভনা দিয়েছে এটা।’

শুনে দাদা হঠাৎ যেন একটু চমকে উঠলেন: ‘শোভনা? উঁ? তোর বৌদির সেই পিস্তুতো বোন নয় তো?’

‘সেই যাকে তোমারটা চালিয়েছিলে?’ ব’লে আমি এমনি কাস্কেটের ডালাটা তুললুম। তুলতেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো: ‘এ কী!’

‘কী রে?’ দাদা কাছে এসে কাস্কেটের ভিতরটা দেখে হতভম্ব।

বলি শোনো। কাস্কেটে সাবানের খোপটা গোল, সেখানে একখানা চৌকো বড় সাবান অতি কষ্টে ঠেসে-ঠুসে ঢোকান হ’য়েছে; এসেন্সের চওড়া গর্ত্তটায় অতি ক্ষুদ্র সরু একটি শিশি আছে শুয়ে; যেখানে চ্যাপ্টা চেহারার চুলের তেল থাকবার কথা সেখানে একটা তরল আলতার গোল শিশি।

একটু তাকিয়ে থেকে আমি বললুম: ‘আসল জিনিসটা দেখেছো, দাদা?’

দাদা বললেন, ‘হুঁ।’

এর মানে হ’ল গিয়ে কাস্কেটের ডালায় আমার ছুরির দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; সেটা আর কারো চোখে পড়ুক আর না-ই পড়ুক, আমার ছুরির দাগ আমি তো চিনি।

দাদা বললেন: ‘কে জানে বেচারাদের বাড়ীতে এ জিনিস বোধ হয় অনেকগুলো গেছে, কোন্‌টা কোন্ বাড়ী থেকে এসেছে মনে রাখা কি সম্ভব? ওঁদের আর দোষ কী—ভেতরের জিনিসগুলো ফুরিয়ে কি প’চে গেছ্‌ল, তাড়াতাড়িতে ঠিক মাপসই আর কেনা হয়নি। তাতে আর কি—কাস্কেটটাই আসল। ওটা থাক্ তোলা, শীগ্‌গির কি আর কারো বিয়ে না হবে!’

গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরী হয় তা বোধ হয় তোমরা জান। এক যোড়া রেশমী মোজা তৈরী কর্‌তে ৩৩৩টি গুটিপোকার দরকার হয়।

কলির ব্যস্ত মানুষ

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

এ যুগের মানুষ সব সময়েই বড় ব্যস্ত;—তার সময়ের অভাব প্রতি মুহূর্ত্তে। কেমন ক’রে তাড়াতাড়ি চলা যায়, ঘরের কাজ করা যায়, হিসাব করা যায়, লেখা যায়, ছাপা যায়, চাষ করা যায়, রান্না করা যায়, কল চালান যায়, জিনিষপত্র তৈয়ারী করা যায়—তার মাথায় কেবলই এই সকল ফন্দি। এমন কি, খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার ইত্যাদিতেও কে কত তাড়াতাড়ি খেল্‌তে, চল্‌তে বা যেতে পারে তা’রও রেষারেষি চ’লেছে দিনরাত।

সাধে কি আমরা বর্ত্তমান যুগকে ‘কলিযুগ’ বলি? ‘কলি’ কথাটার বানান বদ্‌লিয়ে ‘কলী’ ক’রে দিলে বোধ হয় আরো ভাল হ’তো;—অর্থাৎ কলের যুগ বলা হ’তো।

এই কলের যুগের প্রধান কাজ হ’ল তাড়াতাড়ি চলাফেরা কর্‌তে পারা। তা’র ফলে, মানুষ তাড়াতাড়ি নিজের গন্তব্য স্থানে যেতে পারে, অল্প সময়ে মাল সরবরাহ কর্‌তে পারে, চিঠিপত্র খুব কম সময়ে পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

সামান্য একটু তুলনা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারি, এ যুগে চলাফেরার বেগ কতটা বেড়ে গেছে।

বার্লিন থেকে পারির (Paris) দূরত্ব ৬৬০ মাইল। এইটুকু যেতে সময় লাগে:

পায়ে হেঁটে	...	...	১৭ দিন
ঘোড়ায় চ’ড়ে	...	...	৯½ ”
মোটরে	...	...	১৪⅚ ঘণ্টা
দ্রুতগামী রেলে	...	...	১২ ”
এরোপ্লেনে	...	...	৩⅚ ”

কোথায় ১৭ দিন, আর কোথায় ৩⅚ ঘণ্টা! মোটরের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, সেটা রেলের সময়ের চেয়ে বেশী; কারণ, রেলের চেয়ে মোটরের রাস্তার সুবিধা অনেক কম। সোজা রাস্তায় মোটর রেলের চেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারে।

যে ভাবে দিন দিন রেল, মোটর আর এরোপ্লেনের বেগ বেড়ে চলেছে, তা'র ফলে উপরের হিসাবটি যে শীঘ্রই অন্য রকম হ'য়ে যা'বে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মাল-সরবরাহ ব্যাপারেও দেখি, দিন দিন আমাদের ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। একটা হিসাব দিচ্ছি; তা' থেকে বুঝ্‌তে পার্‌বে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়িয়েছে।

ইজিপ্টের চিয়প্‌সের পিরামিডটিকে যদি সরা'বার দরকার হয় তা' হ'লে—

	মানুষ	লাগ্‌বে	...	২,৩৭,৮৭৯,৪৩৮টি
কিংবা	খচ্চোর	"	...	৬৯,২৯৩,১৪৬টি
"	ঘোড়ার মালগাড়ী লাগ্‌বে		...	২,৩৮১,২৮৬টি
"	মোটর লরি	"	...	৭১৪,৩৮৬টি
"	পালের জাহাজ	"	...	২৩,৮১৮টি
"	আধুনিক মালের জাহাজ		...	১,৪২৯টি
"	মালের ট্রেন	"	...	৭১৫টি

পিরামিডের ওজন ধরা হয়েছে ৭,১৪৩,৪৬০ টন (এক টনের ওজন প্রায় ২৭ মণ)।

উপরের হিসাবের মধ্যেও মোটর লরি, আর মালের ট্রেনের হিসাব যে শীঘ্রই অন্য রকম হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি যে সব বিরাট্ ছয় চাকার এবং আট চাকার মোটর লরি তৈয়ারী করা হয়েছে তা'র এক একটি, সাধারণ ২।৩টি লরির মাল অনায়াসে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে। তা'র এক একটি চাকা একজন মানুষের সমান।

মালের ট্রেনের হিসাবও নিশ্চয়ই বদ্‌লিয়ে যাবে, কারণ আধুনিক এঞ্জিনের ক্ষমতা বেড়েই চলেছে।

ভবিষ্যতে বিরাট্ জাহাজ, এরোপ্লেন এবং এয়ার-শিপ্, জলে এবং আকাশ-পথে হাজার হাজার মণ মাল অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশ-বিদেশে সরবরাহ ক'রে বেড়াবে। মানুষেরও চলাফেরার আরও সুবিধা হবে তখন।

স্থল-পথে, রেলের গতি এখনই ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশী হ'য়ে পড়েছে।

অবিশ্যি, তা'র জন্য বাতাসের-বাধা-কাটান এঞ্জিন এবং গাড়ী তৈয়ারী কর্‌তে হয়েছে। মোটরের জন্য ভাল রাস্তা তৈয়ারী হয়েছে; বাতাসের-বাধা-কাটান মজবুত মোটরও তৈয়ারী করা হয়েছে। ফলে, মোটরের বেগও অনেক বেড়ে গিয়েছে।

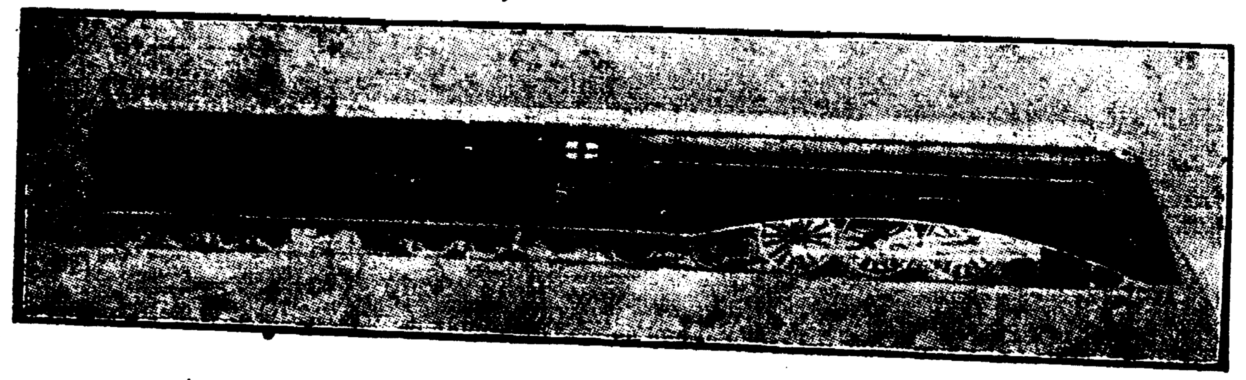

এটি একটি রেল-এঞ্জিন; বাতাসের বাধা কাটাবার জন্য সর্ব্বাঙ্গ এইভাবে ঢাকা হয়েছে।

কিন্তু, এই সব অতিরিক্ত বেগের ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই এ বিষয়ে মোটরওয়ালারা খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। এখনকার মোটরের 'বডি' বা উপরের 'ঘর' মজবুত ইস্পাতে তৈয়ারী করা হচ্ছে; সামনে এবং পিছনে ধাক্কা সইবার 'বাম্পার' লাগান হচ্ছে; টায়ার ফুলিয়ে বেলুনের মত বড় করা হচ্ছে; ভাল 'ব্রেক্' লাগান হচ্ছে, যা'তে গাড়ী চট্ ক'রে থামান যায়। এখনকার মোটর কেমন মজবুত তা' প্রমাণ করার জন্য আমেরিকার বড় বড় মোটরওয়ালারা বেপরোয়া চালক দিয়ে নানা রকম খেলা দেখাচ্ছেন—মোটরে ডিগ্‌বাজি খাওয়া, ধাক্কা লাগান, উল্টে যাওয়া, আগুনের ভিতর দিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি।

রেলগাড়ীর দুর্ঘটনায় লোকের বেশী অনিষ্ট হয়; কাজেই, সে বিষয়েও নানা ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। রেলের লাইনের কোনও জায়গায় দোষ থাক্‌লে, কোনও জায়গায় ভেঙ্গে গিয়ে থাক্‌লে, আপনা থেকে আগের এবং পরের ষ্টেশনে সেটা জানা যাবে; লাইনের ওপর কোনও জিনিষ ফেলে রাখ্‌লে সেটাকে এঞ্জিনের সামনের একটি কল ঠেলে সরিয়ে দেবে; পিছন থেকে অন্য রেল এসে ধাক্কা মারার আগে পিছনের রেলকে সাবধান ক'রে দেবে—এই ধরণের অনেক ব্যবস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু, দুর্ঘটনা তবুও ঘট্‌ছেই। এ সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে কি হবে বলা যায় না।

জলপথে চলার ব্যবস্থা তো বেশ ভালই হয়েছে। আধুনিক বিরাট্ জাহাজ

ডিগ্‌বাজি

আগুনের ভিতর দিয়ে লাফ মোটরের কস্‌রৎ উল্‌টিয়ে পড়্ছে

"নর্ম্যাণ্ডি" ("Normandy") এবং "কুইন মেরি" ("Queen Mary") এক একটি

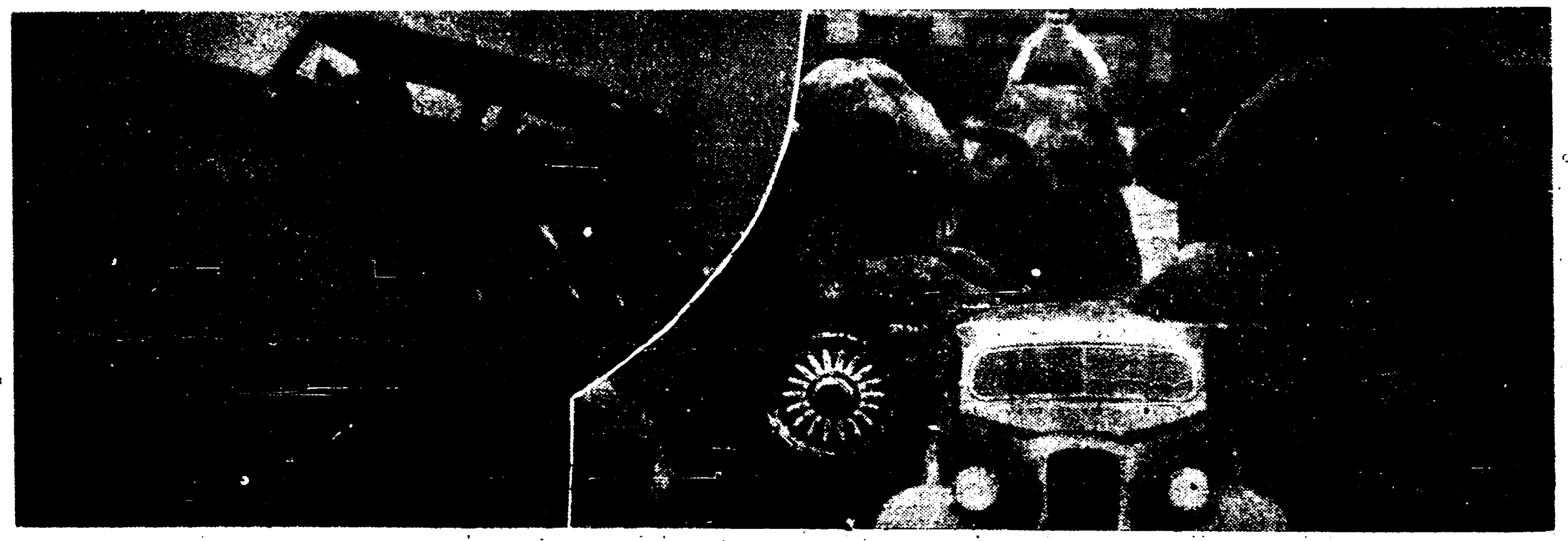

শূন্যে ছয় ফিট লাফ তিনটি হাতীর পায়ের চাপেও কাবু নয়

ভাসমান সহর বল্‌লেই হয়। জাহাজের মধ্যে সিনেমা, খেলার জায়গা, সাঁতার

কাটার জায়গা, ছাপাখানা—সবই আছে। জলপথে চলার সময়ও পৃথিবীর কোন্ দেশে কি ঘটনা ঘট্‌ছে সব খবর পাওয়া যায়। ধোঁয়ার কোনও যন্ত্রণা নাই এ সব জাহাজে। দুর্ঘটনা ঘট্‌লে ভাল লাইফ্-বোটের ব্যবস্থা আছে; সব যাত্রীই মোটর লাইফ-বোটে চ'ড়ে রক্ষা পেতে পারে। জাহাজে ব্যাণ্ড আছে, সিনেমায় রোজ নূতন ফিল্মের ব্যবস্থা আছে, রোজ জাহাজের প্রেসে ছাপা সংবাদপত্র পাওয়া যায়, ডেকের উপর টেনিস খেলার প্রতিযোগিতা চলে, নাচ, গান, বক্তৃতা ইত্যাদি চলে—ঠিক যেন একটি সহরের কাণ্ড-কারখানা। এ সব জাহাজ চলেও দারুণ বেগে; সমুদ্রে বেশী দোলা দিতেও পারে না।

তবুও আশ মেটে না। জাহাজ বেগে চলার সময় বাতাসে বড় বাধা দেয়; জল কাটাবার সময় জল দেয় বাধা; জাহাজ দুলেও বড় অসোয়াস্তি বাধায়। কাজেই, এমন জাহাজ তৈয়ারী কর্‌তে হবে যা' বাতাসের বাধা কাটায়, জলের বাধাও কাটায়; তা' ছাড়া দোলেও না মোটেই। সে জাহাজ চল্‌বে ভীষণ বেগে—যেন ডাঙ্গায় রেল চলেছে। একজন এঞ্জিনিয়ার ঐ ধরণের একটা জাহাজের

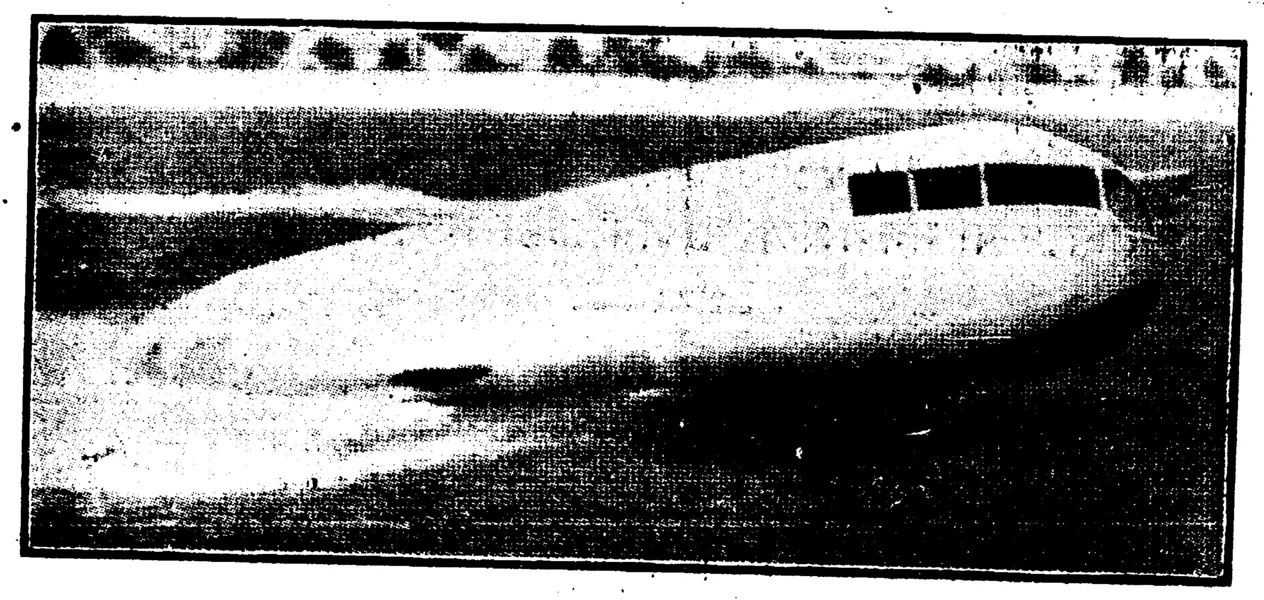

ভবিষ্যতের জাহাজের ছোট নমুনা

নক্সা তৈয়ারী করেছেন; ছোট্ট একটি জাহাজও ঐ নক্সা দেখে বানিয়েছেন। এ জাহাজ ঠিক চুম্‌চমের আকারের; চোঙা ইত্যাদি কিছুই নাই। জাহাজের তলাটা চ্যাপ্টা; চল্‌বার সময় জলের উপর দিয়ে শুধু ঘেঁসে যাবে। বেগে চলার

সময় সে জাহাজ একটুও দুল্‌বে না। দোষের মধ্যে এই, সে জাহাজে 'ডেক্' থাক্‌বে না; ভিতরে ঢুকে ব'সে থাক্‌তে হবে। তবে, জাহাজের চলার বেগ এত বেশী হবে যে তিন দিনের পথ একদিনেই অনায়াসে যাওয়া চল্‌বে। ভবিষ্যতে হয়তো আরো বেগ বাড়িয়ে একদিনেই মহাসাগর পাড়ি দেওয়া যাবে; তখন আর ডেকের অভাব মনেই হবে না।

আকাশ-পথে ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে এরোপ্লেন তো চলেছেই; প্রতিযোগিতায় ঘণ্টায় ৪২০ মাইল পর্য্যন্ত চলেছে। অবিশ্যি, এত বেগে বেশীক্ষণ চালান এখনও সম্ভব হয় নি; শুধু প্রতিযোগিতার ঝোঁকে খানিকক্ষণ চালান হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ঘণ্টায় ৪০০ মাইল চালান সম্ভব হবে। তা' ছাড়া, বাতাসকে এড়িয়ে, শূন্যে অনেক মাইল উঁচুতে হাউইএর সাহায্যে এরোপ্লেন উড়িয়ে, বাতাসের বাধাহীন জায়গায় ঘণ্টায় ৫।৬শ' মাইল বেগে এরোপ্লেন চালানর চেষ্টা এখন থেকেই হচ্ছে! ভিতরের লোকের অবস্থা তখন কি হবে সেটাই ভাবনার বিষয়! কল্পনায় দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে বিরাট্ এরোপ্লেন ৫।৭শ' যাত্রী নিয়ে, সাগরের জলের উপর থেকে উড়ে, ঘণ্টায় ৩।৪শ' মাইল বেগে চ'লে একদিনেই মহাসাগর পার হ'য়ে যাবে।

ততদিনে চলাফেরার ব্যাপারে মানুষের সখ মিটে আস্‌বে কিনা জানি না;— হয়তো তখন মানুষ চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে যাবার চেষ্টা কর্‌বে।

দরদী-বুড়ো

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

বোম্বাই সহর।

সন্ধ্যেবেলা। বন্ধুর সঙ্গে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে অম্বরনাথ এক জুয়ার আড্ডায় এসে পড়্‌ল;

কৌতূহলী হ'য়ে সে খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। জুয়ার অভিজ্ঞতা তার জীবনে আজ এই প্রথম। তাই ও জান্‌ত না এর আকর্ষণী শক্তি কি ভীষণ!

খানিক বাদেই মনের ভেতর তার এক দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছে হ'ল—নিজেকে কোন রকমেই সে আর সংযত রাখ্‌তে পার্‌ল না। বাজীর পর বাজী ধ'রে চল্‌ল আর টেব্‌লটার ওপর রাশি রাশি টাকা এসে জম্‌তে লাগ্‌ল। মাথার ভেতর রক্তকণিকা চন্‌চনিয়ে উঠ্‌ল···উঃ, কত টাকা, কত ঝক্‌ঝকে টাকা! অম্বরনাথের বন্ধু তার হাতটা চেপে ধ'রে বল্‌ল, "ওহে ফিরে চল। যে টাকা তুমি জিতেছ সে টাকা দিয়েই বাকী জীবনটা তোমার স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবে।"

কিন্তু টাকার মোহ, জুয়ার নেশা তাকে তখন পূরোদমে চেপে ধরেছে,—ঝক্‌ঝকে টাকা তাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। তাই একটু বিরক্তির সুরেই সে বল্‌লে, "যেতে হয় তুমি যাও, আমি এখন যাব না।" আরও খানিক ব্যর্থ চেষ্টা করে ক্ষুণ্ণমনে বন্ধু চলে গেল।

আবার বাজী ধর্‌ল অম্বরনাথ,—অনেক টাকার বাজী। আবার জিত্‌ল। অদ্ভুত উত্তেজনায় তখন তার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌ছে। ঘরের আর সবাই ক্রমশঃ তার চারধারে জড় হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রতিবারেই সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার বাজী ধরা দেখে আর প্রতিবারেই সবাইকার বিস্ফারিত দৃষ্টির সাম্‌নে সে টাকার তোড়া তুলে নেয়। একজন বল্‌ল, "মশাই! সারা জীবন জুয়া খেলেই কাটালাম···কত জুয়াড়ীকেই না দেখ্‌লাম। কিন্তু আপনার মত নিখুঁৎ দান ফেলা আর তার চেয়েও নিখুঁৎ সৌভাগ্য আর কখনও আমার চোখে পড়ে নি! অদ্ভুত! ধরুন—আবার বাজী ধরুন। ঘরের সবাইকার পকেট থেকে টাকা টেনে বার ক'রে নিন। সবাইকে একেবারে ফতুর ক'রে ফেলুন।"

ঘরের সবাই সত্যিই শেষে 'ফতুর' হয়ে এল—আর কেউই খেল্‌তে চায় না। টেব্‌লের ওপরটা টাকা আর নোটে প্রায় ভরে গেল।

অম্বরনাথ কি ক'রে অতগুলো টাকা গুছিয়ে নেবে, তাই ভাব্‌ছে এমন সময় হঠাৎ এক বৃদ্ধ সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। দেহটা তার অসম্ভব লম্বা—বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে, মাথা-ভরা টাক, আর তার লম্বা নাকটার ঠিক নীচেই বাদামী রঙের এক যোড়া গোঁফ। বাঁ-দিকের গালে তার গভীর ক্ষতের একটা দাগ। কিন্তু সব চেয়ে অদ্ভুত তার চোখ দু'টো—কী তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি, ধারালো ছুরির মতই ঝক্‌ঝকে।

অম্বরনাথের উদ্দেশ্যে মাথাটা একটু নুইয়ে অভিবাদনের ভঙ্গী করে হেসে সে বল্‌ল, "যে টাকা আপনি জিতেছেন আপনার জামায় যদি সাত-আটটা করেও পকেট থাক্‌ত তা' হ'লেও তা পোরা যেত না, আর যদিই বা যেত, আপনার পক্ষে নড়া-চড়া করা তা' হ'লে এক রকম অসম্ভব হ'য়ে পড়্‌ত। এক কাজ করুন, আপনার গায়ের চাদরটা খুলে বেশ ভালো ক'রে টাকাগুলো বেঁধে নিন্"।

বৃদ্ধের কথামতই অম্বরনাথ কাজ করল। সে হেসে বল্‌ল, "ঠিক হ'য়েছে। কিন্তু আপনি কি মনে করেন টাকার এই মোটটা পিঠে ফেলে এত রাতে নিরাপদে আপনি বাড়ী পৌঁছুতে পারবেন?"

একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়ে অম্বর জবাব দিল, "কেন? রাত এখন ক'টাই বা হ'বে?"

বৃদ্ধ কোনও উত্তর না দিয়ে তার পকেট থেকে বড় ঘড়িটা বার করে সাম্‌নে ধর্‌ল। দেখা গেল ঘড়ির ছোট কাঁটাটা তু'টোর ঘর পেরিয়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধ অম্বরনাথকে একটা চেয়ারে বস্‌তে ইঙ্গিত করে নিজেও বসে পড়্‌ল। তার পর সে বলে চল্‌ল, "আমার নাম রূপ সিং। আমি সারা জীবন পল্টনে কাজ ক'রে এখন অবসর পেয়েছি। গত মহাযুদ্ধে আমি ছিলাম, আর তার স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে আমার বাঁ গালের ওপর। এই ঘর-বাড়ী সমস্তই আমার। বলেন তো আপনার থাক্‌বার বন্দোবস্তটা করে দিই। পথে এখন লোক চলাচল নেই বল্‌লেই চলে। এই বৃদ্ধের উপদেশটা নিলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আপনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন। কিন্তু আপনাকে বড় পরিশ্রান্ত ব'লে মনে হ'চ্ছে যে! ওরে কে আছিস্‌, তু' কাপ্‌ কড়া ক'রে কফি এনে দে তো!"

সত্যিই অম্বরের নিজেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ব'লে মনে হ'চ্ছিল। উত্তেজনার দরুণ এতক্ষণ সেটা সে অনুভব করে নি। অবসাদে এখন সমস্ত শরীরটা যেন ভেঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌ল। সে ভেবে দেখ্‌ল, বৃদ্ধের কথামত রাতটা ওখানে কাটানোই যুক্তি-সঙ্গত। তাই বল্‌লে, "হ্যাঁ, ভেবে দেখ্‌লাম রাতটা এখানে কাটানোই বুদ্ধিমানের কায হবে। আপনি তা' হ'লে দয়া ক'রে সে ব্যবস্থাটা যদি ক'রে দেন তা' হ'লে বড়ই উপকৃত হব।"

অম্বরের হাতে এক কাপ্‌ ধোঁয়া-ওড়ানো কড়া কফি তুলে দিতে দিতে বৃদ্ধ বল্‌ল, "না না— এ তো প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। দয়া-টয়া ওসব বড় বড় কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।"

সে উঠে গেল। অল্প খানিক বাদেই ফিরে এসে বল্‌লে, "দেখুন, খুবই সুবিধে হ'য়েছে। আমার পাশের ঘরটাই খালি পাওয়া গেছে। রাতে দরকার-টরকার হ'লে আমাকে ডাক্‌তে কুণ্ঠা বোধ কর্‌বেন না। ঘরভাড়াও বেশী নয়, চলুন, আর বসে থাক্‌বেন না। রাত তো প্রায় ফুরিয়ে এল!"

ঘরটা ছোট কিন্তু বেশ চমৎকার সাজানো। বিশেষ করে বিছানাটি। খাটটিও অতি চমৎকার। যে কোনও পরিশ্রান্ত লোকের কাছে সেটি অত্যন্ত লোভনীয়। ঘরের দেওয়ালের চারদিকে বড় বড় ছবি টাঙ্গানো। দক্ষিণ দিকে একটা জান্‌লা। এক পাশে জলের ট্যাপ্‌-লাগানো ছোট্ট একটি বেসিন।

অবসাদে অম্বরের শরীর ভেঙ্গে আস্‌ছিল, শয়নের ব্যবস্থা দেখেই তার চোখ জড়িয়ে এল,

বৃদ্ধ তা লক্ষ্য করে বল্‌ল, "আচ্ছা, শুভ-রাত্রি, তা' হ'লে—যদিও সুপ্রভাত বলাই বোধ হয় এখন বেশী যুক্তি-সঙ্গত। কিচ্ছু সংশয় মনে রাখবেন না। আপনার নিজের বাড়ীতে আপনি যে রকম নিরাপদ্‌ এখানে তার চেয়ে কিছু কম নিরাপদ্‌ ব'লে নিজেকে মনে করবেন না। তবুও অতগুলো টাকা যখন আপনার সঙ্গে রয়েছে তখন জান্‌লা-দরজাগুলো ভালো ক'রে বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।"

সাম্‌নের দিকে একটু ভেঙ্গে প'ড়ে সে আবার বল্‌ল, "আচ্ছা, শুভরাত্রি"।

…"শুভরাত্রি" জড়িত-স্বরে অম্বর উত্তর দিল; কিন্তু সে জান্‌ত না সেই রাত্রিটি তার জীবনের ভেতর কি রকম অশুভ!

জান্‌লা-দরজাগুলো ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে বেসিনে মুখ-হাত ধুয়ে অম্বর বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। টাকার মোটটা রইল বালিশের ঠিক নীচেই।

খানিক বাদেই কিন্তু তার মনে হ'ল কে যেন তাকে এক অদ্ভুত অবস্থায় এনে ফেলেছে; শরীরের শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরে গেছে, মাথার ভিতরটায় কে যেন হাতুড়ি পিটুছে আর হাত-পাগুলো জ্বল্‌ছে! একটু আরাম পাবার জন্য সে পাশ ফির্‌তে গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটুও নড়্‌তে পার্‌লে না। চোখ বন্ধ কর্‌তে গেল, কিন্তু তাও সম্ভব হ'ল না! আশ্চর্য্য! কারণ কী? হাত-পা নাড়াবার শক্তি নেই অথচ জ্ঞান রয়েছে সম্পূর্ণ, স্পষ্ট! কারণ কী, কারণ কী?

হঠাৎ অম্বরনাথ শিউরে উঠ্‌ল। কেউ তাকে কোনও ক্ষতিকর ওষুধ খাইয়ে দেয় নি তো? মনে পড়্‌ল একটু আগে সেই বৃদ্ধই পরম সমাদরে ওকে এক কাপ্‌ কফি খাইয়েছিল। তার সঙ্গে অন্য কোনও ওষুধ মেশানো ছিল না তো? নিশ্চয়ই ছিল—সেই কফি খাবার পর থেকেই তো তার শারীরিক অবসাদ বেড়ে উঠেছে। নিজের মূঢ়তার জন্য তার নিজেরই ওপর রাগ হ'ল। তার এই জড়তার সুবিধা নিয়ে আততায়ীরা হয়তো কোনও গুপ্ত পথ দিয়ে এসে টাকাগুলো নিয়ে সরে পড়্‌বে। তাদের সে দেখ্‌তে পাবে, তাদের কথা অবিকৃত হয়েই তার কানে বাজ্‌বে, কিন্তু তা'দের বাধা দেবার এতটুকু শক্তিও থাকবে না। কে বল্‌তে পারে তাদের হাতের শাণিত ছুরি ওর বুকের ওপরই ঝল্‌সে উঠ্‌বে না? মৃত্যু হয়তো ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌বে অথচ তাকে প্রতিহত করবার সামর্থ্য তার থাক্‌বে না। ভয়ে ও উত্তেজনায় সেই শীতের রাতেও অম্বরনাথের কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আবার এক-একবার তার মনে হতে লাগ্‌ল যে হয়তো তার ভয় অমূলক, কল্পনাতেই নানা রকম বিভীষিকা সে দেখ্‌ছে।

ঘরের মৃদু আলোতে সে দেখ্‌তে পেল তার সাম্‌নের দেওয়ালের গায়ে টানান একটা মস্ত

ছবি। ছবিটা এক যোদ্ধার। এক তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে সে বসে, মুখে তার নির্ভীকতার ছাপ। মাথায় তার মস্ত এক টুপি, তার ওপর লম্বা লম্বা পালক-বসানো। ক'টা পালক আছে অম্বর তা গুণ্‌তে লাগ্‌ল,—এক, দুই, তিন—তিনটে লাল আর ওই দু'টো সবুজ। তা হ'লে সবশুদ্ধ হ'ল পাঁচটা—কিন্তু যোগে কি ভুল হ'ল? কই—সবশুদ্ধ ত' মোটে চারটে রয়েছে! আবার সে গুণ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। কিন্তু আশ্চর্য্য, কই, মোটে যে তিনটে! এদিক্-ওদিক্ চেয়ে আবার ওই ছবিটার দিকেই সে তাকা'ল। চীৎকার কর্‌বার শক্তি থাক্‌লে বোধ হয় আতঙ্কে প্রাণপণেই সে চীৎকার করে উঠ্‌ত—যোদ্ধার মাথা থেকে সব ক'টা পালকই কোথায় মিশিয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে যোদ্ধার মাথাটাও তার সাম্‌নে থেকে মিলিয়ে গেল। এ কি ভৌতিক লীলা!

হঠাৎ ওপরের দিকে তার দৃষ্টি পড়্‌ল; দেখ্‌ল মাথার ওপর ছাদের একটা অংশ ধীরে ধীরে নেমে আস্‌ছে। সে অংশটা ঠিক খাটের মতই বড়। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমস্ত পরিষ্কার হ'য়ে গেল। ছাদটার ওই অংশটা ধীরে ধীরে নেমে আসার দরুণই তার সাম্‌নের ওই ছবিটা ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। অম্বর বুঝ্‌ল, আর অল্প সময়ের মধ্যেই ছাদের এই অংশটা নিঃশব্দে তার ওপর নেমে এসে তাকে একেবারে পিষে দেবে। মানুষ মারবার এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিটি দেখে বিস্ময়ে হঠাৎ সে যে কি কর্‌বে তা ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌ল না। কি চমৎকার এই উপায়! এমনি ক'রে হয়তো কত হতভাগ্য লোক এই বিছানার ওপর শুয়েছে। কিন্তু পরদিনের সূর্য্যোদয় তারা আর কখনও দেখ্‌তে পায় নি। তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল কিংবা অম্বরের মতই সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় পঙ্গু হ'য়ে শুয়ে ছিল, ছাদের ওপরের এই অংশটি তখন ধীরে ধীরে নেমে এসে তাদের চিরকালের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছে। তার পর তাদের জেতা-টাকা এই দুর্ব্বৃত্তেরা অতি সহজেই নিয়ে নিয়েছে। বৃদ্ধের সেই কথাটা অম্বরের মনে এল, "কিছু সংশয় মনে রাখবেন না। আপনার বাড়ীতে আপনি যে রকম…" ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার শরীরের সমস্ত রোঁয়াগুলো ভয়ে ও বিস্ময়ে খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ল।

আবার সামনের দিকে সে চাইল—যোদ্ধার ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। ওপর দিকে তার সঙ্গে সেই মারাত্মক জিনিষটার ব্যবধান মাত্র তিন-চার হাত! ধীরে ধীরে তখনও সেটা নাম্‌ছে।

অম্বরনাথ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লে, কোন রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে এখন তাকে খাট থেকে নামতেই হ'বে, নইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ধীরে ধীরে খাটের ধারে সে এগিয়ে চল্‌ল। বোধ হয় এতক্ষণ পরে সেই বিষ-মেশানো কফির ক্রিয়া সামান্য কমে থাক্‌বে। আস্তে আস্তে একটা পা খাট থেকে সে ঝুলিয়ে দিল, তার পর ক্রমে ক্রমে খুব ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে পড়্‌ল। সামান্য শব্দ করলেই বিপদ্ এখন সুনিশ্চিত।

নীচে নেমেই অম্বরনাথ তাকিয়ে দেখে, সে জিনিষটি খাটটার ওপর থেকে মাত্র আর ক'য়েক আঙুল ওপরে রয়েছে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। সেটা খাটের ওপর নাম্‌ল…আরও নাম্‌ল। দারুণ চাপে বালিসগুলো খাটের সঙ্গে প্রায় সমান হ'য়ে গেল। খাটে থাক্‌লে এতক্ষণে তার কী দশা হ'ত মনে মনে ভেবে সে শিউরে উঠ্‌ল।

মিনিট পনেরো প'রে সে অভিনব পদার্থটি আবার ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। দুর্ব্বৃত্তেরা হয়তো তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'য়ে গিয়েছে।

আরও মিনিট পনেরো ঠাণ্ডা মেঝেয় চুপ্‌চাপ্ শুয়ে থাকার পর অম্বরের মনে হল দেহ তার প্রায় সবল হ'য়ে উঠেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ বাড়ী ছেড়ে তাকে পালাতে হ'বে, এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত্ত এখন মারাত্মক—হয়তো কয়েক মুহূর্ত্ত দেরীর জন্যে তাকে যেতে হ'বে পরপারে।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমতঃ জামা-কাপড় সে বেশ করে সাম্‌লে নিল, কোনও শব্দ না ক'রে টাকার মোটটাকে ধীরে ধীরে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিল, তার পর পা টিপে টিপে চল্‌ল জান্‌লার কাছে। খুব সাবধানে সেটা খুলে ফেল্‌ল সে। আব্‌ছা কুয়াশা তখন একটা পাৎলা ধূসর পর্দার মত রাত্রির হিমেল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। আকাশের গায়ে জ্যোতিঃহীন একখণ্ড পাণ্ডুর চাঁদ। অস্পষ্ট আলোয় অম্বরের চোখে পড়্‌ল দেওয়ালের গায়ের সঙ্গে লাগান একটা জলের পাইপ্ জান্‌লার পাশ থেকে রাস্তায় গিয়ে নেমেছে। সে মুহূর্ত্তেই তার মনে হ'ল সে নিরাপদ্—কারণ, জলের পাইপ বেয়ে নীচে নামা আর যার কাছেই শক্ত হোক্ না কেন, অম্বরনাথের কাছে তা একটুও নয়।

রাস্তায় নেমেই কোন দিকে না চেয়ে অম্বর সোজা ছুটে চল্‌ল, ও রকম ছোটা জীবনে আর কোন দিন সে ছোটে নি, আর, ঈশ্বর করুন, ছুট্‌তেও যেন আর কোনদিন না হয়। দেহের প্রতিটি মাংসপেশী, প্রতিটি রক্ত-কণিকা তখন তার সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে।

সব চেয়ে কাছের পুলিশ-ষ্টেশনে গিয়ে ঘুমন্ত ইন্‌স্পেক্টারকে বিছানা থেকে তুলে অম্বরনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে জানাল। প্রথমে ত' তিনি বিশ্বাস কর্‌তেই চান্ না—ওর কথাগুলোকে মাতালের প্রলাপ বলে ধরে নিচ্ছিলেন। কিন্তু যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তার কথাকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারলেন না।

সে রাত্রেই সেই জুয়ার আড্ডার লোকগুলো একে একে ধরা পড়্‌ল; সেই মারাত্মক বিছানাটাও আবিষ্কৃত হ'ল। জানা গেল, দলের পাণ্ডা হ'চ্ছে সেই বুড়োটা, যে অম্বরকে আপ্যায়িত ক'রে বিষ-মেশানো কফি খাইয়েছিল, যে তার শোবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিল অমন সুচারু রূপে। নাম তার রূপ সিং নয়, পুলিশের খাতায় তা'র আসল নাম বহু দিন ধরে আছে—একজন

সন্দেহজনক লোক ব'লে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তা'কে এত দিন কেউ ধর্‌তে পারে নি।

জুয়ার আড্ডায় সেই-ই অম্বরনাথের প্রথম ও শেষ যাওয়া।*

শ্রাবণ মাসের বর্ষা

(শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ)

শ্রাবণ মাসের বর্ষা রে ভাই, শ্রাবণ মাসের বর্ষা,
পথিকরা সব ভাবছে আকাশ কখন হ'বে ফর্সা।
খানায় ডোবায় ঘ্যাঙর্ ঘ্যাঙর্ ব্যাঙের জাগে স্ফূর্ত্তি,
আজ প্রকৃতি ধর্‌ল কিরে ছিঁচকাঁছুনে মূর্ত্তি!
দুষ্টু ছেলে কাদার উপর পিছ্‌লে কেবল পড়্‌ছে,
বিষ্টি-জলের ঝাপ্‌টাতে ভাই, ব্যাঙের ছাতা নড়্‌ছে।
সিক্ত-পাখা—বাকুম্ বাকুম্ ডাক্‌ছে কেবল পায়রা
গাছের পাতায় দুল্‌ছে যেন বিষ্টি-জলের টায়রা!
দোকান পশার বন্ধ করে ময়রা মুদী ঢুল্‌ছে,
ব্যবসা তাদের চলছে নাকো আলস্যে হাই তুল্‌ছে।
ঢাক্‌ছে গরীব চালের ফুটো থামিয়ে ছেলের কান্না,
মাটির দাওয়া ভেপ্‌সে ওঠে, হয় না তাদের রান্না!
ঠাকুর্দ্দা ঐ খাচ্ছে তামাক, সদর দুয়ার বন্ধ
চুপ্ চুপ্ চুপ্, ঘুমাস্‌নিকো আসছে ধোঁয়ার গন্ধ।
গুড়্ গুড়্ গুড়্ মেঘের আওয়াজ স্বর্গলোকের বাদ্য,
মাটির বুকে ফল্‌বে ফসল দেশবাসীদের খাদ্য।

---

* বিলাতী গল্পের ভাবাবলম্বনে।

আকাশ ভেঙ্গে ধরার বুকে নাম্‌ল বুঝি বন্যা,
আজকে যাবে শ্বশুর-বাড়ী শিবঠাকুরের কন্যা।
বিষ্টি থেমে মাটির বুকে রামধনু যেই উঠ্‌বে
খোকনমণির সোনার মুখে মিষ্টি হাসি ফুট্‌বে।

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

[**ভুল সংশোধন**—গত মাসে পাণ্ডুলিপি-নকলকারীর দোষে একটা বিশ্রী রকমের ভুল ছাপা হইয়া গিয়াছে—প্রুফ্ রিডিংয়ের সময়ও তাহা খেয়ালে আসে নাই। পন্স্‌ফোর্ড্ সম্বন্ধে উত্তর হইবে "অষ্ট্রেলিয়াবাসী।"]

নীচে কতগুলি প্রশ্ন দেওয়া হইল। প্রশ্নগুলি দেখিয়া প্রথমে নিজেরাই উত্তর ঠিক কর, তার পর রামধনুর শেষের পৃষ্ঠায় দেওয়া উত্তরগুলির সঙ্গে মিলাইয়া লও—আগেই কিন্তু উত্তর দেখিয়া ফেলিও না।

১। কোন ব্যবসা ফেল পড়িলে চল্‌তি কথায় বলা হয় "লাল বাতি জ্বালিয়াছে"। কথাটা কি ভাবে আসিল বল ত'?

২। মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড, মিঃ উইন্‌ষ্টন চার্চ্চিল, আর্ল অব রেডিং, মার্কুইস্ অব জেট্‌ল্যাণ্ড্, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স—ইঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ভারতসচিব কে?

৩। নীচের খবর দুইটির মধ্যে যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভুল আছে, সব কয়টি বাহির কর—

(ক) ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের সম্রাট্ লুই পাস্তুর অষ্ট্রেলিয়ার মিকাডো রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করিবেন।

(খ) শোনা গেল ক্যানাডার এব্রাহাম লিঙ্কনকে এবার জীববিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হইবে। তিনি শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসিতেছেন।

কেন ? কি ? কোথায় ?—ইত্যাদি

"ডারউইনিজ্‌ম্" (Darwinism) কি ?

ডারউইন সাহেবের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ ; সেই থ্যাব্‌ড়া-নাকওয়ালা ভদ্রলোকের একটা ছবিও এই সঙ্গে দেওয়া হইল। কিন্তু ডারউইন সাহেবের কাজ সম্বন্ধে খুব সম্ভব তোমাদের স্পষ্ট কোনও ধারণা নাই। তোমরা হয়ত বলিবে ডারউইন সাহেব বলিয়াছেন, বানর হইতে মানুষ হইয়াছে। কিন্তু ডারউইন সাহেবের পূর্ব্বেও অনেক পণ্ডিতই বলিয়াছেন যে মানুষ কিংবা কোন জানোয়ারেরই হঠাৎ সৃষ্টি হয় নাই—প্রত্যেকেরই নিম্নতর জীব হইতে ক্রমপরিবর্ত্তন (Evolution) হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই মতের একটা স্পষ্ট রূপ প্রথম দেন চার্ল্‌স ডারউইন। ইঁহার পিতামহ ইরাসমাস ডারউইনও ক্রমপরিবর্ত্তনে বিশ্বাস করিতেন।

ডারউইন সাহেবের বয়স তখন বেশী নয়—বিগ্‌ল্‌স্ (Beagles) নামে একখানি জাহাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কতগুলি নির্জ্জন দ্বীপ পরিদর্শন করিতে যাইবে ঠিক হয়। ডারউইন সাহেব ধরিয়া বসেন ঐ জাহাজে তিনিও যাইবেন। তাঁহার পিতা শেষে বলেন যে অন্ততঃ পক্ষে একজন লোকও যদি তাহার ইচ্ছা সমর্থন করে তবে তিনি যাইতে পারেন। শেষ পর্য্যন্ত ডারউইন সাহেবের কাকার সুপারিশে ডারউইনের যাত্রা হয়। ডারউইনের এই সুযোগ লাভের কারণ হইল তাঁহার নাক ; তাঁহার কাকা বলেন—যাহার নাক এত অদ্ভুত তাহাকে অদ্ভুত কাজ করিতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

পাঁচ বৎসর বিগ্‌ল্‌স্ জাহাজে নানা সমুদ্রে ঘুরিয়া—অধুনালুপ্ত এবং বর্ত্তমান নানা রকমের গাছপালা জীবজন্তু দেখিয়া ডারউইন সাহেব ক্রমবিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হন। তাঁহার মতবাদ সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে : গাছপালা

এবং জন্তু জানোয়ারদের লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ইহাদের প্রত্যেকের সমস্ত সন্তান-সন্ততি যদি বাঁচে তবে প্রকৃতি-দেবী ইহাদের খাদ্য যোগাইয়া উঠিতে পারেন না। আবার কোন একটা জীবের সবগুলি সন্তান এক রকম হয় না—কাহারও হয়ত এমন কোনও গুণ থাকিয়া যায় যাহাতে সে অন্যদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই যখন খাদ্যের অভাব হয় তখন কতকগুলি—যেগুলির কোনও গুণ আছে সেগুলি—বাঁচে এবং অন্য-গুলি নষ্ট হইয়া যায়। এখন ধর, একটা জানোয়ার এ রকম অবস্থায় পড়িয়াছে যে শারীরিক বলে সে অন্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলে টিকিতে পারিবে না—কেননা এক সঙ্গে অত জানোয়ারের স্থান সেখানে নাই। এই অবস্থায় একটী জানোয়ারের হয়ত একটা লম্বা শিং দেখা দিল। ক্রমে দেখা গেল যার যত বড় শিং আছে তারই বাঁচিবার সম্ভাবনা তত বেশী—কালে হয়ত শিং-শূন্য জানোয়ারদের বংশই লোপ পাইয়া যাইবে। এই প্রকারে এক রকম নতুন ধরণের জীবের সৃষ্টি হইতে পারে।

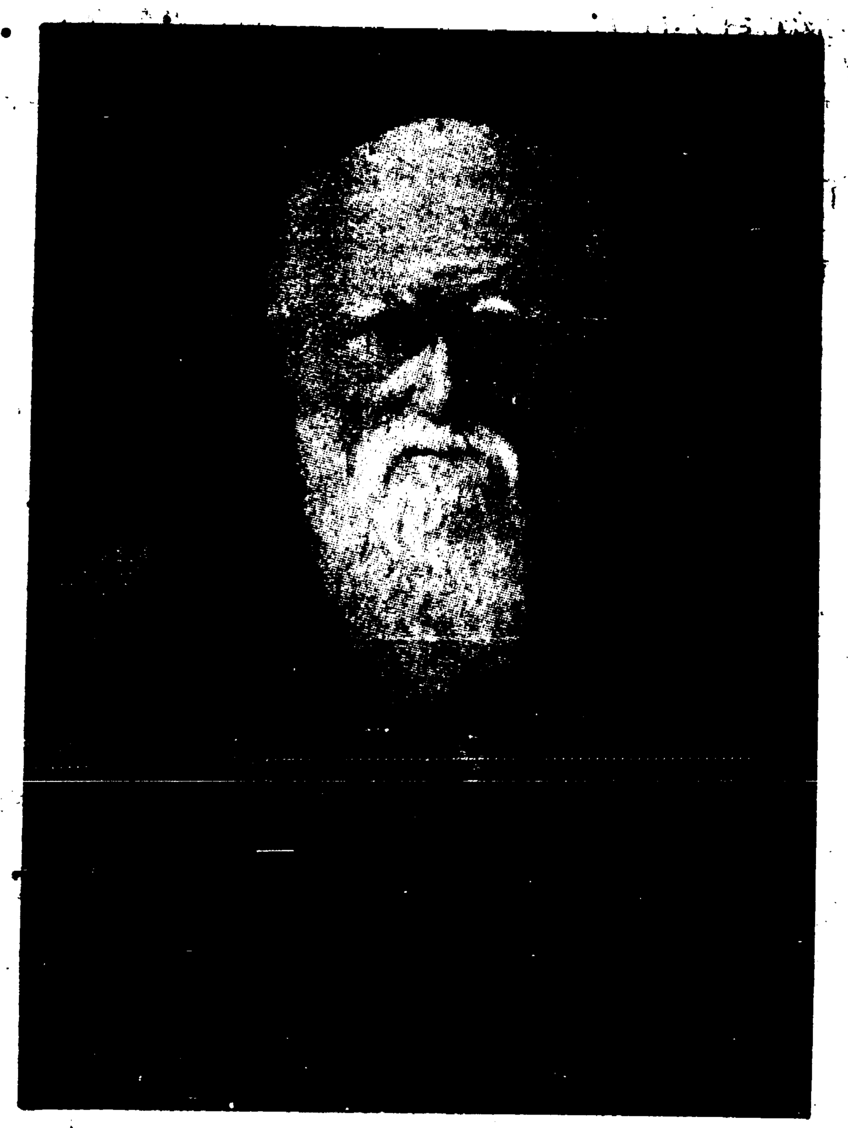

চার্ল্‌স্ ডারউইন

এই ভাবে নিম্নতম জানোয়ারের ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া উচ্চতম জানোয়ারে পরিণতিকেই বলে 'ক্রমপরিবর্ত্তন' (Evolution)। ডারউইন সাহেবের পূর্ব্বের পণ্ডিতদের ধারণা কিছু অস্পষ্ট ছিল—বিশেষতঃ পাদ্রীদের ভয়ে তাঁহারা এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ডারউইন ও ওয়ালেস (Wallace) সাহেব জিনিষটাকে এত পরিষ্কার প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দেন

যে ক্রমে সকলেই বুঝিতে পারে যে, 'ক্রমপরিবর্ত্তনে' ভুল নাই। আজকাল 'ক্রমপরিবর্ত্তন' কি ভাবে ঘটিয়াছিল ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে—এবং এ বিষয়ে ডারউইনের মত অনেকেই মানেন না। কিন্তু মনে রাখিও, 'ক্রম পরিবর্ত্তন' যে ঘটিয়াছিল এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

'রেডক্রস্' মানে কি?

তোমরা আজকাল নিশ্চয়ই হাসপাতালে, এম্বুলান্স-গাড়ীতে এবং ঐ জাতীয় সাধারণের চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে নানা রকম ভাবে লাল ক্রস্ চিহ্ন আঁকা দেখ। 'রেডক্রস্ সোসাইটী'র নামও হয়ত তোমরা অনেকে শুনিয়াছ—কিন্তু এই রেডক্রসের মানে হয়ত সকলে জান না।

সুইট্জারল্যাণ্ডে জেনিভা সহরে সমস্ত জাতির প্রতিনিধিদের লইয়া সভা বসে। এই রকম একটী সভায় (Geneva convention) ১৮৬৪ সনে স্থির হয় যে কোনও যুদ্ধে ডাক্তার, শুশ্রূষাকারী, হাসপাতাল কি এম্বুলান্সের উপর কখনও অস্ত্র নিক্ষেপ করা যাইবে না। সুইট্জারল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা হইতেছে লাল জমির উপর সাদা ক্রস্। সুইট্জারল্যাণ্ডকে সম্মান দেখাইবার জন্য ঠিক হয় যে ঐ সমস্ত শুশ্রূষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাদা জমির উপরে লাল ক্রস্ চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে এবং এই চিহ্ন দেখিলে কেহ কখনও অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না। সেই হইতে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা-সংক্রান্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এবং সমস্ত কর্ম্মচারী, যানবাহন ইত্যাদির উপরে 'রেডক্রস্' ব্যবহার করা হয়।

স্পেনে বর্ত্তমান অন্তর্বিপ্লবের কারণ কি?

কিছু দিন যাবৎ খবরের কাগজের সব চেয়ে জোর খবর হইতেছে স্পেনের অন্তর্বিপ্লব বা civil warএর কথা। Civil war কথাটার মানে তোমরা জান কি? এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের বা কতগুলি দেশের যুদ্ধ বাধিলে তাকে বলা হয় war অথবা international war. কিন্তু একই দেশের লোকেরা পরস্পরের মধ্যে যদি কাটাকাটি-মারামারি করে তবে সে যুদ্ধকে বলা হয় civil war. স্পেনের লোকেরা সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে এই ধরণের কাটাকাটি মারামারি সুরু করিয়াছে।

কিন্তু কেন? হঠাৎ 'ভাইয়ে-ভাইয়ে' মারামারি ঘটিবার কারণ কি তা জানিবার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের খুব কৌতূহল হইতেছে। খুব অল্প কথায় ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেছি।

পাঁচ বছর আগে পর্য্যন্ত স্পেনদেশ শাসন করিতেন সেখানকার রাজা—তাঁর নাম ছিল আল্‌ফোন্‌সো।

কিন্তু এ যুগের লোকেরা চায় গণতন্ত্র; গণতন্ত্রের মানে কি তা গত মাসে বুঝাইয়া দিয়াছি—দেশের লোকেরাই দেশ শাসন করিবে। তার ফলে বছর পাঁচেক আগে আলফোন্‌সোকে তাঁর রাজত্ব হারাইতে হইল, স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। (ইংল্যাণ্ডের রাজারা প্রায় দু'তিন শ' বছর হইল প্রজাদের হাতেই রাজ্য চালাইবার সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছেন, কাজেই সেখানে কোন গোলমাল নাই, প্রজারাও খুব রাজভক্ত। এই ধরণের রাজতন্ত্রকে বলা হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বা Constitutional monarchy)।

রাজা আলফোন্‌সো যখন রাজত্ব করিতেন তখন তাঁর পেছনে আসল শক্তি ছিল স্পেনের সৈন্যাধ্যক্ষেরা—সৈন্যাধ্যক্ষদের কমিটিগুলিকে বলা হইত জুণ্টা, আর এই জুণ্টাগুলির ছিল বাস্তবিকই প্রচুর প্রতাপ-প্রতিপত্তি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেদের হাতে ক্ষমতা আসিল। এখন, সাধারণ লোকও তো আর কিছু এক দলের নয়, তাদের মধ্যেও নানা রকমের মতভেদ আছে। যারা খুব উগ্রপন্থী, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে ওলট্‌পালট করিয়া একটা নতুন সমাজ গড়িতে চায় তাদের এক কথায় বলে বাঁ হাতের দল (Left wing); আর যারা সমাজের এখনকার অবস্থাটাকেই বরাবর বজায় রাখিতে চায় তাদের বলা হয় ডান হাতের দল (right wing)। দু'দলের মধ্যেই আবার নানা রকমের স্তর আছে—বড় হইলে সে সব তোমরা বুঝিতে পারিবে। স্পেনে এখন কর্ত্তৃত্ব চলিতেছে বাঁ হাতের দলের। ক্ষমতা পাইয়াই সৈন্যাধ্যক্ষদের জুণ্টাগুলিকে একটু একটু করিয়া তারা পিষিতে সুরু করিয়াছিল; সৈন্যাধ্যক্ষরা এইবার বুঝিয়াছে তাদের টিকিয়া থাকিতে হইলে এইবার একটা "শেষ কামড়" দেওয়া দরকার—নতুবা এর পর আর তারা কিছুই করিতে পারিবে না। তাই লাগিয়াছে দুই

যে ক্রমে সকলেই বুঝিতে পারে যে, 'ক্রমপরিবর্ত্তনে' ভুল নাই। আজকাল 'ক্রমপরিবর্ত্তন' কি ভাবে ঘটিয়াছিল ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে—এবং এ বিষয়ে ডারউইনের মত অনেকেই মানেন না। কিন্তু মনে রাখিও, 'ক্রম পরিবর্ত্তন' যে ঘটিয়াছিল এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

'রেডক্রস্' মানে কি?

তোমরা আজকাল নিশ্চয়ই হাসপাতালে, এম্বুলান্স-গাড়ীতে এবং ঐ জাতীয় সাধারণের চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে নানা রকম ভাবে লাল ক্রস্ চিহ্ন আঁকা দেখ। 'রেডক্রস্ সোসাইটী'র নামও হয়ত তোমরা অনেকে শুনিয়াছ—কিন্তু এই রেডক্রসের মানে হয়ত সকলে জান না।

সুইট্জারল্যাণ্ডে জেনিভা সহরে সমস্ত জাতির প্রতিনিধিদের লইয়া সভা বসে। এই রকম একটী সভায় (Geneva convention) ১৮৬৪ সনে স্থির হয় যে কোনও যুদ্ধে ডাক্তার, শুশ্রূষাকারী, হাসপাতাল কি এম্বুলান্সের উপর কখনও অস্ত্র নিক্ষেপ করা যাইবে না। সুইট্জারল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা হইতেছে লাল জমির উপর সাদা ক্রস্। সুইট্জারল্যাণ্ডকে সম্মান দেখাইবার জন্য ঠিক হয় যে ঐ সমস্ত শুশ্রূষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাদা জমির উপরে লাল ক্রস্ চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে এবং এই চিহ্ন দেখিলে কেহ কখনও অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না। সেই হইতে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা-সংক্রান্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এবং সমস্ত কর্ম্মচারী, যানবাহন ইত্যাদির উপরে 'রেডক্রস্' ব্যবহার করা হয়।

স্পেনে বর্ত্তমান অন্তর্বিপ্লবের কারণ কি?

কিছু দিন যাবৎ খবরের কাগজের সব চেয়ে জোর খবর হইতেছে স্পেনের অন্তর্বিপ্লব বা civil warএর কথা। Civil war কথাটার মানে তোমরা জান কি? এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের বা কতগুলি দেশের যুদ্ধ বাধিলে তাকে বলা হয় war অথবা international war. কিন্তু একই দেশের লোকেরা পরস্পরের মধ্যে যদি কাটাকাটি-মারামারি করে তবে সে যুদ্ধকে বলা হয় civil war. স্পেনের লোকেরা সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে এই ধরণের কাটাকাটি মারামারি সুরু করিয়াছে।

কিন্তু কেন? হঠাৎ 'ভাইয়ে-ভাইয়ে' মারামারি ঘটিবার কারণ কি তা জানিবার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের খুব কৌতূহল হইতেছে। খুব অল্প কথায় ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেছি।

পাঁচ বছর আগে পর্য্যন্ত স্পেনদেশ শাসন করিতেন সেখানকার রাজা—তাঁর নাম ছিল আল্‌ফোন্‌সো।

কিন্তু এ যুগের লোকেরা চায় গণতন্ত্র; গণতন্ত্রের মানে কি তা গত মাসে বুঝাইয়া দিয়াছি—দেশের লোকেরাই দেশ শাসন করিবে। তার ফলে বছর পাঁচেক আগে আলফোন্‌সোকে তাঁর রাজত্ব হারাইতে হইল, স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। (ইংল্যাণ্ডের রাজারা প্রায় দু'তিন শ' বছর হইল প্রজাদের হাতেই রাজ্য চালাইবার সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছেন, কাজেই সেখানে কোন গোলমাল নাই, প্রজারাও খুব রাজভক্ত। এই ধরণের রাজতন্ত্রকে বলা হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বা Constitutional monarchy)।

রাজা আলফোন্‌সো যখন রাজত্ব করিতেন তখন তাঁর পেছনে আসল শক্তি ছিল স্পেনের সৈন্যাধ্যক্ষেরা—সৈন্যাধ্যক্ষদের কমিটিগুলিকে বলা হইত জুন্টা, আর এই জুন্টাগুলির ছিল বাস্তবিকই প্রচুর প্রতাপ-প্রতিপত্তি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেদের হাতে ক্ষমতা আসিল। এখন, সাধারণ লোকও তো আর কিছু এক দলের নয়, তাদের মধ্যেও নানা রকমের মতভেদ আছে। যারা খুব উগ্রপন্থী, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে ওলট্পালট করিয়া একটা নতুন সমাজ গড়িতে চায় তাদের এক কথায় বলে বাঁ হাতের দল (Left wing); আর যারা সমাজের এখনকার অবস্থাটাকেই বরাবর বজায় রাখিতে চায় তাদের বলা হয় ডান হাতের দল (right wing)। দু'দলের মধ্যেই আবার নানা রকমের স্তর আছে—বড় হইলে সে সব তোমরা বুঝিতে পারিবে। স্পেনে এখন কর্ত্তৃত্ব চলিতেছে বাঁ হাতের দলের। ক্ষমতা পাইয়াই সৈন্যাধ্যক্ষদের জুন্টাগুলিকে একটু একটু করিয়া তারা পিষিতে সুরু করিয়াছিল; সৈন্যাধ্যক্ষরা এইবার বুঝিয়াছে তাদের টিকিয়া থাকিতে হইলে এইবার একটা "শেষ কামড়" দেওয়া দরকার—নতুবা এর পর আর তারা কিছুই করিতে পারিবে না। তাই লাগিয়াছে দুই

দলে যুদ্ধ। বাঁ হাতের সম্মিলিত দলে (Popular Front), অর্থাৎ সরকার পক্ষে আছে স্পেনের পুলিশ, সিভিল গার্ড্, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগের অধিকাংশ, পদাতিকদের মধ্যে কিছু কিছু আর বাঁ-হাতী দলের নিজস্ব সৈন্যসামন্ত। সৈন্যাধ্যক্ষদের দলে আছে—অশ্বারোহী, গোলন্দাজ এবং প্রায় সমস্ত পদাতিক সৈন্য, রাজা আল্‌ফোন্‌সোর অনুরাগী লোকেরা, এবং ডান হাতের দলের মধ্যে যারা একেরারে প্রথম স্তরের সেই সমস্ত লোক।

লেখক ধনগোপাল

(শ্রীনির্ম্মলকুমার সরকার)

তোমরা অনেকেই বোধ হয় 'চিত্রগ্রীব' এবং 'যূথপতি' বই ত্ব'খানি পড়েছ? এ ত্ব'খানা বইই যাঁর ইংরাজী লেখার তর্জ্জমা তাঁর নাম হচ্ছে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গালীর ছেলে একটা বিদেশী ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের দখলে এনে কি চমৎকার সাহিত্য যে রচনা কর্‌তে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ধনগোপাল বাবু। পৃথিবীর নানা দেশে নানা জাতের লোক আগ্রহের সঙ্গে তাঁর লেখা পড়ে থাকে। আমাদের তুর্ভাগ্য, গত ১৫ই জুলাই আমরা এই প্রতিভাবান্ পুরুষটিকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছি।

ধনগোপাল বাবুর জীবন বাস্তবিকই বাঙ্গালী ছেলেদের শোনাবার মত। একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় বিদেশে গিয়েও কেবল প্রতিভার জোরে যে ভাবে তিনি নিজের জীবনকে সার্থক করে গেছেন তা বাস্তবিকই গল্প বলার মত।

১৮৯০ সনের ৬ই জুলাই কল্‌কাতার কাছাকাছি এক গ্রামে ধনগোপালের জন্ম হয়। তাঁদের পরিবারের পৈতৃক পেশা ছিল পূজা-পার্ব্বণে লোকের বাড়ী পৌরোহিত্য করা। ধনগোপালকেও ছেলেবেলা হতেই সে কাজে লাগ্‌তে হল, কিন্তু পুরুতের এ ছেলেটির পৈতৃক ব্যবসায়ে তেমন মন বস্‌ল না, তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিত্যি-নূতন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা। ফলে পনেরো বছর

বয়সেই সারা ভারতবর্ষটা তাঁর এক রকম দেখা হয়ে গেল। তার পর এলেন তিনি কল্‌কাতায় পড়্‌তে, কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই দিলেন এক লম্বা পাড়ি—সুদুর জাপানে—একেবারে সহায়-সম্পদ্‌হীন ভাবে। জাপানের কল-কারখানায় কিন্তু তিনি প্রাণের সাড়া পেলেন না, পেলেন তার মুক্ত প্রান্তরে, অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে। কলকব্জা নাড়াচাড়ার চাইতে কলম ধরে সাহিত্যচর্চ্চাতেই তাঁর ঝোঁকটা যে বেশী তা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু জাপানেও স্থিতি হ'ল না বেশী দিন—আবার ভ্রাম্যমাণ—এবার একেবারে এড্‌ভেঞ্চারের সেরা দেশ আমেরিকা। ইতিমধ্যেই ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তাটা বেশ বল্‌তে-কইতে শিখেছিলেন, ভর্ত্তি হয়ে পড়লেন ক্যালিফোর্ণিয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। ট্যাঁক্ একেবারে শূন্য, কিন্তু দম্‌বার পাত্র আর যেই হোক ধনগোপাল নন্; সুরু করে দিলেন হোটেলে কাজ, সুরু করে দিলেন রাস্তায় রাস্তায় জিনিষপত্র ফিরি করা, যাকে বলে দারিদ্র্যের একেবারে চরম দশা। এম্‌নি ভাবে কিছু দিন যাবার পর

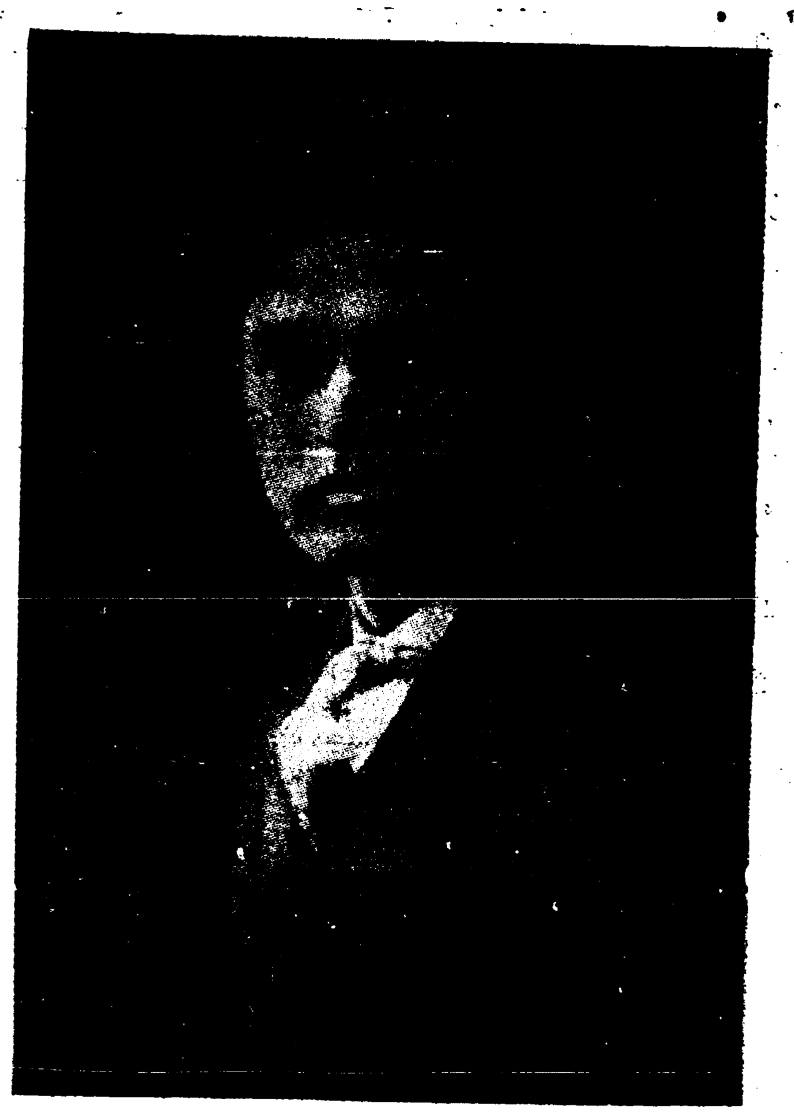

লেখক ধনগোপাল

১৯১৪ সনে লেল্যাণ্ড্ ষ্ট্যান্‌ফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি Ph. B. উপাধি লাভ করলেন।

শিক্ষা শেষ করবার পর বক্তৃতার দিকে তাঁর ঝোঁক পড়্‌ল; শুধু আমেরিকায় নয়, বিলাতের অনেক জায়গায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু ধনগোপালের আসল খ্যাতি যে জন্য সেটা হচ্ছে তাঁর বিরাট্ সাহিত্য-প্রতিভা। কেবল আমেরিকা বলে নয়, যে যে দেশে ইংরাজী ভাষার চলন আছে আশা করা যায় সে সমস্ত দেশেই

ধনগোপাল বাবু তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আরও অনেক দিন বেঁচে থাক্‌বেন। ছেলেমেয়েদের জন্য যা কয়খানি বই তিনি লিখেছেন তা বাস্তবিকই অতি উঁচুদরের—আমেরিকার সুধী-সমাজও তা স্বীকার করেছে তাঁকে "জন নিউবেরি" মেডেল দিয়ে। Gay neck (চিত্রগ্রীব) বইখানি লিখেই এ পুরস্কার তিনি পান। এ ছাড়া তাঁর 'Kari, the elephant,' 'Jungle beasts and men,' 'Hari the jungle lad', 'Rama, the hero of India' এ সব বইও অতি উপাদেয়। কেবল যে শিশু-সাহিত্যেরই একজন পাকা ওস্তাদ্ ছিলেন তিনি তা নয়—বড়দের সাহিত্যেও তাঁর খাসা হাত ছিল। মিস্ ক্যাথেরাইন্ মেয়ো নামে একজন আমেরিকান মেম সাহেব এদেশে বেড়িয়ে গিয়ে ভারতীয়দের নানা রকম দুর্নাম দিয়ে 'Mother India' নামে একখানা বিশ্রী বই লেখেন। তার জবাব দেন ধনগোপাল বাবু 'A Son of India answers' লিখে। তা ছাড়া তাঁর 'Visit India with me,' 'Caste and outcast,' 'The face of Silence,' 'My brother's face' প্রভৃতি বইগুলিরও প্রচুর নাম আছে।

কাজকর্ম্মের সূত্রে আমেরিকাতেই তাঁকে বরাবর বাস কর্‌তে হয়েছিল, সেখানেই তিনি বিবাহাদি করেছিলেন, কিন্তু একটি দিনের তরেও জন্মভূমি ভারতকে তিনি ভুল্‌তে পারেন নি। সারাজীবন আমেরিকায় ভারতের গৌরবকাহিনীই তিনি প্রচার করে গেছেন। বাংলা দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই খোঁজ রাখ্‌তেন, অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি তাঁর চল্‌ত। তাঁদের লেখা ভাল হলে মুক্তকণ্ঠে তিনি প্রশংসা কর্‌তেন, প্রচুর উৎসাহ দিতেন। আমেরিকায় স্থায়ী ভাবে বাস কর্‌বার পর বার কতক তিনি দেশে এসেছিলেন—'আমেরিকান্ সাহেব' মিষ্টার মুখার্জ্জির চালে নয়, ঘরের ছেলে যে ভাবে ঘরে ফিরে আসে সেই খাঁটি বাঙ্গালীর ধরণে। অথচ যে দেশের সামান্য একটু হাওয়া গায়ে লাগিয়েই আমাদের অনেক অখ্যাত লোক একেবারে 'ধোপদোরস্ত সাহেব' বনে যান, সেই খোদ্ ইংল্যাণ্ডেই তখন ধনগোপালের খ্যাতিপ্রতিপত্তি এতখানি ছড়িয়ে পড়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ্ হ'তে পর্য্যন্ত তাঁর নিমন্ত্রণ আস্‌ত।

যুধিষ্ঠির বাবু ও টম্

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

বাপ-মা আদর করিয়া ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন যুধিষ্ঠির। আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাম খুবই ফ্যাশন-দুরস্ত এবং ব্যাকরণসম্মতও বটে। ব্যাকরণ-সম্মত নামের বাংলা দেশে বড়ই অভাব, প্রমাণ এখনই দেখাইয়া দিতেছি। তোমার নাম কি? হয় সুরেন, না হয় সুবোধ, না হয়তো নিশ্চয়ই বিমল। সত্যি না? আচ্ছা বেশ, এবার নামটি 'পাস্' কর তো? তুমি (যদি 'গ্রামার' ভাল জান বলিয়া তোমার সুনাম থাকে) অমনি সুরু করিবে—'নাউন্—প্রপার নাউন্—ম্যাস্‌কু—' ব্যস্, ঐখানেই ব্যাকরণের মাথায় কুড়ুল পড়িল। সুরেন, কি সুবোধ, কি বিমল এ সব নামকে মোটেই প্রপার নাউন্ বলা চলে না, নামগুলি একেবারেই সাধারণ অর্থাৎ 'কমন্'—বাংলা দেশের অলিতে-গলিতে ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যাইবে। কাজেই এগুলিকে কমন্ নাউন্ই বলা উচিত। অথচ "যাহা দ্বারা কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে ব্যক্ত করা হয় তাহাকে প্রপার নাউন্ কহে"—এ কথা কে না জানে? কিন্তু যুধিষ্ঠির নামটা দেখ দেখি? একেবারে 'আন্‌কমন্' অর্থাৎ প্রপার। সেই দ্বাপর যুগে ছিলেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, আর এই কলিতে আমাদের যুধিষ্ঠির বাবু—যুধিষ্ঠির গুপ্ত। ইংরাজীতে সংক্ষেপে লিখিতে গেলে তো কথাই নাই—মিষ্টার ওয়াই, গুপ্ত—একেবারে 'প্রপারেষ্ট্' নাম হইয়া পড়িবে। দ্বাপরের যুধিষ্ঠিরও তখন আর এ নামে ভাগ বসাইতে পারিবেন না। কাজেই নামটির জন্য যুধিষ্ঠির বাবুর বাপ-মা'র কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু, অদৃষ্টের পরিহাস ইহাকেই বলে।

মহাপ্রস্থানের পথে যে যুধিষ্ঠিরের কুকুর-প্রীতি মহাভারতের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছে সেই যুধিষ্ঠির নামের সঙ্গে শত্রুতা করিবার জন্যই বোধ হয় আমাদের যুধিষ্ঠির বাবুর ছিল অহেতুক রকম কুকুর-ভীতি—কুকুরে অরুচি। আজ বলিয়া নয়, সেই কচি বয়স হইতে। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, বাজী অর্থাৎ ঘোড়ার

ঠ্যাং হইতে সর্ব্বদা এক শ' হাত দূরে থাকিবে। কুকুরের কাছ হইতে কত হাত দূরে থাকিতে হইবে সে সম্বন্ধে সংস্কৃতে কিছু লেখা নাই, কাজেই যুধিষ্ঠির বাবু একটু হাতে রাখিয়া শ' দেড়েক হাত দূরে দূরেই থাকিতেন। রাস্তায় চলিতে চলিতে যদি কখনও কোন কুকুর হইতে তাঁর দূরত্ব দেড়শ' হাতের কম হইয়া পড়িত তবে তিনি তখনই দৌড়াইয়া সে ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইতেন। আর যদি তা' করা নেহাৎই অসম্ভব হইত তবে সঙ্গে যে অভিভাবক থাকিত তাঁর কাছাটি ধরিয়া তারই আড়ালে নিজেকে গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন।—তখন তাঁর বুকের ভিতর আওয়াজ হইত ঢিব্ ঢিব্ ঢিব্ ঢিব্। কুকুরের কাছে যাওয়া মানে তার কামড় খাওয়া, কামড় খাওয়া মানে জলাতঙ্ক, আর জলাতঙ্ক মানে একদম খতম্—পাঁচ বছর বয়স হইতেই যুধিষ্ঠির বাবুর এ সত্য জানা ছিল।

কাছাটি ধরিয়া তারই আড়ালে···

এখন যুধিষ্ঠির বাবুর বয়স কিছু বাড়িয়াছে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কুকুর-ভীতিও কিছুটা কমিয়াছে, কিন্তু কুকুরের প্রতি কোন রকম স্নেহভাব আজও তাঁর মনে উঁকি দিতে পারে নাই। এমন সময়ে একদিন যুধিষ্ঠির বাবুর বিবাহ হইয়া গেল।

যুধিষ্ঠির বাবুর শ্বশুর-বাড়ী ভবানীপুরে। শ্বশুর মহাশয় বেশ পয়সাওয়ালা লোক, এবং শুধু পয়সা নয়, সেই সঙ্গে তাঁর নাকি কিছু কলাজ্ঞানও আছে। তাঁর

সাজান-গোছান বাড়ীখানা দেখিলেই তা' বুঝা যায়। বিবাহের সময়ে হট্টগোলে শ্বশুর-বাড়ীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বাবুর ভাল রকম পরিচয় হয় নাই, তাই এই রবিবার তাঁকে সেখানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির বাবু থাকেন শ্যামবাজারের এক মেসে—তাঁর ছোট শালা আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে।

বেলা দশটার সময়ে স্নান সারিয়া, পরিপাটী করিয়া পোষাক পরিয়া, যুধিষ্ঠির বাবু তৈরী হইলেন। নতুন জামাই, বলা বাহুল্য এসেন্স্ মাখিতে ভুল হইল না, এবং, অভ্যাস না থাকায় একটু বেশী পরিমাণ এসেন্স্ই খরচ হইয়া গেল। কস্তুরী মৃগের মত নিজের গন্ধে নিজেই মাতোয়ারা হইয়া যুধিষ্ঠির বাবু শ্বশুর-বাড়ী রওনা হইলেন।

যথা সময়ে ট্যাক্সী ভবানীপুরে পৌঁছিল। যুধিষ্ঠির বাবুর শ্যালক-শ্যালিকার সংখ্যা ঈশ্বরেচ্ছায় কিছু বেশী; মোটরের শব্দে তারাই আগে ছুটিয়া আসিবে এ কথা যুধিষ্ঠির বাবুর অজানা ছিল না। কি ভাবে তাদের সহিত রসিকতা করিতে হইবে মনে মনে তারও একটা খস্ড়া তাঁর করা ছিল। কিন্তু গাড়ী থামিতেই তিনি খাইলেন এক প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্। যুধিষ্ঠির বাবুকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল —না না, কোন শালা নয়, শালীও নয়—আসিল এক যোড়া বিরাট বুল্ টেরিয়ার কুকুর। যুধিষ্ঠির বাবুর নাক সঙ্কুচিত হইল, তিনি মাটীতে নামিয়া আবার সভয়ে পা-দানীতে পা তুলিলেন। ট্যাক্সীর মিটারে হু-হু করিয়া ভাড়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কে তা'কে বাধা দিবে? অবশেষে কুকুরের চীৎকারে ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর আর সকলে আসিয়া জামাইকে উদ্ধার করিল।

শ্বশুর মহাশয় লোকটি বড় ভালমানুষ, বড়ই সাধাসিধা; জামাইকে কি করিয়া খুসী করিবেন ভাবিয়া পান না। কথায় কথায় "বাবাজী বাবাজী" করিয়া বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। খানিকক্ষণ কুশল সমাচারে কাটিলে পর শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "ওহো, বাড়ীর সকলকার সঙ্গে বুঝি বাবাজীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি? ওরে—!"

ওয়ান্—টু—থ্রী। একে একে পর পর সাতটি নানা বর্ণের এবং নানা আকারের কুকুর ঘরের মধ্যে ঢুকিল, এবং যুধিষ্ঠির বাবুকে সপ্তরথীর মত ঘিরিয়া

দাঁড়াইয়া প্রাণপণে তাঁকে আঘ্রাণ করিতে লাগিল। তাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল এসেন্সের মিষ্টি গন্ধে তাদের নাক ভরপুর হইয়া গিয়াছে। যুধিষ্ঠির বাবুর গায়ের লোম ততক্ষণে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। যদিও তাঁর চোখ দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি চোখ মেলিয়া আছেন কিন্তু আসলে তিনি তখন চোখ বুঁজিয়া পরমব্রহ্মের নাম জপিতেছিলেন। শ্বশুর মহাশয় বলিয়া চলিলেন, "এই আমার

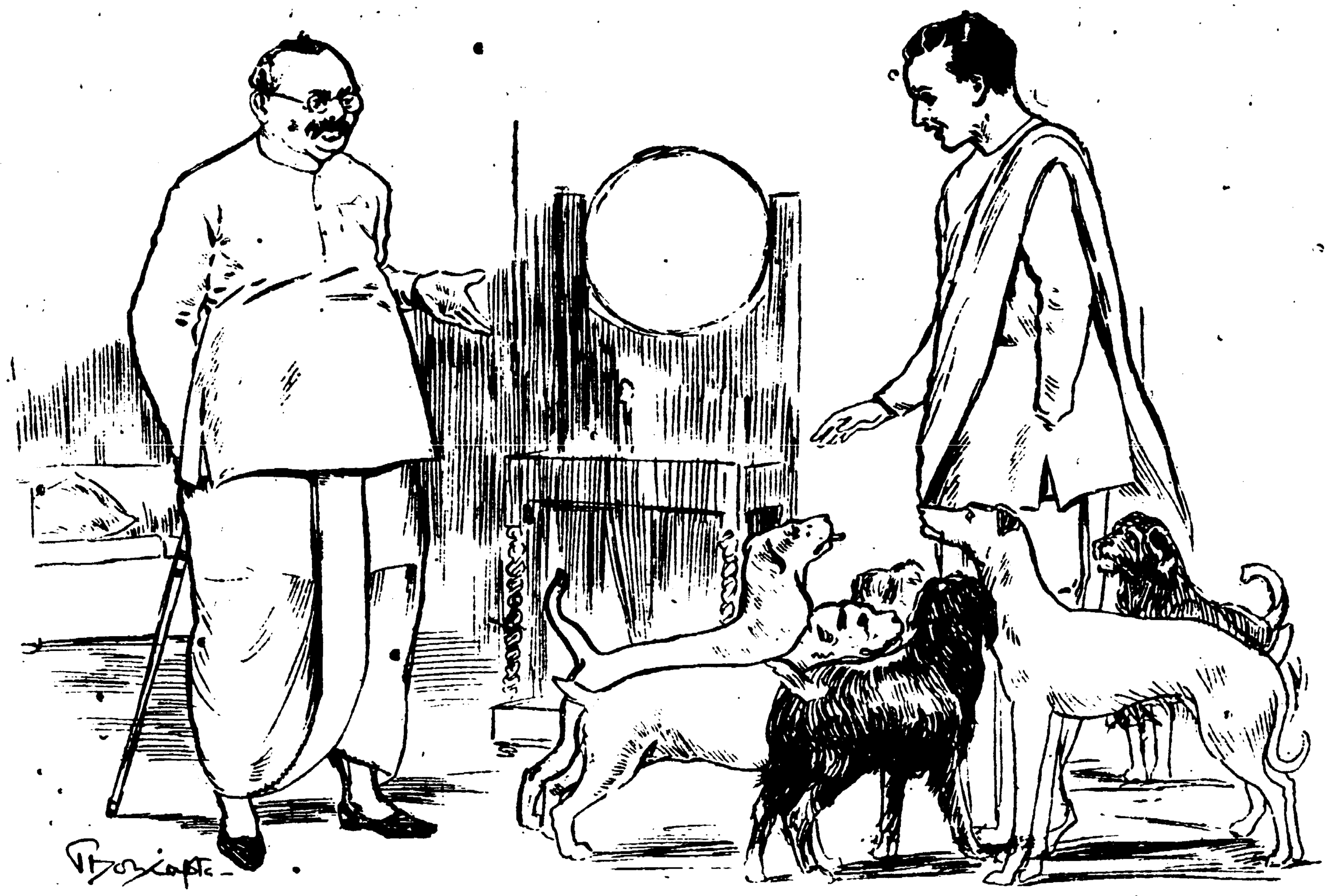

সপ্তরথীর মত ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া……আঘ্রাণ করিতে লাগিল।

একটা 'হবি' আছে। কুকুরের। ভারী চমৎকার, নয়? এস, আলাপ করিয়ে দি। এর নাম জলি—আসল স্প্যানিয়ার্ড্; এর নাম ডলি—ঠিক পুতুলের মত দেখতে, নয়? আর ঐ জ্যাকি, ঐ হেক্টর, আর এই টম্—টেরিয়ার। টম্ গেল বছর এখানকার ডগ্-শোতে কন্সোলেশন্ প্রাইজ্ পেয়েছিল। আর এই দু'টির বাংলা নাম দিয়েছি, ট্যাঁপা আর গুপী; এগুলো সব—এই টম্, জামাইবাবুকা সাথ বাৎচিৎ কর। এর সঙ্গে আমি হিন্দিতে কথা বলি।" টম্ 'বাৎ' আরম্ভ করিল—কানে একেবারে মধুবর্ষণ করিয়া, তার ভাবে বেশ বুঝা গেল জামাইকে 'চিৎ' করিতেও তার

বেশী সময় লাগিবে না। পর মুহূর্ত্তেই যুধিষ্ঠির বাবু সভয়ে আবিষ্কার করিলেন তিনি এখন আর অগুরুর মত গন্ধদ্রব্য নন, মকরধ্বজের মত একটি লেহ্য পদার্থে পরিণত হইয়াছেন (চর্ব্ব্য ও চোষ্য হইবার আশঙ্কাও যে তাঁর ছিল না এমন নয়)। সাতটি 'বাড়ীর সকলে' মিলিয়া তাঁকে প্রাণপণে লেহন করিতেছে। কী খস্‌খসে এক-একখানি জিভ—যেন শিরীষ কাগজ! পরক্ষণেই ধপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল। যুধিষ্ঠির বাবু মাটীতে বসিয়া পড়িয়াছেন—তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। হৈ চৈ, গোলমালে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। এই গরমে সর্দ্দি-গর্ম্মী হইবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? শ্বশুর মহাশয় অনর্গল সবাইকে ধমকাইতে লাগিলেন। জামাইকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

যুধিষ্ঠির বাবু সেইদিনই মেসে ফিরিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কোন দিন তিনি শ্বশুর-বাড়ীর ওমুখো হইবেন না—একেবারে 'কম্‌প্লীট্ বয়কট্'। পর পর তিনবার তিনটি লোভনীয় নিমন্ত্রণ তিনি দৃঢ়চিত্তে নানা অজুহাত দিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু হায় পুরুষের অদৃষ্ট! দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?—দেবতারাই জানেন না, মানুষ কোন্ ছার! হঠাৎ একদিন স্বয়ং শ্বশুর মহাশয় জামাই-এর মেসে আসিয়া হাজির।

শ্বশুর মহাশয় সপ্তাহখানেকের জন্য সপরিবারে মধুপুর চলিয়াছেন, জামাইকেও সঙ্গে লইতে চান। 'সপরিবারে' কথাটির অর্থ বুঝিতে যুধিষ্ঠির বাবুর বাকী রহিল না; সাতটি কুকুরও যে এ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তা কে না জানে? কুকুর যে শ্বশুর মহাশয়ের 'হবি'। তিনি মনকে শক্ত করিলেন, জানাইলেন এখন তাঁর পক্ষে কলিকাতা-ত্যাগ অসম্ভব—কাজের অত্যন্ত চাপ। শ্বশুর মহাশয় অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠির বাবু হিমালয়ের মত অটল। কাজ তাঁর সত্যিই এমন কিছু ছিল না, কিন্তু সাতটি কুকুরের সহিত এক গৃহে এক সপ্তাহ একত্র বাস! তার চাইতে বাজারে গিয়া একগাছা দড়ি ও একটি কলসী কিনিয়া সেগুলি গলায় বাঁধিয়া হাওড়ার পোলের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলেই তো হয়! ও একই কথা।

জামাইকে কিছুতেই বাগ মানাইতে না পারিয়া শ্বশুর মহাশয় ক্ষুণ্ণকণ্ঠে

কহিলেন, "যাওয়া যখন কোন রকমেই সম্ভব নয় তখন বাবাজী, একটা কাজের ভার নাও। আমার কুকুরের 'হবি' জান তো? কুকুর হচ্ছে আমার দ্বিতীয় প্রাণ। কিন্তু তাই বলে তো আর এক হপ্তার জন্য ওগুলোকে মধুপুরে টেনে নেওয়া যায় না! আমাদের পাড়ার বলরাম বাবু ছ'টি কুকুরের ভার নিতে রাজী হয়েছেন কিন্তু টম্‌কে আমি যার তার কাছে রেখে যেতে পারব না! ও আমার বড় আদরের। ওকে আবার ভয়ানক নিয়মে রাখা হয়। একটু অনিয়ম হয়েছে কি ব্যস্, নিউমোনিয়া। ওকে তা' হ'লে এ ক'টা দিন তোমার কাছেই রেখে যাব। বিশেষ কিছুই না, রোজ ওকে পোটেক্ মাংস আর আধসেরটাক দুধ দিতে হবে। তা' হ'লেই হ'ল। আর একটু যত্নে রাখা। তা' তোমায় আর কি বলব বাবাজী, বুঝতেই পারছ, কুকুর হচ্ছে আমার 'হবি'।"

যুধিষ্ঠির বাবু চোখ দু'টি ছানাবড়া করিয়া তাকাইয়া রহিলেন; কিন্তু একে শ্বশুর—তার উপর আবার নতুন শ্বশুর, বড় দুর্ব্বল জায়গা; ফুটি-ফুটি করিয়াও তাঁর মুখ দিয়া একটি কথাও ফুটিল না।

যথা সময়ে যুধিষ্ঠির বাবুর স্কন্ধে টম্ আরূঢ় হইল। যুধিষ্ঠির বাবু শুনিয়াছিলেন কুকুরকে লাই দিলে মাথায় চড়ে, এখন দেখিলেন লাই না দিলেও কোন কোন কুকুর মাথায় চড়িবার চেষ্টা করে—যদি সে শ্বশুর-বাড়ীর কুকুর হয়। আহ্লাদে ছেলে নিয়াও হয়তো কাজ চলিতে পারে কিন্তু আহ্লাদে কুকুর একেবারেই অচল। একটা জানোয়ার (সত্যিসত্যিই জানোয়ার) যখন তখন নির্ব্বিকারচিত্তে তোমার হাত, পা বা গা চাটিতে সুরু করিয়া দিবে—ভাবিতেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে না? কিন্তু উপায় নাই। যুধিষ্ঠির বাবু নিশ্চয়ই 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' গোছের কোন ছল-চাতুরী এ জন্মেও করিয়াছিলেন, তাই এই নরকভোগ।

টম্ যে শুধু মাংস আর দুধেরই ভক্ত তা নয়, দেখা গেল শিঙ্গাড়া-কচুরীতেও তার যুধিষ্ঠির বাবুর মতই অনুরাগ। সামনে বসিয়া কিছু খাইবার যো নাই; পারে তো কাড়িয়া খায়। টম্‌কে শিকল বাঁধিয়া রাখিতেও শ্বশুর মহাশয়ের কড়া নিষেধ ছিল, উহাতে নাকি কুকুর ভীরু হইয়া যায়। অতএব বেচারা যুধিষ্ঠির বাবু বড়ই মুশ্‌কিলে পড়িয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে মেসের রাজ্যে অরাজকতা সুরু হইল। ঠাকুর আসিয়া খবর দিল 'মানিজার বাবু'র নিজের-হাতে-বাজার-করা মাছের মুড়ো সে এই মাত্র সাঁৎলাইয়া রাখিয়াছিল—মুড়িঘণ্টের জন্য, হঠাৎ সে মুড়ো কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! তার কিছু আগে টম্‌কে রান্না-ঘরের কাছে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরিতে দেখা গিয়াছিল, এবং এখন তার মুখে পেঁয়াজের গন্ধও কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। বিপিন বাবু আজ বাড়ী যাইবেন, ছেলের জন্য এক ঠোঙ্গা বিস্কুট কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ঠোঙ্গাশুদ্ধ একেবারে অদৃশ্য!—টমের দাঁতের ফাঁকে বিস্কুটের গুঁড়া লাগিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। হরেন বাবুর ঘরে কে যেন অপকর্ম্ম করিয়া গিয়াছে—টম্ ছাড়া আর কারও কাজ নয়। পাঁড়েজির ছয় যোড়া মুক্ষি পায়রা ছিল, টম্ তাদের দু'টিকে আজ প্রায় ঘাল করিয়াছিল, আধেকলাল আসিয়া ছাড়াইয়া দেওয়ায় সে দু'টি রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু তার বদলে আধেকলালের পায়ে টমের কয়েক পাটী দাঁত বসিয়া গিয়াছে। আধেকলালকে এখনই ট্রপিক্যাল স্কুলে পাঠাইতে হইবে। যুধিষ্ঠির বাবুর মাথায় রক্ত উঠিয়া গেল—তাঁর মনের মধ্যে কে যেন বলিতে লাগিল, "পাপ নহে, পাপ নহে, কুত্তাহত্যা পাপ নহে"। আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার। টম্‌কে আজ তিনি শাসন করিবেনই। কুকুর কুকুরই, তা' শ্বশুর-বাড়ীরই হোক্ আর বাপের বাড়ীরই হোক্। মনে মনে যুধিষ্ঠির বাবু অওড়াইতে লাগিলেন, "শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা—স কিং স কিং স কিং—" বাকীটা তাঁর আর মনে পড়িল না।

"টম্! ট-ম্!! ট--ম্!!!" টমের সাড়া নাই। যুধিষ্ঠির বাবুর হাতে বেত দেখিয়া টম্ সরিয়া পড়িয়াছে। কোথায় গেল সে! যাক্ যেখানে খুসী। ও আপদ্ বিদায় হইলেই বাঁচা যায়।

ক্রমে বেলা গড়াইয়া চলিল, কিন্তু টমের দেখা নাই। যুধিষ্ঠির বাবু ক্রমে চিন্তিত হইতে লাগিলেন। সত্যিই কি কুকুরটা সাধু-সন্ন্যাসীর মত গৃহত্যাগ করিল নাকি! শ্বশুর মহাশয় বলিয়াছিলেন বটে টম্ বড় অভিমানী, কিন্তু কুকুরের আবার অভিমান থাকিবে কি? তবে আর ওদের কুকুর বলিবে কেন, মানুষই তো বলিতে পারিত!

ক্রমে বারোটা বাজিল, একটা বাজিল, দেড়টা বাজিয়া গেল; টমের তবু

দেখা নাই। যুধিষ্ঠির বাবু এবার প্রমাদ গণিলেন। তাঁর তখনও নাওয়া-খাওয়া হয় নাই। পাশের ঘরের হরিদাস বাবু এক ঘুম দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি হ'ল যুধিষ্ঠির, মুখখানা অমন করে আছ কেন? কুকুরের দেখা পেলে না! আচ্ছা ফ্যাসাদ জুটেছে বাপু! তোমার বন্ধু মহেন্দ্র নিয়ে পালায় নি তো? সে কিন্তু সকালে তোমার খোঁজ করছিল, সে তো আবার বড্ড কুকুর ভালবাসে।"

সত্যিই তো, সে তো খুবই সম্ভব। চট্ করিয়া যুধিষ্ঠির বাবুর মনে পড়িল, মহেন্দ্রকে তিনি কালই বলিয়াছিলেন, টম্‌কে আজই বিদায় করিতে পারিলে তিনি বাঁচেন। মহেন্দ্র ভুল বুঝিল না তো!

বিদ্যুদ্বেগে আলনা হইতে একটা পাঞ্জাবী টান দিতেই নীচে সদর দরজায় ধাক্কা শোনা গেল। হয়তো মহেন্দ্র টম্‌কে ফিরাইয়া আনিয়াছে—ক্ষীণ আশা লইয়া যুধিষ্ঠির বাবু নামিয়া আসিলেন। দরজায় টম্ নয়, মহেন্দ্রও নয়, পিয়ন। পিয়ন যুধিষ্ঠির বাবুর হাতে একখানি চিঠি দিল। মধুপুরের চিঠি। শ্বশুর মহাশয় জানাইয়াছেন, তাঁরা আজই বিকালে কলিকাতা ফিরিতেছেন, সন্ধ্যার পর যুধিষ্ঠির বাবু যেন টম্ সহ সেখানে যান—রাত্রের আহারাদি সেখানেই হইবে। যুধিষ্ঠির বাবু ততক্ষণে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন।

মহেন্দ্রের বাড়ী গিয়া শুনিলেন সে একটার ট্রেনে কৃষ্ণনগর গিয়াছে, টমের খোঁজ বাড়ীর কেহ দিতে পারিল না। যুধিষ্ঠির বাবু হতাশ ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলেন। যে যুধিষ্ঠির বাবু অন্য দিন কুকুর দেখিলে ভ্রূ-নাক কুঁচকাইয়া তফাতে সরিয়া যান আজ তিনিই রাস্তায় একটি কুকুর দেখিলেই পরমাগ্রহে তার দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু টমের দেখা মিলিল না। সারাদিন অনাহারে, অস্নানে রোদে রোদে ঘুরিয়া সন্ধ্যার একটু আগে তিনি শ্রান্ত দেহে, ভগ্ন মনে মেসে ফিরিলেন।

আধেকলাল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চা দিবে কিনা। যুধিষ্ঠির বাবু হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। তাঁর চেহারা দেখিয়া মনে হইল এইমাত্র তাঁকে ফাঁসীর হুকুম দিয়া 'সেলে' বন্ধ করা হইয়াছে।

সে রাত্রে যুধিষ্ঠির বাবু ঘরে আর আলো জ্বালিলেন না। ঠাকুরকে বলিলেন, তিনি আজ আর কিছু খাইবেন না; চাকরকে বলিলেন, কেহ তাঁহাকে ডাকিলে তাহার মাথা ছাতু করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ দেহে কম্বল টানিয়া তিনি বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

পরক্ষণেই তাঁর পিঠের তলা হইতে বাঁশীর মত একটা আওয়াজ বাহির হইল—'কেঁও!' যুধিষ্ঠির বাবু লাফাইয়া উঠিলেন; তাড়াতাড়ি সুইচ্ টিপিয়া দেখেন তাঁর বিছানার উপর কম্বলের তলায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শ্বশুর মহাশয়ের 'হবি'—'ডগ্-শো'তে কন্‌সোলেশন্-প্রাইজ-পাওয়া টম্ বাবাজী দিবানিদ্রা বা সান্ধ্যনিদ্রা উপভোগ করিতেছে। উচ্ছ্বসিত আনন্দ যুধিষ্ঠির বাবুর মুখ, চোখ, সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। জীবনে এই প্রথম তিনি একটি কুকুরকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিলেন।

বায়ুমণ্ডলের কথা

(শ্রীধ্রুবচন্দ্র মল্লিক)

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সমুদ্র দেখে থাকবে। সমুদ্রের যেন কোন কূল-কিনারা নেই—কেবল চোখে পড়ে জল, জল আর জল—দূরে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। ঠিক তেম্‌নি ধারা, গ্যাস ও বাষ্প দিয়ে তৈরী আর একটা সমুদ্রের মত জিনিষ পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে আছে। আমরা তা দেখ্‌তে পাই না, মাছের মত তার নীচে ঘুরে বেড়াই। মাছকে জল থেকে উপরে অর্থাৎ ডাঙ্গায় তুল্‌লে যেমন মরে যায় আমরাও তেমনি এই সমুদ্রের বাইরে গেলে বাঁচতে পারি না। এই হাওয়ার সমুদ্রকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন "বায়ুমণ্ডল"।

এই বায়ুমণ্ডল দুটি 'গ্যাস' মিলে তৈরী হয়েছে—অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেনের ভাগের পরিমাণ প্রায় $\frac{৪}{৫}$ ভাগ, আর অক্সিজেনের $\frac{১}{৫}$ ভাগ। শত করা হিসাবে প্রথমটা ৭৯ ভাগ, আর দ্বিতীয়টা ২১ ভাগ। অক্সিজেন প্রাণীর জীবনধারণের একমাত্র সহায়। এর অভাবে আমরা বাঁচ্‌তে পারি না। খাঁটি অক্সিজেন

নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া কষ্টকর; হাওয়ায় নাইট্রোজেন বেশী থাকায় অক্সিজেনের গুরুত্ব কমে যায় এবং আমরা বেশ আরামে তা নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি। আবার এই অক্সিজেনের সাহায্যেই আগুন জ্বলে। আর নাইট্রোজেন লাগে তা নেভাতে। বাঁচতে গেলে এ দুটোরই বিশেষ প্রয়োজন।

অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন ছাড়া বায়ুমণ্ডলে আরও কয়েকটা গ্যাস খুব অল্প পরিমাণে আছে, যেমন ধর—জলীয় বাষ্প, কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্, ক্রিপ্টন্, জেনন, আরগন্ প্রভৃতি গ্যাস। তোমরা হয়ত সকলেই দেখেছ, শিমুল গাছের ফল যখন ফাটে তখন তুলোগুলি হাওয়ায় কেমন ওড়ে! আচ্ছা, বল তো কেন ওড়ে? আর একটা পাথরই বা ওড়ে না কেন? এর উত্তরে তোমরা বল্‌বে—পাথরটা যে ভারী! কেবল হাল্‌কা হ'লেই যে উড়বে তা ভেবে নিও না, হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা হওয়া চাই। শিমুল তুলো হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা নয়, কাজেই তাকে এক সময়ে হাওয়ার বেগ কম হ'লে মাটীতে পড়তে হবেই। কিন্তু কোন কোন জিনিষ আছে যা মাটীতে একদম্ পড়ে না। কি বল তো? কেন,—ধোঁয়া। ধোঁয়া হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা। ঠিক এম্‌নি ধারা—জল গরম হ'লে যে বাষ্প ওঠে তাও হাওয়ার চেয়ে হালকা বলে উপর দিকে উঠতে থাকে এবং হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়। এই রকম ভাবেই বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্প আবার কেমন অবস্থার ফেরে অন্য চেহারা নেয় সে কথা পরে বল্‌ছি।

হাওয়া পৃথিবী থেকে ধূলিকণাকে নিজের সাথী করে নেয়। হাওয়ার মধ্যে অসংখ্য ধূলিকণা সব সময়ে কিল্‌বিল্ করে তা তোমরা সবাই জান। এত ধূলো কোথা থেকে আসে সে সম্বন্ধে তোমাদের নিশ্চয়ই কৌতূহল হয়? এর কতক আসে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে; বড় বড় সহরের কলকারখানা থেকেও কম আসে না। তা ছাড়া পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিষই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গুঁড়ো হয়ে গেলে শেষটায় ধূলো হয়ে যায়—আর বাতাসের বেগে উপরে ওঠে। তা' ছাড়া আর একভাবে বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা আসে। তোমরা রাত্রিতে নিশ্চয় দেখেছ, মাঝে মাঝে এক-একটা তারা এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে চলে যায়। ওগুলি তারা নয়—ওদের এক কথায় বলা যেতে পারে—আকাশ থেকে পড়ে-যাওয়া জ্বলন্ত পাথর।

ইংরাজিতে ওদের 'মিটিওর' অর্থাৎ 'উল্কা' বলে। উল্কাগুলি নীচে পড়বার সময়ে হাজার হাজার টুক্‌রো হ'য়ে পড়ে এবং হাওয়ার মধ্যে আস্‌বার সময়ে ধূলোয় পরিণত হয়। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, প্রত্যহ দিনে-রাতে প্রায় দু' কোটি উল্কা আকাশ থেকে পড়ছে। কাজেই সম্ভবতঃ উল্কা থেকেই হাওয়াতে সব চেয়ে বেশী ধূলিকণার সমাগম হয়।

হাওয়ায় ধূলো থাকে বলেই আমরা সব জিনিষ দেখ্‌তে পাই।—আকাশ নীল দেখি, সকালে ও বিকালে স্বচ্ছন্দে সূর্য্যের দিকে তাকাতে পারি, কারণ ঐ সময়ে সূর্য্যরশ্মিকে অধিক ধূলিকণা-পূর্ণ বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীতে পৌঁছাতে হয়। ফলে সূর্য্যের তেজ অনেকটা কম থাকে। পরের পৃষ্ঠার ছবিটা দেখ্‌লে তা বুঝ্‌তে পারবে।

বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস (অঙ্গারাম্ল বাষ্প) আছে। এতে আছে কার্ব্বন (অঙ্গার) আর অক্সিজেন। কার্ব্বন কাকে বলে জান? কয়লার আসল জিনিষটা হচ্ছে কার্ব্বন। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের শরীরে এই কার্ব্বন আছে।

প্রাণী ও উদ্ভিদ্ নশ্বর অর্থাৎ তাদের ধ্বংস হ'য়ে থাকে। প্রাণীরা যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন তাদের শরীর থেকে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বাষ্প বার হয়। এই গ্যাস আবার উদ্ভিদের খাদ্য। উদ্ভিদেরা বায়ু থেকে সূর্য্যালোকের সাহায্যে তা গ্রহণ করে থাকে। উদ্ভিদ্‌গুলি মরে গেলে বা নষ্ট হ'লে কার্ব্বন আবার হাওয়ার মধ্যে ফিরে যায়। প্রাণী থেকেও ঠিক এই রকম হ'য়ে থাকে। এইভাবে প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও বায়ুর মধ্যে বিশুদ্ধ কার্ব্বনের বা অঙ্গারের আনা-গোনা হয়।

পৃথিবীর উপর কত দূর অবধি হাওয়া আছে তা এখনও কেউ ঠিক করে বল্‌তে পারেন নি। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন পৃথিবীর চারদিকে প্রায় দু'শ' মাইল পর্য্যন্ত হাওয়া আছে। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে হাওয়ার ওজন পনের পাউণ্ড—অর্থাৎ সাত সের। হাওয়া চারদিক্ থেকে প্রবাহিত হওয়ার জন্য আমরা সে ওজনের গুরুত্ব অনুভব করতে পারি না। তোমরা কলেজে বিজ্ঞান

পড়বার সময়ে এ সব ভাল ক'রে জানতে পারবে। এখন অতি সামান্য জানিয়ে রাখি।

একটী বড় নলের একদিক্ রবারের চাঁদর দিয়ে বেশ করে বেঁধে দেওয়ার পর পাম্পের সাহায্যে ভিতরের হাওয়া অপর দিক্ দিয়ে বার করে নিলে দেখবে রবারের চাদরটী ফেটে যাবে। এর কারণ তলা আর পাশ থেকে হাওয়ার যাতায়াত হয় না, উপর থেকে চাপ পড়ে। বায়ুমানযন্ত্র (ব্যারোমিটার) দিয়ে এই চাপের পরিমাপ করা যায়। তোমরা এ যন্ত্র স্কুলে অনেকেই হয়তো দেখেছ। হাওয়ার উত্তাপও

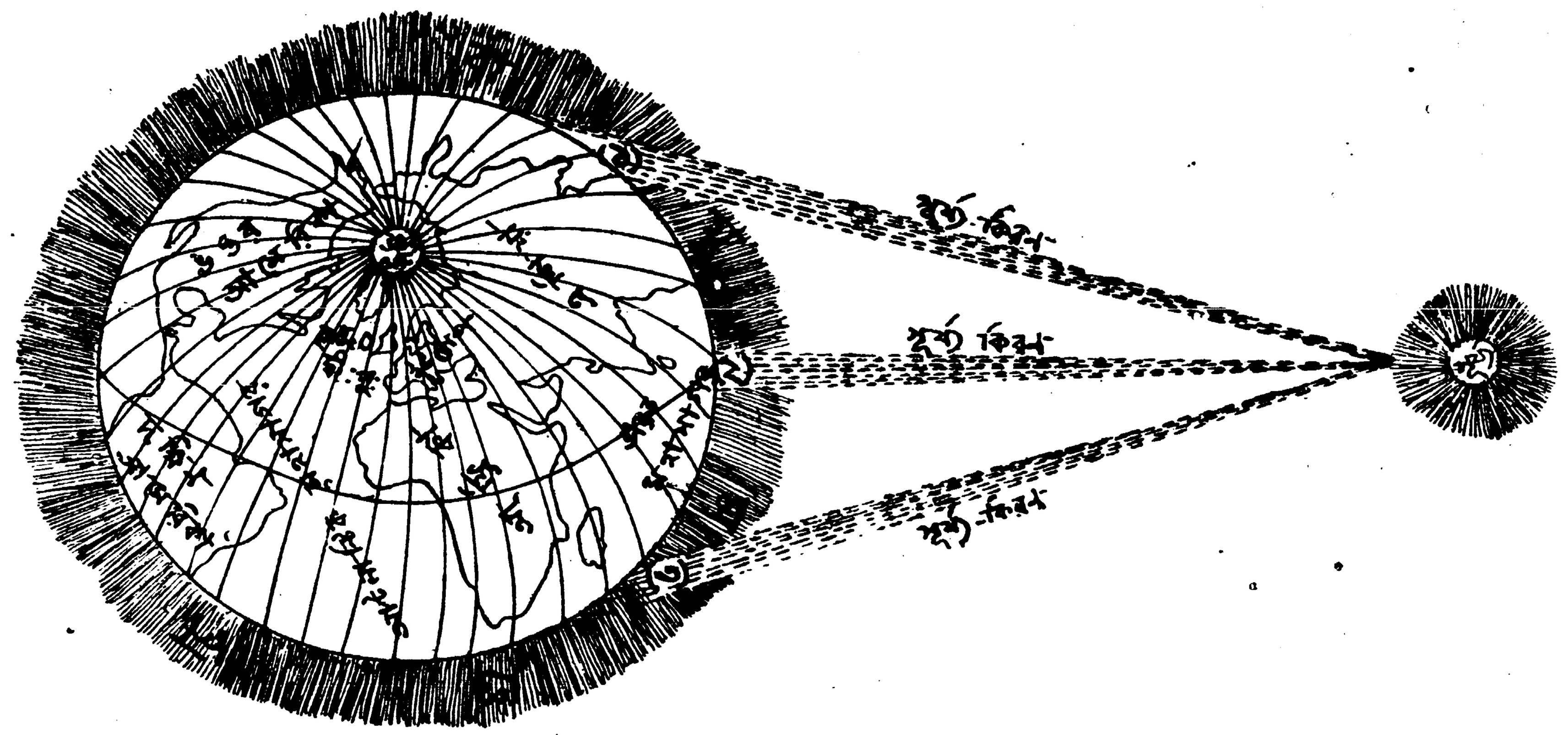

বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে স্ূর্য্যকিরণ কি ভাবে পৃথিবীর উপর পড়ে।
(১) সকালে (২) দুপুরে (৩) বিকালে

মাপা যায়—থার্ম্মোমিটার (তাপমান যন্ত্র) দিয়ে। তাও তোমরা নিশ্চয়ই জান।

বাতাসের জলীয় বাষ্পের কথা তোমাদের আগে বলেছি—এই বাষ্প থেকেই মেঘ হয় এবং তা থেকে বৃষ্টি পড়ে। কুয়াশা এবং শিশির বাষ্পেরই রূপান্তর। হিমালয় বা অন্য কোন উঁচু পর্ব্বতে যে তুষার দেখা যায় তাও হয় ঐ বাষ্প ঘনীভূত হয়ে। আমাদের বাংলা বা অন্য গরম দেশ ছাড়া প্রায় সব শীতপ্রধান দেশেই তুষার পড়ে। জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে এলেই মেঘ হয়। মেঘ হাওয়ায়

ভেসে চলে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী শীতল বায়ুস্তরে গেলে তা ছোট ছোট শিলাখণ্ডে পরিণত হয়। হাওয়া তাদের ধরে রাখতে পারে না, নীচে পড়বার সময়ে সেগুলি গলে যায় এবং বৃষ্টি পড়ে। এই মেঘ জমান এবং গলান ব্যাপারে আমাদের ধূলোরও বেশ হাত আছে।

যত উপরে ওঠা যায় ঠাণ্ডা ততই বাড়তে থাকে। হাওয়াও পাতলা হ'তে থাকে। বাষ্প হ'তে মেঘ এবং মেঘ হ'তে বৃষ্টি হওয়ার মতই হাওয়ার নিম্নস্তরে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা থেকে কুয়াশা হয়, আর ঠাণ্ডার সংস্পর্শে শিশির পড়ে।

হাওয়া অস্থির। চুপ্ করে এক জায়গায় থাকা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। চলা-ফেরা তার যেন নেশা। পা বাড়িয়েই আছে—কোথায় যাবে এই ভাবনায়। মাটী সূর্য্যতাপে গরম হয়, তার সঙ্গে হাওয়াও। গরম হয়ে হাওয়া উঠ্তে থাকে উপর দিকে। আশ-পাশের হাওয়া, যা গরম হয় নি, তারা আসে তার স্থান পূরণ করতে। উপরের হাওয়া নাম্তে থাকে নীচের দিকে। এইভাবে একবার উপরে যাওয়া আবার নীচে আসা এটা বাতাসের একটা স্বভাব। ফুটন্ত জলের দিকে লক্ষ্য করলে অনুরূপ একটা ব্যাপার দেখতে পাবে। জল ফুটলে নীচের জল উপরে আসে এবং উপরের জল নীচে নামে। বাতাসেও ঠিক এই ব্যাপারই হয়। আমরা দেখ্তে পাই না—এইটুকুই যা পার্থক্য।

নিম্ন বায়ুস্তরে বহু দূর অবধি হাওয়া গরম হয়ে হাল্কা হ'য়ে পড়লে দূরের হাওয়া ছুটে আসে সে স্থান পূর্ণ করতে। তখনই ঝড় হয়। হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৭ মাইল্ থেকে ৮০ মাইল। প্রবল ঝড়ের বেগ সময় সময় ঘণ্টায় ৮০ মাইলেরও, অর্থাৎ আমাদের পাঞ্জাব মেল, বম্বে মেলের বেগের চাইতেও, অনেক বেশী হয়ে থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে গভীর সমুদ্র প্রশান্ত মহাসাগর—তার এক জায়গায় গভীরতা ৩৪,৪১৬ ফিট্, এই কথাই লোকে জানিত। সম্প্রতি ডাঃ বার্টচ্ নামে এক পণ্ডিত বলিতেছেন তিনি আটলান্টিক মহাসাগরে ইহার চেয়েও গভীর একটি জায়গার সন্ধান পাইয়াছেন। এ জায়গার গভীরতা—৪৭০০০ ফিট্, অর্থাৎ প্রায় ৯ মাইল্।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(২২)

ঘোড়া-চরিত্র

সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু হুকা-কাশি একেবারে চাপিয়া গেলেন, ঘুণাক্ষরেও দ্বিতীয় কোন প্রাণীকে কিছু জানিতে দিলেন না, মিষ্টার বাসুকেও না। দুপুর বেলা বাসুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেনারসী কাপড়চোপড় কিছু আছে আপনার সুটকেসে ?"

"তার মানে ?" বাসু সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিলেন।

"মানে বিশেষ কিছু শক্ত নয়। বিলাত-ফেরতই হোন আর যাই হোন, আপনি হিন্দু তো বটেন ? কাশীতে এসে কোন হিন্দু বিশ্বনাথ দর্শন না করে যে ফিরে যেতে পারে এ আমি বিশ্বাসই করি না। তা দেবদর্শনের উপযুক্ত কাপড় তো চাই !"

"ওঃ, সেই কথা ? ভণিতা শুনে মনে হচ্ছিল কতই না জানি গূঢ় রহস্য রয়েছে বেনারসী কাপড়ের ভেতর ! যে রকম তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়বার নোটিস্ দিলেন তাতে আর পার্‌লাম কই দেবদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়ে বার হ'তে ? এক জোড়া পুরানো তসর হয়তো থাক্‌তে পারে কাপড়চোপড়ের সঙ্গে।"

"দিন তো তা হলে সেটা একবারটি বার করে, একটু ঘুরে আসি।"

মিষ্টার বাসুর দেওয়া তসরের জোড় পরিয়া হুকা-কাশি একটা বিশেষ দোকানের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর মশাই ভেতরে আছেন কি ? রামদয়াল ঠাকুর মশায়ের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

রামদয়াল যে সে সময়ে দোকানে অনুপস্থিত থাকিবে না হুকা-কাশি তা ভাল করিয়াই জানিতেন ; ছোট ভাই কৃষ্ণদয়াল উপস্থিত ছিল, চোখ দুইটি একটু কুঁচ্‌কাইয়া প্রশ্ন করিল, "বাবুর কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?"

"আস্‌ছি তো মশাই বাংলা দেশ থেকেই ; আমার খুড়োমশাই ওনার নাম বলে দিয়েছিলেন কিন্তু খুঁজে কি আর নিতে পারি ? সেই কাল সক্কাল থেকে… …"

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করিয়া কলিং বেলের মত কি একটা বাজিয়া উঠিল, অমনি কৃষ্ণদয়াল তাড়াতাড়ি হুকা-কাশির বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়া বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন,

আমি এলাম বলে।" অল্প দূরে আর একটি দোকান, হুকা-কাশি দেখিলেন 'কেষ্ট' সেই দোকানে ঢুকিতেছে।

কালবিলম্ব না করিয়া হুকা-কাশি দোকানটার সাম্‌নে গিয়া উপস্থিত হইলেন, অবশ্য দাঁড়াইলেন এমন একটা জায়গা বাছিয়া যাতে হঠাৎ তাঁর উপর কারো নজর না পড়িতে পারে—অন্ততঃ পড়িলেও দোকানের উপর তাঁর যে কোন রকম লক্ষ্য আছে এ সন্দেহ ভুলিয়াও কারো মনে না জাগে। কতকগুলি জিনিস একই সঙ্গে তাঁর নজরে আসিল—দোকানটা পান, জর্দ্দা এবং স্ফূর্ত্তির ; কৃষ্ণদয়াল ঘণ্টার সঙ্কেত পাইয়া হঠাৎ খরিদ্দার সাজিয়া স্ফূর্ত্তি চাহিতেছে ; দোকানের সাম্‌নে আরও দুইটী সৌখীন বাঙ্গালী যুবক দাঁড়াইয়া ; তাদের পরস্পরের আলাপ হইতে আর কিছু না হোক অন্ততঃ এটুকু বুঝা যাইতেছে যে আজ বেলা সাড়ে পাঁচটায় তারা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে অপর এক জায়গায় যাইবে। হুকা-কাশি আরও লক্ষ্য করিলেন, স্ফূর্ত্তি দিবার আছিলায় দোকানী কৃষ্ণদয়ালকে ভিতরে ডাকিয়া নিল।

একটু বাদেই দোকানদারের সহিত কৃষ্ণদয়ালকে আবার বাহিরে আসিতে দেখিয়া হুকা-কাশি আর সেখানে অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না, আবার দোকানটিতেই ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে বসিয়া বসিয়াই তিনি লক্ষ্য করিলেন কৃষ্ণদয়াল স্ফূর্ত্তির দোকান হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া সোজা গোধূলিয়ার বিখ্যাত গাড়ীর আড্ডাটায় ঢুকিয়া পড়িল, তার পর এক টঙ্গাওয়ালাকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া কি সব কথা বলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সেই সৌখীন যুবক দুইটির পানে অঙ্গুলি-সঙ্কেতও চলিতেছিল। সমস্ত খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলি একত্র করিয়া হুকা-কাশি ব্যাপারটার আসল অর্থ মুহূর্ত্তেকের মধ্যেই বাহির করিয়া ফেলিলেন। সে অর্থটা যে কি সে সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের পূর্ব্বেরই অভিজ্ঞতা আছে, কাজেই এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষ্ণদয়াল দোকানে ফিরিয়া আসিলে হুকা-কাশির সঙ্গে অল্প কিছুকাল ধরিয়া তার কথাবার্ত্তা হইল—কখন আসিলে রামদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে প্রধানতঃ সেই আলোচনা। তার পরেই দোকানের প্রকাণ্ড তালাটায় চাবি লাগাইতে লাগাইতে কৃষ্ণ জানাইল আজ তাকে একটু সকাল সকালই দোকান বন্ধ করিয়া বাহির হইতে হইবে, কেননা এক যজমানের কাছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

লোকটা সম্পূর্ণরূপে চোখের আড়াল না হওয়া পর্য্যন্ত হুকা-কাশি সে জায়গাটিতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন গোধূলিয়ার দিকে, গাড়ীর আড্ডার উদ্দেশ্যে। এরই মধ্যে মনে মনে তিনি সঙ্কল্প ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, আজ এক ঢিলে দুই পাখী মারিবেন। দেখা যাক, কি ধরণের ঢিল সেটা !

কৃষ্ণদয়ালের সহিত টঙ্গাওয়ালা যখন আলাপে ব্যস্ত ছিল তখন হুকা-কাশি ভাল করিয়াই গাড়ীখানা নিশানা করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাই সেটি খুঁজিয়া বাহির করিতে মোটেই বেগ পাইতে হইল না। লোকটার কাছে গিয়া পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে তিনি কহিলেন, "বাঃ, তোমার ঘোড়াটা তো চমৎকার দেখ্‌ছি হে!……আমায় একটু হাওয়া খাইয়ে আন্‌তে পার্‌বে? আমি কিন্তু ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দেব—রাত আটটা পর্য্যন্ত চুক্তি। দেখ!"

"না হুজুর, আটটা পর্য্যন্ত আমি ভাড়া খাট্‌তে পার্‌ব না, পাঁচটার পরেই জোয়াল খুলে দিতে হবে, নইলে ঘোড়ার বড্ড 'তখ্‌লিফ্‌' হবে; আজ সারাটা দিনই দৌড়ের ওপর আছে কিনা!"

আশ-পাশ হইতে অন্ততঃ দশ জন টঙ্গাওয়ালা হুকা-কাশিকে ছাঁকিয়া ধরিল—"আসুন হুজুর, আমার গাড়ীতে, আটটা কেন, চান তো রাত দশটা পর্য্যন্ত আপনাকে হাওয়া খাইয়ে আন্‌ব। চলে আসুন।"

হুকা-কাশি কিন্তু বারবারই ঘোড়াটার উপর এমনই সলোভ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যে উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিল ওই ঘোড়াটাই বাবুর বিশেষ পছন্দ হইয়াছে, সহজে ওটিকে বেহাত হইতে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা নয়। মুখের কথাতেও সেই আভাসই তিনি দিলেন, কহিলেন, "আচ্ছা বাপু, পাঁচটা পাঁচটাই সই, তার পর না হয় অন্য আর একটা গাড়ী ধরা যাবে। খা—সা ঘোড়াটি তোমার বাপু, যাই বল! এটা আবার কি, পা-দানের কাছে একটা পচা দড়ি ফেলে রেখেছ কি জন্য?" গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

এ কথায় গাড়োয়ান কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, ঘোড়ার মত দড়িটাকেও প্রশংসা করিলে বোধ করি সে খুসী হইত; একটু অনুযোগ-মাখা স্বরে বলিল, "হা বাবুজী, পচা দড়ি? পাঁচ জন যোয়ান মরদ একে ছিঁড়্‌তে পার্‌বে? আমার এ ঘোড়াটাকে এই দিয়ে আমি বেঁধে রাখি, আর আপনি বল্‌ছেন পচা দড়ি!"

"আচ্ছা আচ্ছা বাবা, ঘাট মান্‌লাম, খুব শক্ত দড়িই বটে। গোড়ায় একবার চকের দিকে নিয়ে চল তো, একটু কেনাকাটি কর্‌বার আছে।"

চকে পৌঁছিয়া হুকা-কাশি একখানা মোটা চাদর কিনিলেন—কেন তিনিই জানেন—ধূসর রংয়ের চাদর, নিতান্ত খেলো কম দামী জিনিষ। তার পর টঙ্গাওয়ালাকে হুকুম করিলেন, "সহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে নিয়ে চল তো বাবা, যেখানে লোকজনের আনাগোনা হৈচৈ একেবারে নেই; উঃ, হট্টগোলে সকাল থেকে মাথাটা একেবারে ধরে আছে।"

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা সহরের বাহিরে সম্পূর্ণ নির্জ্জন একটা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়োয়ানের মেরজাইয়ের পকেটে একটা বড় ঘড়ি ছিল, হুকা-কাশির অলক্ষ্যে সেটি দেখিবার জন্য সবে একবারটি সে ঘাড় হেঁট করিয়াছে অমনি তার মনে হইল কোথা হইতে

একটা অদৃশ্য লোহার নিগড় আসিয়া হঠাৎ যেন সজোরে তার গলার উপর চাপিয়া বসিল, শ্বাস বন্ধ করিয়া আনিল। হুকা-কাশি জাপানী ঢিল ছুড়িয়াছেন, যুযুৎসুর প্যাঁচ কষিয়াছেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ভিতরের ব্যবধানটুকু ডিঙ্গাইয়া হুকা-কাশি পিছন হইতে একেবারে সাম্‌নের আসনে চলিয়া আসিলেন, ক্ষিপ্রহস্তে গাড়োয়ানের কোমর হইতে লুকানো ছোরাখানা গাড়ীর পা দানের উপর ফেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "গলার প্যাঁচ্‌ আরও শক্ত হয়ে এঁটে বসে এটা যদি না চাও তবে এক্ষুণি আমার সঙ্গে গাড়ী থেকে নেমে পড়।" গাড়োয়ান সভয়ে দেখিল তাঁর হাতে সেই দড়িটি—অল্প কিছুক্ষণ আগেই যার দৃঢ়তা সম্বন্ধে সে খুব উঁচু মত জাহির করিতেছিল। আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া—সে ক্ষমতাও তার ছিল না—হুকা-কাশির হুকুম মত তাঁর সঙ্গে সে মাটীতে নামিয়া আসিল।

রাস্তার পাশে একটা তাল গাছ ইতিপূর্ব্বেই হুকা-কাশি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দাঁতের সাহায্যে দড়িটি চাপিয়া ধরিয়া লোকটাকে সেই গাছের কাছে তিনি টানিয়া আনিলেন; তার পর দু'দিক্‌ হইতে তার দুইটি হাত গাছের পিছনে আনিয়া দড়ির সাহায্যে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "সম্পূর্ণ বিদেশী পেয়ে ছোঁড়া দুটোর সর্ব্বস্ব লুঠে নেওয়ার মৎলব ফেঁদেছিলে বাবা, এখন সে পাপের খানিকক্ষণ ধরে প্রায়শ্চিত্ত কর। সরকারি রাস্তা যখন রয়েছে তখন লোকও কিছু না কিছু এ পথে আনাগোনা কর্‌বেই। সময় হলে তখন ছাড়া পাবে।"

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বলিয়া বাংলায় একটা কথা আছে; ঘোঘ জানোয়ারটা বাস্তবিক যে কি তা আমার জানা নাই তবে খুব সম্ভবতঃ বাঘের চাইতে সে বেশী সেয়ানা। যদি আমার এ অনুমান সত্য হয় তবে হুকা-কাশির এখানে একটু ভুল হইল, কেননা ধনপৎ কাজেরিয়ার দোকানের সম্মুখে খরিদ্দারবেশী যুবক দুইটিকে যখন নিতান্ত 'নিরামিষ' জীব বলিয়া তিনি ঠাওরাইয়াছিলেন তখন তাদের প্রকৃত স্বরূপ বাস্তবিকই তিনি বুঝিতে পারেন নাই; তলে তলে তারা যে কী গভীর চক্রান্ত পাকাইয়া কাজে নামিয়াছে বাঘের ঘরে কৌশলের ফাঁদ পাতিয়াছে তখন পর্য্যন্ত তা তিনি টের পান নাই। কাজেই ভাবিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে টঙ্গাওয়ালা যখন তাদের তুলিয়া নিতে পারিল না, তখন "বেচারারা" বোধ হয় এ যাত্রা পার পাইয়া গেল।

এইবারে হুকা-কাশি তাঁর দ্বিতীয় চাল চালিলেন, কাশীর চকে কেনা চাদরটিতে সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়া কেবল মাত্র মুখটুকু বাহিরে রাখিয়া টঙ্গার পিছনকার আসনটিতে লাগাম হাতে বসিলেন—ঠিক যেমন টঙ্গার গাড়োয়ানেরা সোয়ারী না থাকিলে রাস্তার উপর দিয়া হামেশা গাড়ী হাঁকাইয়া আনাগোনা করে। শুধু মানুষের চরিত্রে নয় 'ঘোড়া-চরিত্রে'ও হুকা-কাশির বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল; তিনি জানিতেন লাগামে ঢিল দিয়া গাড়ীর ঘোড়াকে যদি তার ইচ্ছামত চলিতে দেওয়া যায় তবে সে ঘোড়া আস্তাবলেই ফিরিয়া আসে—এ নিয়মের প্রায়ই বড় একটা নড়চড় হয় না। আস্তাবলের

সন্ধান মিলিলে গাড়োয়ানের আস্তানারও সন্ধান পাইতে বেশী বেগ পাওয়ার কথা নয়। রামদয়াল যে গভীর জলের মাছ সে খবর তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, এবং ধনপতের হাবভাবে সেও যে বদ্ধ অগভীর জলে বিচরণ করে তা তো মনে হয় না। তাদের খেলাইয়া ডাঙ্গায় তোলার চাইতে মোটাবুদ্ধি একটা টঙ্গাওয়ালাকে খেলাইয়া তোলা অনেক—অনেক সোজা। রণজিৎ-উদ্ধারের হয়তো একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার হইতে পারে।

হুকা-কাশির হিসাবে কিছুমাত্র গোল হয় নাই, ঘণ্টাখানেক বাদে ঘোর সন্ধ্যাবেলায় বাস্তবিকই ঘোড়া আস্তাবলে আসিয়া উপস্থিত হইল। হুকা-কাশি চকিতদৃষ্টি হানিয়া অমনি চারিদিক্ একবার দেখিয়া লইলেন—নাঃ, ধারে-পাশে এমন কেহই নাই যার নিকট কোন জবাব-দিহি দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। কেবল পাশের একটা মেটে ঘরের দাওয়া হইতে একটী ছোট্ট ছেলে "বাপ্পু জী আ গিয়া" বলিয়া তাঁর দিকে ছুটিয়া আসিল। হুকা-কাশি মনে মনে প্রসন্ন হাসি হাসিলেন—যাক্ কষ্ট করিয়া গাড়োয়ানের বাসস্থান আর খুঁজিতে হইবে না, সেটিরও সন্ধান মিলিয়া গেল। আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া গলিপথে তিনি গা ঢাকা দিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে রাত্রি তখন গাঢ় যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

আধঘণ্টাটাক এ-গলি সে-গলি দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ হুকা-কাশি থমকিয়া দাঁড়াইলেন—দপ্ দপ্ করিয়া পেছনে যেন অনেকগুলি লোকের একত্র পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। মুহূর্ত্ত পরেই চার পাঁচ জন লোক বিদ্যুৎগতিতে তাঁর পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া গেল। আচম্‌কা অন্ধকারে তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন না যে তাদেরই মধ্যে একজন কৃষ্ণদয়াল! কয়েক মিনিট্ পরে আবার ঠিক সেই রকমেরই শব্দ—পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এবার গলার আওয়াজও রহিয়াছে। পুনরায় পিছন-পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই তিনি দেখিলেন, আর একদল লোক ঠিক পূর্ব্বের দলের মতই তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে; সংখ্যায় তারা ঢের বেশী। এবার আর তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হইল না, এ দলের একজনকে তিনি যথার্থই চিনিলেন। ব্যাপার কি? এ এখানে কেন?

হুকা-কাশি ঠিক করিলেন একটু আগাইয়া ব্যাপারটা কি দেখিবেন, কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন; একটী প্রকাণ্ড খাঁটী বেনারসী ষণ্ড পাশের গলি হইতে বাহির হইয়া এমনি ভাবে সমস্ত রাস্তাখানি জুড়িয়া দাঁড়াইল যে পাশ দিয়া একটা মাছিও যদি গলিতে পারিত তো তাকেও বাহাদুর বলিতাম। ষাঁড়টির আবার বারাণসীসুলভ নিরামিষত্বেরও নিতান্ত অভাব; হুকা-কাশি পাশ কাটাইবার সামান্য একটু চেষ্টা করিতেই এমনি ভয়াবহভাবে তিনি তাঁর নধর শিং দুইটি দুলাইয়া উঠিলেন যে চাণক্য ঋষির কি একটা বচন তাঁর স্মরণে আসিয়া গেল—আর অগ্রসর হওয়া তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। শুধু এইটুকু তিনি বুঝিলেন যে পিছনের দল সামনের দলটিকে তাড়া করিয়া যাইতেছে।

কিন্তু হুকা-কাশি আগাইতে না পারিলেও পাঠক-পাঠিকার আগাইতে কোন বাধা নাই; লেখক সঙ্গে থাকিলে তাঁরা না যাইতে পারেন এহেন স্থান পৃথিবীতে আছে নাকি? আগাইতে আপত্তি না থাকিলে তাঁরা দেখিতে পাইতেন, তাড়া খাইয়া সামনের দল হঠাৎ একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পিছনের দলও ভিতরে ঢুকিল। তার পরেই একেবারে অবাক্ কাণ্ড—ভেল্কি বলিলেই চলে! যে দরজা দিয়া সকলে ভিতরে ঢুকিয়াছিল সেটি ভিন্ন গোটা ঘরটিতে দ্বিতীয় জানালা বা দরজা নাই, অথচ দেখা গেল, সামনের দলের সবগুলি লোক বায়োস্কোপের 'ইন্‌ভিজিব্‌ল্ ম্যানের' মতই চকিতে বোধ করি শূন্যেই মিলাইয়া গেছে। কেবল এক অপরিচিত বুড়ো ঘরে বসিয়া থক্ থক্ করিয়া অনবরত কাসিতেছে। (ক্রমশঃ)

ছোটদের চিত্রশালা

বচসার জের

(শিল্পী—শ্রীমন্মথনাথ মিত্র)

সন্দেশ

কলিকাতায় আই, এফ্, এ শীল্ডের খেলা হইয়া গিয়াছে। তোমরা শুনিয়া আনন্দিত হইবে, পর পর তিন বার লীগ্ বিজয়ী মহামেডান্ স্পোর্টিং এবার শীল্ড্ও জিতিয়া ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। ভারতীয়দের মধ্যে এক মোহন-বাগান পঁচিশ বছর আগে একবার শীল্ড্ পাইয়াছিল, তার পরে আজ পর্য্যন্ত আর কোনও ভারতীয় দলের ভাগ্যে এ সম্মান লাভ ঘটে নাই। কুমারটুলি এবং মোহনবাগান— এ দু'টি টিম্ অবশ্য ইতিপূর্ব্বে আরও দু'বার শীল্ডের ফাইনালে গিয়াছিল, কিন্তু শীল্ড্ বিজয় তাদের ভাগ্যে জুটে নাই।

এবার খেলার বিশেষত্ব ছিল এই যে যে সৈনিক দলেরা কিছু দিন যাবৎ শীল্ড্ প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল তাদের কেউই এবার সেমিফাইনাল পর্য্যন্তও যাইতে পারে নাই। সেমিফাইনালে গিয়াছিল ক্যালকাটা, মোহনবাগান, মহামেডান্ স্পোর্টিং এবং হাওড়া ইউনিয়ন্। মোহনবাগান ক্যালকাটার কাছে হারিয়া যায়, আর হাওড়া হারে মহামেডান্-স্পোর্টিংএর কাছে। ফাইনালে দুই দিন ড্র হইবার পর তৃতীয় দিনে অতিরিক্ত সময় খেলিয়া মহামেডান স্পোর্টিং ক্যালকাটাকে হারাইয়া দেয়। ভারতীয়ের মুখোজ্জ্বলকারী এই সুকৌশলী দলটিকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

*　　*　　*

ওদিকে বিলাতে ক্রিকেটে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্ট্ ম্যাচ্ শেষ হইয়াছে; ঠিক শেষ হইয়াছে বলা চলে না কারণ অর্দ্ধেকটা খেলিয়া বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই কোন দলেরই হার-জিৎ ঠিক হয় নাই। ১ম ইনিংস্এ ভারতবর্ষ ভাল করিতে পারে নাই—সকলে মিলিয়া ২০৩ রান্ করে। ওদিকে ইংল্যাণ্ডের হ্যামণ্ড একাই করিলেন ১৬৭ রান্। ৮ উইকেটে ৫৭১ করিয়া ইংল্যাণ্ড "ডিক্লেয়ার" করিল। সবাই ভাবিল, ভারতবর্ষ এবার অতি বিশ্রী ভাবে হারিবে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতবর্ষ দারুণ খেলা সুরু করিল। মার্চ্চেণ্ট আর মুস্তাক আলি দু'জনেই শতাধিক রান্ করিলেন। ৫ উইকেটে ভারতবর্ষ ৩৯০ রান্ করিলে বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হইয়া গেল।

*　　*　　*

বার্লিনে অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিযোগীরা আসিয়া এই খেলায় যোগ দিয়াছেন, আমাদের ভারতবর্ষের খেলোয়াড়েরাও গিয়াছেন। অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতা কি সে সম্বন্ধে তোমাদের অনেকের হয়তো সঠিক ধারণা নাই। প্রাচীন কালে অলিম্পিয়ায় দেবরাজ জিউসের সম্মানের জন্য এই খেলা হইত। তারই অনুকরণে ১৮৯৬ সন হইতে এই আধুনিক অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক চার বছর পর পর পৃথিবীর এক-এক সহরে এই প্রতিযোগিতা হয়। ১৮৯৬ সনে হয় এথেন্সে; তার পর প্যারিসে (১৯০০), সেণ্ট্ লুইসে (১৯০৪), লণ্ডনে (১৯০৮), ষ্টক্হল্মে (১৯১২), এণ্ট্ওয়ার্পে (১৯২০), প্যারিসে (১৯২৪), আমষ্টারডামে (১৯২৮),

লস্ এঞ্জেলস্এ (১৯৩২) এই প্রতিযোগিতা হয়। এবার হইতেছে বার্লিনে, এর পরের বার (১৯৪০) হইবে টোকিওতে। অলিম্পিক্ খেলার আগে একটা রীতি আছে যেখানে প্রতিযোগিতা হইবে এথেন্স হইতে সেখানে রিলে রেস্ করিয়া খেলোয়াড়েরা 'অলিম্পিক্ মশাল' লইয়া যাইবে। এবারকার এই রিলে রেস্এ ৩০০০ খেলোয়াড় যোগ দিয়াছিলেন। ৬টি দেশের ভিতর দিয়া এই রিলে রেস্ হয়। এবার প্রথম যিনি মশাল লইয়া রেস্ সুরু করেন তাঁর নাম কন্ডিলিস্; ইনি অলিম্পিয়ার লোক। মশাল বার্লিনে পৌঁছিলে হের্ হিট্লার তার আগুন দিয়া 'অলিম্পিক্ অগুন' জ্বালাইয়াছেন। এই 'অলিম্পিক্ আগুন' প্রতিযোগিতা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া রাখা হইবে।

*　　*　　*

গেল মাসের রামধনুতে তোমরা পড়িয়াছিলে এলাহাবাদের সাঁতারু শ্রীযুক্ত রবীন চাটার্জ্জি হাত-বাঁধা অবস্থায় ৬৩ ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়া নতুন রেকর্ড্ করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর সে রেকর্ড্ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—৭১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট হাত-বাঁধা অবস্থায় সাঁতার কাটিয়া। বাহাদুর বটে!

কয়েকটি বিখ্যাত জিনিষের আবিষ্কারকের নাম অনেকেই হয়তো জান না। এখানে দেখ—

ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেন টরিসেল্লি; বাইসাইকেল্ আবিষ্কার করেন—কার্ল্ ফন্ ড্রেজ্; সেলাইএর কল—এলিয়াস্ হাউ; বোনার কল—উইলিয়াম্ লী; হারমোনিয়াম্—ডিবেইন্; ট্রামওয়ে—ফ্রান্সিস্ ট্রেন; টাইপ্-রাইটার—ফোকাণ্ট্ ও হুইট্ষ্টোন্।

*　　*　　*

পৃথিবীর কোন্ জিনিষ সব চেয়ে বেশী কোন্ দেশে পাওয়া যায় তারও একটা তালিকা দেখ—

লোহা—যুক্তরাষ্ট্র, সোনা—ট্রান্স্ভাল, রূপা—মেক্সিকো, তামা—যুক্তরাষ্ট্র, প্ল্যাটিনাম্—রাশিয়া, রেডিয়াম্—বেলজিয়ান্ কঙ্গো, হীরা—দক্ষিণ আফ্রিকা, গম—যুক্তরাষ্ট্র, চাউল—চীন, যব—যুক্তরাষ্ট্র, চা—চীন, কোকো—গোল্ডকোষ্ট, কফি—ব্রেজিল, বার্লি—যুক্তরাষ্ট্র, তামাক—যুক্তরাষ্ট্র, মদ—ফ্রান্স, রবার—মালয়, আখ—কিউবা, পাট—বাংলাদেশ, পশম—অষ্ট্রেলিয়া, রেশম—জাপান, অভ্র—ভারতবর্ষ, তূলা—যুক্তরাষ্ট্র, পেট্রোলিয়াম্—যুক্তরাষ্ট্র।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

আপেল ···	২টা—	চার আনা
কলা ···	১০টা—	দশ পয়সা
গোলাপ জাম	২৮টা—	সাড়ে তিন আনা
	৪০টা—	দশ আনা

উত্তরদাতাদের নাম

অমলেন্দুনারায়ণ বিশ্বাস, হরি, বেণু প্রভৃতি (কালীঘাট); অরুণ সেন (বালিগঞ্জ); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল, নির্ম্মল (বালিগঞ্জ); ভোম্বল, (জলপাইগুড়ি); রামু, বাণী, ছোট কাকীমা (জলপাইগুড়ি); শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি (ভবানীপুর); রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর); অক্ষয়•বিশ্বাস (ভবানীপুর); সাধনা ঘোষ, সান্ত্বনা ঘোষ (যশোহর); ভাস্কর, গীতা, তুলো ; প্রতুল, শেফালী, চামেলী, (পুরুলিয়া); সুধীরকুমার দাস ও অনিলকুমার দাস (ভবানীপুর); নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিকাতা); ডলি, সুব্রত, সুশান্ত (রংপুর); শৈলেনকুমার বসু (কলিকাতা); অমল, কমল, বাবুল (বরপেটা); পবিত্র, দীপ্তি, চাঁদু (শিলিগুড়ি); পটল ও গৌর (মূলাযোড়); নীতিপ দাশগুপ্ত, রেবা সেবা, প্রভৃতি (কলিকাতা); বিজনবিহারী হার (ফরিদপুর); মুকুল নির্ম্মলকুমার সেন (গোপালগঞ্জ); সিতেন্দু গুপ্ত (স্বর্ণাসন, পাটনা); চান্দু, পারুল, প্রফুল্ল প্রভৃতি (আটিয়াবাড়ী); গৌরীশঙ্কর, শঙ্কর, ও প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (মূলাযোড়); অনিল ও অরুণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (রাজসাহী); অমলচন্দ্র মুস্তফী (মাথাভাঙ্গা); কালী, তারা, রাখাল প্রভৃতি (নীলফামারি); পাঁচুগোপাল ঘোষ, কান্তিচন্দ্র স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (শ্যামনগর); জেবউন্নেসা খালেদা, সৈয়েদা ও জয়নাল, আবেদিন (মালদহ); মঞ্জুভূষণ দত্ত (ঠাকুরগাঁও); অচলকুমার দত্ত (ভবানীপুর); মুকুল চ্যাটার্জি (বোম্বাই); মোঃ জহুরুল হক্ (আকুয়া); গুলু, অরুণ, পারুল প্রভৃতি (ভাগলপুর); সিমুলিয়া আর্, সি, এম্, ই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (দেবীসহর); নন্দনঘাট এইচ, ই স্কুলের Class Vএর ছাত্রগণ (নন্দনঘাট); মানবেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা); যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (পাটনা); মায়া পাল ও নিশা (উল্লাপাড়া); ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (রাঁচী); ঝণ্টু, নণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (ডোমার); ধীরেন্দ্রনারায়ণ প্রামাণিক (উলিপুর); আভা ব্যানার্জ্জী (লাহোর); প্রসূন রায় (নালান্দা); পুষ্পলতা, বনলতা প্রীতি, গীতা গোস্বামী (বেতিয়া); বিষ্ণুপদ স্মৃতি-পাঠাগারের সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দ (শালিখা); বেবী, বাবু, বখতিয়ার হোঁসেন প্রভৃতি (কালীঘাট); রামপ্রসাদ সিং, পাঁচুগোপাল, বেহালা এইচ, ই স্কুলের দশম মানের ছাত্রবৃন্দ (বেহালা); তাহিরপুর রাজ এম্, ই স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বালকগণ (তাহিরপুর); নিখিল চৌধুরী (রাজসাহী); রমা চৌধুরী (কালিম্পং); রণেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী); দি ভৌমিক্স্ (কলিকাতা); রমা রায়, রাণী রায় (কলিকাতা); উলপুর পূর্ণচন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ (উলপুর); শান্তি, রাধুদি, যশুদি' (কলিকাতা); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা, হাওড়া); গোড়গ্রাম এম্, ই স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (গোড়গ্রাম); মুণীন্দ্রকুমার চৌধুরী (হবিগঞ্জ); অশ্রু ও বারীন (যশোহর); সুরমা, প্রতিমা, নীলিমা (পাঁতিহাল); অরুণকুমার মজুমদার (চাইবাসা); বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, শৈলেন্দ্র-

নারায়ণ রায় (জেমো রাজবাটী); প্রবোধেন্দুনাথ ঘোষাল, মিলনেন্দু, অমলেন্দু ঘোষাল প্রভৃতি (মিঠাপুকুর—বর্দ্ধমান); সমরনারায়ণ বসু (আড়াই হাজার); আশা, রঞ্জু ও দীপালি (ধুবড়ী); প্রমথ, শ্যামু, কালীন্দ্র (মিঠানি কোলিয়ারী); শিবানী, ভবানী, কল্যাণী সরকার (ধুবড়ী); সব্যসাচী সেন (দিল্লী); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে (আঙ্গুর); অনিমা রায় (কুমিল্লা); প্রশান্ত, প্রতাপ, শোভা প্রভৃতি (সীতারামপুর); শরদিন্দু, অরবিন্দ, কল্যাণী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি (বেজডি কলিয়ারী); বাসন্তী নিয়োগী (কলিকাতা); তপন, সবিতা সেন, পৃথ্বীশ প্রভৃতি (রেঙ্গুন); অজিতকুমার বসু রায় চৌধুরী (বানিয়াখামার); দীনেন, খগেন, ছোটদি প্রভৃতি (নলহাটী); প্রীতি, সুধা, কল্যাণ প্রভৃতি (শিলচর); প্রতাপকুমার রায় (কলিকাতা); তুবু, ভোঁদো, সিদারাণী মিত্র প্রভৃতি (লক্ষ্ণৌ); মণীষাকান্ত ঘোষ (লাহেরিয়া সরাই); রত্না দেবী (মহেন্দ্রু—পাটনা), অস্থিচক ইউ, পি, স্কুলের বালকবালিকাবৃন্দ (অস্থিচক); কল্যাণ, অজিত, অসিত প্রভৃতি (পুরুলিয়া); স্বরাজ, সুনীল, খুকুরাণী (সুনামগঞ্জ); বাসন্তী, পুষ্প, কল্যাণী (শ্রীহট্ট); হরিহর, পুষ্প, গৌরী মজুমদার (ধুবড়ী); নির্ম্মলকুমার দাস (ক্লার্ক ষ্ট্রীট); বাণী-মন্দিরের সভ্যবৃন্দ (মুড়াগাছা); অরুণিমা রায় (তমলুক); গোলাম মঈনুদ্দীন (রঙ্গপুর); লীলা দাস (কুমিল্লা); সমরেন্দ্রকুমার সেন (খড়্গপুর); মনোতোষ রায় ও মা (ভবানীপুর); দাদু, মঞ্জু ও রুবী চাটার্জ্জী (ভাগলপুর); জ্যোৎস্না সেন (কলিকাতা); ভারতী মন্দিরের সভ্যবৃন্দ (বহরমপুর); ছবিরাণী রায় (নিউ দিল্লী); সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত, গৌরী, চন্দু প্রভৃতি (দিনাজপুর); শান্তি, চিত্ত, মীরা (বারুইপুর); রবীন্দ্রনাথ দে (মধুবনী); মণি দাস (ডিব্রুগড়); রামানুজ সেন (কাশী); সুমথনাথ মিত্র, হরনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত (দিনাজপুর); অরুণা সেন (কলিকাতা); রণেশচন্দ্র ঘোষ ও অজিতকুমার বসু (কলিকাতা); অজিত, মল্লিকা, ক্ষীরোদ প্রভৃতি (হবিগঞ্জ); রণেন রায় ও গুণেন রায়, মৃগেন্দ্রনাথ কর (হবিগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী)

হেঁয়ালি—

১। রান্না কখন উড়্‌তে পারে ?

২। লম্বা নাতি কেন বেশী লম্বা হয় না ?

৩। বৃষ্টি কখন বিদ্বান্ হয় ?

৪। কোন্ ফুল উল্টা'লে ভীষণ শব্দ হয় ?

৫। দাড়ি কখন ভয়ানক আওয়াজ করুতে পারে ?

৬। কোন্ জন্তুর একটি নামে আর একটি নামের দ্বিগুণ বুঝায় ?

৭। ফুল কখন সিদ্ধ হয় ?

৮। কোন্ জন্তু উল্টা'লে পাখী হয় ?

৯। কোন্ মাঁছ উল্টা'লে পাখী হয় ?

১০। স্রোত কখন্ তুষ্ট হয়ে যায় ?

(কেবল মাত্র নির্ভুল উত্তরদাতাদের নামই বার করা হবে)

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

(১) হাসপাতালে কোনও রোগী মারা গেলে তার বিছানার পাশে একটি লাল বাতি জ্বালিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে। তাহার অর্থ—লোকটির জীবন ছাড়িয়া গেল। ইহা হইতেই ব্যবসা সম্বন্ধে এ কথাটি আসিয়াছে।

(২) মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড্।

(৩) (ক) সাধারণতন্ত্রের (republic) সম্রাট্ হয় না, ফ্রান্সে রাজা নাই। লুই পাস্তুর একজন বৈজ্ঞানিক—তিনি কোনও দিন ফরাসী দেশ শাসন করেন নাই। অষ্ট্রেলিয়ায় নামে কর্ত্তা গভর্ণর জেনারেল, কার্য্যতঃ কর্ত্তা সেখানকার প্রধান মন্ত্রী। মিকাডো জাপান সম্রাটের উপাধি। রুজভেল্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি (President)—অষ্ট্রেলিয়া-শাসনের সহিত তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই।

(খ) আব্রাহাম লিঙ্কন গত শতাব্দীতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একজন রাষ্ট্রপতি (President) ছিলেন—তাঁর সহিত ক্যানাডা বা জীববিদ্যার কোনও সম্পর্ক নাই। লিঙ্কনের সময়ে নোবেল প্রাইজ ছিল না এবং এখনও জীববিজ্ঞানে কোনও নোবেল প্রাইজ নাই। লিঙ্কনের বহু দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। কাজেই তাঁর পক্ষে এখন ভারতবর্ষে আসা অসম্ভব।

আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিং

মোহাম্মদীর সৌজন্যে

রামধনু

৯ম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৩ { ৯ম সংখ্যা

টুনি

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত)

টুন্‌টুনি তুই,
নাচিস্ কেন
গোলাপ-ডালে
তালে তালে
ভোর-সকালে ?

মার্‌ব তোকে ;
এই দেখেছিস,
তীরভরা মোর তূণ ?

কেমন ! লাগাই ধনুর গুণ ?
বাঃ, রে ! হেসেই হলি খুন !

দুষ্টু ভারী ! ছিষ্টিছাড়া,
কোথায় থাকিস,
কাদের পাড়া ?
চুপটী ক'রে আছিস বড়,
দেখি নাই তো এমন ধারা
কী খা'স তুই ?

পোকা-মাকড় ?
দেখি একবার ?
মুখটী হাঁ কর।

আবার ওকি !
টগর-বোঁটায়
বসলি কেন ?
যুঁই-মালতীর
ডালেও গেলি !
বাগান খানা
তোরই যেন !

তাই ত' ভাবি
ফুলগুলি যে
এসেই আবার
কোথায় চলে যায় !
টুনির খোরাক
যোগায় তারা
তাইতে রাখা দায়।

ঐ যা !
হোথায় আবার
খুঁজিস কিরে ?
চাঁপা ফুলের
পরাগ মেখে,
পাপড়ি ছিঁড়ে
বল্ না কি চা'স্ শুনি ?
টু-উট, টু-উট, টুনি, টুনি, টুনি।

জংলী আব্‌হাওয়ার পরশ

[সত্য ঘটনা]

(শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়)

সেবার ম্যাট্রিকের কাঠগড়া থেকে মুক্তি পেয়ে কটকে দাদা মশাইয়ের বাড়ীতে গেলাম ছুটিটা উপভোগ করতে, মামার বাড়ীর আদরের মধ্যে। তাঁরা সকলে আমায় পেয়ে ভারী খুসী ! সেখানে দিনকতক খুব হল্লা গোলমালের মধ্যে কাটাচ্ছি, এমন সময়ে একদিন শুনি, বড়মামা যাবেন শিকারে—শিকারী হিসাবে তাঁর ও অঞ্চলে একটু নামডাক আছে। আমার মনটা তখন পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মত উড়ু উড়ু করছে, যাবার জন্য মেচে উঠলো ; কিন্তু দিদিমা হন না রাজী। যা হোক বহু কষ্টে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর আপত্তি কাটিয়ে উঠলাম।

উড়িষ্যাতে ঢেঙ্কানল বলে একটা সামন্ত-রাজ্য আছে। সেখানকার রাজা হলেন মামার সহপাঠী ; তিনি একটা ষ্টেশনে শিকারের মোটর গাড়ী পাঠাবেন—ইংরাজীতে যাঁকে বলে "Hunting Car".. (অনেকটা রেলিং দিয়ে ঘেরা মোটর বাসের মত ; গাড়ীর সামনে একটি খুব জোরালো বিজলী-বাতি থাকে—সেই আলো জন্তুর চোখে ফেলে তাকে অভিভূত করে গুলি করা হয়।) রাত দুটোর ট্রেনে আমরা কটকের পরের ষ্টেশনে নামবো, আর সেইখান থেকে তার পরের ষ্টেশন পর্য্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাব, এই রকম ব্যবস্থা। সেখান থেকে গাড়ীতে শিকার হবে। যাব আমরা চারজন, আমি আর বড়মামা, বড়মামার এক ইংরেজ শিকারী বন্ধু, আর এক ভদ্রলোক—তিনিও অবশ্য আমার মতই দর্শক। এখানে দু'জনের নাম বলে রাখি—ইংরেজটির নাম স্মিথ্ আর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নাম সুধীর বাবু।

রাত একটার সময় স্মিথ্ সাহেবের, 'অমল, অমল,' (বড়মামার নাম অমল) চীৎকারে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তার পর সেজেগুজে কোমরে একটা পাঁচ ব্যাটারী টর্চ্চ আর হাতে একটা শিকারীদের কুড়ুল নিয়ে রওনা দিলাম। মামা আর সাহেবের মাথায় পরান হেড্‌লাইট্ (জন্তুর চোখে ফেলবার জন্যে), হাতে বন্দুক। কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়া হ'ল ব্যাগে কিছু খাবার আর ফ্ল্যাস্কে জল আর চা।

পরের ষ্টেশনে যখন নামলাম তখন রাত তিনটে, আবছা আলোয় চারদিকের ঝোপঝাপ আর গাছপালাগুলো দৈত্যের মত মনে হচ্ছিল। অসমতল মেঠো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চল্লাম। আধ ঘন্টাটাক চলবার পর আমাদের পথের সামনে দাঁড়াল ভীষণ গভীর এক কাঁটা-জঙ্গল। শুনলাম এই জঙ্গলে খুব হরিণ থাকে। আমরা জঙ্গল ফুঁড়ে চল্লাম, কাঁটার আলিঙ্গন সহ্য করে ; শিকারের উৎসাহে ওসব কষ্ট কোন আমোল পেল না। যে জায়গা দিয়ে চলেছি সেটা আসলে জলাভূমি। জল শুকিয়ে গিয়ে নরম মাটীর সৃষ্টি হয়েছে আর তার উপর রয়েছে নানা রকম জন্তুর পায়ের দাগ ; কিন্তু সে পায়ের মালিকগুলোর কোন সন্ধান নাই ! ক্রমে ভোর হয়ে এল ; সূয্যি মামা যখন গাছের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছেন তখন আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি।

হঠাৎ দূর থেকে ডালপালা ভাঙ্গার মটমট শব্দ আর একটা শিঙ্গার মত

আওয়াজ শোনা গেল। সে আওয়াজটা আমার অপরিচিত নয়, হাতীর ডাক। বুনো হাতী দেখবার আশা আমার সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি মুছে নিলে, সকলে আস্তে আস্তে সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চল্লাম—মামা সব সময় আগে আগে। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে এক জায়গায় একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালাম আমরা; ঝোপের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, সামনে একটা মস্ত বড় ঝিল, আর সেই ঝিলে প্রায় গোটা চল্লিশ হাতী জল নিয়ে খেলা করছে। কেউ সাঁতরাচ্ছে, কেউ ডুব দিচ্ছে, কেউ বা শুঁড়ে জল নিয়ে গায়ে ছিটোচ্ছে—আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সেই হাতীর দল সাঁতরে ওপারে উঠ্‌ল—তার পর পথের সামনেকার গাছপালা ভেঙ্গে আস্তে আস্তে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমরাও ফিরলাম।

একটা জঙ্গলে-ঘেরা ডোবার ধারে এসে আমরা যখন চা খাওয়া শেষ করলাম তখন বেলা প্রায় আটটা। চা খেতেই মামার পেটে চাপ পড়লো, তিনি বল্লেন—"একটু বস তোমরা, আমি ঘুরে আসি।" তিনি ফিরলে স্মিথও তাঁরই পথ অনুসরণ করলেন। আমরা চুপি চুপি গল্প করছি, হঠাৎ দেখি সাহেব ফিরে এসেছেন; বল্লেন, "Amal, come come, make haste please." এক সঙ্গে সবাই লাফিয়ে উঠ্‌লাম। খানিকটা এগিয়ে দেখি প্রায় চল্লিশ গজ দূরে তিনটে প্রকাণ্ড সম্বর (এক রকমের হরিণ) কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে কি খাচ্ছে—বোধ হয় মাটিই খাচ্ছে! সূর্য্যের আলো পড়ে তাদের হল্‌দে পিঠ সোনার মত ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে, প্রত্যেকটারই ডালপালাওয়ালা বড় বড় শিং। বড়মামা ততক্ষণে বন্দুক নিয়ে লক্ষ্য ঠিক করছেন; ধড়াম্ করে আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটা হরিণ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠেই মাটিতে পড়ে গেল। দু'চার বার হাত পা ছুঁড়ে সেটা স্থির হয়ে গেল; অন্য দুটো প্রথমে অদের সঙ্গীর দশা দেখে হতভম্ব হয়ে দু'তিন সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল, তার পর তীরবেগে জঙ্গলে ঢুকে পড়্‌ল। আমরা শিকারের কাছে গেলাম। সেটাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছি, দেখি একটা ছোট্ট হরিণ লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে—তখনও আমাদের অস্তিত্ব টের পায় নি। আমরা ফিসফিস করে কথা কইতেই সেটা আমাদের দেখতে পেল। আর তাকে পায় কে?—তিন লাফে পার।

সম্বরটাকে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে অন্য শিকারের আশায় আমরা গাছের আড়ালে বসে রইলুম, চারজন চারদিকে দৃষ্টি রেখে। সুধীর বাবু বসলেন একটু এগিয়ে। চারদিক্ একেবারে নিস্তব্ধ, হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দে সবাই চম্‌কে উঠ্‌লাম। ঘাড়ের পাশেই শব্দ—ব্যাপার কি বাঘ নয় তো! মুখ তুলে চেয়ে দেখি, সুধীর বাবু একটু নিদ্রালু হয়েছিলেন, উল্টে পড়েছেন। সেদিন দুর্দ্দান্ত হাসিকে অতি কষ্টে চেপেছিলাম।

স্মিথ বল্লেন, "Let us go and have a look around."। সুধীর বাবুকে জিনিসগুলোর ভার দিয়ে সেখানেই বসিয়ে রেখে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আধঘণ্টা খানেক বৃথাই এদিক্ ওদিক্ টহল দিয়ে ফিরে এসে দেখি সুধীর বাবু নেই, তাঁর জামাটা পড়ে আছে। আমাদের রাগ হ'ল, তাঁকে দায়িত্বজ্ঞানহীন, বে-আক্কেলে ইত্যাদি বলছি, এমন সময় ঠিক আমাদের পাশের গাছের ওপর থেকে একটা চমৎকার পাখীর শিষের আওয়াজ এল। তাকিয়ে দেখি, সুধীর বাবু গাছের একটা ডালে বসে হাসছেন; শিষটা তিনিই দিচ্ছিলেন—সত্যিই চমৎকার শিষ। আমরা আমাদের কথার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলাম।

বেলা বারটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পুনরায় জন্তুর ধ্যানে বসা গেল, ধ্যান কিন্তু সফল হ'ল না। বিকালবেলা ঝিলের জলে তেষ্টা মেটালাম। কোন জানোয়ার জল খেতে আসে কিনা সেদিকে নজর ছিল, হঠাৎ দেখি নাক আর চোখ উঁচিয়ে দুটো কুমীর ঝিলেরই জলে ভাস্‌ছে। গুলি কর্‌বার কিন্তু মোটেই সুবিধা হ'ল না। সন্ধ্যাবেলা মরা সম্বরটা ঝুলিয়ে নিয়ে সকলে ফির্‌ছি, হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমে এল, বিদ্যুচ্চমকের সঙ্গে সঙ্গে বন-ভূমি ভীষণ মূর্ত্তি ধরলে। যা হোক্ পরের ষ্টেশনে 'হাণ্টিং কার' অপেক্ষা কর্‌ছিল, টর্চ্চ জ্বেলে আমরা ফিরে এলাম।

অন্ধকারের বুক চিরে আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে, মধ্যে মধ্যে আলো ফেল্‌তে ফেল্‌তে। কত সজারু, শেয়াল, আর ছোট ছোট জন্তু আশ্চর্য্য হয়ে আমাদের আলোর দিকে তাকিয়ে আছে, ভাবছে বোধ হয় এ আবার একটা

কি রকম জন্তু! খরগোসগুলো আওয়াজ পেয়ে নিজেদের মুখটা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে বসে আছে; তারা ভাবছে যে নিজেরা চোখে না দেখতে পেলে আমরাও বুঝি আর তাদের দেখতে পাব না। হঠাৎ আলোটা রাস্তার ওপর পড়তেই দেখি একটা ডোরাদার হায়েনা পথের ওপর বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আলোটা তার চোখে রেখে গাড়ীটা থামান হ'ল, তার পর স্মিথ মারলেন গুলি—গুলিটা ঠিক বুকে লাগতেই জন্তুটা আছড়ে পড়্‌ল, খাবি খেতে খেতে আর্ত্তনাদ করতে লাগ্‌ল। তখন আর এক গুলি, ব্যস্, সব শেষ। সেটাকে তুলে নিয়ে আবার গাড়ী চল্‌ল।

মিনিট দশেক চলেছি—এমন সময় সামনে একটা গাছের ওপর পাতার ফাঁকের মধ্যে নজর পড়্‌ল, দেখি অনেক উঁচুতে দুটো চোখ জ্বলছে। মামা বল্লেন, "ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে বোধ হয় চিতা হবে, লাগাই তো একটা গুলি!" বল্‌তে বলতেই একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ হ'ল, সেই জন্তুটার কাছেই, আলো ফেলতেই দেখি যে একটা প্যাঁচা উড়ে যাচ্ছে। ওটারই চোখ জ্বলছিল। সকলে অপ্রস্তুত হয়ে হেসে উঠলাম। আবার গাড়ী চলেছে, জঙ্গলকে দু'টুক্‌রো করে। হঠাৎ আমাদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে গাড়ীর ছাদের ওপর হুড়মুড় করে একটা ভীষণ আওয়াজ ভেঙ্গে পড়্‌ল, আমরা চমকে উঠলাম, গাড়ী থেমে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল গাড়ীর ছাদের ওপর কোন একটা জন্তু লাফিয়ে পড়েছে—এত জোরে লাফিয়েছে যে ছাদটা একটু বসে গেছে। তাকে দেখতে পাওয়ার উপায় নেই। কি করা যায়! বড়মামা আর স্মিথ গাড়ীর দু-পাশ লক্ষ্য করতে লাগলেন, জন্তুটাকে দেখা গেলেই গুলি চালাবেন। দু-তিন মিনিট আমরা এক রকম দম বন্ধ করে অপেক্ষা করার পর একটা গোল মাথা বড়মামার দিকে ছাদ থেকে উঁকি মার্‌ল। বড়মামার বন্দুক তৈরীই ছিল, দিলেন ঘোড়া টিপে। জন্তুটা ভীষণ এক গর্জ্জন করে দিলে প্রকাণ্ড এক লাফ! এবার তাকে বেশ দেখা গেল আলোতে, মাঝারি গোছের একটা চিতা। লাফিয়ে পড়েই তীরবেগে সে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল, গুলিটা লাগে নি বোঝা গেল।

গভীর রাত্রে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা রাজপ্রাসাদে আমরা এসে পৌঁছুলাম

পরদিনকার ঘটনা। আজ সকালে হবে বিটিং শিকার (Beating)। আমরা জঙ্গলের মাঝে একটা জায়গায় মাচায় বস্‌ব; অনেকগুলো লোক চারদিকের জঙ্গল পিটিয়ে জন্তুগুলোকে তাড়িয়ে সেইখানে নিয়ে আসবে, আমরা কর্‌ব শিকার।

বেরিয়ে পড়লাম সেই প্রভাতে। মাচায় আস্‌বার পথটুকু অতিক্রম করতে যে সব প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ল তার তুলনা মেলা বাস্তবিকই ভার। যাক্, মাচায় উঠে তো বসা গেল।

ওদিকে বিটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। দূর থেকে ঘন ঘন ক্যানেস্তার আওয়াজ, ঢোলের ডুম্‌ডুম্ শব্দ আর জঙ্গল-পেটানোর আওয়াজ কানে আসছে। আমরা জন্তুর অপেক্ষা করছি, হঠাৎ আমাদের মাথার ওপরের গাছের একটা ডাল নড়ে উঠতেই আমরা ওপরের দিকে চাইলাম। যা দেখলাম তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল, বুকের ধুক্‌ধুক্ থেমে যায় আর কি! একটা বড় রকমের চিতা বাঘ বসে বসে দাঁত বার করে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করছে, আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেই হয়। মামা কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি হারান নি, তক্ষুণি বন্দুকটা তুলেই ধাঁ করে এক সঙ্গে দুটো গুলিই ছেড়ে দিলেন। বাঘটা ভীষণ গর্জ্জন করে হুড়মুড় খেয়ে নীচে পড়্‌ল, তার দেহে তখন আর প্রাণ নেই। একটা গুলি তার গলা ভেদ করেছে আর একটা ঢুকেছে পেটে। উঃ, কি ভয়ানক বিপদের হাত থেকেই না রক্ষা পাওয়া গেল!

এবার বিটার্‌রা (Beater) কাছাকাছি এসে পড়েছে—আমরা খুব সজাগ। একটু পরেই দলে দলে হরিণ আর খরগোস পালাতে লাগ্‌ল। আমি বড়মামার কাছ থেকে বন্দুকটা নিয়ে একটা সম্বরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। লাগ্‌ল ঠিকই, সেটা কর্কশ আওয়াজ কর্‌তে কর্‌তে আস্তে আস্তে নিঃসাড় হয়ে গেল। তার পর মামা আরও তিনটে সম্বর শিকার করলেন। মিনিট দশেক পরে দেখি একটা প্রকাণ্ড বুনো শূয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ কর্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে আস্‌ছে, বেশ বড় বড় দুটো দাঁত তার মুখের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। গুলি খেয়ে অত্যন্ত আহত হলেও সেটা গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে জঙ্গলে ঢুকে পড়্‌ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ডান পাশের জঙ্গলটা নড়ে উঠ্‌ল, শুকনো পাতার ওপর খড় খড় শব্দ শোনা গেল,

লোকগুলো খুব কাছে দাঁড়িয়ে চীৎকার গোলমাল করছে। আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ, কিন্তু কিছু অন্য রকমের। একটু পরেই থপ্‌থপ্‌ করে বেরিয়ে এল একটা ভাল্লুক। পিছনের ছ'পায়ে ভর দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে, শুয়োরটা যেদিকে গেছে সেইদিকেই। গলায় তার একটা সাদা দাগ। স্মিথ তাকে গুলি করলেন, লাগ্‌ল পায়ে, সেটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পালাতে লাগ্‌ল! তখন মামা ছাড়লেন আর এক গুলি। এ গুলিও কিন্তু তাকে থামাতে পারলে না, সে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা একটু বিমর্ষ হয়ে অন্য জন্তুর অপেক্ষা করছি এমন সময়ে মামা হঠাৎ কানখাড়া করে কি যেন শুনতে লাগলেন। আমিও মন দিয়ে শুনতেই, বোধ হ'ল কোন একটা ভারী জন্তু যেন জঙ্গলের আড়ালে চলে বেড়াচ্ছে। পরমুহূর্ত্তেই একটা ডোরাদার গোল মাথা ঝোপের বাইরে জেগে উঠেই আবার ঢুকে গেল। চিড়িয়াখানাতেই বাঘ দেখেছি, আর এ হ'ল জঙ্গলের স্বাধীন বাঘ! আমার মনে হ'ল বাঘের পক্ষে আমাদের এই মাচায় লাফিয়ে ওঠা কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। মামা আর স্মিথ্‌ বন্দুক উঁচিয়ে অপেক্ষা করছেন। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে

চিড়িয়াখানার বাইরে বাঘ যে কী জিনিষ এ ছবি থেকে তার কিছু ধারণা হবে।

লোকগুলি যেমনি একবার হৈ হৈ করে উঠেছে অমনি সেই মাথাটা আবার দেখা গেল; সঙ্গে সঙ্গে এক গুলি! বাঘ আহত হ'ল, এবার আর সে লুকিয়ে রইল না—

মরিয়া হয়ে ভীষণ গর্জ্জনে সেই বনভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে, এক প্রচণ্ড লাফ দিলে আমাদের দিকে। আমি আর সুধীর বাবু ভয়ে মাচার অন্য পাশে কাৎ হয়ে পড়লাম। বাঘটা কিন্তু মাচা পর্য্যন্ত উঠতে পারল না, হাজার হোক্‌, জখম হয়েছে তো! মাটিতে পড়তেই স্মিথের আর একটা গুলি খেয়ে তার হিংস্র গর্জ্জন আর্ত্তনাদে পরিণত হ'ল, সে মাটি কামড়াতে লাগ্‌ল যন্ত্রণায়। আর এক গুলিতেই তার যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেল। বেলা অনেকটা গড়িয়েছিল, উল্লেখযোগ্য আর কোন জন্তু আসছে না দেখে আমরা এবার সশিকার রাজবাড়ী ফিরে চল্লাম। যাবার সময়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দেখ্‌লাম পথের ধারে গুলি-খাওয়া ভালুক মরে পড়ে আছে, আর তার বিশ গজ দূরে শুয়োরটাও।

স্নান আর খাওয়া সেরে আবার আমরা চার জনে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম—এবার অন্য দিকে। কাঠ-ফাটা রোদ। জঙ্গলে এক রকম ভিজে মাটি আছে, সেই মাটি সম্বর খেতে ভালবাসে। সেই রকম একটা জায়গায় ঝোপের আড়ালে আমরা আস্তানা গাড়্‌লাম। সুধীর বাবু একটু 'মটকা' দেবার জন্য লম্বা হলেন। শীগ্‌গিরই কিন্তু তাঁর নাক থেকে এমন সব আওয়াজ বার হতে লাগ্‌ল যাতে করে কয়েকটি সম্বর কাছে এসেও ভেগে পড়্‌ল। সত্যিই, আমরা স্পষ্ট টের পেয়েছি।

পর দিন ভোরে আমাদের কটকে ফেরবার কথা। তাই আমরা বিকালের জলখাবার খেয়ে, সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আর একবার বেরিয়ে পড়লাম টর্চ্চ্‌ আর হেড্‌লাইট নিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি হয়ে পড়্‌ল। আকাশে চাঁদ নেই, আমাদের ঘিরে খালি অন্ধকার আর অন্ধকার। অন্ধকারেরও একটা বিরাট, ভীষণ সৌন্দর্য্য আছে। রাত প্রায় ন'টার সময় একটু দূরে বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল, সে কি রাতের বুক-কাঁপানো ভীষণ গর্জ্জন! লাইট ফেলে দেখা গেল প্রায় ছ'শ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড ডোরাদার বাঘ—চোখ ছ'টো ভাঁটার মত জ্বলছে—আমাদের আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। বাঘ এত দূরে যে গুলি করলে কিছু ক্ষতি হবে না তার। বাঘটা একটুখানি তাকিয়ে রইল, তার পর ভীষণ এক গর্জ্জন করে রাজার চালে হেল্‌তে ছুল্‌তে সদর্পে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ফেরবার মুখে আলোয়

দেখলাম একটা গাছের গুঁড়িতে শুঁড় জড়িয়ে তিনটে হাতী দাঁড়িয়ে আছে। তারাও আলো দেখে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল, আক্রমণ করার বা পালাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আমরা তাদের না ঘাঁটিয়ে চোখের ওপর আলো রেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

পর দিন সকালে আমরা সব জন্তুগুলোকে নিয়ে কটকের ট্রেনে চড়লাম; গার্ডের কাছে খুব খাতির পাওয়া গেল। মহানদীর পুলের ওপর দিয়ে গাড়ী চলেছে, বড়মামা আঙ্গুল দিয়ে নদীর একটা চরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দেখ্‌লাম চারটে কুমীর চরের ওপর শুয়ে আছে। মামা বল্লেন, 'ষ্টেশনে নেমেই একবার নদীর ধারে আসা যাবে, দেখি যদি একটাকে মারতে পারি।'

তাই করা হ'ল। ঘুরে ঘুরে কুমীরগুলোর যতটা কাছে আসা সম্ভব এলাম—প্রায় এক শ' গজের মধ্যে। মামা গুলি ছুঁড়লেন, সব ক'টা কুমীর হুড়মুড় করে জলে ঢুকে গেল, একটা শুধু চিৎ হয়ে জলে পড়্‌ল। কোনটাকেই আর দেখা গেল না। নদীর ধারে জেলেদের বলে এলাম, কুমীরটা যদি ভেসে ওঠে তো খবর দিতে। শুনে সুখী হবে, পর দিন বাস্তবিকই মরা কুমীরটী করায়ত্ত হয়েছিল।

সফল অভিযানান্তে দিদিমার কোলে ফিরে এসে তাঁকে নিশ্চিন্ত কর্‌লাম।

তারে চড়ার নানান্ ফ্যাসাদ্

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

তোমাদের কারো ওদিকে ঝোঁক্ আছে কিনা আমার জানা নেই তবে আমি, সত্যি কথা বল্‌তে কি, তারে চড়্‌তে একেবারেই ভালোবাসিনে। চলাচলের পক্ষে রাস্তা হিসেবে ওকে খুব প্রশস্ত বলা চলে না, তা ছাড়া, (টেলিগ্রাফেরই বল আর সার্কাসেরই বল,) যে-সব পোষ্টের ওপরে সাধারণতঃ তার খাটান হয় মাটি থেকে তার বেশ উচ্চতা আছে—এই কারণে প্রতিপদেই বিপদের আশঙ্কা।

কিন্তু এককালে, টেলিগ্রামের মত, তারে যাতায়াত করাই আমার কাজ ছিল। আমি সার্কাস্ ছেড়েছি তা খুব বেশী দিনের কথা নয়। তারের উপর দিয়ে হাঁটা, কায়দা-কসরৎ দেখানোর চেষ্টা করা, নানাবিধ তারের খেলা দেখানোই ছিল তখন আমার রোজকার কাজ এবং রোজগারের কাজ—ঐ উপায়েই আমার দিন গুজ্‌রাণ্ হ'ত। কিন্তু একদা তার-যোগে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাবার ফলেই দারুণ বিরক্ত হয়ে সার্কাস্ আমি ছেড়ে দিয়েছি। সে-কথা ভাবতে গেলে এখনও আমার—, কিন্তু যাক্ সে কথা।

তোমরা হয়তো অনুমান করছ আমি পড়ে গেছলাম? উঁহু, মোটেই তা নয়। পড় পড় হয়েছিলাম, কিন্তু পড়ি নি—কিন্তু না প'ড়ে যা হয়েছিলাম তার চেয়ে পড়ে যাওয়াই ছিল ভাল। আমার সেই অপদস্থ অবস্থায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেণীর দর্শকেরাই একবাক্যে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন এ কথা অস্বীকার করব না। হয়ত রামধনুর পাঠকদের মধ্যে অনেকে ছিলে যারা খুব ক'ষে হাততালি দিয়েছ। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত সেই খেলাটা আর একবার দেখ্‌তে চেয়েছিলে। আবার দেখার প্রত্যাশায় পরের দিনের টিকিটও হয়ত কিনে থাকবে, কিন্তু সে-খেলা দেখাতে আমি আর রাজি হই নি। তার পর কোন খেলাই আমি আর দেখাই নি, তারে চড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

আঃ, সেই জুতো যোড়ার কথা মনে হলে আজও আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়। আমার তার-পথের পথিক, আমার সার্কাসী সহচর সেই জুতো যোড়া—তাদের সহায়তায়, এমন কি তাদেরই প্ররোচনায় সার্কাসে তারের খেলা দেখাবার প্রস্তাবে আমি সম্মত হয়েছিলাম। কত বার সত্যি-সত্যিই তারা আসন্ন বিপদ্ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু বিপদ্ থেকে যে বাঁচায়, প্রয়োজন হ'লে সেই যে বেশী বিপন্ন করতে পারে এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছ থেকেই আমার হ'ল।

সার্কাস্ ছাড়ার পর আর আমি তাদের মুখদর্শনও করি না। তাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছি; কোথায় ফেলেছি মনে নেই, আমারই ঘরের আনাচে কানাচে, দেরাজ-আল্‌মারির পেছনে-টেছনে কোথাও। আমার দৃষ্টির সম্মুখসীমার বাইরে।

কেন তারে চড়া ছাড়লাম সে-কথা বল্‌ব না—কিন্তু হ্যাঁ, তারে চড়া ছেড়ে দিয়েছি তার পর। আমার আর ঝোঁক নেই ওদিকে। এখন আমি রামধনুর জন্য গল্প লিখি তোমরা জান। কিন্তু মানুষ যা চায় না তাই এসে তার ঘাড়ে চড়ে—সেই কথাই আজ তোমাদের বল্‌ব।

আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে সুরেশ বাবুদের বাড়ী—পুলিস কোর্টের নামজাদা উকীল সুরেশ বাবু। কিন্তু কোন পুলিস-কেসের কথা নয়, কথা হচ্ছে এই, আমাদের তেতালার ছাদ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে তাঁদের বাড়ীর গা ঘেঁষে গেছে একটা জিনিস। আর কিছু নয়, টেলিফোনের তার।

সেদিন সকালে উঠে দেখ্‌লাম একটা ঘুড়ি কোত্থেকে সেই তারে এসে আট্‌কেছে! রঙীন্ ঘুড়ি, বেশ চৌকস্, তারে বেঁধে দোল্ খাচ্ছে হাওয়ায়।

ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বাল্যকালকে স্মরণ করছি। বাল্যকাল এবং সার্কাস্-কাল।

দুয়ের যোগাযোগ হ'লে তো কথাই ছিল না। সেই মার্কামারা জুতো যোড়ার সাহায্য নিয়ে তারের ওপর দিয়ে গিয়ে ওটাকে পেড়ে এনে এতক্ষণ ওড়াতেই আরম্ভ ক'রে দিতাম হয়তো!

ইত্যাকার চিন্তা করছি এমন সময়ে নীচের রাস্তা থেকে বালসুলভ কণ্ঠস্বর এসে ধাক্কা মারে—"মশাই, ও মশাই!"

রাস্তার দিকে তাকাই। এমন কেউ না, আমারই জনৈক বালক প্রতিবেশী।

রঙ্‌চঙে ঘুড়িটা ওরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পড়্‌তে বসেছিল, সেই দুর্যোগের মুহূর্ত্তে ঘুড়িটা চোখে পড়্‌ল—বই ফেলে এসেছে কিন্তু মই নিয়ে আসে নি। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল মই না আনার মূর্ত্তিমান্ কারণ হচ্ছি আমি।

"ঘুড়িটা আমায় পেড়ে দিন্ না মশাই।"

"কি ক'রে পাড়্‌ব? নাগালের বাইরে যে!" হাত বাড়িয়ে ওকে দেখালাম। আমার দোতালার বারান্দা থেকে যতদূর সম্ভব হস্ত বিস্তার করলেও মস্ত ব্যবধান।

"আপনি তারের ওপর দিয়ে গিয়ে এনে দিন্।" ছেলেটি আব্‌দার ধরে।

"বাঃ, পড়ে যাব যে! দেখ্‌ছ তো কত উঁচুতে? ওখান থেকে পড়লে কি আর বাঁচ্‌ব?" সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা যত দূর সম্ভব ওর দিব্য দৃষ্টির কাছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করি—একদম্ ছাতু একেবারে, বুঝেছ, আর দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে না।"

"বাঃ, আপনি পড়বেন কেন? আপনি আবার পড়েন নাকি!" সে শুনতেই চায় না—"তারে চড়তে পারেন যে আপনি।"

"বটে? তারে চড়তে পারি? বল কি! এমন দুঃসংবাদ কে দিল তোমায়?

"হুম্, মামার কাছে শুনেছি আমি। মামা বলেন আপনি সার্কাসে তারে চড়তেন।"

মামার কাছে যে শোনে তাকে থামান সহজ নয়। আমি বলি—"তুমি এক কাজ কর। তোমার মামার ঘাড়ে চড়ে দেখ না কেন যদি নাগাল পাও।"

এ পরামর্শ সে অগ্রাহ্য করে, তার মামা নাকি ভারী বেঁটে। অগত্যা তাকে সান্ত্বনা দিই—"ঘুড়ি ওড়াবে, তোমার একটা ঘুড়ি চাই, এই ত'? এই পয়সা নাও, ঘুড়ি কেন গে।"

আনিটা পেয়ে ছেলেটা লাফাতে লাফাতে চলে যায়। খানিক বাদে আর একটি ছেলে—তার চেয়ে কিছু ক্ষুদ্রাকার, দেখি সামনের রাস্তায় ঘুড়ির ঠিক অব্যবহিত নীচেই এসে দাঁড়িয়েছে।

"আমাকে ঘুড়িটা দেবেন?"

"স্বচ্ছন্দে। তুমি নিয়ে যেতে পার, আমার বিশেষ আপত্তি নেই।"

আমি কি ক'রে পাড়্‌ব? আমি কি তারে চড়তে জানি?" ছেলেটি জবাব দেয়।

ও বাবা! এও তারে চড়ার কথা বলে যে! ভয়ে ভয়ে বলি—"তা আমিই কি তারে চড়্‌তে জানি?"

"বাঃ, আপনি জানেন না আবার! চড়ে চড়ে কত তার ক্ষইয়েই ফেল্‌লেন! সবাই তো বলে। আপনি আমায় পেড়ে দিন্।"

"এক কালে পারতাম বটে।" আমি স্বীকার করতে বাধ্য হই, "কিন্তু এখন তো আর চড়ার অভ্যেস নেই অনেক দিন—যদি পড়েই যাই?"

"পড়বেন না।" ছেলেটি খুব জোরের সঙ্গে বলে, "কিছুতেই পড়বেন না বল্‌ছি আমি। আপনি দেখে নেবেন—হ্যাঁ।"

তার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে বিস্মিত করে। আমি কিন্তু সহজে বিচলিত হই না—"সে কথা কি বলা যায়? প'ড়ে গিয়ে কি পা ভাঙ্‌ব শেষটায়?"

"ভাঙে যদি আমি দায়ী।" ও আমাকে ভরসা দেয়।

পরের দায়িত্বে পদচ্যুত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কিনা একবার ভাবি। পা-ই ভাঙে, তাই ভেঙে ক্ষান্ত হবে কিনা কে জানে? মাথার ওপর দিয়েও চোট্‌টা যেতে পারে। তেতালা থেকে পড়বার সময় বেতালা হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী—সাধারণ মানুষের তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকার কথা নয়। ছেলেটার শিরোদেশ থেকে ঘুড়ির উড়ন্ত দূরত্ব (অথবা দুরন্ত উড়ত্ব) পর্য্যন্ত মনে মনে একবার মেপে নিই।

"আপনি অত ভীতু কেন?" সে আমাকে প্রেরণা দেবার প্রয়াস পায়।

আমি লজ্জিত হই কিন্তু সাহসী হতে পারি না। "ভয় আমার নেই, তবে কি জান, ক'দিন থেকে পায়ে একটা ব্যথা—"

ছেলেটি কথা শেষ হতে দেয় না—"তা হ'লে দাদাকে আপনি যা দিয়েছেন আমাকেও তাই দিন্। ঘুড়ি আমি কিনেই নেব।"

"ও, তাই বল।" জোর ক'রে একটু হাসি, "সে কথা মন্দ না।"

আনিটা হস্তগত হবা মাত্র ছেলেটা অস্তগত হয়।

নাঃ, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়—এখুনি হয়তো আবার কার ভাগ্‌নে এসে ঘুড়িটার ভাগ নিতে চাইবে। অনেক ছেলের চোখেই ঘুড়িটা এতক্ষণে পড়েছে নিশ্চয়। এ পাড়ার অনেকেরই বেশ উঁচু নজর আছে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। রাস্তার সীমান্তে একটি বালকের আবির্ভাব হতেই আমি আতঙ্কিত হয়ে স'রে পড়ার চেষ্টা করি। অত দূর থেকেই, আমার মনোভাব টের

পেয়েই বোধ হয়, ছেলেটা দৌড়ুতে সুরু ক'রে দেয়। পেছন ফিরতে না ফিরতে ওর ডাক পৌঁছয়—"মশাই, ও মশাই!"

কাতর আহ্বানে কর্ণপাত করতে হয় (আমি তো কি ছার্, ভগবান্ পর্য্যন্ত ক'রে থাকেন বলে শোনা গেছে)। "কি খবর তোমার? বলে ফেল চট্‌পট্।"

"ওই ঘুড়িটা আমায় দিন্ না।" ছেলেটা হাঁপাতে থাকে।

"ও কি আমার ঘুড়ি যে আমি দেব?" এবার আমি সত্যি সত্যিই চটে গেছি। "কার ঘুড়ি আমি জানিও না।"

"তবে ঘুড়ি কেনার পয়সা দিন্।" ছেলেটা স্পষ্ট বক্তা এবং বেশী কথা বল্‌তে ভালবাসে না।

অগত্যা ওকেও একটা আনি ছুঁড়ে দিই। তিন তিনটা আনি বাজে খরচে মনটা খচ্‌খচ্ কর্‌তে থাকে।

টেবিলে গিয়ে বস্‌তে না বস্‌তেই নীচে থেকে হেঁড়ে গলায় আওয়াজ আসে—"অগাষ্টাস্ সার্কাসের বিখ্যাত তারের ক্রীড়াপ্রদর্শক তারেশ বাবু কি বাড়ী আছেন?"

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই—"আজ্ঞে হ্যাঁ, রয়েছি। কি দরকার বলুন?"

ঘুড়িটার দিকে একবার বঙ্কিম কটাক্ষে তাকিয়ে নিই, এঁরও যেন ওর ওপরেই নজর এই রকম একটা আশঙ্কা হ'তে থাকে।

"তা, তারেশ বাবু—" ভদ্রলোক হাত কচ্‌লাতে সুরু করেন।

(তারের অধীশ্বর ইতি তারেশ, সার্কাস্ থেকে এই নাম আমার পাওয়া। যে লোকটা ঘোড়ার খেলা দেখাত তার নাম হয়েছিল ঘোড়েল্। এ নিতান্ত মন্দ না, নাম-কে-নাম খেতাব-কে-খেতাব্!)

"তারেশ বাবু, একটা কথা বল্‌ব কিছু যদি মনে না করেন।" ভদ্রলোকের হাতের কাজ চল্‌তেই থাকে। "দেখুন, আমার ভাগনেরা আব্‌দার্ ধরেছে—"

বাক্যটা আমি সংক্ষিপ্ত ক'রে আনি—"কিন্তু তাদের তো আমি—"

"হ্যাঁ, তারা কিন্‌ছিলও বটে। আমি সেই মনোহারী দোকানে দাঁড়িয়ে। আমিই বারণ কর্‌লুম, বল্লুম, ঘুড়ি কিনে পয়সা বাজে নষ্ট করছিস্ কেন? আমাদের পাড়ায় বিখ্যাত তারের ক্রীড়া-প্রদর্শক তারেশ বাবু আছেন—তাঁকে বল্লেই তিনি একটু কষ্ট ক'রে দু' পা হেঁটে গিয়ে ঘুড়িটা এখুনি তার থেকে খুলে এনে দেবেন। তাঁর কাছে ও তো এক মিনিটের মাম্‌লা, পা বাড়ালেই হ'ল। আমিই ওদের কিন্‌তে বাধা দিলুম। সেই পয়সায় ওদের চকোলেট্ কিনে দিয়েছি।"

প্রমাণ-স্বরূপ, তাঁর নিজের শেয়ারের চকোলেট্ আমাকে দেখালেন। দেখিয়েই মুখে

পুরে দিলেন। তার পরে প্রসন্নমুখে বল্লেন—"ও পাড়্‌তে আপনার কতক্ষণ আর! এক মিনিটের ব্যাপার। তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওদের।"

এর আর কি জবাব দেব আমি? বিকৃতবদনে চেয়ারে এসে বসি। একটু পরেই অনতিপূর্ব্বপরিচিত সেই দুই ভাগ্‌নে, তাদের তিন বোন্, ভদ্রলোকের নিজস্ব সাত ছেলেমেয়ে এবং অপোগণ্ড কোলে একজন ঝি—এই চোদ্দজন, এক বিরাট শোভা যাত্রা ক'রে এসে হাজির।

একাদিক্রমে সকলের দিকেই দৃক্‌পাত করি। এরা সবাইই কি ওই একমাত্র ঘুড়িটার প্রত্যাশী? জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম তাই বটে। অনন্যোপায় হয়ে পকেট ঝেড়ে ঝুড়ে খুচরা-খাচরা যা ছিল সব বার করতে হয়। প্রাণ এবং পয়সা এই দুয়ের মধ্যে টানাটানি বাধলে লোকে প্রথমতঃ পয়সাই বার করে, প্রাণ সহজে বার করতে চায় না। পয়সা-বিয়োগ বরং সহা যায়, প্রাণ-বিয়োগের শোক একেবারেই অসহ্য।

"দেখ, ক' দিন থেকেই পায়ে ব্যথা যাচ্ছে তাই, নইলে ঘুড়িটা আমি তোমাদের পেড়ে দিতে পারলেই খুসী হতাম।"

ওদের একটু হেঁটে দেখিয়ে দিই। জন্ম-খঞ্জের চেয়েও আমার পায়ের অবস্থা যে সম্প্রতি বেশী খারাপ, হাঁটার নমুনা দেখেই তা বুঝ্‌তে ওদের দেরী হয় না।

"দেখ্‌ছ তো, এম্‌নিতেই হাঁটতে কেমন খ্যাচ্ লাগ্‌ছে। তার ওপরে তারের ওপর দিয়ে চল্‌তে হ'লেই—বুঝতেই পার্‌ছ।"

ওরা সমবেদনা প্রকাশ করে। সবাই বেশ সহানুভূতি-সম্পন্ন।

"তা তোমাদের আমি পয়সাই দিচ্ছি, ঘুড়ি তোমরা কিনে নাও গে, কেমন?"

দেখলাম কেউই এ প্রস্তাবে গর্‌রাজি নয়। পরের দুঃখ এরা বোঝে। প্রত্যেকের হাতেই চারটে ক'রে পয়সা দিই।

অবশেষে ঝি-ও দেখি হাত বাড়ায়।

"য়্যাঁ? তুমিও ওড়াও নাকি ঘুড়ি?" আমি ঈষৎ অবাক্ হই, "বটে? তোমারও ঐ বদভ্যাস আছে?"

এক গাল হেসে মাথা নেড়েই ঝি তার জবাব দেয়, বাক্যব্যয়-বাহুল্য করে না।

অগত্যা ঝিকেও একটা আনি দিই। এবং ওর কোলের অপোগণ্ডটাকেও দিতে হয়। কি জানি ওরও হয়তো ঘুড়ি ওড়ানোর সখ থাকতে পারে। কিছুই বলা যায় না। ওই বা কেন বাদ যাবে?

আমারই চোদ্দটি আনির তেরটি আমারই চোখের সামনে অপরের ট্যাঁকস্থ হয়—আমি অম্লানবদনে সহ্য করি। কেবল শিশুটি তার আনিটা মুখস্থ করতে থাকে।

এর পর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেও ভয় করে। পাড়ায় ছেলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব! কিন্তু ঘরে বসেও কি পরিত্রাণ আছে? একটি ছোট মাথা দরজার ফাঁকে উঁকি মারে।

উঁকি মারে আবার অন্তর্হিত হয়। ডাক দিই।

অভ্যর্থনা পেয়ে কাছে আসে। খুব সম্ভব, আগের জন্মের আলাপী; কেননা ইহজন্মে এঁকে কোথাও দেখেছি মনে হয় না।

সঙ্কোচে ছেলেটির মুখে কথা সরে না। একটা আনি দিই ওর হাতে। "কিছু বল্‌তে হবে না, এই নাও।"

যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি সে চলে যায়।

নাঃ, ঘরের মধ্যে থাকাও আর নিরাপদ্ নয়। ধড়াচূড়া প'রে বেরিয়ে পড়্‌তে হ'ল।

বেরুবার মুখেই দুর্ঘটনা! একটি বালক তীরবেগে আমার বাড়ীর মধ্যে ঢুকছিল তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। ভয়াবহ কলিশন্, কিন্তু ফিরে আর তাকাই না, হত অথবা আহত ফলাফল কি হ'ল দেখবার দুঃসাহস হয় না। কেবল একটা আনি পেছনে ছেলেটার উদ্দেশে ছুড়ে দিই, দিয়েই দ্রুত অগ্রসর হই।

গলির মোড়ে আর একটি কিশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। হন্ হন্ ক'রে সে চলেছে, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তাকে ধ'রে থামাতে হয়। "কোথায় যাচ্ছ বুঝতে পেরেছি। এই নাও।" আনিটা ওর হাতে গুঁজে দিই।

ছেলেটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায়। "অনেক দূর থেকেই আস্‌ছ বলে বোধ হচ্ছে। বাড়ীতে আমাকে না পেলে, মনে কষ্ট পাবে, সেইজন্যই দিলাম।"

তবু যেন সে বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

"আমার পায়ে ব্যথা কিনা, তারে চড়তে পার্‌ব না তো। সেই জন্যই।" আমি ওকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করি।

ছেলেটি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে আমি স'রে পড়ি।

অনেকক্ষণ এধারে ওধারে কাটিয়ে বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরি। সন্ত্রস্ত হয়ে চল্‌তে হয়, বালকের তো অভাব নেই পৃথিবীতে, বিশেষ ক'রে যে পার্থিব অংশটায় আমার বসবাস। একটা অপার্থিব ভীতি আমাকে বিচলিত কর্‌তে থাকে, পা টিপে টিপে পাড়া দিয়ে চলি। যে রকম ছেলেপিলের সংক্রামকতা আজকাল!

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছতেই কোলাহল এসে কানে লাগে। আর একটু এগুতেই সমস্ত বিশদ হয়। সাম্‌নের, পাশের, পেছনের অলিগলি এবং আমার বাড়ীর আশপাশ জুড়ে কম্-সে-কম

প্রায় দেড় হাজার বালক! তারা একবার ঘুড়ির দিকে আর একবার আমার বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছে। কিসের এত আন্দোলন বুঝতে আর বাকী থাকে না।

'ন যযৌ ন তস্থৌ'—বুক্‌নিটা বড় বড় পণ্ডিতদের লেখায় বারবার চোখে পড়েছে, তোমরাও হয়ত চাক্ষুষ ক'রে থাকবে, কিন্তু কথাটার যথার্থ মানে সেই মুহূর্ত্তেই যেন প্রথম হৃদয়ঙ্গম কর্‌লাম।

তার পর কেবল এই বাক্যগুলি অস্পষ্ট ভাবে আমার কানে এল: "ঐ ঐ", "ঐ যে তারেশ বাবু!" "তারেশ বাবু এই দিকে—" "আসুন অসুন, আমরা আপনার জন্যই—", "ওঃ, কখন্ থেকে দাঁড়িয়ে, বাপ্‌স্!" "কি হ'ল ওঁর, ভদ্রলোক এগুচ্ছেন না তো!" "গেঁটে বাত ধর্‌ল নাকি!" "ওদিক দিয়ে সরে পড়ছেন যে!" "ও বাবা! তারেশ বাবুর পেটে-পেটে এত!" "কি সাংঘাতিক মানুষ দেখেছিস্!" "আরে পালায় যে!" "তারেশ বাবু পালাচ্ছেন!" "পালাল রে; তারেশ পালাল!" "সট্‌কে পড়্‌ল—ধর্ ধর্ তার্‌শাকে!"

উপসংহারে এই কথাগুলি শুন্‌লাম:

"আপনি কখনও দৌড়ে পারেন আমাদের সঙ্গে?" "রানিংএর অভ্যেস্ থাকা চাই মশাই!" "হ্যাঁ, আমাদের মত প্র্যাক্‌টিস্ করা চাই রেগুলার, রোজ সকালে উঠেই ছুট্‌তে হবে মাঠে।" "বলে রানিং-শুই কিনে ফেল্লাম ছ' যোড়া!" "কত গণ্ডা মেডেল্‌ই পেয়েছি প্রাইজ্!" "আমাদের সঙ্গে ছুটে পার্‌বেন আপনি—ছোঃ!" "আর এই দেহ নিয়ে?" "দেহ না তো কলেবর!" "তারের উপর দৌড় ঝাঁপে কি হয় বল্‌তে পারি না, তবে ফাঁকা রাস্তায় আপনি আমার সঙ্গে—হুঁ হুঁ, জানেন আমি রানিং-এ চ্যাম্পিয়ন্?" "ছি ছি, ছুটে পালাচ্ছেন, আপনার ভারী অন্যায়!", "আপনি ভারী কাপুরুষ তারেশ বাবু।"

তার পর যা হ'ল তা আর কহতব্য নয়। সম্মিলিত বাক্যতানের মধ্যেই কার্য্যকলাপ সব ঘট্‌তে লাগ্‌ল। মোহনবাগানের সেণ্টার্-ফরোয়ার্ড গোল দিতে পারলে যা হয় (প্রায়ই দিতে পারে না তাই রক্ষে) সেই দুরবস্থাই আমার হ'ল। ছেলেদের কাঁধে কাঁধেই ঘুড়ির নীচে বরাবর এসে পৌঁছলাম। আমার তখন কাঁদ্‌বার অবস্থা।

"কি চাও তোমরা বল তো?" অশ্রুপাত সম্বরণ ক'রে কোন রকমে বাক্যস্ফূর্ত্তি করি।

"ওই ঘুড়িটা আমরা চাই। তারের উপর দিয়ে গিয়ে ওটা আমাদের পেড়ে দিন্।"

"পায়ে ব্যথা যে"—আমি অভিযোগ জানাই, "বাঁ পা-টায়।"

"তা'তে কি হয়েছে? এক পায়ে কি যাওয়া যায় না? এই রকম করে—" একটা ছেলে অন্য পা তুলে একমাত্র পায়ে লাফিয়ে চলার কৌশলটা আমাকে দেখিয়ে দেয়।

তবু আমি বল্‌বার চেষ্টা করি—"তারের উপর কি অমন লাফানো চল্‌বে? কতটুকুই বা জায়গা! অত স্কোপ্ কই?"

"খুব খুব।" সকলের সমবেত উৎসাহ পাই—

"ও তার ছিঁড়বে না, ভয় নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে লাফান্ না!"

"তবে তাই হোক্।" আমি মরীয়া হয়ে উঠি। "সেই হতভাগা জুতো যোড়াকে পাই কি না, খুঁজে দেখি।"

বাড়ীর মধ্যে ঢুকি। বেরুবার মুখেই বাধা পড়েছিল তা না মেনে এই দুর্দ্দশা এখন। পৃথিবী থেকেই আজ বেরিয়ে যেতে হবে কিনা কে জানে! আড়াই ডজন ছেলে আমার বডিগার্ড্ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে আসে।

সেদিনই একটা বইয়ের কপিরাইট্ বেচে এক শ' টাকা পেয়েছিলাম, নোট্খানা বুকপকেটে কড়্কড়্ করছিল। সেইটাই ভাঙিয়ে আনি-য়ে ফেল্ব নাকি? আনি-য়ে মানে আনি ক'রে। মনে মনে ভাবি। কিন্তু এই করেই কি নিস্তার আছে? কাঁহাতক্, কতদিন এমন পারা যাবে? দুনিয়ার যাবতীয় আনি ফুরিয়ে গেলেও ছেলে ফুরোবে না। জীবাণুর চেয়েও ছেলেরা সংখ্যায় ও পরিমাণে বেশী। তবে? তার চেয়ে বরং তারেই চেপে পড়া যাক্। একেবারে ধনে-প্রাণে মারা যাওয়ার চেয়ে শুধু প্রাণে মারা যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

এ ঘর ও ঘর খুঁজে, ভাঙা এক আল্মারির পেছনে জুতো যোড়াকে আবিষ্কার করলাম। কালিঝুলি মেখে ভৌতিক চেহারা নিয়ে পড়ে আছে আমার সার্কাসের সহচরেরা!—আমার এককালের পরমাত্মীয়, দেখে দুঃখিতই হলাম। বেচারাদের সারা গায়ে অগুন্তি আল্পিন্ আর যত রাজ্যের পেরেক্। আমার বাক্সের, দেরাজের আর ঘরের চাবি কেন যে কেবলি হারিয়ে যায় এতদিনে তার কারণ প্রত্যক্ষ হ'ল। সেই জুতোর গায়ে সংলগ্ন রয়েছে সব একত্র হয়ে; মিলেমিশে বাস করছে সবাই। স্যুট্কেসের একটা ছোট তালাও সেই সঙ্গে। একটা কর্ক্স্ক্রুও।

আমার আড়াই ডজন বডি-গার্ডের এক-একজনের উপর এক-একটার ভার দিই। দশ জন আল্পিন্গুলো নিয়ে বাইরে বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে আসে। চার জনে পেরেকগুলো সংগ্রহ করে। তিন জন মিলে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তালাটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বাকী তের জন প্রত্যেকে একটা ক'রে চাবি সজোরে ছিনিয়ে বহু কষ্টে মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে রাখে; কর্কস্ক্রুটাকেও।

তার পরে আমি সেই মারাত্মক জুতো পদতলগত করি। বিস্তর পয়সা ব্যয় ক'রে তাল তাল চুম্বক লাগিয়ে 'স্পেশালি' ওদের তৈরী করানো হয়েছিল, সার্কাসে ব্যবহারের জন্যই, যাতে তারে যাতায়াতের দুর্য্যোগে আকস্মিক পদস্খলন না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। এবং কৃতজ্ঞতাসূত্রে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করব, ওদের অনুগ্রহে তার থেকে কোন দিন ভূপতিত হতে হয় নি আমাকে। হ্যাঁ, ভূপতিত হ'তে হয় নি, সত্যি।

কান-ফাটানো করতালির মধ্যে তেতালার ছাদে গিয়ে দাঁড়াই। আবার যেন সার্কাসের

দিন ফিরে আসে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি অগুন্তি কচিকচি উন্নত মুখ। উৎসুক এবং উদ্দীপ্ত। চারিধারে বালকের জনতার মধ্যে উৎসাহের আর অবধি নেই। এতক্ষণ হৃদ্কম্প হচ্ছিল, কিন্তু ওদের উচ্ছ্বাস যেন আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয় ক্রমশঃ—একটা বিজাতীয় আনন্দ বোধ হতে থাকে।

ভগবান্ মাথার উপরে এবং জুতো পায়ে—তখন আর ভয় কিসের? আকাশও মাথায় ভেঙে পড়বে না এবং ভূপতনের আশঙ্কাও নেই। অবলীলাক্রমে তারের উপর দিয়ে চল্তে সুরু করি। সমস্ত তারটায় দু' দু'বার টহল্ দেওয়া হয়ে যায়। একবার মনে হয়, প্রাতভ্রমণের এমন সোজা রাস্তা থাক্তে এত দিন ব্যবহার করি নি কেন? এত উচ্চতায় আর এমন ফাঁকা জায়গায় অক্সিজেন নিশ্চয় যথেষ্টই থাকে, তবে রোজ সকালে উঠে এখানে পায়চারি করলেই তো হয়! নীচে থেকে হাততালির আর বিরাম নেই।

নীচে থেকে আওয়াজ পাই: "ঘুড়ি ঘুড়ি! দেরি করছেন কেন? ধ'রে ফেলুন ঘুড়িটাকে।"

হ্যাঁ, ঘুড়ি! প্রাতঃভ্রমণের ভাবনার মধ্যে ঘুড়ির কথা ভুল্লে চল্বে না। ধর্ব তো বটেই।

কিন্তু আমি আছি তারের উপরে আর ঘুড়ি ঝুল্ছে তারের নীচে—কি ক'রে ওটাকে বাগাই? উঁকি-ঝুঁকি মারি, অনেক চেষ্টাচরিত্র করি, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর এক পা নীচে যতদূর সম্ভব নামিয়ে দিই, দিয়ে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করি—কিন্তু ঘুড়ি থাকে তেমনি, আমার হাত-পা দু'জনেরই নাগালের একেবারে বাইরে।

তাই তো, এ তো ভারী মুস্কিল হ'ল দেখ্ছি!

"বসে পড়ুন্ মশাই! কিংবা শুয়েই পড়ুন্ না। তা হ'লেই ঠিক ধর্তে পারবেন।"

নীচে থেকে আদেশ উপদেশের কামাই নেই, কিন্তু পালন করাই কঠিন। ভালো করেই ভেবে দেখি যে তারের উপর শুয়ে পড়া আমার পক্ষে তত সহজ হয়ে উঠ্বে না। না, বালিশের অভাবের জন্য বল্ছি না, এক ঘুমের পর বালিশ খুব কম রাত্রেই আমি খুঁজে পাই—(আমার মাথার তলার চেয়ে চৌকির তলাই বালিশের বেশী পছন্দ) সেজন্য না; কিন্তু শয্যার সূক্ষ্মতাটাও তো বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।

নীচে থেকে তাগাদার রেহাই হয় না, হাততালিও খুব জোর চল্তে থাকে।

অকস্মাৎ আমি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি—যা থাকে কপালে, জয় মা দুর্গা, ঘুড়িটাকে আমি হাতাবই। তারের উপর হামাগুড়ি দিয়ে পড়ি। কিন্তু দুঃসাধ্য-সাধনার সূত্রপাতেই দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

তার থেকে আমার পা ফস্‌কায়। ছেলেদের উত্তেজিত চীৎকারে আকাশ যেন অকস্মাৎ চৌচির হয়ে ফাটে—কিন্তু সমস্ত চেঁচামেচি ক্রমশঃ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে।

তার থেকে আমি পড়ে যাই। কিন্তু পড়ে যাবই বা কোথায়? যে চুম্বক লাগানো জুতো পায়ে তাতে পড়া অত সহজ নয়। এতক্ষণ আমি ছিলাম তারের উপরে, এখন আমার উপরে থাকে তার—আমি ঝুল্‌তে থাকি, ঘুড়ির মতই, ঘুড়ির পাশাপাশি। সেই সার্কাসের দুর্ঘটনাটার মতন—কি বিপদ্ ভাব দেখি!

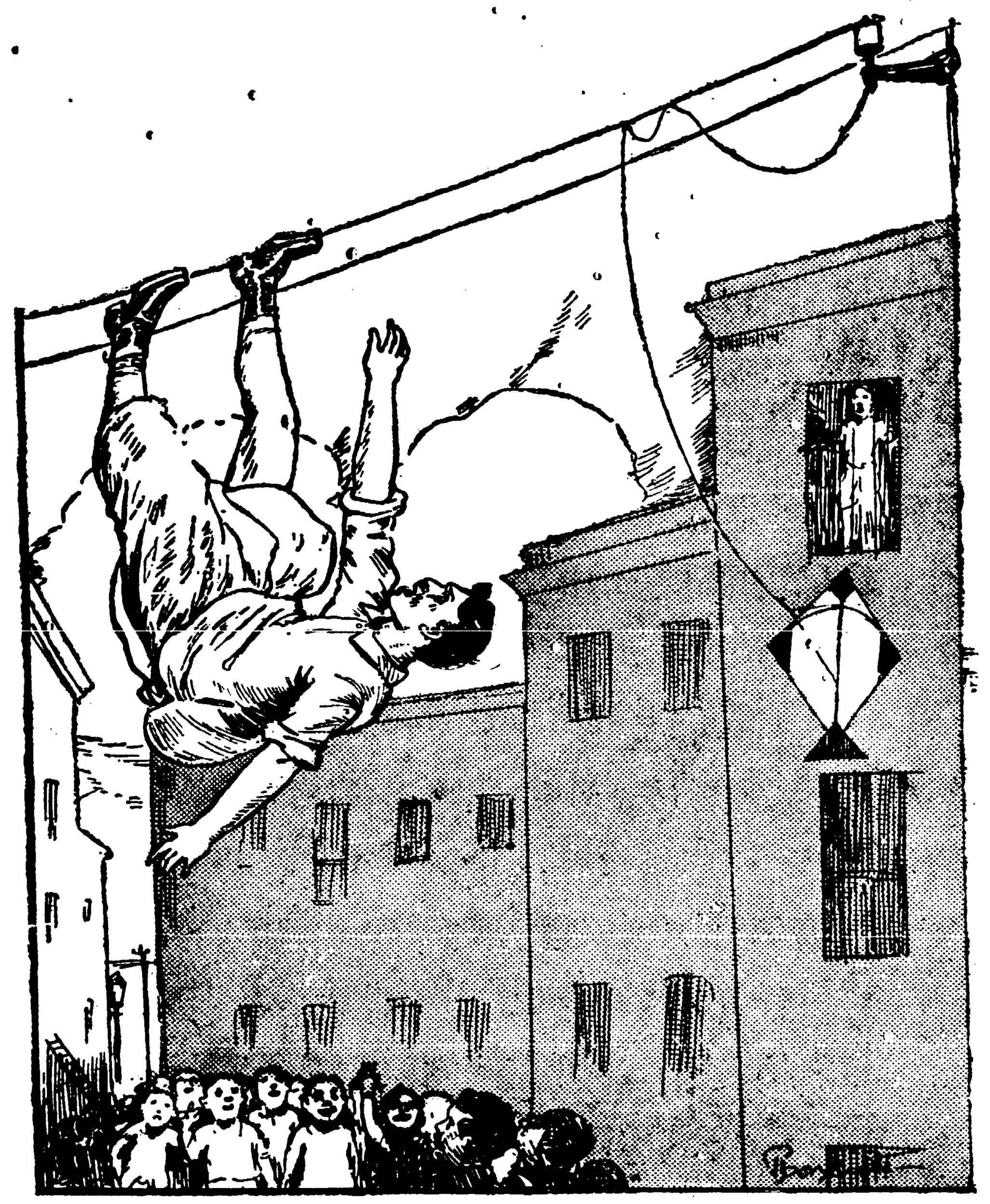

আমি ঝুলতে থাকি···ঘুড়ির পাশাপাশি

নীচে মহা হৈ-চৈ! ততক্ষণে ছেলেরা সব ভারী লাফালাফি সুরু ক'রে দিয়েছে। তাদের উৎসাহ দেখে কে! আমার 'ঝোঝুল্যমান' অবস্থা—আমি নিরুপায়। ঘাড় বাঁকিয়ে আড় নয়নে কেবল তাকাই। সমবেত সকলের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করি—কি আর কর্‌ব?

এতক্ষণ বাদে সকালের সেই মামা এগিয়ে আসেন। চকোলেট্-খাওয়া মামা। "আহা, কি কর্‌ছ তোমরা! ভদ্রলোককে নামাবার ব্যবস্থা কর। শুধু লাফালে কি হবে?"

মামা, তোমাকে ধন্যবাদ। মনে মনে সকৃতজ্ঞ হই।

"অম্‌নি ক'রে কি ঝুলে থাকা যায়? ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে না? ওইভাবে কতক্ষণ ওখানে থাক্‌বেন?"

বলুন তো! বলুন মামা, আপনিই বলুন। এ ভাবে কতক্ষণ থাকা যায় শূন্যমার্গে?

মামা একটা দড়ি যোগাড় ক'রে আনেন নিজেই। তাতে ফাঁস লাগিয়ে ঘুরিয়ে ছুড়ে দেন্ ওপরে আমার দিকে। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর দড়ির ফাঁস্‌টা আমার গলায় এসে বাধে।

মামা বলেন—"বি রেডি—সব্বাই! এক হ্যাঁচ্‌কায় নাবিয়ে আন্‌ব। তোরা হাত পেতে তৈরী থাক্—পড়্‌লেই লুফে নিবি।"

এইবার সত্যিই আমার হৃদ্‌কম্প সুরু হয়। "অমন কাজও করবেন না মামা।" আমি প্রতিবাদ করার প্রচেষ্টা করি, "তা হ'লে ফাঁসি হয়ে যাব যে; এখনও তো আপনাদের কাউকে খুন করি নি আমি।"

মামা বলেন—"তা হ'লে? তা হ'লে উপায়? তা হ'লে একটা মই নিয়ে আয়। হরেকেষ্টর বাড়ী আছে তেতালা-সমান মই, চেয়ে আন্ গে। মই ধরেই নেমে আস্‌তে পারবেন তারেশ বাবু।"

হ্যাঁ, তা হয়ত পারবেন। তারেশ বাবু মনে মনে ঘাড় নাড়েন।

মই আসে।

আমার বরাবর খাটানো হয়।

মইয়ে হস্তক্ষেপ করি আমি।

পা আমার উপরের দিকে, মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও মহত্তর আকর্ষণের কবলে—একান্ত অসহায়। কিন্তু হাত আছে, হাতই পায়ের অভাব পূরণ করবে এখন। লোকে যেমন পা চালিয়ে নামে, আমাকে তেমনি এখন 'ষ্টেপ্ বাই ষ্টেপ্' হাত চালিয়ে নাম্‌তে হবে।

নাম্‌বার উদ্যোগ করছি, আবার ছেলেদের আর্ত্তধ্বনি। "ঘুড়ি ঘুড়ি! ওটাকেও আন্‌বেন ঐ সঙ্গে।"

হ্যাঁ, ওকেও নিয়ে যাওয়া চাই। তা নইলে সেই এক শ' টাকার নোট্‌খানাই হয়তো ঘুড়ির মত উড়িয়ে দিতে হবে। আর, যার জন্য এত কাণ্ড, এত হাঙ্গামা, তাকেই কি ফেলে যাওয়া চলে?

ঘুড়িটাকে করতলগত করার জন্য হাত বাড়াই।

কিন্তু এম্‌নি দুর্বিপাক—

এতক্ষণ ব্যাটা পাশেই ঝুল্‌ছিল অম্লানবদনে, কোন উচ্চবাচ্য করে নি—কিন্তু এখন এই মুহূর্ত্তেই কোত্থেকে দম্‌কা বাতাস এসে পড়্‌ল আর ও গেল নাগালের বাইরে চ'লে।

এখন সে উড়ছে তারের উপরে,—ঠিক যেখানে একটু আগে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম সেই জায়গায়।

আমি আছি শূন্যে, আর আমার শূন্যস্থান সে পূর্ণ করেছে।

নাপিতের কাণ্ড

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

আজ তোমাদের একজন অদ্ভুত নাপিতের গল্প শুনাইব। নাপিতেরা নাকি খুব চালাক জাত—অন্ততঃ আমাদের দেশে এই রকম একটা কথা আছে। নাপিতের বুদ্ধির অনেক গল্পও তোমরা হয়তো গল্পের বইএ পড়িয়াছ, কিন্তু আমি যে নাপিতটির কথা বলিতেছি ইনি কোন গল্প-উপকথার লোক নন, ইনি সত্যিকারেরই নাপিত,—প্রায় শ' দেড়েক বছর আগে ইংল্যাণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে ইনি বাস করিতেন। ইঁহার নাম কেউ কেউ হয়তো শুনিয়া থাকিবে কিন্তু অনেকেই সম্ভবতঃ জান না। রিচার্ড্ আর্ক্‌রাইট্ নামটা চেনা চেনা লাগিতেছে কি?

রিচার্ড্ আর্ক্‌রাইট্

তা' চেনা থাকুক আর না থাকুক, তোমাদের চিনাইয়া দিবার জন্যই আমার এ গল্পের অবতারণা। আর্ক্‌রাইট্ ছিলেন ভয়ানক গরীবের ছেলে; এত গরীব যে তাঁর বাপ-মা সারা বছর তাঁকে স্কুলে পড়াইবার খরচটাও যোগাইতে পারিতেন না, বছরের মধ্যে শুধু কয়েক মাস তিনি স্কুলে যাইতে পাইতেন। স্কুলে যাইতে না পারিলে সব ছেলেরই মনে কষ্ট হয়, আর্ক্‌রাইটের মনেও খুবই কষ্ট হইত; কিন্তু টাকা না থাকিলে পৃথিবীতে কিছুই হয় না। ঐ কয়েক দিন স্কুলে যাওয়াও আর্ক্‌রাইটের বরাতে বেশী দিন ঘটিল না, তেরো বছর বয়সের সময়েই তাঁকে পেটের দায়ে এক নাপিতের দোকানে কাজ শিখিবার উদ্দেশ্যে ঢুকিতে হইল।

বছর সাতেক শিক্ষানবীশী করিয়া একদিন আর্ক্‌রাইট্ নিজেই নাপিতের ব্যবসা সুরু করিয়া দিলেন। কিন্তু পয়সার জোর নাই, বেশ সাজান-গোছান একখানা ঘর লইয়া ভদ্রভাবে ব্যবসা চালাইবেন সে উপায় তাঁর ছিল না। রাস্তার চেয়েও নীচু একটা ছোট স্যাঁৎসেঁতে ঘর অল্প টাকায় ভাড়া লইয়া আর্ক্‌রাইট্ কাজে নামিলেন।

কিন্তু সাধ করিয়া স্যাঁৎসেঁতে নীচু ঘরে কে যাইবে বল? আর্ক্‌রাইটের বরাতে খরিদ্দার বড় একটা জুটিল না, প্রায় অনাহারেই তাঁর দিন কাটিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন শেষে কি ভিক্ষা করিয়া পেট চালাইতে হইবে? কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ছিল ভয়ানক প্রখর, উপায় ঠাওরাইতে তাঁর সময় লাগিল না; তিনি দোকানের সামনে এমন মজার মজার সব সাইন্‌বোর্ড্ লাগাইতে লাগিলেন যে তারই ফলে তাঁর দোকানে লোক আসিতে সুরু করিল। মজুরীও তিনি অপর নাপিতদের চাইতে অনেক কম লইতেন। ক্রমে তাঁর অবস্থা একটু একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিল।

সে সময়ে বিলাতে পরচুলার খুব চলতি ছিল। তখনকার দিনের বড় বড় লোকদের ছবি দেখিলেই তোমরা আমার কথার সত্যতা বুঝিবে। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া জমীদার, ব্যবসাদার, চাকুরে, সাহিত্যিক—সকলেই প্রায় পরচুলা ব্যবহার করিতেন। নাপিতের ব্যবসা করিতে করিতে আর্ক্‌রাইট্ লক্ষ্য করিলেন এই পরচুলার ব্যবসা চালাইতে পারিলে লাভ নেহাৎ মন্দ হইবে না। তিনি নানা জায়গা হইতে চুল সংগ্রহ করিয়া মাথা খাটাইয়া সেগুলিকে এমন ভাবে রং করিতে লাগিলেন যে সে রং দেখিয়াই লোকে তাঁর পরচুলা কিনিত। পরচুলার ব্যবসায়ে তাঁর বেশ আয় হইতে লাগিল।

কিন্তু বরাত মন্দ হইলে লোকে কি করিতে পারে বল? ইংল্যাণ্ডের লোকেদের হঠাৎ পরচুলার প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইল—এবং ক্রমে পরচুলা না পরাটাই সভ্য পরিবারে ফ্যাশন্ হইয়া দাঁড়াইল। আর্ক্‌রাইট্ বুঝিলেন তাঁকে পরচুলার ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য ব্যবসা ধরিতে হইবে।

আর্ক্‌রাইটের স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল স্বামী তাঁর আবার নাপিতের ব্যবসা আরম্ভ করেন। নাপিতের স্ত্রী হইতে তাঁর মোটেই আপত্তি ছিল না, ঘরে দু' পয়সা আসিলেই তিনি খুসী। কিন্তু আর্ক্‌রাইটের মন আর নাপিতের কাজে বসিল না, পৃথিবীতে তিনি অনেক বড় কাজ লইয়া আসিয়াছিলেন, নাপিতের দোকানের ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর প্রতিভার স্থান সংকুলান হইতে পারে না।

ল্যাঙ্কাশায়ার জায়গাটি কাপড় তৈরীর জন্য বরাবরই বিখ্যাত, সে সময়েও

তাই ছিল। কিন্তু এখন সেখানে যে ভাবে কাপড় তৈরী হয় তখন সে ভাবে হইত না। কাপড়ের কল বলিয়া তখন কিছু ছিল না, আমাদের দেশের মতই চরকায় বাড়ীর মেয়েরা সূতা কাটিয়া দিত আর পুরুষেরা সে সূতা তাঁতে বুনিয়া কাপড় তৈরী করিত। এ ভাবে তৈরী কাপড় যে কলে-তৈরী কাপড়ের মত পরিমাণে বেশী, বুননে নিখুঁত আর দামে সস্তা হইতে পারে না তা তো বুঝিতেই পার। (অবশ্য চেষ্টা করিলে চরকায় কাটা সূতা খুব উঁচুদরেরও তৈরী করা যায়—যেমন ঢাকার মস্‌লিন, কিন্তু সাধারণতঃ যা হয় তার কথাই বলিতেছি।) আর্ক্‌রাইটের ছেলেবেলা হইতেই কলকব্জা, যন্ত্রপাতির দিকে খুব ঝোঁক ছিল; এখন তাঁর মাথায় আসিল, আচ্ছা, তূলা হইতে সূতা তৈরীর আর কাপড় বুনিবার কোন কল কি তৈরী করা যায় না?

যেই ভাবা অমনি আর্ক্‌রাইট্‌ কাজে লাগিয়া গেলেন। সে কি সহজ সাধনা? ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁর পরীক্ষা চলিতে লাগিল—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পরীক্ষা করিতে খরচ আছে, আর্ক্‌রাইট্‌ যে সামান্য টাকা জমাইয়াছিলেন তা দিয়াই পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে সে টাকা কর্পূরের মত উবিয়া গেল। এদিকে সংসার চলে না, স্ত্রী তো ভয়ানক খাপ্পা, কিছুতেই স্বামীর এই পাগ্‌লামী তিনি সহ্য করিবেন না। অবশেষে একদিন তিনি রাগে আগুন হইয়া আর্ক্‌রাইটের সমস্ত যন্ত্রপাতির মডেল্‌ ভাঙ্গিয়া দিলেন। আর্ক্‌রাইট্‌ কিন্তু তবু দমিলেন না, আগের চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নতুন করিয়া কাজ সুরু করিলেন। তখন কিন্তু তাঁর দু'বেলা ভাল করিয়া খাইবারও সংস্থান নাই, পরনের কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে তা' পর্য্যন্ত কিনিবার পয়সা নাই।

অবশেষে একটি সহৃদয় বন্ধুর সাহায্যে আর্ক্‌রাইটের কল তৈরী হইল। সেদিন তাঁর কী আনন্দ! বাড়ীর কাছে জঙ্গলের মধ্যে একটা পড়ো স্কুল-বাড়ী ছিল, তিনি গিয়া তারই মধ্যে তাঁর যন্ত্র বসাইলেন। জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া কল বসাইবার মানে আর কিছুই না, তখনকার লোকেরা কল-কারখানার উপর বড় চটা ছিল, কল-কারখানা বসান মানে তারা বুঝিত গরীব শ্রমজীবীদের মুখের গ্রাস

কাড়িয়া লওয়া। ইতিপূর্ব্বে হারগ্রীভ্‌স্‌ নামে এক ভদ্রলোক এই রকম চেষ্টা করায় ক্রুদ্ধ জনতা গিয়া তাঁর সে কল ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দেয়। কাজেই আর্ক্‌রাইট্‌কে খুব সাবধানে, লোকচক্ষুর আড়ালে কাজ আরম্ভ করিতে হইল। জঙ্গলের মধ্যে পড়ো-বাড়ীতে কল বসান'র কথা যে লোকের কাছে গোপন রহিল তা' নয়, তবে তারা ব্যাপারটাকে কোন মায়াবীর কাণ্ড বলিয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিতে সাহস করিল না। দু'জন বুড়ী তো স্পষ্টই জানাইল, রোজ গভীর রাত্রে এই মায়াবী 'ব্যাগ্‌পাইপ্‌' লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করে, তারা দুপুর রাত্রে কান পাতিয়া সেই অদ্ভুত আওয়াজ শুনিয়াছে। আসলে কিন্তু সেগুলি কলেরই ঘড়্‌ঘড়্‌ আওয়াজ, তা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না?

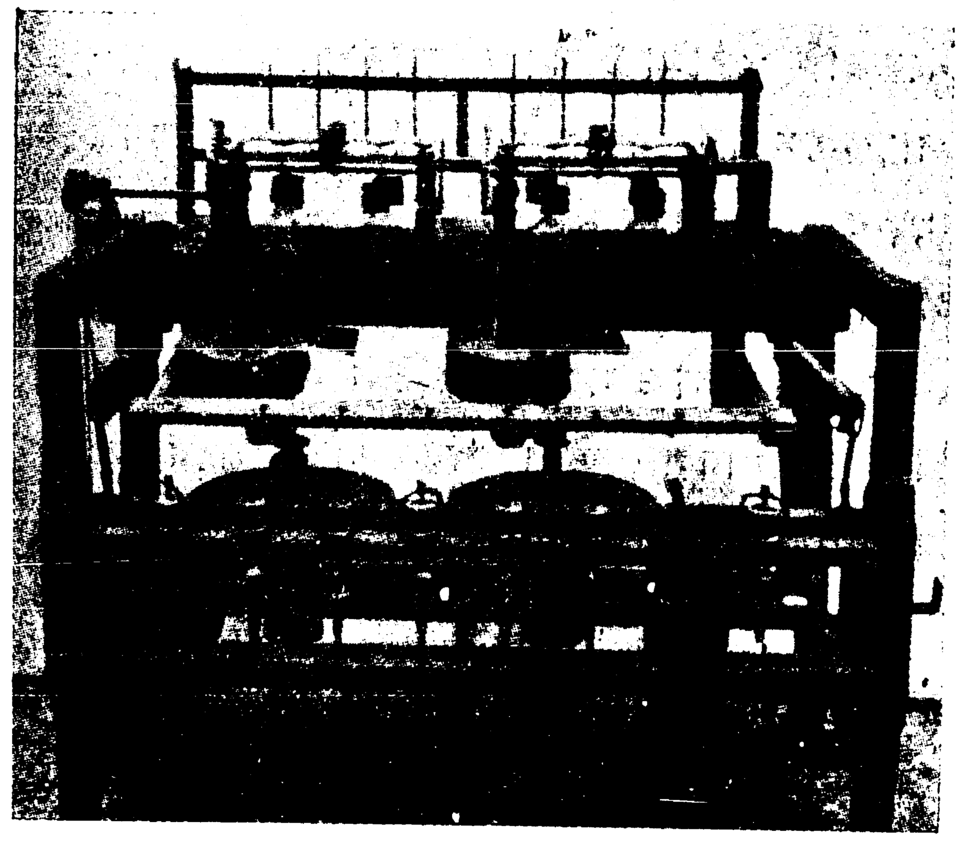

আর্ক্‌রাইটের তৈরী কল

প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ হইলে আর্ক্‌রাইট্‌ নটিংহাম্‌ সহরে গিয়া একটা পেটেন্ট লইয়া তাঁর কারখানা খুলিলেন। আরও দু'জন ধনী বন্ধু—জন্‌ কে ও জন্‌ স্মলি তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। সেটা ১৭৬৯ সন—ইংলণ্ডের বাণিজ্যের ইতিহাসে এক মস্ত স্মরণীয় দিন।

শীঘ্রই আর্ক্‌রাইটের কারখানা সরাইয়া ডার্ব্বিশায়ারে আনা হইল—কারণ এখানে ঝরণার সাহায্যে কল চালান আরও সুবিধাজনক। আর্ক্‌রাইটের কলে তৈরী সূতা দেখিতে দেখিতে বাজারে ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু সুবিধা হইলে কি হইবে? ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্যান্য তাঁতীরা ইহাতে একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। কী, কল বসাইয়া তাদের রুটি কাড়িয়া লওয়ার ব্যবস্থা?

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে যে কলের সাহায্য লইতেই হইবে, মানুষের সুখ-সুবিধা বাড়াইতে হইলে যে কল ছাড়া উপায় নাই, কতক লোকের অন্ন কাড়িলেও এক-একটা কারখানা যে বহু লোকের অন্নের সংস্থানও করে—এ সব যুক্তি তারা মানিল না। তারা মারমুখো হইয়া উঠিল, কিসে আর্ক্‌রাইট্‌কে বিপদে ফেলা যায় সকলে মিলিয়া তারই উপায় ঠাওরাইতে লাগিল। আর্ক্‌রাইটের কলে তৈরী সুতা তারা কেনা বন্ধ করিল।

কিন্তু আর্ক্‌রাইট্‌ সহজে দমিবার পাত্র নন, তিনি তাঁর কলে তৈরী সুতা দিয়া নিজেরাই বোনার কাজ আরম্ভ করিলেন; তাঁদের জিনিষ ভাল হওয়ায় সাধারণ লোকে সেটাই বেশী পছন্দ করিতে লাগিল। আর্ক্‌রাইট্‌ শুধু এতেই ক্ষান্ত রহিলেন না, কলের নিত্য নূতন উন্নতি করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে বুনিবার কলও বাহির করিয়া ফেলিলেন। তাঁর কারখানায় শত শত লোক খাটিতে লাগিল।

তাঁতীরাও সহজে ছাড়িল না, তাঁর একটা কারখানা তো তারা জোর করিয়া ভাঙ্গিয়াই দিল; তার পর তাঁর নামে দল বাঁধিয়া নালিশ করিল—তিনি নাকি মোটেই সুতা তৈরীর কল আবিষ্কার করেন নাই, তাঁর ও পেটেন্ট্‌ নেওয়া নাকি জোচ্চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। জজ্‌ সাহেবও তাদের মতে সায় দিলেন। এত বড় একটা প্রতিভাবান্‌ লোকের এমন মন্দ বরাত বড় একটা দেখা যায় না। বিচারের পর বিপক্ষ দলের একজন লোক আর্ক্‌রাইট্‌কে শুনাইয়া বলিল, "যাক্‌, এত দিনে কামানে বেটার দফা নিকেশ করা গেল।" তিনি নাপিত ছিলেন বলিয়াই অবশ্য 'কামানে' কথাটা বলিল। আর্ক্‌রাইট্‌ জবাব দিলেন, "কামানে বেটার কাছে একখানা ক্ষুর যে এখনও রয়ে গেছে! তাই দিয়েই সে তোমাদের সবাইকে আবার কামাবে।"

এই ক্ষুর আর কিছু নয়, তাঁর ক্ষুরধার উদ্ভাবনী-বুদ্ধি। আদালতে হারিয়াও তিনি দমিলেন না! তাঁর ছিল আবিষ্কারকের প্রতিভা, সাধারণ তাঁতীরা তাঁর সঙ্গে পারিবে কেন? তিনি কলে নিত্য নূতন পরিবর্তন আনিতে লাগিলেন—কল চালাইবার জন্য বাষ্পের শক্তি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন,—এই রকম কত কি! দেখিতে দেখিতে সম্পদে তাঁর ঘর ভরিয়া উঠিল। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ

ধনীদের মধ্যে লোকে তাঁরও নাম করিতে লাগিল। তাঁর স্ত্রী, যিনি এক সময়ে নাপিত-বৌ হইবার জন্য মাথা কুটিয়াছিলেন, তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর পাগলামীর পরিণাম দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অবশ্য কেউ কিছু লিখিয়া রাখিয়া যান নাই, তবে অনুমান করিতে বোধ হয় বেশী কষ্ট হয় না।

বুড়া বয়সে আর্ক্‌রাইটের মাথায় আবার এক নতুন খেয়াল চাপিল। ছেলেবেলায় বেশী দিন স্কুলে পড়িতে না পাওয়ায় সাহিত্যে তাঁর বেশী পাণ্ডিত্য লাভ ঘটে নাই। সে শোধ তিনি তুলিতে লাগিলেন পঞ্চাশ বছর বয়সে ইস্কুলের ছেলেদের মত সকালে-বিকালে ব্যাকরণ পড়িয়া, বানান মুখস্থ করিয়া আর হাতের লেখা পাকাইয়া।

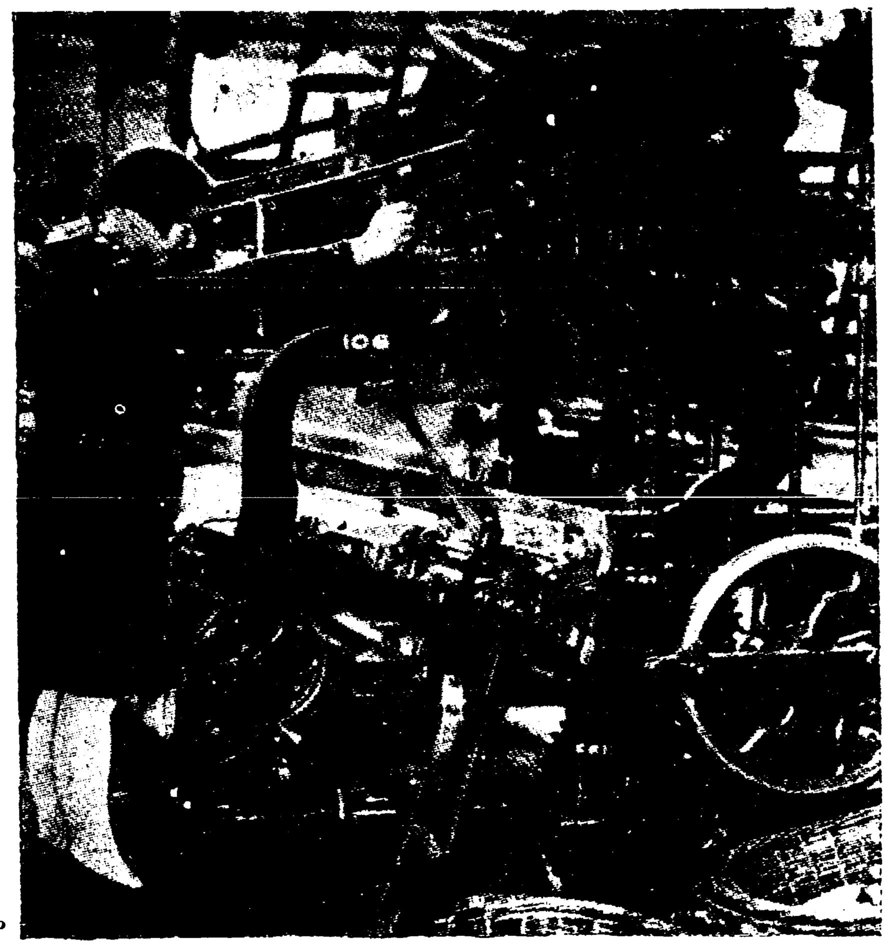

আধুনিক কাপড়ের কলের একটি দৃশ্য

শেষ বয়সে অবশ্য আর্ক্‌-রাইট্‌ দেশের লোকের কাছে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছিলেন। পাইবেন না কেন বল? কাপড়ের ব্যবসাই হইল ইংরাজদের প্রধান—হয়তো বা সর্ব্বপ্রধান ব্যবসা। যে লোকটি দেশকে এত বড় একটা ব্যবসা শিখাইয়া গেলেন তাঁকে কি তারা সম্মান না করিয়া পারে?

যোসেফ্‌ কনরাড্‌ একজন খুব নাম-করা ইংরেজী সাহিত্যিক। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এঁর মাতৃভাষা কিন্তু ইংরেজী নয়। এই ধরণের আরও কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম করা যেতে পারে যাঁরা বিদেশী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে যশস্বী হয়েছেন। যেমন, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, কবি মনোমোহন ঘোষ, কবি তরু দত্ত ও সরোজিনী নাইডু।

শরতের সাদা মেঘ

(শ্রীনলিনী দাশগুপ্ত, এম্-এ)

ওগো শরতের সাদা মেঘ!
তোমারি সাথে
আমি মিতালি পাতাই, এসো,
আজ্‌কে রাতে।
নীল আকাশের ভরা গাঙ্গে'
তুলে দিয়ে পাল
মোরা সারি বেঁধে পাড়ি দিই
সন্ধ্যা-সকাল।
সাদা জ্যোৎস্নায় ধোয়া-পোঁছা
রূপালী ছাদে,
এসো লুকোচুরি খেলা করি
লইয়া চাঁদে।
দূর মিট্‌মিটে তারাদের
কাছে ডাকিয়া
মৃদু আদরে সোহাগ করি
আঁচল দিয়া।

আজি যেদিকে যেমন খুসী
হাওয়ার বুকে
মোরা আরামে বেড়াই ঘুরে
সহজ সুখে।
নিয়ে মুখে ভরা হাসি আর
মনেতে খুসি,
সদা সবা'কার শুভ-সাধ
হৃদয়ে পুষি।
পথে যারে আজ কাছে পাই
বুলাই পরশ,
দুখে ম্রিয়মাণ প্রাণে তার
জাগাই হরষ।
চির অনাবিল, সুকোমল,
স্নিগ্ধপূত—
ঢালি' দেবতার শুভাশিস্
স্বর্গচ্যুত।

মেজমামার এক্স্‌পেরিমেণ্ট্

(শ্রীমতী নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়)

মেজমামা কোন কথাই সহজে বিশ্বাস করেন না। যে কোন ব্যাপারেই 'প্রমাণ', 'প্রত্যক্ষ' এম্‌নিধারা বড় বড় সব কথা বলেন—এগুলি নইলে নাকি কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। নিজে কোন জিনিষ প্রত্যক্ষ যাচাই না করে ফস্ করে বিশ্বাস

করে ফেলাটা তাঁর মতে একটা মস্ত বড় বোকামী। সম্প্রতি তিনি প্রমাণ করে ফেলেছেন যে ভোরে বিছানা থেকে উঠ্‌বার আগে কেউ হাঁচি দিলে, কিংবা নাম ধরে ডাক্‌লে, অথবা কোন জাতি বিশেষের উল্লেখ কর্‌লে তাতে নাকি কিছুই অনিষ্ট হয় না। যাত্রার সময় কচ্ছপ দেখে যাত্রা কর্‌লেও লাভ হয়। শূন্য কলসী, শুক্‌নো না প্রভৃতি দেখেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি পরীক্ষা যে তিনি পাশ করে ফেলেছিলেন সে কথা যখন তখন যাকে তাকে শুনিয়ে দেন। কেবল জ্বর হলেই তাঁর সমস্ত লজিক্ গুলিয়ে যায়, অষ্টপ্রহর তিনি ঠাকুর-দেবতার নাম করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর যে কতখানি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ভুলেও সে কথা তোলেন না। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও মেজমামা একটু বিশেষ যত্নবান্; বাবা বলেন, "তোমার মেজমামা পেটুক।" নিজে কিন্তু তিনি এটা বরাবরই অস্বীকার করে আস্‌ছেন।

একবার মেজমামার অসুখ কর্‌ল—দাঁত কনকনানি। রুগ্ন দাঁতটা তুলে ফেলে একটা নতুন দাঁত বসাবার কথা হ'ল। মেজমামা একটা পাথরের দাঁত কিনে আন্‌লেন; বাবা গম্ভীর ভাবে সেটা নেড়েচেড়ে শেষটায় বল্লেন, "এটা শেয়ালদ'র চোরা-বাজারে কেনা সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্ মাল।" তর্ক সুরু হ'ল—দারুণ তর্ক, আর তারই ফলে রাত্তিরের দিকে মেজমামার হয়ে পড়্‌ল জ্বর। তিন দিন তিনি স্রেফ্ উপোস করে রইলেন, চতুর্থ দিনে উঠে জানালেন তিনি নাকি বড়ই 'উইক্‌নেস্ ফীল্' কর্‌ছেন। বাবা বলেন, মেজমামার 'উইক্‌নেস্ ফীল' করাটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, প্রায়ই ভাঁড়ার-ঘর কাবার হয়ে যায়।

মেজমামার এই 'উইক্‌নেস্ ফীল্' করার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না, পূজোর ঠিক আগেই কিন্তু তিনি দাদামশাইকে বলে দুম্‌কায় একটা বাড়ী ভাড়া করে ফেল্লেন। বলা বাহুল্য, আমাদেরও সঙ্গী হ'তে তিনি আহ্বান্ করেছিলেন; ছুটী আরম্ভ হবামাত্র তাই বাবা, মা, ছোটমামা, মেজমামীমা আর আমরা সবাই স-মেজমামা রওনা হয়ে পড়্‌লাম। ট্রেন এবং মোটরযোগে দুম্‌কার বাসায় গিয়ে যখন উপস্থিত হওয়া গেল তখন বেলা প্রায় দশটা। ফাঁকা জায়গার ওপর চারদিকে বাগান-ঘেরা খাসা বাংলোখানা। সহরের একেবারে

বাইরে। বাগান 'হাতে পেয়ে' ছুটোছুটি কর্‌তে লেগে গেছি। মেজমামা ততক্ষণে মালীর সঙ্গে কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব ভাষায় আলাপ আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমরা সবাই অবাক্ হয়ে তাঁর কথা শুন্‌ছি দেখে তিনি বুঝিয়ে বল্লেন, "এইটেই হ'ল আসল হিন্দি ভাষা!" শুনে বাবা বল্লেন, "ওটা ক—।"

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই একচোট ঘুমিয়ে নিলাম, কেননা পথে পরিশ্রম হয়েছিল একেবারে মন্দ নয়। যখন জেগে উঠেছি তখন সন্ধ্যা হব হব, ছুটে গেলাম বাগানে। দেখি মেজমামা খুব মনোযোগ দিয়ে মালীর সঙ্গে কি একটা গভীর তত্ত্বের আলোচনায় নিবিষ্ট আছেন। আমরা কাছে যেতেই সতর্ক করে দিলেন, "দেখ্, তোরা খবর্দ্দার কিন্তু ঝোপের দিকে, বা বেশী ঘাসের মধ্যে যাবি নে, সাপ-খোপের ভয় নাকি খুব বেশী এখানে। প্রায়ই নাকি গোখ্‌রো সাপ দেখা যায়; কামড়ালে কিন্তু আর রক্ষা নেই।" তার পর হঠাৎ মালীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "সাপখোপ ছোবল মার্‌লে এখানে গুণী লোক পাতে পার্‌তা হ্যায়?"

কথাটা অবশ্য মালীর বোধগম্য হ'ল না, আমাকেই দোভাষী সেজে ব্যাপারটা খোলসা করে বুঝিয়ে দিতে হ'ল। প্রশ্ন শুনে সে যা বল্লে তার সারাংশ এই যে কাছেই চামার জাতীয় এক বৃদ্ধ বাস করে, সাপে কামড়ান তিন দিনের মড়াও নাকি সে বাঁচিয়েছে। মেজমামা খানিকটা আশ্বস্ত হলেন, বল্লেন, "উতো ঠিক হ্যায় কিন্তু সাপ তাড়াবার কিছু ব্যবস্থা হ্যায়?" তদুত্তরে মালী জানাল যে বাড়ীতে একটা বেজী পোষা মন্দ নয়, কেননা সে নিজে চোখে প্রত্যক্ষ করেছে যে বেজীতে সাপ দেখ্‌লেই মুহূর্ত্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে। মেজমামা মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্‌লেন, তাঁর স্মরণ হচ্ছে বটে কথামালায় এ রকমই একটা গল্প তিনি পড়েছিলেন; এক ব্রাহ্মণী একটা বেজী পুষে ছিল আর সেই বেজীটাও একটা সাপ মেরেছিল। কিন্তু নিজে চোখে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলে তিনি তো কিছুই করতে পার্‌ছেন না। শেষটায় ঠিক হ'ল মালী একটা বেজী যোগাড় করে আন্‌বে আর তার জন্য মেজমামা তাকে আট আনা পয়সা বখ্‌শিস্ কর্‌বেন। ঠিক সেই সময়েই কোথা থেকে বাবা এসে উপস্থিত, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,

"বেজী? বেজী দিয়ে কি হবে?" কী যে হবে দু' কথায় তা বুঝিয়ে দিয়ে অবশেষে মেজমামা টিপ্পনী কাট্‌লেন, "কিন্তু জানেনই তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলে এ শর্ম্মা কিছুই বিশ্বাস কর্‌ছে না।" বাবা বল্লেন, "প্রত্যক্ষ প্রমাগ না ক—"

পর দিন সকালে মালী বাস্তবিকই একটা বেজী এনে হাজির কর্‌লে। প্রথম প্রথম তার গায়ে হাত দিতে আমাদের বড্ডই ভয় কর্‌ছিল, বিষধর সাপের সঙ্গে লড়্‌বে, বড় সহজ চীজ্ তো নয়! কিন্তু খানিক বাদেই আমরা আবিষ্কার করে ফেল্লাম যে ওটা নিতান্তই একটী গো-বেচারা নিরীহ জীব, ডাক্‌লে বেড়ালের মতই কাছে আসে, পাঁউরুটি দিলে হাতের উপরেই বসে খায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে আমাদের ভারী ভাব হয়ে গেল।

দিন তিন-চার পরের কথা। ভোরের দিকে ঘুম বেশ জমে এসেছে, হঠাৎ অতি মধুর এক বাঁশীর সুর কানে ভেসে এল। ঘুমের ঘোরে মনে হ'ল যেন কোন গল্পের মায়াপুরীতে বিচরণ কর্‌ছি। চট্ করে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই আসল ব্যাপারটা বুঝ্‌লাম—দূর ছাই, এ যে সাপুড়ের বাঁশী! যাক্, তাতেও খুব বেশী আপত্তি ছিল না, ছুটে বাইরের বাগানে চলে গেলাম—যেখানে সাপের খেলা দেখান হচ্ছিল। খেলা শেষ হতে মুখ-হাত ধোবার জন্য ভেতরে চলে এলাম, তার পর সঙ্গ নিলাম ছোটমামার, নদীর ধারে বেড়াতে যাব বলে। বাইরে বারান্দায় আস্‌তেই সাশ্চর্য্যে দেখি, সাপুড়ে তার একটা ঝুড়ি সেখানে রেখে গেছে। কাছেই মেজমামা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর দৃষ্টি সেদিকে এনে বল্‌লাম, "দেখেছেন মেজমামা, বেটা ঝুড়িটা এখানে রেখে গেছে!"

মেজমামা জবাব দিলেন, "রেখে যায় নি রে, ওটা আমিই কিনে নিয়েছি। ওর ভেতর একটা সাপ আছে, বেজীর সঙ্গে আজ তার লড়াই লাগাব। বেজী সাপকে কেমন টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলে আজ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হবে।"

বাবা কাছেই ছিলেন, শুনে বল্‌লেন, "প্রত্যক্ষ প্রমাণ না ক—"

বেজীটাকে প্রায়ই ছেড়ে দেওয়া হ'ত, সেদিন তার কি খেয়াল হল, সন্ধ্যার আগে সে দেখাই দিলে না। এদিকে মেজমামার উৎসাহও সপ্তমে চড়ে গেছে, তিনি হেঁকে উঠ্‌লেন, "সন্ধ্যা সন্ধ্যাই সই, আজই আমি তোমাদের সাপ-বেজীর

সার্কাস্ দেখাব।" আকাশে বেশ ঘনঘটা হয়ে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে দেখে তিনি ঠাকুরকে ডেকে হুকুম দিলেন, "এবেলা লাগাও ভুনি খিচুড়ি আর ফুলকপি ভাজা। বেজীর সার্কাস্ দেখে ভাজি খেতে হবে, বেজীতে আর ভাজিতে বেশ মিল আছে।"

বেচারা বেজীর জন্যে আমাদের কিন্তু দুঃখই হ'তে লাগ্‌ল, পাজী সাপটা যদি বাস্তবিকই ওকে মেরে ফেলে!

রান্না-ঘরের পাশের ভাঁড়ারটা খালি ছিল, মেজমামা সেইটাকেই তাঁর সার্কাসের (অথবা এক্স্‌পেরিমেন্টের) উপযুক্ত জায়গা বলে মনোনীত কর্‌লেন। একটা দেবদারু কাঠের টেবিলের ওপর টেব্‌ল্ ল্যাম্প্ রাখা হ'ল আর ছোটমামার সঙ্গে আমি, রমু, মঞ্জু, শেফালী প্রভৃতি তার ওপর উঠে বস্‌লাম। ঠিক হ'ল বাবা বেজীটাকে ছেড়ে দেবেন, আর মেজমামা একটা লম্বা লাঠির সাহায্যে ঝুড়িটার মুখ তুলে ধর্‌বেন। দরকার হলে সেই লাঠির ঘায়েই যে সাপের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে সদম্ভ অঙ্গভঙ্গী করে সে ইঙ্গিত কর্‌তেও মেজমামা ভুল্‌লেন না। তবে ছোটমামার বোধ হয় তাঁর বাহুবল অথবা লাঠিবল কোনটার ওপরই খুব বেশী পরিমাণে আস্থা ছিল না, তাই নিজেও তিনি একখানা সবল লাঠি হাতেই এসেছিলেন।

সার্কাস্ আরম্ভ হ'ল; মেজমামা গোড়াতেই ভণ্ডুল বাধিয়ে বস্‌লেন। বোধ হয় তিনি একটু বেশী তাড়াতাড়িই ঢাকনাটা খুলে দিয়েছিলেন, কেননা বাবা "ওয়ান্, টু, থ্রী," বলে বেজীটাকে ছেড়ে দিতে না দিতেই ফোঁস্ করে ভীষণ একটা শব্দ হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড ফণা মেলে একটা সাপ ঝুড়ির ভেতর থেকে ব্যর হয়ে পড়্‌ল।

"ও রে বাপ্‌স্" বলে বাবা আর মেজমামা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠ্‌লেন। মেজমামা আবার লাঠি সাম্‌লাতে গিয়ে ভড়্‌কে দড়াম্ করে দিলেন দরজা ঠেলে। পরের মুহূর্ত্তে দু'জনাই এক লাফে টেবিলেয় ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাম্প্ উল্‌টে দেবদারু কাঠের টেবিল মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়্‌ল। তার পর অন্ধকারে আমরা জনা সাতেক প্রাণী ভাঙ্গা টেবিলের উপর বসে প্রকাণ্ড গোক্ষুরো সাপের সঙ্গে

এক ঘরে বন্ধ হয়ে যে কি চীৎকার করেছিলাম তা শুনে তোমরা হয়তো হাস্‌তে পার, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি আমাদের তখন একটুও হাসি পায় নি। আমাদের মধ্যে বাস্তবিকই তখন চীৎকারের প্রতিযোগিতা চল্‌ছিল। আমাদের মারাত্মক চীৎকারে মালী, ঠাকুর, চাকর সবাই লাঠি হাতে ছুটে এল, কিন্তু মেজমামার রাম-ধাক্কায় দরজার ভিতর দিক্‌কার ছিটকানি পড়ে গিয়েছিল, তারা ঢুক্‌তে পার্‌ল না। দরজার গোড়ায় গোক্ষুর সাপ, আর মেঝে ভরা টেব্‌ল্ ল্যাম্পের ভাঙ্গা কাচ। কারো পায়েই জুতো নেই, কেননা এ ঘরটা রান্নাঘরেরই সামিল।

বাবা চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লেন, "দেশলাই, দে-দে-দেশলাই কোথায়?" শেফালী হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌ল, "বাবা, আমার পায়ে সাপে কাম্‌ড়েছে!" মেজমামা জিজ্ঞাসা করলেন, "কো-কো-কোন্ পায়ে?" বাবা বল্‌লেন, "রাখ এখন তোমার তামাসা,—কোন্ পায়ে সেইটাই যেন জান্‌বার বড় বিষয় হ'ল?" মেজমামা ধমক খেয়ে আশ্বাস দিলেন, "ভয় নেই, আমার সন্ধানে ভাল ওঝা আছে।"

ইতিমধ্যে ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ হ'ল, চেয়ে দেখি বাবা জ্বলন্ত কাঠিটা হাতে করে এক দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। কাচে পা কাটবার ভয় তখন কারোই ছিল না, হুড়মুড় করে সবাই বাইরে চলে এলাম। আঃ, যেন নতুন জীবন পেলাম! দেখা গেল শেফালীর কিছুই হয় নি, খুব সম্ভবতঃ বেজীটাই তার পায়ের ওপর দিয়ে পালিয়ে গেছ্‌ল। মেজমামা বারান্দায় এসেই ধপাস্ করে বসে পড়্‌লেন, বল্‌লেন, "উঃ, বড় উইক্‌নেস্ ফীল কর্‌ছি। ঠাকুর, গোটা কয়েক ফুলকপি-ভাজা হয়ে থাকে তো নিয়ে এস।"

আলো, লাঠি এবং লোকজন নিয়ে সাপ আর বেজীর খোঁজে বাবা আবার সেই ঘরে ঢুকে পড়্‌লেন। বেশী কষ্ট পেতে হ'ল না, কেননা আমাদের চীৎকারে আর আলো ভাঙ্গার শব্দে ভড়্‌কে গিয়ে সাপটা সেই ঝুড়ির মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছিল। ঝুড়ির ডালা চাপা দিয়ে আবার তাকে আটক করা হ'ল। বেজীটা, দেখা গেল, ভয় পেয়ে স্কাই-লাইটের জানালার ওপর উঠে বসে আছে; এক খণ্ড রুটী ও এক বাটী দুধ দেখাতেই সে আস্তে আস্তে নেমে এল। মেজমামা কপি-ভাজা খেয়ে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে এইবার বল্লেন, "তোরা ঘরে যা দিকি নি, আমি সব ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

বাবা বল্লেন, "তুমি করবে ক—"

মুখ হাত ধুয়ে সবাই খিচুড়ি খেতে বস্‌লাম; বাবা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আজকের এক্সপেরিমেণ্টে কি প্রমাণ হ'ল?"

মেজমামা নির্ব্বিচারে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, "প্রমাণ হল, বাড়ীর ছেলেপেলেগুলো খুব চেঁচাতে পারে।" ছোটমামা বল্‌লেন, "উঁহুঁ, প্রমাণ হ'ল যে একটা পচা পুরানো দেবদারু কাঠের টেবিলের ওপর যখন পাঁচটি ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমার মত ভারী লোক বসে আছে, এবং তদুপরি একটি ল্যাম্পও রয়েছে তখন তোমাদের মত দু'জন হোঁৎকা লোক সেই টেবিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লে সেটা ভেঙ্গে চূরমার হয়ে সকলকে বিপদে ফেল্‌তে পারে যদি সেই ঘরের মেঝের ওপর একটি গোখ্‌রো সাপ থাকে।"

বাবা বল্লেন, "আসল এক্সপেরিমেণ্টে প্রমাণ হ'ল কচু।"

এবারকার অলিম্পিক্ খেলা

(শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

এ বছর পয়লা আগষ্ট একাদশ অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতা বার্লিনে আরম্ভ হয়। স্বয়ং হের হিট্‌লার এর উদ্বোধন করেন,—ব্যাপারটা খুবই জমকালো গোছের দেখ্‌বার জিনিষই হয়েছিল। উদ্বোধনের ঠিক আগেই ষ্টেডিয়াম-টাওয়ারের বিরাট্ ঘণ্টাটা বেজে উঠ্‌ল, আর সেখানে উড়্‌ল চুয়ান্নটি বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক্-পতাকা। তার পর সব খেলোয়াড়েরা মিলে ষ্টেডিয়ামের মধ্যে মার্চ্চ ক'রে চল্‌ল—প্রবর্ত্তক হিসাবে গ্রীস্ সকলের আগে, আতিথেয়তা দেখাবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মানীর বিরাট্ বাহিনী সব শেষে। মাঝে বর্ণানুক্রমিক ভাবে বাকী সব দেশ। আর তিরিশ হাজার সংবাদবাহী পায়রা আকাশ কালো করে উড়ে চল্‌ল পৃথিবীর সবাইকে জানাতে যে আজ অলিম্পিক খেলার আরম্ভ।

প্রথম দিনটা প্রায় কাট্‌ল এই ধরণের সমারোহতেই—খেলাধুলা আর

সেদিন বিশেষ কিছু হয় নি। প্রকৃত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় দ্বিতীয় দিন থেকে। সবাইকার খেলার উৎসাহ এতই বেশী ছিল যে রাতের অন্ধকারও ওদের দমাতে পারে নি—মাঠের মাঝে মস্ত মস্ত আলো জ্বালিয়ে তারা খেলা চালা'ত। ভারোত্তলনের দিন ত' প্রায় সমস্ত রাতটাই এই ভাবে কাবার হয়ে গেল।

দিন পনেরো অবিশ্রান্ত খেলা চলার পর সেদিন এই অনুষ্ঠানের শেষ হয়েছে। জার্ম্মানী সবশুদ্ধ ৫৮৪ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র—৬৮৯ পয়েণ্ট পেয়ে আর তৃতীয় হয়েছে ইটালী ১৫৫ পয়েণ্ট পেয়ে। কিন্তু "ফিল্ড-য়্যাণ্ড্-ট্র্যাক" খেলাগুলির সম্মানই সব চেয়ে বেশী। এই ধরণের ২৩টি প্রতিযোগিতার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১২টিতে জিতে এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ গৌরব দাবী করতে পারে—আর তাদের প্রায় সমস্ত গৌরবের মূলই বোধ হয় একা জেসি ওয়েন্স, আমেরিকার এক নিগ্রো যুবক। একদিনে তিনি একাই ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে আর লং জাম্পে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

হের্ হিট্‌লার
(ইনি এবারকার অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছেন)

খেলা আরম্ভ হবার আগে বৃটেন সম্বন্ধে যে রকম বড় বড় গুজব শোনা গিয়েছিল সে রকম কিছুই বাহাদুরী সে দেখাতে পারে নি। মাত্র চারটি প্রতিযোগিতায় প্রথম, সাতটিতে দ্বিতীয় ও তিনটিতে তৃতীয় স্থান সে পেয়েছে। সাঁতারে এবারও সব চেয়ে বেশী সম্মান পেয়েছে জাপানীরা—এই প্রতিযোগিতায় তিনটিতে তারা প্রথম হয়েছে। আর এবার হল্যাণ্ডের মুখ যেন মেয়েরাই রাখ্‌ল,

তারা যে ছ'টি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সোনার মেডেল্ পেয়েছে তার অধিকাংশই মেয়ে সাঁতারুদের জন্যে। মিসর এই প্রথম অলিম্পিক্ খেলায় যোগ দিল, কিন্তু প্রথম বারের তুলনায় তারা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে—তারা একটি বিষয়ে প্রথম, একটিতে দ্বিতীয় আর একটিতে তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

এবারেও ভারত তার পূর্ব্ব গৌরব (?) অক্ষুন্ন রাখ্‌ল—তারা মাত্র যে ক'টা বিষয়ে যোগদান করেছিল তার অধিকাংশতেই প্রায় শেষের দিক্ থেকে প্রথম হয়ে, আর বাকীগুলোয় ফিনিস্ না দিতে পেরে। তবে ভারতের ভারোত্তলনবীর হু উইক্ আমাদের নিরাশ করলেও অত করুণ ভাবে করেন নি; শুনতে পাই এই বিষয়ে জন সাতেক প্রতিযোগী তাঁর নীচে হয়েছিল।

ফুটবল খেলায় চীনে দল এখানে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল কিন্তু বৃটেনের সঙ্গে প্রথম খেলাতেই তারা শোচনীয় ভাবে হেরে যায়। তবে ও দেশের আবহাওয়া এর জন্যে কতটা দায়ী বল্‌তে পারি নে। ফাইন্যালে ইটালী অষ্ট্রিয়াকে হারিয়ে দিয়ে তার ফুটবল-গৌরব বজায় রেখেছে। রোইংএ, আর (আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত খেলা) হ্যাণ্ড-বলে জার্ম্মানীই জিত্‌ল। বাস্কেট-বলে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিবেশী ক্যানাডাকে অতি সহজেই হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ান্ হ'ল।

এর পর হকি—আমাদের সবে ধন নীলমণি। অবশ্য ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে গোড়াতে অনেকেই অনেক কথা বলেছিলেন। আমাদের সে দুরন্ত দল নাকি আর নেই। তার পর আবার শুনলুম যে জার্ম্মানীর অভিজ্ঞেরাও বলাবলি করছেন এবার নাকি তাঁদের হারাতে ভারতকে খুব বেগ পেতে হবে। গোড়ায় একটু দুশ্চিন্তাই যেন হয়েছিল, কিন্তু আমাদের হকি-দল অল্প দিনেই বুঝিয়ে দিল যে কাউকে গোটা আষ্টেক গোল দিতে তারা কখনই খুব বেশী বেগ পায় না। জার্ম্মানীও আমাদের একটা গোল দিয়েছিল আর অনেকক্ষণ নাকি ঠেকিয়েও রেখেছিল। যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত ফাইন্যালে ভারত জার্ম্মানীকে ৮—১ গোলে হারিয়ে সোনার মেডেল্ পেয়েছে। এর মধ্যে একা ধ্যানচাঁদ ৫টা গোল দিয়েছেন।

অবশ্য আশার কথা এই যে ভারতের নীচেও অনেক দেশ রয়েছে। ভারত তবু কিছু পয়েন্ট পেয়েছে, কিন্তু এমনও অনেক দেশ আছে যারা কিছুই পয়েন্ট পায় নি'। আমরা কিন্তু একটা জিনিষ দেখে খুব খুসী হলুম যে ইয়োরোপের অনেক দেশই হকি খেলায় একটু আধটু উন্নতি করেছে, এখন আর তারা কথায় কথায় কুড়ি-পঁচিশ গোল খায় না। আশা করি অদূরভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে হকিতে যুঝবার মত যথেষ্ট শক্তি তাদের হবে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

ধর্ম্ম

(কুমারী অরুণা বাগচী)

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম ধারণা আছে। কিন্তু ধর্ম্মের সব চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা কি? যাহা হইতে মানুষের আসল সুখ ও শান্তি হয় তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। মানুষ অধর্ম্ম করিয়া যদি কোনও সুখ পায় তাহা হইলে সে সুখ তাহার স্থায়ী হয় না। প্রথমে সে সুখ পাইতে পারে বটে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাহার দুঃখ আরম্ভ হয়। যেমন—মানুষ চুরি করে; তাহাতে প্রথম সে অনেক ধনরত্ন পায় বলিয়া তাহার বেশ আনন্দ হয় কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাহার ভয় হয়, মনে হয় এই বুঝি আমি ধরা পড়িলাম, এই ভয়ে সে মনে শান্তি পায় না। কাজেই তাহার যে সুখ সে কখনও আসল সুখ হইতে পারে না।

ধর্ম্মকে সাধারণতঃ ১২টি ভাগে ভাগ করা যায়।—পাঁচটা যম, পাঁচটা নিয়ম, দয়া ও দান। পাঁচটা যম কি কি? না—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। সেইরূপ নিয়ম পাঁচটা—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

কথাগুলি বোধ হয় খুব বড় বড় ঠেকিতেছে, কিন্তু এগুলি মোটেই বড় বড় কথা নয়, অতি সাধারণ কথা—একটু বুঝাইয়া বলিলেই বুঝিতে পারিবে।

অহিংসা কাহাকে বলে? কোন প্রাণীর শরীরে বা মনে আঘাত না দেওয়াকেই অহিংসা বলে। যদি কেহ কাহারও উপর হিংসা করে তাহা হইলে প্রতিপক্ষও তাহার উপর রাগিয়া থাকে ও তাহার অনিষ্ট করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই অনিষ্ট করে। আর যিনি সর্ব্বজীবে অহিংসা করেন তাঁহার অনিষ্ট করা দূরে থাক লোকে তাঁহার মঙ্গল কামনাই করিয়া

থাকে। সত্য কাহাকে বলে ? মনে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় কথায় ঠিক সেইরূপ যদি প্রকাশ করা যায় তবেই তাহা সত্য হয়। যে সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলে তাহার সত্য কথাও কেহ বিশ্বাস করে না। কথামালার রাখালের গল্প তোমরা পড়িয়াছ। অস্তেয় কাহাকে বলে ?—চুরি না করাকে অস্তেয় বলে। ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে ? গুরুর কাছে খুব নিয়মে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। তাহাতে আমাদের জীবনে অনেক উন্নতি হয়। আর যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তাঁহারা এই যম, নিয়ম প্রভৃতি ধর্ম্ম পালন করেন।

অপরিগ্রহ কাহাকে বলে ? প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ না করাকেই অপরিগ্রহ বলে। যেমন—আমাদের একখানি কাপড় ও সেমিজ হইলেই চলে, কিন্তু আমরা কত ভাল ভাল কাপড়, ব্লাউজ ইত্যাদি ব্যবহার করি। আমাদের ডাল, ভাত ও একটা তরকারী হইলেই চলে কিন্তু আমরা মাছ, মাংস কত কি খাই! ইহার জন্য আমাদের অনেক সময়ে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়।

শৌচ কাহাকে বলে ? মন ও শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাকেই শৌচ বলে। যে সর্ব্বদা অপরিষ্কার হইয়া থাকে তাহার হাতে খাইতেও ঘৃণা হয়, কিন্তু যে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে তাহার হাতে খাইতে মোটেই ঘৃণা করে না। কাজেই আমাদের সকলের পরিষ্কার থাকা উচিত। তাহাতে মনও ভাল হয়।

সন্তোষ কাহাকে বলে ? নিজে যথাসম্ভব কষ্ট করিয়া যে বিষয়ে যাহা উপার্জ্জন করা যায় তাহা কম হইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাকেই সন্তোষ বলে। সন্তোষ পালন করিলে নিজের মনে খুব শান্তি পাওয়া যায়। তাহা না হইলে লোকে সব বিষয়ে খুব বেশী উপার্জ্জন করিলেও মনে শান্তি পায় না। নিজের শান্তি বজায় রাখিতে হইলে সন্তোষ-ধর্ম্ম পালন করা প্রয়োজন।

তপঃ কাহাকে বলে ? যে-কোনও ভাল কাজের জন্য কষ্ট সহ্য করাকে তপস্যা বা তপঃ বলে। তপঃ পালন করিলে আমি ভাল কাজের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতেছি মনে করিয়া মনে আনন্দ পাওয়া যায়। আর কাজ সিদ্ধ হওয়াতে পরে সুখ পাওয়া যায়।

স্বাধ্যায় কাহাকে বলে ? ভাল বই পড়া ও জপ করা প্রভৃতিকে স্বাধ্যায় বলে।

ঈশ্বর-প্রণিধান কাহাকে বলে ? ভগবান্‌কে ভালবাসা এবং তাঁহার নাম জপ করা ও তাঁহার স্তব, স্তুতি ও ধ্যান করাকেই ঈশ্বর-প্রণিধান বলে।

দয়া ও দান কাহাকে বলে ? নিজের সাধ্যমত দুঃখীদের দুঃখমোচনকে দয়া ও দান বলে।

এই বারটী ধর্ম্ম যে যতটুকু পালন করিবে সে ততটুকু সুখ ও শান্তি লাভ করিবে।

[এই বিভাগে গ্রাহকদের নিজের হাতে আঁকা ছবি ও নিজের হাতে তোলা ফটো প্রকাশিত হয়।]

রেঙ্গুন লেক্
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গৃহীত
আলোকচিত্র

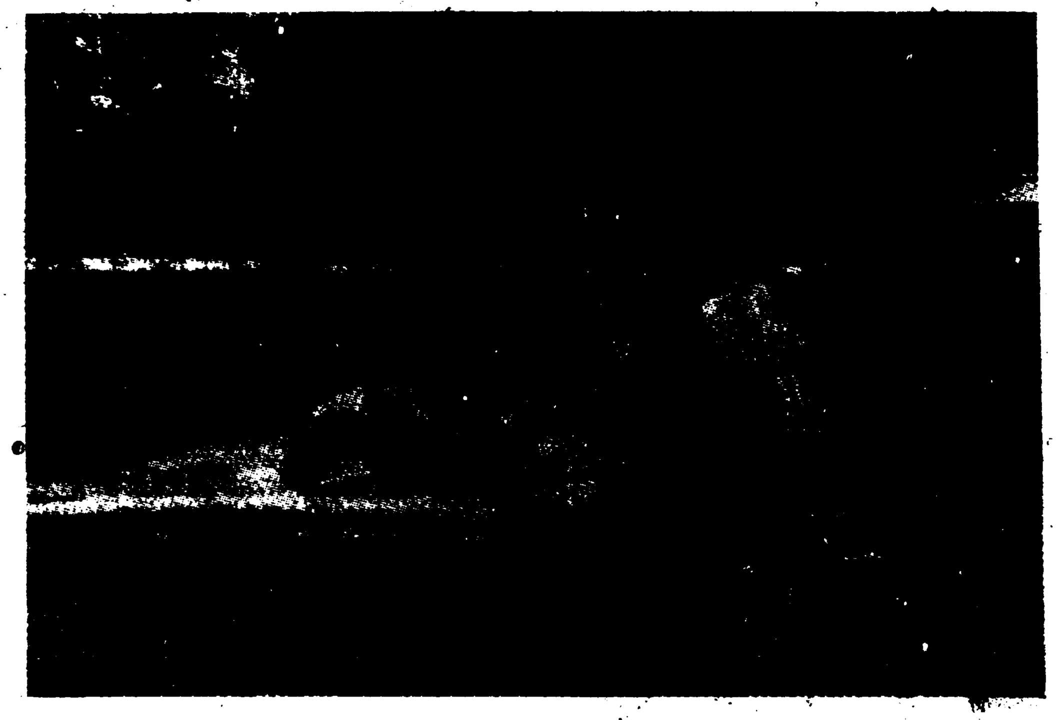

আলিপুরের বন্দী হিপ্পো।

শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র গৃহীত আলোকচিত্র

সন্দেশ

পৃথিবীতে এখন যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার মধ্যে বোধ হয় পেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ই সব চেয়ে পুরানো। এটি ৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ই সব চেয়ে পুরানো। এই তিনটিই স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সনে।

* * *

ভাইকাউন্টেস্ য়্যাষ্টর ইংলণ্ডের পার্লিয়া-মেন্টের প্রথম নির্ব্বাচিত নারী সদস্য।

* * *

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মাঝখানে যে সমুদ্র তার নাম ইংলিশ চ্যানেল তা তোমরা জান। এটি চওড়ায় ২৮ মাইল। এই চ্যানেল মেয়ে পুরুষ অনেকেই সাঁতরাইয়া পার হইয়াছেন। পুরুষদের মধ্যে কিন্তু প্রথম পার হন ক্যাপ্‌টেন ওয়েব। আর মেয়েদের মধ্যে মিস্ গারট্রুড্ এডার্ল্।

ক্যাপ্‌টেন্ ষ্টিভেন্স্ ও এণ্ডারসন্ নামে দু'জন আমেরিকান্ গত বছর প্রকাণ্ড একটা বেলুনে চড়িয়া ডাঙ্গা হইতে ৭২,০০০ ফুট্ উপরে উঠিয়াছিলেন—অর্থাৎ এভারেষ্টের চেয়েও আড়াইগুণ উঁচুতে। এ পর্য্যন্ত অত উঁচুতে আর কোন মানুষই পৌঁছিতে পারে নাই। যে বেলুনে চড়িয়া তাঁরা এই দুঃসাহসিক অভিযান করিয়াছিলেন তার নাম "দ্বিতীয় এক্সপ্লোরার"।

* * *

প্রত্যেক বয়স্ক সুস্থ মানুষ গড়ে প্রতি মিনিটে ১৬ হইতে ১৮ বার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

* * *

কলিকাতা সহরের একটা নাম "City of Palaces" অর্থাৎ 'প্রাসাদের নগরী'। এ নাম কে দিয়াছিলেন জান? বিখ্যাত ইংরাজ লেখক মেকলে সাহেব।

* * *

প্রথম বাংলা অক্ষরে ছাপার বই কি জান? "বাঙ্গালা ব্যাকরণ"। এটি কিন্তু একজন সাহেবের লেখা। তাঁর নাম হল্‌হেড্।

* * *

সুমাত্রা দ্বীপের কাছে এক রকম ফুল পাওয়া যায়, তার নাম "রাফেলসিয়া আরনল্ডি"। এই ফুলগুলি এক-একটা ওজনে প্রায় পাঁচ সের হয়। এত বড় ফুল পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

* * *

কিছু দিন আগে কুইন্ মেরী নামে যে বিরাট্ জাহাজখানি তৈরী হইয়াছে সেটির সম্বন্ধে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা শোনা গিয়াছিল এবং অনেকেই ভাবিয়াছিল এই জাহাজটিই পৃথিবীর রেকর্ড্ ভাঙ্গিবে। কিন্তু প্রথম বার জলে ভাসিলে দেখা গেল লোকের এ অনুমান সত্য হইল না। সম্প্রতি কুইন্ মেরী দ্রুততায় পৃথিবীর রেকর্ড্ ভাঙ্গিয়া নিজের নাম রাখিয়াছে।

কুইন্ মেরীর মত, অমনি বিরাট্, আরও একখানি জাহাজ ইংলণ্ডে তৈরী হইতেছে।

বয়সে কি বুদ্ধি বাড়ে

(শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্.এস্-সি)

একে আষাঢ় মাস, তায় রথের দিন। আকাশ যেন একেবারে উজাড় হইয়া যাইবার যোগাড়। চক্রবর্ত্তী-পাড়ায় রথের মেলা, ছেলেমেয়েগুলা আজ সারাদিন ছটফট্ করিতেছে, কখন বিকেলটা হয়! তা দেবতার এমন দয়া যে মেলা ত মেলা, গ্রামকে গ্রাম যেন ডুবাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় তিনি সকাল হইতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন।

বেলা প্রায় তখন চারটা, ছেলেমেয়েদের সব আশা এক রকম নির্ম্মূলই হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে বৃষ্টি বোধ হয় যেন একটু ধরিল। ছুটি পাইয়া ছেলেমেয়ের দল খাঁচা-খোলা পাখীর মত দরজার বাহিরে আসিয়া জুটিতে লাগিল। ফটিকচাঁদের সাত বছরের মেয়ে ছবি "ওমা, বিষ্টি থেমেছে, মলিকে ডাকতে যাচ্ছি" বলিয়াই ফুড়ুৎ করিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া মল্লিকার বাড়ীর দিকে ছুটিল। পাশেই মল্লিকাদের বাড়ী। দু'জনে মিলিয়া আজ মল্লিকার কাকার সঙ্গে রথের মেলায় যাইবে, এ আজ সাত দিন হইতে ঠিক হইয়া আছে।

মল্লিকার বাড়ীতে পৌঁছিতেই দরজার মুখে মল্লিকার সঙ্গে দেখা। তার পরনে বাসন্তী রঙের সাড়ী, পায় আল্‌তা, সে কাদার ভয়ে রাস্তায় নামিতে পারিতেছে না। ছবি বলিল, "বা রে, তুই বাসন্তী পরেছিস্! মা আমাকে সবুজ সাড়ী দিয়েছে। কই, কাকাকে ডাক, মেলায় যাবি নি?"

মল্লিকা ছবির চেয়ে বছর দু'-তিনের বড়। সে বলিল, "দাঁড়া না, কাকা বল্‌লে রাস্তার জলটা একটু সরুক।" ছবি বলিল, "জল নেই রাস্তায়; তুই দেখ্ না"। মল্লিক বলিল, "আহা, জল নেই, ঐ ত!" পাশেই কোথাকার বাগান হইতে এক নালি দিয়া হুড়হুড় করিয়া জল আসিয়া রাস্তার কাদার মধ্যে এক জায়গায় জমিয়া উঠিতেছিল। ছবির পা দু'খানা নিস্‌পিস্ করিয়া উঠিল, সে বলিল, "এই মলি, তবে আয় না, ততক্ষণ জলে নামি।" মল্লিকারও যে লোভ হইতেছিল না তা নয়, তবে তাঁর পায়ে আল্‌তা, পরনে ধোপ কাপড়; তাই একটু আপত্তি ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছবির পীড়াপীড়িতে শাস্ত্রের বচন অগ্রাহ্য করিয়া সেও পথে নামিয়া পড়িল। মুখে বলিল, "কিন্তু ভাই, কাপড়ে যদি কাদা লাগে মা যা বক্‌বে!" ছবি ততক্ষণে দুই হাতে কাপড়খানি হাঁটুর উপর গুটাইয়া ধরিয়া "এম্‌নি করে আয় না" বলিয়া সেই কাদা জলে নামিয়া পড়িয়াছে। "হিঃহিঃ-হিঃহিঃ", কি ফূর্ত্তি! মল্লিকাও একবার পিছনে দেখিয়া লইয়া, সন্তর্পণে কাপড় সাম্‌লাইয়া আসিয়া জুটিল, "কি ঠাণ্ডা রে!"

মল্লিকা কাছে আসিতেই ছবি এক হাতে মল্লিকার কাপড় জড়াইয়া ধরিয়া জলের মধ্যে কিলবিল্ করিয়া উঠিল। "কতখানি জল রে মলি?" মোটে তার গোড়ালিটুকু ডুবিয়াছে। মল্লিকা কাদা ছিটানর ভয়ে ধমকাইয়া উঠিল, "এই ছবি, অমন করলে মারব কিন্তু, জল ছিট্‌কোবে যে! আচ্ছা ছট্‌ফটে মেয়ে বাবা। আস্তে আস্তে চল্ না।"

তার কথা শেষ হইতে না হইতেই ছবি কিছু না বলিয়া জলের উপর ছপাৎ করিয়া পা ফেলিয়া, তার পর দুষ্ট চাহনিতে মল্লিকার মুখের দিকে চাহিয়া তার কাপড় ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া গেল। একরাশ জল ছিট্‌কাইয়া মল্লিকার কাপড়ে অজস্র কাদার ছোপ লাগাইয়া দিল। মল্লিকার মুখ রাগে, দুঃখে ইস্কাবনের বিবির মত হইয়া গেল। সে চটিয়াছে, সত্যিই চটিয়াছে, ছবিকে আজ সে কয়েক ঘা দিবেই। তার মুখ দিয়া কথা ফুটিল না, সে ছুটিল ছবিকে মারিতে।

মল্লিকার মা এমন সময়ে বাড়ীর বাহিরে আসিতেছিল। ছবি তার সামনে, একেবারে তার কোলের উপর পড়িল। তাকে ধরিয়া ফেলিয়া মল্লিকার মা বলিল, "কিরে, কি হয়েছে?" অদূরে মল্লিকা, সে কাদা-লাগা কাপড় তুলিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "ছবি কাদা ছিটিয়ে দিয়েছে।" দেখিয়া মা বলিয়া উঠিল, "ও-মা-গো! এই মাত্র না মেয়েকে ধোপ কাপড় পরিয়ে দিলাম!" ছবির হাত তার হাতেরই মধ্যে, জোরে তাঁর হাতে চাপ দিয়া মল্লিকার মা বলিল, "কেন্ রে দস্যি মেয়ে?" আর যায় কোথা, ছবি একেবারে "ওঁ মাঁ রেঁ" করিয়া চড়া কান্না সুরু করিল। ওদিকে ছবির মায়ের টনক নড়িয়া উঠিল। "কি রে, কি হল রে?" বলিতে বলিতে সেও ছুটিয়া আসিল। আর কি হল; জবাব দিবার লোক কি আর আছে? মল্লিকার মা মুখ ভার করিয়া বলিল,

"কি সয়তানী মেয়েই করেছ তুমি!" ব্যস, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—সঙ্গে সঙ্গে দেবর্ষির আবির্ভাব। দুই মায়ে তখন বাধিয়া গেল একেবারে তুমুল ঝগড়া। মেয়ে দুটা যেন শুকাইয়া কাঠ।

ঝগড়ার সুর ক্রমশঃ মধ্যম হইতে পঞ্চম, পঞ্চম হইতে নিখাদে উঠিতে লাগিল। ফটিকচাঁদের কানে সে সুর পৌঁছিতে দেরী হইল না। গামছা কাঁধে ফটিকচাঁদ দেখিতে আসিল ব্যাপার কি।

তার পর আসিল শশী মণ্ডল, তার পর ক্যাব্‌লার বাপ, ক্রমে দুই পরিবারের যে যেখানে ছিল সকলে আসিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। স্ত্রী-পর্ব্ব হইতে ঝগড়া গড়াইয়া পুরুষ-পর্ব্বে চলিল। নারদ ঋষির ঢেঁকি ঢপাঢপ্ পড়িতে লাগিল। ফটিকচাঁদ ক্যাব্‌লার বাপকে বলিল, "তোকে কে দালালী করতে ডেকেছে?" ক্যাব্‌লার বাপ জবাব দিল, "দালালী করি ত করি, তোর খেয়ে করি?" "কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!" "ফটিকচাঁদ কাঁধের গামছায় হাত দিল। কে একজন বলিয়া উঠিল, "খবরদার ফটকে।" শশী মণ্ডল বলিল, "ঢের ঢের মরদ দেখেছি, থাক থাক।" ফটিকচাঁদ কাঁধের গামছা কোমরে জড়াইল। জয় ঢেঁকিবাহনের জয়। হাতাহাতি বাধে আর কি! ফটিকচাঁদের গামছায় গেরো পড়িয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে মল্লিকার থুত্থুড়ে বুড়ী ঠাকুরমা ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া কখন আসিয়া জুটিয়াছিল, বুড়ী দু'দলের মধ্যে পড়িয়া বলিল, "ওরে হতভাগারা, সারাদিন পরে যদি বা বিষ্টিটা থাম্‌ল, তা এই গোঁয়ারগোবিন্দের দল কোথাকার এক ছেঁড়াল্যাটা নিয়ে কুরুক্ষেত্তর বাধাতে বসেছে! যা না, তার চেয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে একটু ঠাকুর দর্শন করে আয়। পুণ্যিও হবে, পাড়াও জুড়ুবে। সর্ তো দেখি, সর্।" হ্যাঁ, ঐ ঝড়ের মুখে ঐ বুড়ী! শশী মণ্ডল বলিল, "যাও যাও, তুমি আবার এর মধ্যে কেন? সরে যাও বল্‌ছি।" হাত ছোটে আর কি! এমন সময় বুড়ী আর একদিকে চাহিয়াই চেঁচাইয়া উঠিল, "দেখ্ দেখ্ মূখ্যুর দল, চেয়ে দেখ্।" সবাই এক সঙ্গে চাহিয়া দেখিল, নালির জলের স্রোতে একটুক্‌রা কাঠ ভাসিয়া চলিয়াছে, আর মল্লিকা আর ছবি গলা ধরাধরি করিয়া সেটিকে দেখিতে দেখিতে তার পাশে পাশে চলিয়াছে, মুখে দু'জনেরই কী আমোদ!

বুড়ী বলিল, "দেখ্ দেখি হতচ্ছাড়ারা, যাদের নিয়ে তোদের ঝগড়া তাদের ঝগড়া কখন মিটে গেছে। আর তোরা ধাড়িগুলো, তাদের বাপ-জ্যেঠারা, আজ বছরকার দিনে কাক-চিলের মত ঝগড়া করে মরছিস, লজ্জাও কি করে না তোদের? তোরা আবার ওদের বলিস্ অবুঝ! তোদের আবার নাকি বুদ্ধি বেশী! পোড়াকপাল তোদের।" *

---

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে।

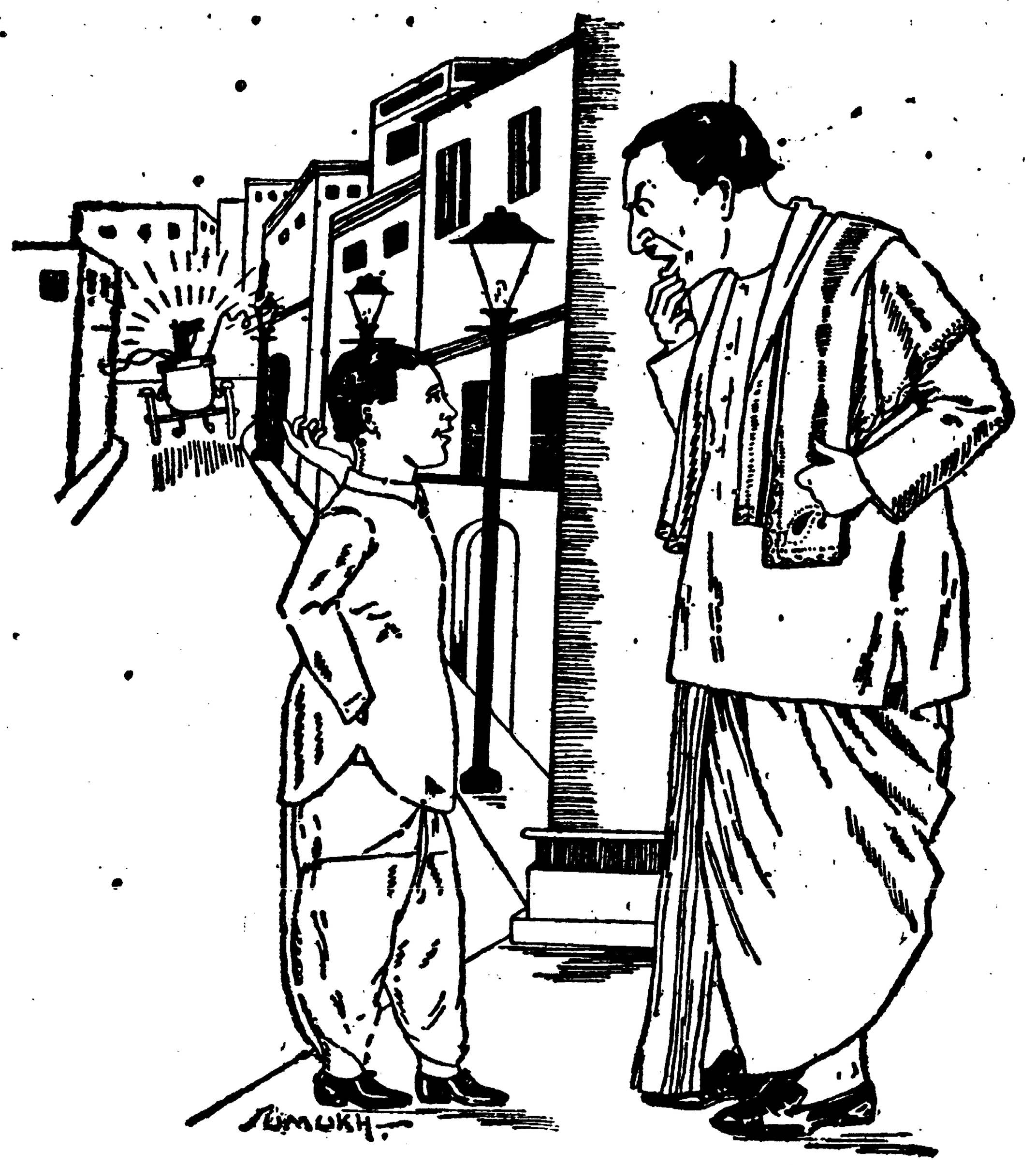

টম্‌টম্‌ওয়ালা-বাবু রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটি ছেলেকে ডেকে বল্লেন, 'খোকা, আমি না আসা পর্য্যন্ত গাড়ীটা একটু দেখো তো'।

খানিক বাদে বাবু ফিরে এসে দেখেন গাড়ী নেই, ঘোড়া পালিয়েছে,—বহু দূরে রাস্তায় গাড়ীর খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ছেলেটি অত্যন্ত বিচলিত ভাবে বল্‌ল, 'যাক্, ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন। আমাকে গাড়ীটা দেখ্‌তে বলেছিলেন, এতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেয়েছি, কিন্তু আর এক সেকেণ্ড পরে এলে ওটা আর দেখা যেত না। আমার দৃষ্টিশক্তি একটু কম কিনা!'

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ; বি-এল্)

(২৩)

সুমিত্র-নিকেতনে অমিত্র

রাত্রে হোটেলে ফিরিয়াই হুকা-কাশি বাসুকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাছে সুট আছে মিষ্টার বাসু?"

"ব্যাপার কি বলুন তো, ওবেলা চাইছেন ভসরের জোড়, এবেলা চাইছেন সুট, কাপড়ের ব্যবসায়ে নাম্‌বার মৎলব কর্‌লেন নাকি?"

"না না, ঠাট্টা নয়, সত্যিসত্যিই আছে নাকি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।···অবশ্য আপনাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য আমার একেবারেই নেই, কিন্তু তবুও আসল ঘটনা সম্পূর্ণ গোপন করাও বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সত্যি বল্‌তে কি, ব্যাপার বাস্তবিকই বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার পরিচয় যে আর একটুও ছাপা নেই তার স্পষ্ট প্রমাণ আজ পাওয়া গেছে।"

বাসু বাহিরে কোনরূপ ভাবান্তর দেখাইলেন না বটে, কিন্তু ভিতরটা তাঁর যেন কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল। আল্‌কেপুন-ডিলিঞ্জারের লীলাভূমি শিকাগো সহরে এতকাল যিনি কাটাইয়া আসিয়াছেন, নেটিভ গুণ্ডার উল্লেখে তাঁর তরফ হইতে কিছু মাত্র ভয়ের ভাব দেখানও যে অশোভন তা জানি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রণজিতের অবস্থাটার কথাও ভুলিতে পারি কই?

হুকা-কাশি আবার বলিলেন, "আমার নিজের জন্য ততটা ভাবি না, আর তা ছাড়া আত্ম-বিশ্বাসও যে একেবারে নেই তাও নয়; কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। ধর্‌তে গেলে এ কাজে আপনাকে নাম্‌তে উৎসাহ দিয়েছি আমিই; কাজেই আপনাকে নিরাপদ্ না করে আমি কোন মতেই সুস্থির হতে পার্‌ছি না। এক রণজিৎ বাবুর কথা ভেবেই আমার······"

তাঁর কথা শেষ হইতে পারিল না, বাসু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে কি আপনি এম্‌নি অপদার্থ পেলেন মিষ্টার হুকা-কাশি যে আপনাকে এই বিপদের ভেতর একা ফেলে দিয়ে আমি সরে পড়্‌ব? সে শিক্ষা তো ছেলেবেলা থেকে কখনো পাই নি!"

হুকা-কাশি মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, "সরে পড়্‌তে তো আপনাকে বলি নি, শুধু বলেছি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ্ করে তুল্‌ব। সেইজন্যেই সুটের খোঁজ কর্‌ছিলাম; আমার কাছে সমস্ত সাজসরঞ্জামই রয়েছে, মিনিট দশেকের মধ্যেই আপনাকে একটী খাঁটী ট্যাস্-ফিরিঙ্গি বানিয়ে ছাড়্‌ছি। তার পর আজ রাত্রেই আপনি এই হোটেল ছেড়ে—আমার সঙ্গ ত্যাগ করে—বেনারসের ডাকবাংলাতে গিয়ে উঠ্‌বেন। বিপদের গন্ধ পাওয়ামাত্রই আমি সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে এসেছি। এর পর কখন কি কর্‌তে হবে সে হদিস্ ডাকবাংলাতে বসেই আপনি পাবেন—পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত আমিই কর্‌ব। আপনি শুধু কাঁটায় কাঁটায় সেগুলো করে যাবেন, তা হলেই আমার কাজ বারো আনা পরিমাণ এগিয়ে যাবে। আচ্ছা···আমি তবে এবার দরজা আট্‌কে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসি।"

হুকা-কাশির কণ্ঠস্বর শান্ত, অথচ দৃঢ়; বাসু বুঝিলেন প্রতিবাদ করিয়া কোনই ফল হইবে না।

মিনিট পনেরো পরে একটি নিখুঁৎ চীনাবাজারী ফিরিঙ্গি সকলের অলক্ষ্যে হোটেলের ফটক পার হইয়া একখানা ট্যাক্সিতে গিয়া চাপিয়া বসিল। আরও মিনিট পনেরো পরে হুকা-কাশি

টেবিলের সামনে গিয়া বসিলেন, চিঠি লেখার আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলি লইয়া। পর পর দু'খানা চিঠি লেখা হইল, তার মধ্যে "বিশেষ গোপনীয়" মার্কা পড়িল যেখানার উপর সেখানি যাইবে সন্তোষের কাছে—শ্রীপুরে।

চিঠি লেখা শেষ হইলে হুকা-কাশি ঘড়ি খুলিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর নয়, আহারাদি চুকাইয়া রাত্রির মত এইবার বিশ্রামের আয়োজন করা দরকার। একটা হাই তুলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তার পর তিন চার ঘণ্টা পরের কথা, দুপুর রাত; বহু পূর্ব্বেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা নীরব, নিঝুম হইয়া গেছে, যে যার ঘরে অঘোরে ঘুমাইতেছে। হুকা-কাশির পাশের ঘরটা লোকাভাবে প্রায় দুই মাস যাবৎ খালি পড়িয়াছিল, হঠাৎ সেই ঘর এবং হুকা-কাশির ঘরের ভিতরকার দরজায় ধীরে—অতি ধীরে খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল এবং তার পরমুহূর্ত্তেই ছায়ার মত একটা মূর্ত্তি আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া ও ঘর হইতে এ ঘরের দিকে আসিতে লাগিল। দুপুর রাত্রে তো কথাই নাই, দিনের বেলায়ও বোধ হয় সে মূর্ত্তি দেখিয়া যে কোন লোক শিহরিয়া উঠিবে—পা হইতে মাথা অবধি একটা ভাপ্‌সা কালোর আভাসই মাত্র পাওয়া যাইতেছে। চলনে তার অতি সামান্য মাত্রও শব্দ নাই।

পাশাপাশি দু'খানি খাট, একখানা হুকা-কাশির, অপরটা বাসুর। বাসু যে হোটেল ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন, এক ম্যানেজার ছাড়া আর কাহাকেও এ পর্য্যন্ত সে খবর জানান হয় নাই, কাজেই চাকর তাঁর খাটেও মশারি ফেলিয়া দিয়া গেছে। আস্তে আস্তে পা ফেলিতে ফেলিতে মূর্ত্তিটা প্রথমে বাসুর খাটের দিকে আগাইতে লাগিল। খাটে পৌঁছিয়া একবার সে নিজেকে একটু প্রস্তুত করিয়া নিল, তার পরেই সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া ভিতরে হাত দিল। পরক্ষণেই বুঝিল সেখানে কেউ নাই, বিছানা শূন্য। বাসুর খাট ছাড়িয়া সে তখন চলিল হুকা-কাশির বিছানার দিকে। মশারি তুলিয়া এখানেও অল্প একটু হাতড়াইবার পরই সে দস্তুর মত চমকিয়া উঠিল—এ বিছানাটাও যে ওখানার মতই শূন্য। হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হইতেই সে যেন বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—একটা অস্ফুট আওয়াজ করিয়া উঠিল কিনা আজ এতদিন পরে ঠিক স্মরণ হইতেছে না; তবে এটা সত্য যে উন্মত্তের মত দরজা খুলিয়া সে রাস্তার দিকের বারান্দার পানে ছুটিয়া গেল এবং পরের মুহূর্ত্তেই একেবারে মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হইয়া দোতালার বারান্দা হইতে সোজা কঠিন রাস্তার উপর লাফ মারিয়া পড়িল। অথচ কেন যে সে এতটা ভয় পাইল সেই জানে, তাকে ধরিবার অথবা তাড়া দিবার জনপ্রাণীও তখন জাগিয়া ছিল না। কেবল দূরে একজন পাহারাওয়ালা চেঁচাইতেছিল, "জুড়িদার, জুড়িদার হো।"

পর দিন বেলা ন'টার সময় ডাকবাংলাতে বসিয়া মিষ্টার বাসু একখানি লেপাফায় মোড়া

চিঠি পাইলেন; সাইকেলে চড়িয়া একজন অচেনা লোক চিঠিখানি দিয়া গিয়াছে। বাসু কিঞ্চিৎ ব্যস্ত খাম খুলিয়া পড়িলেন,—

"কাল রাত্রেই আপনাকে ডাকবাংলায় স্থানান্তরিত করাটা যে কত বড় সুবিবেচনার কাজ হয়েছিল আজ ভোর হ'তে না হতেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। আপনি শুনে হয়তো অবাক্ হয়ে যাবেন, দুপুর রাত্রে আমাদের শোবার ঘরে কাল বাস্তবিকই অবাঞ্ছনীয় লোকের শুভাগমন হয়েছিল। উদ্দেশ্যটা অনুমান করা বোধ হয় খুব বেশী শক্ত নয়, কেননা ও সময়টাকে বন্ধুত্ব পাতাবার ঠিক উপযোগী সময় বলে কিছুতেই মনে কর্‌তে পারছি না।

"শুধু একটা বিপদের আভাস মাত্র পেয়েছি—এইটুকুই কাল আপনাকে জানিয়েছিলাম, এর বেশী আর কিছু বলা যুক্তিযুক্ত মনে করিনি। হ্যাঁ, সত্যিই স্বীকার কর্‌ছি আমার মনে ভয় ছিল সবগুলি কথা খুলে বল্লে হয়তো আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কিন্তু আজ আর বল্‌তে বাধা নেই, কাল এই কাশীরই রাস্তায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ মিলেছে যাকে দেখ্‌বার পর হতেই অজ্ঞাতবাসে যাবার যুক্তিটা বার বার মনের কোণে উঁকি দিতে লাগ্‌ল। অন্ততঃ 'সুমিত্র নিকেতনে' আর একদিনও নয়। এক রকম জোর করেই আপনাকে ডাকবাংলায় পাঠালাম। দু'খানা চিঠি লেখ্‌বার ছিল, শেষ করে নীচে ম্যানেজারের ঘরে নেমে এলাম, তাকে বুঝিয়ে বল্‌তে যে অন্ততঃ আজকের রাতটার মত তার নিজের ঘরেই আমাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে, কেননা রাত্রিবাসের পক্ষে আমার ঘর আর এক মুহূর্ত্তও নিরাপদ্ নয়। লোকটা একেবারে হাউ হাউ করে উঠ্‌ল—এই বুঝি চেঁচিয়ে পাড়াশুদ্ধ লোক জড় করে! অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করা গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওপরে এসে প্রথমেই টয়লেট্ পাউডারের কৌটোটা খুলে মুঠো মুঠো পাউডার ঘরের সমস্ত মেঝেটাতে ছড়িয়ে দিলাম। হোটেলের সবাই রাত্রির মত যে যার ঘরে কখন শুতে চলে যায় মোটামুটি তার একটা ধারণা ছিল; সেটুকু সময় ঘুমের ভান করে ওপরের নির্দ্দিষ্ট ঘরটাতেই কাটিয়ে, তার পর নিঃশব্দে দোরে চাবি এঁটে চুপিচুপি চলে এলাম ম্যানেজারের রুমে। যার যে প্রশংসাটুকু প্রাপ্য তা থেকে তারে বঞ্চিত করব না—ভদ্রলোক বাস্তবিকই দরজা ভেজিয়ে রেখে আমার জন্য ঘরের ভেতর অপেক্ষা কর্‌ছিলেন।

"তার পর সকালবেলা নিজের ঘরে ফিরে আস্‌তেই চক্ষু স্থির হয়ে গেল: বারান্দার দিকের দরজাটি একেবারেই খোলা, যেটি যাবার আগে আমি ভাল করেই বন্ধ আছে দেখে গেছি। কার করস্পর্শে এটি সম্ভব হয়েছে জান্‌তে বাকী রইল না; দু'টো মশারিরই এক একটা ধার ওপর দিকে তোলা দেখে সে ধারণার অনুকূলে দ্বিতীয় যুক্তিও মিলে গেল।

"মেঝের দিকে চেয়ে দেখি পাউডারগুলো আমার একেবারেই বিফলে যায় নি, সমস্ত

ঘরখানায় কার যেন গোদা গোদা পায়ের দাগ সযত্নে বুকের ওপরে তারা ধরে রেখে দিয়েছে। ...তিশয় নয় যে সে 'নিশাচর'টি তাও বোঝা গেল যখন একটী মাত্র রেখার সন্ধানও সে পায়ের দাগের ভেতর দেখ্‌তে পেলাম না। আমি কি বল্‌তে চাইছি বুঝতে পার্‌ছেন বোধ হয়—হয় রবারের জুতো পরে, আর নয় তো রবারের পট্টি পায়ে জড়িয়ে সে কাজে নেমেছিল, যাতে পায়ের দাগ কোন মতেই কেউ আঁচ্‌তে না পারে—কোন রকম ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই যেতে না হয়।

"কি রকম শক্ত লোকের পাল্লায় আমরা পড়েছি তাই জানাবার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এই ক' ছত্র লেখা। আপনাকে সাবধান করে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য, ভয় দেখানো নয়। 'সুমিত্র নিকেতন' ছেড়ে অন্য একটা আস্তানার সন্ধানে আজই আমায় বার হতে হবে। আস্তানার ব্যবস্থা হ'লেই আপনাকে সংবাদ দেব। হুকা-কাশি"

(২৪)

পার্শি সাহেবের অর্ডার

তিন চারি দিন পরের কথা, সন্ধ্যার পর কাশীর একটা উচ্চশ্রেণীর য্যারিষ্টোক্র্যাটিক্ হোটেলের সম্মুখে হুকা-কাশিকে দেখা গেল। সদর দরজার সাম্‌নে এক নেপালী দুরওয়ান বসিয়া ছিল, হুকা-কাশি তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পার্শি সাব কৌন্ কাম্‌রামে রহ্‌তা ?"

"জি তেরো লম্বারমে, দোতাল্লা'পর"

"আউর কল্‌কাত্তাবালা বংগালী—" হঠাৎ কি ভাবিয়া হুকা-কাশি থামিয়া গেলেন, প্রশ্ন পাল্‌টাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিঁড়ি কিধার, বাংলাও।"

প্রায় আধঘণ্টারও বেশী সময় উপরে কাটাইয়া হুকা-কাশি আবার যখন নীচে নামিয়া আসিলেন তখন পৃথিবীর বুকে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। রাস্তায় নামিয়াই তিনি একখানা ট্যাক্সি ধরিলেন, চালককে হুকুম দিলেন, "ডাকবাংলা।"

মিষ্টার বাসু ইজি-চেয়ারের উপর দেহ এলাইয়া দিয়া একখানা ইংরাজী বই পড়িতেছিলেন, হুকা-কাশিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই সকলরবে অভ্যর্থনা করিয়া উঠিলেন, একটু অনুযোগের সুরে বলিলেন, "বেশ যা হোক্, একখানা স্লিপ্ পাঠিয়ে দিয়েই তিন চার দিন একেবারে ডুব! আমি বেঁচে রইলাম না কি গুণ্ডার হাতেই নিপাত গেলাম সে খবরটুকু পর্য্যন্ত নিলেন না!" হুকা-কাশির চিঠিখানা পাওয়ার পর নেটিভ্ গুণ্ডাদের প্রতি বোধ হয় 'শ্রদ্ধা'টা তাঁর কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে, কেননা ফিরিঙ্গির বেশ ত্যাগ তো তিনি করেনই নাই বরং সেটিকে আরও একটু বাড়াইয়া তোলারই চেষ্টা করিয়াছেন।

হুকা-কাশি একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "বাড়ী বদল, তার ওপর শত্রুপক্ষের চোখ এড়িয়ে অজ্ঞাত-বাস—দুটোতেই এমন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে নিজে এসে বাস্তবিকই দেখা করতে পারি নি, কিন্তু তাই বলে আপনার সংবাদ নিইনি এ কথা বল্লে কিন্তু সত্যিই আমার ওপর অবিচার করা হবে। লোকের মুখে অন্ততঃ রোজ একবারও খবর নিয়েছি বাস্তবিকই আপনি সুস্থ মনে বহাল তবিয়তে রয়েছেন কিনা।"

"নতুন আস্তানা গাড়্‌লেন কোথায় ?"

হুকা-কাশি এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া খাটো গলায় বলিলেন, "আস্তে। একেবারে বাঙ্গালী-টোলার ভেতরে দেবনাথপুরা। ব্যাটারা যত হুঁসিয়ারই হোক্ না কেন এবার আর সহজে আঁচ্‌তে হচ্ছে না। কিন্তু আর এক মুস্কিল বাধিয়েছে এক ব্যাটা পার্শি ব্যবসাদার—ব্যাটার বায়নার যেন আর অন্তই নেই। অথচ আমোল না দিয়েও পারি না, লোকটাকে হাতে রাখা দরকার। এই মাত্র তার সঙ্গে কথা ক'য়ে আপনার এখানে আস্‌ছি। আমায় বলে কিনা, 'আপনি জাপানী, সস্তায় কি করে কিস্তি মার্‌তে হয় আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে—আমায় বিদেশ থেকে অল্প কিছু—লাখ দুত্তিন টাকার—কলকব্জা আনিয়ে দিতে হবে।' যত বল্‌ছি জাপানী মাত্রেই ব্যবসাদার নয়, ব্যবসার কোন ধারই আমি ধারি না, তবু কে কার কথা শোনে! শেষটায় তাই আপনার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বার জন্য চলে এলাম। আপনি তো প্রায় দশ বারো বছর আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছেন, জানাশোনা এমন কোন লোক আছে যার ওপর এ ভারটা দিয়ে দেওয়া যায় ? অবশ্য ন্যায্য কমিশন সে পাবে। তবে খুব বিশ্বাসী লোক হওয়া দরকার, এক রকমের জিনিষ তো নয়, শেষে মাথায় বাড়ি না দিয়ে দেয়! আছে এমন ধারা লোক ? শুধু একটা পরিচয়-পত্র দিয়ে দেওয়া, তার পর ওরা দু'জনে যা হয় বোঝাপড়া করুক গে। বেশী ঝুক্কি আমরা নিতে যাচ্ছি না, যেটুকু না কর্‌লে নয় সেইটুকু—আসল কথা লোকটাকে হাতে রাখা উদ্দেশ্য।"

মিষ্টার বাসু একটু চিন্তা করিয়া শেষে তাঁরই জানাশোনা এক আমেরিকান্ সাহেবের নামে একটা পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। সে লোকটা নাকি নানা বিষয়ের দালালি করে।

চিঠি লিখিয়া মিষ্টার বাসু বলিলেন, "সেদিন সেই যে ফটো দেখাচ্ছিলেন না, তার সঙ্গে কাল বিকেলে একেবারে মুখোমুখি দেখা।"

হুকা-কাশি উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলেন কি ? আপনাকে চিন্‌তে পেরেছিল ?"

"উঁহুঁ, কিন্তু সে শুধু আপনারই এই ফিরিঙ্গি পোষাকের দৌলতে।"

"আচ্ছা, তবে আরও একটু খবর দিয়ে রাখি; মনে রাখ্‌বেন সে লোকটার নাম রামদয়াল।"

(ক্রমশঃ)

পূজা-সংখ্যা রামধনু

কার্ত্তিকের (পূজা-সংখ্যা) রামধনু আগামী ২৬শে আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। বরাবরকার মত এবারও এই সংখ্যা আকারে অনেক বড় হইবে, এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখা প্রচুর গল্প ও প্রচুর ছবি লইয়া হাজির হইবে। গ্রাহকেরা কেহ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইলে অনুগ্রহ আশ্বিনের ভিতর আমাদের জানাইবেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। যখন রান্না চড়াই। ২। 'নাতিদীর্ঘ' ব'লে। ৩। যখন বৃষ্টি পড়ে। ৪। জবা। ৫। যখন নামান হয়। ৬। হাতী—গজ। ৭। যখন ফোটে। ৮। কপি। ৯। থলিশা। ১০। যখন বয়ে যায়।

উত্তরদাতাদের নাম

(কোন কোন গ্রাহক অনুযোগ করেছেন, গত বারের ধাঁধা নাকি একটু কঠিন হয়েছে। তাই তাঁদের অনুরোধে যাঁদের উত্তরে সামান্য ভুল ছিল এবারকার মত তাঁদের নামও দেওয়া হ'ল)

নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন—

প্রফুল্ল, রামপ্রসাদ সিং, পাঁচুগোপাল প্রভৃতি (বেহালা) ; সিদা, বাবা মা, মেজমামা (লক্ষ্ণৌ) ; পবিত্র, দীপ্তি, অজিত (শিলিগুড়ি) ; সুমথনাথ ও রাণী মিত্র, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (দিনাজপুর)।

যাঁদের সামান্য ভুল হয়েছে—

দিলীপকুমার, ধীরাজকুমার ও বাণী ব্যানার্জ্জি (জলপাইগুড়ি) ; লীলন, দেবু, তুখু (জলপাইগুড়ি) ; পাঁচুগোপাল ঘোষ ও পুষ্পলতা ঘোষ (শ্যামনগর) ; প্রমোদ, প্রবীর, নীহার কাকিমা (জামসেদপুর) ; দীনেন মুখার্জ্জি (নলহাটী) ; ভূতনাথ, রমাপদ, গৌরীপ্রসাদ সরকার (চাইবাসা) ; রত্না দেবী (পাটনা) ; রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর) ; নলিনীরঞ্জন মুখার্জ্জি (নাহোর) ; রমেন্দ্র ও রণেন্দ্র (ধুবড়ী) ; মৃণালকান্তি গুহ (বৈটপুর) ; প্রহ্লাদ, অবনী, কৃষ্ণ (পঞ্চকোটরাজ) ; শিবানী, কল্যাণী, জয়ন্তী সরকার (ধুবড়ী) ; হরিহর, গৌরী, পুষ্প মজুমদার (ধুবড়ী) ; অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল, খোকন (কলিকাতা) ; প্রসূন রায় (নালান্দা) ; নিখিল চৌধুরী (রাজসাহী) ; প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর) ; বিজনবিহারী হার (ফরিদপুর)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী)

হেঁয়ালি

১। কোন্ জন্তু বন্দুকে থাকে ?

২। কোন্ ফলের পেট কাটলে অন্য ফল হয় ?

৩। গান করার সময় কোন্ ফলের দরকার হয় ?

৪। কোন্ দেশ ফর্সা নয় ?

৫। কোন্ কোন্ নদী ফর্সা নয় ?

৬। কোন্ সহরের মাথা কেটে উল্টে দিলে আর একটি সহর হয় ?

৭। কোন্ জায়গার নাম সকলেই জিজ্ঞাসা করে ?

৮। কোন্ জায়গা কম্‌ছে না ?

৯। কোন্ জন্তুকে পশম নিতে বলা হচ্ছে ?

১০। কোন্ জন্তু বলে, সে গান করে ?

১১। কোন্ পাখীর আর দেশের এক নাম ?

১২। কোন্ দ্বীপ শস্য ?

১৩। কোন্ জন্তু ধর্ম্মযাজক ?

"প্রভু, দাঁড়াও তোমায় দেখি !
দুই নয়নে কুলায় না যে তোমার রূপের আলো,
লক্ষকোটি নয়ন হ'লে হ'ত যে মোর ভালো !"

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমো

৯ম বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৪৩ { ১০ম সংখ্যা

আগমনী

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

সত্য যে মা আসে,
নইলে কি হায় দীঘির জলে
এত কমল ভাসে !
ধরবে বলে রাঙা চরণ
জবা ফোটে লোহিত বরণ,
লতার গৃহ আলো করে
অপরাজিতা হাসে।

"প্রভু, দাঁড়াও তোমায় দেখি !
দুই নয়নে কুলায় না যে তোমার রূপের আলো,
লক্ষকোটি নয়ন হ'লে হ'ত যে মোর ভালো !"

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে — শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমো

৯ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৩ | ১০ম সংখ্যা

আগমনী

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

সত্য যে মা আসে,
নইলে কি হায় দীঘির জলে
এত কমল ভাসে !
ধরবে বলে রাঙা চরণ
জবা ফোটে লোহিত বরণ,
লতার গৃহ আলো করে
অপরাজিতা হাসে।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

নইলে কভু আকাশ ও জল
হয় কিরে ভাই এমন বিমল,
এত শিশির ঝরে কি হায়
চলা-পথের ঘাসে ?
চাঁদ হেসে দেয় সুধার ছিটে,
বংশী যে হয় অধিক মিঠে,
সন্ধ্যা যে হয় সুরভিত
শিউলি ফুলের বাসে।
যুগের যুগের ভক্ত আসি
পঞ্চপ্রদীপ দেয় উদ্ভাসি'
লক্ষ্মী-সরস্বতী বেড়ান
মায়ের পাশে পাশে।

আস্ত গাধা

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

ধুত্তোর—পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোন সুখ নেই। মানুষগুলো নামেই মানুষ—বুদ্ধিসুদ্ধি তাদের এক ফোঁটাও নেই। আরে, আমাদের মংলি তো একটা আস্ত গাধা, তার কথা আর কী বলবো ? কিন্তু সুপতি তালুকদার নিজেই যে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটা কাণ্ড করবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। বাস্তবিক, এই মানুষ জাতটাই অদ্ভুত !

সুপতি তালুকদার কে তা আবার ব'লে দিতে হবে নাকি ? আর কেউ নয়, সাক্ষাৎ অল্ বেঙ্গল স্পোর্টিং-এর সেণ্টার-ফরওয়ার্ড। লোকের মুখে তো এ বছর মেট্রো আর তালুকদার ছাড়া কথাই নেই। হবে না—তৈরি খেলোয়াড় !

আমি এ বছর থর্ড কেলাসে উঠেছি। গেল বছর প্রথম সশরীরে ফুটবলের মাঠে গেলুম, তাও ছেঁচড়ে-হেঁচড়ে—বাস্ রে, ঢুক্‌তেই প্রাণান্ত ! জামা-কাপড় ছিঁড়ে, বৃষ্টিতে টাপুটাপু ভিজে যেই বাড়িতে পা দিয়েছি, পড়বি তো পড় একেবারে বাবার খপ্পরে। বকুনি খেলুম, মনে বড় কষ্ট হ'ল। হায়রে, ছেলেমানুষ ব'লেই তো এই অত্যাচার ! ওঁরা সব্বাই তো ফূর্ত্তিসে খেলা দেখেন—জলেও ভেজেন, জামাও ছেঁড়েন, গলা ভেঙে জ্বরেও প'ড়ে থাকেন মাঝে মাঝে—তা ওঁদের তো আর বকবার কেউ নেই। তবু কি ভেবেছ আমি ভড়কে গেলুম ! খবরের কাগজে খেলার খবর প'ড়ে আর ওঁদের মুখে শুনে শুনে কত আর হৈ-হৈ করা যায় বল ! লুকিয়ে লুকিয়ে আর একদিন গিয়েছিলুম, সেদিন ছিল সেমি-ফাইনেল। সেদিন দেখলুম তালুকদারের খেলা—ওঃ, খেলা বটে !

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু

তার পর এই এক বছরে আমি এক লাফে হঠাৎ অনেকখানি লম্বা হ'য়ে গেছি। লোকে হঠাৎ দেখে দাদা ব'লে ভুল করে। আরে কেষ্টা, তুই এত বড় হ'য়ে গেলি কবে রে ? হেঁ-হেঁ, বুঝি চিরকাল ছোটই থাকব ! এখন আর আমার কোন ভাবনা নেই, এ বছর আমি প্রায়ই তো খেলা দেখতে যাই। লুকোছাপা করি না, বুক ফুলিয়ে সোজাসুজি যাই, টিকিট কিনে মারামারি হৈ-হৈ ক'রে গ্যালারির জায়গা দখল করি। ভেবেছ কী—এখন বড় হয়েছি না !

মংলিটার ক্যারদানি কম নয়, ও-ও আসে খেলা দেখতে। ও আমার সঙ্গে একই কেলাসে পড়ে বটে, কিন্তু দেখতে ও এই একরত্তি, মনে হয় ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। ঐটুকু মানুষ তুই, তোর আবার খেলা দেখতে আসা কেন রে বাপু !

চুপচাপ বাড়ি ব'সে থাকবি, ওহেলে-ত্বলে লতা শব্দের রূপ মুখস্থ করবি, বড় জোর খবরের কাগজে খেলার রিপোর্ট প'ড়ে হাত-পা ছুঁড়বি। তোর মত বাচ্চাদের জন্যই তো খবরের কাগজে সব কথা লেখে!

তা অত স্থবুদ্ধি কি আর মংলির! রোজ ও যাবে খেলা দেখতে। কী ক'রে ঢোকে, কী ক'রে বেরোয়, কী ক'রেই বা প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরে কালী-মাই জানেন। আমি হয়তো অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে ভিতরে ঢুকে সবে গ্যাঁট হ'য়ে বসেছি, পাশে থেকে একটা আওয়াজ এলো : 'এই যে কেষ্ট।'

তাকিয়ে দেখি আর কেউ নয়, মংলি। আমার মাথার উপরে ব'সে ফ্যা-ফ্যা ক'রে ইষ্টুপিটের মত হাসছে।

'তুই কখন্ এলি?'

'এই তো এইমাত্র।'

বাবু যেন আদ্দির জামা চড়িয়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন এমনি ওর মুখের চেহারা। রাগে শরীরটা জ্বলে যায়। মুখের ঘাম মুছে সোজা মুখ ফিরিয়ে থাকি তা ঐ হাবাটাই গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে আসে।

মংলিটা একটা জংলি। এতদিন তো জলপাইগুড়ির সহরে কেটেছে, এই তো সেদিন কলকেতায় এসে আমাদের ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'ল। পাড়াগেঁয়ে ভূত, নাকে দড়ি বেঁধে সাত পাক ঘুরিয়ে আনতে পারি—ওর আবার অত কায়দা কিসের?

সেদিন হয়েছে কী, খেলা আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা তখনো দেরি, মংলি আর আমি পাশাপাশি ব'সে মুড়মুড় ক'রে চীনেবাদাম ভেঙে ভেঙে খাচ্ছি। সেদিন অল্-বেঙ্গলের খেলা, উল্টোদিকে জাঁদরেল গোরা পল্টন টীম।

আমি বললুম, 'বল্ তো কোন্ দল জিৎবে?'

মংলি বল্লে, 'কী জানি ভাই, কেমন ক'রে বল্ব?'

'আমি বল্তে পারি, অল্-বেঙ্গল জিৎবে। তালুকদারের দৌড়খানা দেখেছিস তো? ওর জন্যেই জিৎবে।' তার পর ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্লুম : 'অমন খেলোয়াড় আছে তোদের জলপাইগুড়িতে!'

মংলি কাঁচুমাচু মুখে বল্লে : 'না ভাই, নেই।' আহা—কথার কী ছিরি, ধ'রে মারতে ইচ্ছে করে। সত্যি-সত্যি যেন জিজ্ঞেস করেছি জলপাইগুড়িতে ও রকম খেলোয়াড় আছে কি নেই।

আমি বল্লুম : 'কী শুট্! বাপ্স্! কেমন ম্যাজিকের মত পাস্ করে! দেখেছিস কখনো ও রকম?'

'এই তো দেখছি ভাই।'

তার পর আমি বললুম : 'জানিস, স্থপতি তালুকদার আমার দাদার বন্ধু।'

মংলি তৎক্ষণাৎ বল্লে : 'তাই নাকি?' মস্ত গোল-গোল হ'য়ে উঠলো ওর চোখ দুটো।

'প্রায়ই তো আসেন আমাদের বাড়িতে।'

আহা—অমন দু' একটা কথা বুঝি লোকে আর মাঝে মাঝে বলে না! তুমিও বল, আমিও বলি, সকলেই বলে। তার জন্যে কি আর জিভ খ'সে পড়ে, না ম'রে যাবার পর টগ্বগে তেলে ভাজে। কচু হয়।

মংলি খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লে : 'সত্যি তোকে হিংসে হচ্ছে ভাই।'

হবে না! হিংসে না হ'য়ে উপায় আছে! তার পর সেদিনকার খেলায় অল্-বেঙ্গল তো দু' গোলে জিতলো। আমি বললুম : 'দেখলি তো? স্থপতি বাবু আগেই বলেছিলেন।'

'খেলায় কী হবে আগে থেকে কি কেউ বল্তে পারে?'

'পারে না! যাকে নিয়ে সমস্ত খেলা সে পারে না! স্থপতি তালুকদার পারে না!'

মংলি ঘাবড়ে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

মংলিটা একটা আস্ত গাধা, ওর কাছে যা খুসি তাই বল্লেই হ'ল। সেদিন তো ও-সমস্ত কথা হ'ল, কয়েকদিন পর ইস্কুলের টিফিনে আমিই ওকে পাকড়াও ক'রে বল্লুম : 'আজ তো মস্ত খেলা—যাবি নে?'

'হ্যাঁ, যাবো।'

'ওঃ, এবার বুঝি অল্-বেঙ্গলই লীগ নিয়ে নেয়! তা হ'লে কী কাণ্ড হয় বল্ তো!'

'হ্যাঁ, ভালোই তো।'

দেখতে পারি নে এই হাবাকান্তদের—সাত চড় মারলে মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোয় না। একটু পরে বললুম: 'সুপতি তালুকদার কাল আমাদের বাড়িতে চা খেতে এসেছিলেন।'

বলো দেখি, অমন সুযোগ পেলে তোমরাই কি ও রকম কথা না বলতে? কে না ব'লতো? ব'লতো না শুধু মংলিদের মত ঐ আস্ত গাধারা।

শুনে মাছের মত মুখ ক'রে মংলি বল্লে: 'য়্যাঁ!'

'ওঃ! কত গল্প করলেন! ফুটবলের মারপ্যাঁচ এবারে সব বুঝে নিয়েছি। বুলবো তোকে আর এক সময়।'

ব'লে আমি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চ'লে গেলুম। মংলির মুখ দেখে মনে হ'ল ওর য়্যাঁ বুঝি শীগ্গিরই ভ্যাঁ হ'য়ে যাবে।

এর পর প্রায়ই মংলির কাছে আমি সুপতি তালুকদারের গল্প করতে থাকলুম। গল্প করতে গ্র্যাণ্ড লাগে। একদিন বললুম; 'বুঝলি, আমার সঙ্গে ওঁর রীতিমত ভাব হ'য়ে গেছে, কাল আমাকে মেট্রোতে নিয়ে গেছ্লেন।' তার পর থেকে আমার মুখে উনি সুপতি-দা হ'য়ে গেলেন। 'খেলার সীজন্টা শেষ হ'লেই সুপতি-দা দারজিলিঙ্ চ'লে যাবেন।' 'সন্দেশ আর কলা খেতে সুপতি-দা সব চেয়ে ভালোবাসেন।' 'সুপতি-দার তিনধার পা ভেঙেছে—এখন এমন হয়েছে যে ভাঙলেও কিছু হবে না।' 'সুপতি-দা সামনের বছর বিলেত যাচ্ছেন ব্যারিস্টরি পড়তে।' এমনি কত কথাই যে বলতুম তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে, না কি আমারই মনে আছে! একদিন সুপতি-দার বাড়িতে নেমন্তন্নও খেয়ে এলুম; চুপি-চুপি তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ধমক খেলুম অঙ্কের হরগোবিন্দ বাবুর কাছে।

মংলিটা ক্যাবলাকান্ত, সব চুপ ক'রে শোনে—শুনতে-শুনতে হাঁ-টা মস্ত হ'য়ে ওঠে। শেষটায় একদিন আর থাকতে না পেরে বল্লে: 'দিবি ভাই, আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে?'

আমি তুচ্ছে তুড়ি দিয়ে বললুম: 'ওঃ, তা দেবো'খন। শোন্, আমি এবার থেকে ফুটবল খেলা ধরবো।'

মংলি বল্লে: 'তা বেশ তো। ইস্কুলের টীমে—'

'ছোঃ! ইস্কুলের টীমে খেল্বো কী রে পাগ্লা! সুপতি-দা আমাকে প্রাইভেট লেসন্স দিচ্ছেন—বলেছেন একবারেই আমি এ-ডিভিসনের কোন টীমে নামতে পারবো!'

মংলিটা আবার বল্লে; 'তোর সুপতি-দা আবার তোদের বাড়িতে এলে একটু খবর দিস্ ভাই। একটা অটোগ্রাফের সই নিয়ে আসবো।'

ভালো লাগে না এই ঘ্যান্ঘ্যানানি। চেঁচিয়ে ডাকলুম: 'এই প্রসন্ন, শোন তোমার সঙ্গে কথা আছে।' বলতে বলতে চ'লে গেলুম প্রসন্নর দিকে।

তার পর এক শনিবার মংলি বল্লে: 'কাল ভাই আমাদের বাড়িতে তোর নেমন্তন্ন।'

আমি খুব ফূর্ত্তি ক'রে বললুম: 'হঠাৎ কেন রে? ব্যাপার কী?'

'দিদি ব'লে দিয়েছেন।'

'তোর আবার দিদি আছে নাকি একজন?'

'দিদি এত দিন গিরিডিতে ছিলেন কিনা, এই তো সেদিন মোটে ফিরলেন। তিনি আমার বন্ধুদের খাওয়াবেন কাল। প্রসন্ন, রমেশ আর অবিনাশকেও বলেছি।'

তা বেশ কথা। খাওয়া যাবে সকলে মিলে হৈ-হৈ ক'রে। মংলিটা তো একটা মিনমিনে ভূত—খালি ওর সঙ্গে কি কোন ফূর্ত্তি জমে!

পরদিন তো বেলা এগারোটা নাগাদ চান-টান ক'রে মিহি ধুতি পরেছি আর সিল্কের পাঞ্জাবি আর চক্চকে কালো পম্প-শু—সাজখানা জমকালোই বলতে হবে। তা ছাড়া বৌদির হেজলিন স্নো আর পাউডার মেখে—বলতে লজ্জা করে, কিন্তু সত্যি বলছি, আমাকে ভালোই দেখাচ্ছিলো খুব। গিয়ে দেখি, মংলি নীচের তলার ঘরে একলা ব'সে আছে। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'চল্ ভাই উপরে, ওরা সব এসে গেছে।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই খুব হো-হো হাসির শব্দ শোনা গেল। বাঃ, আমাকে ফেলেই ওরা তো জমিয়েছে বেশ! নিশ্চয়ই ঐ জবড়জং রমেশটা। ওর ফোঁপর-দালালি আমি মোটেই সইতে পারি নে।

মংলি বল্‌লে, 'এই যে, এই ঘরে।'

মুখ-চোখের খুব একটা স্মার্ট ভাব ক'রে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। কিন্তু ঢুকেই আমার মনে হ'ল চোখের সামনে ভাল ক'রে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, ঘরের মেঝেটা যেন একটু একটু টলছে।

মংলির গলার আওয়াজ শুনলুম: 'এই তো দিদি, আর এই আমার জামাই বাবু। জামাই বাবু, কেষ্ট আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে খুন।'

সুপতি তালুকদার বল্‌লেন—'খুব বুঝি খেলা ছাখো? বেশ, বেশ।'

ওঃ, খাওয়ার কত যে ভালো ভালো জিনিস ছিল সে কী বলবো! চোখেই দেখলুম, খেতে যেন ভুলেই গেছি। ধুত্তোর, খাওয়া না ছাই। মংলিটা একটা আস্ত গাধা সে তো সকলেই জানে, কিন্তু শেষটায় সুপতি তালুকদারও—তাঁর কী দরকার ছিল একেবারে ঐ মংলিটারই জামাই বাবু হবার? বলো তো? নাঃ, পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোন সুখ নেই। ইচ্ছে মত দুটো কথাও বলা যায় না!

বুনো হাতীর কবলে

(শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

হাতীর পিঠে তোমরা অনেকেই হয়তো চড়িয়াছ; যারা চড় নাই, তাদেরও মনে কিছু মাত্র ক্ষোভ রাখার কারণ নাই, কেননা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় মাত্র দু' আনা পয়সা দিলেই মাহুত তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া দিবে। তখন কী মজা! অত বড় জন্তু, অমন বিশাল বপু, অথচ কি ঠাণ্ডা, কি ধীর, কত বাধ্য, কত শিষ্ট!

কিন্তু তোমরা দেখিয়াছ শুধু পোষা হাতীই, কাজেই বুনো হাতীর বিপুল পরাক্রম আর দুর্ব্বার আক্রোশের কথা ধারণাও করিতে পার না। ঘোর দুর্গম মহারণ্যের মধ্যে দল বাঁধিয়া

এই সচল পাহাড়গুলি যখন চরিয়া বেড়ায় তখন মনে হয় এরাই বুঝি সত্যিকারের বনের রাজা—কোথায় লাগে বাঘ-সিংহের মত ক্ষুদ্রতনু সব জানোয়ার!

কিন্তু মানুষের মনের ক্ষুধা অসীম, বুকের সাহস অপরিমিত, তাই এই সব মৃত্যু-সমান ভয়ঙ্কর হাতীর পালের সাম্‌নে অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া তাদের শিকার করিতেও সে পিছ-পা হয় না। এ যে কি ভয়াবহ অবস্থা তা তোমরা সহজেই বুঝিতেছ—পদে পদে মৃত্যুর সম্ভাবনা। তবুও বুনো হাতী শিকারে মানুষের বিরাম নাই।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস

এমনই এক বিপদ্‌সঙ্কুল হাতী শিকারের কাহিনী আজ তোমাদের শুনাইব। পটার্স্‌ নামে এক অসম-সাহসী শিকারী আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশে বড় বড় জীবজন্তু শিকারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। জায়গাটাতে যেমন নিবিড় জঙ্গল, তেম্‌নি দুস্তর সব পাহাড়ের সারি; এই সব বনের মধ্যে, পাহাড়ের আশ-পাশে দলে দলে বুনো হাতী ঘুরিয়া বেড়ায় আর সুবিধা পাইলে গ্রামের কাছাকাছি ক্ষেত-খামারে ঢুকিয়া ফসলের সর্ব্বনাশ করিয়া যাইতেও কসুর করে না।

কিছু দিন হইতে এমনই এক বুনো হাতীর দল রাত্রির অন্ধকারে নিকটের এক গ্রামে আসিয়া শস্যের বিশেষ ক্ষতি ঘটাইতেছিল। কথাটা কানে আসিতেই পটার্স্‌ স্থির করিলেন হাতী শিকারে যাইবেন। তার পর একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে জনা কুড়ি কাফ্রি লইয়া তিনি গ্রামের অদূরবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

সে এক ভীষণ বন। চারিদিকে বড় বড় আকাশস্পর্শী সব গাছ; গাছের উপরে এক ডাল হইতে আর এক ডালে নিবিড় লতাকুঞ্জ ছাইয়া আছে। সে সব পাতা ও লতার আড়ালে 'রাক্ষুসে' মাকড়ষা জাল পাতিয়া বসিয়া আছে—পাখী শিকারের জন্য। নীচে কোথাও জলাভূমি, কোথাও বা নিবিড় উলুবন ও নলখাগড়ার জঙ্গল। সে সবের ভিতর দিয়া পথ করিয়া লওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার!

যাই হোক, পটার্স্ সাহেব কোন মতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে আগাইতে লাগিলেন। ঘোড়াটি তাঁর যেন জাত-আরবী, যেম্‌নি বুদ্ধি, তেম্‌নি দ্রুতগতি। গত কয়েক বছর ধরিয়াই পটার্সের সঙ্গে সে শিকারে বাহির হইতেছে, ফলে অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছে বেশ। ঘোড়াটি সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়, নাম জন্।

ঘণ্টা-দু'য়েক পথ চলার পর তাঁরা কিছু দূরে দুইটি প্রকাণ্ড গজরাজের সাক্ষাৎ পাইলেন। দু'টারই প্রকাণ্ড দুই জোড়া গজ-দন্ত। পটার্স্ তাঁদের দেখিতে পাইলেও তারা কিন্তু সাহেবকে অথবা তাঁর দলের লোকদের দেখিতে পায় নাই; নির্ভয় মনে তাই গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তারা গায়ে বুলাইতেছিল।

আফ্রিকার বিশালকায় হাতী—এদের এক-একটি কান এত বড় যে একজন মানুষকে কান দিয়াই ঢাকিয়া ফেলা যায়।

সাহেব তাড়াতাড়ি ঘোড়া হইতে নামিয়া অতি সন্তর্পণে উলুবনের ভিতর দিয়া বন্দুক হাতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খানিকটা আগাইয়া তিনি লক্ষ্য ঠিক করিবার পর গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম করিতেছেন, হঠাৎ একটা হাতী ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাফ্রিদের মাথার পালকের টুপিগুলি তার চোখে পড়িল। শুধু এক নিমেষের ব্যাপার—পটার্সের গুলিও ছুটিল আর সেই সঙ্গে হাতী দুইটাও এক চীৎকার দিয়া ঠিক খরগোসের মতই দে ছুট্।

কিন্তু পটার্স্ও দমিবার পাত্র নন, চক্ষের নিমেষে জনের পিঠের উপর লাফাইয়া উঠিয়াই তিনি পলাতক হাতী দুইটির অনুসরণ করিলেন। প্রায় পাঁচ শ' গজ তিনি আগাইয়াছেন ঠিক এম্‌নি সময়ে এক দৈব-দুর্ঘটনায় তাঁকে অনেকটা পিছাইয়া পড়িতে হইল। সেই নিবিড় ঘাসের মধ্যে ছিল একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত, জনের পা তার উপর পড়িতেই ঘোড়া এবং সওয়ার দু'জনাই মাটীর উপর পড়িয়া গড়াগড়ি! শুধু তাই নয়, পটার্সের একখানি পা আবার ঘোড়ার নীচে এম্‌নি ভাবে আটকাইয়া গেল যে সে পা টানিয়া বাহির করিতেই বেশ কিছু সময় লাগিল। তবে সৌভাগ্যের

বিষয়, কারোও তেমন আঘাত লাগে নাই। কালবিলম্ব না করিয়া আবার পটার্স্ ঘোড়ার উপর উঠিয়া বসিলেন; সঙ্গের অনুচরেরা তখন অনেকখানি পিছাইয়া পড়িয়াছে, তবুও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় গভীর বনের ভিতর আহত বুনো হাতীর পিছু লইতে তিনি এতটুকুও ভীত হইলেন না।

প্রায় মিনিট পনেরো ছুটিবার পর পটার্স্ গুলি ছুঁড়িবার সুযোগ পাইলেন। হাতী দুইটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থূলতরটির বয়স কিছু বেশী হইয়াছিল, কাজেই সে ছিল পিছনে পড়িয়া। সেটীকে লক্ষ্য করিয়াই সাহেব গুলি ছুঁড়িলেন—জনহীন অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গুলি গিয়া বিঁধিল তার কাঁধে। গুলি খাইয়াও তার গতিবেগ কিন্তু এতটুকু কমিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার পটার্সের দ্বিতীয় গুলি ছুটিল; এবার তার চোখের তলায় গুলি লাগিয়াছে। বেগের প্রাবল্য না কমিলেও এবারে সে যে বিলক্ষণ চটিয়াছে অন্ততঃ এটুকু বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

ভীষণ চীৎকার করিয়া হাতী ছুটিতেছে, পিছন পিছন শিকারীও ছুটিয়াছেন। পটার্সের বন্দুকে তখন আর গুলি নাই। বন্দুকে গুলি পূরিতে গেলে না থামিলে চলে না, অথচ ঘোড়াকে একটু দাঁড় করাইলেই হাতী গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এতখানি আসিবার পর হাতীকে ছাড়িয়া যাইতে পটার্সের মন উঠিতেছিল না, তাই শূন্য বন্দুক হাতেই সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর পিছনে তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

পটার্স্ দেখিলেন, যদি তিনি খানিকটা শিকারের পিছন পিছন ছুটিতে পারেন তবে সেই অবসরেই তাঁর পক্ষে বন্দুকে গুলি ভরিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। ঘোড়া না থামাইয়া, অথচ হাতীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া তিনি বন্দুকে গুলি পূরিবার উপক্রম করিতেছেন, হঠাৎ আহত হাতী ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং তার পরেই দুরন্ত বেগে সাহেবকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

পটার্সের তখন সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা; একবার ভাবিলেন ছুটিয়া পালান, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা না করিয়া সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে তিনি উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। আহা, এ সময়ে যদি একটা গুলি ভরা বন্দুক তাঁর হাতে থাকিত!

মাত্র কয়েক শ' গজের ব্যবধান, তার পরেই ক্রুদ্ধ হাতী একেবারে তাঁর উপর আসিয়া পড়িবে! কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, তাঁর আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকারে কয়েক জন কাফ্রি আগাইয়া আসিয়াছিল, তাদেরই মধ্যে একজন ঠিক সঙ্গীন মুহূর্ত্তটিতে পটার্সের হাতে একটা গুলিভরা বন্দুক গুঁজিয়া দিল। তখন আর এদিক্-ওদিক্ ভাবিবার সময় নাই, ধাবমান হাতীর কপাল লক্ষ্য করিয়া অকম্পিত হস্তে, অব্যর্থ সন্ধানে তিনি গুলি ছুঁড়িয়া পরমুহূর্ত্তেই এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সশব্দ ঝড়ের মত হাতী তাঁর পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল এবং চোখের পলক পড়িতে না পড়িতেই আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পটার্স্‌কে দ্বিতীয় বার আক্রমণের উপক্রম করিল। সে দৃশ্য যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই করুণ! তৃতীয় গুলি তার মাথার খুলি ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে, দর দর

ধারায় রক্ত বাহিয়া পড়িতেছে, আর মুখ হইতে বাহির হইতেছে এক বিকৃত বীভৎস শব্দ। সে শব্দ যেমন অসহ্য বেদনা-সূচক, তেমনি দুঃসহ ক্রোধব্যঞ্জক।

পটার্স্ দেখিলেন, হাতী যেমন রাগিয়াছে ও যেরূপ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে তা'তে দাঁড়াইয়া আবার গুলি করার চেষ্টা করিতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতীও সমানে পিছন পিছন ছুটিয়া চলিল। তিন-তিনটি গুলি খাইয়া ইতিমধ্যেই সে যদি বেশ কিছু কাবু না হইয়া পড়িত তবে ও-অবস্থায় পটার্স্‌কে আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইত না; কেননা স্থানটি বনের ভিতর, চারিদিকে নিবিড় লতাপাতা, মাটীতে অসংখ্য গর্ত্ত, তার উপর অতক্ষণ ছুটাছুটি করায় জন্ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

হাতী যত অগ্রসর হয়, পটার্স্‌ও ততই ছোটেন। ঘোড়ার দম প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, তবুও পটার্স্ পিছন-পানে না তাকাইয়া ক্রমাগত তাকে ছুটাইতেছেন। পিছন হইতে অনবরত শোনা যাইতেছে হাতীর পায়ের গুরুভার ধপ্ ধপ্ শব্দ ও তার ক্রুদ্ধ গর্জ্জনধ্বনি।

হাতীর পায়ের দাগ—শিকারীরা এই দাগ দেখিয়া হাতীর অনুসরণ করে।

কিছুক্ষণ পরে ধপ্ ধপ্ শব্দ বন্ধ হইয়াছে মনে হইতেই পটার্স্ পিছন পানে ফিরিয়া তাকাইলেন, দেখিলেন, হাতীটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া টলিতেছে! তিনি বুঝিলেন, এতক্ষণ পরে তিনটি গুলির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সেই জায়গাটাতে জঙ্গল কিছু কম ছিল, চারিদিক্ একরকম ফাঁকা। কেবল কিছু দূরে আর একটা জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। পটার্স্ তখন সাহস করিয়া হাতীর দিকে একটু আগাইলেন, তার পর কপাল লক্ষ্য করিয়া চতুর্থ গুলি ছুঁড়িলেন। খুলি ফাটাইয়া গুলি একেবারে হাতীর মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকিয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে হাতীও সেইখানে পা দুম্ড়াইয়া বসিয়া পড়িল।

কিন্তু একটা বিপদ্ না কাটিতেই আর এক নূতন বিপদ্ উপস্থিত। সেই মুহূর্ত্তেই চারি-

দিকের বনান্তরাল হইতে প্রায় বার তেরটা বুনো হাতী এক সঙ্গে পটার্সের দিকে ধাইয়া আসিল। মনে হইল যেন বার তেরটা কালো পাহাড় বনের ভিতর হইতে গড়াইয়া আসিতেছে। পটার্স্ বুঝিলেন, এই মুহূর্ত্তেই কোন একটা কৌশলের উদ্ভাবন না করিতে পারিলে আর কিছু না হোক শুধু এগুলির গায়ের ঘষাতেই তিনি ছাতু হইয়া যাইবেন। তাই তিনি 'মরিয়া' হইয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে হাতীগুলির পানে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। কি অদ্ভুত, মূর্খ জীব—পটার্সের সেই অভিনব মূর্ত্তি দেখিয়াই লেজ নাড়িতে নাড়িতে তারা একেবারে বনের ভিতর অদৃশ্য!

পটার্সের মাথায় আবার এক দুর্ব্বুদ্ধি জাগিল; পলায়মান হাতীগুলির মধ্যে একটির ছিল অতি সুন্দর দাঁত, সেইটিকে শিকার করার লোভে তিনি সেই দলের পিছন পিছন আবার বনের মধ্যে ঢুকিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর তিনি লক্ষ্য করিলেন, আর সমস্ত হাতীই এদিক্-ওদিক্ পালাইয়াছে, কেবল তাঁরই সেই মনোনীত হাতীটির পিছন পিছন তিনি ছুটিতেছেন। এই উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া যেমন তিনি বন্দুক বাগাইয়া গুলি করিবেন, অমনি হাতীটা যেন তাঁর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াই একেবারে রুখিয়া দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিপুলবিক্রমে আক্রমণ! তখন আর গুলি ছুঁড়িবার সময় নাই—পটার্সের মাত্র হাত পাঁচেক দূরেই সেই বুনো হাতী। চক্ষুর নিমেষে পটার্স্ তখন হাতীর পথ হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রবল ঝড়ের মত হাতীটা তাঁর পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল। হাতীর পিছনে পড়িতেই তিনি তখন গুলি ছুঁড়িলেন; গুলি গিয়া বিঁধিল তার বিশাল মাংসল পাছায়। হাতীর আর তাতে কি হইবে, আমাদের শরীরে ইন্‌জেক্‌সন্ করিলে যেটুকু যন্ত্রণা হয় তার বেশী বোধ হয় আর কিছুই না। গাছ-পালা ভাঙ্গিয়া হাতী গিয়া তখন বনের মধ্যে কোথায় যে লুকাইল, তার আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

তার পিছনে আর সময় নষ্ট করা বৃথা মনে করিয়া পটার্স্ ফিরিয়া আসিলেন যেখানে প্রথম হাতীটিকে তিনি গুলি করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। এতক্ষণে নিশ্চয় সেটা মরিয়াছে। তিনি একেবারে হাতীটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু বলিহারি হাতীর প্রাণ! সে তখনও মরে নাই, পটার্স্ কাছে আসিতেই সে ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সাহেবের উপর প্রতিশোধ লইতে। মাথার ভিতরকার থল্‌থলে মস্তিষ্ক ও চর্ব্বি বাহির হইয়া তখন শুঁড়ের উপর জমিতে আরম্ভ করিয়াছে; সেই শাদা চর্ব্বি ও রাঙা রক্তে তার চোখমুখ ভাসিয়া যাইতেছে।

মৃতপ্রায় হাতীটা যে অমন অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বসিবে অত বড় শিকারী পটার্স্‌ও তা ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না; হাতীটা তার রক্তাক্ত চূর্ণবিচূর্ণ মাথা দিয়াই জন্‌কে এমন এক ঘা লাগাইল যে ঘোড়াটা সেই নিমেষেই হাতীর পায়ের তলায় পড়িয়া

একেবারে চট্‌কাইয়া গেল। আর পটাস্‌ ? ঘোড়ার পিঠ্‌ হইতে ছিট্‌কাইয়া দূরে এক গাছের গুঁড়ির তলায় গিয়া তিনি পড়িলেন। বন্দুক তখনও তাঁর হাতে আছে বটে কিন্তু তখন তাঁর একেবারে আচ্ছন্ন অবস্থা।

আর হাতীটার কি হইল জান ? মুখে চোখে রক্তের ধারায় এবং চাপ্‌ চাপ্‌ চর্ব্বির স্তরে সে বোধ করি ভাল দেখিতে পাইতেছিল না, যে গাছের গুঁড়ির তলায় পটাস্‌ ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিলেন তারই উপর সে গিয়া সজোরে ধাক্কা মারিল, তার পর সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল।

অবশ্য হাতীটা পটাসের উপরে পড়িলে তাঁর আর রক্ষা ছিল না, কিন্তু তবুও সে পড়িল এম্‌নি ভাবে যে পটাসের একটা পা হাতীর পিছনের একটা পায়ের তলায় আট্‌কাইয়া গেল। শুধু কি তাই ? মৃত্যু-যন্ত্রণায় হাতীটা এমনই ভাবে পা টানিতে ও ছুঁড়িতে লাগিল যে মাটীর উপরে বেশ খানিকটা গর্ত্ত হইয়া গেল, আর সেই সঙ্গে পটাসের পা খানার একটি হাড়ও আস্ত রহিল না। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু এ সত্যিসত্যিই অরণ্যে রোদন !

কিছুক্ষণ পরেই হাতীর পা নাড়া শেষ হইল, পটাস্‌ বুঝিলেন হাতীর প্রাণবায়ু তার বিশাল শরীর হইতে বাহির হইয়া গেছে। আর কিছুক্ষণ পা নাড়া চলিলেই হইয়াছিল আর কি ! অতি কষ্টে বন্দুক লইয়া তখন তিনি পর-পর তিনটি গুলি ছুঁড়িলেন। সেই শব্দ শুনিয়া লোক-জনেরা আসিয়া হাতীর কবল হইতে তাঁকে টানিয়া বাহির করিল।

পটাস্‌ প্রাণে বাঁচিলেন বটে, তবে হাসপাতালে পা খানি কাটিয়া বাদ দিতে হইল।

শিলং-যাত্রা

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্‌-এ)

কানাই, হয়তো ভাবছো, আমি আসল কথাই গেছি ভুলে—
চিঠি লেখার কথা ছিলো ছন্দ-মিলের তরঙ্‌ তুলে।
বিলম্ব তো হবেই তাতে, কারণ বাদল নামলো ভারি,
মেঘ্‌লা দিনের ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে কথার সারি।
কয়েকটা দিন উঠেছে রোদ, আকাশ্‌ হলো আলোয় আলো,
শহর জুড়ে ভ্রমণ করা লাগ্‌লো হঠাৎ বেজায় ভালো।
বর্ণনাটা করবো নাকি ?—হোক্‌ না সুরু প্রথম থেকেই—
সেই যে সেদিন শ্যাল্‌দা হ'তে ছুটলো গাড়ী এঁকেবেঁকেই ;

তার পরে যেই সারা-ব্রীজের ওপার হ'তে এলাম এপার,
অম্‌নি পেটের ইঞ্জিনটা বল্লে, কয়লা চাই যে এবার।
তাই দু'জনে লেগে গেলাম ভোজন নামক শ্রেষ্ঠ কাজে
জান্‌লা দিয়ে কেবল ব'সে আকাশ দেখা আর কি সাজে ?
পার্ব্বতীপুর ইষ্টেশানটা মস্ত বড়, গাড়ী বদল—
ছোট্ট একটা খাঁচার ভেতর বোঁচ্‌কা-বুঁচকি, এক কুঁজো জল,
সব গুছিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম একটা বেঞ্চি 'পরে ;
অর্থাৎ শুলাম আমি স্বয়ং। লালা তখন কি আর করে,—
দুটো বেডিং এক ক'রে তায় শোয় সে যেন নরম সোফায় ;
আমার মতো মুসাফিরের সঙ্গে যখন, নেইকো উপায় !
পাহাড়ী সব জংলী লোকের চ্যাপ্টা মুখের থ্যাব্‌ড়া নাকে
আশেপাশে অনেক রকম ঘর্ঘরানি বংশী ডাকে।
তাহার মাঝেই একটা চতুর ক্যান্‌ভাসারের মাস্তুতো ভাই
নানান্‌ প্যাঁচের বচন ঝেড়ে চেষ্টা করে বেচ্‌তে দাওয়াই।
গাড়ী কখন বাজিয়ে বাঁশী ছুট্‌লো বেগে, পাইনি কো টের,
নিদ্রা যখন ভাঙ্‌লো তখন অভাব বুঝি গরম কোটের।
শীতল বায়ু বইছে হুহু, বাইরে আলো পূব আকাশে,
পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে দূরে, যেন কালীর দাগ আঁকা সে।
তোমরা তখন খাচ্ছো হয়তো মশার কামড় গায়ের ঘামে,
কিংবা 'দিদি' মানেন মানত ঠাকুর-ঘরে লালার নামে।
লালা কিন্তু চালাক বড়, পথে-ঘাটে খুব হুঁসিয়ার—
কোন্‌ 'টীশানের পরেই এবার নাম্‌তে হবে, মুখস্থ তার।
লালা,—যে জন নৈহাটি পার হয়নি কো আর ই-বি-আর-এ—
একেবারে আমিনগাঁওয়ে চড়লো সেদিন ইষ্টিমারে।
দুই তীরে তার পাহাড় উঁচু—ব্রহ্মপুত্র চল্‌ছে শাদা,
ফেরি-ঘাটের মধ্যে নদী,—কোমর যেন বেল্ট্‌-এ বাঁধা।
শীর্ণ স্রোতে নেই কোনো ঢেউ, একটা যেন চপল মেয়ে
বাদল-বেলায় ঘুমিয়ে গেছে হিমেল হাওয়ার পরশ পেয়ে।

ইষ্টিমারের বাঁশীর সাড়ায় চম্‌কে বালা উঠলো জেগে,
অমল জলের আঁচল-খানি ছড়িয়ে দিলে ঈষৎ রেগে।
কূলে কূলে কুল্‌কুলিয়ে বল্লে যেন কী সব কথা—
যন্ত্রযানের অত্যাচারে বাজ্‌লো বুকে যে সব ব্যথা—
অস্ফুট তার ভাষায় যেন গুম্‌রে ওঠে মর্ম্মরিয়া ;
আমরা গেলাম পার হ'য়ে তার বুকের ওপর তর্‌তরিয়া।

'পাণ্ডু' এসেই হাজির দেখি মণ্ডপে সব মোটর গাড়ী,
লগেজ্‌গুলো হচ্ছে ওজন, আরোহীদল ব্যস্ত ভারী।
কামাখ্যা সে তীর্থ খ্যাত, লাগ্‌লো পিছে পাণ্ডা দু'চার।
'ফেরার পথেই পুণ্যি হবে'—এম্‌নি অনেক বাক্য-বিচার,
শেষ ক'রে সব ভক্তি-ভয়ের, সাঁচ্চা-মিছার কষাকষি,
আমের ঝাঁকা সাম্‌লে নিয়ে বাসের সীটে উঠে বসি।
তার পরেতেই হ'লো সুরু আসল আসাম-মাটির মায়া।—
শৈলমালার শৃঙ্গে আলোক, অরণ্যে তার নিবিড় ছায়া।

হর-গৌরীর লীলা যেন চল্‌ছে চিরকালের তরে,
স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য করে কোলাকুলি সোহাগ ভরে!
সাপের মত পথ গিয়েছে দীর্ঘকায়ার পাকে পাকে,
ঘচাং ক'রে মোটর ঘোরে হঠাৎ এসে বাঁকে বাঁকে।
স্তরের পরে স্তর গিয়েছে গহন গিরি সকল দিকে,
শ্যামল শোভার আস্তরণে চোখ চেয়ে রয় নির্ণিমিখে।
গুহার ফাঁকে ঝর্ণা ঝরে নুড়ির বুকে কলস্বরা,
মোটর দেখেই বন্যবালার হয় নাকো আর কলস ভরা।

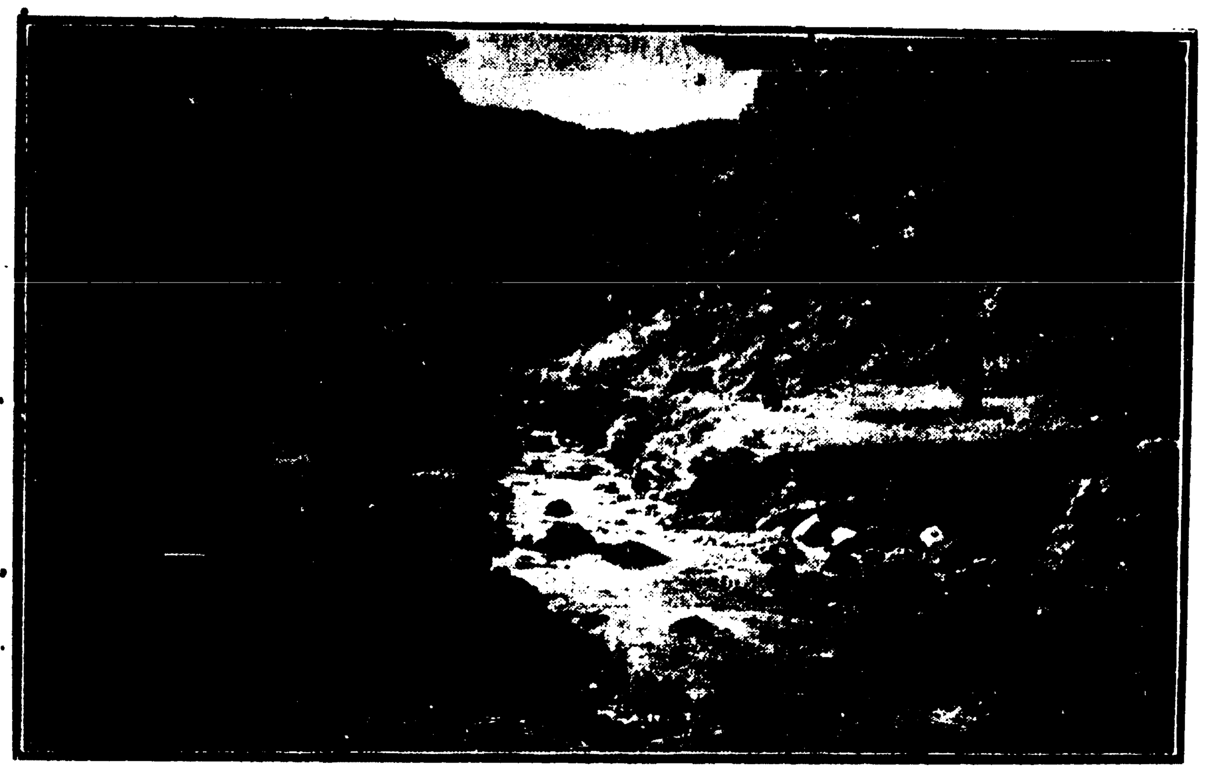

পাইন্ বনে শন্‌শনিয়ে উতল বাতাস গান গেয়ে যায়,
সরল-গাছের তুঙ্গ মাথায় পাতায় নাচন লাগে বেজায়।
পায়ে-চলা পথ বেয়ে ঐ কে যায় চ'লে, পাইনে দেখা—
বনের হরিণ বন্যবধূ ঘনচ্ছায়ায় যায় কি একা?
পাহাড়-চূড়ায় কুটীরগুলি স্বপনপুরীর মায়ার মত,
মেঘের সুরা পান ক'রে সব ঝিমায় যেন তন্দ্রাহত!
কল্‌কাতা সে রাজার পুরী, বাসিন্দা সব বান্দা নকর;
শিলংপাহাড় নিসর্গ-দেশ, মুক্ত মনের বিচিত্র ঘর।

হেলে-দুলে চলেছে ঐ খাসিয়া-দল স্বাধীন জাতি,
প্রকৃতি-মা'র দুলাল এরা, শৈল এদের জীবন-সাথী।
পুঞ্জীভূত মেঘ চলেছে পাইন্ তরুর কুঞ্জবনে,—
হচ্ছে মনে দৌড়ে গিয়ে নৃত্য করি ওদের সনে।
নৃত্য করে ঝকাং ঝকাং মোটরখানা গতির টানে,
উঁচু-নীচু পথের ঢেউয়ে ওঠা-নামায় ক্লান্তি আনে।
হেথা-হোথা দু'একটা গ্রাম, খাসিয়াদের ফর্সা মুখে
কৌতূহলের আব্ছা খুসি, মোটর দেখে একটু ঝুঁকে।
কিচির-মিচির ভাষা তাদের একটি বর্ণ বুঝতে নারি,
হাসছে তারা, বোকার মত মোরাও হাসি। ছুট্ছে গাড়ী।
এম্নিধারা ঘণ্টা ছ'য়েক নাগর-দোলার দোলন খেয়ে,
মাজায় ব্যথা, পেটে ক্ষিধে, শুষ্ক মুখে এলেম ধেয়ে।

শিলং সহর পৌঁছে গেলাম দুপুরবেলা অবশেষে ;
মোটর যখন থাম্লো, দেখি ভায়া হাজির মুচ্কি হেসে।
সেদিনটা তো কেবল শুয়ে কাটিয়ে দিলাম ঘরের কোণে,
রইলো স্থগিত সহর-দেখা, ঘোরা-ফেরা পাইন্-বনে।
কারণ, চোখে ঘুমের নেশা, গায়ের ব্যথাও কমে নি, ভাই।
চিঠি লেখা এইখানে শেষ। আজ্কে তবে আসি, কানাই।

নদীর চরের দৈত্য

(শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র)

চৈত্রমাস—

আমবারুণীর মেলা বসেছে সেই নদীর ওপার মঙ্গলবেড়ের মাঠে। এপার থেকে দেখা যায় না ; ওপারে পৌঁছেও সিকি ক্রোশ গেলে তবে মেলার ধারের জোড়া আমগাছ চোখে পড়ে।

মেলায় কত গাঁ থেকে কত লোক এসেছে—কেউ গরুর গাড়ীতে, কেউ নৌকোয়, কেউ হেঁটে, কেউ বা ডুলি চড়ে। কেউ কেউ আবার ঘোড়ায়ও এসেছে। যত লোক তত জিনিষ—মাটির খেলনা, সাদা-লাল রঙ্ করা মাটির ঘট, বাঁশী, রাংতামোড়া বাঁশের তলোয়ার, কামারে ছুরি, চিনির জোড়া-সন্দেশ, রসোগোল্লা, বাতাসা, খৈ,মুড়ী—কত নাম করব! আর মেলার বর্ণনাই বা করব কি? যে মঙ্গলবেড়ের আমবারুণীর মেলা না দেখেছে সে বুঝ্বে না, কি ব্যাপার, কি মজা!

মর্ণিং ইস্কুলের পর ছুটি হ'য়ে গেল। বাড়ীর পথে হরিশ ও রামগোপাল পরামর্শ করলে, মেলায় যেতে হবে। তারা এর আগে দু'বার ঐ মেলায় গেছে ;—প্রত্যেক বছর ওখানে আমবারুণীর দিনে মেলা বসে।

বাড়ীর সাম্নে এসে হরিশ বল্লে—"তবে শীগ্গির খেয়ে নে—"

"এত সকালে কি রে? এই ত সবে বেলা দশটা।"

"কতটা পথ যেতে হবে তার ঠিক আছে? এখান থেকে মজলপুরের খেয়াই তো প্রায় এক ক্রোশ—তার পর—"

"ওখান দিয়ে কে যাবে?"

"তবে কোথা দিয়ে?"

"এই নদীর চর ভেঙে সোজা—বেদুঈনদের মত—"

কথাটা শুনে হরিশ রামগোপালের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। তার পর বল্লে—"সে আমি যাব না!"

"তুই না যাস্ আমি একাই যাব—"

"যাস্—" বলে হরিশ বাড়ী ঢুক্ল। সেখান থেকে আর একটু গেলে একেবারে নদীর ধারে রামগোপালদের বাড়ী। রামগোপাল বার-বাড়ীর উঠোনে আমতলায় দাঁড়িয়ে একবার

নদীর দিকে তাকালে। এ পারে তাদের বাড়ীর কাছে নদীর সরু জলধারা; তার পর একখানা ছোট চর। তার পর আবার একটু জল, আবার একখানা ছোট চর, আবার খানিকটা জল—তার পর যে চর যেন মরুভূমি-বালি, বালি, কেবল বালি; কোথাও সাদা, কোথাও সাদায় কালোয় মিশানো। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝাউবন—তার পর শক্ত, শুক্‌নো, চাপড়া-বাঁধা মাটি রৌদ্রে ফেটেফুটে চৌচির। ঠিক দুপুরের রৌদ্রে বা রাতের গাঢ় অন্ধকারে একা এ চর পারাপার করতে সাহস ও শক্তির দরকার।

রামগোপাল বাড়ী গিয়ে বই রেখে জামা খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে—"মা, আমি মঙ্গলবেড়ের মেলায় যাব—"

"কার সঙ্গে?"

"একা" বল্‌তে বল্‌তে রুক্ষ মাথায়ই গামছা নিয়ে নদীতে ছুট্‌ল।

অল্প জল, স্রোতও সামান্য, ওপর থেকে একেবারে তলা অবধি দেখা যায়। ঐ যে চেলা মাছের ঝাঁক। রামগোপাল কোমরে গামছা বেঁধে জলে লাফিয়ে পড়্‌ল। ঠাণ্ডা জল; তাঁর গা জুড়িয়ে গেল। কিন্তু আজ আর সাঁতার-কাটা হবে না; আর, সাঁতার কাটবেই বা কোথায়? নদীটা একেবারে মরে গেছে—বড় নৌকো ত চলেই না, যা চলে জেলেডিঙ্গি; লোকে এধারে হেঁটে নদী পারাপার করে। তবে মজলপুরের খেয়াঘাটে এখনও জল গভীর।

রামগোপাল একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ সাঁতার কেটে, জল তোলপাড় করে, গোটা কয়েক ডুব দিয়ে ডাঙায় উঠ্‌ল। তার পর মাথা মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাড়ীর দিকে দিলে দৌড়।

বাড়ী এসে কাপড় ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে বল্‌লে—"মা, ভাত দাও—"

মা তখন মাছ ভাজছিলেন। বল্‌লেন—"এত তাড়া কিসের? ইস্কুলে তো যেতে হবে না—"

"বাঃরে! ক্ষিদে পায় না বুঝি?"

"তোমার মত্‌লব বুঝেছি। মেলায় যাওয়া হবে না—"

"কেন?"

"এই কাঠফাটা রোদে তিন ক্রোশ পথ ভেঙে যাবেন মেলায়! শেষে একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে বস। উনি নেই বাড়ী—"

"কিছু হবে না। তোমার কেবল ভয়—"

"না, যাওয়া হবে না—"

"বেশ তাই, কিন্তু তুমি আমায় ভাত দাও—"

"হোক্‌ রাগে—"

রামগোপাল আর কিছু বল্‌লে না। কাল মফঃস্বলে যাবার সময় বাবা তাকে দু' আনা পয়সা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে পয়সা দু' আনা ট্যাঁকে গুঁজলে; তার পর জুতোজোড়া ও জামাটা নিয়ে বাইরের ঘরে রেখে এল। আস্‌বার সময় আর একবার আমতলায় দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত রেখে নদীর ওপর দিয়ে চরের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলে। ঐ ধোঁয়ার মত গাঁ দেখা যায়, ওর কোলে এক সার সাদা সাদা ফোঁটা। বোধ হয় মেলা যাত্রীরা চলেছে। এর মধ্যেই কি রোদ! বালি তেতে উঠে জলের ঢেউয়ের মত তাত উঠ্‌ছে। এই চর ভেঙে—! কিন্তু সে হরিশের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, যাবেই। চরের দৈত্যটাকে সে মাঝে মাঝে দেখেছে; তবে সে যেখানে-সেখানে হঠাৎ দেখা দেয়। একবার যদি তার কবলে—!

কিন্তু ভয় কি? কিসের ভয়? সে দৌড়বে—তার আগে আগে। ইস্কুলে ১০০ গজের দৌড়ে সে প্রথম। আঃ! বেলা হয়ে যাচ্ছে! ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। মা যে কি করে তাঁর ঠিক নেই। ইস্কুলে না থাক্‌লে কি হয়? তার খাবার অভ্যাস তো দশটার সময়!

ভেতরে গিয়ে হাঁক্‌লে—"ওমা! দাও না; ক্ষিদেয় মরে গেলুম যে—"

"দিচ্ছি; কিন্তু তুমি কিছুতেই মেলায় যেতে পারবে না—"

রামগোপাল চুপ করে রইল। সে যখন খেয়ে উঠ্‌ল, বেলা প্রায় বারোটা।

মা বল্‌লেন—"ঘরে গিয়ে শোও গে—"

"দুপুরে ঘুমোলে আমার শরীর খারাপ লাগে—"

"তবে পড় গে—"

"ছুটির দিন পড়তে ইচ্ছে হয় না—"

"তবে কি করবে শুনি?"

"কি আর করব—" বল্‌তে বল্‌তে রামগোপাল বাইরে বেরিয়ে গেল।

মা ডাকলেন—"গোপ্‌লা—"

"কি? এই ত আমি বাইরে—"

"কোথাও যেয়ো না—"

"যাই নি—" বলে একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ করে সে জামা গায়ে দিয়ে, জুতোজোড়া হাতে ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

তাঁদের ঘাট থেকে পূর্ব্ব দিকে কিছু দূরে গিয়ে সে কাপড় গুটিয়ে জলে নাম্‌ল। এখানে জল এত কম যে হাঁটু ডোবে না। নদী পার হয়ে সে চরে উঠ্‌ল। উঃ! কি গরম হাওয়া! গা যেন পুড়ে যাচ্ছে; মুখখানা ঝলসে গেল। বালি মুড়ীর খোলার বালির মত তেতে আগুন, পা ঠেকালেই ফোস্কা পড়ে। সে জুতো পায়ে দিয়ে চর পার হল। তার পর আবার জুতো খুলে,

হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে জল পার হয়ে গেল। আবার চর ; তবে ছোট। এখানে-ওখানে কেসুর জন্মে আছে। সে কয়েকটা কেসুর তুলে চিবুতে চিবুতে চর পার হয়ে আবার জলে নাম্‌ল।

এ ধারের জলধারাটা একটু বেশী চওড়া। জায়গায় জায়গায় জলও বেশী ; সাবধানে পার হতে হয়। কিন্তু রামগোপালের ভয় নেই। কোথায় কি আছে সে সব জানে। জল পার হয়ে এবার সে যে চরের ধারে এল, তাই পার হওয়া শক্ত।

প্রথমে কাদা ও চোরা বালি ; তার মধ্যে পা বসে গেলে আর রক্ষা নেই। সে একবার একটা মহিষকে চোরা বালিতে পড়ে মাটিতে তলিয়ে যেতে দেখেছে। অনেক চেষ্টা করেও কেউ মহিষটাকে তুল্‌তে পারে নি। সে খুব সাবধানে কাদা পার হয়ে শক্ত মাটিতে দাঁড়াল। সেখানে একটা ছোটখাট জলা মত ছিল ; তার জলে পা ধুয়ে জুতো পরে চার ধার থেকে এক রাশ কেসুর তুলে নিলে। পিপাসার সময় জলের অভাবে সেগুলো চিবোবে।

সাম্‌নে উঁচু চর ;—ওর ওপর উঠ্‌তে হবে। সে শক্ত জায়গাটা পার হয়ে প্রকাণ্ড চরখানায় উঠ্‌ল। সেখানে দাঁড়িয়ে এপারে তাদের বাড়ীর দিকে একবার তাকালে। ঐ যে আমতলায় বড় ঘরখানা ; ওর ওধারে জামগাছ। আর, সেই একেবারে ও কোণে সজনে গাছটা দেখা যাচ্ছে। রামগোপাল আর সেদিকে মনোযোগ দিলে না, চরের ওপর দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

চরখানা পাকা এক ক্রোশ ; তবে তিন ভাগ পার হতে পারলে আর ভয় নেই, কেবল ঝাউবন, তার মধ্য দিয়ে সরু পথ এঁকে-বেঁকে গাঁয়ের বাঁশঝাড়ের মধ্যে চলে গেছে। সেটা ধরে গেলেই মঙ্গলবেড়ের মাঠ।

রামগোপাল চলেছে। তার সাম্‌নে, পিছনে, পাশে সাদা গরম বালির ছোট ছোট তরঙ্গ। মাঝে মাঝে হাওয়ায় বালি উড়ছে। রোদের ঝাঁঝে চোখ মেলে তাকান যায় না। তার মনে হল, সে যেন বেদুঈন্ - তবে তার উট বা ঘোড়া নেই ; সে হেঁটেই মরুভূমি পার হচ্ছে।

বালির ওপর দিয়ে কিছুতেই জোরে চলা যায় না ; পা দু'খানা জড়িয়ে আসে ; আবার দৌড়লে প্রতি পায়ে আছাড় খাবার সম্ভাবনা। রামগোপাল যায়, আর এদিক্‌-ওদিক্ তাকায়। কি জানি দৈত্যটা কোন্ দিক্ থেকে আসে ঠিক কি ? যে হাওয়া ! এখনি হয়তো হাওয়ায় ভর করে তার সামনে বা পিছনে এসে উপস্থিত হবে !

রামগোপাল কিছু দূর চলে গেল। সিকি ক্রোশ পার হয়েছে। পা দু'খানা ভারী ভারী ঠেক্‌ছে ; মাথা পুড়ে গেল, মুখ ঝল্‌সে গেল। চোখ দুটো ও নাকের ভেতরটা জ্বালা করছে ; তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। সে পকেট থেকে গাছ কয়েক কেসুর বার করে চিবোতে লাগ্‌ল।

মিষ্টি রসে গলাটা একটু ভিজল ; কিন্তু তৃষ্ণা মিট্‌ল না। এখনও যে অনেক বাকী।

হঠাৎ সে শুন্‌লে পিছনে শব্দ হচ্ছে ;—হু-হু-হু-উ-উ—! ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠ্‌ল। সে পিছন ফিরে দেখে, তপ্ত বালিরাশিকে ঘোরাতে ঘোরাতে এক প্রকাণ্ড ঘূর্ণি তার পিছন থেকে উঠ্‌ল।

ঘূর্ণিটা তার দিকেই ছুটে আস্‌ছে ; ঐ যে ওর কলেবর ক্রমে বাড়ছে ; আকাশ পানে মাথা উঠ্‌ল, শরীর ফুলে উঠ্‌ল। সে যেন রামগোপালকেই ধরবার জন্যে মাটির ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গর্জ্জন করতে কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে। রামগোপাল প্রাণপণ শক্তিতে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু যাবে কোথায় ? আজ তাকে দৈত্যটা একা পেয়েছে—মুখে পুর্‌বেই। রামগোপাল ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরে দেখলে দৈত্যটা একেবারে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। ঐ যে তার একখানা হাত—গরম, খরখরে। রামগোপালও আর ছুট্‌তে পারে না। সে আবার পিছন ফিরে দেখ্‌লে। দৈত্যটা একটু পাশে সরেছে, রামগোপালের ডান দিকে। রামগোপালও সেদিকে সরেছিল। আর রক্ষা নেই। রামগোপালের দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে ; শরীর অবশ।

তবুও সে চট্ করে মনে মনে ঠিক করে নিলে, দৈত্যটা যদি তাকে ধরেই, সে হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে চোখ বুজে পড়ে থাক্‌বে।

ভাব্‌তে না ভাব্‌তে হঠাৎ দৈত্যটা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে এক প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নাকে, মুখে, চোখে গরম বালির ঝাপ্‌টা মারলে। রামগোপালের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ঐ যে তার জামা-কাপড় ধরে টান্‌ছে ; এখনই তাকে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে এই চরের একধারে ফেলে দেবে ! তার চারধারে শব্দ হচ্ছে হু—উ—উ—উ—উ—। উঃ ! কি গরম !

সে তাড়াতাড়ি বসে হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে, চোখ বুজে রইল। তার পিঠের ওপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে—দৈত্যটা তার জামা-কাপড় ধরে টান্‌ছে, আর কর্‌ছে হু—উ—উ - উ—উ—।

রামগোপাল মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—আর কোন দিন দুপুর রোদে এই চরে আস্‌ব না—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—"

দৈত্যের মনে বোধ হয় দয়া হল ; সে রামগোপালকে ছেড়ে দিয়ে পিছনে সরে গেল। কিন্তু ঐ যে আবার আস্‌ছে। এবার রামগোপাল বাঁচবে না, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। সে আর বস্‌তেও পারে না। হাত-পা-মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে—এ সময় একটু জল—।

কিন্তু দৈত্যটা এবার এসে তাকে ধরলে না ; তার কাছ থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে চীৎকার করতে লাগ্‌ল হু—উ—উ—উ—। রামগোপাল সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কখন্ ছুটে আসে ঠিক কি ? ঐ যে সর্‌ছে। সরতে সরতে চরের ওপর বাঁ দিকে দিলে দৌড়।

রামগোপাল এবার সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মঙ্গলবেড়ে মেলায় যেতে আর পা চল্‌ল না; বাড়ীর দিকে ফির্‌ল। যেতে যেতে দেখ্‌লে, দৈত্যটা ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ঝাউবনের ধারে গিয়ে পড়েছে। তার শরীর ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে!

ঐ যে রামগোপালের বাঁ ধারে আবার একটা; এটা ছোট। কিন্তু খুব জোরে ঘুরছে। রামগোপালও যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল। ছোট দৈত্যটাও এগিয়ে আস্‌ছে; কখনও শরীর বাঁকাচ্ছে, কখনও ফোলাচ্ছে, কখনও নোয়াচ্ছে।

এটাও কি তাকে ধর্‌বে? না—না—যত কষ্টই হোক, তাকে জলের ধারে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

ঐ যে জল, ঐ যে—ঐ যে—আর দশ মিনিট। কিন্তু এই দশ মিনিটের মধ্যেই দৈত্যটা এসে পড়বে।

কিন্তু না, আর ভয় নেই। দৈত্যটা চর ধরে মজলপুরের খেয়া-পারের দিকে ছুটেছে।

রামগোপাল দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগ্‌ল। কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে ভরসা হ'ল না। সে চর পার হয়ে নীচে নেমে নদীতে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আঁজলা ভরে জল খেলে ও চোখে-মুখে-মাথায় দিলে। তার পর নদী পার হয়ে বাড়ী চলে গেল।

মা তাকে দেখেই বল্‌লেন—"এ কি রে গোপ্‌লা? তোর মুখখানা যে ঝল্‌সে কালো হয়ে গেছে! মাথায় বালি। কোথায় গিয়েছিলি? মেলায়?"

রামগোপাল ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"না।"

"তবে? শুয়ে পড়্—শুয়ে পড়্—" বল্‌তে বল্‌তে মা মাদুর পেতে দিলেন।

রামগোপাল কোন উত্তর দিলে না; সটান তার ওপর শুয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল।

মা কত জিজ্ঞাসা করলেন, রামগোপাল কিছুই বল্‌লে না। কোন দিন সে কথা সে কারো কাছে প্রকাশও করে নি।

কিন্তু ভীরু হরিশটা সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছে, রামগোপাল নদীর চরের দৈত্যের হাতে পড়েছিল, এপারে আমতলায় দাঁড়িয়ে সে দেখেছে।

কলিকাতাকে 'City of Palaces' বলা হয়। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন কলিকাতায় একখানাও পাকা বাড়ী ছিল না। কলিকাতায় প্রথম পাকা বাড়ী নাকি করেন বাবু লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার—লালদীঘির ধারে। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক্ সাহেব এই বাড়ীটা অফিস করিবার জন্য ভাড়া নিয়াছিলেন।

রামধনু—

আঃ, পড়ে যাব যে!

নিরুদ্দেশ-রহস্য

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড! ডিটেক্‌টিভ, ইন্‌স্পেক্টার, পুলিশে চারিদিক্ ছেয়ে গেছে। প্রফেসার আত্মম্ভরী ঘোষ নিজের পরীক্ষাগারে কাজ কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ কোথায় যে মিলিয়ে গেছেন, কিছুতেই আর তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। তিন দিন্ ধ'রে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ আছে; একবারও খোলা হয় নি। বাড়ীর চারিদিকে উঁচু পাচীল দিয়ে ঘেরা বাগান; বাইরে যাবার একটি মাত্র ফটক; সে ফটকও তিন দিন থেকে বন্ধ আছে। ফটকে জবরদস্ত গুর্খা পাহারাদার নরবাহাদুর চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে। পাচীল টপ্‌কে যাবারও উপায় নাই;—একে উঁচু পাঁচীল, মাথায় বোতলের কুচি গাঁথা; তার উপর আবার ইলেক্‌ট্রিক তার দু'তিন সারি লাগান রয়েছে; "ছুঁলেই ম'লে"।

ঘরের ভিতরেও এমন একটু জায়গা নাই যেখানে মানুষ লুকিয়ে থাক্‌তে পারে। মেঝের মাঝখানে একটা কাঠের তক্তা লাগান, তার নীচে ছোট্ট একটি "ঠাণ্ডা কাম্‌রা" (cold-storage room),—সেখানেও কিছু নাই, সব খালি। চারিদিকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হয়েছে; কোথাও প্রফেসার ঘোষের নামগন্ধও নাই।

রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে আরও এক ব্যাপারে। এক অচেনা অল্পবয়সী যুবক কখন কি করে প্রফেসারের ঘরে ঢুকেছিল কেউ টের পায় নি—ঘর খুলতেই তার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে প'ড়েছে। খুব সম্ভবতঃ ঢুকে সে আর বার হবার পথ পায় নি বলে সেখানেই উস্‌কো-খুস্‌কো চুলে বসেছিল—কোন প্রশ্নেরই সে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারছে না, শুধু আম্‌তা-আম্‌তা কর্‌ছে। বলা বাহুল্য, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রফেসার ঘোষের সহযোগী বা য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট শমনদমন সিংহই প্রথমে পুলিশে খবর দেন্। তাঁকে পাশের ঘরে থাক্‌তে ব'লে প্রফেসার ঘোষ তিন দিন আগে নিজের পরীক্ষাগারে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দেন্।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, আড়াই দিন যায়;—প্রফেসার ঘোষের আর খোঁজখবর নাই। তখন শমনদমন বাবুর মনে সন্দেহ হ'লো। ডাকাডাকি ক'রে সাড়া না পেয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন, একটি যুবক টেবিলের কাছে ব'সে আছে আর চারিদিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে;—প্রফেসার ঘোষের চিহ্নও নাই।

শমনদমন বাবু তো একেবারে হতভম্ব! ব্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে তখনই গুর্খা

পাহারাদার নরবাহাদুরকে ডাক দিলেন। তা'কে পরীক্ষাগারের দরজায় মোতায়েন রেখে তিনি তখনই ছুটে গিয়ে পুলিশে খবর দিলেন।

পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখ্‌ল, সেই যুবকটি দিব্য নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে।

প্রফেসার ঘোষকে তো তোমরা জানই। তিনি হরিহরপুরের ময়দানের এক কোণায় নিজের পরীক্ষাগার বানিয়ে নানা রকম অদ্ভুত পরীক্ষা চালাচ্ছেন—নানা রকম আশ্চর্য্য আবিষ্কারও তিনি করেছেন।

সম্প্রতি নাকি তিনি 'অদৃশ্যকারী আলো'র যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। সে আলো যার গায়ে পড়্‌বে সে-ই অদৃশ্য হয়ে যাবে। পরীক্ষা নাকি অনেক পরিমাণে সফলও হয়েছিল; কিন্তু, শমনদমন বাবু বল্‌লেন, যন্ত্রটির কাজ শেষ হয় নি।

পুলিশের নজর আগেই সেই যন্ত্রটার দিকে গেল। ডিটেক্‌টিভদের বড় সাহেব মিষ্টার বিগ্‌ম্যান সেই যন্ত্রটিকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন। অদৃশ্যকারী আলো কোন্ দিক দিয়ে আস্‌তে পারে, যন্ত্র থেকে কোনও আলো আস্‌ছে কিনা, আলোর পথ কেমন ক'রে বন্ধ করা যায়, যন্ত্রের স্বইচ্, হাতল প্রভৃতি টিপ্‌লে বা টান্‌লে কোনও ফল হয় কিনা, যন্ত্রের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার যোগ করা আছে কিনা—ইত্যাদি, নানা রকম পরীক্ষা তিনি ক'রে দেখ্‌লেন। শেষটায় বল্‌লেন, "অদৃশ্যকারী আলোর গুণে প্রফেসার ঘোষ যে অদৃশ্য হয়ে যান্ নি, এ কথাই বা কেমন ক'রে বল্‌ব?"

একটু ভেবে মিষ্টার বিগ্‌ম্যান আবার বল্‌লেন, "এ যন্ত্রটিকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। কিন্তু, সরাই কোথায়?"

শমনদমন বাবু বল্‌লেন, "কেন! কঙ্কাল-কামরায় সরালেই হয়!"

মিষ্টার বিগ্‌ম্যান চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "সে আবার কি? আর কোনও কামরা আছে ব'লে তো আগে বলেন নি!"

শমনদমন বাবু বল্‌লেন, "ওটার কথা ভুলেই গেছিলাম। তা' ছাড়া, উনি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ তো আর সে কাম্‌রা খুল্‌বার কায়দা জানে না; তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম।

মিষ্টার বিগ্‌ম্যান বল্‌লেন, "খুলুন, খুলুন! শীগ্‌গির কামরাটা খুলুন।"

শমনদমন বাবু টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা অদ্ভুত চাবি নিয়ে, বাঁ দিকের দেয়ালে একটা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু'চারবার ঘুরা'তেই দেয়ালের গা থেকে একটা দরজা খুলে গেল আর একটা ছোট কামরা দেখা গেল। তা'র মধ্যে সারি সারি কয়েকটা নরকঙ্কাল ঝোলান রয়েছে। প্রফেসার ঘোষ নাকি সেই সব কঙ্কাল নিয়ে 'এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট' অর্থাৎ পরীক্ষা কর্‌ছিলেন। শমনদমন বাবুকেও সেই পরীক্ষার কথা ঘুণাক্ষরে কিছু বলেন নি।

আট-দশটা কঙ্কাল সারি সারি ঝুল্‌ছে; তা'র মধ্যে একটা দড়ি দিয়ে ঝোলান, অন্যগুলো তার দিয়ে ঝোলান। বিগ্‌ম্যান সাহেব সেই কঙ্কালটার দিকে দেখিয়ে শমনদমন বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "এই কঙ্কালটা কি আগেও ঝুল্‌তে দেখেছিলেন?"

শমনদমন বাবু বল্‌লেন, "আমার ঠিক মনে নাই, কারণ এ কামরা আমি বড় একটা দেখ্‌তে পেতাম না। এ কঙ্কালটা আগে দেখেছি ব'লেও মনে হচ্ছে না।"

এ কঙ্কালটা কি আগেও ঝুল্‌তে দেখেছিলেন?

মিষ্টার বিগ্‌ম্যান বল্‌লেন "আচ্ছা; প্রফেসার ঘোষ কত লম্বা ছিলেন? তাঁ'র কোন ছবি আছে কি?"

শমনদমন বাবু বল্‌লেন, "ছবি তিনি বড় একটা তোলা'তেন না। বহু বৎসর আগেকার একটা ছবি ড্রয়ারে আছে;—সেটা তত ভাল ছবি নয়। তিনি লম্বায় প্রায় ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি ছিলেন—ঠিক মাপ কোনদিন নেওয়া হয় নি।"

ড্রয়ার থেকে তাড়াতাড়ি ছবি বের ক'রে নিয়ে, মিষ্টার বিগ্‌ম্যান একবার সেটার দিকে চেয়ে, আর একবার কঙ্কালের দিকে চেয়ে, চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "খুবই আশাপ্রদ! মুখের চেহারার 'কাট্' কঙ্কালের মুখের 'কাট্'এর সঙ্গে হুবহু মিল্‌ছে; লম্বায়ও কঙ্কালটা মোটামুটি ৫½ ফুট।—আচ্ছা, মিষ্টার সিংহ, মানুষের গায়ের মাংস, চামড়া ইত্যাদির বিষয় তিনি কি কখনও কিছু এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট বা গবেষণা ক'রেছিলেন?"

শমনদমন বাবু বল্‌লেন, "ইজিপ্টের 'মামী'র বিষয় তিনি রীতিমত পরীক্ষা এবং গবেষণা ক'রেছিলেন! একটি ছাত্র মাঝে মাঝে রাত্রে তাঁর কাছে আস্‌ত, তা'র সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে

আলোচনা কর্‌তেন। আমাকে সেখানে থাক্‌তে দেওয়া হ'তো না, কারণ, ছাত্রটির নাকি অন্যের সাম্‌নে এ বিষয়ে আলোচনা কর্‌বার সম্বন্ধে আপত্তি ছিল। এমন কি, তা'র মুখ পর্য্যন্ত ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাই নি। একদিন একটু দেখেছিলাম;—অনেকটা এই যুবকটির মত।"

মিষ্টার বিগ্‌ম্যানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল! তিনি বল্‌লেন, "এর চেয়ে পরিষ্কার 'কেস্' হ'তে পারে না। যাক্, অনেক রাত হয়েছে; আসামীকে নিয়ে আজ সরে পড়ি। এখানে পাহারার ব্যবস্থা রেখে যেতে হবে। কাল আবার কথাবার্ত্তা হবে।"

* * * *

পরদিন সকালেই "সরস সমাচার" কাগজ লিখ্‌ল:

"অদৃশ্য-রহস্য

"আপন আলয়ে আশ্চর্য্যভাবে অধ্যাপক আত্মম্ভরী (ঘোষ) অকস্মাৎ অদৃশ্য! সহযোগী শমনদমন সিংহের সোনাক্তকরণে, সব-ইন্‌স্পেক্টর, সি-আই-ডি, সকলেরই সন্দেহ সেথায় সুপ্ত শ্মশ্রুগুম্ফহীন, শ্যামবর্ণ, সুস্থ, সপ্তবিংশবর্ষীয়োপরি। সমস্যার সমাধান, সমুচিত শাস্তিবিধানাদি সম্বন্ধীয় সকল সংবাদ সংগ্রহ সম্বন্ধে "সরস সমাচার"এর সুদক্ষ সহকারী সম্পাদক সত্যসখা সরকার স্বয়ং সচেষ্ট। 'সরস সমাচার' সর্ব্বসাধারণকে সর্ব্বাগ্রে সংবাদ সরবরাহকরণে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত।"

আগের দিন অনেকেই ঘটনার কথা জান্‌ত না। সকালে "সরস সমাচার" প'ড়ে সকলেরই এ বিষয়ে নজর পড়্‌ল। থানার চারিদিকে লোকে লোকারণ্য; সরস সমাচারের কাট্‌তিও খুব।

* * * *

পরদিন মিষ্টার বিগ্‌ম্যান আবার ঘটনার জায়গায় এলেন; শমনদমন বাবুও উপস্থিত। প্রথমেই টেবিলের ড্রয়ার খুলে যা' কিছু কাগজপত্র, সব বের করা হ'লো। তা'র ভিতরে প্রফেসার ঘোষের "নোট বুক" ছিল। সব যেন ঠারে লেখা;—অর্থ বোঝা ভার। দু'এক জায়গায় একটু বোঝা যায়।

এক জায়গায় লেখা আছে—"প্রফেসার চিন্ চিংএর 'ফর্ম্মুলা'ই ঠিক;—২৩ ঘণ্টায় কঙ্কাল। ছাত্র এলে দেখা যাবে।" নোটের পাশে কোনও তারিখ নাই।

পরে আর এক জায়গায় লেখা আছে—"প্রফেসার টাকাহাসির ফর্ম্মুলা—সামান্য পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যুগান্তর আন্‌বে। কালই পরীক্ষা কর্‌ব।" এই নোটের পাশে যে তারিখ লেখা আছে সেটা মাত্র দশদিন আগের।

মিষ্টার বিগ্‌ম্যান ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আচ্ছা, মিষ্টার সিংহ! কাল যখন ড্রয়ার থেকে চাবি বের কর্‌লেন তখন কি ড্রয়ার খোলা ছিল?"

শমনদমন বাবু বল্‌লেন, "হাঁ, খোলাই ছিল। পরে আমি ওটা আমার চাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম।"

মিষ্টার বিগ্‌ম্যান বল্‌লেন, "তবে তো আর সন্দেহই রইল না কিছু। ঐ যুবকটি নোট-বুকের ঠার নিশ্চয়ই জানে; ড্রয়ার খুলে সে নোটবুক দেখেছে। '২৩ ঘণ্টায় কঙ্কাল' কথাগুলির মধ্যে কোনও গূঢ় রহস্য আছে। 'ছাত্র' হচ্ছে আমাদের এই আসামীটি। যতই ভালমানুষী করুক, যতই ন্যাকামির ভাব দেখা'ক,—ওকে আমি ছাড়্‌ছি না। আমেরিকার 'গ্যাংষ্টার'দের মত এ লোকটা একেবারে হৃদয়হীন—একেবারে বেপরোয়া।"

শমনদমন বাবু বল্‌লেন, "টুক্‌রা টুক্‌রা যোগ দিয়ে রহস্যটা যেন ভেদ হয়ে আস্‌ছে ব'লে মনে হয়। 'ছাত্র'টি হয়তো প্রফেসার ঘোষের ঠারের ভাষা শিখেছিল। ক'দিন আগে একবার একটা প্রকাণ্ড টব নিয়ে কি যেন পরীক্ষা করা হয়েছিল; সেখানে ছাত্রটি উপস্থিত ছিল। আমাকে তখন কার্য্যোপলক্ষ্যে অন্য জায়গায় যেতে হয়েছিল। দড়ি দিয়ে ঝোলান কঙ্কালটি তো মাপে ঠিকই আছে ব'লে মনে হচ্ছে; তা'র মুণ্ডুর গড়নটাও প্রফেসার ঘোষের মাথার মত, আপনি বল্‌ছেন। এখন, 'কেস্'টি গোছান আপনার হাতে।"

* * * *

দু'চার দিন খুব হৈচৈ গেল;—যেখানে যাও, কেবলই ঐ কথা। "সরস সমাচার"এর কাট্‌তি খুব হচ্ছে; রোজ খবর কিছু না কিছু থাকেই।

বিচারের দিন ক্রমেই কাছে আস্‌ছে। যুবকটিকে দিয়ে কিছুতেই স্বীকারোক্তি করান যাচ্ছে না, যদিও তার ভাবনা খুবই বেড়ে গেছে। বেচারার প্রতি অনেকে আবার সহানুভূতিও দেখাচ্ছেন—হয় তো সে বাস্তবিকই নির্দ্দোষ। একজন উদীয়মান ব্যারিষ্টার মিষ্টার বিপদ্‌বারণ বসু তার পক্ষে বিনা পয়সায় দাঁড়িয়েছেন।

মিষ্টার বিগ্‌ম্যান 'কেস্'টি যথাসম্ভব সুন্দর ক'রে গুছিয়ে এনেছেন। বড় বড় ব্যারিষ্টার এখন সরকারী 'কেস্' লেখা নিয়ে ব্যস্ত। নথিপত্র তৈয়ারী হয়েছে; সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় হয়েছে; প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে; কঙ্কাল, যন্ত্রপাতি সব আদালতে আনা হয়েছে; ঝুড়ি ঝুড়ি ফটো তোলা হয়েছে;—এবার বিচার আরম্ভ হ'লেই হয়।

* * * *

বিচার আরম্ভ হয়েছে। সরকারী পক্ষের ব্যারিষ্টার স্যার শৈলেশ্বর সিংহ খুব তেজের সঙ্গে বক্তৃতা দিয়ে, খুব কায়দায় 'কেস'টি গুছিয়ে এমন ভাবে সব কথা ব'লেছেন যে, ব্যাপারটি অতি সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—

"আসামী অনেক দিন ধ'রে অধ্যাপক ঘোষের কাছে যাতায়াত ক'রেছে; সাক্ষীসাবুদ

সে বিষয়ে যথেষ্ট আছে। অধ্যাপক ঘোষের 'নোটবুক' আসামীর হাতে পড়েছে বা পড়ার সম্ভাবনা ছিল, সে বিষয়েও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রফেসার ঘোষ নিরুদ্দেশ হবার সময় এবং পরে ঐ ঘরে আসামী ছাড়া আর কোনও লোক থাকা সম্ভবপর ছিল না। ঘরে নানান্ জায়গায় জিনিষপত্রের উপর প্রফেসার ঘোষের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে;—তা' থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে, একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিল। এমন কি, আসামীর জামায়ও প্রফেসার ঘোষের আঙ্গুলের কয়েকটি ছাপ পাওয়া গেছে। ঘরে যে কঙ্কালটি পাওয়া গেছে, বিশেষজ্ঞের মতে সেটা প্রফেসার ঘোষের কঙ্কাল। আসামী প্রফেসার ঘোষের কাছ থেকে, ২৩ ঘণ্টায় মৃতদেহ থেকে কঙ্কাল তৈয়ারী করার উপায় শিখেছিল বা জেনেছিল—সে বিষয়েও প্রমাণ রয়েছে। একমাত্র প্রমাণ যা' পাওয়া যাচ্ছে না, সেটি হচ্ছে কবে, কখন এবং কি ভাবে প্রফেসার ঘোষকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রমাণ যা' রয়েছে, তা'তে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ হয় না যে, আসামী ছাড়া আর কোনও লোক প্রফেসার ঘোষের মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে এবং সেই মৃত্যু, যেদিন কঙ্কাল পাওয়া গেছে তা'র অন্ততঃ দু'দিন আগে এবং চারদিনের মধ্যে, ঘটেছিল। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড কম দেখা যায়। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় প্রফেসারকে যে বিনা কারণে 'হত্যা করতে পারে সে যে দুনিয়ার কোনও বিচারকের কৃপাপাত্র নয়, তা' কি আর ব'লে দিতে হবে?"

রাস্তায়, ঘাটে যেখানে যাও, লোকের মুখে এক কথা, "স্যার শৈলেশ্বরের বক্তৃতার পর আসামীর ব্যারিষ্টারকে আর কিছু বল্‌তে হবে না; আসামীর ফাঁসি হওয়াই উচিত।"

* * * *

এবার আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টারের পালা। মিষ্টার বসু প্রথমেই বল্‌লেন, "প্রফেসার টাকাহাসিকে যে সাক্ষী ডাকা হয়নি, সেটি হচ্ছে এই মোকদ্দমার এক নম্বর গলদ। আমরা প্রফেসার টাকাহাসিকে সাক্ষী দেওয়াতে চাই। এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আরও দু'চারটি কথা মাত্র বল্‌লেই আপনারা অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—হাতে হাতে প্রমাণও পাবেন, অকাট্য যুক্তিও দেবো। আমার বিশেষ অনুরোধ, মোকদ্দমা আর ৯ দিন স্থগিত থাকুক; ততদিনে টাকাহাসির সাক্ষী দেবারও ব্যবস্থা হবে এবং আমার অন্যান্য প্রমাণও তৈয়ারী হয়ে যাবে।"

মোকদ্দমা ৯ দিনের জন্য স্থগিত হ'লো। প্রফেসার টাকাহাসি তখন আরাফৎগঞ্জে ছিলেন; তাঁকে আনাবার ব্যবস্থা হ'লো।

নয় দিন পর আবার বিচারের পালা। এবার প্রথমেই টাকাহাসির সাক্ষ্য। বৃদ্ধ, সৌম্যমূর্ত্তি, সুদর্শন জাপানী পণ্ডিত—দেখ্‌লেই মনে শ্রদ্ধা আসে। এই রহস্যময় ঘটনা ঘটার দিন দশেক আগে তিনি প্রফেসার ঘোষের সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন। মোকদ্দমার বিবরণ প'ড়ে

তিনি নিজেই 'সাক্ষী' দেবার ইচ্ছা জানিয়ে ব্যারিষ্টার বসুকে চিঠি লেখেন, এবং মোকদ্দমা সম্বন্ধে দু'চারটি অত্যন্ত দরকারী খবর মিষ্টার বসুকে দেন।

হরিহরপুরে হাজির হয়েই তিনি মিষ্টার বসুর সঙ্গে দেখা করেন; তা'র পর জজের অনুমতি নিয়ে আসামীর সঙ্গেও দেখা করে কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁর সঙ্গে একটি যুবক ছিল, তা'র নাম কোবায়াশি; সে নাকি আর একজন অতি দরকারী সাক্ষী।

* * * *

আবার বিচারের দিন এসেছে। এ কয়দিনে আসামীর যা' অবস্থা হয়েছে তা' আর বল্‌বার নয়। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, ভাবনায় বেচারার চেহারা এত বদ্‌লিয়ে গেছে যে, দেখে চেনাই যায় না। যখন কাঠগড়ায় তা'কে আনা হ'লো তখন সকলে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল!

প্রফেসার টাকাহাসি বল্‌লেন, "আমার সঙ্গে প্রফেসার ঘোষের অল্প কালের আলাপ। তিনি কয়েকটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন এবং সে বিষয়ে গবেষণায় সাহায্য করবার জন্য আমার ভাগ্নে কোবায়াশিকে পাঠাই। সে বহু কাল এ দেশে থেকে তার চালচলন ঠিক বাঙালীর মতই হয়ে গেছে। কোবায়াশি কিছু কাল প্রফেসার ঘোষের সঙ্গে কাজ করে; তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখিও হয়। ইজিপ্টের 'মামী' সম্বন্ধে কোবায়াশির সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়। কোবায়াশিকে প্রফেসার ঘোষ 'ছাত্র' ব'লে ডাকতেন। প্রফেসার ঘোষের নোটবুকে প্রফেসার চিন্ চিংএর যে 'ফর্ম্মুলা' লেখা আছে সেটা কোবায়াশির হাতের লেখা। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে কোবায়াশির আঙ্গুলের ছাপ আছে; পাশাপাশি দু'জনেরই ছাপ তোলা রয়েছে;—কেমিক্যাল প্রসেসে, অর্থাৎ আরকের সাহায্যে, তোলা ছাপ। তার আশেপাশে জাপানী ভাষায় লেখা রয়েছে। কোবায়াশিকে মিষ্টার সিংহ আর নরবাহাদুর দেখে থাক্‌বে। আমার কাছে প্রফেসার ঘোষ যে সব চিঠিপত্র লেখেন তা' আমি নিয়ে এসেছি এবং এই ব্যাপারে দাখিলও করেছি। শেষে যখন তাঁর কাছে আসি তখন একটা বিশেষ দরকারী ব্যাপারে। একটি বিশেষ দুষ্প্রাপ্য 'ফর্ম্মুলা' নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি পরামর্শ করতে এসেছিলাম। নানা দেশী গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে এনে, 'ফর্ম্মুলা'টি এবং গাছগাছড়া তাঁকে দিই। 'ফর্ম্মুলা'টি একটা ওষুধের;—কি ওষুধের তা' আপনারা একটু বাদেই জান্‌তে পার্‌বেন।"

এর পর কোবায়াশির সাক্ষী। সে তা'র নিজের তোলা অনেক ফটোগ্রাফ দাখিল করেছে; তা'র মধ্যে শমনদমন বাবুর ছবি, নরবাহাদুরের ছবি, প্রফেসার ঘোষের ছবি—সবই আছে। আর একটি ছবি আছে, সেটার সম্বন্ধে এখনই শুনবে। কোবায়াশির সাক্ষী দু'চার কথায় হ'য়ে গেল। প্রফেসার ঘোষের একমাত্র 'ছাত্র' যে সে, তা'র আর কোনও সন্দেহ রইল না।

এবার মিষ্টার বসুর বল্‌বার পালা এসেছে। প্রথমেই তিনি একরাশ ফটোগ্রাফ এনে

হাজির করলেন। একটা পুরানো ফটোগ্রাফে কঙ্কাল-কামরা দেখা যাচ্ছে; তার মধ্যে 'প্রফেসার ঘোষের কঙ্কাল' ব'লে যেটিকে বলা হয়েছে সেটিও ঝুল্‌ছে! আর একটি ছবিতে দেখান হয়েছে, প্রফেসার ঘোষ সেই কঙ্কালটি নিয়ে একটা মস্ত বড় বাক্সের মধ্যে ভর্‌ছেন; বাক্সের গায়ে কি সব কলকব্জা আঁটা; পাশে কোবায়াশি ব'সে।

এর পর একটা ফটোগ্রাফ দেখালেন, সেটাতে দেখা যাচ্ছে, ঐ কঙ্কালের গায়ে প্রফেসার ঘোষের আঙ্গুলের ছাপ!

তা'র পর একটা ফটো দেখালেন, আসামীর আঙ্গুলের ছাপ। পাশে প্রফেসার ঘোষের আঙ্গুলের ছাপ রেখে দেখালেন—ছাপগুলি অবিকল এক!

এর পর প্রফেসার ঘোষের সম্প্রতি তোলা একটি ছবি বের করে দেখিয়ে বল্‌লেন, "আমি আর কিছু বল্‌তে চাই না;—একবার এই ফটো দেখুন আর একবার আসামীর দিকে দেখুন!"

সকলে চেয়ে দেখ্‌লেন, দুটি চেহারা অবিকল এক! ব্যাপারখানা কি?

আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হ'লো তার কি বল্‌বার আছে। আসামী বল্‌ল "গত পাঁচ দিনে আমার সব কথা মনে পড়েছে। প্রফেসার টাকাহাসি একদিন আমাকে একটা 'ফর্ম্মুলা' আর কয়েকটা গাছ-গাছড়া দিয়ে বলেন, 'নবযৌবন লাভের এই ফর্ম্মুলাটি আপনার কাছে এনেছি; একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন। সেই ফর্ম্মুলা অনুসারে, সামান্য পরিবর্ত্তন ক'রে ওষুধটি বানাই। শমনদমন বাবুকে পাশের ঘরে থাকৃতে বলে, চুপি চুপি আমি ওষুধটি খাই। ওষুধের ফল স্থায়ী হবার দ্বিতীয় একটি ওষুধ ছিল সেটি আর খাওয়া হয় নি। ওষুধ খাবার পরই ঘুমিয়ে পড়ি;—জেগে উঠে দেখি আমার ঘরে পুলিশ। তা'র পর আমাকে গ্রেপ্তার করা হ'লো! ওষুধের ফল নাকি মাত্র তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয়—দ্বিতীয় ওষুধটি খেলে আরো বেশী হয়। যাক্, প্রফেসার টাকাহাসি বল্‌লেন, 'আর মাত্র তিন দিন বাকী; তা'র পর আপনি আগের স্মৃতিশক্তি, চেহারা, সবই ফিরে পাবেন।' এবার একবার শমনদমনকে, নরবাহাদুরকে আর আমার দাদা ঢক্কানিনাদ ঘোষকে সাক্ষী মান্‌লেই আপনাদের সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যাবে।"

এর পর আর মোকদ্দমা চল্‌বার কোনও কারণ রইল না। আসামী যে নিজেই প্রফেসার ঘোষ তা'র আর কোন সন্দেহ রইল না;—প্রমাণও যথেষ্ট হয়ে গেল। সকলেই তাঁকে তাঁর গলার স্বর, তাঁর লেখা, ভাবভঙ্গি ইত্যাদি দেখে, চিন্‌তে পার্‌লে। ফটো, দলিলপত্রও যথেষ্ট প্রমাণ দিল। পরনের কাপড়ে ধোপার মার্কাও প্রমাণ দিল।

"সরস সমাচার" এবার লিখ্‌ল, "সৌম্যমূর্ত্তি শ্বেতশ্মশ্রু সাক্ষীর সাহায্যে সহসা সকল সমস্যার সমাধান: শেষফলে সকলেই সুখী।"

বেতার-কাহিনী

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

আমাদের বাচ্চুর অনুসন্ধিৎসাটা একটু প্রবল। সব জিনিষই সে বৈজ্ঞানিকের চোখ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করে এবং তার ভিতরকার গূঢ় অর্থ বাহির করিবার জন্য খামিয়া সারা হয়। এই ধর সেদিনকার কথা। বাচ্চু থাকে মফঃস্বলে, গ্রীষ্মের ছুটীতে কলিকাতায় আসিয়াছে। প্রথম দিন আসিয়াই সে ছাদে গিয়াছে—উদ্দেশ্য কোলাহলময়ী নগরী সম্বন্ধে একটু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ। কিন্তু গিয়া বাচ্চু কি দেখিল? দেখিল প্রায় অনেক বাড়ীরই ছাদের উপর এক-এক যোড়া করিয়া বাঁশ আকাশের দিকে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কার্ত্তিক মাস হইলে বাচ্চু মোটেই আশ্চর্য্য হইত না, কারণ কার্ত্তিক মাসে অনেক বাড়ীতেই আকাশপ্রদীপ খাটাইবার রেওয়াজ আছে—তা' যত আধুনিক হাল ফ্যাশানের বাড়ীই হোক্ না কেন। গ্রীষ্মকালে তো আর কেউ আকাশপ্রদীপ দেয় না! তবে? বাচ্চু দেখিল সব ক'টা বাড়ীতেই যোড়া বাঁশে খানিকটা তার বাঁধা আছে। তবে কি কাপড় মেলিবার উদ্দেশ্যেই এত কাণ্ড! কিন্তু অত উঁচুতে কাপড় মেলিতে যাইবে কেন? অনেকক্ষণ মস্তিষ্কচালনার পর যখন সেটা একটু গরম বোধ হইতে লাগিল তখন বাচ্চু গেল মেজমামার কাছে। এ রহস্যের সমাধান মেজমামাকেই করিয়া দিতে হইবে।

বাচ্চু ভাবিয়াছিল মেজমামাকেও হয়তো বহুক্ষণ এই গুরুতর বিষয়টি লইয়া গবেষণা করিতে হইবে। কিন্তু ও হরি! মেজমামা তো একটুও ভাবিলেন না, উপরন্তু যে জবাব দিলেন তা শুনিয়া উল্টা বাচ্চুরই বড় লজ্জা হইল। মেজমামা বলিলেন, "আরে গাধা, ওগুলি যে ওয়ারলেসের এরিয়েল্!"

বাস্তবিক ওয়ারলেসের এরিয়েল কাকে বলে এ কথা জানে না বলিলে বাচ্চুর উপর বড় অবিচার করা হইবে। জিনিষটা কোন দিন চোখে দেখে নাই বলিয়াই না চিনিতে পারে নাই! ওয়ারলেস্ অর্থাৎ বেতারের কথা বাচ্চু ভাল করিয়াই জানে—অনেকের চেয়ে বেশী জানে। আজকালকার দিনে বেতারে কি রকম অসম্ভব অসম্ভব কাণ্ড ঘটিতেছে! এক সেকেণ্ডের মধ্যে পৃথিবীর এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে খবরাখবর পাঠান হইতেছে—অথচ ভিতরে টেলিগ্রাফের মত কোনও তারের যোগ নাই! এ সব কি আর বাচ্চু জানে না? গভীর সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বেতারে সে খবর পাইয়া অন্য জাহাজ তাকে উদ্ধার করিতে ছুটিল। ভীষণ মরুভূমির মধ্যে, দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কারক ভ্রমণকারী বিপদে পড়িল, অমনি বেতারে খবর আসিল, দলে দলে এরোপ্লেন চলিল তাকে সাহায্য করিতে। কোথায় কোন্ সুদূর সহরে

সভা হইতেছে, বক্তৃতা হইতেছে, তুমি এখানে নিজের ঘরে বসিয়াই ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে বক্তৃতা কান পাতিয়া শুনিতেছ। এমনি ধারা কত রকম সুবিধা বেতারের সাহায্যে পাওয়া যাইতেছে। এ সবও বাচ্চুর ভাল করিয়াই জানা আছে।

আর শুধু এ সবই নয়, কি ভাবে বেতারের আবিষ্কার হইল, কে আবিষ্কার করিলেন, কেমন ভাবে তিনি পরীক্ষা করিলেন এ সব অনেক খুঁটিনাটী খবরও বাচ্চু জানে। তার অনুরোধেই তো আমি আজ তোমাদের সে কাহিনী বলিতে বসিয়াছি।

গভীর সমুদ্রের তলায় বসিয়া বেতারে কথা বলার যন্ত্র

বেতারের আবিষ্কারকের নাম তোমরা অনেকেই বোধ হয় জান—আমি মার্কনি সাহেবের কথা বলিতেছি। মার্কনির বাড়ী ইটালী দেশে। তবে তাঁর উপর ইংরাজদেরও কিছুটা জোর আছে কারণ বাপ ইটালিয়ান্ হইলেও মার্কনির মা ইংলণ্ডেরই মেয়ে। ছেলেবেলা হইতেই মার্কনির আবিষ্কারের দিকে ভয়ানক ঝোঁক ছিল। বড় বড় আবিষ্কারকদের গল্প শুনিতে তিনি খুব ভাল বাসিতেন, আর তাঁর একটা প্রিয় খেলা ছিল নানা রকম যন্ত্রপাতি লইয়া টুক্‌টাক্ পরীক্ষা করা। বছর চৌদ্দ বয়সের সময়েই তিনি বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের লেখা অনেক বই পড়িয়া ফেলিলেন—বিশেষ করিয়া যে সব বইএ বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে নানা পরীক্ষার কথা লেখা আছে। এরই একটার উপর ভিৎ গাড়িয়া তাঁর আবিষ্কার সুরু হইল।

মার্কনির আগেই পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে আমাদের আশ-পাশে যে সব ফাঁকা জায়গা রহিয়াছে—যাকে আমরা আকাশ বা শূন্য বলি—সেগুলি ঠিক ফাঁকা নয়, তার সর্ব্বত্রই ইথার

নামে একটা জিনিষ ছড়ান আছে। এই ইথার জিনিষটা চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ দিয়াও বোঝা যায় না—আমাদের অন্য কোন ইন্দ্রিয়েই ধরা পড়ে না, কিন্তু এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের কোনও সন্দেহ নাই। শুধু তাই নয়, তাঁরা বলেন আলো জিনিষটা আর কিছু নয়, এই ইথারেরই ঢেউ। ধর, তুমি অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছ, তুমি যদি কোন উপায়ে আশ-পাশের ইথারটুকুকে ইচ্ছামত কাঁপাইতে পার তবে দেখিবে তোমার চারদিকে আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে এই কাঁপান'র মধ্যে একটু কারিকুরি আছে, ইথারকে কাঁপাইতে হইবে প্রতি সেকেণ্ডে ৪ কোটি কোটি বার হইতে ৮ কোটি কোটি বারের মধ্যে। তার কম-বেশী হইলে কিন্তু সে আলো আর দেখা যাইবে না।

পণ্ডিতেরা শুধু এই আবিষ্কারেই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁরা আরও প্রমাণ করিয়াছেন—ইচ্ছা করিলে ইথারে আলোর মত বিদ্যুতের ঢেউও সৃষ্টি করা যায়—যদি ইথারের কম্পন-সংখ্যাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা চলে। যায় বলিয়াই বেতারের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে, কেননা বিদ্যুতের সাহায্যে এক জায়গা হইতে অন্যত্র শব্দও পাঠান চলে।

প্রথম যিনি ইথারে বিদ্যুতের ঢেউ তুলিবার এবং তা' ধরিবার যন্ত্র লইয়া মাথা ঘামান তাঁর নাম হার্ট্‌জ্। হার্ট্‌জ্ ও রকম যন্ত্র তৈরী করিতেও ছাড়েন নাই, তবে প্রথম যন্ত্রে অনেক দোষ-ত্রুটী ছিল। সে সব শোধরাইবার আগেই পরলোক হইতে হার্ট্‌জের ডাক পড়িল।

কিন্তু হার্ট্‌জ্ চলিয়া গেলেও তিনি যে মস্ত একটা আবিষ্কারের আভাস দিয়া গেলেন তা'তেই কাজ হইল। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের নানা বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। এই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের বাংলার জগদীশ বসু আর একজন ছিলেন ইটালির মার্কনি। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক কাজ করিলেন, আমাদের জগদীশচন্দ্রও করিলেন, কিন্তু ব্যাপারটি সব চেয়ে নিখুঁত ভাবে হাসিল করিলেন মার্কনি সাহেব। মার্কনি এমন যন্ত্র তৈরী করিলেন যার সাহায্যে ইথারে ইচ্ছামত ছোট-বড় নানা আকারের ঢেউ তোলা যায় আর অনেক দূরে বসিয়া সে ঢেউ যন্ত্রের মধ্যে ধরা যায়। যন্ত্র তৈরী করিয়া তিনি ইংলণ্ডে আসিলেন, উদ্দেশ্য যন্ত্রটার একটা পেটেণ্ট লইবেন।

জেনারেল পোষ্ট অফিসের একটা ঘরে মার্কনির যন্ত্র বসান হইল; তিনি সেখান হইতে প্রায় একশ' গজ দূরে একটা বাড়ীর ছাদে বিনা তারে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া দিলেন। ইহাই প্রথম বেতার-বার্ত্তা। ইহার কিছু দিন পরে মার্কনি আবার একদিন বেতারে সংবাদ পাঠাইলেন—এবারে একেবারে দু' মাইল দূরে।

দেখিতে দেখিতে চারিদিকে মার্কনির জয় জয়কার পড়িয়া গেল। এমনি একটা অভাবনীয়

কাণ্ড কেউ কি ভাবিতে পারিয়াছিল ? শীঘ্রই ইংলণ্ড; ফ্রান্স ও ইটালীর নানা জায়গায়—বিশেষতঃ নৌবিভাগে বেতারের চলন আরম্ভ হইল।

কিন্তু মার্কনি জানিতেন তাঁর যন্ত্র এখনও নিখুঁত হয় নাই। গোপনীয় সংবাদ আদান-প্রদানের পক্ষে এ যন্ত্র খাটিবে না, কেননা যে কোন্ লোক হাতে যন্ত্র পাইলেই তা দিয়া ইথার-তরঙ্গ ধরিয়া সংবাদ জানিয়া লইতে পারে। তা ছাড়া বেশী দূরে—শত শত মাইল্ দূরে সংবাদ পাঠাইতে হইলেও তাঁর যন্ত্র কোন কাজে আসিবে না।

বেতারের আবিষ্কারক মার্কনি

সহজে হাল্ ছাড়িবার পাত্র মার্কনি নন, তিনি মাথা খাটাইয়া এমন একটা উপায় বাহির করিলেন যে সংবাদ পাঠাইবার এবং ধরিবার যন্ত্র ঠিক এক ভাবে খাটান না থাকিলে তা'তে শব্দ ধরা যাইবে না। কাজেই পাঠাইবার যন্ত্র ঠিক কি ভাবে খাটান আছে তা না জানা থাকিলে কেউ সে সংবাদ ধরিতেও পারিবে না। এই বিশেষ ভাবে যন্ত্র খাটানকে ইংরাজীতে "টুন্" করা বলে।

মার্কনি আরও দেখিলেন, ভাল করিয়া টুন্ করা যন্ত্রে শব্দ শুধু গোপনেই পাঠান যায় না—অনেকটা দূরেও পাঠান যায়। তখন তাঁর সাধ হইল, তিনি আটলান্টিক্ মহাসাগরের এপার হইতে ওপারে বেতারবার্ত্তা পাঠাইবেন। এই ব্যাপারের জন্য তিনি ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল জায়গাটি বাছিয়া লইয়া সেখানে তাঁর যন্ত্রপাতি বসাইলেন। তার পর সেখানে সব সরঞ্জাম ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়া একদিন হু'টি সঙ্গীসহ জাহাজে চাপিয়া আটলান্টিক্ পার হইয়া নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ডে আসিয়া হাজির হইলেন। কর্ণওয়াল হইতে এখানেই তিনি তাঁর বেতারবার্ত্তা পাঠাইতে চান।

বেতারে সংবাদ গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমে হু'টি মাস্তলের মত জিনিষ বসাইয়া তার গায়ে তার খাটাইতে হয়, তাকে বলা হয় এরিয়েল। নিউ ফাউণ্ড্ল্যাণ্ডে সমুদ্রের ধারটা শুধু পাথুরে পাহাড়ে ঘেরা, সেখানে এরিয়েল বসান সহজ কথা নয়। মার্কনি ঠিক করিলেন, তিনি একটা প্রকাণ্ড ঘুড়ি তৈরী করিয়া আকাশে উঠাইয়া দিবেন, আর সেই ঘুড়ির সঙ্গে এরিয়েল

বাঁধিয়া দিবেন। সিল্ক ও বাঁশের কঞ্চি দিয়া নয় ফুট লম্বা একটা ঘুড়ি তৈরী করা হইল, কিন্তু দেখা গেল সেটিকে আকাশে রাখা নেহাৎ সহজসাধ্য নয়। সমুদ্রের ধারে এমন প্রচণ্ড বাতাস বহিতে লাগিল যে সে ঘুড়ি ছিঁড়িয়া কোথায় উড়িয়া গেল! আবার ঘুড়ি তৈরী হইল, সেটিরও সেই দশা। এমনি ভাবে ঘুড়ির পেছনে ক্রমাগত বারো দিন খাটিয়া অবশেষে একদিন ডাঙ্গা হইতে চারশ' ফিট উপরে

মার্কনির সহকারীরা বিরাট্ ঘুড়ি উড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে, অদূরে মার্কনি দাঁড়াইয়া।

মার্কনির ঘুড়ি এরিয়েল সহ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মার্কনি সঙ্গে সঙ্গে কর্ণওয়ালে তাঁর সহকারীর কাছে টেলিগ্রাম করিলেন ঠিক তিনটার সময়ে যেন তারা 'এস্' শব্দটি টেলিগ্রামের সাঙ্কেতিক ভাষায় বেতারে পাঠাইতে থাকে এবং ঐ এক 'এস্' শব্দ যেন ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত পাঠান হয়।

কর্ণওয়ালের বেলা তিনটা মানে নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ডের বেলা সাড়ে এগারোটা। মার্কনির আবিষ্কার যদি সফল হয় তবে ঠিক সাড়ে এগারোটার সময়ে যন্ত্রের মধ্যে বেতারে 'এস্' শব্দটি ধরা পড়িবে। সাড়ে এগারোটা বাজিতেই মার্কনি আর তাঁর সঙ্গীরা যন্ত্রের মধ্যে কান লাগাইয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁদের মনের অবস্থাটা কল্পনা করিতে পার? কিন্তু বিধি যেন বাদ সাধিলেন, বাহিরে এমন জোরে বাতাস বহিতে লাগিল যে বেলা ১২টার সময়েও তাঁদের যন্ত্রে কোন কিছুই শোনা গেল না। তবে কি মার্কনির যন্ত্র ঠিক হয় নাই? এত বড় একটা আবিষ্কার তবে কি সত্যিই সম্ভব হইবে না? উদ্বেগে মার্কনির মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। কিন্তু পুরুষকারের কখনও পরাজয় হয় না; সহসা বাহিরে বাতাসের বেগ একটু কমিল, সঙ্গে সঙ্গে মার্কনিরও কানে আসিল—'ডট্ ডট্ ডট্'—'এস্'-এর সাঙ্কেতিক শব্দ। মার্কনির সঙ্গীরাও শুনিলেন। একবার, হু'বার, বার বার শুনিলেন। না, কোন ভুল হয় নাই, সত্যই কর্ণওয়াল হইতে আটলান্টিক্ মহাসাগর ডিঙ্গাইয়া বেতারে এই শব্দ আসিতেছে। মার্কনির পরিশ্রম তবে বিফল হয় নাই! বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় ঘটনা।

এমনি ভাবে মার্কনি দেখাইলেন, পৃথিবীতে দূরত্ব বলিয়া কিছু নাই—যদি কিছু থাকে মানুষের বুদ্ধির কাছে তাকে পরাজিত হইতে হইয়াছে। পৃথিবীর দুই প্রান্তে দু'জন লোক দাঁড়াইয়া, তাদের সম্মুখে শুধু দু'টি যন্ত্র, মাঝখানে আর কোন রকম যোগসূত্র নাই, অথচ তারা কথাবার্ত্তা বলিতেছে ঠিক যেন মুখোমুখী দাঁড়াইয়া। এ কথা কি কেহ কখনও ভাবিতে পারিয়াছিল? অথচ এত বড় কাণ্ডটা যার দ্বারা সম্ভব হইল সে লোকটির বয়স তখন কত জান? মাত্র সাতাশ বছর।

এই ঘটনার পর ৩৫ বছর চলিয়া গিয়াছে। মার্কনি এখন বুড়া হইয়াছেন। ইতিমধ্যে বেতারে আরও কত না উন্নতি হইয়াছে এবং হইতেছে! মার্কনি নিজেও করিয়াছেন, অপরেও করিয়াছে। ইতিমধ্যেই বেতারে শব্দ পাঠান ছাড়া ছবিও পাঠান সম্ভব হইয়াছে। পণ্ডিতেরা আশা করেন ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড মানুষ বেতারের সাহায্যে সম্পন্ন করিবে। আমাদের বাচ্চুও তখন হয়তো আর লজ্জায় পড়িবে না, কারণ তখন সহরের মত পাড়াগাঁয়েও সমান ভাবে বেতারের চলন হইবে।

ঘুমপাড়ানী গান

(শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ)

ঐ আস্‌ছে হালুম্ বুড়ো, ঘুমো, খোকা ঘুমো,
চুপটি ক'রে ঘুমোও যাদু, দেবো সোনার চুমো।
আকাশ থেকে আসবে পরী ঘুমের মাণিক হাতে,
ঐ বুঝিরে নাম্‌লো এসে ঠাকুর-ঘরের ছাতে।
মাণিক আমার, সোনা আমার, যাদু আমার, ঘুমো,
সকাল হ'লে সূয্যিমামা দেবে সোনার চুমো।

হুমোপাখী ডাক্‌ছে বসে বাব্‌লা গাছের ডালে,
ছাদের গায়ে মাকড়সাটা নাচ্‌ছে কেমন জালে;
আজ্‌কে রে ঐ বাঁশ-বনেতে পেত্নী-মাসির বিয়ে
ভূত মাম্‌দো নাচ্‌বে সেথায় বরযাত্তর গিয়ে।

ঝিঁঝির ঝিঁঝির ডাক্‌ছে ঝিঁঝি, ঘুমো খোকা, ঘুমো,
ক্ষীর-সাগরের ঢেউয়ের দোলা দেবে সোনার চুমো।

আকাশ পথে ঐ চলেছে পক্ষীরাজের ঘোড়া,
তীরের মত ছুট্‌তে পারে নেইকো তাহার জোড়া;
ঘুম-কুমারী ঘুমায় যেথা লক্ষ্মী মেয়ের মত
চোখের পাতায় সোনার কমল ফুট্‌ছে কত শত,
সেথায় কেমন ঘুম-পাখীরা গাইছে 'ঘুমো ঘুমো,'
বাতাস এসে ঘুমন্তদের খাচ্ছে মিঠে চুমো।

গুম্‌রে কাঁদে মেঘলা আকাশ ঘুমো, খোকা, ঘুমো—
লক্ষ্মী হ'লে সবাই কেমন দেবে সোনার চুমো;
খেল্‌না দেবে, পুতুল দেবে, দেবে কলের-গাড়ী,
দুষ্টু হ'লে সবাই মিলে করবে এসে আড়ি।
রাত্রি অনেক হ'ল মাণিক, এই বেলাটি ঘুমো,
সকাল হ'লে ভোরের আলো দেবে সোনার চুমো।

জ্যান্ত 'পিসে'র শ্রাদ্ধ

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়)

মুরারিমোহন মুখুয্যে কৃপণ, বেশ নাম করা কৃপণ—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু হাজার কৃপণ হ'লেও মানুষের মনের কোণে একটুও দয়ামায়া থাকে, এবং বাইরের ব্যবহারে সামান্য একটু ভদ্রতাও থাকে; কিন্তু এ লোকটীর যে তাও ছিল না সেদিন তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

মুরারি বাবু কলকাতায় এসে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ জমিয়েছেন—খরচ আর করেন নি—শুধু ভাত কাপড়ের খরচটী ছাড়া?

আদিত্য রায় আর মুরারি বাবু একই গ্রামের লোক, আর মুরারি বাবু সম্পর্কে আদিত্যের পিসেমশায়ও হন। আদিত্যদের গ্রামে সেবার একটা পাড়ায় লাগল ভীষণ আগুন। ফলে

কয়েক জনের জীবন নাশ হ'ল, আর বাকী যা'রা কোনও রকমে বেঁচে গেল তা'রা হ'ল গৃহহীন। আদিত্যের প্রাণ পরের দুঃখে কেঁদে উঠ্ল, দোরে দোরে চাঁদা তুল্ল, কিন্তু তা যথেষ্ট হ'ল না, কারণ গ্রামে সকলেরই ত অবস্থা অতি খারাপ। আদিত্যের হঠাৎ খেয়াল হ'ল, কল্কাতায় মুরারি বাবুর কাছে গেলে নিশ্চয় বেশ মোটা কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। পাড়ার লোকে ম্লান হেসে বল্ল, "মুরারি বাবু কর্বেন সাহায্য, তা হ'লেই হয়েছে!"

আদিত্য বল্লে, "এত বড় একটা দুঃখের ব্যাপার শুন্লে তিনি সাহায্য করবেন না—এ হ'তে পারে কখনও? বারোয়ারী পূজা, থিয়েটার-বায়োস্কোপ এমন কি কন্যাদায় বা বন্যাদায়ে তিনি চাঁদা না দিতে পারেন, কিন্তু নিজের গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ—আর অনেকে তাঁর আত্মীয়ও; তা'দের এ দুঃখের কথা শুনে—না, তা হ'তে পারে না, হাজার কৃপণ হ'লেও মানুষ ত?'

আদিত্য আর বিনয় নামে তাদেরই গ্রামের আর একটী ছেলে চলে এল কল্কাতায়, দেখা কর্ল মুরারি বাবুর সঙ্গে, তাঁকে সমস্ত ব্যাপার জানাল এবং শেষে অত্যন্ত কাতর ভাবে তাঁর কাছে চাইল কিছু সাহায্যভিক্ষা। মুরারি বাবু যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসে রইলেন, মুখের একটু ভাব পরিবর্ত্তন হ'ল না, শুধু বল্লেন, "ও সব হ'বে না এখানে, অন্যত্র চেষ্টা দেখ।"

আদিত্য এবং বিনয় দু'জনে অতি কাতর ভাবে বল্ল, "তা'রা সব নিরাশ্রয়, ছোট ছেলেপিলে নিয়ে গাছতলায় রয়েছে; কিছু চাঁদা উঠেছে, আপনি কিছু দিলে তাদের খান কয়েক চালা ঘরও···"

তা'দের আবেগে বাধা দিয়ে বল্লেন মুরারি বাবু, "অন্যের চালাঘরের খড় যোগাবার জন্য আমি পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে পয়সা রোজগার করি নি; এখানে এক পয়সাও মিল্বে না—তোমরা যাও!"

আদিত্য জীবনে কখনও অযথা চেঁচামেচি করে না, কিন্তু দুষ্টের দমন সে কর্তে জানে, কিন্তু সে অতি নীরবে। বিনয় কিন্তু তখন অত্যন্ত ক্ষেপে উঠেছে। সে বল্লে, "মশাই, আমরা যাচ্ছি, আপনার এখানে থাক্তে আসি নি। ভেবেছিলাম যত বড়ই কঞ্জুস হ'ন না কেন, হৃদয় বলে একটা জিনিষ আপনারও নিশ্চয় আছে। কিন্তু এখন দেখ্ছি আপনি হৃদয়হীন। এত টাকা জমিয়ে কর্বেন কি? বয়স ত ষাটের কাছাকাছি, মরণের দিন ঘনিয়ে আস্ছে; মরণের পর সমস্ত টাকা যে বারো ভূতে উড়িয়ে দেবে! আজকে এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত খেতে দিলেন না, আপনি মর্লে শ্রাদ্ধ খেতে আস্ব; নিশ্চয়ই খুব জমকালো শ্রাদ্ধই হ'বে তখন!"

আদিত্য যেন মহা এক চিন্তায় মগ্ন। ওর মুখ থেকে সে কাতর ভাব কেটে গেছে, ও যেন কি একটা ফন্দি আঁটবার চেষ্টা কর্ছে।

বিনয়ের এত কথাতেও মুরারি বাবুর ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হ'ল না, শুধু একটু খেঁকি

হাসি হেসে বল্লেন, "ওহে বাপু, সে গুড়েও বালি, উইল ক'রে রেখেছি, আমার শ্রাদ্ধে শুধু শ্মশান-বন্ধু ক'জন খাবে; আর ছেলেকেও বলে রেখেছি আমি ম'লে আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় যেন বন্ধুর সংখ্যা না বেড়ে যায়। চারজন, নিদেনে পাঁচজন—একজন না হয় বেশী থাক্বে কাঁধ বদ্লাবার যদি দরকার হয়—"

মুরারি বাবু এই কথা বলার একটু পরেই আদিত্যর মুখের চিন্তাকুল ভাবটা একেবারে কেটে গেল, সে যেন ভীষণ অন্ধকারের মাঝে কিসের আলো দেখ্তে পেয়েছে। বিনয়কে বল্ল, "চল বিনয়, উনি যখন কিছুতেই কিছু সাহায্য দেবেন না বল্ছেন তখন মিথ্যা পীড়াপীড়িতে লাভ কি? আচ্ছা পিসেমশায়, তা হ'লে চলি!" বলে সে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। মুরারি বাবু প্রায় এক রকম তা'দের মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রাস্তায় বা'র হ'য়েই আদিত্য বিনয়কে বল্লে, "গোটা পাঁচেক টাকা বেশী আছে?"

বিনয় একটু অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্ল "কি হ'বে?"

আদিত্য বাধা দিয়ে বল্লে, "সে পরে বল্ব, টাকা আছে?"

"আছে।"

"তা হ'লে দাও" বলে আদিত্য বিনয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা প্রেসে গিয়ে উঠ্ল। বিনয় দেখ্ল যে আদিত্য প্রেসের লোকেদের সঙ্গে দু'একটা কি কথা বলার পর একটা কাগজে কি লিখ্ল তাড়াতাড়ি, তারপর সেই কাগজটা প্রেসের লোকেদের হাতে দিয়ে বল্লে, "ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে চাই কিন্তু।" বলে তাদের হাতে একটা টাকা দিয়ে বা'র হয়ে এল।"

বিনয় ব্যাপারটা কিছুই বুঝ্তে পার্ছিল না, তবে আদিত্যকে সে চিন্ত বাল্যকাল থেকেই। তার হঠাৎ এ রকম ভাবপরিবর্ত্তন আর এই সব কাণ্ড দেখে এইটুকু সে বুঝ্ল যে শীঘ্রই এমন একটা কিছু ঘট্বে যাতে আদিত্যর পিসে, অর্থাৎ মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আর দুর্গতির সীমা থাক্বে না।

বাইরে এসে বিনয়কে আদিত্য বল্লে, "এবেলা তো ট্রেন নেই, ট্রেন তো সেই সন্ধ্যা সাতটায়; চল, দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্—"

যাই হো'ক সন্ধ্যাবেলা তারা ষ্টেশনে এসে হাজির হ'ল; আদিত্যর হাতে তখন এক তাড়া ছাপান কার্ড।

এর পর কয়েক দিন গেছে কেটে; সেদিন সকাল বেলা বাইরের ঘরে বসে মুরারি বাবু গল্প কর্ছেন তাঁরই এক বন্ধুর সঙ্গে। বল্লেন, "দেখ দিকিন, কোথায় গ্রামে পুড়ল কার ঘর, টাকা দিতে হ'বে এই মুরারি মুখুয্যেকে! যেন সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে, মাথার ঘাম পায় ফেলে টাকা রোজগার করেছি ওদের ঐ ঘরের চাল তৈরী কর্বার জন্য! গিন্নীর সেই

অতিজ্যাঠা ভাইপোটি এসেছিল টাকা চাইতে। তার সঙ্গে এসেছিল আর একটা ছোঁড়া, সে বেটা ভীষণ প্যাজি। বলে কি জান, বলে 'এখন না হয় কিছু খেতে দিলেন না, আপনি মর্‌লে, তখন শ্রাদ্ধ খেতে আস্‌ব ; নিশ্চয় জমকালো রকমের শ্রাদ্ধ হবে'। বেটাদের সে গুড়ে বালি ! বুঝেছ হে নবীন, উইল করেছি সব স্ত্রীর নামে, পাছে খোকাটাকে ছেলেমানুষ পেয়ে কেউ ঠকিয়ে নেয়—আর এও উইলে লিখে রেখেছি যে আমার শ্রাদ্ধে শ্মশানবন্ধু ক'জন ছাড়া আর কা'কেও যেন খাওয়ান না হয়। আর খোকাকে বলে রেখেছি যে এই শ্মশানবন্ধুদের সংখ্যা যেন চার-পাঁচজনের বেশী না হয় !" তার পর একটু টেনে টেনে হেসে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "মুরারি মুখুয্যে অত বোকা নয়, আটঘাট বেঁধে কাজ করে। আমি মরি, আর আমার টাকায় পাঁজজনে স্ফূর্ত্তি করুক। খোকাকে বলেছি যে, লোকে বলে শ্রাদ্ধে যত বেশী লোকজন খাওয়াবে তত তৃপ্তিলাভ কর্‌বে মৃতব্যক্তির আত্মা। ওসব বাজে কথা—অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে। শ্রাদ্ধে যত কম লোক খাওয়াবে তত তৃপ্তিলাভ কর্‌বে আমার আত্মা।"

মুরারি বাবু এইভাবে খুব খানিকটা আত্ম-প্রসাদ নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকেছেন, একটু বাদেই বাইরে একটা শব্দ শোনা গেল—একেবারে মড়া কান্না "ওরে মুরারি রে, ওরে ভাই মুরারিমোহন আমার ! তুই আমাকে ফেলে কোথায় গেলি রে দাদা !"

কি সর্ব্বনাশ, এ আবার কি ? সকলে ছুটে গেল, গিয়ে দেখ্‌ল যে, মুরারি বাবুর সত্তর বছরের বুড়ো এক বোন তাঁর এক নাতি আর নাতনীকে সঙ্গে করে এসেছেন—বহু দূর থেকে। মুরারি বাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, বল্লেন, "সে কি দিদি, আমি মরেছি এ কথা তোমায় কে বল্লে, আমি তো মরিনি, এই তো বেঁচে আছি !" মুরারি বাবু যেন আকাশ থেকে পড়্‌লেন।

দিদি প্রথমটায় বিশ্বাসই করেন না, অনেক করে আলো ধরে মুরারি বাবুর মুখ চোখ গা হাত পা দেখে বল্লেন, "হ্যাঁ মুরুরিই বটে ! বেঁচে আছিস দাদা, য়্যাঁ—আহা ভাল, ভাল ! যদি বেঁচেই আছিস তা হ'লে ঘোড়ার গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে, ভাড়াটা মিটিয়ে দে। আর রাতে আমার জন্য ফল, ছানা আর দুধের বন্দোবস্ত কর্ ; আর হ্যাঁ, পচার জন্য একটু লেবু দিয়ে সাবু—ওর কাল থেকে জ্বর হয়েছে কিনা ! আর খেঁদি, ও লুচিই খাবে—ওরে ও খেঁদি, কোথা গেলি ?"

খেঁদি একটু পেছিয়ে ছিল, ঘোড়ার গাড়ী থেকে পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লীগুলি নামাচ্ছিল, সে এগিয়ে এসে মুরারি বাবুকে দেখেই কি রকম হয়ে গেল। হঠাৎ ওর চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, শুধু মুখ দিয়ে বার হ'ল—'দিদ্দিমা, দাদু ভূত'—আর পরে গোঁ গোঁ কর্‌তে লাগ্‌ল। তাকে কিছুতেই বোঝান গেল না যে তার দাদু ভূত হয়নি, মানুষই আছে। মুরারি বাবু 'থ' হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখন আর কোন কথা বলার সময় নেই, কাজে বেরোবার বেলা হয়ে গেছে। ফিরে এসে তিনি বোঝাপড়া করবেন।

বৈকালবেলা মুরারি বাবু তাঁর কাজ থেকে বাড়ী ফিরে যা দেখ্‌লেন তা'তে তাঁর চৈতন্যলোপ হওয়ার যোগাড়। সমস্ত বাড়ী লোকে লোকারণ্য—অতি নিকট সম্পর্ক থেকে অতি দূর সম্পর্কের তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজন সকলেই উপস্থিত। কেউ অতিবৃদ্ধ, কেউ আধা বৃদ্ধ, কেউ যোয়ান, কেউ বা অতি-কচি ; স্ত্রী, পুরুষ সব ! মুরারি বাবু যখন একটু ধাতস্থ হ'লেন তখন ব্যাপার যা শুনলেন তা'তে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল; চোখে সর্ষের ফুল দেখলেন, পা টল্‌তে লাগ্‌ল—ঘরে আর উঠ্‌তে পার্‌লেন না, দরজার সামনেই বসে পড়লেন। এঁরা নাকি সবাই তাঁর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতে এসেছেন বিদেশ থেকে ! সকলেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়েছেন।

মুরারি বাবু হঠাৎ ঐ মুহ্যমান অবস্থায় একেবারে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "সব শয়তানী, মিথ্যা কথা ! আমি জল-জ্যান্ত বেঁচে আর আমার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠিয়েছে খোকা ? এ হতে পারে না কক্ষণো— দেখি, দেখি কার কাছে চিঠি আছে ?"

সত্যিই তো !

তখন তাঁরই একজন আত্মীয় দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "মজাদারি পেয়েছ নাকি মুরারি দা, বেঁচেই থাক আর মরেই যাও, এ রসিকতার মানে কি ? শ্রাদ্ধের চিঠি লিখিয়ে এখন মজা মারা হচ্ছে ! এই দেখ চিঠি" বলে পকেট থেকে একখান পোষ্ট কার্ড বার কর্‌লে। মুরারি বাবু অবাক্ হয়ে গেলেন, সত্যিই তো এ যে তাঁর শ্রাদ্ধেরই নিমন্ত্রণের চিঠি ! তলায় তাঁরই একমাত্র পুত্র সমীরের নাম লেখা। শুধু নিমন্ত্রণের চিঠিই নয়, চিঠির নীচে পুনশ্চ দিয়ে লেখা রয়েছে "আপনাদের

আত্মা চাই-ই। ৺পিতাঠাকুরের শেষ ইচ্ছা যে, যেন তাঁর শ্রাদ্ধে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন আসেন, তাঁদের যাতায়াতের সমস্ত খরচ যেন দেওয়া হয় এবং এ ছাড়া প্রত্যেককে ধুতি চাদর এবং কিছু টাকাও দেওয়া হয় যেন। তাঁর জীবিত-অবস্থায় তিনি আত্মীয়দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন নি, তার জন্য তিনি অনুতপ্ত; তাঁর শ্রাদ্ধে আত্মীয়-স্বজনে পরিতৃপ্ত হয়ে খেলে তাঁর অনুতপ্ত আত্মা খানিক শান্তিলাভ করবে।"

মুরারি বাবু এবার একেবারে ক্ষেপে গেছেন, চীৎকার করে বলে উঠলেন, "বেরোও, বেরোও সব আমার বাড়ী থেকে, জাল-জুয়াচুরীর আর জায়গা পাওনি?" বলে তিনি দু'একজনের হাত ধরে বল্লেন, "বেরিয়ে এস, বেরিয়ে।"

যারা এসেছিল তারা তো এমনিই ভীষণ চটে গিয়েছিল এই মিথ্যা নিমন্ত্রণের ব্যাপারে। তার পর যখন মুরারি বাবু গালি-গালাজ করে দু'একজনকে স্বয়ং বাড়ীর বার করে দিতে গেলেন তখন এক মহা হুলুস্থুল বেধে গেল। দু'চারজন যোয়ান যোয়ান ছোকরা এগিয়ে এসে মুরারি বাবুর হাত চেপে ধরে বল্লে "বেশী 'চালাকী ক'র না, টুঁটি টিপে মেরে ফেলে সত্যিকারের শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত করব। যদি ভাল চাও তো এখনি আমাদের সকলের রাত্রির খাওয়ার এবং থাকার বন্দোবস্ত কর; আর ধুতি চাদর ও সব ছেড়ে দাও—প্রত্যেকের যাতায়াতের খরচ দিয়ে দাও। কাল সকালে আমরা চলে যাব। বাঁচতে যদি চাও তা হ'লে যা বল্লাম তাই কর!" যোয়ান ছোকরাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে মুরারি বাবুর আর কথা বল্‌তে সাহস হ'ল না, ওরা যে কোনও মুহূর্ত্তে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু এই এতগুলি—প্রায় একশ'—লোকের খাওয়া আর পথ-খরচ—উঃ, সে যে প্রায় চার-পাঁচশ' টাকা! বৃদ্ধ মুরারি বাবু হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করতেই হ'ল; অনেক খোঁজাখুঁজি করে ঠাকুর আনা হ'ল, জিনিষপত্র এল, রান্না সুরু হ'ল।

রাত্রি প্রায় একটার সময় মুরারি বাবু সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর নিজেরই শ্রাদ্ধের ভোজ খাইয়ে তবে ছাড়া পেলেন, এবং পরদিন প্রত্যেককে পথখরচ দিয়ে বিদায় করে তবে নিস্তার পেলেন। একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি; সমস্ত আত্মীয়-স্বজনই এসে মুরারি বাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেল, কেবল আসেনি আদিত্য। মুরারি বাবু দু'একদিন পরে তা'র একটা চিঠি পেয়েছিলেন, তা'তে লেখা ছিল, "পিসেমশায়, আপনার মৃত্যুর পর আপনার শ্রাদ্ধে তো লোকজন কেউ খাওয়াবেন না বলেছিলেন কিন্তু সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে যে আপনার জীবিত অবস্থাতেই আপনার নিজের শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে এত পরিতৃপ্ত করে আহার করিয়েছেন এ কথা শুনে মহা আনন্দ লাভ করেছি। আমি নিজে যেতে পারিনি বলে মহা দুঃখিত, ক্ষমা করবেন।

"আর হ্যাঁ, আপনার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপানর খরচ বাবদ যদি আমাকে পাঁচ টাকা নয় আনা পাঠিয়ে দেন তো বড় উপকৃত হই। ইতি— আপনার সেবক আদিত্য"।

মুরারি বাবু চিঠি ছাপানর খরচ বাবদ ও টাকাটা আদিত্যকে পাঠিয়েছিলেন কিনা তা ঠিক বল্‌তে পারি না—আদিত্যকে জিজ্ঞাসা করলে সে হয়তো বল্‌তে পারে।

সভ্যতার গোড়াপত্তন

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ)

স্নেহের মণ্টু,

স্বপ্নের ভেতর দিয়ে তোমার ঠাকুরদাদার ছেলেবেলাকার বঙ্গদেশে যেতে পার কি? মনে কর, তোমার জন্মের দিন একশ' বছর পিছিয়ে গেছে। তখন জাহাজ সম্বন্ধে হয়তো তোমার একটা ধারণা ছিল। "উড়ো-জাহাজ" বলতে, যে রকমই হোক, একটা ধারণাও তুমি করতে পারতে বটে—কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তোমার সে ধারণার যে কোনও মিলই থাকা সম্ভব ছিল না এ কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে; এখন সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে তোমার পড়বার ঘরে বিজলীবাতি জ্বলে ওঠে, তারই উজ্জ্বল আলোতে তুমি পড় The Tales the Letters tell. তোমার ঠাকুরদাকে পড়তে হত টিম্‌টিমে মাটীর প্রদীপে। পূজার ছুটির নামেই তোমার আনন্দের সীমা থাকে না; ছুটির এক মাস আগে থাকতেই কোথায় বন্ধটা কাটাবে তার জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। তোমার এটুকু বয়সেই তুমি কত নূতন দেশ, কত রকমের লোক দেখেছ। আর তোমার ঠাকুরদার জীবন ছিল সীমাবদ্ধ— বহু দিন অবধি তাঁর গণ্ডী ছিল ছোট্ট গ্রামটি।

এই একশ' বছরের ভেতরই কত নূতন নূতন জিনিষের সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটেছে। যখন তোমার যে জিনিষের দরকার তাই তুমি পেয়েছ। কিন্তু কি রকম করে পেয়েছ তা কোনদিন ভেবে দেখেছ কি? কত যুগের সাধনা, কত নিঃস্বার্থ লোকের আত্মত্যাগ, কত অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে যে তোমার দরকার মেটানো সম্ভব হয়েছে তা হয়তো তুমি জান না। এ রকম ভাবে যদি একশ' বছর করে ক্রমে ক্রমে পেছিয়ে যাও তবে তুমি এমন এক সময়ে পৌছুবে যখন লোকের সম্বলের মধ্যে ছিল কেবলমাত্র তাঁর দুখানি হাত। আর কোন সম্পত্তিই তাদের ছিল না। জামা-কাপড় বুনতে অথবা পরতে তারা জানত না। আগুনের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সোনা, লোহা প্রভৃতি ধাতু কি তা তাদের অজানা ছিল। তারা কোন একটা উপায়ে নিজেদের মনোভাব জানাত বটে কিন্তু কোন লিখিত ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। তাদের শিখিয়ে দেবার লোকেরও সম্পূর্ণ অভাব ছিল। তাদের সমস্তই

নিজে নিজে শিখে নিতে হয়েছে। এইভাবে প্রত্যেক দেশের লোকের নিজ নিজ চেষ্টার ফলে পৃথিবীর সভ্যতা আজ এত উঁচু স্তরে পৌঁছুতে পেরেছে।

গুহামানুষ

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা বোধ হয় আরও পরিষ্কার হবে। অষ্ট্রেলিয়ার নীচে যে দ্বীপটি আছে তার নাম যে ট্যাসমানিয়া তা বোধ হয় তুমি জান। এই দ্বীপটি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের অনেকটা বেড়ে গেছে। প্রায় একশ' বছর আগে এই অদ্ভুত দ্বীপটি পর্য্যটকদের চোখে পরে। তখন পর্য্যন্ত ট্যাসমানিয়ার আদিম অধিবাসীরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মতই জীবন যাপন করত। তারা কাপড় পর্‌ত না; বাড়ী ঘর তৈরী করতে জান্‌ত না; তীরধনুক তৈরী করে কি ভাবে তার সাহায্যে জীবজন্তু শিকার করা যেতে পারে তার কোন ধারণাই তাদের ছিল না। তারা এক অদ্ভুত উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ কর্‌ত। এক টুকরা শক্ত গাছের ডালের সঙ্গে তারা একটা ধারালো পাথরের নুড়ি বেঁধে নিত। এই বর্শার পূর্ব্বপুরুষের সাহায্যে শিকার ঘায়েল করতে তাদের ক্ষিপ্রতা আসাধারণ ছিল। এই সব পশু-পাখীর মাংসই তাদের একমাত্র খাদ্য ছিল। এমন কি তারা মাছ পর্য্যন্ত ধরতে জান্‌ত না। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিরও বিশেষ বিকাশ হয় নি। এই উলঙ্গ গৃহহীন জাতি নিজের নিজের স্বার্থ

নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু তবুও তারা পৃথিবীর একেবারে আদিম অধিবাসীদের তুলনায় অনেক পরিমাণে সভ্য ছিল, কেননা তারা আগুন তৈরী করতে জান্‌ত। যেদিন মানুষ আগুন তৈরী করতে শিখ্‌ল সেদিনই তারা সভ্যতার দিকে অনেকটা এগিয়ে গেল। তুমি হয়তো ভাব্‌বে যে আগুন তৈরী করা আর এমন একটা শক্ত কাজ কি? একটা দেশলাইএর কাঠি জ্বালালেই তো আগুন জ্বলবে, এবং একটি দেশলাইএর কাঠিই একটি প্রকাণ্ড সহর পুড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই সামান্য আগুন তৈরী করতে কত হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, কত পরীক্ষার পর পরীক্ষার ফলে যে আগুন জ্বলেছে সে খবর তুমি জান কি? ট্যাসমানিয়ার লোকদের সভ্যতার যে স্তরে পাওয়া গিয়েছিল সে স্তরে উঠতে কত হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে সাধনা করতে হয়েছে! গ্রীসপুরাণের যে ছেলেটি স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে মানুষকে দিয়ে দেবতাদের রোষে আজীবন অমানুষিক শাস্তিভোগ করা সত্ত্বেও জগতের সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তার গল্প নিশ্চয়ই জান। সে গল্প হচ্ছে মানুষের প্রথম আগুন আবিষ্কারের রূপক। আবার পার্শীদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা হচ্ছে অগ্নি। পার্শীদের যে কোন মন্দিরে যাও, দেখবে যে একটা কুণ্ডের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বল্‌ছে। সে আগুন যে প্রথম কবে জ্বলেছিল তা কেউ বলতে পারে না। একবার যখন আগুন জ্বল্‌ল তখন মানুষ অনেক কিছু জ্ঞানেরই অধিকারী হ'ল। সভ্যতার পরের স্তরগুলিতে পৌঁছান তখন তার পক্ষে খুবই সহজ হয়ে গেল। তখন সে শিখ্‌ল কি করে সেই আগুনে মাটি পুড়িয়ে বাসনপত্র তৈরী করতে হয়। তার পর হ'ল ধাতুর আবিষ্কার। সেই ধাতু আগুনে গলিয়ে একদিকে আরম্ভ হ'ল চাষবাস; এবং অন্যদিকে আরম্ভ হ'ল নূতন নূতন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ। যে জাতি সর্ব্বপ্রথম ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রের দ্বারা চাষ করতে এবং অস্ত্র তৈরী করতে শিখল সেই জাতির প্রাধান্যের কাছে অন্য সমস্ত জাতিকেই মাথা নোয়াতে হ'ল।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম আগুন তৈরী করতে শিখল ইজিপ্ট (মিশর), ব্যাবিলন এবং কারো কারো মতে ভারতের সিন্ধুপ্রদেশের আদিমতম অধিবাসীরাই। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার নূতন আবিষ্কারের কথা 'রামধনু'তে পড়েছ, এবং এ বিষয়ে কিছু কিছু ধারণাও নিশ্চয়ই তোমার আছে। কিন্তু সে বিষয়ে চরম মীমাংসা আজও হয় নি। কাজেই ও আলোচনা আপাততঃ মুলতুবি রইল।

ইজিপ্ট এবং ব্যাবিলন যে কোথায় তা বোধ হয় বলে দিতে হবে না। ইটালী এবং আবিসিনিয়ার মধ্যে যুদ্ধের কল্যাণে আবিসিনিয়ার মানচিত্রের সঙ্গে পরিচয় তোমার নিশ্চয়ই আছে। ঐ আবিসিনিয়া থেকে একটা নদী বেরিয়ে পরে আর একটা নদীর সঙ্গে মিলে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। সেই মিলিত স্রোতের নাম নীল নদ। সেই নীল নদের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর উর্ব্বরতম দেশগুলির একটি; এই ভূমিভাগের নামই হচ্ছে ইজিপ্ট। এসিয়াতে টাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস নামে

যে দু'টি নদী উত্তর দিক্ থেকে এসে একসঙ্গে পারস্যোপসাগরে মিশেছে সেই দু'টি নদীর মাঝখানের পাহাড়ে জায়গাটির দক্ষিণ অর্দ্ধের নাম ব্যাবিলন এবং উত্তর অর্দ্ধের নাম আসিরিয়া। আসিরিয়া আগে ব্যাবিলনের লোকদের হাতেই ছিল। কিন্তু পরে তারা কেবলমাত্র ব্যাবিলন নয়, পৃথিবীর বহু দেশই জয় করে নেয়।

নীল নদ

এই দেশগুলির আদিমতম অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমরা খুব অল্পই জানতে পারি। তারা এমন কিছু রেখে যায়নি যা থেকে তাদের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা সম্ভব। তাদের তৈরী পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র কিছু কিছু আমরা পেয়েছি। কিন্তু তা থেকে তারা যে মানুষের প্রথম অবস্থা থেকে বিশেষ কিছু উন্নতি করেছিল এমন কোন প্রমাণ আমরা পাই না। তাদের জীবনযাত্রার রীতির সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি না। এইমাত্র অনুমান আমরা করতে পারি যে আধুনিক আফ্রিকার অসভ্য অধিবাসীদের মতই তারা মাটির তৈরী বাড়ীতে থাকৃত এবং চামড়ার পাত্র ব্যবহার করত। কিন্তু কবে তারা আগুন তৈরী করতে শিখ্‌ল, এবং মাটির বাসনপত্র বানাতে শিখে ইজিপ্টে এবং ব্যাবিলনে এক নূতন যুগের সূত্রপাত করল তা ঠিক করে বলা অসম্ভব। এতদিন প্রকৃতি তাদের যা দিয়েছিলেন তাই তারা সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবহার করত। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার করে বুঝতে পারবে। মনে কর তুমি একজন আদিম অধিবাসী। একদিন জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে তুমি একটা ধারালো পাথর পেলে এবং সামনের গাছে একটা পাখী দেখে তাকে লক্ষ্য করে সেই পাথরটা ছুড়ে দিলে। দৈবক্রমে সেই পাথরের টুকরোটা পাখীটার গায়ে বিঁধে গেল এবং সে মরে মাটিতে পড়ে গেল। এই ব্যাপারটা থেকে তুমি এই শিখ্‌লে যে ধারালো পাথর পাখীর গায় লাগ্‌লে পাখী মরে যায়। তখন থেকে ধারালো পাথর সংগ্রহ করা এবং পাখী মারা তোমার একটা কাজ হয়ে দাঁড়াল। তোমার দেখাদেখি হয়তো

আরও অনেকে পাথর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল। পাথরের টুক্‌রোর ব্যবহারের ফলে পাথরের টুক্‌রো একটা অস্ত্রে দাঁড়িয়ে গেল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মধ্যে বুদ্ধির কোন বিকাশ দেখা যায় নি; কিন্তু যখন তোমার অস্ত্রের ধার কমে যাওয়াতে তুমি তাকে আবার ধার দিতে শিখলে তখনই আরম্ভ হ'ল তোমার বুদ্ধির বিকাশ। তখনই তুমি সভ্যতার দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলে। কোনও জিনিষের প্রথম আবিষ্কার হঠাৎই হয়, কিন্তু সেই আবিষ্কারের উপর উন্নতির ভার মানুষের হাতে। যেদিন সে সেই উন্নতি করতে শিখ্‌ল সেদিনই তো সভ্যতার আরম্ভ। আদিম অধিবাসীরা যে কি রকম করে এই সব পাথরের টুক্‌রো অস্ত্ররূপে ব্যবহার করত এবং এই সামান্য পাথরের টুক্‌রো যে কি রকম মারাত্মক হতে পারত তা আমরা জানতে পারি আদিম মানুষের পাহাড়ের উপর খোদাই করা বিস্তর ছবি থেকে। মানুষের প্রধান অস্ত্র—বুদ্ধি, তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত জীবজন্তুই তার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে।

বুদ্ধির কাছে শক্তির পরাজয়

অনেক বলেন পৃথিবীর প্রথম সভ্য দেশ ইজিপ্ট, (যদিও আজকাল পণ্ডিতদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যাচ্ছে)। ইজিপ্টের লোকরা বহু পূর্ব্বে মাটির বাসনপত্র তৈরী করতে শিখেছিল। কিন্তু তারা কি করে এবং কোথা থেকে এ কাজ শিখল তা আজও জানা যায় নি। মাটি খুঁড়বার ফলে যে সমস্ত মাটির পাত্র আমরা পেয়েছি তার বয়সও ঠিক করে বলা প্রায় অসম্ভব। নীলনদের ইতিহাসের সঙ্গে ইজিপ্টের ইতিহাস জড়িত। নীলনদের দু'পাশের মাটি খোঁড়ার ফলে প্রস্তরযুগের অনেক নিদর্শনই আমাদের চোখে এসেছে। এই সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে ইজিপ্টের আদিম

অধিবাসীদের কবরই সব চাইতে আশ্চর্য্যজনক। সেই সব বালু-ঢাকা কবরে মৃত ব্যক্তির কঙ্কালের সঙ্গে নানা আকারের মাটির পাত্র, নানা প্রকারের শস্য এবং কাপড়ের টুকরো আমরা পেয়েছি। এই সমস্ত কবর থেকেই আমরা জান্‌তে পারি যে ছ' হাজার বছরেরও আগে ইজিপ্টের অধিবাসীরা জমি চাষ করতে, কাপড় বুনতে এবং ব্যবহার করতে, এবং মাটির সুদৃশ্য বাসন তৈরী করতে জানত। তাদের কাজকর্ম্ম চালাবার জন্য নিশ্চয়ই কোন একটা ভাষার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই ভাষায় লিখিত কোন নিদর্শন আজ অবধি আমাদের হাতে আসে নি। কেবল মাত্র পর্ব্বতের গুহার গায়ে আঁকা কয়েকটি ছবি আমরা পেয়েছি। সেই সব ছবি দেখে এই মনে হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ছবি এঁকে কিছু কিছু মনের ভাব ব্যক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। কিন্তু তখনও তারা ভাল ভাবে লিখতে শেখে নি। পৃথিবীর প্রথম লিখিত ভাষা, অথবা ইজিপ্টের চিত্রলিখন (হায়রোগ্লিপ্‌স্) তখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।

ইজিপ্টের লোকেরা ঐ সমস্ত কাজ জানত বটে কিন্তু এ সব জ্ঞানের প্রথম উৎপত্তি যে কোথায় তা আজও জানা যায় নি। ইজিপ্টে যে রকমের বাসনপত্রের প্রচলন ছিল ঠিক সে রকম বাসন-পত্রই সমসাময়িক সিরিয়া, সাইগ্রাস প্রভৃতি জায়গাতেও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ দেশের অধিবাসীরা যে এ সমস্ত প্রথম তৈরী করতে শিখল তার সমাধান করা আজও অসম্ভব। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশ হঠাৎ আমাদের চোখে এল। এবং যখন এল তখন সে সব দেশে সভ্যতার বেশ উন্নত অবস্থা। কাজেই ইজিপ্ট এবং ব্যাবিলনে যে সভ্যতার আরম্ভ ঠিক কবে থেকে এ সমস্যা সমস্যাই থেকে যাবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নূতন কিছু প্রমাণ আবিষ্কার করা যায়। ইজিপ্ট এবং ব্যাবিলনের যে সভ্যতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সে সভ্যতার বয়স প্রায় ছয় হাজার বছর। এই ছয় হাজার বছর আগেকার মানুষের জীবন ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক যুগে পৌঁছুতেই আদিম অধিবাসীদের নিশ্চয়ই অনেক দিন লেগেছিল। ইতিহাসে যাদের ধরাছোঁয়া যায় না তাদের বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ। এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী-সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নেই। পঞ্জিকার আবিষ্কার হয়েছিল যীশুখৃষ্ট জন্মাবার চার হাজার বছরেরও আগে—এবং সে আবিষ্কার করেছিল ইজিপ্টের লোকরাই। এই পঞ্জিকার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল ঐতিহাসিক যুগ। এই ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর সভ্যতার ধারাবাহিক বৃত্তান্ত ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

আজ তোমাকে পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম বিকাশ সম্বন্ধে কিছু বল্‌লাম। ভবিষ্যতে আর এক দিন সভ্যতার ক্রমোন্নতির বিষয়ে কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রইল। ইতি

ইয়াঙ্কি-পর্ব্ব

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্)

রাবণ রাজার উল্লাসের আজ আর সীমা নাই; অনেক দিনের চেষ্টার ফলে অনেকখানি প্রোপাগাণ্ডার পর আজ এতদিনে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হইতে চলিল। এই মাত্র রয়টারের খবর আসিয়াছে।

ব্যাপারটা তবে একটু বুঝাইয়া বলি। চারি বছর অন্তর অন্তর স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল—তিন মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের মধ্যে একবার করিয়া ব্রাহ্মাণ্ডিক প্রতিযোগিতা হইত—অনেকটা অলিম্পিক গেমের মতই, তবে আরও জাঁকালো। অলিম্পিক্ গেমে কেবল খেলাধূলা আর ব্যায়াম-কসরতেরই প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু এমন কোন উচ্চাঙ্গের গুণই নাই ব্রাহ্মাণ্ডিকে যার বোঝাপড়া না হইত। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সভ্যতার গৌরবে যে সব দেশ সমুজ্জ্বল কেবল মাত্র সেই সব দেশের রাজধানীতেই ব্রাহ্মাণ্ডিক প্রতিযোগিতা বসিতে পাইত। ছোটখাট কত দেশ ব্রাহ্মাণ্ডিক কমিটির কাছে আবেদন করিয়াছে অন্ততঃ একবার তাদের রাজধানীতে প্রতিযোগিতাটা বসুক, কিন্তু কোন আমলই পায় নাই। রাবণ রাজার তরফ্ হইতেও অনেক আবেদন-নিবেদন গিয়াছে, কিন্তু কমিটিকে রাজী করান বাস্তবিকই বড় শক্ত ব্যাপার।

গত বারের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল হস্তিনাপুরে আর তার উদ্বোধন করিয়াছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির। রাবণ স্বয়ং সেই উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন উদ্বোধকের সে কি সম্মান! ঠিক যেন বিবাহ-আসরের বরের মত; তুমি বেচারা বরযাত্রী, হাজার ভাল জামা-কাপড় পরিয়া যাও, কেউ ভুলিয়াও একবার তোমার পানে তাকাইবে না, ফটোগ্রাফ আর অটোগ্রাফ্‌ওয়ালারা কেবল 'বরের' আনাচে-কানাচেই ঘুরিয়া মরিবে। ঐ তো ইন্দ্র, হাজারটি চোখে তিনি এক হাজার রকমের চশমা আঁটিয়া আসিয়াছিলেন তো কেউ ভুলিয়াও একবার সেদিকে তাকাইল? চন্দ্রদেবের চেহারাটা যে বাস্তবিকই সুন্দর তা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করিবে না; তার উপর আবার উৎসবে যোগ দিবার এক সপ্তাহ আগে হইতে ছ'বেলা তিনি মুখে হিমানী ঘষিতেছিলেন। কিন্তু? এরিষ্টোক্রেসিতে কুলাইল কি? ষ্টেডিয়ামের দরজায় গেট্-কীপার ঠিক তাঁর টিকেট দেখিতে চাহিল! এই রকম কত আর উদাহরণ দিব? ব্যাপার দেখিয়া রাবণ রাজার 'ডোণ্ট্ কেয়ার' গোঁফ ঝুলিয়া একেবারে 'বেগ্ ইওর পার্ডন্' হইয়া গেল। নাঃ, উৎসবটা একবার লঙ্কাপুরীতে না নিতে পারিলে মানসম্মান একেবারেই থাকে না।

কোথাও যাওয়া-আসা করিতে হইলে রাবণ রাজা গুপ্তপ্রেস্ পঞ্জিকা না দেখিয়া এক পাও

নড়েন না, সেবারে তার হাতে হাতে ফল পাইয়া গেলেন—উৎসবের শেষ দিনটিতে একটা অপূর্ব্ব সুযোগ মিলিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরকে একটা ভোট অব্ থ্যাঙ্ক্স্ দিতে হইবে, সে ভার পড়িল রাবণ রাজার উপর। রাবণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রথমেই উৎসবের অপূর্ব্ব সাফল্যের উল্লেখ করিলেন, হস্তিনাপুর-বাসীর, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের আতিথেয়তার প্রচুর তারিফ্ করিলেন—এমন তত্ত্বতালাস, এমন খানা-পিনা ইত্যাদি। তার পরেই সুকৌশলে ছাড়িলেন একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র—গদ্গদ ভাষায় কহিলেন, "হস্তিনাপুরের আতিথেয়তায় আমরা লঙ্কাবাসী যে কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ হয়েছি তার একমাত্র পরিচয় দেওয়া সম্ভব যদি আমাদেরও একবার এই আতিথেয়তা দেখাবার সুযোগ দেওয়া হয়। আমি আগামী বারের উৎসবের কথা বল্‌ছি। আগামী বারের স্থান-নির্ব্বাচনের সময় এক্‌জিকিউটিভ্ কমিটি লঙ্কাপুরীর কথা স্মরণ রাখ্‌বেন এ আশা অবশ্যই আমি মনে মনে পোষণ করি…" কথা কয়টা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আড়চোখে চারিপাশটা একবার দেখিয়া লইলেন; কারো যে খুব বেশী আপত্তি আছে এমন ভাব দেখা গেল না, কেবল বৃত্রাসুরের ঠোঁটটা যেন কেমন একটু বাঁকিয়া গেছে মনে হইল। অবশ্য রাবণের সঙ্গে চোখো-চোখি হইতেই বৃত্র একটিপ্ নস্যি নাকে দিতে দিতে মুখের ভাবখানা এমনই করিলেন যাতে লোকের মনে হয়, ইচ্ছা করিয়া তিনি ঠোঁট বাঁকান নাই, নস্যি গুঁজিবার সময় আপনা হইতেই অলক্ষ্যে একটু বাঁকিয়া থাকিবে। তবুও রাবণের মনে কেমন একটু খট্‌কা লাগিল, এরোপ্লেনে ওঠার আগে রেডিও কোম্পানীর ডিরেকটরের সহিত একবার দেখা করিয়া যাইতে তিনি ভুলিলেন না।

দু'দিন বাদেই এই দেখা করার অর্থ সুস্পষ্ট হইল, রেডিও কোম্পানী রাবণের হইয়া জোর প্রোপাগ্যাণ্ডা সুরু করিয়া দিল। রেডিও-মারফৎ একদিন সন্ধ্যার পর বিশ্ববাসীর কানে আসিল—

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হ'লাম যে ব্রাহ্মাণ্ডিক কমিটি নাকি ঠিক করেছেন, আস্‌ছে বারের উৎসব লঙ্কাপুরীতে অনুষ্ঠিত হবে। কথাটা যদি সত্যি হয় তবে কমিটিকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাস্তবিক, লঙ্কাপুরী সভ্যতার যে উঁচু স্তরে উঠেছে তাতে ব্রাহ্মাণ্ডিক উৎসব অন্ততঃ একবারও সেখানে অনুষ্ঠিত না হলে রাক্ষস-সভ্যতাকে দস্তুর মত অপমান করা হয়। সেকেলে ট্রাম-বাস্ উঠিয়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় এরোপ্লেন-সার্ভিসের প্রচলন আমরা যত দূর জানি, রাক্ষসেরাই প্রথম্ করেছেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে লঙ্কাপুরী আজ অপরাজেয়—গ্রেট্ লঙ্কা বিড়ি কোম্পানীর বিড়ি ইয়োরোপে পর্য্যন্ত চালান যায়। দুঃখের বিষয় সব রকম আবিষ্কারের জন্য নোবেল্-প্রাইজের ব্যবস্থা আজও হয় নি, নতুবা তিমি-কাট্‌লেট্, অক্টোপাস্-জেলী প্রভৃতির উদ্ভাবকেরা যে সে পুরস্কারের সম্পূর্ণই উপযুক্ত এ কথা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানেও রাক্ষস জাতির দান বড় সামান্য নয়; প্রোফেসার ভস্মলোচনের 'য়্যাস্ রে' (Ash ray), প্রিন্স্ মেঘনাদের হাইডিং ক্লাউড (Hiding Cloud) যুদ্ধ-বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাক্ষসেরা যে নিতান্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ জাত গেল-বছর সিনর বিভীষণের শান্তির জন্য নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্তি থেকেই তা বোঝা যায়।…"

কিন্তু রাবণ মনে মনে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কয়েক দিন পরে বাস্তবিকই তা ফলিয়া গেল। 'কাঁচা-লঙ্কা' পত্রিকায় * রেডিও প্রোগ্রামের পাতা উল্টাইতে গিয়া তিনি দেখিলেন, সেই দিন দৈত্যপুরীর প্রোপাগ্যাণ্ডা-অফিসার শর্ব্বরীদিবাসুর বেতারে বক্তৃতা করিবেন। কথাটা একটু চিন্তারই বটে, কেননা ইনি নাকি রাতকে দিন করিতে পারেন। কয়েক ঘণ্টা পরেই দৈত্যবরের বক্তৃতা আরম্ভ হইল—"জোর গুজব শোনা যাচ্ছে, এবারের ব্রাহ্মাণ্ডিক উৎসব যাতে লঙ্কাপুরীতে সম্পন্ন হয় তারই জন্য রাক্ষসেরা উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু হে ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, ইংরিজী বা বাংলা যে বর্ণমালাই ধরুন না কেন, কোন্ হিসাবে দৈত্যপুরীর আগে লঙ্কাপুরীর স্থান হতে পারে? আপনারাই সমাধান করুন, 'ডি' আগে না 'এল্' আগে। আপনারাই এ প্রশ্নের মীমাংসা করুন যে 'দ' প্রথমে না 'ল' প্রথমে! রাক্ষস-সভ্যতার উন্নতি-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হচ্ছে, কিন্তু হে সুধীবৃন্দ, আমি জিজ্ঞাসা করি, দৈত্যেরা পিছিয়ে আছে

* রামধনুর পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় জানেন যে এ পত্রিকাখানি লঙ্কার কাঁচা অর্থাৎ তরুণ বয়সের রাক্ষসেরা বাহির করেন।

কোন্ হিসেবে ? গত একশ' বছরের ভেতর মহিষাসুর অকারণে কাউকে গুঁতিয়েছে এমন কথা বুক ঠুকে বল্‌তে কেউ প্রস্তুত আছেন ? আমি জবাব চাই ! ঋষিদের যজ্ঞের সুবিধার জন্যে নৈমিষারণ্যে গত বছর যে দু' হাজার গ্যালন শ্রীঘৃত চালান গেছে সে কার খরচায়—বলুন, কার খরচায় ? তারকাসুর নামে একজন মহাপ্রাণ দৈত্যই কি সেজন্য চেক্ কাটেন নি ? আজ যে পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ বালক নালান্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখরচায় লেখাপড়া শিখ্‌ছে তাদেরই বা বৃত্তির বন্দোবস্ত কে কর্‌লে ? জবাব দিন আমার প্রশ্নের ! এরও সেই একই জবাব—দৈত্য বৃত্রাসুর।"

রাবণ বিষম নার্ভাস হইয়া বেতার-অফিসে দূত পাঠাইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন, ঠিক এম্‌নি সময় রয়টারের খবর আসিল, আগামী বারের ব্রাহ্মাণ্ডিক উৎসব লঙ্কানগরেই বসিবে পাকা-পাকি ভাবে ঠিক হইয়াছে।

তার পর অনেক দিন চলিয়া গেছে, ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই, কেবল বার কয়েক কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তা' সেজন্য লঙ্কাবাসী বরাবরই প্রস্তুত থাকে, রাবণ রাজার খাস্‌কামরায় ঝুলান ক্যালেণ্ডারখানার গায়ে কুম্ভকর্ণের জাগিবার বিশেষ দিনটিতে লাল কালির দাগ দেওয়া আছে, সেদিনটি আসিবার অনেক আগেই প্রচুর খাবার ভাঁড়ার ঘরে মজুত রাখা হয়। মনোমত খাবার পাইলেই কুম্ভকর্ণ মহা খুসী, আর কা'কেও সে ঘাঁটায় না, দুপুরবেলা ঘরের মধ্যে বসিয়াই দশ-পঁচিশ খেলে আর নয়তো লাল-নীল মাছগুলির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে। তার পর সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আবার সুরু হয় তার নাকের ডাক ; ফের ছ' মাসের ধাক্কা ! লঙ্কাপুরীর এত উন্নতি, লঙ্কা-সভ্যতার এত বিস্তার, অথচ সে সবের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের এতটুকু সম্পর্ক নাই—কায়মনোবাক্যে এখনও সে সেই সনাতন খাঁটি অকৃত্রিম রাক্ষসটিই রহিয়া গেছে। রাবণ মাঝে মাঝে প্রায়ই দুঃখ করেন, "বিধাতা তো আমায় কোন জিনিষ দিতেই কার্পণ্য করেন নি, কেবল একটি হস্তিমূর্খ ভাই দিয়েই সব মাটী করে রেখেছেন। চলমান জগতের কোনই খবর রাখে না—একটা আস্ত রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্ক্‌ল্ !"

ব্রাহ্মাণ্ডিক উৎসবের দিন ক্রমেই কাছাইয়া আসিতেছে, বোধ হয় আর মাস ছয়েকও বাকী নাই। এইবার একটু একটু করিয়া রাবণের মনে চিন্তার উদ্রেক হইতেছে ; জেদের মাথায় নিজের রাজধানীতে উৎসব তো তিনি ডাকিলেন, কিন্তু প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া রাক্ষসেরা তাঁর মুখ রাখিতে পারিবে তো ! রাক্ষসদের পয়েন্ট্ যদি খুবই কম হইয়া যায়—ছিঃ ছিঃ সে যে বড়ই লজ্জার কথা হইবে ! একটা বিড়ি ধরাইয়া ড্রয়ার হইতে গত বারের রিপোর্ট্‌খানা তিনি টানিয়া বাহির করিলেন ; রিপোর্টে লেখা আছে :—

প্রতিযোগিতার নাম	চ্যাম্পিয়ানের নাম	দেশের নাম
হাইজাম্প্	হনুমান্	কিষ্কিন্ধ্যা
লং জাম্প্	ডিটো	ডিটো
হাণ্ড্রেড্ মাইল্‌স্ ফ্ল্যাট্ রেস্	প্রভঞ্জন	অমরাবতী
থ্রোইং দি আয়রণ বাঁটুল	ভরত	অযোধ্যা।

রাক্ষসদের নাম অনেক তলায় ; শুধু তাই নয়, রিপোর্টার টিপ্পনী কাটিয়াছে—রাক্ষসদের পেটের গড়ন বড়ই মোটা, উদর না কমাইলে ভবিষ্যতেও তাঁরা যে এসব কম্‌পিটিসনে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন এমন মনে হয় না। অপ্রসন্ন মনে পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে রাবণ আর এক জায়গায় আসিলেন, সেখানে ললিত-কলাগুলির প্রতিযোগিতা-ফল দেওয়া হইয়াছে

প্রতিযোগিতার বিষয়	চ্যাম্পিয়ানের নাম	দেশের নাম
সঙ্গীত (ভোকাল)	নবঘন মহাপাত্র	উড়িষ্যা
যন্ত্র-সঙ্গীত	'হোলি-হ্যায়' পার্টি	দ্বারভাঙ্গা (বিঃ)
সুকুমার কবিতা	ফেঁকুলাল পাঁড়ে	বিহার
চিত্র-কলা	কবীন্দ্র গোস্বামী	বেঙ্গল

এখানেও রাক্ষসদের নাম বহু নীচে ; এন্‌ডিওরেন্স্ প্রতিযোগিতাগুলিতে সব চেয়ে বেশী পয়েন্ট্ পাইয়াছে বাংলা দেশ—সেখানকার শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী দেবী আশী ঘণ্টা এন্‌ডিওরেন্স্ চীৎকারে নতুন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। তাইতো বড়ই সমস্যার কথা !

চিন্তা বড়ই খারাপ জিনিষ; একবার একটাকে আমোল দিলে অন্যগুলিও লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতে থাকে। এক্ষেত্রেও তা-ই হইল, একে একে হাজারো রকমের চিন্তা রাবণকে পাইয়া বসিল। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে প্রতিযোগিতায় রাক্ষসেরা তো করিবে ঘেঁচু, অথচ তাঁর তরফ্ হইতে পয়সার শ্রাদ্ধ। লঙ্কা-গভর্ণমেণ্টের অবস্থা তো আর অজানা নাই, কেবল দেনার উপরেই চলিতেছে। সভ্যতার ঐ এক আপদ্ ! শেষে দেখিতেছি জাতও যাইবে, অথচ পেটও ভরিবে না—হঁম্‌ম্ !

হঠাৎ রাবণের চিন্তাস্রোত বাধা পাইয়া থামিয়া গেল, বাহিরে ও কিসের গোলমাল ? তৎক্ষণাৎ 'বয়' পাঠাইয়া তিনি খবর জানিলেন—এক সাহেব সকলের নজর এড়াইয়া তাঁরই খাস্‌কামরার দিকে আসিতেছিল, দরওয়ান কপট-শঠ তাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। রাবণ একটু ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চায় ও ?"

"মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"আচ্ছা, নিয়ে এস ওকে আমার কাছে।"

সাহেবের মুখখানা অবিকল একটি পাকা আমের মত, মাথায় কয়েক গাছা চুল আছে এই যা পার্থক্য। মহারাজের সাম্‌নে আসিয়া সে 'বাও' করিয়া দাঁড়াইল, রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বাড়ী তোমার ?"

"ম্যারিকা।"

"সে আবার কোথায় ?"

"ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ অব ম্যারিকা !"

"ওহ্, সোজা কথায় বল্লেই তো পার বাপু এমেরিকা ; তা না ম্যারিকা ম্যারিকা কর্‌ছ কেন ? কি কর ?"

"আজ্ঞে আমি আইডিয়া বেচি।"

"সেটা আবার কি পদার্থ ?"

"আইডিয়া বেচি মানে, ব্যবসাদারদের এমন সব নতুন নতুন আইডিয়া দিই যা কাজে খাটিয়ে তারা বেশ্ কিছু লাভ করতে পারে। ধরুন, আপনি জুতো সেলাই করেন……"

"কি ? আমি কি করি ?"

সাহেব বুঝিল উপমাটা বড়ই বেফাঁস হইয়া গেছে, কুর্ণিশের ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি তিন বার 'বাও' করিয়া সে দোষ সারিয়া নিল, তার পর আবার বুঝাইতে লাগিল—"ধরুন, কোন লোক জুতোর ব্যবসা করে ; বাজারে হয়তো আরও হাজার লোক জুতো বেচ্‌ছে ; তাদের ভেতর বেজায় রেষারেষি, সকলেই খদ্দের পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত। এখন এ লোকটি যদি একটু নতুনত্ব দেখাতে পারে—যদি প্রকাণ্ড একটা জুতোর মতন করে দোকানঘরখানাকে তৈরী করতে পারে—তা হ'লে তার দিকে সকলেরই নজর পড়্‌বে, গল্পগুজবের সময় তার দোকানের কথাই সকলে উল্লেখ করবে—ফলে বাজারে তার মালই কাট্‌বে বেশী। ধরুন কেউ হোটেল খুলেছে ; তখন তার উচিত হবে দোকানে দু'টো দরজা রাখা—একটা ভেতরে ঢোক্‌বার জন্যে, আর একটা ভেতর থেকে বাইরে আসার জন্যে। ভেতরে ঢোক্‌বার দরজায় লাগান থাক্‌বে এমন একটা আয়না যাতে মানুষের চেহারা ফুটে ওঠে বেজায় সরু লিক্‌লিকে গোছের—অমন আয়না বহুৎ পাওয়া যায়। তার নীচে সে লিখে দেবে, 'আমাদের খাবার খাওয়ার আগের অবস্থা।' আর বার হবার দরজায় থাক্‌বে আর একটা আয়না তাতে ফুট্‌বে দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল চেহারা—নীচে লেখা থাক্‌বে 'আমাদের খাবার খাওয়ার পর'। ধরুন, কেউ বিড়ির ব্যবসা করে……"

"বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি বিজ্ঞাপন জাহিরের মরদ, শর্ব্বরীদিবাস্থরের মাস্‌তুতো ভাই, রাতকে দিন করতে পার। তা বাপু, আমি তো জুতোও বেচি না, হোটেলের ব্যবসাও আমার নেই, আমাকে আর তুমি কি আইডিয়া দেবে ?"

"আজ্ঞে আইডিয়াটা হচ্ছে এই, ব্রাহ্মাণ্ডিক উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটা এক্‌জিবিসন্‌ও খুলে দিন ; যদি পাঁচ লাখ ষ্টলেরও এপ্লিকেশন আসে আর ষ্টল্ পিছু আপনি একশ' ডলারও সেলামী নেন, তা হ'লেও দেখুন পাঁচ লাখ ইন্‌টু একশ' ইজ্ ইকোয়াল টু—পাঁচ কোটী ডলার হাতে এল। আমার নিজের লাভ এই যে, ওই সব ষ্টল্‌ওলাদের কাছে কিছু কিছু আইডিয়া বেচে হয়তো দু'চার সেণ্ট্ রোজগার করতে পারব।"

রাবণ ভাবিয়া দেখিলেন, আইডিয়াটা বাস্তবিকই মন্দ নয়। তিনি তখন প্রীত হইয়া সাহেবকে (তার নাম হব্‌সন) নিজের কেস্ হইতে একটি বিড়ি উপহার দিলেন।

ব্রাহ্মাণ্ডিক উৎসবের ঠিক আগের দিন, লঙ্কাপুরীর সে দৃশ্য বাস্তবিকই বর্ণনাতীত। আপিস-কাচারি, ইস্কুল-কলেজ সমস্ত বন্ধ, দলে দলে সুসভ্য রাক্ষসেরা মহা ব্যস্ত ভাবে এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমুদ্রের পারে বিরাট্ ষ্টেডিয়াম উঠিয়াছে, তাতে লক্ষ লক্ষ দর্শকের আসন। তারই পাশে বিশাল এক্‌জিবিসন বসিয়াছে ; কার না জিনিষ আসিয়াছে সেখানে ? দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দন-বাগানের বড় বড় বাঁধাকপি, মটরশুঁটি আসিয়াছে, দ্রৌপদী দেবী নিজে হাতে চানাচুর ভাজিয়া পাঠাইয়াছেন, কিষ্কিন্ধ্যার 'কলা-ভবন' হইতে কলা আসিয়াছে—কত নাম করিব ? বড় বড় চীনা রেস্তোরাঁগুলি হইতে আরশুলা-চচ্চড়ির অপূর্ব্ব খোসবোয় সমস্ত জায়গাটা ভরপূর হইয়া গেছে—সে কি অপূর্ব্ব গন্ধ, নাকে আসিলে ভরপেটেও ক্ষুধার সঞ্চার হয়। জাপানীরা আবার হব্‌সনের নিকট হইতে আইডিয়া কিনিয়াছিল, ফড়িং-ঘণ্টগুলিকে তারা এমনই রংদার ভাবে সাজাইয়াছে যে পকেটে পয়সা থাকিলে আর রক্ষা নাই, নির্ঘাৎ খরচ হইয়া যাইবে। আর্ট-গ্যালারী তো মাৎ করিয়া দিয়াছে মাড়োয়ারী-আর্টের বড় বড় ছবিগুলিই—পাট্রেট্‌গুলিতে 'ফুল ভি আছে, পাখী ভি আছে, পরী ভি আছে, আবার একটা করিয়া রেলগাড়ীও আছে। হব্‌সনের আজ আর মরিবার ফুরসুৎ নাই, ক্রমাগত আইডিয়া-সাপ্লাইএর অর্ডার !

রাবণ রাজা এক্‌জিবিসনের ভিতরেই একটু টহল দিতেছিলেন, হঠাৎ এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল ; রাজবাড়ী হইতে এক দূত রক্তমুখে ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে খবর দিল, "মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে, মেজকর্ত্তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তিনি ভয়ানক চেঁচামেচি লাগিয়েছেন।"

এক মুহূর্ত্তে রাবণের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, "য়্যাঁ কুম্ভকর্ণ জেগেছে ? বলিস্ কিরে ! এখন তো তার জাগ্‌বার কথা নয়, এই তো সেদিন ঘুমোলো !"

"মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"আচ্ছা, নিয়ে এস ওকে আমার কাছে।"

সাহেবের মুখখানা অবিকল একটি পাকা আমের মত, মাথায় কয়েক গাছা চুল আছে এই যা পার্থক্য। মহারাজের সাম্‌নে আসিয়া সে 'বাও' করিয়া দাঁড়াইল, রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বাড়ী তোমার ?"

"ম্যারিকা।"

"সে আবার কোথায় ?"

"ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ অব ম্যারিকা !"

"ওহ্, সোজা কথায় বল্লেই তো পার বাপু এমেরিকা ; তা না ম্যারিকা ম্যারিকা করছ কেন ? কি কর ?"

"আজ্ঞে আমি আইডিয়া বেচি।"

"সেটা আবার কি পদার্থ ?"

"আইডিয়া বেচি মানে, ব্যবসাদারদের এমন সব নতুন নতুন আইডিয়া দিই যা কাজে খাটিয়ে তারা বেশ কিছু লাভ করতে পারে। ধরুন, আপনি জুতো সেলাই করেন……"

"কি ? আমি কি করি ?"

সাহেব বুঝিল উপমাটা বড়ই বেফাঁস হইয়া গেছে, কুর্ণিশের ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি তিন বার 'বাও' করিয়া সে দোষ সারিয়া নিল, তার পর আবার বুঝাইতে লাগিল—"ধরুন, কোন লোক জুতোর ব্যবসা করে ; বাজারে হয়তো আরও হাজার লোক জুতো বেচ্‌ছে ; তাদের ভেতর বেজায় রেষারেষি, সকলেই খদ্দের পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত। এখন এ লোকটি যদি একটু নতুনত্ব দেখাতে পারে—যদি প্রকাণ্ড একটা জুতোর মতন করে দোকানঘরখানাকে তৈরী করতে পারে—তা হ'লে তার দিকে সকলেরই নজর পড়্‌বে, গল্পগুজবের সময় তার দোকানের কথাই সকলে উল্লেখ করবে—ফলে বাজারে তার মালই কাটবে বেশী। ধরুন কেউ হোটেল খুলেছে ; তখন তার উচিত হবে দোকানে দু'টো দরজা রাখা—একটা ভেতরে ঢোক্‌বার জন্যে, আর একটা ভেতর থেকে বাইরে আসার জন্যে। ভেতরে ঢোক্‌বার দরজায় লাগান থাকবে এমন একটা আয়না যাতে মানুষের চেহারা ফুটে ওঠে বেজায় সরু লিক্‌লিকে গোছের—অমন আয়না বহুৎ পাওয়া যায়। তার নীচে সে লিখে দেবে, 'আমাদের খাবার খাওয়ার আগের অবস্থা।' আর বার হবার দরজায় থাক্‌বে আর একটা আয়না তাতে ফুটবে দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল চেহারা—নীচে লেখা থাক্‌বে 'আমাদের খাবার খাওয়ার পর'। ধরুন, কেউ বিড়ির ব্যবসা করে……"

"বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি বিজ্ঞাপন জাহিরের মরদ, শর্ব্বরীদিবাসুরের মাসতুতো ভাই, রাতকে দিন করতে পার। তা বাপু, আমি তো জুতোও বেচি না, হোটেলের ব্যবসাও আমার নেই, আমাকে আর তুমি কি আইডিয়া দেবে ?"

"আজ্ঞে আইডিয়াটা হচ্ছে এই, ব্রাক্ষাণ্ডিক উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটা এক্‌জিবিসন্‌ও খুলে দিন ; যদি পাঁচ লাখ ষ্টলেরও এপ্লিকেশন আসে, আর ষ্টল্ পিছু আপনি একশ' ডলারও সেলামী নেন, তা হ'লেও দেখুন পাঁচ লাখ ইন্টু একশ' ইজ্ ইকোয়াল টু—পাঁচ কোটী ডলার হাতে এল। আমার নিজের লাভ এই যে, ওই সব ষ্টল্‌ওলাদের কাছে কিছু কিছু আইডিয়া বেচে হয়তো দু'চার সেণ্ট্ রোজগার করতে পারব।"

রাবণ ভাবিয়া দেখিলেন, আইডিয়াটা বাস্তবিকই মন্দ নয়। তিনি তখন প্রীত হইয়া সাহেবকে (তার নাম হব্‌সন) নিজের কেস্ হইতে একটি বিড়ি উপহার দিলেন।

ব্রাক্ষাণ্ডিক উৎসবের ঠিক আগের দিন, লঙ্কাপুরীর সে দৃশ্য বাস্তবিকই বর্ণনাতীত। আপিস-কাচারি, ইস্কুল-কলেজ সমস্ত বন্ধ, দলে দলে সুসভ্য রাক্ষসেরা মহা ব্যস্ত ভাবে এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমুদ্রের পারে বিরাট্ ষ্টেডিয়াম উঠিয়াছে, তাতে লক্ষ লক্ষ দর্শকের আসন। তারই পাশে বিশাল এক্‌জিবিসন বসিয়াছে ; কার না জিনিষ আসিয়াছে সেখানে ? দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দন-বাগানের বড় বড় বাঁধাকপি, মটরশুঁটি আসিয়াছে, দ্রৌপদী দেবী নিজে হাতে চানাচুর ভাজিয়া পাঠাইয়াছেন, কিষ্কিন্ধ্যার 'কলা-ভবন' হইতে কলা আসিয়াছে—কত নাম করিব ? বড় বড় চীনা রেস্তোরাঁগুলি হইতে আরশুলা-চচ্চড়ির অপূর্ব্ব খোসবোয় সমস্ত জায়গাটা ভরপূর হইয়া গেছে—সে কি অপূর্ব্ব গন্ধ, নাকে আসিলে ভরপেটেও ক্ষুধার সঞ্চার হয়। জাপানীরা আবার হব্‌সনের নিকট হইতে আইডিয়া কিনিয়াছিল, ফড়িং-ঘণ্টগুলিকে তারা এমনই রংদার ভাবে সাজাইয়াছে যে পকেটে পয়সা থাকিলে আর রক্ষা নাই, নির্ঘাৎ খরচ হইয়া যাইবে। আর্ট-গ্যালারী তো মাৎ করিয়া দিয়াছে মাড়োয়ারী-আর্টের বড় বড় ছবিগুলিই—পাট্রেট্‌গুলিতে 'ফুল ভি আছে, পাখী ভি আছে, পরী ভি আছে, আবার একটা করিয়া রেলগাড়ীও আছে। হব্‌সনের আজ আর মরিবার ফুরসুৎ নাই, ক্রমাগত আইডিয়া-সাপ্লাইএর অর্ডার !

রাবণ রাজা এক্‌জিবিসনের ভিতরেই একটু টহল দিতেছিলেন, হঠাৎ এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল ; রাজবাড়ী হইতে এক দূত রক্তমুখে ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে খবর দিল, "মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে, মেজকর্ত্তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তিনি ভয়ানক চেঁচামেচি লাগিয়েছেন।"

এক মুহূর্ত্তে রাবণের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, "য়্যাঁ কুম্ভকর্ণ জেগেছে ? বলিস্ কিরে ! এখন তো তার জাগ্‌বার কথা নয়, এই তো সেদিন ঘুমোলো !"

"কথা নয় বটে, তবু জেগেছেন। খেলোয়াড়রা নাম্‌বার সঙ্গে সঙ্গে যে হাজারবার তোপ দাগা হ'ল, তারই আওয়াজে জেগে উঠেছেন। উঠেই বল্‌ছেন, "কই, হাতীর রস কোথায়? গণ্ডার ভাতে দেওয়া হয়েছে তো!"

রাবণের মুখ ফর্সা হইয়া গেল—অর্থাৎ কাগজের মত ফর্সা। ভায়া নোটিস্ দিয়া জাগিলে এ সমস্তেরই বন্দোবস্ত রাখা হয়, কিন্তু বিনা-নোটিসে এখন তিনি কি দিয়া কি করেন? আর সে কি সহজ ব্যাপার? আস্ত হাতীটিকে আদার রসে বেশ কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে; তার পর তাকে ছেঁচিয়া বাদাম, কিস্‌মিস্ পেস্তা মিশাইয়া মিহি ন্যাকৃড়ায় ছাঁকিতে হইবে। এই হইল বাবুর এক নম্বরের পেয়ারের খাবার! দুই নম্বর গণ্ডার-ভাতে—যে সে গণ্ডার হইলে চলিবে না, খাঁটি আফ্রিকা-জঙ্গলের গণ্ডার হওয়া চাই। এ ছাড়া প্রকাণ্ড একটি লিষ্টি তো আছেই। কোথায় ছোটেন তিনি এখন হাতী-গণ্ডারের তল্লাসে? অথচ কুম্ভকর্ণকে ঠাণ্ডা না করিলেও মহা বিপদ্, যে গোঁয়ার, কি যে কাণ্ড করিয়া বসে কে জানে?

রাবণের মাথা তো ঘুরিতেই ছিল, কুম্ভকর্ণের ঘরে ঢুকিবার পর একেবারে লাট্টুর মত ঘুরিতে লাগিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কুম্ভকর্ণের চেহারাখানা এম্‌নিই খুব বাড়ন্ত—লঙ্কাপুরীতেও দ্বিতীয় অমন একখানি বপু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তার উপর সে রাগিয়াছে, চোখ দু'টা ভাঁটার মত জ্বলিতেছে, গায়ের প্রত্যেকটি রোঁয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, আর চুলগুলি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঠিক যেন সজারুর কাঁটা। সাম্‌নেই একটা চাকর-রাক্ষস মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া আছে—সে জোচ্চোর নাকি হাতীর রসের নাম করিয়া খানিকটা ছাগলের রস আনিয়া দিয়াছিল; এক চুমুক খাইবার পরই কুম্ভকর্ণ তার কানের ডগায় মারিয়াছে এক ঘুষি। ছাগলের সমস্তখানি রক্ত কুম্ভকর্ণের কাপড়ে পড়িয়া যাওয়ায় তার সেই প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি এমনই প্রলয়ঙ্কর-তর হইয়া উঠিয়াছে যে সে চেহারা দেখিয়া অমন যে নির্ভীক রাবণ, তাঁর পর্য্যন্ত বুকখানা সাত হাত বসিয়া গেল।

রাবণকে দেখিয়াই কুম্ভকর্ণের রাগ যেন হাজারগুণ বাড়িয়া গেল, সে চেঁচাইয়া উঠিল, "দাদা, আমি যদি তোমার এমনই গলগ্রহ হয়ে থাকি, বল্লেই তো পার, আমি আমার খাবার ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারি।" তার পর দু'টি হাত শূন্যে বার দুই নাচাইয়া নিয়া কহিল, "এ দু'টো থাকৃলে কুম্ভকর্ণ দুনিয়ায় কার তোয়াক্কা রাখে শুনি! ঠিক জেনো......"

বক্তৃতার মাঝখানেই আচম্‌কা সে থামিয়া পড়িল; সমুদ্রের দিক্ হইতে তখন জোর হাওয়া বহিতেছিল, চোখ বুঁজিয়া কুম্ভকর্ণ বার দুই জোরে নিঃশ্বাস লইল, তার পরেই তার গোঁফের পাশ দিয়া ক্ষীণ একটু হাসির রেখা দেখা দিল যেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাবণ রাজা প্রমাদ গণিলেন—সমুদ্রের বাতাসে ভাসিয়া চীনা-রেস্তোরাঁর পাগল-করা আরশুলা-চচ্চড়ির গন্ধ, জাপানীদের মন-মাতানো ফড়িং-ঘণ্টের গন্ধ ক্ষুধার্ত্ত কুম্ভকর্ণের নাসা-রন্ধ্রে ঢুকিয়াছে। আর কি তাকে কেউ আট্‌কাইয়া

রাখিতে পারিবে? অসম্ভব! এই মুহূর্ত্তেই সে ষ্টেডিয়ামের দিকে ছুটিয়া যাইবে; এক্‌জিবিসনে ঢুকিয়া জিনিষপত্র সব লণ্ডভণ্ড করিয়া তো দিবেই, লোকজনদেরও আস্ত রাখিবে কিনা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। রাবণের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, বুকের ভিতরটা ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল—হায় হায়, বিশ্বের দরবারে আজ সত্যিসত্যিই তাঁর মুখে চুণকালি পড়িল বুঝি! এক্ষুণি ওয়্যারলেসে সমস্ত খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, দেবতারা ঠোঁট্ বাঁকাইয়া বলাবলি করিবেন, "আরে হাজার হ'লেও রাক্ষস তো, ও ব্যাটাদের আবার সভ্যতা!" দৈত্যেরা সারাদিন হাসিবে, তার পর সন্ধ্যার সময় বেতারে বাহির হইবে শর্ব্বরীদিবাসুরের বক্তৃতা—জিব দিয়া কতখানি বিষ ছড়ান যায়, তারই পরিচয় সে দিবে।

কুম্ভকর্ণ ছুটিয়া চলিয়াছে এক্‌জিবিসনের দিকে, দুরন্ত ঝড়ের মত, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত। পাইক-বরকন্দাজ কারো এমন সাহস নাই যে তার পিছু নেয়। কেবল, বহু পিছনে রাবণ এবং বিভীষণ দৌড়াইয়া আসিতেছেন দেখা গেল।

এক্‌জিবিসনের প্রথমেই হব্‌সনের ঘর; নানা রকম আইডিয়ার আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র রাখার জন্য এখানি রাবণের নিকট হইতে বিনা ভাড়ায় সে পাইয়াছে। জানালার পাশে বসিয়া বসিয়া সে বিজ্ঞাপনের আইডিয়া ভাবিতেছিল, হঠাৎ মুখ বাড়াইয়া দেখিল যমদূতের মত চেহারার আদিম যুগের এক অধিবাসী বিকট শব্দ করিতে করিতে বায়ুবেগে এদিকে আসিতেছে। আর কুম্ভকর্ণ দেখিল, জানালার পাশে ঝুলিতেছে একটি অকালের আম—টুকটুকে সিন্দূর বর্ণের।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কুম্ভকর্ণের প্রোগ্রাম ঠিক হইয়া গেল, প্রথমেই এই আমটি দিয়া জলযোগ করিতে হইবে, তার পর অন্য জিনিষ—চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে সে হব্‌সনের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। দূর হইতে রাবণ দেখিলেন আইডিয়া-সাহেবের আদ্যশ্রাদ্ধের এই বন্দোবস্ত।

প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে তিনি এবং বিভীষণ হব্‌সনের দরজার গোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কুম্ভকর্ণ ঘর হইতে বাহির হইল। কিন্তু একি অবস্থা তার! কোথায় তার সেই রুদ্র মূর্ত্তি? অত বড় বীর পুরুষ ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, পা দু'টি মাতালের মত টলিতেছে, মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে, গোঁফ 'ঝোঝুল্যমান'। বিভীষণ কাছে গিয়া দাঁড়াইতে কুম্ভকর্ণ তাঁর কাঁধের উপর ঈষৎ হেলিয়া পড়িল, সভয়কণ্ঠে বলিল, "ভীষ্‌ণে, আমায় বাড়ী নিয়ে চ'—চ' চ' আমায় শুইয়ে দিবি, আমি ঘুমোব।" হতভম্ব বিভীষণ মেজদাদাকে লইয়া বাড়ীর পথে হাঁটা দিল।

রাবণ রাজার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না—ব্যাপারখানা কি? তিনি হব্‌সনের ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। প্রথমেই চোখ পড়িল হব্‌সনের উপর—দাঁত-লাগিয়া আচ্ছন্নের মত মেঝের

উপর সে পড়িয়া আছে। রাবণ তাকে ধরিয়া সামান্য একটু ঝাঁকুনি-ঝুঁকুনি দিতেই সে বলিয়া উঠিল, "খিং খং—খিং খং।"

'কিং কং' তো বুঝিলাম, কিন্তু সে কিং কং মুহূর্ত্তে অমন জুজু হইয়া গেল কিজন্য? ব্যাপার বুঝিবার জন্য রাবণ মাথা তুলিয়া চতুর্দ্দিকে একবার তাকাইতেই ঘরের দেওয়ালের উপর এইবার সর্ব্বপ্রথম তাঁর চোখ পড়িল। প্রথমে তিনিও একটু চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তার পরই আসল রহস্য বুঝিলেন। একটা নতুন আইডিয়াকে কাজে খাটাইবার জন্য সাহেব ঘরের সবগুলি দেওয়ালেই খান পনেরো কুড়ি বিরাট্ বিরাট্ আয়না ঝুলাইয়াছে। তুমি সেদিকে তাকাইলে তোমার চেহারাটাই যে শুধু তিনগুণ মোটা দেখাইবে তা নয়, মুখখানা হইয়া যাইবে পাঁচগুণ বিকট। আবার মজা এই, ভিন্ন ভিন্ন আর্শিতে ফুটিয়া উঠিবে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গী। কুম্ভকর্ণের স্বাভাবিক চেহারারই তুলনা নাই, সে চেহারা যদি তিনগুণ ফাঁপিয়া ওঠে, মুখখানা যদি পাঁচগুণ বিকট দেখায় তবে সে চীজটি কি হয় মনে মনে কল্পনা কর। শুধু একটী নয়, যে দিকেই সে তাকাইয়াছে বরাবর দেখিয়াছে গোটা ঘরখানিই এই অজ্ঞাত মহাদানবে ভর্ত্তি। তার পরের ইতিহাসও যদি বলিয়া দিতে হয় তবে তোমার কল্পনাশক্তির তারিফ্ করিতে পারিব না।

রাবণ রুমাল বাহির করিয়া ধীরে ধীরে কপালের ঘাম মুছিলেন—এ বড় সুখের ঘাম। সাহেব সুস্থ হইলে আজ তিনি তাকে বখশিস্ করিবেন—গোটা বিড়ির কেস্‌টিই।

কেটা

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ)

ডাক্তারি করি। সাধারণ ডাক্তার নয়, সরকারী ডাক্তার। অর্থাৎ চিকিৎসা যা করি, তার চেয়ে অনেক বেশী করি চাকরি। আজ চাটগাঁর পাহাড়তলীতে বসে কালাজ্বর তাড়াচ্ছি, কাল খবর এল জলপাইগুড়ির টেরাইতে গিয়ে ম্যালেরিয়া ঠ্যাঙাও। এমনি করে রোগজীর্ণা বঙ্গমাতার রোগের ঘাঁটি প্রায় সবগুলোই ঘোরা হ'য়ে গেছে।

সেবার আশ্বিনের মাঝামাঝি। শরতের নীলাকাশ জুড়ে রোদ আর ধরে না। চেয়ে চেয়ে মনটা কেমন হাল্‌কা হ'য়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা মনে হয় ভারী। থার্ম্মোমিটারটা বগলে লাগাব কিনা ভাবছি, এমন সময় এক টেলিগ্রাম। পড়ে দেখি বদলির হুকুম। রাণাঘাটের রেল থেকে দার্জ্জিলিঙের জেল। দার্জ্জিলিঙ্!! মনটা যেন নেচে উঠ্‌ল। এতদিন পরে কপাল ফির্‌ল!

শিলিগুড়ি পৌঁছতেই এক গাদা মোটরওয়ালা ধরলে চেপে। সবারই মুখে এক কথা—"বহুৎ জলদি পৌঁছ্ জায়গা"। আমি বললাম, "জলদিই যদি পৌঁছব, তবে দেখব কি?" আসল কথা মোটর হচ্ছে অতি পুরানো জিনিষ। কিন্তু ঐ যে ছোট ছোট পালকীর মত খেলাঘরের রেল, ওটা একেবারে নতুন জিনিষ, দেখলেই মনে হয় চড়ে বসি। তাই বসলাম। গাড়ী চল্‌ল নিবিড়-ছায়া-ঢাকা হিমালয়ের বনপথ বেয়ে, এঁকে বেঁকে উপরে উঠে, নীচে নেমে, পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে। তিনধরিয়া ছাড়াতেই চোখে পড়ে ডাইনে, বাঁয়ে, সুমুখে পিছনে সহস্রশীর্ষ হিমালয়ের গভীর উপত্যকা শ্যামলে শ্যামল—কোথাও এতটুকু রুক্ষতা নেই। যে মেঘ ভেসে যায় আকাশে, তাকে দেখলাম পায়ের নীচে বনঝোপের মাথায়। দেখলাম বাতাসিয়া লুপ, যেখানে গার্ডের গাড়ী আর এঞ্জিনে প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি। ইষ্টিশনের নামগুলো—তাতেও যেন পাহাড়ী সুরের মায়া—রংটং···কার্সিয়াং—টুং—ঘুম্—দার্জ্জিলিঙ্।

যার জায়গায় যাচ্ছি, সেই ডাক্তার বাবুটি একেবারে তৈরী হ'য়ে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'এই যে এসেছেন। আমি ক্রমাগত দিন গুণছি।' আশ্চর্য্য লাগ্‌ল। দার্জ্জিলিংএ বসেও কেউ দিন গোণে? বললাম, 'আপনার এখানটা ভালো লাগে নি?'

—'আরে রামো, দায়ে না পড়লে এ দেশে মানুষ থাকে? এই দেখুন না, সব দাঁতগুলো রেখে যাচ্ছি, আর নিয়ে যাচ্ছি বাত'—বলে তিনি হাঁ করে দাঁতের ফাঁকগুলো দেখিয়ে দিলেন।

তার পর আমাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে বললেন, 'এই দেখুন আপনার বাসা, আর এই জিনিষগুলো বুঝে নিন্। সরকারী জিনিষ ভালো করে মিলিয়ে নিন। আবার যেন চিঠি লিখে বসবেন না, এটা পাইনি, ওটা পাইনি।' বলে একটা লিষ্ট্ আমার হাতে দিলেন; আমি মিলিয়ে নিলাম, এবং তাঁর কথামত প্রত্যেকটি জিনিষের গায়ে ঢ্যারা দিলাম—একটা শিল, আধখানা নোড়া, একটা তিন পা-ওয়ালা চেয়ার, গোটা দুই বালতি, একটা জলের ড্রাম, (তাতে চাল থাকে) একখানা পিঁড়ি—(একদিকে নীচু, আর একদিকে উঁচু), একটা ভাঙ্গা টিনে খানিকটা ফিনাইল ইত্যাদি। আমি বুঝে নিয়ে সই দিলাম। ডাক্তার বাবু বললেন, 'আর একটা জিনিষ আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি যখন একা এসেছেন, কাজে লাগবে।' বলেই হঠাৎ বাড়ী ফাটিয়ে হাঁক দিলেন, 'কেটা, এই কেটা—আ—আ—আ!' কেউ সাড়া দিলে না। তিনি তখন রান্নাঘরে গিয়ে একটা ছেলেকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন। বছর পনেরো বয়সের একটা পাহাড়ী ছেলে, ঠোঁট দুটো অতিরিক্ত সিগারেট টেনে টেনে কালো, চোখ দুটো লাল, পরনে ফর্সা বেনিয়ান আর ভীষণ ময়লা সুরুয়াল (পায়জামা); তাদের চেহারা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে কোনোদিন তারা জলের মুখ দেখে নি।

আমি বললাম, 'এটিও কি সরকারী নাকি? কিন্তু লিষ্টে তো পেলাম না!'

ডাক্তার বাবু হেসে বললেন, 'আজ্ঞে না, এটি আপনার প্রাইভেট্, চমৎকার Combined hand—একাধারে, ঠাকুর, চাকর, দরোয়ান, বেয়ারা ; সব করবে—জুতো ঝাড়া থেকে ভাত রাঁধা। খুব কাজের লোক, তবে ঘুমটা একটু বেশী।

বললাম, 'তোর নাম কিরে'?

কেটা গম্ভীর ভাবে বললে, 'ব্যম্ বাহাদুর গুড় ম্'।

অর্থাৎ কেটা মানে কেউকেটা নয়, রীতিমত ব্যম্ বাহাদুর গুড় ম্। শুনে ভয় হ'ল, কেননা, দিনের মধ্যে বার পাঁচেক ব্যম্ বাহাদুর আওড়ালে মাস খানেকেই দম ফুরোবার সম্ভাবনা। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিলেন, 'ওসব ছেড়ে দিন, ওর নাম কেটা, এদেশে সব ব্যাটাই কেটা'।

ডাক্তার বাবু ঠিকই বুলেছিলেন। কেটা খুবই কাজের লোক। শুধু একজন লোক চাই তাকে জাগিয়ে রাখতে। ডাক্তার বাবু সেটা নিজেই করতেন। তার বাঁজখাঁই গলার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে তার বাড়ীতে আর যাই থাক ঘুম যে থাকতে পেত না এ কথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মুস্কিল হ'ল আমার। হয়তো জলতেষ্টা পেয়েছে—"কেটা এক গেলাস জল দে তো।" কেটা গেলাস হাতে ছুটল। আর দেখা নেই। মিনিট পনেরো পরে গিয়ে দেখি ডান হাতে গেলাস, বাঁ হাত কুঁজোর গায়ে—কেটা ঘুমুচ্ছে। সকাল ন'টায় বললাম, 'কেটা এক সের মাংস লে আও।' যখন ফিরল, বেলা দু'টো। কি ব্যাপার? রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে ঘুম পেয়ে গেল। পড়ে গেল সেইখানেই, পুলিশ এসে ডেকে দিয়েছে। সকাল নেই, দুপুর নেই, পাইখানার সিঁড়িতে, বাথ্ রুমে, কয়লার গাদায়, উনুনের ধারে, কেটার নাক ক্রমাগত ডেকে চলেছে। কিন্তু তোমার ডাক তার কানে পৌঁছবে না। অনিদ্রা-রোগের চিকিৎসা অনেক করেছি, এবার এই অতিনিদ্রা রোগ নিয়ে পড়লাম। খুব কড়া চা খেতে দিলাম। ফল হ'ল উল্‌টো। আগে, কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচালে উঠ্‌ত, এখন টেনে না তুল্‌লে ওঠে না। তখন ব্যবস্থা হ'ল ঠাণ্ডা সরবৎ, এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য ফল। সরবৎ কি খেতে চায়, জন দুই কয়েদী চেপে ধরে তিন বেলা সরবৎ খাওয়ায়। মাসখানেক পরে ঘুমটা একটু কমে এল।

তোমরা মনে যাই কর, আমি একটু সাহেবী ধরণের লোক। চাকরদের নাম ধরে হাঁক-ডাক আমি পছন্দ করি নে। আমার পকেটে সব সময়ে একটা "কলিং বেল্" থাকে ; যখন দরকার হয়, বাজিয়ে দিই। এখানেও সেই নিয়ম চালাতে স্থরু ক'রলাম। সেদিন কয়েকজন হোমরা-চোমরা বন্ধু এসেছেন ; চা চাই। "কলিং বেল্" ঠুকে দিলাম। একবার, দু'বার, তিনবার। কোন সাড়া নেই। অগত্যা গলা ছাড়তে হ'ল, তাতেও জবাব নেই। উঠলাম ; গিয়ে দেখি উনুনের উপর আলুর দম পুড়ে কয়লার দম হ'য়ে গেছে। কাছে শুয়ে ব্যম্ বাহাদুরের নাসিকা-গর্জ্জনে রান্নাঘর গম্‌গম্ করছে। টেনে তুলে বললাম, 'চা লেয়াও চার কাপ্—জলদি'। কেটা সঙ্গে

সঙ্গে বললে—'ল' (অর্থাৎ আচ্ছা)। মিনিট দশেক পরে বসবার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হ'ল ; ব্যম্ বাহাদুর মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে জানালেন, "চিয়া ছৈনা" (চা নেই)। সর্ব্বনাশ! সে কথা এখানে এসে না জানালেই হ'ত না? তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে জেলার বাবুর বাড়ী থেকে চা আনানো গেল। আবার মিনিট দশেক, দরজা ফাঁক, কেটার মুখ। 'কি রে?' 'চিনি ছৈনা'। সেটাও আনানো গেল। আশা করছি এবার চা আসবে! পাঁচ মিনিট পরে দরজা সবটা খুলে গেল। কেটার শুধু মুখ নয়, সর্ব্বশরীর প্রকাশিত হ'ল—'কি হ'ল রে?' "দুধ ছৈনা।' বন্ধুরা বললেন, 'থাক, থাক্ আপনার বড্ড কষ্ট হ'ল। চা আমরা বাড়ী গিয়েই খাবো।'

জেলার বাবু এলেন। সিগারেট-কেস্‌টা আনবার জন্য "কলিং বেল্" ঠুকছি। তিনি বললেন, 'কেন মিছে যন্তরটা ভাঙছেন। কলিং বেল তো দূরের কথা, কলিং ঢাক্ পিটলেও ওর ঘুম ভাঙবে না। তার চেয়ে এক কাজ করুন, একটা লম্বা দড়ি রাখুন। তার একদিক্ থাকবে আপনার হাতে, আর একটা দিক্ ওর টিকিতে বাঁধা। দরকার হলেই এক টান। এ ছাড়া আর পথ নেই।'

সেদিন আফিসে বড্ড কাজের ভিড়। বিকেলে সকাল সকাল বেরোতে হ'ল। বেশ শীতটা পড়েছিল। কেটাকে ডেকে বললাম, 'ঠিক চারটেয় উনুনে আগুন দিয়ে লুচি-মাংস করে রাখবি।'

কেটা বল্লে, 'ল'।

ফিরতে সাড়ে আটটা হ'য়ে গেল। ক্ষিধে যা পেয়েছিল, মনে হ'ল পেটের ভিতর একটি নাড়ীও বাকী নেই, সব হজম হয়ে গেছে। কিন্তু একি? চারদিক্ অন্ধকার! কোথাও এতটুকু সাড়া নেই। কেটা পালাল? রান্নাঘরটা খাঁ খাঁ করছে। হায়রে লুচি-মাংস! ছেলেমানুষের মত দু' চোখ জলে ভরে গেল। বসবার ঘরে একটা চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে পড়লাম। দেখলাম ঘরের কোণে একটা কম্বলের পুঁটলি পড়ে আছে। ওটা তো ওখানে আগে দেখি নি। কাছে গিয়ে খোঁচা মারতেই সেটা নড়ে উঠ্‌ল, এবং তার পরেই শ্রীমান্ ব্যম্ বাহাদুর মুখ বার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "চার্ বাজ গিয়া?" পেটের আগুন চড়ে গেল মাথায়। ইচ্ছে হ'ল এখুনি ওর মাথার উপর জুতো দিয়ে চার বাজিয়ে দিই। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "চুলামে আগুন লাগাও।" কেটা ছুটে গেল এবং মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে জানাল, 'কয়লা ছৈনা'।

'ষ্টোভ্ জ্বালাও'।

'ইস্পিরিট্ ছৈনা'।

ইস্পিরিট ছৈনা? কাল একটা পুরো বোতল আনা হ'য়েছে! ধমক দিয়ে বললাম, কি করেছিস স্পিরিট! খেয়েছিস? কেটা খানিকটা চুপ করে থেকে বল্‌ল—'জু'। শুনে মাথা

ঘুরে গেল। একদিনে এক বোতল মেথিলেটেড্ স্পিরিট্ কেউ খেয়ে ফেলতে পারে, কে বিশ্বাস করবে? মানুষের সবই সহ্য করবার একটা সীমা আছে। সেটা পেরিয়ে গিয়েছিল। বল্‌লাম, 'নিকাল যাও, উল্লুক, আভি নিকাল যাও।'

কেটা কোন কথা না বলে কাপড়খানা নিয়ে জুতো যোড়া পরে বেরিয়ে চলে গেল।

চার বাজ্ গিয়া?

পর দিন সকালে আবার বদলির হুকুম। মেদিনীপুর কলেরা-ক্যাম্প্! আকাশ থেকে পড়লাম। তার পর মনে হ'ল, বেশই হয়েছে। কেটা ব্যাটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। ওকে ডেকে পাঠিয়ে মাইনে চুকিয়ে দিলাম, এবং সেই সঙ্গে আর একটা টাকা বখসিস্ দিয়ে বল্‌লাম, 'আমার মালগুলো দেখে শুনে বাসে (Bus এ) তুলে দিস।' ঠিক হ'ল জিনিষ-পত্তর নিয়ে একটা বাস্ রিজার্ভ করে শিলিগুড়ি যাব।

শিলিগুড়িতে পৌঁছে মাল গুণে নিচ্ছি। তেরটা হ'বার কথা; হ'চ্ছে চৌদ্দটা। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে, বেশী কি ক'রে হ'ল? দু'জন কুলি মাল নামাচ্ছে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটা কুলি 'রামা হো' বলে এক হাঁক দিয়েই কলাপাতার মত কাঁপতে লাগ্‌ল।

'কী—কী—কীরে?'

'ঐঠো হেলত্আ হায়, বাবুজি!'

'কোনঠো রে?'

'ঐ কম্বল'।...বলে সে কেঁদে ফেলে আর কি। আমি গিয়ে এক ঠেলা দিতেই বেরিয়ে এলেন আমার মূর্ত্তিমান্ ব্যম্ বাহাদুর। সকলে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কেটা চারদিক্ দেখে একেবারে অবাক্। সে মোটেই ইচ্ছা করে আসে নি, মাল তুলে দিতে এসে ঘুম পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কম্বল-মুড়ি, তার পরেই শিলিগুড়ি। দার্জ্জিলিং ছাড়লে কি হয়, কেটার হাত থেকে আমার ছাড়া নেই।

কাঠ-ঠোকরার বৈজ্ঞানিকতা

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

ক'দিন থেকেই একটা কাঠ-ঠোক্‌রা তাদের প্রতিবেশী গাছটার উপর অত্যাচার সুরু করেছিল, এবং এর মধ্যেই ওর সারা গায়ে, নান্‌কু ভালো করেই দেখেছে, যে লক্ষ্য করলে কত লক্ষ লক্ষ গর্ত্তই না দেখ্‌তে পাওয়া যাবে—সেই কাঠ-ঠোক্‌রার কীর্ত্তি!

সেদিনও সকাল থেকে অদ্ভুত পাখীটা কাঠ ঠুক্‌রে গর্ত্ত বানাবার জরুরি কাজে ভারী ব্যাপৃত রয়েছে বলেই মনে হয়; এবং নান্‌কুরও কৌতূহলের অন্ত নেই, বড় বড় চোখ মেলে তার সমস্ত কার্য্যকলাপই সে নিরীক্ষণ করছে।

অবশেষে নান্‌কু আর থাকতে পারল না; কাঠ-ঠোক্‌রাকে প্রশ্ন করে বস্‌ল—'এত গর্ত্ত করে কি লাভ হয় তোমার? এবং এর উদ্দেশ্যই বা কি?"

"দেখ, এখনও বিজ্ঞানের শৈশব-অবস্থাই বল্‌তে গেলে,"—কাঠ-ঠোক্‌রা ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়—"তাই এখন সবিশেষ কিছু তোমাকে আমি জানাতে পার্‌ব না। তবে কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলে থাকেন যে ঐ সব গর্ত্তের মধ্যে আমি খাদ্যশস্য লুকিয়ে রাখি। সেই জন্য—"

নান্‌কু বাধা দেয়—"খাদ্যশস্য কি ব্যাপার?"

"কোন ব্যাপার নয়, বস্তু বিশেষ। সহজ কথায় আমার খাবার খুদকুঁড়ো। বিজ্ঞানের আলোচনা-কালে গুরুগম্ভীর ভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করাই বিধি, দেখছি তাও তুমি জান না! তবে কি ইস্কুলে পড় ছ!"

নান্‌কু হট্‌বার ছেলে নয়—“আমি কোন্ কালে জানি। তোমাকে পরীক্ষা কর্‌ছিলাম কেবল। এবার তোমার গল্প চলুক।”

কাঠ-ঠোক্‌রা প্রতিবাদ করে—“গল্প নয়, এ সব হচ্ছে গবেষণা। অর্থাৎ কিনা, প্রায় সত্য কথা। হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলাম। কতকগুলি বৈজ্ঞানিকের ঐ মত বটে, কিন্তু আবার অন্য কতকগুলি বৈজ্ঞানিকের ধারণা একেবারে তার বিপরীত। তাঁরা বলেন, আমি ঐ সব গর্ত্ত থেকে পোকা-মাকড় বের করে খাই।”

“বটে বটে?” নান্‌কু উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

“হ্যাঁ।” কাঠ-ঠোক্‌রা বলে চলে, “আমি ঐ দুটো ‘থিয়োরী’র মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিলাম কিছুদিন। কিন্তু ফলে হ’ল কি, আমার যা কিছু খুদকুঁড়ো ছিল তা পোকা-মাকড়েরাই সব খেয়ে শেষ কর্‌ল এবং অবশেষে তারাও আর কিছুতে বাইরে বেরুতে চাইল না। তার পর থেকে বিরক্ত হয়ে বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের ভার আমি বৈজ্ঞানিকের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি—তাদের কাজ তারা করুক্, ততক্ষণ আমার কাজ আমি করে চলি।”

“তোমার কাজ তো কেবল নতুন নতুন গর্ত্ত ফাঁদা?”

“হুঁ। আমার বিশ্বাস আছে, শেষ বৈজ্ঞানিক মীমাংসা আবিষ্কার হতে হতে তত দিনে আমি নিজের সুবিধা করে নিতে পার্‌ব।”

“কি রকম্ সুবিধা আশা কর্‌ছ?” নান্‌কু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করে।

“বিস্তর ‘রেডি-মেড্’ গর্ত্ত আমার তৈরী করাই আছে। খবর পাবা মাত্র, এক মুহূর্ত্তের নোটিসে আমি কোন না কোন গাছে সে সব বসিয়ে দিতে পারব। বৈজ্ঞানিকের মাথাতেও তার কয়েকটা বসাবার ইচ্ছা আছে আমার।” কাঠ-ঠোক্‌রা জবাব দেয়।

“দূর্ দূর্!” নান্‌কু একেবারেই বিশ্বাস করতে চায় না। “রেডি-মেড্ গর্ত্ত আবার হয় নাকি? এ কি আমার হাফ্ প্যান্ট্? আর হলেই বা সে সব গর্ত্ত থাকে কোথায়? আর থাকেই যদি তা বসিয়ে দেওয়া এতই কি সোজা?”

“সোজা নয়ই তো! এই কারণেই ষ্টীম্-হ্যামারের সাহায্য নিতে হবে—বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকদের মাথার বেলায়।”

কাঠ-ঠোক্‌রা আর কিছু বলে না, কাঠ ঠুক্‌রে চলে।

নান্‌কু বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে।

[এই বিভাগে গ্রাহকদের নিজের হাতে আঁকা ছবি ও নিজের হাতে তোলা ফটো প্রকাশিত হয়।]

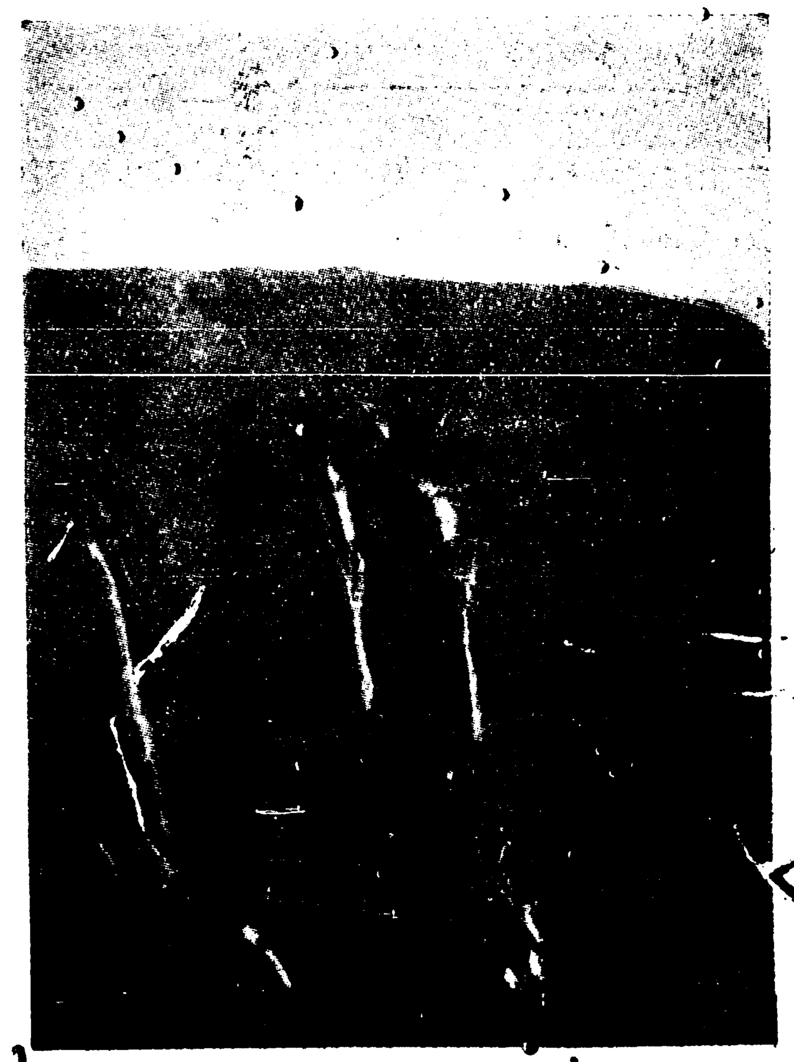

মস্‌মাই জলপ্রপাত

আলোকচিত্র-গ্রহীত্রী—
কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায়

সন্দেশ

তোমরা অনেকেই বোধ হয় "Home Sweet Home" নামক বিখ্যাত ইংরাজী গানটি শুনিয়াছ। এই গানটি যিনি লিখিয়াছিলেন তাঁর নাম জন্ হাওয়ার্ড পেন। তিনি নিজে কিন্তু ছিলেন একেবারে ভবঘুরে— ঘর-বাড়ী বলিতে তাঁর কিছু ছিল না; প্রায় গোটা জীবনটাই ইনি নিঃস্ব অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।

* * *

বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টোর হুগোর লে মিজারেব্ল্স্ বইএ একটা 'বাক্য' আছে— বাক্যটি আড়াই পৃষ্ঠা লম্বা—৮২৩টি শব্দ তার মধ্যে আছে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে আছে ৯৩টা কমা, ৫১টা সেমিকোলেন, ৪টা ড্যাস। এত বড় বাক্য আর কোন সাহিত্যিক কোন দিন ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

* * *

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জর্জ্জ ইংরাজীতে একটি কথাও বলিতে পারিতেন না।

* * *

ইংলণ্ডে ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫০,০০০ ছাত্র পড়ে। অধ্যাপকের সংখ্যাও কম করিয়া সাড়ে তিন হাজার।

* * *

পৃথিবীতে এখনও এক হাজারের উপর আগ্নেয়গিরি আছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র গোটা ত্রিশেক সজীব।

* * *

ইউক্যালিপ্টাস্ গাছ খুব উঁচু হয়, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় আর এক রকম গাছ আছে সেগুলি এক-একটা উঁচু হয় ৫০০ ফুট। এই গাছের নাম গাম্ (আঠা) গাছ।

* * *

সম্রাট্ অশোক আমাদের দেশে অনেক জনহিতকর কাজ করিয়াছিলেন তা তোমরা জান। অশোক যে রোগীদের জন্য হাসপাতাল তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন তাহাও বোধ হয় তোমরা পড়িয়াছ। কিন্তু অশোক শুধু মানুষের চিকিৎসারই ব্যবস্থা করেন নাই— পশু-চিকিৎসার জন্যও হাসপাতাল তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন এবং এই হাসপাতালে নাকি শুধু পশু নয়, আরও অনেক ছোট-খাট জীব—এমন কি পোকা-মাকড়ের পর্য্যন্ত যত্ন লওয়া হইত।

* * *

টেমিস্থেমিং বলিয়া একটা সহর আছে, এখানকার লোকদের কাহাকেও [illegible] পয়সা খাজনা দিতে হয় না। সহরটির মালিক হইতেছে একটা কাগজ-কলের কোম্পানী, তাদের কর্ম্মচারীদের থাকিবার জন্যই শুধু তারা এই সহরটা তৈরী করিয়াছে—কাজেই কারও খাজনার বালাই নাই।

* * *

পেশীর চর্চ্চা করিলে মানুষ কত কি-ই না করিতে পারে! পিয়েরি [illegible]সি নামে একজন ফরাসী অভিনেতা তাঁর চুলের গোড়াকার পেশীগুলিকে এমন ভাবে বশে আনিয়াছেন যে হাত-পা'র মত তিনি ইচ্ছামত চুলও নাড়াইতে পারেন (বলা বাহুল্য মাথা না নাড়িয়া)।

* * *

যোসেফ ক্যাস্পার ছিলেন ইটালীদেশের লোক। তাঁর মত বহুভাষাবিদ লোক পৃথিবীতে আর কেউ হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। ক্যাস্পার ১১৪ টি ভাষা জানিতেন, তার মধ্যে ৫৪টি ভাষায় তাঁর এমন সুন্দর দখল ছিল যে লোকে বুঝিতে পারিত না ওগুলির মধ্যে কোন্টি তাঁর মাতৃভাষা। অথচ ক্যাস্পার জীবনে কোন দিন ইটালীর বাহিরে যান নাই। ক্যাস্পার চীনা ভাষাও বেশ জানিতেন। তাঁর মতে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মধ্যে এইটি শেখাই সব চেয়ে কঠিন এবং এটি শিখিতে তাঁর সব চেয়ে বেশী সময় লাগিয়াছিল।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) ঘোড়া (২) কমলা (৩) তাস (৪) শ্যাম (৫) কৃষ্ণা (৬) প্রয়াগ (৭) কোন্নগর (৮) বর্দ্ধমান (৯) নেউল (১০) গাই (১১) পেরু (১২) যবদ্বীপ (১৩) লাঙল।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

অক্ষয় বিশ্বাস (ভবানীপুর); রমা চৌধুরী (কালিম্পং); রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর); সুমুখনাথ ও রাণী মিত্র, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (দিনাজপুর); রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বালকবৃন্দ (দেওঘর); পদ্মরাণী গুপ্ত, সমর, নানু প্রভৃতি (কলিকাতা); রামপ্রসাদ সিং, প্রফুল্ল, সুধীর প্রভৃতি (বেহালা); প্রতিভা চক্রবর্ত্তী (বারাকপুর); জ্যোতির্ম্ময়, নির্ম্মল, পরেশ প্রভৃতি (পাটনা); মায়া পাল ও সুকুমার পাল (উল্লাপাড়া); রত্না দেবী (পাটনা)।

যাঁহাদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে—

দিলীপ, ধীরাজ ও অঞ্জলি ব্যানার্জ্জি (জলপাইগুড়ি); বাণী বসু (চাইবাসা); নৃসিংহ-মুরারি দত্ত (কর্ণিন ষ্ট্রীট); শিবানী, ভবানী, কল্যাণী সরকার (ধুবড়ী); সুনীল, বৈদ্যনাথ, তোতু (লক্ষ্ণৌ); মৃণালকান্তি ও বিমলকান্তি গুহ (বৈটপুর); রণেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী); [illegible] ও তপনকুমার দত্ত (মিরাশী); কুমুদরঞ্জন সান্যাল, পতঞ্জলি, শলু (গৌরীপুর); মিরাশী হাই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ; বিমল, অজিত, মেজদা প্রভৃতি (মালদহ); বাসন্তী, কল্যাণী, নীহার (শ্রীহট্ট); প্রমোদ চন্দ্র মুস্তাফী (জামসেদপুর); সমিতা ও হিমাংশু (কলিকাতা); রাণু, লেখা, হাসি (নিউ দিল্লী); কল্যাণকিশোর ব্যানার্জ্জি (গয়া); কামিনী, সুশীল, সুবোধ প্রভৃতি (হাইলাকান্দী); কালিসাধন চট্টোপাধ্যায় (মূলাজোড়); গৌরীশঙ্কর, শঙ্কর, প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর); ভোলা,

ওকিনহাসি ও নির্ম্মলকুমার সেন (গোপালগঞ্জ) ; রমা রায়, রাণী, বিজু প্রভৃতি (ক'লকাতা) ; গোড়গ্রাম এম্, ই, স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ; অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাঞ্চন, নির্ম্মল (বালিগঞ্জ) ; প্রসূন (নালান্দা) ; নিখিল চৌধুরী (রাজসাহী) ; কল্যাণী, লীলা, নমিতা প্রভৃতি (কলিকাতা) ; অমলচন্দ্র ও উমারাণী মুস্তফী (মাথাভাঙ্গা) ; শিমুলিয়া আর, সি, এম্, ই, স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (দেবীসহুর) ।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

'কল' এই দুটি অক্ষরের আগে বা পরে (মাঝে নয় কিন্তু) অন্য অক্ষর বা আকার-ইকারাদি চিহ্ন যোগ ক'রে অনেক কথা বানান যায়। নীচে ঐ রকমের কয়েকটি কথা, ভাবার্থ বা মানে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কথাগুলি বের করতে পার কি ?

উদাহরণ ঃ—ধাঁধা ঃ "সমস্ত কল" ; উত্তর "সকল" ।

(১) ঝুটা কল (২) শিক্ষিতের ভাব প্রকাশের কল (৩) তেলওয়ালা কল (৪) বিগড়ান কল (৫) জলভরার কল (৬) অকালপক্কের ভরসা কল (৭) মিষ্ট-খাদ্য কল (৮) হুবহু কল (৯) পিঠে লাগে-কল (১০) নিন্দার বা দাগের কল (১১) অশান্তির কল (১২) বন্ধনের কল।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

১। ১৮৪৯ সনে। ২। নেপালের প্রধান মন্ত্রীকেই 'মহারাজ' বলা হয় এবং তিনিই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। 'মহারাজাধিরাজ' সম্মানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নামে দেশের কর্ত্তা হইলেও আসলে তাঁর কোনই ক্ষমতা নাই। ৩। নিউক্যাসলে। ৪। আমেরিকার জাতীয় খেলা বেস বল, ইংল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা ক্রিকেট। ৫। Marylebone Cricket Club.

৬। W. Rontgen ; অঙ্কে কোন জিনিষ জানা না থাকিলে তার জায়গায় 'এক্স' লেখা হয়। আলোটার কারণ তখন জানা ছিল না, তাই তার নাম 'এক্স' দেওয়া হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে, কাজেই অগ্রহায়ণ মাসের রামধনু ১লা অগ্রহায়ণ বাহির না হইয়া ৭ই অগ্রহায়ণ বাহির হইবে।

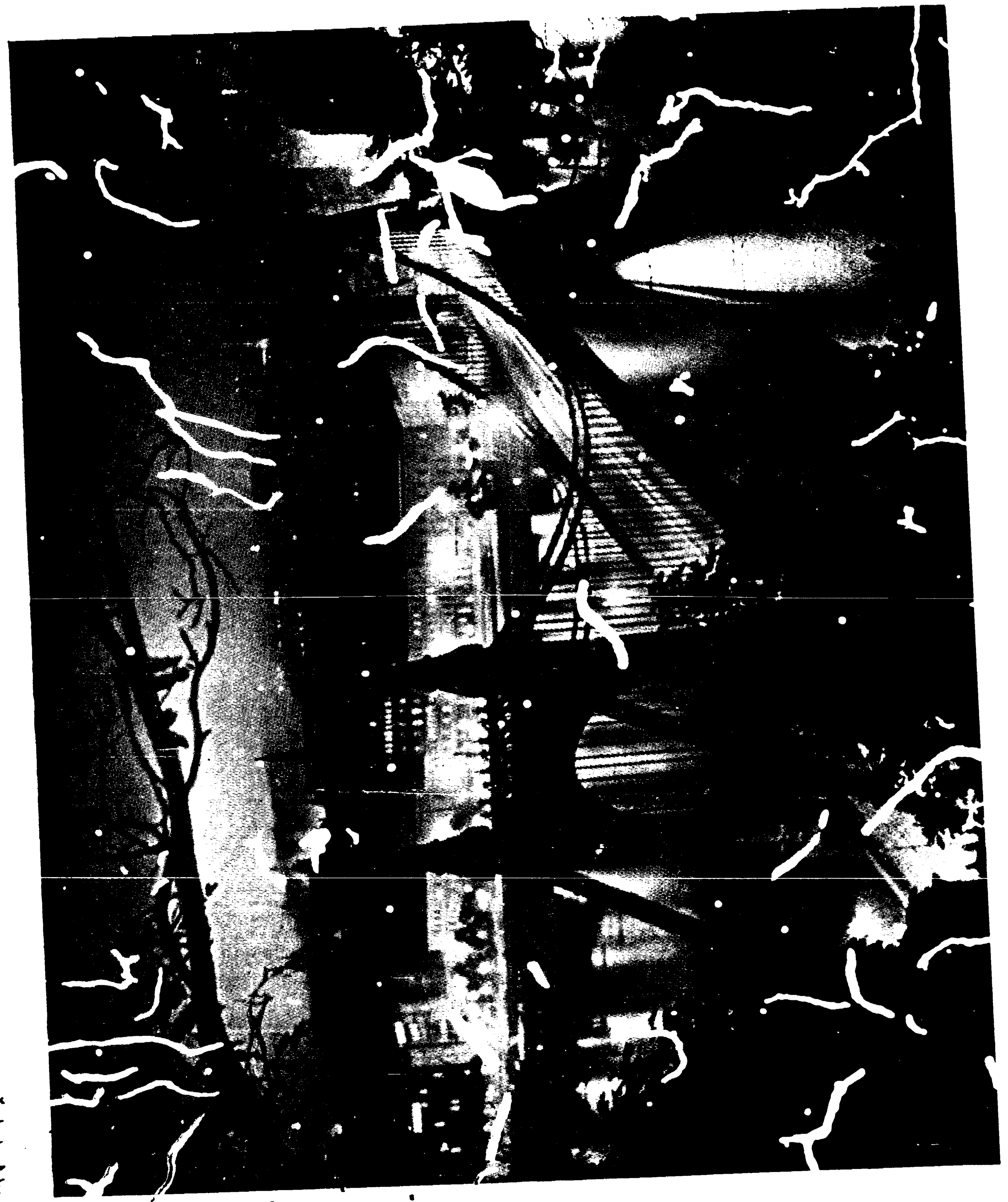

আলো-ছায়া

৯ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ { ১১শ সংখ্যা

কয় ভাই বোন

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী)

ভোরবেলা জানালায় কে ডাকে ?
খুট্‌খাট্‌ খুট্‌খাট্‌—ওঠো ওঠো ব'লে হায় কে ডাকে ?
তন্দ্রায় গান গাই
গান গাই ঠাণ্ডায়
ফুলে ভরে শিউলির পাতাভরা সে শাখে।
কয় ভাইবোনে হায়, ভোরবেলা ঠাণ্ডায় কে ডাকে ?

টলমল করে জল পুকুরে—
সূর্য্যি দেখিছে মুখ শিশিরের মুকুরে

খুট্খাট্ জান্‌লায়
কে যে ভাই গান গায়,
ভয় পাই ঝুম্-ঝুম্ ঝুনুরে।
ভোরের আলোতে দেখি টলমল করে জল পুকুরে।

ঘুমসাথীদের মাঝে সাড়া প'ল জাগ্‌বার-
ডেকে ফিরে যায় কে গো বারবার !
ছোট ছোট জামা গায়
হাত ধরি' পায় পায়
সময় হ'য়েছে ফুল ঝর্‌বার—
টুপ্‌টাপ্ ফুল ঝরে, সাড়া প'ল জাগ্‌বার।

ঝোপে ঝোপে ঘুমাইছে পাখীরা,
শিউলিতলায় চলি চুপিচুপি সাথীরা—
চেয়ে থাকি জামা গায়
শিশির ঝরিয়া যায়
ফুল পনে টুপ্‌টাপ্ ডেকে উঠে পাখীরা—
শিউলিতলায় চলি চুপিচুপি সাথীরা।

ভোরবেলা জান্‌লায় কে ডাকে ?
খুট্খাট্ খুট্খাট্— ওঠো ওঠো ব'লে হায় কে ডাকে ?
তন্দ্রায় গান গাই
গান গাই ঠাণ্ডায়
ফুল ভরে শিউলির পাতাভরা সে শাখে।
কয় ভাইবোনে হায় ভোরবেলা ঠাণ্ডায় কে ডাকে ?

———

চোর

(শ্রীরজত সেন)

সে দুর্য্যোগের রাত্রির কথা—আমার আজও মনে আছে—যেদিন বিমল বাবুর বৃদ্ধ কাকা মারা গেলেন। অমাবস্যার রাত্রি; বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র আর ভিজা বাতাসের অবিশ্রাম সোঁ সোঁ গর্জ্জন। কোন অদৃশ্য স্থান থেকে মাঝে মাঝে একটা কুকুর করুণ ভাবে কেঁদে উঠ্‌ছিল। মৃত দেহটার মুখের দিকে তাকাবার কারুর সাহস নেই, পৃথিবীতে এমন সাংঘাতিক বীভৎস মুখ দেখা গেছে বোধ হয় কমই।

কিন্তু দুর্য্যোগ যতই ভয়াবহ হোক, ঘরের মধ্যে একটা মড়া রেখে দেওয়া যায় না তা ব'লে। যথারীতি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং শবদাহ করাও হ'ল। কিন্তু যারা শ্মশানে গিয়েছিল তারা ভয় পেয়েছিল খুব। মৃতদেহ যখন চিতায় তোলা হ'ল তখন কোথা থেকে ঐ ঝড়বাদলার রাত্রে এল এক ভিখিরী, তার 'নাকটা নেই বল্‌লেই হয়, অন্ধকারে প্রকাণ্ড দুটো সাদা দাঁত ঝক্‌ঝক্ করছে; বল্‌লে, 'পয়সা দাও, ক্ষিধে পেয়েছে।' বিমল বাবু কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলেন—কিন্তু তাঁর কথা শেষ না হ'তেই সে ভিখিরীটা ভীষণ কর্কশকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, 'চাই-না শুন্‌তে কোন কথা, পয়সা দেবে কিনা বল।' বিমল বাবু এবং অন্যান্য সঙ্গীরা ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌লেন। শেষ পর্য্যন্ত কয়েক আনা পয়সা তাকে দিতেই সে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কিন্তু ব্যাপার যাই হোক আসলে বিমল বাবুর কাকা লোক ছিলেন অতি সৎ এবং সহৃদয়। বিমল বাবু অনেক টাকা খরচ ক'রে তাঁর কাকা নরহরি বাবুর একখানি তৈলচিত্র প্রসিদ্ধ একজন চিত্রকরকে দিয়ে আঁকিয়ে চমৎকার ফ্রেমে বাঁধিয়ে বাইরের ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখলেন, কিন্তু তাতেও কি শান্তি আছে? সেই প্রকাণ্ড ছবিখানা টাঙ্গাবার পর থেকে বিমল বাবুর বাড়ীতে টেকাই দায় হ'য়ে উঠ্‌ল। যখন তখন তিনি ভয় পেয়ে চম্‌কে ওঠেন। মনে হয়, তাঁর কাকার মারা যাবার

সেই রাত্রের কুকুরটা যেন বার বার ডেকে উঠছে। ঘরের কোন এক কোণ থেকে সেই কুৎসিত কানা ভিখিরীটার কর্কশ কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে! বন্ধুবান্ধবেরা বোঝাতে চেষ্টা পান এ তাঁর মনের বিকার, কিন্তু বিমল বাবুর মন বোঝে না; ছবিটাকে তিনি দূর করতে পারলেই বাঁচেন। কিন্তু কেমন ক'রে দূর করবেন? নষ্ট করতে ভয় হয়। কোন্ দিক্ দিয়ে কখন বিপদ্ আসে বলা যায় না।

কয়েক দিন পরে এক রাত্রে বিমল বাবু বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছবিখানার কথাই ভাবছিলেন। বোধ হয় ঈষৎ তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ নীচে কিসের অস্পষ্ট শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পেতে রইলেন। শব্দটা ক্রমে স্পষ্টতর হ'ল। মনে হ'ল যেন কেউ বাইরের ঘরের দরজা খুলে ঘরে ঢুক্‌ছে। বিমল বাবু বিছানার উপর উঠে বস্‌লেন, ভূতের যতই ক্ষমতা থাক দরজা খোলবার ক্ষমতা আছে কিনা সে বিষয়ে বিমল বাবুর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বোধ হয় চোর।

তিনি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। স্পষ্ট শুনতে পেলেন কেউ বৈঠকখানা ঘরের আলমারি খুল্‌ছে। তিনি এগিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি, দূর থেকে দেখ্‌লেন একটা লোক বাঁ হাতে টর্চ্চ ধরে ডান হাতে আলমারির ডালাটা খুলে ফেলেছে। লোকটা যে চোর সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ রইল না। খুব যোয়ান নয়, বিমল বাবু একাই কাবু ক'রে ফেল্‌তে পারবেন। নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে তিনি এগিয়ে পেছন থেকে ক্যাঁক ক'রে তার টুঁটি টিপে ধর্‌লেন, যৌবনে কুস্তি লড়া তাঁর বৃথা হয় নি। লোকটার হাত থেকে টর্চ্চটা মাটিতে পড়ে গেল; একবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ল বিমল বাবুর হাত ছাড়াতে পারে কিনা, কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা! খুব শক্তিমান্ কোন লোকও বিমল বাবুর সে বজ্রমুষ্টি ছাড়াতে পারত কিনা সন্দেহ।

'আঃ লাগ্‌ছে খুব, ছেড়ে দিন' চোরটা কাতর কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, 'নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে মারা গেলাম যে!'

'পালাবার চেষ্টা করবে না?' বিমল বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

'না; পুলিসে দেবেন না ত?' চোর বল্‌লে।

'সে দেখা যাবে।' বিমল বাবু তার গলা ছেড়ে দিয়ে আলোর সুইচ্ টিপ্‌তে ঘরটা আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

রোগা লিক্‌লিকে লোকটা, পায়ে জুতো নেই। মাথায় লম্বা টেরী, গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবী।

'নূতন দেখ্‌লাম।' বিমল বাবু বল্‌লেন।

'কি?' চোর তাকা'ল তাঁর মুখের দিকে।

'চোর আবার সিল্কের জামা গায়ে দেয়!'

'চোরের কি ভদ্রলোক হ'তে সাধ যায় না?' ও চট্ করে উত্তর দিলে।

'কিন্তু জামাটাও তো চোরাই'—বিমল বাবু ঠাট্টা ক'রে বল্‌লেন।

'আজ্ঞে না, নিজের পয়সায় কেনা!'

'পয়সা কোথায় পেলে?'

মনে হ'ল চোর ঘাবড়ে গেছে, বল্‌লে, 'তা অবশ্যি পকেট মেরেছি।'

বিমল বাবু হেসে ফেল্‌লেন। চোরের মুখ দেখে মনে হ'ল সে রীতিমত রাগ করেছে।

'ওহে শুন্‌ছ?' বিমল বাবু তাকে ডাক্‌লেন।

'না, শোনবার কি আছে বলুন!' চোর জবাব দিলে।

'তুমি বেজায় চটে গেছ দেখ্‌ছি। শোন, এক কাজ করতে পার? তা হ'লে কিন্তু পুলিসে দেব না।'

'কি কাজ?'

'ঐ যে দেওয়ালে প্রকাণ্ড ছবিখানা দেখ্‌ছ, ওখানা চুরি কর্‌তে পারবে?'

ওর বোধ হয় ছবিখানার দিকে আগে নজর পড়ে নি। কয়েক মিনিট তৈলচিত্রখানির দিকে তাকিয়ে ও বল্‌লে, 'আপনিও তো ছবিখানা চুরি করতে পারেন; আপনার নিজের বাড়ী, আমার থেকে আপনার সুবিধে তো অনেক বেশী!'

'তুমি তো বড় বাচাল দেখ্ছি হে! তোমায় বল্ছি, তুমি পারবে কিনা সে কথাটাই বল না।'

'এ আর এমন শক্ত কি? সামান্য 'একখানা ছবি তো! আপনি যদি বলেন তো আপনার শোবার ঘরের লোহার সিন্ধুকটাও চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পারি! কিন্তু ছবি একখানা চুরি ক'রে কি হ'বে?' চোরটা আবার তাকাল ছবির দিকে।

'সামান্য নয় হে! ঐ যে ছবির ফ্রেম দেখ্ছ—কিসের বল্তে পার?'

'কাঠের, সোনালী রং করা তার ওপরে।'

'বুদ্ধি থাক্লে কি আর চুরি করতে?' বিমল বাবু ঠাট্টা ক'রে বল্লেন, 'কাঠের নয় ফ্রেমটা, সোনার, একেবারে নীরেট সোনার। চেন তো সোনা? কাছে গিয়ে একবার দেখ না যদি বিশ্বাস না হয়।'

চোর আবার তাকা'ল ছবিটার দিকে, বিস্ময়ে তার চোখ দু'টি বিস্ফারিত, কথাটা সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না; বিমল বাবুর দিকে তাকাল ভালো ক'রে। লোকটা পাগল নয় তো? চোর ভাব্লে।

'শোন, ক'বে তোমার সুবিধা হ'বে বল, ছবিখানা চুরি করে নিয়ে যাবে। কাল?'

'কাল'? কাল আমার সুবিধে হবে না।'

'কাল বুঝি আর কারও সিন্ধুক ফাঁসাবার মৎলব? তোমাকে তো দেখে দাগী চোরই মনে হচ্ছে। বেশ কাল না হয়—পরশু?'

চোর মাথা নেড়ে জানা'ল যে সে পারবে।

'ক'টার সময় আসবে? একটা?'

'হুঁ, সেদিন ধরিয়ে দেবেন না ত?'

'না!'

সেদিন শনিবার। বিমল বাবুর মনে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। ছবিখানা বাড়ী থেকে বিদায় হ'লে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। যা সব কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে, শেষ

কালে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হ'বে। ছবিখানাই যে যত সব ভূতুড়ে ব্যাপারের মূল সে বিষয়ে বিমল বাবুর আর কোনই সন্দেহ নেই।

রাত্রে বিমল বাবু বিছানায় জেগে আছেন; ঘুম আস্ছে না। সমস্ত ইন্দ্রিয় তার উৎসুক হ'য়ে অপেক্ষা করছে। এই বুঝি এল সেই চোর। ব্যাটা না আবার অন্ধকারে সাংঘাতিক কিছু দেখে মূর্চ্ছা যায়!

হঠাৎ নীচে শোনা গেল কার পায়ের শব্দ। বিমল বাবু বিছানা থেকে উঠে অন্ধকারে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। গলির দরজাটা তিনি ইচ্ছে করেই খোলা রেখেছিলেন আজ। উল্লুকটা দরজাটা কোথায় একটুখানি ঠেলে দেখ্বে—তা না পাঁচীল টপকাচ্ছে! অভ্যেস পাঁচীল টপকানো, কি আর করবে?

বৈঠকখানা থেকে রীতিমত শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিমল বাবুর আশঙ্কা হ'ল যদি বাড়ীর অন্যান্য লোক সব জেগে যায় গোলমালে, তা হ'লে যা ঠ্যাঙ্গানটা খাবে তা কল্পনা ক'রে তিনি প্রায় শিউরে উঠ্লেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে শেষ হ'ল শব্দ। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, শুধু অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রাম শব্দ। আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, তারই স্তিমিত আলোকে বিমল বাবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখ্লেন বামালসমেত চোর পালাচ্ছে। তিনি একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। এত সহজে এবং নিরাপদে যে কার্য্য সুসম্পন্ন হ'বে সেটা তিনি আদৌ ভাবতে পারেন নি! চোরগুলো আবার বিশেষ ক'রে যা গাড়োল হয়, ওদের চুরি না ক'রে ঘানি টানা উচিত।

বিমল বাবু আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলেন। ঘরের বাতি জ্বাল্তেই চোখে পড়ল নরহরি বাবুর প্রকাণ্ড তৈলচিত্রখানা ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে, আর ছবির ফ্রেমখানা বেমালুম অদৃশ্য!

তিনি গাড়োলের মতই ফ্রেমহীন ছবিখানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। শেষ কালে কিনা একটা সামান্য ছিঁচ্কে চোর তাঁকে ঠকিয়ে গেল—যে চোরকে তিনি পুলিসে দিতে পারতেন, নিজে ঠ্যাঙ্গাতে পারতেন, এমন কি বদমায়েস্টার কান দুটোকে আচ্ছা ক'রে টেনে ঘোড়ার মত লম্বা ক'রে দিতে পারতেন!

জাপান !—জাপান !

(শ্রীজগৎমোহন সেন)

চল, একবার জাপান বেড়িয়ে আসি।

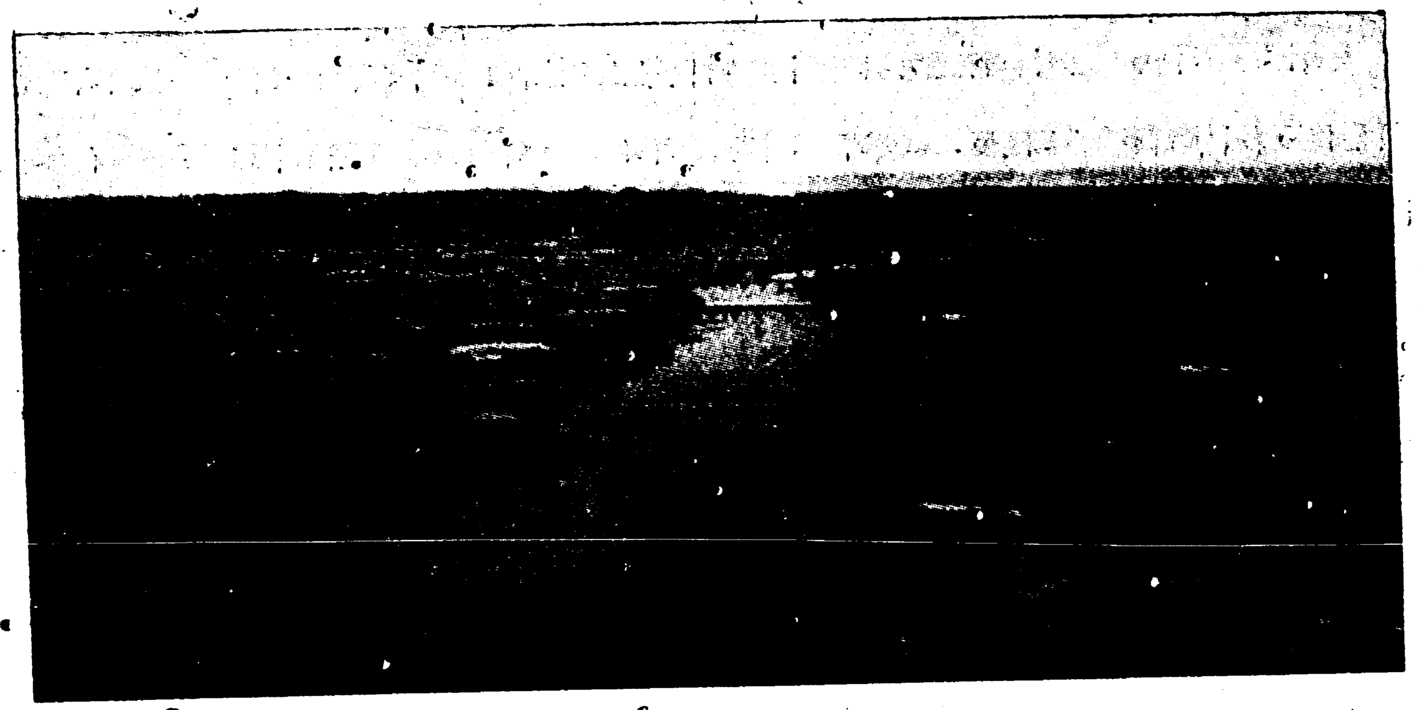

ইস্, বল্‌লেই হ'ল আর কি! জাপান কি এ-পাড়া ও-পাড়া? যাই বললেই তো যাওয়া হয় না। যাওয়ার ব্যবস্থা করা চাই;—টাকা চাই, পাসপোর্ট চাই। কিন্তু আমরা যাব নিখরচায় যাব আর আসব। কি করে যাই বল তো? ভাবতে পারছ না বুঝি?

কি করেই বা ভাব্‌বে! মন-পবনের না' তো তোমরা দেখনি কেউ। রূপ-কথা তো দেশছাড়া হবার জোগাড়। যাক্ গে, ও কথায় কাজ কি? চল, ঐ মন-পবনের নায়েই জাপান বেড়িয়ে আসি। ফুর্‌ফুরে হাল্কা ইচ্ছের হাওয়া পালে লাগিয়ে তরতর করে ছুটে চলবে মন-পবনের না',—স্থান-কাল পেরিয়ে যাব আর আসব। ভয় পাচ্ছ না তো? তা যদি হয়, তবে কাজ নেই। কিন্তু ভয়ই বা কেন? এসো তবে।

এই তো জাপান। 'এটা রাজধানী টোকিও বুঝি? তাই হবে। এখনও ভোর হয় নি। বাড়ীগুলো সব বন্ধ করা বড় বড় কাঠের বাক্সের মতন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। রাত্তিরে ওরা কোন বাড়ীতেই দরজা-জানালা খুলে রাখে না। পুলিশের কড়া শাসন আছে,—দরজা-জানালা খোলা রাখলে পাছে চোরের উপদ্রব বাড়ে,—সেই জন্যে।

চল, ঐ বাড়ীটায় ঢুকে পড়ি। ভয় নেই, চোর বলে কেউ ধরবে না। আমাদের দেখবেই

বা কে, আর আমাদের মন-পবনের না' রুখবেই বা কে? কাজটা কিন্তু,—তা হ'লই বা। একটা দিন না হয় কৌতূহলের খাতিরে একটু,—সত্যিই তো অন্যায় হচ্ছে না এতে!

বাড়ীর ভেতর ঘরগুলো সব কাঠের পরদা দিয়ে ভাগ করা। দরজা-জানালায় সব "আমাদো" (কাঠের টানা ঢাকনা) দেওয়া আছে। সব ঘরে কাগজের লণ্ঠনের ম্লান আলো। এরা সারা রাত ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখে।

ঘরের মেঝের উপর সর্ব্বত্র "তাতামি" (মাদুর) পাতা। তার উপর দু'খানা করে পুরু লেপের মধ্যে ঢুকে সব দিব্যি ঘুমুচ্ছে। মাথার তলায় কাঠের বালিশ। লক্ষ্য করে দেখ, একজনও উত্তর-দিকে মাথা রেখে ঘুমোয় নি; ঠিক আমাদের মতনই। মৃতদেহকে উত্তর-শিয়রে শোয়ানো ওদেরও নিয়ম, তাই ও-দিকে মাথা দিয়ে কেউ শোয় না।

ক্র্—র্—র্—র্—এই যে, ঘড়িতে এলার্ম বাজল;—ভোর পাঁচটা। বাড়ীর গিন্নী উঠলেন। ঐ দেখ, আলো নিভিয়ে রাখলেন। এইবার "আমাদো"-গুলো সরিয়ে দিলেন। খড়্—খড়্—ঘড়্—ঘড়্—সব বাড়ীতেই "আমাদো" টানার শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঃ, সারা পাড়াটা কেঁপে উঠছে ও আওয়াজে। ধ্যেৎ, এমন চমৎকার আলস্যে মজগুল ভোর-ঘুম, ও কি টিঁকবে এতে? শুধু তো তাই নয়,—ঐ শোন, হেঁসেলে কোন বল্লভ-সূপকার পরম উৎসাহে কাঠ চিরতে সুরু করেছে। মিউনিসিপ্যালিটির রিক্‌শ-ওয়ালা ঝাড়ুদার ঝড়ের বেগে পাতা ঝেঁটিয়ে নিচ্ছে। নাঃ, আর ঘুমোনো যায় না,—এতেও যদি কেউ বিছানায় পড়ে আড়ামোড়া দেবার যোগাড়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই সে কুম্ভকর্ণের কলি-সংস্করণ। বাড়ীর সধাই উঠে পড়েছে—বাড়ীর চাকর-বাকর থেকে সুরু করে বুড়ী ঠাকুমা পর্য্যন্ত। হাত-মুখ ধোয়ার ধুম পড়েছে এইবার। কিন্তু এদের সঙ্গে আমাদের কি দরকার? চল, বন্ধু-বান্ধবের যোগাড় করি।

ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে—দুই ভাই এক বোন। ওদের পরিচয় দি'; সব চেয়ে বড় হলেন বড় কুমার "তারো সান"। তারো নামটা জাপানী ছেলেরা খুব পছন্দ করে। তারো হ'ল রূপ-কথার এক মস্ত বীর-পুরুষ। মোমো-তারোর গল্প,—ওঃ, সে ভারী মজা। শুনবে না কি? তোমরা অনেকেই জানো কিন্তু। সেই যে রাক্ষসের উনোনের মধ্যে রইল গিলে, পান্তভাতের হাঁড়ীতে শিঙী মাছ, আর ঘরের কোণে বোল্‌তা। রাক্ষস বেচারী উনোনে ফুঁ দিতে গিয়ে কাণা হ'ল গিলে ফুটে, তার পর যথাক্রমে যথাস্থানে শিঙী আর বোলতার হুলের চোটে বেচারী মরতে পথ পেল না। কিন্তু এখন যদি গল্প শুন্‌তে ব'স তবে আর জাপান বেড়ানো হবে না। মন-পবনের না' এক সঙ্গে ক'দিকে ছুটবে বল? রাত্তিরে বরং তারোর ঠাকুমার কাছেই শুনো গল্পটা, বেশ চমৎকার করে বলবেন এখন।

তারোর ছোট বোন হ'লেন যুচী সান, অর্থাৎ তুষারিকা দেবী। সব চেয়ে ছোট ইতো

সান, এখনও অত্যন্ত 'নাবালক'; তোমাদের দলে ভেড়বার মত লায়েক হয়ে উঠতে পারেন নি এখনও, কাজেই ওঁর নামের ব্যাখ্যাটা আর নাই শুনলে। আসল কথা কি জান ?—মুখ ফুটে বলতে হবে সেটা ? আন্দাজই কর না।

ওদের মুখ ধোওয়া হয়ে গেছে। চল, ওদের অজান্তে আমরাও ও কাজটা সেরে নি। জাপান দেখতে এসেছি বলে কি মুখ না ধুয়ে অনাহারে কাটাতে হবে না কি ?

ঘরের মধ্যে দেখ, সব বিছানা-পত্তর তোলা হয়ে গেছে। চাকরেরা সে সব তুলে "তোদানা"র (ইংরেজি-কাবার্ড) মধ্যে রেখে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে কোন আসবাব নেই,—মাঝখানে "হিবাচি"তে আগুনের উপর ছোট একটা লোহার কেটলিতে "ওচা"-র (চা) জল গরম হচ্ছে। তারই কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম আর প্রাতরাশের ব্যবস্থা।

সকালবেলা ভাত তোমরা অনেকেই পছন্দ করবে না। কিন্তু এরা আমাদের চেয়েও "ভেতো", তিনবেলা ভাত না হলে ওদের চলে না। তাই বলে "ভেতো" বাঙালীর যে দুর্ণাম "ভেতো" জাপানীর সেটি নেই। দুনিয়ার লোক জাপানকে কি চোখে দেখে সে তো দেখতেই পাও রোজ। যাক্, এ ভাত তোমরা হয়তো আরও এক কারণে পছন্দ করবে না। ভাতের ফেন এরা গালে না, গালবার দরকার হয় না। ভাত ঠিক মত সেদ্ধ হতে যতটা জল চাই, তার বেশী জল ওরা দেয় না। কুন্দ ফুলের পাপড়ির মত ভাত ওদের হয় না বটে, কিন্তু ওদের ভাতই ভাল, খুব পুষ্টিকর। ফেনের সঙ্গে আমরা ভাতের অনেক সারই বাদ দি'। ওদের ভাতে সেটি হতে পায় না।

দুপুর বেলা এক ঘুম ঘুমিয়ে নিয়ে নুনে মজানো কুল খেতে আরাম আছে বই কি ! কিন্তু তাই বলে সাত সকালে,—দূর। বাটিতে আর একটি জিনিস রয়েছে দেখ—এক রকম ঝোল। ওরা বলে "ওমিসো"; সিম থেকে "তোফু" বলে ছানার মত এক রকম জিনিস তৈরী করে, তারই ঝোল। আর আছে পচা মূলো; "মূরি, মূরিকা পত্তি" পশ্চিমে খুব চলে শুনেছি, তোমাদের কেমন লাগবে জানি না। ওটা ওদের চাটনির মত, খুব খায়। আর ডিম; নেবে নাকি দু' একটা তুলে ?

নাঃ, আর হ'ল না। ঐ যে ওরা এসে গেছে খেতে। আমাদের দেখতে পেলে খুবই আদর-অভ্যর্থনা করে খাওয়াত; বিদায় দেবার সময় "ইত্তে ইরাষ্‌ষাই মাষি" বলে আর একদিন আসবার নেমন্তন্নও করে রাখত। কিন্তু যাক্, ওতে কাজ নেই। মন-পবনের না' যদি বিগড়েই যায়, কে জানে, তখন আবার সারানো মুস্কিল। আমরা যেমন আছি তেমনিই থাকি,—অলক্ষ্যে।

বাঃ, আকো আর য়ুচী কি চমৎকার জামা পরেছে দেখেছ ? ঢিলে জামা, ওরা বলে

"কিমোনো"। তারোর কিমোনো কালো কালো ডোরা কাটা, একটা আলখাল্লার মত আর কি। আস্তিন ওর ছোট। হুক্ নেই, বোতাম নেই, কোমরে একটা কালো "ওবি" দিয়ে কিমোনো বেঁধে রেখেছে। ইতো-ও কিমোনো আর ওবি পরে, সে হল্‌দে রঙের। একটা জিনিস কিন্তু ইতো-র নেই,—"হাকামা"। ও যে বড্ড ছোট্ট ! তারোর কিন্তু হাকামা আছে; সে পাঁচ বছর থেকেই বড় হয়ে গেছে, সে জন্যে ওর গর্ব্বও আছে মনে। "হাকামা" হ'ল ঢিলে পা-জামা। তারোর পায়ে আছে সাদা রঙের "তোবি"; মোজা না বলে ওকে পায়ের দস্তানা বলাই ভাল। তোবি গোড়ালি ছাড়িয়ে ওঠে না। দস্তানার মত ওতে আঙুলের ঘর আছে, পায়ের একল-সেঁড়ে বুড়ো আঙুলটা একলা একদিকে আর অন্য আঙুলগুলো একদিকে থাকে; তা না হলে "গেতা" (খড়মই বলা যাক্) পরবার সুবিধা হয় না। তোবি না পরাটা খুব 'বে-দস্তর কাজ। "গেতা" বোধ হয়, তোমরা পছন্দ করবে না,—বড্ড উঁচু উঁচু। তবে "জোরি" পরে খুব আরাম আছে। আজ বৃষ্টি না হ'লে ওরা "জোরি" পরেই বেরুতো। ও-সব বাইরে রাখা আছে। ভেতরে ওদের প্রবেশ নিষেধ।

প্রকৃতির দুলাল জাপান—দূরে ফুজি।

য়ুচীর কিমোনোর ভারী বাহার, রঙে রঙে ঝলমল করছে। লতা-পাতা-ফুল-পাখী, কত কি ওতে আঁকা আছে। আস্তিনটা খুব ঢিলে,—হাঁটু পর্য্যন্ত পড়ে। য়ুচীর আস্তিন একটা মজার জিনিস। ওর ভেতর দিকে খোল আছে, তার মধ্যে য়ুচীর বই-পত্তর থেকে আরম্ভ করে পুতুল, খাবার পর্য্যন্ত বেমালুম ঢুকে যেতে পারে। বাইরে থেকে তুমি টেরও পাবে না।

য়ুচীর ওবি-টা খুব সখের জিনিস, আর খুব দামী। ওর মা ওর চুল বেঁধে দিয়েছেন। চুলের ফিতে-কাঁটাগুলো দেখবার মত। ওবি-র মত ওগুলোও ওর সখের সামগ্রী।

তাই বলে পোষাক পছন্দ না হলে তোমরা যেমন কেউ কেউ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কান্না সুরু করে দাও—(রাগ ক'র না, আমি কেউ কেউ বলেছি, আর কথাটা সত্যিও বটে)—কোন

জাপানী ছেলেমেয়ে তেমন করবে না। খুব ছোটবেলা থেকেই ওরা মুখ বুজে সহ্য করতে শেখে। খুসী হলে হো হো করে হাসেও না, আর দুঃখে ভেউ-ভেউ করে কাঁদেও না। অতি শান্ত, ভদ্র আর নম্র, সর্ব্বদা হাসি-হাসি মুখ। এ তুমি ছেলে-বুড়ো সকলেরই দেখতে পাবে।

হয়ত ভাবছ মা-বাপের শাসনের ভয়ে ওরা মুখ বুজে সব সহ্য করে। তা নয়, মা-বাপের আদর ওরা কারো চেয়ে কম পায় না একতিল। বলে, জাপানী ছেলেমেয়েদের মত সুখী দুনিয়ার কোন ছেলে-মেয়ে নয়। ছেলেমেয়েদের মারধ'র করার কথা ওদের মা-বাপ ভাবতেও পারেন না। আর গালাগাল ?—শুনেছি, জাপানীরা মাত্র দুটির বেশী গাল জানে না,—অমানুষ আর অ-জাপানী। হয়ত ভাবছ, এ আবার গাল কি? কিন্তু ঐ ওদের চরম কথা,—নিজেদের মনুষ্যত্ব আর জাতীয়তাকে ওরা প্রাণের মত ভালবাসে। তাই শাসন করার দরকার ওদের হয় না। নিজের সম্মানকে ভালবাসে বলে ওরা দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা সব অম্লান-মুখে সহ্য করতে শেখে আপনা থেকেই। কাজটা ওদের কাছে খুব গুরুতর কিছু নয়, নিতান্ত আটপৌরে ব্যাপার।

কিন্তু এতক্ষণে ওদের খাওয়া হয়ে গেল যে। কেমন কাঠি দিয়ে খেল দেখলে তো! ঠাকুমা কাছে বসে পরিবেষণ করতে লাগলেন। বেশ খুসী হয়েই ওরা ঐ সব খাবার খেয়েছে। দেখবে বাটিতে একটিও ভাত পড়ে নেই। সব শেষে চায়ের পালা। তোমরা বেশ দুধচিনি দেওয়া মিষ্টি মিষ্টি চায়ের কথা ভাবছিলে বুঝি? কিন্তু ওদের ওচ্চা-টা আমাদের কাছে সত্যিই ভারী ওঁচা ব্যাপার,—না আছে এক ফোঁটা দুধ, না একটু চিনি। নাক সিঁটকোচ্ছ বুঝি? এ দেশে ও কাজটা না করাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

মা এতক্ষণ ওদের খাতা-বই বেঁধে দিয়েছেন। দুপুর বেলার জল খাবারের বাক্স "ওবেন্তো"ও গুছিয়ে রেখেছেন। সাড়ে সাতটার আগেই ওদের ইস্কুলে পৌঁছতে হবে। ঐ দেখ, যাবার আগে কেমন মা-বাবা-ঠাকুমা সবাইকে ওরা প্রণাম করছে—রোজই করে। ওঁরা আশীর্ব্বাদ করে বলেন, "আচ্ছা, তবে এখন এসো গিয়ে।" এইবার ওরা হাতে দোয়াত ঝুলিয়ে ইস্কুলে বেরুলো। চল, একবার ওদের সঙ্গেই যাই।

ছেলেমেয়েরা সব এসেই হাঁটু গেড়ে মাষ্টার মশাইকে প্রণাম করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে গলার ভেতর দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে এক রকম আওয়াজ করছে,—আমরা আঁৎকে উঠলে যেমন করি কতকটা সেই রকম।

বছর পঁচিশেক আগে ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে মেঝের উপর পা মুড়ে বসে লেখাপড়া করত। কিন্তু দেখা গেল, অমন ভাবে বেশীক্ষণ বসে থাকার ফলে ছেলেমেয়েরা ভাল বাড়তে পায় না,—বড় হয়েও বেঁটেই থেকে যায়। তাই এখন বেঞ্চি-ডেস্কের চল হয়েছে।

ওরা লেখে কি করে দেখ। কলম লাগে না,—তুলি দিয়ে ওপর থেকে নীচের দিকে

ক্রমাগত ছবি এঁকে যায়। সেই হ'ল ওদের লেখা। অক্ষরগুলো ওদের নিজের নয়, চীন থেকে আমদানি করা। অক্ষরই বা বলি কেন, ওগুলো কথা,—প্রত্যেক ছবিই এক একটা শব্দ। প্রায় হাজার তিনেক করে ঐ সব শব্দ ওদের লিখতে, শিখতে হয়। লেখা আরম্ভ হয় উর্দ্দুর মত ডান দিকেই, কিন্তু বাঁয়ে না গিয়ে নীচে নামতে থাকে। এক লাইন হয়ে গেলে তার পাশেই বাঁ দিকে অন্য লাইন সুরু হয়। শেষ হয় বাঁ দিকের নীচের কোণে।

এখন তারো আর য়ুচী দু'জনেই খুব ছোট, তাই একই ইস্কুলে পড়ে। আর একটু বড় হ'লে তারো অন্য ইস্কুলে যাবে, য়ুচী হয়ত বাড়ীতেই শিখবে। স্কুলের লেখাপড়া ছাড়া বাড়ীতে ওদের অনেক রকম বিষয় শিখতে হয়,—আদব-কায়দা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। কাকে কি ভাবে কবার প্রণাম করতে হবে, বন্ধুর সঙ্গে, গুরুজনের সঙ্গে, অতিথির সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে, এ সব ঐ দু'বছরের ইতো পর্য্যন্ত শিখেছে। বাড়ীতে কেউ নতুন লোক এলেন, ইতো হয়ত তখন ঘুমোচ্ছে; প্রণাম করবার জন্যে তক্ষুণি ওকে ডেকে তোলা হবে। ও উঠবেও ঠিক,—একটুও কাঁদবে না। প্রণাম করে আবার ওর দিদির পিঠে চড়ে তখনি ঘুমিয়ে পড়বে।

যে ছেলে-মেয়েদের পরের বাড়ী চাকরী করতে হবে তাদের জন্যে বাড়ীতে স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাড়ীতে লোক এলে কি ভাবে কথা কইতে হবে, কি ভাবে ঘরে ঢুকতে হবে, কি ভাবে খাবার পরিবেষণ করতে হবে, কতখানি উঁচুতে চায়ের ট্রে ধরতে হবে, ইত্যাদি অনেক কিছু ওদের শিখতে হয়। কারো বাড়ী চাকরী করা জাপানীদের কাছে অসম্মানের কাজ নয়। বেশ ভাল বংশের ছেলেমেয়েরাও কাজ করে। বাড়ীর চাকর-বাকর বাড়ীর লোকের মতই থাকে। মনিবের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতেও ওদের বাধে না; কিন্তু ওদের সব কাজেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তার বাইরে ওরা যায় না। বাড়ীতে ওরা চাকর বটে, কিন্তু বাইরের লোক ওদের সঙ্গে চাকর-বাকরের মত ব্যবহার করে না, সমস্কন্ধ লোকের মতই কথা বলে।

প্রত্যেক জাপানী ছেলেমেয়ে খুব ছোট থেকেই স্বদেশ, রাজা এবং গুরুজনকে ভক্তি করতে শেখে। এটা ওদের জীবনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। তারো আর য়ুচী যে সব বই পড়ে, তার দু'একটা গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে গুরুভক্তি ওদের কি জিনিস। একখানি বই হচ্ছে,—"চতুর্ব্বিংশ সন্তান-রত্ন"। সু-পুত্রের আদর্শ কি, তারই গল্প এ বইতে আছে।

একটি গল্প আমাদের উদ্দালক-আরুণির মত। তবে আরুণির গুরুর স্নেহের অভাব ছিল না, ওঁর উদ্দেশ্য ছিল শিষ্যকে পরীক্ষা করা। কিন্তু এ বেচারীর ছিলেন কঠোর-হৃদয়া বিমাতা। তাঁর ছিল মাছ খাওয়ার সখ নিদারুণ। মাছ খাওয়ার জন্যে নানা ভাবে তিনি সতীন-পোর ওপর জুলুম করতেন। এক দারুণ শীতের রাত্রে নদীর জল জমে বরফ হয়ে গেছে,—মাছ পাবার কোন সম্ভাবনা

নেই ; কিন্তু বিমাতার মাছ চাই-ই। অগত্যা ছেলেটি গিয়ে জমাট বরফের ওপর শুয়ে পড়ল। ওর গায়ের তাপে খানিকটা বরফ গলে গিয়ে একটা গর্ত্ত হ'ল। তখন দু'টি মাছ ধরে এনে সে সৎ-মাকে সন্তুষ্ট করলে।

আর এক সুসন্তান মা-বাপকে শান্তিতে ঘুমোতে দেবার জন্যে নিজে খালি গায়ে ঘুমোত। উদ্দেশ্য এই যে, মশারা সব ওর গায়ে এসেই বসবে। রোরাইশাই-র গল্প শুনলে তোমরা হাসবে না কাঁদবে? ওঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছর। তখনো ওঁর নব্বই বছরের মা বাপ বেঁচে। বুড়োবুড়ীর ভীমরতি হয়েছিল নিশ্চয়ই, তাই সত্তর বছরের খোকা রোরাইশাই বাড়ীতে হামা টেনে ওঁদের বোঝাতেন যে বয়স ওঁদের খুব বেশী হয় নি,—যে হেতু "খোকা"-টি এখনো হাঁটতে শেখেনি।

দিব্যি লক্ষ্মী মেয়ে

তারোর কাছে রাজা এবং দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় কথা আর কিছুই নেই। দেশ এবং রাজা তারোর চোখে অভিন্ন। স্বদেশ-স্বজাতির মান-সম্ভ্রম অনাহত রাখতে, দেশের আইন-কানুন-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখতে ও হাজার বিপদ্‌কেও তুচ্ছ করতে শিক্ষা পাচ্ছে। এখনও ওর বয়স কম, আর একটু বড় হলেই ও যুদ্ধবিদ্যা, যুযুৎসু ইত্যাদি শিখে দেশসেবার জন্যে নিজেকে তৈরী করবে।

আর য়ুচী,—অমন লক্ষ্মী, বাধ্য মেয়ে পেলে আমাদের দেশের মা-বাপেরা হাতে স্বর্গ পাবেন। রাগ হচ্ছে বুঝি মনে মনে? তোমাদের ভেতর যে লক্ষ্মী মেয়ে নেই, এমন কথা আমি বলি নি, এই ত, তুমিই রয়েছ। কিন্তু য়ুচী সান জানে, হুকুম তামিল করতেই ওর জন্ম যতদিন না শাশুড়ী হতে পারছে, ততদিন ওর ঐ করেই কাটবে। এখন তবু ভাল কাপড়-

চোপড় পরে, খেলা-ধূলো-আমোদ-আহ্লাদ করতে পায়, শ্বশুর-বাড়ী গেলে এ সব কিছুই ওর থাকবে না,—আমোদ-আহ্লাদ, থিয়েটার-বায়স্কোপ, কিচ্ছু না। বাড়ীর বৌ ছাড়া তখন আর ও কিছুই নয়। তাই বলে ঘোমটা-টানা বৌ নয়,—পরদা এদের নেই যে। নিজের অভাব অসুবিধার ভাবনা দূর করে বাড়ীর সবাইকার সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হবে ওকেই। এদের অনেক মেয়ে নাকি খুব বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী হয়,—যেমন আমাদের দেশে এখনও কিছু কিছু আছে। য়ুচীর কপালে কি জুটবে কে জানে!

এখন থেকেই দেখ না কেন,—বয়স ওর আর কতই হবে, বড় জোর পাঁচ কি ছয়—এখন থেকেই ও ইতোকে পিঠে বেঁধে বেড়ায়। ইস্কুল থেকে ফিরে যখন খেলা করতে যাবে, দে'খ তখন। তোমরা পার কেউ? ইতো-ও কম নয়। দিদি যখন ছুটোছুটী করে বেড়ায় ও তখন নিশ্চিন্ত আরামে ওর পিঠের ওপর বসে থাকে। দিদির দৌড়োনোর তালে তালে ওর ছোট্ট মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ দুলতে থাকে, ওর তা'তে একটুও আপত্তি নেই। ঐ ভাবে দু'এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতেও ওর বাধে না।

ঢং—ঢং—ঢং—ঐ যাঃ, ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল; বিকেল চারটে। চল, আমরাও ফিরি, তারো আর য়ুচী কেমন খেলা করে দেখব।

বছরের মধ্যে একটি দিন য়ুচীর সব চেয়ে ভাল লাগে। সে হ'ল ৩রা মার্চ্চ (তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিন)। "ও হিনা মাৎসুরি"—পুতুলের উৎসব ষোল-আনা ওকে নিয়েই হয়। য়ুচীর জন্মের পর প্রথম ৩রা মার্চ্চ ওর হাতে প্রথম পুতুল দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে বছরে বছরে ও এই উৎসব করে আসছে। ও হিনা মাৎসুরি-র দিন য়ুচী-ই হ'ল বাড়ীর গিন্নী,—সারা বছরের মধ্যে ঐ একটি দিন ও মনের সুখে গিন্নীপনা করে নেয়। সেদিন একটি ঘরে উৎসবের দেবতা "ও হিনা সানের" মূর্ত্তি সাজানো থাকে, তাঁর চারদিকে থাকে থাকে আরও অনেক পুতুল, সব চেয়ে ওপরে রাজা-রাণীর মূর্ত্তি। পুতুলের বেদীর ওপর লাল রঙের কাপড় পাতা। পুতুলগুলি চমৎকার কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজানো।

পুতুলগুলি সব বিভিন্ন যুগের,—শ'-শ'-বছরের পুরানো। যখনকার পুতুল, তখনকার সাজ-পোষাক। এ সব পুতুল য়ুচীর ঠাকুমা আর মা-র সম্পত্তি—ছেলেবেলায় ওঁরাও ওঁদের মা-ঠাকুমার কাছে পেয়ে খেলা করেছেন, আর আসবার সময় সঙ্গে করে শ্বশুর-বাড়ী নিয়ে এসেছেন। ওদের মধ্যে অনেক দামী দামী পুতুল আছে,—সবগুলি আটপৌরে খেলার জন্যে নয়। সে-সব বেশ যত্ন করে রাখা থাকে। বংশানুক্রমে পুতুলেরাও সংখ্যায় বাড়তে থাকে। ও হিনা মাৎসুরির দিন য়ুচী বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ায়,—বালির ভাত আর কাঁচা ঘাসের তরকারি নয়, দস্তুর মত রান্না করা খাবার। এখন হয়ত মা একটু-আধটু সাহায্য করেন,—

কিন্তু এর পরে য়ুচীই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়াবে। ওর রান্নাঘরে একটিও সাজ-সরঞ্জামের অভাব খুঁজে পাবে না।

তারোর মজার দিন হচ্ছে ৫ই মে,—পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিন। সেদিন "তাংগো বে সেক্কু"—মধু-কেতনোৎসব। বাড়ীর সে দিনের কর্ত্তা তারো। য়ুচীর মত সেও সেদিন নিজের বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করে,—তবে রাঁধে না নিশ্চয়ই। আর কর্ত্তা সেজে ঠাকুর দাদার কেদারায় বসে নাকের ওপর চশমা ঝুলিয়ে গড়গড়া টানবার চেষ্টাও করে না।

তারোর উৎসবে পুতুল নেই। আছে পুরাণ-প্রসিদ্ধ বীরপুরুষদের বড় বড় কাঠের মূর্ত্তি আর যুদ্ধের সরঞ্জাম। সে সব ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। বাড়ীর মাথায় লম্বা-লম্বা বাঁশের আগায় রঙ-বেরঙের কাগুজে মাছ উড়তে থাকে। সে মাছ আমাদের দেশে দেখা যায় না। ইংরেজীতে ওর নাম কার্প্। কার্প্ নাকি স্রোতের প্রতিকূলে লড়তে ওস্তাদ,—দুর্দ্দান্ত জলপ্রপাতের বেগ কাটিয়েও ও উজান যেতে পারে, সেই জন্যে ও মাছ এরা খুব পছন্দ করে। তারো যে পুরুষ-মানুষ,—বিঘ্ন-বিপদের প্রতিকূলে যুঝেই ওর সারাটা জীবন কাটবে। তাই উৎসবের দিনে ঐ লড়ায়ে মাছকে-ই ওরা চোখের সামনে রাখে। কাগুজে মাছগুলো ফাঁপা আর মুখ-হাঁ-করা। মুখে বাতাস ঢুকে ওগুলো ফেঁপে উঠে উড়তে থাকে, পাতাকার মত।

"তাং গো নে সেক্কু" রণদেবতা "হাকাইমা"র প্রিয় দিন। তাই তারো আর ওর বন্ধুরা সেদিন লড়াই-লড়াই খেলে। নিজেদের মধ্যে দু'দল ওরা করে নেয়,—"হেই কি" আর "জেঞ্জি"। তোমরা হ'লে হয়ত দেব-রাক্ষস, কি কৌরব-পাণ্ডব কি মোগল-পাঠান এই রকম কিছু দল করতে। যোদ্ধাদের মাথায় থাকে মাটির শিরস্ত্রাণ আর হাতে বাঁশের কৃপাণ। যুদ্ধে যার শিরস্ত্রাণ ভাঙে তার হার হয়।

এই যে বাড়ীতে এসে গেছে ওরা। এইবার খেলতে যাবে। য়ুচীর পিঠে ইতো-কে বেঁধে দিয়েছে কেমন দেখ। ঐ দেখ, সব দল বেঁধে কেমন খেলা করছে। রং-বেরং-এর পোষাকে দূর থেকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে ওদের,—যেন একরাশ ফোটা ফুল।

ওদের অনেক রকম খেলা আছে,—লাট্টুর লড়াই, ফড়িং-শিকার, যুদ্ধের খেলা, বালিতে ছবি আঁকা,—আরও কত কি। আজ কিন্তু একটা ভারী মজার খেলা চলেছে; তোমাদের কাছে একেবারে নতুন।

চারি দিকে ঘিরে বসে কেমন স্থির হয়ে সব দেখছে দেখ। একটা কাগজের গাড়ীতে চাল বোঝাই করা,—গোটা ছ'য়েক ঝিঁঝি পোকা ধরে ঐ গাড়ী টানানো হচ্ছে। গাড়ীটা সিল্কের সুতো আর আঠা দিয়ে পোকাগুলোর পিঠে আটকে রাখা হয়েছে। তোমাদের ভাল লাগে এ খেলা?

খেলতে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি এদের মধ্যে খুব কমই হয়। হলেও মিটতে বেশী সময় লাগে না। একজন বড় ছেলে সব মীমাংসা করে দেয়। তা নয়ত "জন কেম্পো",—সে কি জানো? ওরা নিজেদের মধ্যে বলে, "জন কেম্পো"। তার পর ডান হাতটা পেছনে নিয়ে কাগজ, পাথর, নয়ত কাঁচি করে এক সঙ্গে সামনে এনে দেখায়। হাতের পাতা খোলা থাকলে কাগজ, মুঠো থাকলে পাথর আর মধ্যমা-তর্জ্জনী ফাঁক করা থাকলে হয় কাঁচি। পাথর কাঁচি ভাঙে, কাঁচি কাগজ কাটে, আর কাগজ পাথরকে বন্দী করে। বুঝতে পারলে না বুঝি? আচ্ছা, দেখো'খন।

রাত্তিরে সব বাড়ী ফিরে "ও-মিসো" খেল। তার পর তারো আর য়ুচী ঠাকুমার কোল ঘেঁসে বসল;—'ঠাকুমা, গল্প বল না।'

'কিসের গল্প?'

'মোমো তারো।'

'না, য়ুরোশিমা;' য়ুচী বললে।

ঠাকুমা অল্প একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা তবে নিজেরাই ঠিক কর, মোমো তারো না য়ুরোশিমা।'

তারো বললে, 'আচ্ছা বেশ, জন কেম্পো।'

য়ুচী বললে, 'হাঁ, জন কেম্পো।'

তাড়াতাড়ি হাত পেছনে নিয়ে দু'জনেই বার করে দেখাল। য়ুচীর পাথর আর তারোর কাগজ। তারো জিতে গেল। ঠাকুমা সুরু করলেন, 'আচ্ছা, তবে মোমো তারোই শোনো।

'এক যে ছিল বুড়ো আর বুড়ী। বয়েস অনেক,—বড্ড গরীব ওরা। এক পাহাড়ের নীচে ছোট একটি কুঁড়ে বেঁধে দু'জনে দুঃখে সুখে ঘরকন্না করে।—গতর খাটিয়ে খায়।

'পাহাড়ের তলা দিয়ে তরতর করে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী—কি চমৎকার তার জল,—যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি পাতলা আর পরিষ্কার,—যেন স্ফটিক।

'বুড়ো রোজ পাহাড়ের জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনে, আর বুড়ী নদীতে কাপড় কাচে। ছেলেপিলে নেই,—তাই ওদের মনে ভারী কষ্ট। বুড়ী রোজই ভাবে, আহা, যদি একটি ছেলে থাকত। চাঁদের মত ফুটফুটে নাই বা হ'ল, হাঁদা হ'ক বোকা হ'ক, একটা ছেলে যদি থাকত। বুড়ী রোজ দাওয়ায় বসে ভাবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।' বলে, 'ভগবান, একটি ছেলে দাও।

'এক দিন হয়েছে কি, না—', কিন্তু' রাত হয়ে গেছে যে! সারা দিন কিচ্ছু খাওয়া হয় নি সে কথা মনে আছে? গল্প খেলে পেট ভরবে বুঝি? গল্পই শোনো তবে বসে। আমি কিন্তু

বাড়ী চল্‌লাম। ঘুম পায় তো ঐ তারো কি য়ুচীর লেপের মধ্যে ঢুকে কাঠের বালিশ মাথায় দিয়ে রাত কাটিও। নয় তো মন-পবনের নায়ে বাড়ী যেও! তোমাদের জন্য ওটা রেখেই না হয় গেলাম।

"ঈরা-ব"

(শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

কোথাও বৃষ্টির নামগন্ধও নেই—গরমে প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। রেগে-মেগে বল্লুম রেঙ্গুন দেখার সাধ মিটেছে। এবার মানে মানে কল্‌কাতা ফির্‌তে পার্‌লে বাঁচি।

'কিন্তু তাড়াতাড়ি ফেরা আর হ'ল না—সবাই বল্ল, "আর ক'টা দিন কাটিয়ে দাও না, সাম্‌নেই বার্ম্মিজদের জলোৎসব (water-festival)। বৃষ্টি সেদিন হ'বেই হবে, প্রতি বছরই হয়। ঠাণ্ডাও কম্‌বে, আর তা ছাড়া এ উৎসবটাও একটা দেখার জিনিষ!" এই আশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই থেকে গেলাম।

দিন কতক পরের কথা—দালানে একটা ডেক্ চেয়ার টেনে চোখ বুঁজে চুপ্‌চাপ্ শুয়ে আছি, হঠাৎ রাস্তায় ভীষণ হৈ হৈ শব্দে চম্‌কে উঠ্‌লুম। গোড়ায় মনে হ'ল সাধারণতঃ এদের মধ্যে যে রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে এও তাই। কিন্তু একটু তলিয়ে বুঝ্‌লুম এটা ওদের উল্লাসের চীৎকার—হাঁ, উৎসবের উল্লাসই বটে, আর বোধ হয় এ-ই 'জলোৎসব'! ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে বুড়োবুড়ীরাও উঠেছে মেতে। হাতে তাদের বাল্‌তি বাল্‌তি জল, আর তাই দিয়ে লোককে একেবারে কুকুর-ভেজা করে ছাড়্‌ছে, পথিককে ক'রে তুল্‌ছে বিভ্রান্ত। অনেকটা আমাদের দোল খেলারই মত—তবে এরা ব্যবহার করে শুধু সাদা জল, রংএর স্পর্শও নেই কোথাও। কিন্তু এত বেশী জল ঢালে যে সবশুদ্ধ একটা বিশ্রী বীভৎসতারই সৃষ্টি হয়। শুধু জল ঢালা নয়, তার সঙ্গে ওদের ভাষায় সবাই একটা একটানা

চীৎকার করে চলেছে—দুর্ব্বোধ্য বলেই মনে হ'ল। হয় জাতীয়-সঙ্গীত, আর না হয় আনন্দধ্বনি!

একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব দেখ্‌ছি। এমন সময় মনোজেরা সদলে এসে হাজির হ'ল। আজ বিকেলে নাকি ওদের বাড়ী নেমন্তন্ন। বল্লুম—"রাস্তার এই দুর্যোগ এড়িয়ে যাব কেমন করে?" ছোটদি একটা উপায়ের কথা বল্ল—"ঐ যে দেখ্‌ছ না ওরা একটানা চীৎকার করে চলেছে..."ঈরা-ব, ঈরা-ব"...বলে, কথাটার মানে হচ্ছে 'আমাকে জল দিও না'—নিজেদের মধ্যে কেউ যদি ও কথা বলে চেঁচায় তা হ'লে ওদের উত্তেজনা বেড়ে যায়,—জল দেয় বেশী করে। কিন্তু বিদেশীর মুখে এ কথা শুন্‌লে ওরা ছেড়ে দেয়। অতএব..."

বাধা দিয়ে বল্লুম—"অতএবের পরের কথাগুলো খুবই সোজা—ভাব্‌ছি হুড্‌টা নামিয়েই যেতে পার্‌ব।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই..." অনেকে এক সঙ্গে উত্তর দিল।

বিকেলের দিকে স্নান সেরে যথোচিত পরিচ্ছন্ন ভাবে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের "চীপে রোডের" বাড়ী থেকে মনোজদের বাড়ীর রাস্তা লেক্‌টার ধার দিয়ে। অনেকটা নির্ব্বিঘ্নে আসা গেল—ওদের উৎসবের উল্লাস খানিক কমে এসেছে বলে লেক্‌টা আসা পর্য্যন্ত আমার দিকে কেউ জল ছোঁড়ে নি। তাই আমাকেও কর্‌তে হয় নি "ঈরা-ব" মহামন্ত্রের উচ্চারণ। কিন্তু গোল বাধ্‌ল এই লেক্‌টারই ধারে—একদল বার্ম্মিজ মস্ত মস্ত পিয়ে দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। অগত্যা গাড়ী থামাতে হ'ল। চেয়ে দেখি ওদের প্রত্যেকেরই হাতে জল-ভরা বাল্‌তি, জামা-কাপড় সপ্‌সপে ভিজে। প্রথমটায় আমাকে বিদেশী দেখে ওরা যেন একটু দোনোমনো কর্‌ছিল—জল দেবে কি না। ভাব্‌লুম ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া যাক্, তাই চীৎকার করে উঠ্‌লুম—"ঈরা-ব"।

অবাক কাণ্ড! কোথায় গেল ওদের সেই দোনোমনো ভাব, বাল্‌তির পর বাল্‌তি জল ঝর্‌তে লাগ্‌ল আমার উপর—আমি যত চেঁচাই "ঈরা-ব", ওরা ততই জল ঢেলে চলে!

* * * *

এর পরের কথাগুলো আর না বল্লেই ভাল ছিল। কারণ বাকী সবটাই আমার দিক্ থেকে একটা করুণ কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রমাগত জল ঢুকে ঢুকে গাড়ীর কল গেল বিগড়ে। এখান থেকে আবার আমাদের বাড়ী অনেক দূর, বরং মনোজদেরটা খুব কাছে। একটা "ন্যাংচা"য় * চড়ে চল্লুম ওদের বাড়ী—নিতান্ত দায়ে না পড়লে মানুষ এমন করুণ অবস্থায় নেমন্তন্ন খেতে আসে না। কিন্তু পৌঁছে তো তাজ্জব! আমার জন্য তোয়ালে থেকে গেঞ্জী পর্য্যন্ত প্রস্তুত!

একটা কথা না বল্লে নিতান্ত যেন অসঙ্গতি থেকে যায়—আইস্-ক্রীমের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছোটদি' বলেছিলেন—"ঈরাঁ-ব"র আদত মানে হচ্ছে—আমি করি নে ভয়, যত খুসী জল দাও না কেন।"

সর্প নদীর সন্ধানে

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

আমাজন নদীর 'কথা তোমরা সকলেই বোধ হয় জান? অমন চওড়া নদী সারা পৃথিবী খুঁজিয়া তুমি দ্বিতীয় আর একটি পাইবে না। সে কি যেমন-তেমন চওড়া? মোহানার কাছে এ নদীর বেড়, কম করিয়া প্রায় দু'শ' মাইল! কিন্তু শুধু চওড়ার জন্যই নয়, আর এক দিয়াও এ নদীর তুলনা মেলা ভার। এ নদীর আশ-পাশে যে ভীষণ অরণ্য রহিয়াছে তার যুড়ি পৃথিবীতে খুব বেশী নাই। সে জঙ্গল এমনই ভয়াবহ যে তার মধ্যে একবার ঢুকিলে কম লোকেই প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। নানা রকম হিংস্র জানোয়ার—জগুয়ার, কুমীর, বরাহ, বিষাক্ত সাপ, বিষাক্ত পোকা-মাকড় এবং বিষাক্ত রোগের বীজে সে বন আগাগোড়া ভর্ত্তি। তার ভিতর এমন অনেক জায়গা আছে যেখান দিয়া

* স্থানীয় রিক্সার মত গাড়ী।

দিনের পর দিন মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া গেলেও তুমি এক ফোঁটা সূর্য্যের আলোর দেখা পাইবে না।

কিন্তু ভগবানের বিধান কে বুঝিতে পারে? এ হেন জায়গায়ও তিনি এমন সব ধনরত্ন ছড়াইয়া রাখিয়াছেন যার লোভ এড়ানও আধুনিক মানুষের পক্ষে নেহাৎ সহজ কথা নয়। প্রচুর বন্য রবার, সিঙ্কোনা (যা হইতে কুইনিন হয়), কফি প্রভৃতি মূল্যবান্ গাছপালা তিনি যেন বাছিয়া বাছিয়া এখানেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। তা ছাড়া কাছাকাছি আরও দিয়াছেন রাশি রাশি সোনা, রূপা, তামা, পেট্রোলিয়াম্ প্রভৃতির খনি। সভ্য মানুষের কাছে এর সবগুলিই সমান লোভনীয়। কিন্তু এ সব সংগ্রহ করিতে হইলে প্রথমটা জায়গাটি সম্বন্ধে ভাল রকম ভৌগোলিক জ্ঞান থাকা দরকার, তার পর দরকার মালপত্র, লোকজন যাতায়াতের উপযুক্ত পথঘাট।

আমাজন-অঞ্চলের গহন অরণ্য

কিন্তু উপরে জায়গাটার চেহারা সম্বন্ধে যেটুকু আভাস দিয়াছি তা হইতেই বুঝা যাইবে এ অঞ্চল সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান আয়ত্ত করা নেহাৎ সহজ ব্যাপার নয়। শুধু আমাজন নয়, আমাজনের আশ-পাশে যে সব উপনদী ও শাখা-নদী রহিয়াছে সেগুলির অবস্থাও ঐ একই ধরণের—তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করাও প্রায় একই রকম কষ্টকর।

কিন্তু কষ্টকর বলিয়া ফেলিয়া রাখিলে কোন কিছুই হয় না। এক শ্রেণীর লোক আছে যারা সত্যিসত্যিই অসাধ্য সাধন করিতে পারে—দেশের, দশের উন্নতির

জন্য জীবনটাকে তারা নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। এই রকম বীর পৃথিবীতে আছে বলিয়াই আজ আমাজন-অঞ্চলের ভৌগোলিক তথ্যও অনেকখানি জানা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কি কঠিন ভাবে এ তথ্য তাদের সংগ্রহ করিতে হইয়াছে তা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। আজ তারই একটু আভাস তোমাদের দিব।

দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপ্ খুলিলে তোমরা দেখিতে পাইবে আমাজন নদীর কিছু নীচে কুজ্কো নামে একটা সহর আছে। এই কুজ্কোর কাছাকাছি মালভূমি হইতে একটা নদী বাহির হইয়া পূব দিকে চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু কোথায় গিয়াছে সে সম্বন্ধে ৭০।৮০ বছর আগেও কারো কোন ধারণা ছিল না। এই নদীর আসল নাম Madre De Dois অর্থাৎ "দেবতার মা"—কিন্তু নদীটি এমন ভীষণ আঁকাবাঁকা যে স্থানীয় লোকে এর নাম দিয়াছে সর্প নদী। নদীটি যে শুধু সাপের মত আঁকাবাঁকা তাই নয়, সাপের মত ভয়াবহও বটে। দু'-চার জন সাহসী আবিষ্কারক এ নদীর সীমা অন্বেষণ করিতে রওনা হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। হয়তো গভীর অরণ্যের ভিতর তাঁরা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন, নয়তো ও অঞ্চলের অসভ্য আদিম অধিবাসীদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন। ও অঞ্চলের লোকেরা এ নদীর নাম শুনিলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত—এ নদীর সন্ধানে যাওয়া আর নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়া একই কথা বলিয়া তারা জানিত।

আমি প্রায় ৭০।৮০ বছর আগেকার কথা বলিতেছি। সেই সময়ে এখানে একটা সমিতি ছিল। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আশপাশের—বিশেষতঃ আমাজন-অঞ্চল সম্বন্ধে নানা রকম ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করা। কারণ আগেই বলিয়াছি কোন জায়গা সম্বন্ধে ভাল ভৌগোলিক জ্ঞান না থাকিলে তার ভিতরকার সম্পদ্ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ম্যালডোনেডো ছিলেন এই সমিতিরই একজন সভ্য। যেমন অদ্ভুত ছিল তাঁর সাহস তেমনি ছিল চরিত্রের দৃঢ়তা। সর্প নদী সম্বন্ধে নানা রকম বিভীষিকা-পূর্ণ গল্প শুনিয়া ম্যালডোনেডোর সাধ হইল তিনি এ নদীটিকে লোকের কাছে চিনাইয়া দিবার ভার লইবেন—হয়তো তা'তে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ম্যালডোনেডো দেখিতে দেখিতে তাঁরই মত আরও ছয় জন অসমসাহসিক সঙ্গী যোগাড় করিয়া ফেলিলেন, আর সঙ্গে চলিলেন

তাঁর ভাই গ্রেগরি। নতুন জায়গা আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁদের কারোই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না—সঙ্গে কি কি লওয়া দরকার সে সম্বন্ধেও ভাল ধারণা ছিল না। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁরা বেশী মাথা ঘামাইলেন না। অতি সামান্য কিছু সরঞ্জাম, খাবার আর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া একদিন আট জন বাহির হইয়া পড়িলেন।

সর্প নদীতে নামিতে হইলে মালভূমির উপর গভীর বনের ভিতর দিয়া অনেকখানি পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। এই বনের পথটিই যে এত মারাত্মক হইবে তা' তাঁরা আগে ভাবেন নাই। প্রথমটা তাঁরা বেশ মনের আনন্দেই চলিতে লাগিলেন কিন্তু একটু পরেই দু'পাশে বড় বড় ঘাস দেখা দিল, পায়ের তলায় দেখা দিল স্যাঁৎসেঁতে কাদা। তার পর আরম্ভ হইল ঘন কুয়াসা—এক গজ দূরের লোককেও দেখা যায় না।

ক্রমে রাস্তা আরও দুর্গম হইতে লাগিল। পায়ের নীচে বড় বড় শিকড় সাপের মত জড়াইয়া রহিয়াছে—তার ভিতরে ভিতরে অসংখ্য কাঁটাঝোপ—কোথাও এক আঙ্গুল ফাঁক নাই। মাথার উপর গাছের ডালপালা এমন ভাবে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে যে তার ভিতর দিয়া একটুও সূর্য্যের আলো ঢুকিতে পারে না,—দুপুরবেলাই মনে হয় যেন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কোথাও আবার সে পাতা বাহিয়া অবিরাম টিপ্ টিপ্ করিয়া জল ঝরিতেছে—একটা স্যাঁৎসেঁতে গুমোট ভাবে আবহাওয়া ভর্ত্তি। সেই সঙ্গে আরম্ভ হইল পোকা-মাকড়ের উৎপাত। গায়ের ধাক্কা লাগিয়া গাছের উপর হইতে নানা রকম পোকা-মাকড় তাঁদের গায়ে পড়িতে লাগিল—তাদের কোন কোনটার কামড় এমন ভীষণ যে দস্তুরমত ঘা হইয়া গেল। ছুরি দিয়া গাছের ডাল কাটিতে কাটিতে তাঁরা আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু চলিবার উপযুক্ত রাস্তাও যে তাঁদের সব সময়ে জুটিল এমন কথা বলা যায় না। কখনও কখনও তাঁরা একেবারে পাহাড়ের ধারে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলেন যেখান হইতে এক ইঞ্চি পা ফস্কাইলে আর রক্ষা নাই। পাহাড়ের গা দেয়ালের মত খাড়া হইয়া শত শত ফিট্ নীচে নামিয়া গিয়াছে, আর সেখান দিয়া ছুটিয়াছে তীব্র স্রোতবতী পাহাড়ে নদী। সেখানে পড়া মাত্র হাড়গোড় চূরমার হইয়া যাইবে। কখনও গাছের শিকড় ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে; কখনও বা

হামাগুড়ি দিয়া এই সব সঙ্কীর্ণ পথ তাঁরা পার হইলেন। সন্ধ্যার পর আবার আর এক মুস্কিল—কোথায় রাত কাটানো যায় সে এক বিষম সমস্যা। কখনও বড় বড় গাছের গুঁড়ির উপর ডালপালার নীচে, কখনও বা পাহাড়ের গুহা খুঁজিয়া লইয়া তার ভিতর ঢুকিয়া তাঁরা রাত কাটাইতে লাগিলেন। তা ছাড়া আরও এক উৎপাত আছে। এক রকম বাদুড় আছে, সেগুলি রাত্রে আসিয়া ঘুমন্ত মানুষের পায়ের রক্ত চুষিয়া খায়—এদের বলে ভ্যাম্পায়ার। কাজেই রাত্রেও তাঁদের খুব সাবধানে কাটাইতে হইত।

এই ভাবে দীর্ঘ এক মাস গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া তাঁদের চলিতে হইল। তাঁরা সঙ্গে যে খাবার আনিয়াছিলেন তা' তত দিনে প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু উপায় কি? পথে কোন রকম খাবার মিলিবার উপায় নাই। এখন ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব এবং ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁরা আসেনও নাই।

অবশেষে হঠাৎ এক দিন এক ঝলক সূর্য্যালোক জঙ্গলের ফাঁক দিয়া তাঁদের সম্মুখে উঁকি মারিল—তাঁরা সর্প নদীর তীরে পোঁছিয়া গিয়াছেন। এবার এক নূতন যাত্রা সুরু করিতে হইবে।

নদীর ধারে কতকগুলি হাল্কা কাঠের গাছ ছিল; ম্যালডোনেডো এবং তাঁর সঙ্গীরা তারই কতক সংগ্রহ করিয়া বন্য রবার গাছের ঝুরির সাহায্যে সেগুলি বাঁধিয়া একটা চলনসই ভেলা তৈরী করিয়া ফেলিলেন। তার পর সেই ভেলায় চড়িয়া আট জন দুঃসাহসী আবিষ্কারক সর্প নদীর সীমা খুঁজিতে রওনা হইলেন। তাঁদের সঙ্গের খাবার তখন একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। আশ-পাশের জঙ্গলে কিছু বুনো কলা এবং ঐ রকম অন্য বুনো ফল পাওয়া গেল। শুধু তারই উপর ভরসা করিয়া তাঁরা চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিপদ্ কমা দূরে থাকুক ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। নদীর মাঝে মাঝে ডুবো পাথর খাড়া হইয়া আছে—নদীর স্রোত সেখানে ধাক্কা খাইয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করিতেছে—তার মধ্যে ভেলা পড়িলে আর রক্ষা নাই। দু'-তিন বার এই রকম ঘূর্ণিপাকের ভিতর পড়িয়া তাঁরা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেলেন। তার পর আরম্ভ হইল অসভ্য জংলী রেড্ ইণ্ডিয়ান্দের উৎপাত। রাত্রে হয়তো

তীরে ভেলা বাঁধিয়া ঘুমাইতেছেন, হঠাৎ উঠিয়া দেখেন, ভোরের অস্পষ্ট আলোকে দলে দলে উলঙ্গ অসভ্য জংলীরা আসিয়া তাঁদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাদের হাতে তীর-ধনুক—এবং সে তীরে এমন তীব্র বিষ মাখান যে তার একটা গায়ে লাগিলে মৃত্যু এক রকম অবশ্যম্ভাবী। পর পর কয়েক বার অসভ্যদের আক্রমণ হইতে কোন রকমে পালাইয়া তাঁরা রক্ষা পাইলেন। কিন্তু এ ভাবে কতক্ষণ চলে? একবার একটি বিষাক্ত তীর আসিয়া দলের একজন লোককে আহত করিল; তিনি প্রাণে মরিলেন না কিন্তু একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন, তাঁর শুশ্রূষা করা হইল এক মহা হাঙ্গামা। এ দিকে আর এক গোল বাধিল খাবার-সমস্যা লইয়া। বনে দু'-একটা জংলী বানর চোখে পড়িল বটে কিন্তু সেগুলিকে শিকার করিয়া খাইবার মত অস্ত্রশস্ত্র তাঁদের ফুরাইয়া গিয়াছিল। নদীতে মাছ থাকিলেও বন্যার বেগ থাকায় তাও ধরা সম্ভব হইল না। বুনো কলাও সব সময় পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। অভুক্ত অবস্থায়, দুর্ব্বল দেহে খাবারের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁরা ভাসিয়া চলিলেন।

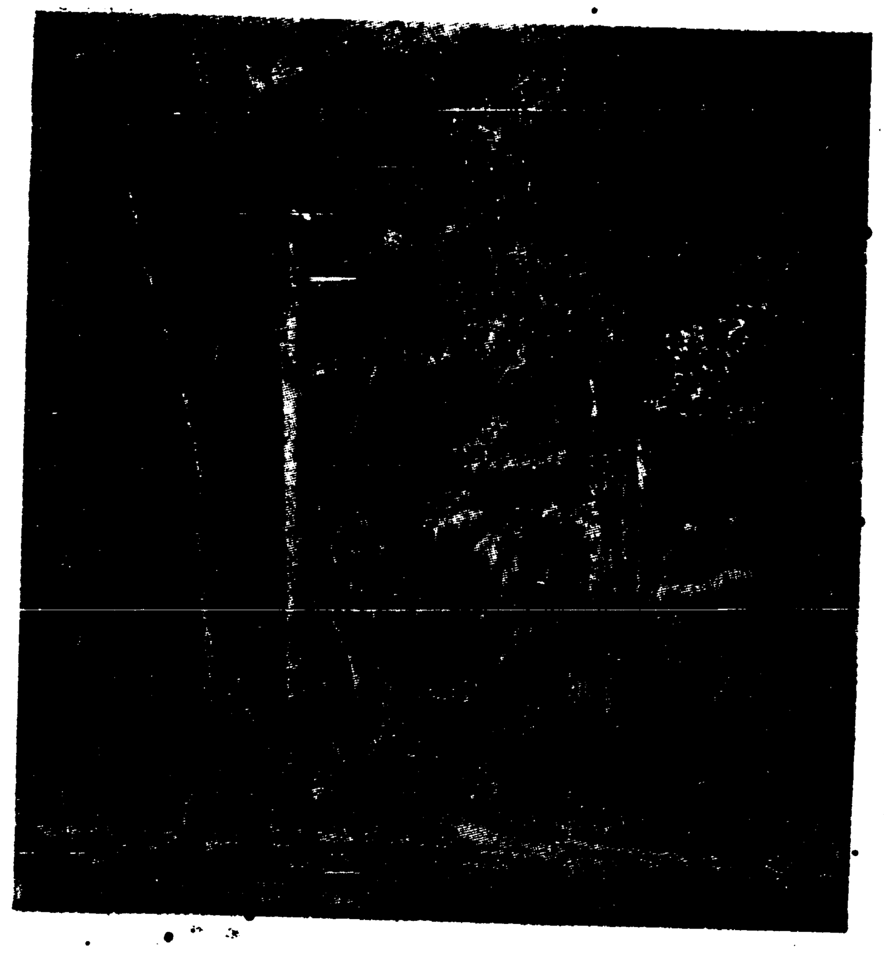

গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া নদী চলিয়াছে

অবশেষে এক জায়গায় একদল নিরীহ রেড্ ইণ্ডিয়ানের সাক্ষাৎ মিলিল। তারা তাঁদের একটা ডিঙ্গি নৌকা দিয়া সাহায্য করিল। দু'জন লোক ডিঙ্গিতে উঠিলেন, ম্যালডোনেডো, গ্রেগরী এবং বাকী চার জন ভেলায় চড়িয়া চলিতে লাগিলেন। এই ভাবে পাঁচশ' মাইল পথ ভেলায় ভাসিয়া আসিবার পর হঠাৎ নদী চওড়া হইয়া গেল। দেখা গেল, সর্প নদী এখানে শেষ হইয়া গিয়া বেণী নদী

নামে আর একটা বড় নদীতে মিলিয়াছে। যাত্রা তাঁদের সফল হইয়াছে—সর্প নদীর সীমা তাঁরা খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

আবিষ্কার শেষ হইলেও ম্যালডোনেডো কিংবা তাঁর সঙ্গীদের যাত্রা তখনও শেষ হয় নাই। কেননা এ স্থান একেবারে জনমানবহীন, এতটুকু আশ্রয় মিলিবার সম্ভাবনা নাই। যে পথে তাঁরা আসিয়াছিলেন সে পথে আবার ফিরিয়া যাওয়া যে অসম্ভব তা তো যে-কেউ বুঝিতে পারে। ম্যালডোনেডো ঠিক করিলেন তাঁরা আর একটু আগাইয়া আমাজনের উপনদী ম্যাডেরিয়া ধরিয়া আমাজনে গিয়া পড়িবেন। সেখানে গেলে হয়তো খাদ্য জুটিবে, আশ্রয়ও মিলিতে পারে।

বেণী নদী দিয়া একটু আগাইতেই তাঁরা এক ঘূর্ণির সম্মুখীন হইলেন—নদীর মাঝখানে প্রাচীরের মত পাথর খাড়া হইয়া আছে, তার উপর দিয়া ভেলা বা ডিঙ্গি চালান অসম্ভব। বুদ্ধিমানের মত ভেলাটাকে সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া তীরে উঠিয়া ডিঙ্গিটাকে টানিতে টানিতে তাঁরা কিছুক্ষণ হাঁটিয়া চলিলেন। তার পর যখন আবার নদীর চেহারা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল তখন ডিঙ্গি জলে ভাসাইলেন। দুর্ব্বল দেহেই আবার একটি নতুন ভেলা তৈরী করিয়া লইতে হইল। তার পর আবার তাঁরা রওনা হইলেন। সামনেই ম্যাডেরিয়া নদী।

কিন্তু বিপদ্ তখনও শেষ হয় নাই—অবশেষে চরম বিপদ্ দেখা দিল। একে একে সম্মুখে আগেকার মত পর পর আঠারোটি ডুবো পাহাড় আর ঘূর্ণিপাকের বাধা পড়িল—তার শেষেরটি সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। দু'ধার হইতে দু'টি প্রচণ্ড স্রোত আসিয়া এখানে বিপুল বেগে ধাক্কা খাইতেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে বিরাট্ ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করিতেছে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় পাথরের চাঁই সাদা ফেনার উপর মাথা উঁচাইয়া প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। ভাবখানা যেন, 'এখানে কারো প্রবেশ নিষেধ। ঢুকিতে চেষ্টা করিও না, প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবে না'। ডিঙ্গিটা তীরের কাছ দিয়া যাইতেছিল, সেটিকে তাড়াতাড়ি ডাঙ্গায় তুলিয়া ফেলা হইল, কিন্তু ম্যালডোনেডো সাবধান হইবার আগেই ভেলাটা প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল, আর তাকে আটকান সম্ভব হইল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণির ভিতর নাচিতে নাচিতে ভেলা বিপুল বেগে গিয়া ডুবো পাথরের গায়ে আছড়াইয়া পড়িল, তার পর

টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ভেলার ভিতরকার দু'জন লোক একটা পাথরের চূড়া কোন রকমে ধরিয়া ফেলিয়া ঝুলিতে লাগিলেন কিন্তু ম্যালডোনেডো, গ্রেগারী, তাঁদের আহত সঙ্গীটি এবং দলের আর একজন লোক প্রচণ্ড পাকের ভিতর পড়িয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন আর তাঁদের সন্ধান মিলিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

যে চার জন বাঁচিয়া রহিলেন তাঁদের অবস্থা তখন ভাবিয়া দেখ। কিন্তু বসিয়া থাকিবার মত অবস্থাও তাঁদের তখন নয়। ডিঙ্গিতে মাত্র দু'জন লোক উঠিতে পারে, এদিকে নতুন করিয়া ভেলা বানাইবার শক্তিও কারও নাই। অগত্যা ঠিক হইল দু'জন লোক সেই জনশূন্য নদীর তীরে বসিয়া থাকিবেন, বাকী দু'জন ডিঙ্গি লইয়া চলিয়া যাইবেন, যদি সামনে কোথাও সাহায্য পাওয়া যায় তবে ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত সঙ্গীদের উদ্ধার করিবেন।

সৌভাগ্যক্রমে ডিঙ্গিতে করিয়া কিছু দূর যাইতেই একটা আশ্রয় মিলিয়া গেল। সেখানে লোকের বসতি ছিল, ব্যাপার শুনিয়া তারা পরিত্যক্ত লোক দু'টিকে উদ্ধার করিল। বহু দিন পরে তাদের কাছে পেট ভরিয়া খাইয়া, বিশ্রাম করিয়া চার জন দুঃসাহসী আবিষ্কারক তাঁদের যাত্রা শেষ করিবার উদ্দেশ্যে আবার বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং আমাজন হইয়া, নানা ঘোরা পথ পার হইয়া অবশেষে একদিন বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

শান্তি-ধামের অশান্তি

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

হুকা-কাশির ঘটনাবহুল জীবনে মাঝে মাঝে এমন অনেক ছোটখাটো য়্যাডভেঞ্চার ঘটেছে যা গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌লে তোমাদের বেশ কিছু গল্পের খোরাক জুটে যায়। তারই একটা আজ তোমাদের শোনাব।

ঘটনাটা ঘটেছিল অনেক দিন আগে, সোনার হরিণের অনুসন্ধানে তখনও তিনি হাত দেন নি। পূজোর সময় কিছুদিন বিশ্রাম-লাভের আশায় তিনি গিয়েছিলেন বিল্বনগরম্—মাদ্রাজ-প্রদেশের সীমান্তে জায়গাটি, বেশ স্বাস্থ্যকর বলে নাকি খ্যাতি আছে। সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না? তা ছিল বই-কি, নইলে ওই জনবিরল তেপান্তরের মাঠে নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্বাস্থ্য লাভ হতে পারে কখনো? রণজিতের ছোট ভাই অভিজিৎ সে যাত্রায় হুকা-কাশির সঙ্গী হয়েছিল।

সেদিন সকাল বেলায় চায়ের পাট চুকিয়ে দিয়ে টেবিলের ধারে মুখোমুখী বসে দু'জনে গল্পে মেতে আছেন, দেখা গেল এক মধ্যবয়সী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ফটকের সাম্‌নে এসে কেমন একটু ইতস্ততঃ কর্‌ছেন, ভাবটা ঢুকি কি ঢুকি না! হুকা-কাশি মুখ তুলে চাইতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হয়ে গেল; তখন সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে ফটক খুলে তিনি ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। হুকা-কাশিকে ছোট্ট একটু নমস্কার জানিয়ে বল্লেন, "আপনি আমায় চিন্‌তে পারবেন না, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি; ক'লকাতায় যেখানে আপনি থাকেন সেই ডাফ্ ষ্ট্রীটে আমারও বাস। কালকেই নদীর পারে বেড়াতে বেরিয়ে আপনাকে এখানে প্রথম দেখ্‌তে পাই। এই তেপান্তরের মাঠে কিছুদিন একত্র বাস কর্‌লে ক্রমে আলাপ-পরিচয়ও ঘট্‌বে আশা ছিল, কিন্তু তখন ভাব্‌তেও পারি নি যে এক অপ্রত্যাশিত কারণে আজকেই আপনার সঙ্গে দেখা করা অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌বে। কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটায় এই বন্ধু-বান্ধবহীন দূর দেশে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছি; সকাল হতেই তাই পরম আত্মীয় জ্ঞানে আপনার কাছে চলে এসেছি।" ভদ্রলোক অতি করুণ ভাবে হুকা-কাশির পানে চাইলেন।

হুকা-কাশি নস্যিদানটা খুলে জোর একটিপ নস্যি নিতে নিতে বল্লেন, "বেশ, আপনার রাত্রির অভিজ্ঞতা খুলে বলুন—আমার তরফ্ থেকে চেষ্টার কোনই ত্রুটি হবে না।" তার পর অভিজিৎকে দেখিয়ে বল্লেন, "এর কাছে আপনার দ্বিধা কর্‌বার কিছু নেই; আমায় যা বল্‌বার আছে নিঃসঙ্কোচে এর সাম্‌নেই তা বল্‌তে পারেন।"

ভদ্রলোক তখন তাঁর বক্তব্য সুরু কর্‌লেন—

"সব ব্যাপার গুছিয়ে বল্‌তে হলে গোড়ার কয়েকটি কথাও আগে বলে নেওয়া দরকার। পূজোর ছুটীতে কোথায় চেঞ্জে যাওয়া যায় কল্‌কাতায় বসে তারই আলোচনা হচ্ছিল, এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন বিল্বনগরম্; কেবল পরামর্শ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন্ নি, কথা-প্রসঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে এখানে তাঁরই জানাশোনা এক ভদ্রলোকের চমৎকার একটা বাড়ী আছে, এবং খুব সস্তায় সেখানা তিনি ভাড়াও দিতে পারেন।

পূজোয় কোথাও যেতে হলে সব চেয়ে বড় সমস্যাই হ'ল বাড়ী-সমস্যা; সেটা এত সহজেই

মিটে যাওয়াতে এখানে আসাই স্থির করে ফেলা গেল। তার পর কাল সকালের ট্রেনে এখানে এসে পৌঁছেছি।

এসে দেখ্‌লাম বন্ধুটি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি; বাস্তবিকই খাসা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ীখানা, ভেতরে অনেকখানি কম্পাউণ্ড্ আর গোটা বাড়ীটাই উঁচু পাঁচীলে ঘেরা। বাড়ীর নাম 'শান্তি-ধাম'। ও ভাড়ায় মরুভূমির ভেতরেও অমন বাড়ী কল্পনাতীত সস্তা। ঘর যা আছে আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত, কেনুনা আমরা ক'টি মাত্র প্রাণী—আমি, আমার স্ত্রী, বছর চোদ্দ বয়সের একটী মেয়ে, আর সঙ্গের ঝি আর উড়ে বামুন। সদর দরজার সম্মুখে মালপত্র নামিয়ে ভেতরে ঢোক্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছি, লক্ষ্য কর্‌লাম রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে সেই যেন অবাক্ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তাদের এই অহেতুক কৌতূহলের কোন অর্থ বুঝ্‌তে পারি নি, কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি; এ বাড়ীতে লোকের বসবাস দেখতে তারা আদৌ অভ্যস্ত নয়, কেননা এ বাড়ীর রহস্য জান্‌তে এ অঞ্চলে কারুরই বোধ করি বাকী নেই।

গুছিয়ে-গাছিয়ে বাড়ীটাকে বাসোপযোগী করে নিতেই সারা দুপুর কেটে গেল। বিকেলে এক কাপ চা খেয়ে সাম্‌নের বারান্দায় বসে সবেমাত্র খবরের কাগজখানা খোল্‌বার উপক্রম কর্‌ছি, দেখি ফটক খুলে এক প্রৌঢ় বয়সের মাদ্রাজী ভদ্রলোক এগিয়ে আস্‌ছেন। 'গুড্ আফ্‌টারনুন্' বলে অভিবাদন করে তিনি বারান্দায় উঠে এলেন, ইংরাজীতে বল্লেন, 'মাফ্ করবেন, আপনিই কি এ বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন?

"জবাব দিলাম 'আজ্ঞে হাঁ।'

'একেবারে পাকাপাকি কথা হয়ে গেছে? ভাড়া আগাম্ আদায় করে নিয়েছে নাকি?'

"বল্লাম, 'কথা পাকা-পাকিই হয়েছে বটে, কিন্তু ভাড়াটাড়া এখনও কিছু দেওয়া হয় নি। বাড়ীওয়ালা যে ঠিক আমার অপরিচিত এ কথা বলা যায় না।'

'কি বল্লেন, এ বাড়ীর মালিক রমেশ বাবু আপনার পরিচিত? অথচ তিনি জেনেশুনে আপনার এ বাড়ী ভাড়া নেওয়া অনুমোদন করেছেন?' ভদ্রলোকের মুখে বিস্ময়ের স্পষ্ট ছাপ এবার ফুটে উঠ্‌ল!

বিস্মিত আমিও কম হয় নি, বল্লাম, 'আপনার ইঙ্গিতটা বেশ ভাল মত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, আর একটু স্পষ্ট করে বল্‌বেন কি?'

কিন্তু ভদ্রলোক বোধ করি আমাকে আর বেশী বিব্রত করে তোলা উচিত মনে কর্‌লেন না, কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন, 'আপনি বিদেশী লোক, নতুন জায়গায় এসে নানা রকম অসুবিধা বোধ করা বিচিত্র নয়। সে রকম কিছু ঘট্‌লে আমাদের খবর দিতে সঙ্কোচ বোধ কর্‌বেন না। আমার নাম ভেঙ্কট চারি, পাশের বাড়ীটাই আমার।'

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর মনের ভেতরটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করতে লাগ্‌ল; একটা অজানা ভয়ও যে মাঝে মাঝে উঁকি মারছিল না, এ কথাও জোর করে বল্‌তে পারি না। যাই হোক্‌, সব ঝেড়েঝুড়ে মনটাকে চাঙ্গা করে তোল্‌বার উদ্দেশ্যে বিকেল বেলা সদলবলে বেরিয়ে পড়্‌লাম নদীর ধারে—ভগবানের বিশেষ দয়া বল্‌তে হবে, সেখানেই আপনার দেখা পেলাম। তার পর বাজার হয়ে তরি-তরকারি, কিছু টাট্‌কা মাছ কিনে যখন বাড়ী ফির্‌লাম রাত তখন আটটা বেজে গেছে। বামুন ঠাকুর রান্নার যোগাড় আরম্ভ করল। ঠিক এই সময় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বেশ একটু হিমেল হাওয়া বইতে সুরু করে দিল। চারদিক্‌ একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ, ধারে পাশে জনমানবের সাড়া নেই; আমরা জানলার সার্সি বন্ধ করে মাঝের হল ঘরটায় এসে বস্‌লাম। আমার স্ত্রী একখানা মাসিক পত্রিকা পড়ে আমাদের শোনাচ্ছিলেন। পাশের কাম্‌রায় ঝির নাকের ডাক উঠে গেল। ঘড়িতে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ সকলেই যেন একটু চম্‌কে উঠ্‌লাম, মনে হ'ল আমাদের মাথার ওপরকার ছাদে অবিশ্রাম খটাখট্‌ খটাখট্‌ কেমন একটা শব্দ হচ্ছে—ঠিক যেন ছাদ-পেটানোর আওয়াজ। একটু কান পেতে থাক্‌তেই লক্ষ্য করলাম, শব্দটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে: আরও একটু বাদে অসম্ভব জোরে শব্দ হ'তে লাগ্‌ল—দপ্‌ দপ্‌ ধুপ্‌ ধুপ্‌—যেন ছাদময় কারা দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আমার স্ত্রী স্বভাবতঃই একটু ভীতু মানুষ, চেয়ে দেখি তাঁর সারা কপাল ঘেমে উঠেছে, কেননা ছাদে উঠ্‌বার যে কোন সিঁড়ি নেই বাড়ীতে ঢুকেই তা আমরা টের পেয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটা ব্যাকুল আর্ত্তনাদ কানে এল, দেখি কিনা, বামুনঠাকুর রান্নাঘর ছেড়ে পাঁই পাঁই করে উর্দ্ধশ্বাসে আমাদেরই দিকে ছুটে আস্‌ছে। বেচারার সারাদেহ বাঁশপাতার মত কাঁপ্‌ছে, গায়ের প্রত্যেকটি রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠেছে, আর চোখ দুটো ঠিক যেন ঠিকরে আসার উপক্রম! একটু বাদে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হ'তে কোনক্রমে সে জানালে যে কড়ার উপর তেল চাপিয়ে সবে ভাজবার মাছগুলো সে ছেড়েছে অম্‌নি সুমুখের জানলা থেকে দুধের মত সাদা দু'খানা হাত তার সাম্‌নে বেরিয়ে এল, ঠিক ভাজা মাছ চাইবার ভঙ্গীতে। সে আঁৎকে পিছিয়ে আস্‌তেই ঝপাৎ করে একরাশ ছাই এসে পড়্‌ল মাছ ভাজবার কড়াটার ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে কে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল—রক্ত হিম করা এক অদ্ভুত হাসি। আর এক তিলও দাঁড়াবার ভরসা সে পায়নি, দু'হাতে পৈতাগাছা জড়িয়ে 'রাম রাম' করতে করতে পালিয়ে এসেছে। এবার ভয়ে সকলেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, গিন্নীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাঁর বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও ব্যাপারটা নিজে চোখে প্রত্যক্ষ করবার জন্য একাই আমি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চল্লাম। উঠান পার হয়ে রান্নাঘরে যেতে হয়, পথে পড়ে মস্ত একটা নেবুগাছ। সবে তার তলায় এসেছি অম্‌নি সেই গাছের আব্‌ডাল থেকে চওড়া লাল পাড় শাড়ী পরা, বোধ করি সাড়ে আট ফুটেরও বেশী ঢ্যাঙ্গা একটি স্ত্রীলোক ঘোমটা মাথায় ঢিপ্‌ করে আমার পায়ের কাছে একটা গড় করল। অতখানি

ঢ্যাঙ্গা মেয়েছেলে তো দূরের কথা, পুরুষও আমি ভাব্‌তে পারি না। আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল; রান্নাঘরে যাওয়া মাথায় উঠ্‌ল, দৌড়ে কোন মতে ঘরে ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে করতে দেখতে পেলাম, হো হো করে বিকট এক অট্টহাসি হেসে স্ত্রীলোকটা রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘরে দুম্‌দাম্‌ হাঁড়িকলসী ফাটার শব্দ শোনা গেল; তার পরেই আক্রমণ সুরু হ'ল বাংলোখানার ওপরে—ঠিক বর্ষাকালের বৃষ্টির ফোঁটার মত অনবরত ইট্‌ আর পাট্‌কেল, ইট্‌ আর পাট্‌কেল! সারারাত ক'টি প্রাণী ঠায় ঘরের মেঝের ওপর বসে কাটালাম, একটি বারের তরেও কারুর চোখের পাতা মুদ্‌তে সাহস হ'ল না। তার পর সকাল হলে ছুটে গেলাম পাশের বাড়ী ভেঙ্কট চারির কাছে। সমস্ত খবর খুঁটিয়ে শোন্‌বার পর তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন, 'হুঁ, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটেছে। কাল আপনাকে সমস্ত কথা খুলে বলা হয় নি, হয়তো আপনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়্‌বেন মনে করে, কিন্তু আজ আর বল্‌তে বাধা নেই যে, যে বাড়ীটা আপনি নিয়েছেন এ অঞ্চলে সবারই ধারণা ওটা ভূতের বাড়ী। প্রায় দু' বছর হ'ল এম্‌নি-ধারা উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। এই দু' বছরে অন্ততঃ বার চারেক বাড়ীটা ভাড়া হয়েছিল কিন্তু এক রাতের বেশী কোন ভাড়াটেই টিক্‌তে পারে নি ওখানে। রমেশ বাবু বাড়ীর ভাড়া খুবই কমিয়ে দিয়েছেন, তবু প্রাণ হাতে করে কে যাবে বলুন! শেষ বারে বাড়ীটা যখন ভাড়া হয় সে আজ ছ'মাসের কথা—সে যাত্রাও এক রাতের বেশী ভাড়াটে টেঁকেনি। ভেবেছিলাম এ ছ'মাসে কিছু উন্নতি হয়তো বা হয়ে থাকবে, কিন্তু তা যে হয়নি সে তো প্রত্যক্ষই করা গেল। ওটা আমারই পাশের বাড়ী হওয়াতে মাঝে মাঝে আমারও যে একটু আধটু ভাবনা হয় না তা নয়,

দুধের মত সাদা দুখানা হাত বেরিয়ে এল

তবে ভগবানের পরম দয়া আজ পর্য্যন্ত এখানে কোন উপদ্রবই ঘটে নি। আপনি এক কাজ করুন, এ বেলার মত সবশুদ্ধ আমারই এখানে উঠে আসুন ; বাড়ীতে আমার মা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী সকলেই আছেন, কাজেই মেয়েদের কোনই অসুবিধা হবে না। আজকের দিনের মধ্যেই লোকজন লাগিয়ে অন্য একটা বাড়ী খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আমি দেখ্‌ছি।

ভদ্রলোককে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে, ঝি-বামুন সমেত মেয়েদের তাঁরই ওখানে পাঠিয়ে আমি সোজা আপনার কাছে চলে আস্‌ছি। কাল রাত্রিরে নিজের চোখে যা দেখেছি তা কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারি না, অথচ বিংশ শতাব্দীর লোক হয়ে ভূতের অস্তিত্ব, বিশেষ করে ভূতের উপদ্রবের কথা বিশ্বাস করতেও মন সায় দিতে চাইছে না। যাকে বলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সত্যিই আমি তাই হয়ে আপনার কাছে এসেছি, আশা করি প্রতিবেশীর এ বিপদে তাকে সাহায্য করতে আপনি বিমুখ হবেন না।”

হুকা-কাশি হাতের দু’ আঙ্গুলে অবশিষ্ট নস্যিটুকু একটানে নিঃশেষ করে বল্লেন, “আমায় দিয়ে যতটা উপকার সম্ভব তা অবশ্যই আপনি পাবেন। অভিজিৎ, পাঞ্জাবীটা একবার গায়ে চড়িয়ে নাও তো, বাড়ীটা একটু ঘুরে আসা যাক্। হ্যাঁ, আপনার নামটা কি সেটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় নি।”

“আজ্ঞে আমার নাম শ্রীভবানীপ্রসন্ন গুপ্ত।”

সদর দরজার তালা খুলে সকলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌লেন। বাড়ীর সমস্তটাই কম্পাউণ্ড্‌ ওয়ালে ঘেরা, ভেতরে জায়গা প্রায় চার পাঁচ বিঘে। পাঁচীল বরাবর ওঁরা হাঁটছিলেন, হঠাৎ হুকা-কাশি হাতের রুমালখানা টপ্‌ করে একবার মাটীতে ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার তুলে নিলেন ; ভবানী বাবু আর অভিজিৎ কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন, কিছু টের পেলেন না। আরও খানিকক্ষণ চল্‌বার পর দেয়ালের ধারে এসে হুকা-কাশি ফের থাম্‌লেন, অভিজিৎকে লক্ষ্য করে বল্লেন, “মাটীর ওপর এ দাগগুলো লক্ষ্য করছ ? বেশ করে দেখে বল দিকিনি কিসের দাগ এগুলো ?”

বাস্তবিকই জায়গাটাতে—কেবল ওই জায়গাটাতেই—কোন অজ্ঞাত জীবের ছোট্ট ছোট গোল গোল কতকগুলো পায়ের দাগ অভিজিতের নজরে এল। অনেকক্ষণ ধরে বিশ্লেষণ করবার পর সে বল্লে, “ঠিক ধরতে পারছি না, তবে কোন্ জন্তুজানোয়ারের পায়ের দাগ নিশ্চয়ই।”

“তুমি তো ভাল শিকারী, অনেক জানোয়ারেরই পায়ের দাগের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে—বল তো এগুলি কোন্ জানোয়ারের পায়ের দাগ ?”

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে শেষ পর্য্যন্ত অভিজিৎকে স্বীকার করতেই হল যে সে কিছুই

ঠাহর করতে পারছে না। হুকা-কাশি আবার বল্‌লেন, “দাগগুলো কেমন এলোমেলো সেটা লক্ষ্য করছ কি ?”

“হুঁ”

“আরও একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ—সব ক’টা দাগেরই এক দিক্ খুব জোর স্পষ্ট ভাবে উঠেছে, অন্য দিক্‌টা দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত হাল্কা। কেমন, নয় কি ?”

অভিজিৎ ঘাড় নাড়্‌ল, “তা বটে।”

“আর ওই যে পর পর গোটাকতক নেবু গাছ রয়েছে, তাও কিন্তু উপেক্ষার বিষয় নয়। সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয়, কাল রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে মাটি সর্ব্বত্রই নরম হয়ে আছে, অথচ দাগ পাচ্ছি শুধু এই জায়গাটাতেই।”

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে আর এক অভিনব জিনিষ সকলের চোখে পড়্‌ল—একটা চাল মাপ্‌বার সের, চল্‌তি কথায় আমরা তাকে ‘পালি’ বলি। “এটা আবার কোত্থেকে এল ? একেবারে আনকোরা নতুন দেখ্‌ছি ; আপনার সঙ্গের বুঝি ?” হুকা-কাশি বলে উঠ্‌লেন।

“না তো !” ভবানী বাবু জবাব দিলেন।

“ওহ্, বোঝা গেছে তবে ! আচ্ছা ভবানী বাবু, সাধারণতঃ আপনি কি মার্কা সিগারেট খেয়ে থাকেন ?”

ভবানী বাবু এইবার বিস্মিত হলেন, “সিগারেট্ ? সিগারেট তো আমি খাই না ; আমি ছেড়ে আমার বামুন-চাকরদের পর্য্যন্ত ও জিনিষটি খাওয়া বারণ। গিন্নীর হাঁফানির মাদুলি আছে, তামাকের গন্ধ পর্য্যন্ত ওঁর নাকে যাওয়া নিষেধ। ওই জন্যই তো বামুন-চাকর জোটানো আমার পক্ষে এক মহা দায় ! তামাক খাবে না, বিড়ি টান্‌বে না—এমন লোক ও শ্রেণীর মধ্যে হাজার করা বোধ করি আপনি একজনও পাবেন না।”

“নস্যিটা নিশ্চয়ই বাদ, ওতে বুদ্ধি খোলে” হুকা-কাশি হেসে বল্লেন, “যাক্ রহস্য থাক, বাড়ীতে ঢুকে ঘরদোর বারান্দাগুলোর আপনি কি অবস্থা দেখেছিলেন, বলুন তো !”

“ধুলো আর ঝুলে গোটা বাড়ীটাই একাকার হয়ে ছিল।”

“রান্নাঘরটা ?”

“তারও ওই একই অবস্থা। পূরো এক দুপুর লেগেছে বাড়ীটাকে শুধু বাসোপযোগী করে তুলতেই।”

“উনোনও তবে পাত্‌তে হয়েছিল নিজেদেরই !”

“নিশ্চয়ই।”

কথা বল্‌তে বল্‌তে সবাই সদর দরজার দিকেই ফিরে এসেছিলেন, হুকা-কাশি বল্‌লেন, "চলুন, এবার আপনার আস্তানায় গিয়ে বসা যাক্। এ বেলার মত চারির ওখানেই তো আপনার থাক্‌বার ব্যবস্থা ?"

অতিথিসৎকারের জন্য ভেঙ্কটচারি তখন নিজে দাঁড়িয়ে মালী দিয়ে তাঁর বাগান থেকে কপি, বেগুন, শালগম প্রভৃতি তোলাচ্ছিলেন, সেখানেই সকলের তলব পড়্‌ল। শিষ্টাচারের পালা শেষ হলে, চারিকে হুকা-কাশি বল্‌লেন, "বাগানখানা করেছেন তো মন্দ নয়, সব রকম তরি-তরকারিই তো দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

বাগান সম্বন্ধে ভেঙ্কট চারির সত্যিকারের গর্ব্ব ছিল, একটু সলজ্জ হাসি হেসে তিনি বল্লেন, "এই আমার একটা 'হবি' আছে। ছোট বাগান, তবে এরই মধ্যে যতটা হয় চেষ্টার ত্রুটি করি নি। আসুন না, দেখ্‌বেন সবটা।"

ঘুরে ঘুরে সকলে বাগান দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, সেই সঙ্গে রমেশ বাবুর ভূতুড়ে বাড়ীটা সম্বন্ধেও আলোচনা চলতে লাগ্‌ল। হুকা-কাশির আরও যে সব তথ্য জান্‌বার ছিল, চারির কাছ থেকেই তা জেনে নিলেন। রমেশ বাবুর বাংলো থেকে ক্রমে গোটা সহরটার কথা উঠ্‌ল। চারি বল্লেন, "সহরের আশ-পাশে দেখ্‌বার অনেক কিছুই আছে, চলুন এক দিন সঙ্গে করে আপনাদের সব দেখিয়ে আনা যাবে—য়্যাঁ, হ্যাঁ এটা আমারই গাড়ী।"

হুকা-কাশি বল্লেন, "আপনার আবার নৌকো চালাবারও হবি আছে নাকি? কিন্তু এদেশের নদীতে কি বার মাস জল পান?"

"নৌকো চালানো? না না, সে সব 'হবি' আমার নেই। এগুলো আঁকৃশি, মালীদের ব্যবহারে লাগে। আরে কে ও সমুখম্ নাকি? রামানুজম্ কে জিজ্ঞাসা কর্ তো, ওরা বাড়ী হোয়াইট্-ওয়াশ্ করে দিতে রাজী হয়েছে কিনা! ভাল কথা, গল্পে-গল্পে আসল কথাই আপনাকে বলা হয় নি ভবানীবাবু! ছোটখাট একখানা বাড়ী ভদ্র পল্লীর ভেতরই পাওয়া গেছে। আশা করি এবার আপনার ভেকেশন্‌টা শান্তিতেই কাট্‌বে!"

বেলা নাগাদ তিনটার সময় হুকা-কাশি অভিজিৎকে খামে মোড়া একখানা চিঠি দিয়ে বল্লেন, "আমি বেরুচ্ছি, ভবানী বাবুদের সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাব। ঠিক পাঁচটার সময় তুমি গিয়ে ভেঙ্কট চারির হাতে এ চিঠিখানা দিয়ে আস্‌বে; কেমন পার্‌বে তো?"

"তা আর না পার্‌বার কথা কি! কিন্তু এ কিসের চিঠি? কী লেখা আছে এতে?"

"এ চিঠিতে ভেঙ্কট চারিকে লেখা হয়েছে, রমেশ বাবুর ও বাড়ীটাকে ভূতুড়ে বাড়ী বলে লোকসমাজে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা আজ থেকে তিনি একদম্ ছেড়ে দেবেন; নইলে ভেতরকার

সমস্ত রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে। তিনি এ সহরে বিশেষ সম্মানিত লোক, তাঁর আর অপদস্থের সীমা থাক্‌বে না।"

অভিজিৎ একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌ল, "বাড়ীটাকে ভূতের বাড়ী বলে প্রতিপন্ন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন ভেঙ্কট চারি? বলেন কি! কিন্তু তাতে তাঁর লাভ?"

"লাভ, মাটীর দরে ও বাড়ীখানা কিনে নেওয়া। বসত বাড়ী, এবং 'হবি'র বাগান, তুটোরই কলেবর কিছু বৃদ্ধি পাবে, আর ফাল্‌তু আরও একখানা বাড়ী লাভ হবে, যার দাম কম্‌সে-কম বিশ হাজার টাকা। রমেশ বাবু থাকেন সুদূর কল্‌কাতাতে; তিনি যখন দেখ্‌বেন ভাড়াটের পর ভাড়াটে মাত্র একটা রাত্রি বাসের পরেই ভূতের উপদ্রবে বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে, ভাড়া যথেষ্ট কমিয়েও সিকি পয়সার আয় হচ্ছে না, তখন যে দাম পান তাতেই ওটা বেচে দিতে তিনি উৎসুক হয়ে পড়্‌বেন—চার হাজার, তিন হাজার, যা আসে। প্রথমে হয় তো কোন ভাড়াটে অহেতুক কোন কারণে ভয় পেয়েছিল, সেই থেকেই চারি ভায়ার মাথায় ফন্দিটা খেলেছে ভাল।

"আসল ব্যাপারটা কি করে আঁচ্‌লাম বলি শোন। আজ সকালে রমেশ বাবুর বাড়ীর কম্পাউণ্ড্‌টা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন রান্নাঘর থেকে অনেকটা দূরে এসে আধ-পোড়া একটা সিগারেট্ পড়ে রয়েছে দেখ্‌তে পেলাম। কাল রাত্তিরে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে অথচ সিগারেটের ওপর তার চিহ্নমাত্র নেই। বোঝা গেল, বৃষ্টি থাম্‌বার পর এইখানটাতে কেউ সিগারেট ফুঁকেছে। এদিকে ভবানী বাবু বলে রেখেছেন বৃষ্টি ধরার পর তাঁরা কেউই ঘরের বার হন্ নি; কাজেই বুঝ্‌তে হবে এ সিগারেট বাইরের কোন লোকের খাওয়া। রুমালে করে তুলে তক্ষুণি সেটা পকেটে পূরে ফেল্লাম।

"তার পর আরও এগিয়ে পাঁচীলের কাছাকাছি আস্‌তেই সেই রহস্যময় দাগগুলো দেখ্‌তে পাওয়া গেল। কোন অজানা জানোয়ারের পায়ের দাগ ও হতেই পারে না, কেননা প্রত্যেক জীবেরই একটা পা থেকে অন্য আর এক পায়ের ভেতর প্রকৃতিদত্ত একটা স্বাভাবিক ব্যবধান আছে যা মোটামুটি চল্‌বার পথের দাগেও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ও দাগগুলো একেবারেই অসম্বদ্ধ, এলোমেলো—কোনটা হয়তো মাত্র দু'আঙ্গুল দূরে, আবার কোনটা পাঁচ হাত তফাতে। তা ছাড়া জানোয়ারের পায়ের দাগ হলে মাত্র অল্প একটু জায়গাতেই তা আবদ্ধ থাক্‌বার কারণ কি? আরও একটা লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় এই যে পাঁচীলের কাছাকাছিই এ দাগগুলো পাচ্ছি, আর সবগুলো দাগেতেই পাঁচীলের বিপরীত দিক্‌টা খুব গভীর হয়ে বসেছে—অথচ পাঁচীলের দিক্‌টা অপেক্ষাকৃত হাল্কা। অর্থাৎ লগীর সাহায্যে পোলভল্ট, করে দেওয়াল টপ্‌কালে যে রকম হওয়া উচিত ঠিক সেই রকম। অবশ্য লগীর দাগ বলে কারো মনে যাতে কোন রকম সন্দেহ না হয় সেই উদ্দেশ্যে ওগুলোর গোড়ায় এক একটা করে বিশেষ আকারের লোহার টুপি পরিয়ে নেওয়া হয়েছিল

নিশ্চয়ই। জায়গাটাকে আড়াল করে নেবু গাছের ঝাড় থাকায় সন্দেহ আরও দৃঢ় হল; বাস্তবিক, অলক্ষ্যে অনেক লোকের দেওয়াল টপ্‌কাবার এমন চমৎকার জায়গা আর কোথাও নেই। বুঝ্‌লাম, ভূত নয়, কয়েক জন মানুষের দ্বারাই রাত্তিরের উপদ্রবটি ঘটেছে। কিন্তু কেন? ভবানীবাবু যখন বল্লেন তিনি আসার আগে সমস্ত বাড়ীটা ধূলোয় আর ঝুলে ভর্ত্তি হয়ে ছিল তখন কোন চোর-ডাকাতের পাকা আড্ডা বলেও সেটাকে মেনে নিতে পারলাম না।

"যেখান দিয়ে লোকগুলো দেওয়াল টপ্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল—অর্থাৎ পাঁচীলের ওধারটাও একবার পরীক্ষা করা দরকার বোধ হ'ল। সেটা চারির কম্পাউণ্ডের মধ্যে। বাগান দেখ্‌বার আছিলায় বরাবর পাঁচীলের আশপাশে নজর রেখে এগুতে লাগ্‌লাম, রমেশ বাবুর বাড়ীর নেবুঝাড়ের বরাবর আস্‌তেই ওধারের মত পাঁচীলের এ ধারেও অবিকল সেই রকম লগীর দাগ দেখ্‌তে পেলাম—একটুও প্রভেদ নেই। নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়ে গেল, এ পথেই প্রভুদের যাওয়া এবং আসা দুটি কাজই ঘটেছে।

সোজা ওপর পানে তুলে দিলেন

"এইবার একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জেগে উঠ্‌ল; চারি বিশেষ ধনী লোক, দাসদাসী মালী-বেহারায় তার বাড়ী ভর্ত্তি। রাত দশটার সময় তাদের সম্পূর্ণ অজানাতে কতগুলো বাইরের লোকের পক্ষে তারই বাগানের ভেতর দিয়ে পাঁচীল টপ্‌কে ওভাবে যাতায়াত করা কি সম্ভব? মনে ঘোরতর সন্দেহ হ'ল। তার পর তার গ্যারেজের পেছনে লম্বা লম্বা অনেকগুলি বাঁশের লগী পড়ে থাক্‌তে দেখে সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল, কেননা চারি ওগুলোকে আঁক্‌শি বলে

চালাবার চেষ্টা কর্‌লেও ওগুলোর প্রত্যেকটারই গোড়াতে লোহার টুপি আঁট্‌বার ব্যবস্থা আমি দেখ্‌তে পেলাম। আর ঠিক সেই সময়টাতেই আঁক্‌শির কথা জোর করে চাপা দিয়ে ওর বাড়ীর কথা তোলার চেষ্টা তুমিও বোধ হয় লক্ষ্য করে থাক্‌বে।"

অভিজিৎ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, একটুখানি চুপ করে থেকে সে বল্লে, "আর ওই চাল মাপ্‌বার পালিটা? ওটা ওখানে এল কোথা থেকে?"

হুকা-কাশি একটু হেসে তাঁর দুটো হাত মাথার দু'পাশ দিয়ে সোজা ওপর পানে তুলে দিলেন, বল্লেন, "এইবারে আমার দু'হাতের ডগায় ওটা চাপিয়ে দাও তো! কেমন, ঠিক মানুষের মাথার মতই মনে হচ্ছে কিনা? এখন যদি আমার গায়ে লালপাড় শাড়ী জড়িয়ে এই পালির ওপর ঘোমটা পরিয়ে দেওয়া হয় আর সেই অবস্থায় আমি তোমার পায়ের গোঁড়ায় একটা ঢিপ্‌ করে প্রণাম ঠুকি তবে এই কার্ত্তিক মাসেও তুমি ঘেমে উঠ্‌বে। অথচ আমি যে খুব ঢ্যাঙ্গা এ কথা বোধ হয় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুও প্রাণ খুলে বল্‌তে পার্‌বেন না।"

সে রাত্রিটা হুকা-কাশি আর অভিজিৎ ভবানী বাবুদের সঙ্গে তাঁদের বাংলোতেই কাটিয়েছিলেন, আর সন্ধ্যার পরেই গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের আরও একটি সঙ্গী আছে—বন্দুক। এর পর থেকে আর কোন দিন 'শান্তি-ধামে' ভূতের উপদ্রবের কথা শোনা যায় নি।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(২৫)

কল্পনারও অতীত

হুকা-কাশির চোখে ধূলা দিয়া তাঁরই গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারে এমন লোক আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই; কিন্তু আমার অজ্ঞাত এ-হেন কোন ব্যক্তি যদি বাস্তবিকই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে,

দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থানে আজ ক'দিন ধরিয়াই তিনি হামেশা আসা যাওয়া করিতেছেন, অবশ্য নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া। স্থান দুইটির মধ্যে একটা একখানি পানের দোকান, গঙ্গার প্রায় উপরেই ; পান ছাড়া বিড়ি সিগারেট প্রভৃতিও অল্পস্বল্প সেখানে পাওয়া যায়, তবে দোকানের আয়তন তেমন বড় নয়। দ্বিতীয় স্থানটি একখানা মেটে বাড়ী, বাহির হইতে নিতান্তই দরিদ্রের সম্পত্তি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভিতরে উঁকি মারিবার সুযোগ পাইলে মালিক যে খুবই হীন অবস্থার লোক তা মনে হয় না।

রাত প্রায় এগারোটা বাজিয়া গেছে, তখনও হুকা-কাশি পানের দোকানেরই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া। একজন বলিষ্ঠ চেহারার হিন্দুস্থানী দোকানের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল ; হুকা-কাশি দেখিলেন, যে লোকটা এতক্ষণ পান বেচিতে ছিল সে দোকান ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিল আর তার পরিত্যক্ত 'গদি' দখল করিয়া বসিল নবাগত হিন্দুস্থানীটি। ভিতরে ছোট্ট একখানি চারপায়া পাতা আছে, আরও খানিকটা রাত হইলে দোকান বন্ধ করিয়া এখানেই সে শুইয়া পড়িবে।

পর দিন, এবং তারও পর দিন হুকা-কাশিকে অতি-মাত্রায় ব্যস্ত দেখা গেল, বাসুর সঙ্গে পর্য্যন্ত একবার দেখা করিবার ফুরসুৎ তিনি পাইয়া উঠিলেন না—নানা জায়গায় নানা কাজে অনবরত ছুটাছুটিতেই তাঁর সময় কাটিয়াছে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে যখন তিনি বাড়ী ফিরিলেন তখন ক্লান্তি এবং অবসাদ হয়তো তাঁর প্রচুরই হইয়াছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নতারও অভাব ছিল না।

ঘরে ঢুকিয়াই পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তিনি পড়িতে বসিলেন, পড়া শেষ হইলে কুচি কুচি করিয়া সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তার পর সেই ছেঁড়া কাগজের প্রত্যেকটি টুক্‌রা সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া জ্বলন্ত উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাঁর নিজের মুখের একটি মাংসপেশীতেও কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল না, কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের যদি সেরূপ কিছু হইয়া থাকে তবে তাঁদের সে কৌতূহল মিটাইবার জন্য চিঠিখানার মর্ম্ম শুনাইয়া দিতেছি—

নীলকুঠি
আসান সরাই

প্রিয় বন্ধু,

বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে রত্নটির দাম যাচাই করিয়েছি—তাঁরা যে দাম বল্‌ছেন তাতে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেছে।…কিন্তু এদিকে নতুন এক বিপদ্—আভাসে যতটা জানা যাচ্ছে তাতে মনে হয় ব্যাপারটা খুব বেশী চাপা নেই, কোন কোন জায়গায় বেশ কিছু জানাজানি হয়ে পড়েছে—বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই কিনা তা অবশ্য জানি না। এক্ষেত্রে আসান সরাইএর মত ছোট্ট অরক্ষিত গ্রামে ওটি আমার কাছে রাখ্‌তে আদৌ ভরসা পাচ্ছি না, তবে পরশুর আগে ওটিকে স্থানান্তরিত করাও আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হবে না। এ দু'দিন আমার লোহার সিন্দুকের ওপর আস্থা-স্থাপন ছাড়া আর গত্যন্তর কি? যদি সময় কর্‌তে পার একবার আস্‌বে।

ইতি—

নীচের স্বাক্ষরটি বুঝিবার উপায় নাই, এমনই জড়ানো।

এগারোটা বাজিতে তখন মিনিট পনেরো বাকী—দিন নয় রাত্রি—হুকা-কাশির নূতন বাড়ীর সম্মুখে যে যুবকটি আসিয়া দাঁড়াইল সে বিলক্ষণ বলশালী। দিন কয়েক পূর্ব্বে কাশীর এক য়্যারিষ্টোক্র্যাটিক হোটেলের ফটকে দরওয়ানের নিকট হুকা-কাশিকে জনৈক 'বংগালী বাবুর' অনুসন্ধান লইতে দেখা গিয়াছিল, এ সেই 'বংগালী বাবু', নাম তারকেশ্বর।

ঠক্ ঠক্ করিয়া দরজায় কয়েকটি মৃদু করাঘাত পড়িতেই হুকা-কাশি স্বয়ং নামিয়া আসিলেন, দুয়ার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "ভেতরে চলে এস।" তার পরেই আবার তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন ; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবশুদ্ধ ক'জন বেরুল গুণে ছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তেইশ জন।"

"বাঃ, চমৎকার! সন্তোষ বাবুকে চিঠি লিখেছিলাম, আমার বেহারা অমৃতকে সঙ্গে করে কাল তিনি এসে পৌঁছেছেন, ওপরেই আছেন। আর

তোমরাও দলে আছ তিন জন। প্রায় ডবল হ'ল। কিন্তু তোমার বন্ধু দু'জনা কোথায়?"

"মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়্‌বে; ওবেলাই আমি তাদের এ বাড়ী চিনিয়ে রেখেছি।"

"সাড়ে বারটা আন্দাজ বন্ধ হয়ে যাবে—তার খানিকটা আগেই ওখানে গিয়ে আমাদের পৌঁছান দরকার।...এই যে আলাপ করিয়ে দিই—ইনিই সন্তোষ বাবু, আর এ হচ্ছে আমাদের তারকেশ্বর রায়, যার কথা আজ সকালেই আপনাকে বল্‌ছিলাম।"

দেখিতে দেখিতে আরও আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল, তারকেশ্বরের বন্ধুদ্বয় ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিয়াছে। হুকা-কাশি পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, "চলুন, আমাদের যাত্রার সময় হয়েছে; সন্তোষ বাবু আপনি কিছুমাত্র নার্ভাস্ হবেন না, শীগ্‌গিরই হয়তো এমন সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ কর্‌বেন যা আপনার কল্পনারও অতীত। কিন্তু ভগবানে নির্ভর রাখুন, সৎকার্য্যে তিনি যে সর্ব্বদাই আমাদের সহায় এই বড় কথাটা কখনই ভুল্‌বেন না।"

তখন সেই ঘনায়মান অন্ধকারে ছয়টি বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ কাশীর এক নির্জ্জন, সঙ্কীর্ণ গলির বুকে নামিয়া পড়িল। আমার এ গল্পের পাঠক-পাঠিকা তাঁদের অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইতেন—যেখানে সকলে আসিয়া থামিলেন তার কয়েক হাত দূরে তাঁদেরই পরিচিত সেই পানের দোকান, যার আনাচে-কানাচে এ কয়দিন হুকা-কাশিকে অবিরত ঘুরিতে দেখা গিয়াছে।

সকলেই থামিয়াছে; কেবল হুকা-কাশি আগাইয়া গিয়া দোকানীর নিকট এক পয়সার মিঠা খিলি চাহিলেন। তার পর পান সাজিবার উদ্দেশ্যে লোকটা উবু হওয়া মাত্র, ব্যাঘ্রবিক্রমে তিনি তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠের উপর চাপিয়া বসিল লোহার নিগড়ের চেয়েও কঠিন একখানি বাহু। ততক্ষণে হুকা-কাশির আর আর সঙ্গীরাও আসিয়া পড়িয়াছে। তারকেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে ঝাঁপ ফেলিয়া ভিতর হইতে দোকানের দরজা আঁটিয়া দিল; এক সঙ্গে পাঁচটি টর্চ্চ জ্বলিয়া উঠিল, আর সেই আলোয় অমৃত দড়ির সাহায্যে লোকটার হাত-পা এমনই

শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল যে বেচারার আর এতটুকু নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। মুখচোখও বাদ গেল না—শক্ত কাপড়ে আচ্ছাদিত হইল।

"এবার মাদুরটা উঠিয়ে ফেল, ম্যান্-হোলের মুখ সরাতে হবে" হুকা-কাশি বলিলেন।

ঘরের মেঝের উপর একটা মাদুর বিছানো ছিল; সেটি সরাইতেই ম্যান্-হোল * সকলের নজরে আসিল। হুকা-কাশি এবং তারকেশ্বর ধরাধরি করিয়া ঢাক্‌নিটা তুলিয়া ফেলিলেন; দেখা গেল ঢাক্‌নির নীচে মোটা লাঠির মত একটা লোহার ডাণ্ডা লাগান রহিয়াছে—সমস্ত জিনিষটা দেখিতে ঠিক একটা খোলা বাক্সের ছাতার মত। হুকা-কাশি তারকেশ্বরের দিকে চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন, কহিলেন, "ডাণ্ডার মানে বুঝ্‌তে পেরেছ বোধ করি! চল, ভেতরে ঢোকা যাক্।"

তারকেশ্বর

ম্যান্-হোলের মুখে টর্চ্চের আলো পড়িতেই সকলে—অবশ্য হুকা-কাশি এবং তারকেশ্বর বাদে—বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেল; ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি একটা বিশেষ দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই বিস্ময় হুকা-কাশির সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইল না; সন্তোষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,

* ড্রেন পরিষ্কারের জন্য মাটীর নীচে ঢুকিবার লোহার ঢাক্‌নি-আঁটা গর্ত্তকে ম্যান্-হোল বলে।

"যা ভাব্ছেন তাই, সুড়ঙ্গই বটে এটা। এরই ভেতর আমাদের ঢুক্তে হবে এবং সেই জন্যেই এতগুলো টর্চ্চের ব্যবস্থা। চলুন, নেমে পড়া যাক্।" রজ্জুবদ্ধ দোকানীকে দেখাইয়া বলিলেন, "এ চাঁদটিকেও এখানে ফেলে যাওয়া নিরাপদ্ নয়, সঙ্গে করে নীচে নেওয়াই শ্রেয়।"

অতি ধীরে ধীরে, সতর্কভাবে সিঁড়ি বাহিয়া সকলে নামিতে লাগিলেন। অল্প খানিকটা আসিয়া সিঁড়ি শেষ হইয়াছে, তার পর আরম্ভ হইয়াছে সরু গলি : আরও খানিকটা আগাইতেই দেখা গেল সে গলি শেষ হইয়াছে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া।

ঘরের দরজা ভিতর হইতে ভেজান ছিল, ধাক্কা মারিতেই কোঁৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গেই দুয়ার খুলিয়া গেল, এবং সেই সঙ্গেই দেখা গেল ভিতরে কে একজন লোক মেঝের উপর গড়াগড়ি যাইতেছে। নিশ্চয়ই সে এতক্ষণ ভিতর হইতে দরজার গায়ে ঠেসান দিয়া ঝিমাইতেছিল, তাই ধাক্কার বেগ সাম্‌লাইতে পারে নাই, হুড়মুড় খাইয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথে টর্চ্চহাতে হঠাৎ এতগুলি লোকের আবির্ভাব বাস্তবিক এমনই বিস্ময়জনক যে লোকটা সহসা নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না, মনে করিল বোধ হয় সে জাগিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছে! কিন্তু ডাকু বড় ঝানু চীজ্, যে কোন অবস্থার জন্যই সে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে ; মুহূর্ত্তের মধ্যে বিপরীত দিকের দেয়ালের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একটা সূক্ষ্ম বোতামের মত কি সে টিপিয়া ধরিল, আর সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিল—এতক্ষণ নীরেট দেওয়াল বলিয়া যেটিকে তারা মনে করিয়া আসিতেছিল তারই মধ্যে পরিষ্কার একটি কাঠের দরজা খুলিয়া গেছে। কিন্তু রং ফলাইবার কি আশ্চর্য্য বাহাদুরী! কার সাধ্য দেয়ালের গায়ে দরজার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারে! হুকা-কাশি তারকেশ্বরের পানে তাকাইয়া আবার একটু হাসিলেন, ঠিক প্রথম বারের মতই অর্থপূর্ণ হাসি—কিন্তু ততক্ষণে তারকেশ্বর 'ডাকুর-পো'কে মারাত্মক ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। হুকা-কাশি বলিলেন, "তুমি এই দরজা আগ্‌লেই থাক, কেউ যেন না ঢোকে।" তার পর অমৃতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে অমৃত!"

প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে ভৃত্যের বিলম্ব হইল না ; অল্প একটু পরেই উপরে দোকানীর যে দশা হইয়াছিল, ঠিক সেই দশাই হইল এ লোকটিরও—অর্থাৎ 'নাগ-পাশে' আবদ্ধ।

"কোণের ওই পেট-মোটা সিন্দুকটার চেহারা বড়ই সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। অক্সি-এসিটিলিনের সরঞ্জামটা এগিয়ে দিন তো সন্তোষ বাবু!" হুকা-কাশি কহিলেন।

এ সামগ্রীটির সহিত যাঁরা পরিচিত নন তাঁদের হয়তো একটু বুঝাইয়া বলা দরকার কি এ জিনিষটা। কলিকাতায় ট্রাম-রাস্তা মেরামৎ করিতে বসিয়া মিস্ত্রিরা অতি উজ্জ্বল আলোর মত একটা জিনিষ ব্যবহার করে তা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করিয়াছেন। উহাই অক্সি-এসিটিলিন্ গ্যাস্। লোহা যত শক্তই হোক্ না কেন, ইহার সংস্পর্শে আসিলে গলিয়া তরল হইয়া যায়।

সন্তোষ সরঞ্জামটা হুকা-কাশির কাছে আনিয়া দিল, তিনি আগাইয়া সিন্দুকের কাছে গিয়া বসিলেন। সকলে শব্দ শুনিল—হিস্‌স্, হিস্‌স্, ব্যস্, সিন্দুকের তালা ক্রমশঃ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরেই হুকা-কাশির বুকের মধ্য দিয়া ঠিক যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ খেলিয়া গেল—তাঁর সাধনার ধন, এত দিনের এত পরিশ্রমের মূল শ্রীপুরের সোনার হরিণ ভিতর হইতে আলোক বিচ্ছুরণ করিতেছে। অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে সবে তিনি সেটি বাহিরে আনিবেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর সব কয়টি সঙ্গী সমস্বরে এক বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—নিদারুণ ভয়ব্যঞ্জক এক ধ্বনি! চম্‌কিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সেই অতি-বড় সাহসী পুরুষটিরও বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল—তাঁর নিকট হইতে মাত্র কয়েক আঙ্গুল দূরে প্রায় তাঁর গা ঘেষিয়াই দাঁড়াইয়া আছে বীভৎস-হিংস্র চেহারার একটা ভালুক, পিছনের দু'টি পায়ে ভর রাখিয়া। আগুনের গোলার মত তার দুই ক্রুদ্ধ চোখে সে কী ক্রূর দৃষ্টি, যেন এখনই নখে ছিঁড়িয়া সে তাঁকে কুটি কুটি করিয়া ফেলিতে চায়!

আত্মরক্ষার জন্য হুকা-কাশি সঙ্গে অস্ত্র আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন তার ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব। দু' একটা গুলিতে এ লোমশ জীবের হয়তো কিছুই

হইবে না, বরং যন্ত্রণার প্রতিশোধ লইতে সে 'মরিয়া' হইয়া উঠিবে। আক্রান্ত না হইলে কিছুতেই তিনি আক্রমণ করিবেন না, মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একদৃষ্টে তার চোখের দিকে তিনি তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরেই তাঁর সঙ্গীরা দেখিতে পাইল, তিনি ধীরে ধীরে ভালুকের গায়ে নিজের হাতখানি রাখিতেছেন। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল—ভদ্রলোকের কি বন্য জন্তু সম্মোহনের বিদ্যাও জানা আছে নাকি!

হঠাৎ একটা অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া হুকা-কাশি দুই হাতে ভালুকটাকে জাপ্টাইয়া ধরিলেন, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "অমৃত, শীগ্‌গির দড়ি দিয়ে পা' দুটো এর বেঁধে ফেল। আহা, কেন ভয় পাচ্ছ, আক্রমণের শক্তি এর নেই, দেখ্‌ছ কি?"

এ আদেশ অমান্য করা অমৃতের পক্ষে অসম্ভব, যন্ত্র-চালিতের মত দড়িহাতে ভালুকের দিকে সে কয়েক পা অগ্রসর হইল। কিন্তু মনের উপর তো আর মানুষের জোর নাই, পা হইতে মাথা অবধি সমস্ত শরীর তার কাঁপিতে লাগিল—ঠিক ঝড়ের মুখে কলার পাতার মত। বেচারার এই সকরুণ ভাব হুকা-কাশির দৃষ্টি এড়াইল না, অভয় দিয়া তিনি আবার কহিলেন, "অত কেঁপ না অমৃত, বার বার বল্‌ছি ভয়ের কিচ্ছুই নেই এখানে; এমন জ্বলজ্বলে দুটো চোখ থাক্‌তেও এ কিছুই চোখে দেখ্‌তে পায় না—কানে শুন্‌তে পায় না, হাত নাড়বারও শক্তি নেই। যা কিছু আছে ওই পা দু'টোই, কিন্তু ভালুকের জোর এ পায়ে আস্‌বে কোত্থেকে? এ তো ভালুক নয়!"

"ভালুক নয়?" সন্তোষ এবং তারকেশ্বর একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"না; ইনি আমাদের রণজিৎ বাবু।"

হঠাৎ মাথার উপরকার ছাতটা ধ্বসিয়া পড়িলেও বোধ হয় কেউ অধিকতর বিস্মিত হইত না। বিমূঢ়ের মত সকলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। হুকা-কাশি বলিলেন, "মানুষ যে কি রকম কল্পনাতীত নিষ্ঠুর হতে পারে, একটু পরেই তা জান্‌তে পার্‌বেন। কিন্তু তার আগে এই সাক্ষাৎ নরক থেকে বার হওয়া দরকার। আমাদের দুটো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে,—

রণজিৎ বাবু এবং সোনার হরিণ দুয়েরই উদ্ধার। সন্তোষ বাবু, এই আপনাদের সোনার হরিণ!"

হুকা-কাশি রত্নটি বাহির করিতেই সকলের চোখ এক সঙ্গে ঝলসিয়া উঠিল—যেন একটা প্রদীপ্ত সূর্য্য লক্ষধারায় কিরণের ছুরি হানিতেছে! স্থানকাল সমস্তই ভুলিয়া নির্ণিমেষে সকলে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। ইহার জন্য লোকে পাগল হইয়া উঠিবে, তাতে আর কথা কি!

কিন্তু হুকা-কাশি সকলের চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন, কহিলেন, "ওহে তারকেশ্বর, অবাক্ হবার সময় এখন নয়, সে সময় ঢের পাওয়া যাবে; এখন চাই সক্রিয় হওয়া। যে পথে যে ভাবে সকলে ঢুকেছি অবিকল সেই ভাবে বেরুব, শুধু রণজিৎ বাবু আমার কাঁধে থাক্‌বেন এই যা তফাৎ। আমাদের উপস্থিতি কিছুই ইনি টের পাচ্ছেন না—কাঁধে তুলে চল্‌তে শুরু করলে স্বভাবতঃই একটু চঞ্চল হবার সম্ভাবনা; কাজেই পা দু'টো বেঁধে নেওয়া হ'ল। অমৃত, ওই তাকের ওপর ওটা কি, বিছানার চাদর বুঝি! দাও তো, ওঁকে একদম্ ঢেকে ফেলা যাক্!"

যে দুটি 'মহাত্মা'কে দড়ির সাহায্যে বন্দী করা হইয়াছিল তারা যাতে এখন অন্ততঃ চার-পাঁচ ঘণ্টা বেশ 'ঠাণ্ডা' থাকে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া সকলে সুড়ঙ্গ-পথে ফিরিবার উপক্রম করিলেন। উপরে উঠিয়া ম্যান্-হোলটি পরিপাটিরূপে বন্ধ করা হইল, তার পর সকলে মিলিয়া বাহির হইতে দোকানের দরজাটা এম্‌নি ভাবে ভেজাইয়া দিলেন যাতে হঠাৎ কাহারও মনে কোন রকম সন্দেহই জাগিতে না পারে। দোকান হইতে কয়েক পা আগাইলেই গঙ্গা; একখানা বড় পান্‌সী নৌকা সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, সকলে গিয়া তাতে চড়িয়া বসিলেন। হুকা-কাশি তৎক্ষণাৎ মাঝি-মাল্লাদের নৌকা ছাড়িতে আদেশ দিয়া "ভালুকের" মাথার পিছন দিকে বড় বড় লোমগুলির মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে লাগিলেন; হাতে ঠেকিল গুটিকয়েক লোহার বোল্টু। ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলি খুলিয়া ফেলিতেই কঠিন-ইস্পাতের-উপর-রোঁয়া-বসানো, চোখ-মুখ-কান-ঢাকা মুখোসটাও খুলিয়া আসিল, দেখা দিল রণজিতের নিজস্ব মূর্ত্তি—উঃ, সে চেহারা দেখিলে বোধ করি অতি-বড় পাষাণেরও হৃদয় গলিয়া যায়।

'ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া রণজিৎ চারিদিকে তাকাইতে লাগিল—সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তার পর হুকা-কাশির সহিত চোখোচোখি হইতেই সে কেমন এক অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল; আর সেই সঙ্গেসঙ্গেই হুকা-কাশি দুই হাতে তার মাথাটি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইলেন। সেও নিতান্ত নির্ভরশীল ছোট ভাইটির মতই হুকা-কাশির বুকের উপর মাথা লুটাইয়া দিল। অপার্থিব দৃশ্য।

রণজিৎ ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সন্তোষ হুকা-কাশিকে প্রশ্ন করিল, "আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"সূর্য্য ওঠা অবধি নৌকোয় করে যতটা পারি এগিয়ে যাব; তার পর ভোর হলে পরে সব চাইতে কাছাকাছি ষ্টেশনে কলকাতার গাড়ী ধরতে হবে। আসান সরাই থেকে রামদয়ালদের শেষ রাত্তিরেই ফেরার কথা; তারা এসে শূন্য ডেরা দেখবার আগেই কাশী ছেড়ে যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে চাই।"

"কিন্তু মেজ কর্ত্তা যে কাশীতেই প'ড়ে রইলেন!"

"কে? মিষ্টার বাসু? তিনি খুব নিরাপদেই আছেন, কোন অনিষ্টেরই সম্ভাবনা নেই।"

"আর অহিভূষণ চৌধুরী? তাঁর কোন কিনারা করতে পারলেন কি?"

"হুঁ, তাও করেছি।"

"বটে নাকি? প্রাণে বেঁচে আছেন তিনি? কেন তিনি সোনার হরিণ সরিয়ে নিয়ে গেছলেন?"

"সরিয়ে নিয়েছিলেন নিতান্ত জঘন্য চরিত্রের লোক বলে। হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন বই কি,—তবে অহিভূষণ চৌধুরী নামে নয়, ও নামের আর দরকার নেই, ভিন্ন নামে।"

"সে আবার কি? কি নামে?"

"যেটা তাঁর আসল নাম সেই নামে, অর্থাৎ মিষ্টার বাসু নামে—মিষ্টার খগেন্দ্রনাথ বাসু, দ্বারিক বাবুর মেজ ভাই।"

"য়্যাঁ, য়্যাঁ, য়্যাঁ? দূর, তাও কি হয়, কি বলছেন আপনি?"

"আমি ঠিকই বলছি; মিষ্টার বাসু আর অহিভূষণ চৌধুরী একই ব্যক্তি।"

(ক্রমশঃ)

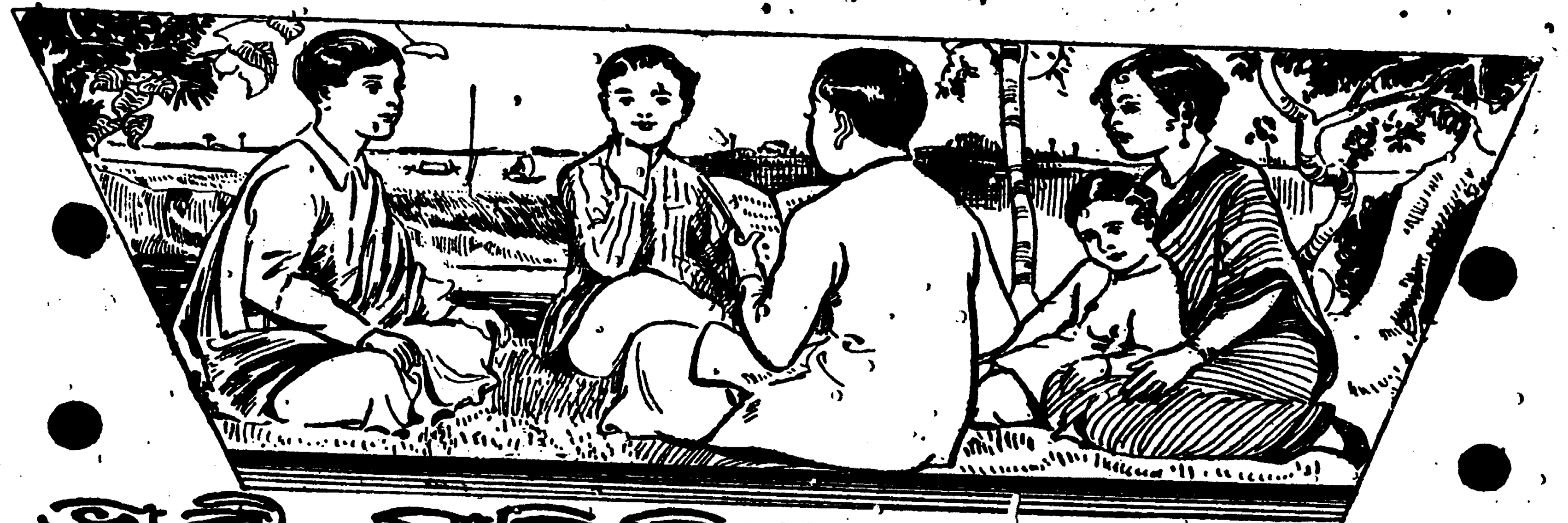

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

অকৃতজ্ঞ

(শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়)

খরতাপে শুষ্ক সরোবর,
ভাবে নর 'এ কি এ বিচার!'
বরষায় বারি ঝরঝর,
বলে না সে 'এ যে দয়াধার।'

মনুষ্যপ্রাণ

(শ্রীরমা দে)

চাপিয়া মুঠার মধ্যে প্রজাপতিটীরে
খুলে দেখি র'য়েছে সেথায়
ম্লান ভগ্ন দুইখানি পাখার বদলে
একটি মনুষ্যপ্রাণ রক্তাক্ত ব্যথায়!

চ'লেছিল কীট এক উদ্যান-উদ্দেশে,
মাড়ায়ে মারিনু তারে হায়;
চরণ সরায়ে দেখি সেথা প'ড়ে আছে
একটি মনুষ্যপ্রাণ মুমূর্ষু দশায়!

চিত্রশালা

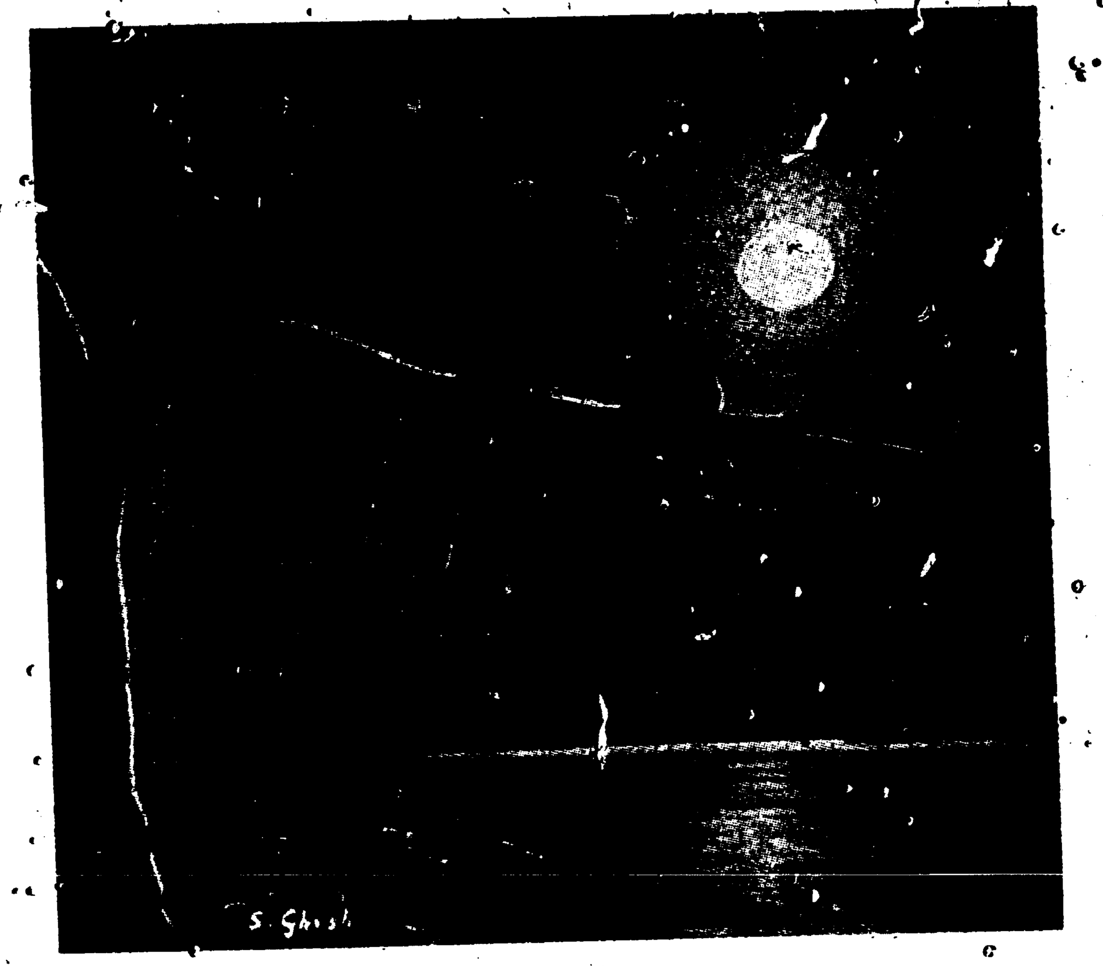

চাঁদনী রাতে
শিল্পী—কুমারী সাধনা ঘোষ

কুকুর সাহেব
আলোকচিত্রগ্রহীত্রী—শ্রীমতী লতিকা ঘোষ

পুস্তক-পরিচয়

কল্‌কাতার হালচাল—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১ বি, রসা রোড, কলিকাতা।

শিবরাম বাবুর লেখার সঙ্গে রামধনুর পাঠকেরা ভাল করিয়াই পরিচিত, এই বইখানির সঙ্গেও অনেকটা। এই বইখানির অনেক অংশ রামধনুতে বাহির হইয়াছিল। পুস্তকাকারে লেখক সে সব অংশে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ নতুন পরিচ্ছেদ ও ছবি যোগ করিয়া বইখানিকে আরও সরস করিয়াছেন। এই ধরণের বই—এমন অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার বাংলা শিশু-সাহিত্যে একেবারেই নতুন। আমরা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বইখানি পড়িয়া দেখিতে বলি। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ অতি মনোরম।

নতুন কিছু—শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি, এস-সি প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

রবীন্দ্র বাবুর লেখার সহিত রামধনুর পাঠকদের পরিচয় করাইবার দরকার নাই। সরস ভাষায় বিমল হাস্যরসপূর্ণ গল্প লিখিয়া ইনি ইতিপূর্ব্বেই বাংলা শিশু-সাহিত্যে তাঁর জায়গা দখল করিয়া লইয়াছেন। এই বইখানি তাঁর বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। প্রত্যেকটি গল্পই প্লট ও রচনাভঙ্গীর গুণে অনবদ্য হইয়াছে। ছেলেমহলে এর আদর অবশ্যম্ভাবী। বইখানির ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট এবং ভিতরের ছবিগুলিও অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

সূর্য্যমুখী—শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কুলজা-সাহিত্য-মন্দির ৯০।৩, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ছেলেদের উপযোগী কবিতার বই। ফটিক বাবুর লেখার সঙ্গে রামধনুর পাঠকদের ভাল রকমই পরিচয় আছে, এ বইটিরও অনেক কবিতা রামধনুতে বাহির হইয়াছিল। প্রত্যেকটি কবিতাই আমাদের কাছে সুন্দর লাগিয়াছে; আমরা ছেলেমেয়েদের বইখানি পড়িয়া দেখিতে বলি।

রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

অনেক গ্রাহক আমাদের জানিয়েছেন, সামনে তাঁদের বাৎসরিক পরীক্ষা থাকায় তাঁরা গত মাসের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারছেন না। তাঁদের অনুরোধে প্রতিযোগিতায় লেখা পাঠাবার তারিখ ১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এ বছরের সব গ্রাহকই এতে যোগ দিতে পারবেন। একই গ্রাহক ইচ্ছা করলে কবিতা প্রবন্ধ দুই-ই পাঠাতে পারেন।

সন্দেশ

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদিগকে আমাদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাইতেছি। অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকাও তাঁদের প্রিয় রামধনুকে বিজয়ার ভালবাসা জানাইয়াছেন। রামধনুর পক্ষ হইতে আমরা তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

*　*　*

আমাদের বাংলাদেশে সব শুদ্ধ ৮৯৫২৫টি গ্রাম আছে। সমস্ত ভারতবর্ষে আছে ৬৮৫৬৬৫টি। ভারতবর্ষে সহর আছে— ২৩১৬টি।

*　*　*

ভারতবর্ষের কোন্ জায়গায় কতগুলি সংবাদ-পত্র আছে জান কি? বাংলায় ২১০, বোম্বাইএ ৪১৫, মান্দ্রাজ ৩৩০, পাঞ্জাবে ২৮৪, আসামে ২৪, বিহার ও উড়িষ্যায় ৫০।

*　*　*

পৃথিবীর কোথায় কত মাইল রেল লাইন্ আছে নীচে দেখ—

ইয়োরোপে আছে—	২৩৮০০	মাইল
এশিয়ায়—	৮১০০০	”
আফ্রিকায়—	৫৭০০০	”
উত্তর আমেরিকায়—	৩১৬০০০	”
দক্ষিণ আমেরিকায়—	৩৫০০০	”

ভারতবর্ষে—

ই, আই, আর—	৪২৯১	মাইল্
এন্, ডব্লিউ, আর—	৬৯৫৪	”
জি, আই, পি, আর—	৩৬৯৯	”
বি, এন্, আর—	৩৩৬২	”
ই, বি, আর—	১৮৯৩	”

ইহা ছাড়া ভারতবর্ষে আরও কতকগুলি রেল-ওয়ে আছে।

*　*　*

শ্রীরঙ্গপট্টমের বিরাট্ খিলান

(শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভৌমিক গৃহীত আলোকচিত্র)

পাশে যে প্রকাণ্ড খিলানওয়ালা পোলটা দেখিতেছ এটা শ্রীরঙ্গপট্টম্ সহরে ছিল, এই সবে কয়েক মাস হইল হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে। পোলটি এক শ' বছরেরও বেশী পুরানো। এটির ইতিহাসও বেশ মজার। টিপু স্থলতান একবার কাবেরীর উপর একটা পোল তৈরী করিতে ইচ্ছুক হইলে ডি হ্যাভেলাও নামে একজন ফরাসী এঞ্জিনীয়ার এই রকম বিরাট খিলানওয়ালা একটা

পোল তৈরী করিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু ব্যাপারটা অসম্ভব বোধে কেউ উহাতে আমল দেয় না। কিন্তু হ্যাভেলাও সাহেব দমিবার পাত্র নন, ও রকম পোল যে বাস্তবিকই অসম্ভব নয় তা দেখাইবার জন্য তিনি নিজের বাড়ীর বাগানেই এই বিরাট্ ১১২ ফিট্ চওড়া খিলানটি তৈরী করিয়া দেখান। এক শ' বছরেরও উপর কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া এই সেদিন এটি পড়িয়া গিয়াছে।

*　*　*

আসল রাজমাতা বলিতে হইলে বলিতে হয় মেরি লেটিশিয়াকে। ইহার ছেলেদের মধ্যে চারজন চার দেশের রাজা হইয়াছিলেন, আর মেয়েদের মধ্যে দুইজন দুই দেশের রাণী হইয়াছিলেন। ছেলেদের মধ্যে একজন হইতেছেন ফ্রান্সের রাজা—নেপোলিয়ন্, একজন স্পেনের রাজা যোসেফ, একজন ওয়েষ্ট ফেলিসের রাজা জেরোম, এবং আর একজন হল্যাণ্ডের রাজা লুই। মেয়েদের মধ্যে একজন নেপ্‌ল্‌সের রাণী ক্যারোলিন, আর একজন টস্কানার রাণী এলিসা।

*　*　*

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) নকল (২) কলম (৩) কলু (৪) বিকল (৫) কলস (৬) কলপ (৭) কলা (৮) অবিকল (৯) কিল (১০) কলঙ্ক (১১) কলহ (১২) শিকল

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

দিলীপকুমার, বাণী ও নীরাজ ব্যানার্জ্জি (বজ্রযোগিনী); নীলিমা, জ্যোতি, নির্ম্মলকুমার সেন প্রভৃতি (গোপালগঞ্জ); অমলচন্দ্র মুস্তফী ও উমারাণী মুস্তফী (মাধবগঙ্গা); প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, পাঁচুগোপাল ঘোষ, রামপ্রসাদ সিং (বেহালা); কল্যাণী, আমেনা, মীনাক্ষী প্রভৃতি (কলিকাতা); রত্না দেবী (পাটনা); মালখানগর স্কুলের ১ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (আড়মহল); শৈলেশ, অনিল, নিরু (জলপাইগুড়ি); প্রভা ও বিভা (জলপাইগুড়ি); ধীরেন্দ্রনারায়ণ প্রামাণিক (উলিপুর); রমা চৌধুরী (কালিম্পং); লীলা দাস (কুমিল্লা); যমুনা, বুড়োদাদা, নির্ম্মল দা' (বড়রা); নীলা মুস্তফী (আরা); জ্যোতির্ম্ময়, বিনয়, পরেশ প্রভৃতি (পাটনা); বাণী বসু, কিকি, চেপু প্রভৃতি (চাইবাসা); অমলবরণ রায় (সাটীরপাড়া); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল ও নির্ম্মল (বালিগঞ্জ); মণি, সাধনা (শিলচর); কালী, তারা, রবি

প্রভৃতি (নিলফামারী) ; অমল, খোকা, পচু দা (মালদহ) ; ভোঁদা, সিদা ভোতু প্রভৃতি (লক্ষ্ণৌ) ; তুলু, গাবু, বাবলু প্রভৃতি (জামসেদপুর) ; নীলাদ্রি, মিনতি, ইরা (মুজঃফরপুর) ; সুনীলকান্তি সেন, শিলা, কৃষ্ণা প্রভৃতি (দিনাজপুর) ; মহিবুল হক (বেহালা) ; মৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত (কুষ্টিয়া) ; নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিন ষ্ট্রীট) ; মাষ্টার সতু সিংহ (রাজসাহী) ; পাঁচুগোপাল ঘোষ, পুষ্পলতা ঘোষ (গারুলিয়া) ।

যাঁহাদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে—

বিমল, অজিত, সুষমা প্রভৃতি (মালদহ) ; বেণু, রুণু ও খোকন (কলিকাতা) ; অস্থিচক ইউ, পি, স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ (অস্থিচক) ; প্রসূন রায় (নালান্দা) ; দীনেন, ছোটদি, মা (নলহাটি) ; বুলি, ময়না, শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি (জামসেদপুর) ; চণ্ডীচরণ সিংহ (গ্রাঃ নং ১৯৪) ; রণেন্দ্র, সুবোধ, রমেন্দ্র প্রভৃতি (ধুবড়ী) ; জ্যোৎস্না সেন (বাঁকীপুর) ; সুধা, লতি, যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (পটনা) ; সাধনা, সান্ত্বনা, অক্ষয় প্রভৃতি (যশোহর) ; নিখিল চৌধুরী (রাজসাহী) ; বিজনবিহারী হার (ফরিদপুর) ; সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (বকুলবাগান) ।

নূতন ধাঁধা

নীচের ভাগ অঙ্কটিতে সংখ্যাগুলি উল্টাপাল্টা করিয়া বসান হইয়াছে—অর্থাৎ ১ এর স্থানে ১ না লিখিয়া অন্য একটা সংখ্যা লেখা হইয়াছে। তেমনিধারা ২, ৩…প্রভৃতিও। কাজেই অঙ্কটি ঠিক মিলিতেছে না। অঙ্কটির সংখ্যাগুলি ঠিক ঠিক বসাইয়া দাও দেখি। একটি সংখ্যার বদলে কেবল মাত্র একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাই ব্যবহার করিতে পারিবে, অর্থাৎ ১ এর স্থানে একবার যা লিখিবে প্রত্যেক বারই তাহাই লিখিতে হইবে।

```
৫৬১ ) ৫৯১১৪৩ ( ৫৬১৩
      ৫৬১
      ----
       ৮১৪
       ৬৩১
      ----
      ১৮৩৩
```

৫৬১) ৫৯১১৪৩ (৫৬১৩

৫৬১

৮১৪

৬৩১

৫৪৪৩

৫৫৯১

২৩

রামধনু—

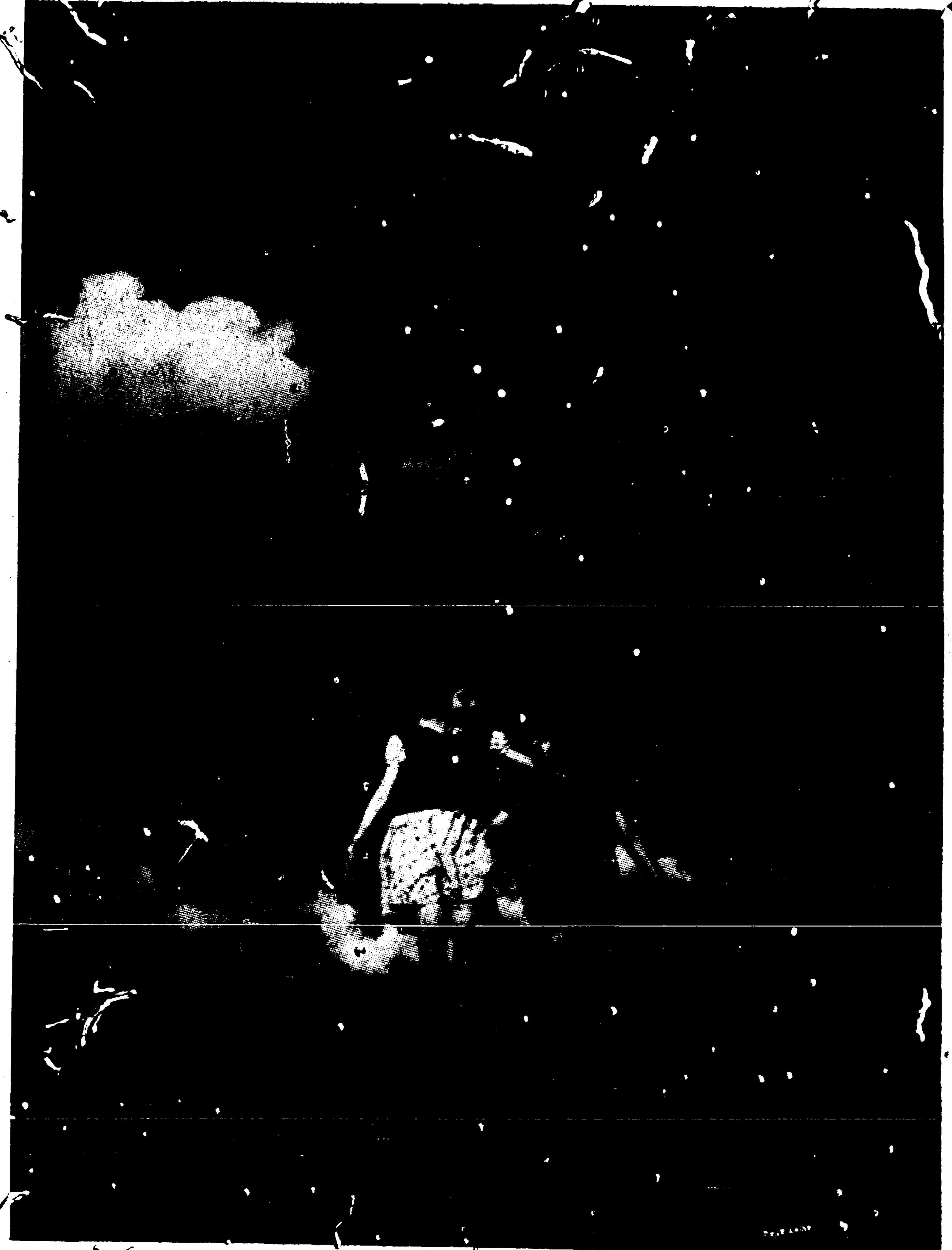

রামধনুকের দেশে যাব, রামধনুকের দেশে
মেঘ-শিশুরা পথ দেখাবে স্নিগ্ধমধুর হেসে।

৯ম বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৩ { ১২শ সংখ্যা

শিলং-ত্যাগ

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ)

এই শিলঙের শৈল এবং গিরিস্রুতা ঝর্ণা-ধারায়
মনটি আমার ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতি মা'র বক্ষে হারায়।
পাইন্-বনের নিঃশ্বাসে মোর শিরায় শোণিত হচ্ছে গাঢ়,
কপি এবং কড়াই সুঁটির নির্য্যাসে মেদ বাড়ছে আরো।
দীর্ঘ পথে ভ্রমণ করি নিত্য সকাল সন্ধ্যা ভরি,
কচিৎ হাঁপাই পাহাড়-চূড়ে, গরম জামায় বুক আবরি'।
ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছি হি-হি, চক্ষে তবু লাগলো ভালো
এই শহরের মোহন শোভা,—বাংলো এবং বিজলী আলো।

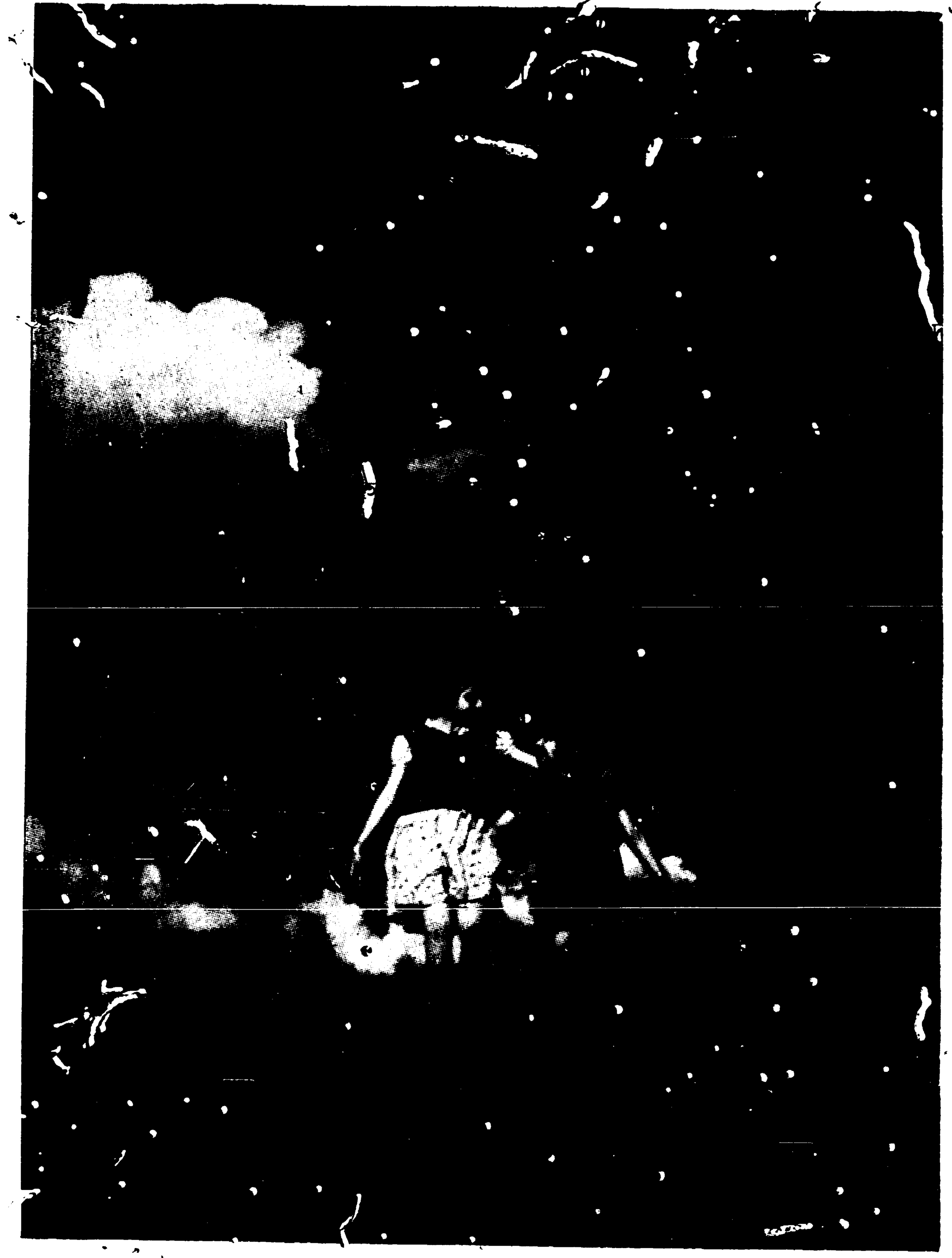

রামধনুকের দেশে যাব, রামধনুকের দেশে
মেঘ-শিশুরা পথ দেখাবে স্নিগ্ধমধুর হেসে।

৯ম বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৩ { ১২শ সংখ্যা

শিলং-ত্যাগ

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ)

এই শিলঙের শৈল এবং গিরিস্রুতা ঝর্ণা-ধারায়
মনটি আমার ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতি মা'র বক্ষে হারায়।
পাইন্-বনের নিঃশ্বাসে মোর শিরায় শোণিত হচ্ছে গাঢ়,
কপি এবং কড়াই সুঁটির নির্য্যাসে মেদ বাড়ছে আরো।
দীর্ঘ পথে ভ্রমণ করি নিত্য সকাল সন্ধ্যা ভরি,
ক্বচিৎ হাঁপাই পাহাড়-চূড়ে, গরম জামায় বুক আবরি'।
ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছি হি-হি, চক্ষে তবু লাগলো ভালো
এই শহরের মোহন শোভা,—বাংলো এবং বিজলী আলো।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

খাসিয়াদের মুখের মতোই ডালিয়া ফুল চ্যাপ্টা রঙীন্
গোলাপ-লতার মালঞ্চকেও জমক দিয়ে করেছে হীন।

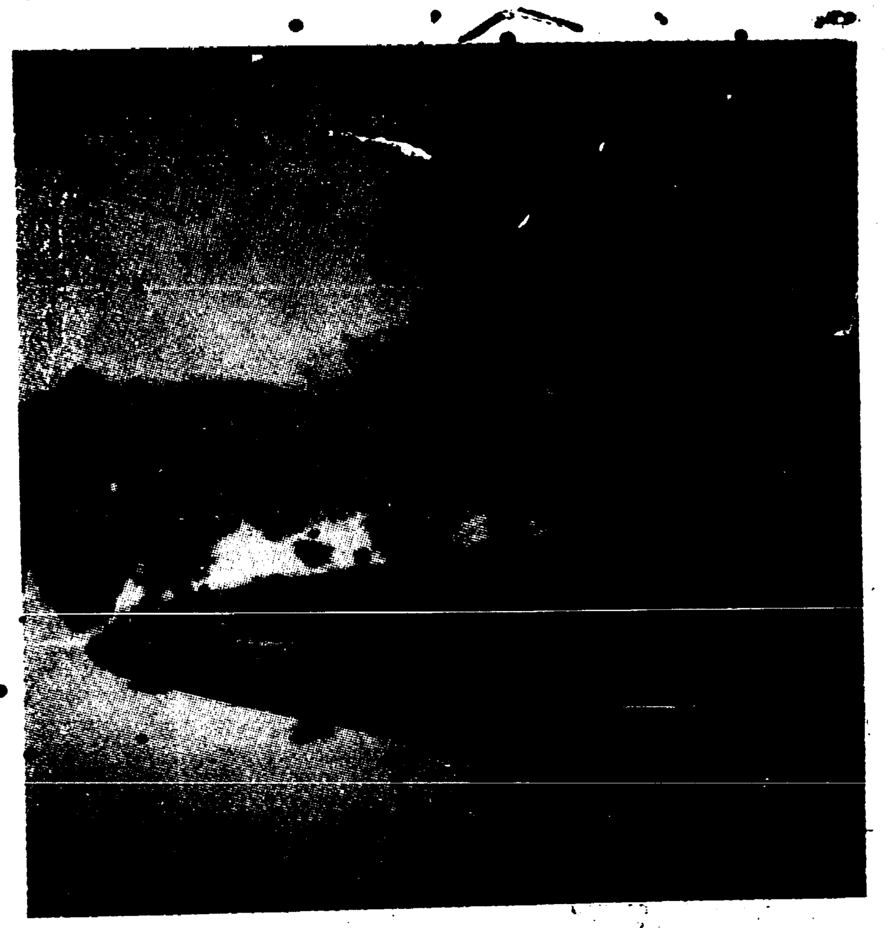

গাছে গাছে প্লাম্ পেকেছে টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত,
ন্যাস্পাতি ফল কোমল কচি ঝুল্‌ছে শাখায় লক্ষ শত ;
আপেলগুলোয় রং ধরেছে, পীচের বুকে জমেছে রস,
দৃষ্টি-ভোজন ছেড়ে যে তাই রসনাতেই দিই আনারস।
মোটের ওপর দেশটা ভালো, খাওয়ার অনেক জুৎ আছে, ভাই,
কম্‌লা-মধুর গন্ধ শুঁকেই নীরোগ হ'য়ে যায় যে সবাই।
কান্নাই, তুমি ভাবছো বুঝি, থাকবো হেথায় মাস তিন-চার ?
মোটেই তা নয়। কারণ যে সব রোমাঞ্চকর য়্যাড্‌ভেঞ্চার
কর্‌তে হচ্ছে নিত্যি নতুন, নয় তা আদৌ আমার প্রিয়,
দুর্ঘটনায় পড়েছি যা, অবস্থা নয় বর্ণনীয় !——
সেদিন ঘরের একটি কোণে হেলান দিলেম আন্‌মনাতে.
অম্‌নি হঠাৎ হই কুপকাৎ দেয়াল ফুঁড়ে নর্দ্দমাতে।

একটুখানি দেহের ভারেই তৈরি যেথায় হয় জানালা,
ভাব্‌তে পারো, সেই ঘরে ভাই রাত কাটানো কেমন জ্বালা ?
কাঠের মেঝেয় সূক্ষ্ম ফাঁকেই হুহু-স্বরে ঠাণ্ডা আসে,
ভূমিকম্পের ঝাঁক্‌ড়ানি তো লেগেই আছে দু'বার মাসে !
ক্যাল্‌কাটাতেই কেটেছে যার এই জীবনের উনিশ বছর,
তার কি সাজে এই বিদেশে হাওয়ার লোভে পাতানো ঘর ?
আবার সেদিন সখ হ'লো সব লাবান্-পাহাড়-চূড়ায় চড়া,
নাম্‌তে গেলাম বিপথ দিয়ে,—মেজাজ ছিল স্ফূর্ত্তি-ভরা ;
অম্‌নি আছাড়, সরসরিয়ে গড়িয়ে এলেম দীর্ঘ সানু,
কাদায় হলেম লুটোপুটি, ফাট্‌লো জামা, কাট্‌লো জানু।
গায়ের ব্যথায় হপ্তাখানেক রইনু প'ড়ে লেপের তলায়,
অনেক কষ্টে গরম চা আর মাখন-রুটি ঠেসে গলায়।
তার পরে স্রেফ্ পথে পথেই অক্সিজেনের জোগাড় দেখি,—
চেরাপুঞ্জীর মেঘের দেশে ঘুরতে সাহস আর হবে কি ?
অখ্যাত এক রাস্তা সরু—উষ্ট্র-পৃষ্ঠ নামটি তাহার, *
(উক্ত নামের সার্থকতা বুঝ্‌বে সাধ্য আছে কাহার ?)
সঙ্গী আমার তরুণ 'লালা', খেয়াল হ'লো যাই দু'জনে,—
(উটে চড়ার ইচ্ছা হয়তো লুকিয়ে ছিল মনের কোণে !)
সন্ধ্যা যখন এলো তখন নেইকো পথের কূল-কিনারা,
ফেরার দিকেও নেই নিশানা, বুকের ভেতর দিচ্ছে নাড়া !
পথিক-দলেও ফির্‌লো কোথায় শৈল শতের অন্তরালে,
দিগ্‌বলয়ে নাম্‌লো ছায়া গভীর কালো মেঘের জালে।
কোরাস্ গেয়ে উঠলো হঠাৎ হাজার ঝিঁঝি দীর্ঘ সুরে,
প্রতিধ্বনি মর্ম্মরিল গিরিশ্রেণীর অন্ধপুরে,—

* শিলংএ Camel back নামে একটি সর্পিল সংকীর্ণ রাস্তা আছে।

ঝঙ্কারে তার মর্ম্মে আমার অজানা সব ভয়-ভাবনা
থম্‌থমে সেই নির্জ্জনতায় করলে শুরু আনাগোনা !
আকাশ-পারে তাকিয়ে দেখি জ্বল্‌ছে তারা একটি দুটি,
কোন্‌টি ধ্রুব, অধ্রুব কোন্, আন্দাজে বা কোথায় ছুটি !
পাহাড়-গায়ে বাংলোতে ঐ প্রদীপগুলি উঠলো জ্বলে',
ক্ষীণ-শিখা সব জোনাক সম, চতুর্দ্দিকেই নয়ন ছলে !
দুজন মোরা 'একলা' তখন শিলং এসে হারিয়ে গেছি,
শহর ছেড়ে হয়তো কোথায় অনেক দূরের গাঁয় এসেছি।
কাছে কোথায় ঝর্ণা ঝরে,—অস্ফুট তার মধুর বাণী—
কুহকিনী আশার ভাষা, কিংবা ভূতের কাণাকাণি !
যা হয় ঘটুক মরণ-বাঁচন পণ ক'রে তাই দুইটি বীরে
গাছের শিকড় ধ'রে ধ'রেই পাহাড় থেকে নামি ধীরে।
ওমা একি ! সাম্‌নে যে সেই ঘোড়-দৌড়ের প্রকাণ্ড মাঠ,
আপন মনেই হাসি তখন,—ভাবি, দুজন মূর্খ অকাট।
কিন্তু, কানাই, এই শিলং-এ আর থাকাটা নয় সমীচীন,
পাহাড় এবং পাইন্-বনেই প্রাণটা শেষে হয় বা বিলীন।

এদিক্ দিয়েও দিন ঘনালো, ইস্কুলে ফের ফির্‌তে হবে,
তাই পুনরায় প্যাঁট্‌রা এবং পুঁট্‌লি বাঁধায় লাগলো সবে।
এবার যাবো সীলেট্ ঘুরে মোদের বাসায় কুমিল্লাতে,—
মোটর বাসে বসি এসে নয়-ঘটিকায় সেদিন প্রাতে।
ছুটলো গাড়ী, পিছন দিকে শহরটাকে দিনু বিদায়,
নতুনতর দৃশ্যলোভে মন যে আমার সম্মুখে ধায়।
ক্রমে কেবল উচ্চে উঠি, যানের গতি মন্দীভূত,
শীর্ণ সে পথ, একটু হেলায় জীবন চাকাই হয় বা চ্যুত !

পার্শ্বে তাহার গভীর খাদে মৃত্যু বদন ব্যাদান করে,
নীচের দিকে চোখ নামালেই মুখটি শুকায়, বুক শিহরে

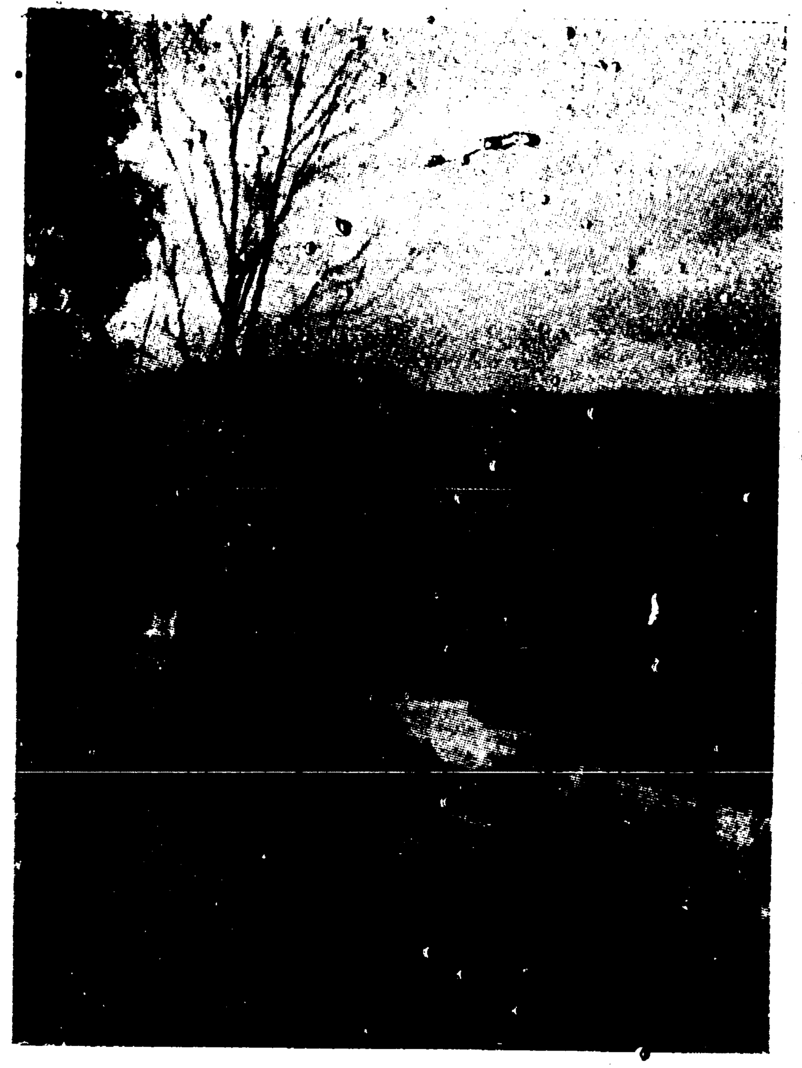

চালক চলে খুব হুঁসিয়ার। সাম্‌নে হঠাৎ সব যে 'ধোঁয়া' !
শাদা মেঘে ঘির্‌লো পাহাড়, হাত বাড়ালেই যাচ্ছে ছোঁয়া।
একটা পুরু পর্দ্দা চিরে দৃষ্টি চলে ঝাপ্‌সা অতি,
প্রাণের দায়ে মন্থরতায় মোটর চলে শামুক-গতি।
তথাপি সেই ঝকাং-ঝকাং ওঠা-নামার হেঁচ্‌কা দোলে,
পেটের ভেতর মোচড় লাগে, শিথিল আঁখি স্বপন ভোলে,—
অতি রূঢ় বাস্তবতায় 'ওয়াক্' ক'রে উঠ্‌লো বমি,—
তখন ভাবি থামাও গাড়ী, পায়ের তলায় চাই যে জমি !
ঝিম্‌ঝিমিয়ে ঘুর্‌লো মাথা, কাপড়-জামা হ'লো যা' তা',
লাগলো মনে এই পথে মোর মৃত্যু-আসন আছে পাতা।

বাইরে তখন স্বর্গছবি, কী অপরূপ বিস্ময়কর !
শৈল-শিরের তরঙ্গ ঐ, যেন সুনীল বিরাট্ সাগর।
পেঁজা তূলোর মতন মেঘে ঢাকা তাদের ঊর্দ্ধগুলি,—
লক্ষ মহাদেব কি এলেন শুভ্র জটায় নাচন তুলি ?
সোনালি রোদ লাগলো মেঘে, ঝল্‌মলিলো হীরক সম,—
ইন্দ্রধনুর চূর্ণ যেন ছড়িয়ে গেলো নয়নরম !
ইচ্ছে হ'লো লাফিয়ে পড়ি, লুটিয়ে পড়ি মেঘের রাশে,
গড়িয়ে পড়ি, ডিগ্‌বাজি খাই, নৃত্য করি ঘনোল্লাসে !

কিন্তু কঠিন মর্ত্ত্য-জীবন, এই মানুষের শক্তি কি, ভাই,
বাসের সীটে ব'সে কেবল বমির বেগে মৌরি চিবাই !
এত বড় করুণ রস আর ঘটেনি কো এই জগতে—
তাই করি শেষ কবিতা মোর শিলং-ত্যাগের অর্দ্ধপথেই।

ছোট একটি মেয়ে ছিল

(শ্রীরজত সেন)

রমেশ বাবু কাছারী থেকে এসেই বৈঠকখানায় ঢুক্‌লেন। যে আইন-বইটা সকালে তিনি আলমারি থেকে বার ক'রে টেবিলের ওপর খোলাই রেখে গিয়েছিলেন, সেই বইএর অনেকগুলো পাতায় লাল-নীল পেন্‌সিল দিয়ে পাখী আঁকা, মানুষের হরেক রকমের মূর্ত্তি আঁকা। দামী বইটার এমন হাল হয়েছে দেখে ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। বইটা হাতে নিয়েই তিনি ওপরে উঠে এলেন।

'টুনি কোথায় ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'খেল্‌ছে, কেন ?' তাঁর স্ত্রী বল্লেন।

'ডাক না তুমি !' রমেশ বাবু গর্জ্জে উঠ্‌লেন।

টুনি রমেশ বাবুর মেয়ে, পঞ্চবর্ষীয়া।

টুনির মা টুনিকে ছাত থেকে ডেকে নিয়ে এলেন। লাল ফ্রক্-পরা টুক্‌টুকে এক মেয়ে। কোঁকড়া চুল।

'এমন ক'রে বইতে এঁকেছ তুমি ?' রমেশ বাবু বইটা দেখিয়ে টুনিকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হুঁ।' সে বল্‌লে; বাবার মেজাজ ভীষণ কড়া, সেটা টুনি জানে। তাই ভয়ও তার করছিল।

'কেন করেছ ?'

কোন উত্তর নেই, টুনি চুপ ক'রে রইল। 'কেন করেছে সে কি নিজেই জানে ? দুপুরে বৈঠকখানায় ঢুকে দেখ্‌ল টেবিলের ওপর প্রকাণ্ড এক বই খোলা, আর হাতের কাছে মোটা লাল-নীল পেন্‌সিল। তার পরের ইতিহাস .....

'আর করবে কোন দিন ?' রমেশ বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

টুনি ঘাড় নাড়্‌ল, জানাল যে সে অমন কাজ আর কর্‌বে না কখনও।

'যাও, খেলা কর গে।' রমেশ বাবু টুনিকে ছেড়ে দিলেন।

টুনি খেল্‌তে চলে গেল বটে, কিন্তু বাবার সেই গম্ভীর মুখ আর ভারী গলার স্বর ভুল্‌তে তার দু'দিনও লাগ্‌ল না। কয়েক দিন পরে টুনি আবার এক দিন দুপুরে তার বাবার বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুক্‌ল। তার মা ঘুমুচ্ছিলেন ওপরে, টুনি যে কখন তাঁর পাশ থেকে উঠে পালিয়েছে তিনি টের পান নি।

আজও অবশ্য টেবিলের ওপর বই কয়েকখানা ছিল বটে, কিন্তু খোলা নয়, বন্ধ। হাতের কাছে লাল-নীল পেনসিল্‌ও পাওয়া গেল। বই খুলে নিতে তার বেশী সময় লাগ্‌ল না। লেগে গেল সে ছবি আঁকতে। পাতার পর পাতা এঁকে চলেছে কত হরেক রকমের ছবি। দু'দিন আগে বাবার ধমকানির কথা একবারও মনে পড়্‌ল না তার।

রমেশ বাবু যথাসময়ে কাছারী থেকে ফিরলেন। তার পর মূল্যবান্ বইগুলোর ওপর টুনির চিত্রাঙ্কনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি পড়তে বিলম্ব হ'ল না।

টুনি তখন পুতুল খেল্‌ছিল। রমেশ বাবু সোজা কান ধরে বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন তাকে ! 'এসব কি করেছ ?' বল্‌লেন তিনি।

কোন উত্তর নেই।

'বল শীগ্‌গির কেন করেছ, ডাইনি মেয়ে !'

টুনি কোন কথা বল্‌লে না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল ; রমেশ বাবু তার কান রগড়াতে লাগ্‌লেন। অনেক কষ্টে সে চোখের জল সাম্‌লে রাখ্‌ল।

'যাও, মনে থাকে যেন।' তিনি তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বল্‌লেন।

টুনি চলে গেল।

সেদিন টুনি কথা কইলে না কারুর সঙ্গে। বড় ডল্‌-টা মাটিতে গড়াগড়ি গেল। পাশের বাড়ীর রাণী এসে বার বার ডেকে ফিরে গেল।

পর দিন।

টুনির বাবা কাছারী চলে গেছেন। টুনি মার পাশে শুয়ে ছিল বটে চোখ বুজে, কিন্তু ঘুমোয় নি। যেই রামায়ণখানি মার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল অমনি টুনি চুপে চুপে বাইরে বেরিয়ে একেবারে বৈঠকখানায়।

লাল-নীল পেন্‌সিলটা নিয়ে সে টেবিলের ওপর যত বই যত নথিপত্র ছিল কিছু আর বাকী রাখ্‌ল না ; সমস্ত এঁকে, দাগ কেটে একেবারে একাকার করে দিল। আলমারি থেকেও মোটা মোটা আইনের বইগুলো টেনে বার করলে ; তার পর চল্‌ল তাদের পাতার উপর বিচিত্র চিত্রাঙ্কন। স্তূপাকার হ'য়ে গেল টেবিল ; পেন্‌সিলের আল গেল ফুরিয়ে ; আর তার বাবারও ফেরবার সময় হ'ল।

টুনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। হাতে তখনও পেন্‌সিলটা। মাথার কোঁক্‌ড়া চুল কপালে এসে পড়েছে। রাগে তার গাল ফুলে গেছে ; পেন্‌সিলটাও কামড়াচ্ছে মাঝে মাঝে !

রমেশ বাবুর চাপকান দেখা গেল, তিনি কাছারী থেকে ফিরে এসেছেন ; টুনি শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল। রমেশ বাবু ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন। তাঁর চোখ পড়ল টেবিলের দিকে, কয়েক মিনিট তিনি সেই বিচিত্রিত বইগুলোর দিকে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন ; ব্যাপার বুঝ্‌তে তাঁর দেরী হ'ল না।

তিনি দেখ্‌লেন টুনি তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে, ক্ষণে ক্ষণে রাগের চোটে স্ফীত হ'চ্ছে তার নাসিকা।

'এদিকে এস।' তিনি ডাক্‌লেন টুনিকে।

সে এল না, তেমনি গ্যাঁট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রমেশ বাবু কাছে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন, কপালে দিলেন কয়েকটা চুমো। বল্‌লেন, 'দুষ্টু মেয়ে !'

গরিলার প্রতিহিংসা

(শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে)

প্রসিদ্ধ শিকারী ইসাডোর সাহেব আফ্রিকার গহন জঙ্গলে শিকারে বেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে তাঁবু ফেল্‌লেন। সন্ধ্যার অন্ধ-করা যবনিকা পড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরও তাঁবুর সামনে প্রত্যহই সারি সারি অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠ্‌ত ; কোন বন্য জন্তু যাতে কাছে না ঘেঁষতে পারে তারই জন্য অবশ্য এ ব্যবস্থা।

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ভোরের আলো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মার্‌ছে কিন্তু সাহেব আর তাঁর অনুচরেরা তখনও তাঁবুর ভেতর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ বানর-সুলভ বিশ্রী একটা কিচিমিচি শব্দ অত্যুগ্র হয়ে ঘুমন্তদের কানে এল, সবাইকারই ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকলেই টের পেল আওয়াজটা আস্‌ছে সাম্‌নের একটা পাহাড়েরই ভেতর থেকে।

সাহেব খোঁজ নিয়ে জান্‌লেন, প্রায় তিন চারশ' বেবুন গোটা পাহাড়টাই ছেয়ে ফেলেছে। খাবারের সন্ধানেই তাদের এই শুভাগমন। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেবুনদের কোলাহল হঠাৎ বেড়ে গেল—কেমন একটা অসহায়, ভয়ার্ত্ত ধরণের চীৎকার—যার স্বরূপ অভ্যস্ত কানের কাছে চাপা থাক্‌বার কথা নয়। ক্রমে তাদের সেই করুণ আর্ত্তনাদকে চাপা দিয়ে বাতাসে ভেসে আস্‌তে লাগল সম্পূর্ণ

বিভিন্ন রকমের আর একটা আওয়াজ—যেন অসংখ্য ডালকুত্তা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সমস্বরে চীৎকার করতে লেগে গেছে।

ব্যাপারটা কি স্পষ্ট করে জান্‌বার জন্য ইসাডোর তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন; তার পর এদিক্ ওদিক্ একটু চাইতেই হঠাৎ তাঁর চক্ষুস্থির! ইয়া চওড়া বুকওয়ালা বিরাট্ একটা গরিলা চুপি চুপি পাহাড়ের কোণে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষোক্ত শব্দটা প্রকৃতপক্ষে কি এইবার তা স্পষ্ট বোঝা গেল—গরিলার গলার আওয়াজ।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাহেবের চোখের সাম্‌নেই সমস্ত গাছটা ভরে গেল—একদল গরিলা গাছের প্রত্যেকটি ডালই অধিকার করে প্রলয়-নাচন—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবল গর্জ্জন সুরু করে দিল। সাহেব আরও দেখ্‌লেন, সেই গরিলার দলের সাম্‌নে নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই পড়ে গিয়েছে সংখ্যায় ঢের বেশী, বেশ বড় আকারের, একদল বেবুন। ভয়ে বেচারাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, চুপিসারে গুটি গুটি কোন মতে সরে পড়্‌তে পার্‌লেই তারা অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেয়। কিন্তু এ যে বড় শক্ত ঠাঁই! হাঙ্গামা বাধাবার বদ্ মৎলব নিয়েই এতটা পথ তারা এসেছে; তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বেবুনের দল এখন সরে পড়্‌তে চাইলেও তারা তাতে রাজী হবে কেন? রক্তের নেশা যে তাদের পেয়ে বসেছে!

ফস্ ক'রে একটা গরিলা পাহাড়ের ঢালু জায়গায় নেমে এল। দেখতে দেখতে আর একটা গরিলাও তার পাশে এসে দাঁড়াল। অম্‌নি বেবুনের দলে এক নিমেষে একটা ছুটোছুটির সাড়া পড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ। আর তারই সঙ্গে গরিলাদের প্রচণ্ড হুঙ্কারধ্বনি মিশে মুহূর্ত্তে সে কি ভীষণ কাণ্ড যে আরম্ভ হয়ে গেল তা' তোমরা ভাব্‌তেও পারবে না।

ব্যস্, দুই দলে বেধে গেল প্রচণ্ড সংগ্রাম। লম্ফঝম্প, চীৎকার, ঘুষোঘুষি, ঠেলাঠেলি, জাপ্‌টা-জাপ্‌টি, চড়-চাপড়, শূন্যে তুলে বেপরোয়া আছাড় প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কোন প্যাঁচই আর বাকী রইল না। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! দুই দল সমানে তাণ্ডবে মেতে গেছে, কোনদিকেই তাদের আর ভ্রূক্ষেপ নেই। ইসাডোর সাহেব যে সদলবলে নীচে বসে সমস্ত ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করছেন তা তারা ভুলেও তাকিয়ে

দেখ্‌ছে না। তাদের যেন একমাত্র লক্ষ্য শত্রুপক্ষের রক্তে মা বসুন্ধরার বুকখানা ভিজিয়ে দেওয়া। প্রায় আদ্ধ-ঘণ্টা কাল এই ভাবে পাহাড়ের বুক কাঁপিয়ে, আশ-পাশের বনভূমি সন্ত্রস্ত করে তুলে দু'দলে লড়াই চল্‌ল, তার পর দু'দলই ক্রমে স্থির হয়ে এল। যুদ্ধ থেমে গেছে, এখন যে যেদিকে পারে সরে পড়্‌বার সময় এসেছে।

গরিলা

যুদ্ধ শান্ত হওয়ার পর ইসাডোর দলবল নিয়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপরে উঠ্‌লেন। চারদিকের রণ-ক্ষেত্রের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। গোটাকতক বেবুন ক্ষত বিক্ষত দেহে সংজ্ঞাবিলুপ্ত হয়ে মড়ার মত পড়ে আছে। বলা বাহুল্য, তাদের দলেই হতাহতের সংখ্যা অগুণ্‌তি—মারাই গেছে প্রায় শ'খানেক বেবুন। গরিলাদেরও আটন'টা একদম শেষ হয়ে গেছে, কতকগুলি আহতও হয়েছে। তবে জিৎ অবশ্য হয়েছে তাদেরই। এ দৃশ্য দেখে তো ইসাডোর সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া। মনে মনে তিনি ভাব্‌তে লাগলেন এ-হেন একটি গরিলার দল যদি কাফ্রীদের কোন একটী গ্রামে গিয়ে হানা দেয় তবেই দফা ঠাণ্ডা! কিন্তু তিনি জান্‌তেন না সে দৃশ্যও শীগ্‌গিরই তাঁর চোখে পড়্‌বে।

ঠিক সেই দিনেরই ঘটনা। ক্রমাগত শিকারের পেছনে ঘুরে ঘুরে সাহেবের মনটা বাস্তবিকই হাঁপিয়ে উঠেছিল, যেম্‌নি তিনি টের পেলেন যে কাছেই একটা

কাফ্রী-গ্রাম আছে, অমনি তাঁবু গুটিয়ে সব শুদ্ধ সেই গ্রামের অভিমুখেই রওনা হয়ে পড়্‌লেন ; উদ্দেশ্য দিন কয়েক বিশ্রাম করে বেশ একটু 'তাজা' হয়ে নেবেন। গ্রামে ঢুকেই কিন্তু সাহেব আর তার অনুচরেরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল—গ্রাম একেবারে জনশূন্য, বাঁশ-কাঠ, লতাপাতা দিয়ে তৈরী কাফ্রীদের ঘরবাড়ীগুলো কারা ভেঙ্গে-চুরে রেখে গেছে। অবশিষ্ট যা আছে তাও জরাজীর্ণ ; ধারে-পাশে জন-মানবের সাড়া নেই। এ যেন রূপকথার সেই রাজপুরী যেখানে রাক্ষস এসে—সমৃদ্ধ নগরকে শ্মশান বানিয়ে ছেড়েছিল। সাহেব আরও দেখ্‌লেন, পথেঘাটে সর্ব্বত্রই অসংখ্য কাফ্রী নরনারীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে আর রয়েছে তাদের কঙ্কাল ; দু'-চারটা গরিলার কঙ্কালও চোখে পড়্‌ল।

কাফ্রীদের আতিথ্য গ্রহণ করা আর সম্ভব হ'ল না, ইসাডোরকে সদলবলে ফিরে এসে ফের তাঁবু খাটাতে হ'ল। তার পরেই তিনি দিগ্বিদিকে নিজের অনুচরদের পাঠিয়ে দিলেন। এ শ্মশানপুরীর প্রকৃত রহস্য ভেদ করতেই হবে। চারদিকে খানিকটা অনুসন্ধানের পর তারা আবিষ্কার কর্‌লে, বহু দূরে এক পাহাড়ের তলায় গুটিকয়েক কাফ্রী লতা-পাতার কুটীর বেঁধে দিন কাটাচ্ছে ; তারা এ গ্রামেরই লোক, কিন্তু ভরসা করে গ্রামের দিকে এগুতে পার্‌ছে না।

পর দিনই সাহেব নিজে গিয়ে তাঁদের সেই গোপন আস্তানায় উপস্থিত হলেন। তার পর সেই 'পলাতক' কাফ্রী কয়টির কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ তিনি যা পেলেন তা নীচে লিপিবদ্ধ কর্‌ছি।

প্রায় মাস ছয়েক আগে একদল শিকারী এই পথে শিকারে বেরিয়েছিলেন। সংখ্যায় তাঁরা নিতান্ত কম ছিলেন না, সবশুদ্ধ প্রায় জনা পনেরো হবেন। হঠাৎ ছোটখাটো—সাত আটটার বেশী নয়—এক গরিলা-দলের সঙ্গে পথেই তাঁদের মোলাকাৎ। শিকারীরা তৎক্ষণাৎ গুলি চালালেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই বেধে গেল দু'দলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ। সম্মুখসমরে শিকারীদের হাতিয়ার কোন কাজে এল না, গুলিবারুদ থাকা সত্বেও তাঁদের অধিকাংশকেই গরিলারা ছিঁড়ে পিষে ছাতু করে দিল।

গরিলা-দলেও খুন-জখম নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু হয়েছিল ; সাধারণ

জানোয়ারের মত 'হাতের' শত্রুকে নিপাত করেই তারা ঠাণ্ডা হ'ল না। মনে মনে ওরা ভয়ঙ্কর এক সঙ্কল্প এঁটে ফেল্ল—শুধু ছিটকে-আসা উপস্থিত দু'চারটাকে নয়, যতদূর সম্ভব এই মহাশত্রুর মূলই উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে হবে। সে মহাশত্রু হচ্ছে মানুষ!

শান্তির নীড় কাফ্রী গ্রামখানি ; সকাল থেকে সুরু করে স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত অধিবাসীরা স্বচ্ছন্দমনে, প্রফুল্লচিত্তে যে যার নিৰ্দ্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে, চারদিক্‌কার আবহাওয়ায় বিপদের বাষ্পটুকুও নেই। হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—নির্বিবাদী গ্রামবাসীরা দেখ্‌তে পেল প্রচণ্ড হুঙ্কারে আকাশ ফাটিয়ে দলে দলে ক্রুদ্ধ গরিলা তাদের গ্রামখানি ঘিরে ফেল্‌ছে। চোখে-মুখে তাদের রক্তের দুর্ব্বার পিপাসা।

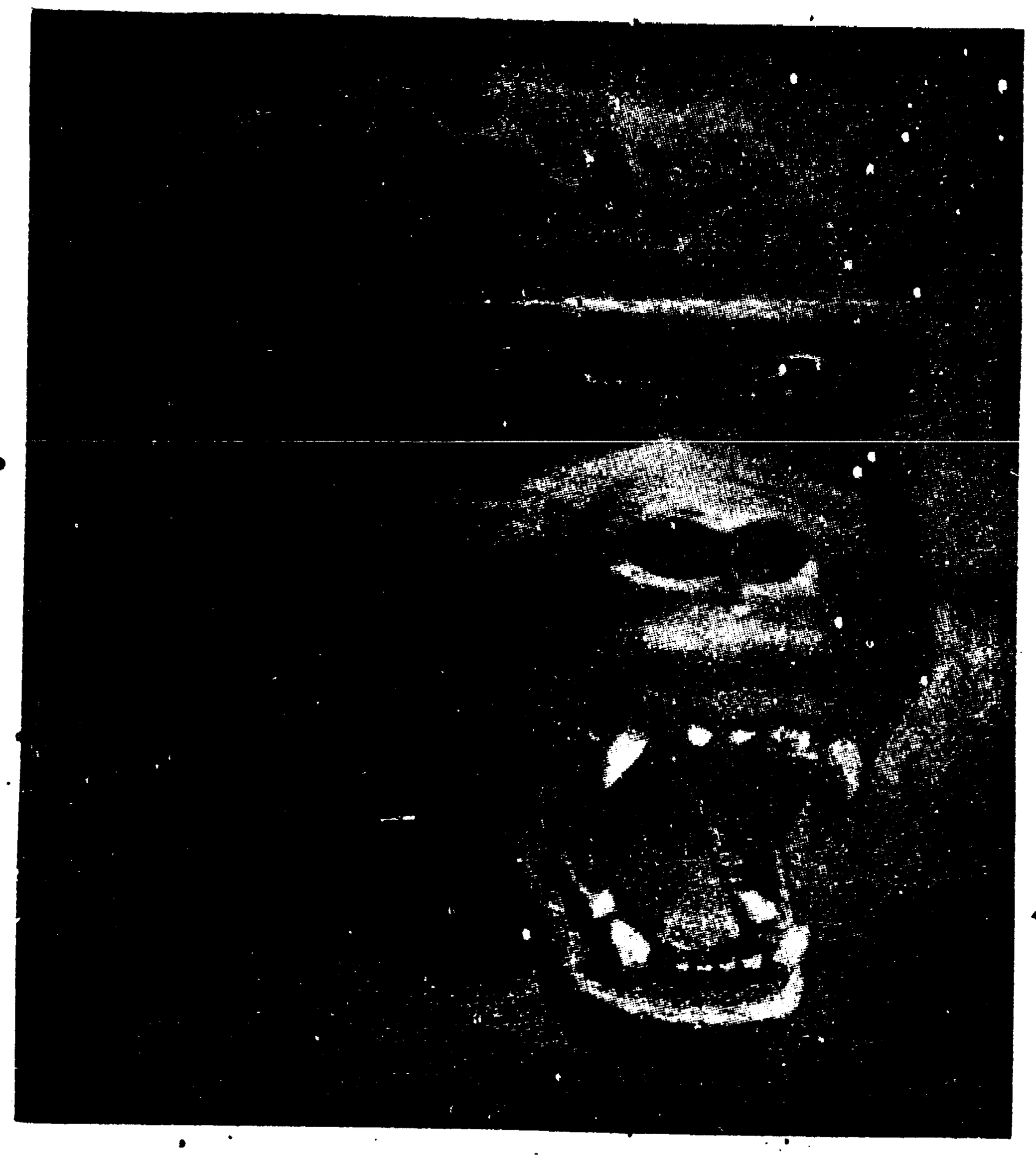

গরিলার ক্রোধ

তার পর সুরু হ'ল গরিলাদের নিষ্ঠুর আক্রমণ। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো কেউ অব্যাহতি পেল না সেই ক্ষিপ্ত গরিলাদের নির্ম্মম হাত থেকে। সারা রাত ধরে তাদের এই অত্যাচার চল্‌ল ; গ্রামের বুকের উপর দিয়ে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। যারা পালিয়ে বাঁচ্‌তে পারল বাঁচল ; যারা তা পার্‌লে না তাদের সেখানেই ইতি হয়ে গেল। পর দিন দুপুর বেলা পর্য্যন্ত গরিলাদের হানা চলেছিল। তার পর অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা চলে যায়।

যারা পালিয়ে বেঁচেছিল, গরিলাদের গ্রাম ত্যাগের পরই আবার তারা গ্রামে ফিরে এল। সে দলের ভিতর ছিল স্বয়ং গ্রামের সর্দ্দার। গ্রামময় সর্ব্বত্র এই অকথ্য অত্যাচারের চিহ্ন দেখ্তে পেয়ে সর্দ্দার প্রায় ক্ষেপে গেল—যে করেই হোক্ এই হত্যালীলার প্রতিশোধ চাই-ই! বাছা বাছা শিকারীদের সন্ধান চলতে লাগ্ল। তার পর একদিন বাছাই-করা এক শিকারীর দল অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রওনা হয়ে পড়্ল অত্যাচারী গরিলাদের সমুচিত শাস্তিবিধান কর্তে।

দিন কতক তাদের কোনই পাত্তা নেই ; তার পর হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল, উদ্দেশ্য সফল করে বিজয়গর্ব্বে তারা গ্রামের দিকে ফিরে আস্ছে। যেই না এ খবর রটা অম্নি গ্রামের ঘরে ঘরে উৎসবের ঘটা পড়ে গেল ; মেয়েরা লেগে গেল হরেক রকমের খাবার তৈরীতে, রণবিজয়ী বীরদের ভূরিভোজনে তারা আপ্যায়িত কর্বে, নিজেদের কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেবে। ঠিক এম্নি সময় সহসা দূরে শোনা গেল একটা কোলাহল—সমরবিজয়ী কাফ্রী যোদ্ধাদের হর্ষধ্বনি নয়, দুরন্ত গরিলা-দলের রুদ্র কলরব।

সকলে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝ্তে না বুঝ্তেই গরিলা-বাহিনী একেবারে গ্রামের বুকের উপর এসে পড়্ল, সমস্ত গ্রাম ছেয়ে ফেল্ল। আজ তারা প্রতিহিংসার দ্বিগুণ আগুন বুকের ভেতর পুষে এনেছে ; আজ তারা ক্ষমাহীন, রক্তের নেশায় উন্মাদ। দেখ্তে দেখ্তে সমস্ত গ্রামখানি তারা বিপর্য্যস্ত, লণ্ডভণ্ড করে দিল, অসহায় নরনারীগুলির প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেল্তে সুরু কর্ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে কী প্রলয়ঙ্কর চীৎকার! প্রবল ঝড়ের মুখে তূলোর মত কাফ্রীরা কোথায় উড়ে গেল, পথঘাট মৃতদেহে স্তূপীকৃত হয়ে উঠ্ল।

যে ক'টি লোক কোন গতিকে পালিয়ে রেহাই পেয়েছিল তারাই এ পাহাড়ের নীচে কুটীর বেঁধে বাস কর্ছে। শিকারীরা ফিরে এসেছে বলে একটা রব উঠেছিল বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি। নিশ্চয় তারা গরিলাদের হাতেই শেষ হয়ে গেছে। গরিলাদের অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ সেই থেকে গ্রামটি জনশূন্য হয়ে পড়ে আছে।

কি ও কেন ?

বাংলা দেশের "বারভুঞা" কাহাদের বলা হইত ?

বারভুঞা—শব্দটী সম্ভবতঃ অনেক প্রাচীন। তবে সাধারণতঃ বাংলা দেশে পাঠান রাজত্বের শেষ হওয়ার পরে এবং মোগল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে যে সকল সামন্ত স্থানে স্থানে প্রবল ভাবে আধিপত্য করিতেন তাঁহাদিগকেই বারভুঞা বলা হইয়া থাকে। বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনেকের সহিত মোগল শাসনকর্ত্তার সংঘর্ষ চলিয়াছিল। এই স্থানীয় সামন্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ মোগল প্রতিনিধির সহিত যোগ দিতেন, আবার সুবিধা দেখিলেই তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিতেন অথবা মোগল শক্তির সহিত যুদ্ধে নামিতেন।

এই ধরণের সামন্ত বাংলা দেশে অনেক থাকিলেও লোকে প্রাধান্য দিত বার জনকে। এই বার জন যে কে কে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ সময় ও সামন্তদিগের শক্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিত। অনেকেরই মতে (১) ভাওয়ালের ফজল গাজী (২) বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায় (৩) ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য (৪) চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ (৫) খিজিরপুরের ঈশা খাঁ (৬) যশোরের প্রতাপাদিত্য এবং (৭) ভূষণার মুকুন্দ রায় বারভূঞার অন্তর্গত ছিলেন। দেখা যাইতেছে ইঁহাদের সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। (অবশ্য যশোরকে পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে ধরিলে)। বাস্তবিক, নদী বেশী থাকায় পূর্ব্ববঙ্গই সেকালে বিদ্রোহীর প্রধান আড্ডা ছিল।

যশোর-খুলনার ইতিহাস-লেখক ৺সতীশচন্দ্র মিত্র নিম্নোক্তরূপে বার ভুঞার সংখ্যা পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

১। ঈশা খাঁ মসনদালি (খিজিরপুর বা কর্ত্তাভু) ২। প্রতাপাদিত্য (যশোর বা চ্যাণ্ডিক্যান্) ৩। চাঁদ রায়, কেদার রায় (শ্রীপুর বা বিক্রমপুর) ৪। কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় (বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ) ৫। লক্ষ্মণ মাণিক্য (ভুলুয়া) ৬। মুকুন্দরাম রায় (ভূষণা বা ফতেহাবাদ) ৭। ফজল গাজী, চাঁদ গাজী (ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপ) ৮। হামীর মল্ল বা বীর হাম্বীর (বিষ্ণুপুর ;

৯। কংসনারায়ণ (তাহিরপুর) ১০। রামকৃষ্ণ (সাতৈর বা সরগোল) ১১। পীতাম্বর ও নীলাম্বর (পুঁটিয়া) ১২। ঈশা খাঁ লেবহানী ও ওস্‌মান খাঁ (উড়িষ্যা ও হিজলী)।

জল ঢালিলে আগুন নিভিয়া যায় কেন ?

জল দু'টি জিনিষ দিয়া তৈরী—হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। ইংলণ্ডের মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিশ সাহেব এ তথ্য আবিষ্কার করেন। অক্সিজেন কিংবা হাইড্রোজেনকে আলাদা ভাবে আগুনের সংস্পর্শে আনিলে আগুন ভাল করিয়াই জ্বলিতে থাকে—অথচ ঐ দুই গ্যাসের সংমিশ্রণ—জল আগুনে দিলে ব্যাপার দাঁড়ায় ঠিক উল্টা। ইহার কারণ আর কিছুই না, জলে পরিবর্ত্তিত হইবার সময়েই অক্সিজেন-হাইড্রোজেন পরস্পর জ্বলিয়া মিলিত হয়—কাজেই পরে আর তাদের জ্বলিবার অবস্থা থাকে না।

বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিশ

কিন্তু তা না হয় হইল, জল আগুনে না হয় নাই জ্বলিল, কিন্তু অন্য কোনও জ্বলন্ত জিনিষে জল ঢালিলে সেটাও নিভিয়া যায় কেন? বৈজ্ঞানিকেরা এর দু'টি কারণ দেখান। প্রথম কারণ—বাতাসের সংস্পর্শে না আসিতে পারিলে কোন জিনিষ

জ্বলিতে পারে না। জ্বলন্ত জিনিষে জল ফেলিলে তার উপর জলের একটা আবরণ পড়ে, বাতাস তার ভিতর দিয়া ঢুকিতে পারে না—কাজেই আগুন জ্বলিতে পারে না। দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ হইতেছে এই—জলের তাপ ধারণ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী—এবং খুব তাড়াতাড়ি সে তাপ টানিয়া লইতে পারে। কোনও জ্বলন্ত জিনিষে জল ঢালা মাত্র জল তার ভিতর হইতে এত তাপ নিজের মধ্যে টানিয়া লয় যে সে জিনিষের উত্তাপ সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কমিয়া যায়; ফলে তার আগুন নিভিয়া যায়।

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

[জবাব প্রথমে নিজেরাই ঠিক কর, তার পর শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নাও]

১। ১৮১০ থেকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর কোন্ কোন্‌টা ঘটেছে—পাণিপথের চতুর্থ যুদ্ধ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সিপাহীবিদ্রোহ, ওয়াটার্লুর যুদ্ধ, ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লব, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রগঠন ?

২। নিম্নলিখিত বিবরণগুলির মধ্যে যদি কোন ভুল থাকে তবে তা সংশোধন কর—

(ক) বোলান—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত বিখ্যাত বন্দর; (খ) কোলার—রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কয়লার খনি; (গ) ইম্ফল—মহীশূরের অন্তর্গত পার্ব্বত্য নদী; (ঘ) উইলিংডন ব্রিজ—বেনারসে গঙ্গার উপরকার সেতু; (ঙ) উইণ্ডারমিয়ার—সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত শৈলাবাস; (চ) ডক্টর গোয়েব্‌ল্‌স্—আমেরিকার প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক (ছ) জেনারেল গোয়েরিং—এবিসিনিয়া-বিজয়ী ইটালিয়ান্ সেনাপতি।

৩। জাপান শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ অগ্রগামী, অথচ শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী একটি জিনিষ জাপানে পাওয়া যায় না। সে জিনিষটা কি ?

৪। এই ধাতুগুলির মধ্যে সব চেয়ে কোন্‌টা ভারী, সব চেয়ে

কোন্‌টা হাল্কা—লোহা, তামা, এলুমিনিয়াম্‌, দস্তা, পারা, নিকেল, ক্রোমিয়াম্‌, ম্যাঙ্গানিজ্‌?

৫। নীচের জিনিষগুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌টা কয়লা থেকে পাওয়া যায়?

আলকাৎরা, স্যাকারিন, চিনি, নুন, ফিনাইল, সোনা, রূপা, হীরা, এমোনিয়া, এসেন্স্‌, সাবান, পেন্সিলের শীষ্‌, গ্রামোফোনের রেকর্ড, সেলুলয়েড্‌, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন।

৬। টেলিফোনের আবিষ্কারক—গ্যালিলিও, মার্কণি, লর্ড কেলভিন, গ্রেহাম বেল্‌, মর্স্‌, ফ্যারাডে—এঁদের মধ্যে কে?

'আজগুবি-আসর'

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি, এস্‌-সি)

ভীষণ শীত পড়েছে সেবার, হাড়-কাঁপানো শীত যাকে বলে। বাইরে বা'র হয় কার সাধ্য! এ সময় ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে গায়ের উপর 'রাগ' বা লেপ টেনে নিয়ে জড়সড় হ'য়ে বসে খোস-গল্প জমাতে বেড়ে আমোদ লাগে। তেম্‌নি জমা জমে উঠেছিল সেদিন বিনয়দের বাড়ীতে। এমনিই বিনয়দের বাড়ীতে প্রচুর লোক, ওদের বাড়ীটাকে বাড়ী না বলে ছোটখাট একটা গ্রাম বল্লেও ভুল বলা হ'বে না; তার উপর আবার আজ ক'দিন বিনয়ের বড়মামা এসেছেন সপরিবারে। তাইতে তা'দের আড্ডাটা আজ আরও ভীষণ জমাট হয়েছে।

বিনয়ের ছোট কাকা পরেশ আজ আর তাস খেল্‌তে বন্ধুর বাড়ী যায় নি, ভীষণ শীত বলে। বিনয়ের বড়দাদা সুধীর একটু আগে বায়স্কোপ থেকে ফিরেছে 'ম্যাটিনী শো' দেখে। সকলে জড় হয়েছে দোতলার একটা ঘরে। বিনয় আর তার অন্য ভাইবোনেরা সব স্কুল-কলেজের পড়া বন্ধ করে এসে বসেছে। খাটের উপর প্রকাণ্ড লেপের ভিতর পা ঢুকিয়ে বসে আছে কয়েকজনা, কেউ বা চেয়ারে

বসে আছে একটা গরম আলোয়ান জড়িয়ে, কেউবা কো'চে আধশোয়া অবস্থায় অবস্থান কর্‌ছে, একটা রাগের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে। যে যেখানে আছে সে সেখানে জমে আছে শীতেও বটে, গল্পেও বটে।

নানা রকম গল্প হ'তে হ'তে ভূতের গল্প এসে পড়ল। অনেকে অনেক ভূতের গল্প বল্‌লে। শেষ কালে সুধীর ইংরাজী মাসিকে একটা চমৎকার ভূতের গল্প পড়েছিল সেইটা এমন জমিয়ে বল্‌লে যে গল্পের আসর একেবারে ভয়ে অবাক্‌ হয়ে গেল। পরেশ দেখলে সুধীরটা তো জোর জমিয়েছে। ও গল্পটা পরেশও পড়েছিল, সুধীরটা আগে বলে ফেলেই তাকে মেরে দিয়েছে। সে ইংরাজী যে সব ভূতের গল্পের বই পড়েছে, তার থেকে অনেকগুলো গল্প ভেবে দেখ্‌লে। সব গল্পগুলোর মধ্যেই ঘট্‌তে পারে এমন ঘটনার কথা লেখা আছে। অনেক ভাবল সে, হঠাৎ তার মনে পড়ল যে সেদিন তার ছোট মাসতুত বোনের কাছে একটা ছেলেদের ভূতের গল্পের বই পড়েছিল—"রাত্রে যা'রা দাঁত খিচোয়"—ঠিক হয়েছে, সেই গল্পটা বল্‌তে হ'বে। অত বড় বোগাস্‌, অসম্ভব গল্পের কাছে নিশ্চয় সুধীরের ও গল্পকেও হার মান্‌তে হ'বে। পরেশ খুব গম্ভীর হয়ে—"রাত্রে যা'রা দাঁত খিঁচোয়"—বইএর সমস্ত গল্পটা বল্‌লে। কিন্তু বেচারা পরেশ! কারুর মুখে একটু ভয়ের চিহ্নও প্রকাশ পেল না? সবাই হাস্‌ছে? এমন কি সুধীরের ছোট্ট বোন অমিতা—বয়স তার মোটে বার—সেও মুচকি হেসে বল্‌লে, "এত বাজে আজগুবি গল্পও বল্‌তে পার ছোটকাকা—!"

সুধীরের বড় মামা এদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়—তিনি একটা ইজি-চেয়ারে বসে এতক্ষণ এদের গল্প শুনছিলেন; তিনিও হাস্‌ছিলেন পরেশের গল্প শুনে। বল্‌লেন, "পরেশ, তোমার এ ভূতের গল্প যদি সত্যিকারের ভূতেরা শোনে তা হ'লে তোমার নামে তারা নিশ্চয়ই নালিশ কর্‌বে তুমি তাদের নামে যা তা বাজে অসম্ভব আজগুবি মিথ্যা গল্প বলে তাদের অপমান করেছ বলে। ভূত বলে নয়—তা'রা এখন মানুষ নয়—কিন্তু মানুষ ছিল তো একদিন! তা'দের মান-অপমান আছে বৈকি!"

সকলে হো হো করে হেসে উঠ্‌ল, পরেশ বেচারা লজ্জায় মরে গেল।

সুধীরের বড় মামা বল্‌লেন আবার, "আচ্ছা এ রকম গল্প কে কি জান যা এমনি আশ্চর্য্য যা পরেশের ভূতের গল্পকেও হার মানায়।"

সুধীর হেসে বল্‌লে, "আমি জানি।"

বড় মামা বল্‌লেন, "বেশ বল।"

সুধীর বল্‌লে, "আমার এক বন্ধুর পিসেমশায় ছিলেন ভীষণ অন্যমনস্ক। নস্যি নিতেন তিনি খুব। একদিন শুতে যাওয়ার আগে তিনি নস্যি নেবার জন্য সেল্‌ফের উপর থেকে নস্যির শিশিটা নামিয়ে আন্‌লেন। তার পর নস্যির শিশির ছিপিটা খুলে নস্যি নিয়ে শিশির মুখে ছিপিটা দিতে ভুলে গেলেন। ছিপির বদলে শিশির মুখে ভরে দিলেন নিজের বুড়ো আঙ্গুলটা। ফলে অত বড় শিশিটা তাঁর হাতের সঙ্গে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। তাঁর সে খেয়াল নেই, তিনি শুধু ছিপিটাকে সেল্‌ফে তুলে রেখে সেই শিশিশুদ্ধ আঙ্গুল নিয়েই শুয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালেও তাঁ'র খেয়াল হ'ত না, যদি না আর পাঁচজনে তাঁকে সে বিষয়ে খেয়াল করিয়ে দিত। সকালে তিনি নীচে নেমে যেতেই তাঁর ছোট নাতি হেসে উঠে বল্‌লে, "দাদুর নস্যির শিশি ঝুল্‌ছে দাদুর আঙ্গুলে।"

তিনি বল্‌লেন, "যাঃ, শিশি তো আমি কাল রাতে সেল্‌ফে তুলে রেখেছি!" সকলে তখন তাকে দেখিয়ে দিল যে শিশি তাঁর আঙ্গুলের সঙ্গেই ঝুলছে।

সুধীরের এ গল্প শুনে সকলে হো হো করে হেসে উঠল। তার বড় মামা বল্‌লেন, "খুব জোর আজগুবি বটে, তবে এটা ঠিক গল্প হ'ল না। আচ্ছা, আর কে কি জানে?"

সুধীরের জ্যাঠতুত ভাই সত্যেন বল্‌লে, "সেবার বিলেত থেকে ফির্‌বার সময় জাহাজে একটা গল্প শুনেছিলাম।" সকলে সত্যেনকে ধরে পড়ল, সত্যেন বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার লোক, তার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশী হ'বেই তো! সত্যেন তার গায়ের কম্বলটা আর একটু ভাল করে টেনে নিয়ে বেশ আমেজ করে বসে, বল্‌তে সুরু করলে—

সেবার বিলেত থেকে ফিরছি; জাহাজে হঠাৎ হ'ল একজন খালাসীর কলেরা। প্রায় দু'দিন তা'র জীবন নিয়ে টানাটানি করা গেল, কিন্তু কিছুই ফল

হ'ল না, তিন দিনের দিন বেচারা মারা গেল। সমুদ্রের মাঝে জাহাজের উপরে মারা গেলে তাকে তো আর গোর দেওয়া যায় না, বা পোড়ানও যায় না। তাই যাতে ভারে ডুবে যায় এমনি কোন একটা বেশ ভারী জিনিষের সঙ্গে মৃতদেহটাকে বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হয়। একেও তাই করা হ'ল।

যখন সেই খালাসীর মৃতদেহটাকে জলের মধ্যে ফেলা হ'ল তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে; আর দাঁড়িয়ে আমার পাশে জাহাজের ক্যাপ্টেন। আমি বল্‌লাম, 'বেচারা! জলের অতল তলে ওর সমাধি হ'ল।'

ক্যাপ্টেন বল্‌লে, 'অতল তলে আর ওকে থাক্‌তে হ'বে না, এক্ষুণি হাঙ্গরে, কুমীরে খেয়ে ফেল্‌বে।' তার পরেই সে হঠাৎ বল্‌লে, 'জানেন মিঃ রয়, সেবার একটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটেছিল?'

আমি অবাক্ হয়ে বল্‌লাম, 'না।'

ক্যাপ্টেন একটা 'সিগার' ধরিয়ে বল্‌ল, 'সেবার, বোধ হয় বছর দু'এক আগে, আমরা বিলেত যাচ্ছিলাম। সমুদ্রের মাঝে জাহাজে হঠাৎ বসন্ত দেখা দিল; অনেকের এক সঙ্গে হ'ল। প্রথম মারা গেল এক বুড়ো খালাসী। তার মৃতদেহও ঠিক এমনি করে একটা ছালার মধ্যে বন্ধ করা হ'ল। একটা পুরানো কুড়ুল আর ছুরী-কাঁচি ধার করবার পুরানো যন্ত্র ছিল, সেই দুটো তার সঙ্গে বেঁধে মৃতদেহটাকে জলে ফেলে দেওয়া গেল। ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণাকার হাঙ্গর মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকাণ্ড হাঁ করে সেই সব কিছু সমেত মৃতদেহটাকে গিলে ফেল্‌ল। তার পরেই আর এক মহা বিপদ্। খালাসীর ছিল একটা চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলে ঐ জাহাজেই। সে জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তার বাপের কাছ-ছাড়া হয় নি—বাবা বল্‌তে পাগল। যেই তার বাবার মৃতদেহটা জলে ফেলে দেওয়া, সেও হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই সঙ্গেই হাঙ্গরটাও টপ্ করে তৎক্ষণাৎ তাকে উদরস্থ করে ফেল্‌ল—যেন সে তারই অপেক্ষা কর্‌ছিল।

এ দৃশ্য দেখে সকলেই মহা দুঃখিত, কিন্তু কি আর করা যাবে! পরের দিন দেখা গেল হাঙ্গরটা আরও মৃতদেহের আশায় জাহাজের পিছু পিছু আসছে।

একজন খালাসী বল্‌লে, 'হাঙ্গরটাকে ধর্‌লে হয় না? জাহাজে হাঙ্গর ধরার বঁড়শীও রয়েছে।' তক্ষণি জাহাজের যে প্রকাণ্ড কাছি থাকে তাতেই সেই ভীষণাকার বঁড়শীটা বেঁধে তাতে খানিকটা মাংসের তাল বিঁধে জলের মধ্যে ছুড়ে দেওয়া হ'লো; সঙ্গে সঙ্গে অম্‌নি হাঙ্গরটা সেটাকে গিলে ফেল্‌ল। তার পর খানিকক্ষণ টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তি চল্‌ল, এবং সেটা কাছাকাছি আস্‌তেই গুলি করা হ'ল। তার পর হাঙ্গরটাকে অনেক কষ্টে টেনে তোলা গেল। সেটা তখন একেবারে মরে গেছে। সেটাকে কাটা হ'বে, এমন সময় একজন খালাসী বল্‌লে যে হাঙ্গরটার পেটের মধ্যে যেন একটা কিসের 'ঘিস্ ঘিস্' শব্দ হ'চ্ছে। প্রথমে সকলে হেসে উঠ্‌ল। হাঙ্গরটা একেবারে মরে পাথর হ'য়ে গেছে; মরা হাঙ্গরে কি নিঃশ্বাস নেয় নাকি! কিন্তু সে খালাসীটা দমবার পাত্র নয়। সে জোর গলায় বল্‌লে 'নিশ্চয়ই শব্দ হচ্ছে।' তখন সকলে হাঙ্গরটার গায়ে কান পেতে শুনলে—সত্যিই তো কিসের একটা 'ঘিস্ ঘিস্' শব্দ হচ্ছে। বিস্ময়ে সকলেই অবাক্। তখন মইএর সাহায্যে উঠে খুব সাবধানে কুড়ুল দিয়ে হাঙ্গরটাকে কেটে কেটে তু-আধখান করা গেল। তু-আধখান করতেই এক তাজ্জব ব্যাপার! হাঙ্গরের পেটের সেই প্রকাণ্ড খোলের মধ্যে সেই খালাসী বাপ আর তার ছেলে স্রেফ বেঁচে রয়েছে। শুধু বেঁচে রয়েছে নয়, বুড়োটা কুড়ুলটা ধরে সেই ছুরী-কাঁচি সান দেওয়ার যন্ত্রটায় ধার দিচ্ছে, ছোকরা তার পাশে দাঁড়িয়ে তাই একদৃষ্টে দেখ্‌ছে।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় ছেলেটা বল্‌লে, হাঙ্গরটা তাদের আস্ত গিলে ফেলেছিল—তাই তাদের কিছু হয় নি। বাবাও তার আসলে মরে নি, শুধু বসন্তের প্রকোপে বেহুঁস হয়ে ছিল—তাকে মরা বলে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। হাঙ্গরের পেটের মধ্যে আসার খানিক পরেই তার বাপের জ্ঞান ফিরে আসে আর ছালাটার মধ্যে ছট্‌ফট্ কর্‌তে থাকে। তার পকেটে একটা ছুরি ছিল, সে তখন সেইটে দিয়ে ছালা কেটে তার বাবাকে বার করে। তার পর তা'রা হাঙ্গরের পেটের মধ্যে থেকে বার হ'বার জন্য ঐ কুড়ুলটা দিয়ে পেটটা কেটে পথ তৈরী কর্‌বার চেষ্টা দেখ্‌ল। কিন্তু যা ভোঁতা কুড়ুল, কিচ্ছু কাটা গেল না। তাই তার বাবা কুড়ুলটায় সান দিচ্ছিল।"

ক্যাপ্টেন একটু থেমে বল্‌লে, 'মিঃ রয়, আপনি ভাবছেন হয় তো তাদের বাতাস-অভাবে কোনও কষ্ট হয়েছিল কিনা। তা কষ্ট হয়েছিল বৈকি। এ তো আর একটা আজগুবি গল্প নয় যে, বল্‌ব বাতাস-অভাবে হাঙ্গরের পেটের মধ্যে তাদের কোনও কষ্ট হয়নি। যখন হাঙ্গরের পেট কেটে তা'দের দেখা গেল তখন তারা গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।'

এত দূর বলে সত্যেন চুপ কর্‌ল। চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে এক সঙ্গে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল। বিনয়ের দিদি রমলা তো হেসেই অস্থির, বল্লে, 'সত্যিই তো আজগুবি গল্প তো নয়, হাওয়া-অভাবে কষ্ট হ'বে না? উঃ সতুদা, তুমি বড়দাকে একেবারে ফ্ল্যাট করে দিলে। কি বড়দা, আর নস্যির গল্প বল্‌বে? সতুদা যে তোমাকেই নস্যি করে দিলে।' সুধীর বেচারী একটু দমে গেল মনে হ'ল, তা হ'লেও সে হাস্‌তে লাগল খুব।

বিনয়দের বড়মামাও খুব হাস্‌ছিলেন, হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "আর কে কি জান বল।"

আরও তু' চারজন হয়ত তু একটা গল্প বল্‌তে পার্‌ত, কিন্তু এ গল্পের পর আর কেউ সাহস পেল না। উঃ বলিহারি, হাঙ্গরে মানুষ খেয়ে ফেল্‌ল, আর সে গিয়ে পেটের মধ্যে বেঁচে উঠে কুড়ুল সান দিতে লেগে গেল পেট কেটে বার হ'বে বলে?

হাসির হিড়িকটা একটু কমে আস্‌তে বিনয় বল্‌লে, "মেজদা তুমি সেই ছাগলের গল্পটা বল না!"

বিনয়ের মেজদা শিবু লোকটী দেখ্‌তে বড় ভাল মানুষ, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে হাসির রসে ভরা। তাঁকে সবাই ধরে বসল ছাগলের গল্প বল্‌তে।

শিবু একটু যেন লজ্জিত ভাবেই বল্‌লে, "এ গল্পের পর কি আর আমার ছাগল-ভেড়ার গল্প জম্‌বে? সতুদা যে রকম 'হাঙ্গেরিয়ান ষ্টোরী' অর্থাৎ হাঙ্গরের গল্প ছেড়েছেন তার পর ছাগলের গল্প—না, না।"

কিন্তু কেউ ছাড়লে না, অনেক পীড়াপীড়ির পর শিবরাম বল্‌লে, "তবে শুনুন অতি সাধারণ ছাগলের গল্প—সমুদ্রে নয়, পাহাড়ে নয়, মরুভূমিতে নয়, এই কলকাতা

সহরেরই এক প্রান্তে। তবে এ ঘটনাটা আমিও নিজে দেখি নি, বড়দা আর সতুদার মত পরের মুখেই শোনা।” বলে শিবরাম সুরু করলে—“আমাদের সঙ্গে কলেজে একটী ছেলে পড়ত,—নাম সমর। তাদের পয়সা ছিল অগাধ—প্রকাণ্ড বাড়ী; প্রচুর, চাকর ঠাকুর, দরোয়ান কত কি! ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, গরু এমন কি প্রকাণ্ড একটা ছাগলও ছিল। সমরের বাবা সেই ছাগলের দুধ খেতেন, ছাগলটা ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। ছাগলকে কেউ কিছু বলবার জো ছিল না। সে যেখানে ইচ্ছা যেত, যা ইচ্ছা করত, তাকে কোনও বাধা দেবার সাধ্য বাড়ীতে কারো ছিল না।

তখন শীতকাল। একদিন তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে—সমরের ছোট ভাই ছুটতে ছুটতে তার বাবার কাছে এসে বল্ল, “বাবা, তোমার ছাগল—মঙ্গলীটা মরে পড়ে আছে বাইরে উঠানে।”

সমরের বাবা এ কথা শুনে পাগলের মত ছুটলেন বার-বাড়ীতে। গিয়ে দেখ্লেন সত্যিই তাঁর অত আদরের ছাগল মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে—চার পা ছড়িয়ে।

প্রথমটা তিনি ভয়ানক দুঃখ করলেন, চোখ দিয়ে তাঁর জল বার হয়ে এল। তার পর বল্লেন, “কি করে হঠাৎ মারা গেল, কি হ’ল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, মারাই যখন গেছে তখন কি আর করা যাবে! ওর ছালটা ছাড়িয়ে রাখ; আমি ছালটা আমার ঘরে রেখে দেব ওর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ। আর ওর দেহটা কাল পুঁতে ফেল ঐ আম গাছটার তলায় যেখানে ও শুতে খুব ভাল বাসত।”

তাঁর কথা মতই কাজ হ’ল; ছাগলটার গা থেকে সমস্ত ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সেটা সমরের বাবার ঘরে রেখে দেওয়া হ’ল, আর রাত্রের মত সেই ছাল-ছাড়ান মরা ছাগলটা সেই আম গাছ তলাতেই পড়ে রৈল!

রাত তখন বারটা—বাড়ীতে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল সমরের বাবার চোখে ঘুম নেই। তাঁর অত আদরের ছাগলটী আজ ওরকম হঠাৎ মারা যাওয়ায় তাঁর বুকটা ব্যথায় ভরে উঠ্ছিল।

হঠাৎ তাঁর মনে হ’ল যেন তাঁর ছাগলটা ডাক্ছে। ভাবলেন, মনের ভুল। কিন্তু খানিক পরেই আবার তার ডাক কানে এল—হ্যাঁ, একবার, দু’বার, তিনবার —ঐ তো সমানেই ডাক্ছে।

বাড়ীর সকলকে তিনি ডেকে জাগালেন, তার পর সকলে ছুটলেন শীতে কাঁপতে কাঁপতে সেই আমগাছের দিকে।

কাছে গিয়ে যা দেখা গেল তাতে সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে—হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সমরের পিসীমা তো ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন আর ঘন ঘন রাম নাম জপ্তে লাগ্লেন। দেখা গেল সেই ছাল-ছাড়ান ছাগলটা উঠে দাঁড়িয়েছে—শীতে থর থর করে কাঁপ্ছে —আর প্রাণপণে চীৎকার করছে। সমরের বাবা কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন—সত্যিই ছাগলটা বেঁচে উঠেছে। তখন তিনি আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি! বল্লেন, “যা, শীগ্গির আমার ঘর থেকে ওর ছাড়ান ছালটা নিয়ে আয়—এনে ওর গায়ে আবার সেলাই করে দে—দে শীঘ্রি, দেখছিস্ না শীতে কি রকম কাঁপ্ছে?”

সেলাই ক’রে লাগিয়ে দিল্ল।

তখন সেই ছাড়ান ছাল নিয়ে এসে দু-তিন জনে মিলে ছাগলের গায়ে সেলাই

করে লাগিয়ে দিল। আবার যে ছাগল সেই ছাগল হয়ে গেল। সমরের বাবা পাগলের মত তাঁর ছাগলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার গালে গাল রেখে কেবল বলতে লাগলেন, "ওরে মঙ্গলি, মঙ্গলি আমার রে! তোর কি হইছিল বল, ওরে বল্ না তোর কি হইছিল, বল্—বল্……"

তখন সমরদের দরোয়ানটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বললে—"ও বলতে পারবে না মহারাজ, যদি অভয় দেন তা হ'লে আমিই বলতে পারি"। সমরের বাবার মন তখন আনন্দে ভরপূর—বললেন, "বল্ বল্, তুই-ই বল্, কিচ্ছু বলব না।"

দরোয়ান তখন বললে, "হুজুর, আজ সন্ধ্যাবেলা আমি আমার কয়েক জন দোস্তের জন্য অনেকখানি ভাং তৈয়ারী করে রেখে দিয়েছিলাম। আপনার ছাগল কখন ঘরে ঢুকে সমস্ত ভাং খেয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি ছাগলটা মরে গেছে। ভয়ে আর হুজুরকে কিছু বলতে পারি নি; ভাবলাম ছাগলটা আমার তৈয়ারী ভাং খেয়ে মরে গেছে শুনলে হুজুর হয়তো আমাকে জুতো মারতে মারতে তাড়িয়ে দেবেন। এখন দেখছি ও মরে নি, শুধু বেহুঁস হয়ে পড়েছিল।"

সমরের পিসীমা রেগে উঠে বললেন, "বেটা, চালাকি পেয়েছিস? ভাং খেয়ে এমনি বেহুঁস হ'ল যে ছাল ছাড়ান হ'ল তাও জানতে পারলে না?"

দরোয়ান হাত যোড় করে বললে, "মাইজি! ভাং খেলে ও রকম হয়। আপনারা বিশ্বাস করেন না, ভাং খেলে আমিও ঐ রকম বেহুঁস হয়ে পড়ি, যতই ডাকেন আপনারা, আমি কিছু জানতে পারি না। হুজুর তো সেদিন আমাকে জুতোই মেরে দিলেন…"

সমরের বাবা তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "না না, আর মারব না, তুই যত ইচ্ছা ভাং খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকিস—আর তোকে কিচ্ছু বলব না।" বলে তিনি ছাগলটাকে জড়িয়ে ধরে সমানে আদর করতে লাগলেন আর ছাগলটাও আনন্দে আর আরামে তাঁর গায়ে গাল ঘষতে লাগল।

এই পর্য্যন্ত বলে শিবু চুপ করলে।

এবার আর শুধু হেসে ঘর ফাটান নয়—হাসতে হাসতে সকলে গড়িয়ে পড়ল।

এমন কি বড় মামা পর্য্যন্ত ককিয়ে হাসতে লাগলেন। রমলা হাসতে হাসতে বললে, "উঃ সতুদা, তুমি বড়দাকে 'ফ্ল্যাট' করেছিলে, শিবুদা তোমাকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছে। ওরে বাবা, বেটা ছাগল ভাং খেয়ে এইসা বেহুঁস যে ছাল ছাড়িয়ে নিল তবু জানতে পারল না, আবার শুধু জানতে পারল না নয়—বেঁচে রইল এবং নেশা কেটে যাওয়ার পর—ওরে বাবারে—" বলতে বলতে সে আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

সুধীরের মাও এতক্ষণ গল্প শুনছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওদিকে ক'টা বেজেছে তা দেখেছ?—সাড়ে দশটা। কর্ত্তা ফিরবার সময় হয়েছে। তিনি যদি এসে দেখেন এখনও কারও খাওয়া হয় নি তা হ'লে সকলের পিঠের ছাল ছাড়িয়ে দেবেন। তোমরা তো ভাং খাও নি যে ছাল ছাড়ানোর পরেও বেঁচে উঠবে—সব মারা যাবে। এই বেলা কর্ত্তা আসবার আগে সব খেয়ে নেবে চল।" বলতে বলতে তিনি বার হয়ে গেলেন। বাকী সকলেও হাসতে হাসতে তাঁর পিছন পিছন নীচে নেমে গেল।

কবির গান

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

কবির গান বলিতে আমি যে কবিদের কথা বলিতেছি তাঁরা কিন্তু আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথ নন; দ্বিজেন্দ্রলাল, মাইকেল, কুমুদ মল্লিক প্রভৃতি যে সব কবির কবিতা বা গান তোমরা রাত-দিন মুখস্থ কর তাঁরাও নন, এঁরা অন্য ধরণের কবি। বাংলা দেশে এক সময়ে—বিশেষতঃ ইংরাজ-আমলের প্রথম দিকে এঁদের খুব কদর ছিল; এঁদের না হইলে বিদ্বৎসমাজের আসর ভাল করিয়া জমিতই না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু দিন হইল এই কবি-সমাজ এবং তাঁদের সুন্দর কবি-গানগুলি বাংলা দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

কবি-গানকে 'সুন্দর' বলিলাম কিন্তু কবির গানের পরিচয় এখন পর্য্যন্ত দিই

নাই। ব্যাপারটিকে এক কথায় "কবিতার বা গানের লড়াই" বলা চলে। কবির গানে হু'টি দল থাকে। এই তুই দলে কবিতা-যুদ্ধ হয়। এক দল উঠিয়া প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিয়া লইয়া অপর পক্ষকে নানা রকম অদ্ভুত প্রশ্ন করে। (বিষয়গুলি অবশ্য বেশীর ভাগই পৌরাণিক ব্যাপার লইয়া) প্রশ্ন করিবার সময়ে প্রতিপক্ষকে নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং অনেক সময় গালাগালিও (অবশ্য সরস ভাবে) করা হয়। বলা বাহুল্য এ সমস্তই কবিতায় করিতে হয়। সে দল বসিলে অপর দল উঠিয়া প্রাথমিক মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি সারিয়া প্রতিপক্ষের প্রশ্নের জবাব দেয়, তার পর তারাও আবার পাল্টা প্রশ্ন আরম্ভ করে। প্রথম দলকে আবার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এই ভাবে বরাবর চলিতে থাকে। গান শেষ হইলে উপস্থিত বিচারকেরা বলিয়া দেন কোন্ পক্ষ জয়ী হইল। ব্যাপারটির মজা হইতেছে এই যে সমস্ত কবিতা-গানই আসরে দাঁড়াইয়া মুখে মুখে রচনা করিতে হয়—অদ্ভুত প্রশ্ন এবং প্রতিপক্ষের প্রশ্নের মানানসই জবাব তখন তখনই ভাবিয়া এবং কবিতায় ঢালিয়া বলিতে হয়। কাজেই ব্যাপারটিতে কি রকম উপস্থিত-বুদ্ধি এবং কবিত্বশক্তির দরকার হয় তা তো বুঝিতেই পার। দলের যে কর্ত্তা বা মালিক তাঁকে বলা হয় কবিওয়ালা, আর দলের যে সব কবিরা গান রচনা করেন তাঁদের বলে বাঁধনদার। এক-এক কবির দলে কয়েক জন করিয়া বাঁধনদার থাকে।

এই কবির গান আমাদের বাংলা দেশের একটা নিজস্ব সম্পদ্ ছিল। ১০০।১৫০ বছর আগেকার কথা বলিতেছি—তখন কোন মজলিসি সভায় বা উৎসব-আসরে কবির গান না থাকিলে একটা যেন বড় রকম অঙ্গহানি হইত। বড় বড় লোকদের—রাজা-মহারাজার বাড়ীতে ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে কবির গান হইত। দেশে অনেক নাম-করা কবির দল থাকিত। কোনটা সখের দল, কোনটা বা পেশাদারী। পেশাদারী দলগুলি বড় বড় আসরে কবির লড়াই করিয়া প্রচুর টাকা উপায় করিত—এই ভাবে অনেকের অন্নসংস্থানও হইত। বহু শিক্ষিত লোকও কবির দলে যোগ দিতেন। তেমন তেমন কবিওয়ালাদের সমাজে কদরও ছিল প্রচুর। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে—কৃষ্টির ইতিহাসে—সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবিওয়ালাদের স্থান নেহাৎ সামান্য নয়।

বড় বড় কবিওয়ালা সেকালে অনেক ছিলেন। এঁদের সকলকার পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, তু'-চার জনের সম্বন্ধে তু'-চার কথা তোমাদের বলিতেছি।

কবিওয়ালাদের মধ্যে রঘুই বোধ হয় সব চেয়ে পুরানো। সেকালকার লোকেরা অনেকে এঁকে "দাঁড়া-কবি" বলিতেন। দাঁড়া-কবির গান অনেকটা কবির গান জাতীয়ই। রঘুর পরে বা প্রায় একই সময়ে রাসু নৃসিংহ নামে একজন বড় কবি ছিলেন। এঁদের গানের সুর এবং ভাব তুই-ই বেশ সুন্দর হইত। এর পরেই নাম করিতে হয় হরু ঠাকুরের। প্রায় শ' তুই বছর আগে এঁর জন্ম হয়। ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর কবিওয়ালা ছিলেন—বর্দ্ধমান, নদীয়া, কলিকাতা প্রভৃতি জায়গায় এঁর প্রচুর নাম-ডাক ছিল, উপস্থিত-বুদ্ধি এবং কবিত্বশক্তিও ছিল অসাধারণ। এঁর সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। রাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর হরু ঠাকুরকে ভারী পছন্দ করিতেন। রাজার অন্যান্য সভাপণ্ডিতেরা ইহাতে একটু তুঃখিত হন। নবকৃষ্ণ ব্যাপারটা আঁচ করিয়া লইয়া হরু ঠাকুর যে কত বড় গুণী লোক তা বুঝাইবার জন্য একদিন সভাপণ্ডিতদের ডাকিয়া বলিলেন, "কাল পূর্ণিমার রাত্রে আমার মনে একটা সুন্দর ভাব এসেছিল, আপনারা সেটা নিয়ে একটা কবিতা তৈরী করে দিলে বড় আনন্দ পাব। ভাবটা এই—"বড়িশে বিঁধিছে চাঁদ"। সভাপণ্ডিতেরা বড় বিপদে পড়িলেন, অনেক ভাবিয়াও ব্যাপারটাকে কেউই বিশেষ সুবিধায় আনিতে পারিলেন না। তখন নবকৃষ্ণ হরু ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হরু ঠাকুর স্নানের জন্য তেল মাখিতেছিলেন, সেই অবস্থায়ই আসিয়া হাজির। রাজার সমস্যা শুনিয়া তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিষয়টি লইয়া এমন চমৎকার এক কবিতা রচনা করিয়া দিলেন যে সভাশুদ্ধ লোক অবাক্। যাঁরা হরুকে হিংসা করিতেন তাঁরাই লজ্জিত হইয়া তাঁকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

হরু ঠাকুরের পরে নীলু পাটনী, নিত্যানন্দ দাস, ভবানী বেণে, রামপ্রসাদ, ঠাকুর সিংহ, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এণ্টনী প্রভৃতি কবিদের নাম করা দরকার। এঁরা সকলেই যে নিজেরা কবিতা বাঁধিতেন তা নয়, অনেকে মাহিনা-করা বাঁধনদার দিয়া কাজ চালাইতেন; কেউ বা বাঁধনদার রাখিতেন, কিন্তু দরকার বোধ করিলে নিজেরাও লড়াইয়ে যোগ দিতেন। এঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ, রাম বসু, ভোলা

ময়রা, এণ্টনী প্রভৃতির কবিত্বশক্তি ছিল প্রচুর। নীলু পাটনীর দলে একজন ফিরিঙ্গী বাঁধনদার ছিল; তার আসল নাম কি বলিতে পারি না—সবাই তাকে বলিত "কুকুর-মুখো গোরা"। কিন্তু কুকুর-মুখো হইলে কি হইবে, এই গোরা হিন্দু পৌরাণিক বিষয় লইয়া এমন চমৎকার চমৎকার গান বাঁধিত, প্রশ্ন করিত এবং জবাব দিত যে লোকে অবাক্ হইয়া যাইত।

কিন্তু কুকুর-মুখো গোরা শুধু বাঁধনদার ছিল, এণ্টনী ছিলেন স্বয়ং কবিওয়ালা।

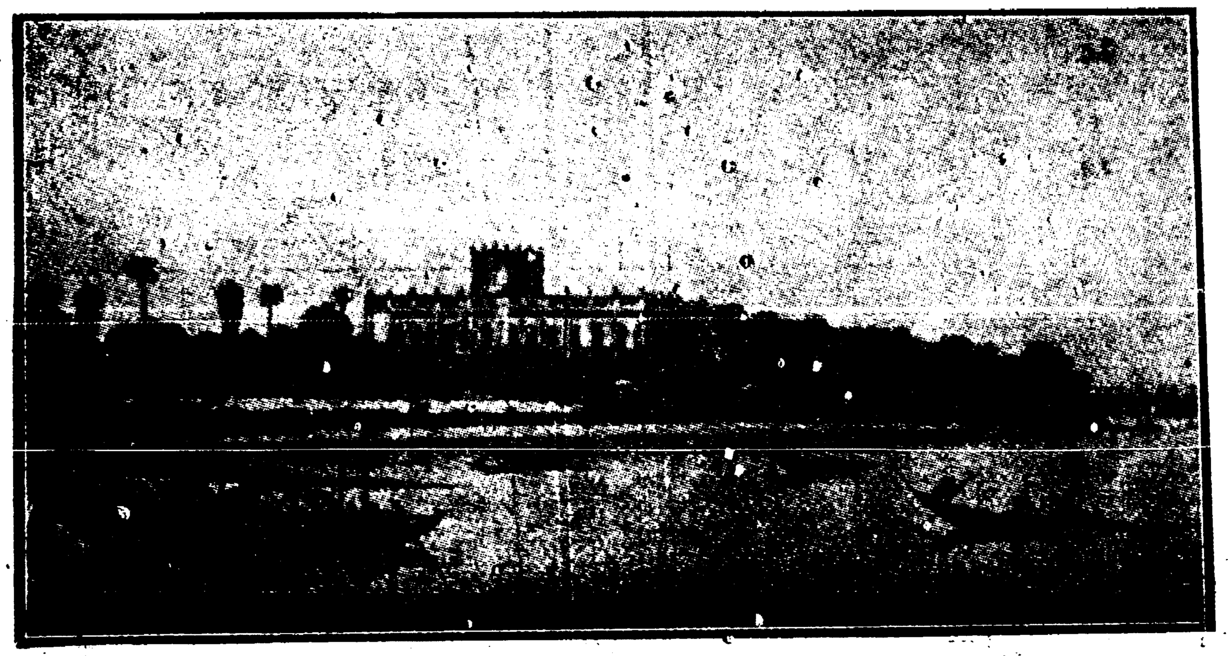

গরুটির বাগান-বাড়ী—এখানে এক সময়ে এণ্টনী সাহেব থাকিতেন।

এণ্টনী নাম শুনিয়াই বোধ হয় বুঝিতেছ ইনি বাঙ্গালী নন, ইনি একজন পর্ত্তুগীজ সাহেব। কিন্তু সাহেব হইলেও ইনি থাকিতেন বাঙ্গালীর মত, বাংলা ভাষায় এঁর অদ্ভুত রকম দখল ছিল। কবির গান শুনিয়া শুনিয়া সাহেবের এত ভাল লাগিয়া যায় যে তিনি নিজেই একটা সখের কবির দল খোলেন। এ ব্যাপারে সাহেব এত উন্মত্ত হইয়া অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন যে দেখিতে দেখিতে তাঁর টাকাকড়ি ফুরাইয়া গেল; তখন তিনি সখের দল ছাড়িয়া পেশাদারী কবিওয়ালা হইয়া পড়িলেন। এই এণ্টনী সাহেবের কবি-গান লইয়া অনেক মজার মজার ঘটনা আছে। দু'-একটা বলিতেছি। গোরক্ষনাথ নামে এণ্টনী সাহেবের একজন বাঁধনদার ছিল। একবার তেলিনীপাড়ার বাঁড়ুয্যে-বাড়ীতে এণ্টনী সাহেবের দলের সঙ্গে ভোলা ময়রার দলের কবির লড়াই হইবে ঠিক হইল। (ভোলা ময়রার কথা আগেই বলিয়াছি, ইনি শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালাদের মধ্যে একজন।) আসরে দুই দল হাজির, এমন সময়ে গোলমাল বাধাইল গোরক্ষনাথ। এণ্টনী তাকে আগমনীর

গান বাঁধিয়া পালা আরম্ভ করিতে বলিলেন, কিন্তু সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "আমার তিন মাসের মাইনে বাকী, এখনই না মিটিয়ে দিলে আমি গান বাঁধ্‌ব না"। এণ্টনী অনেক করিয়া বুঝাইলেন, পর দিন টাকা পাইলে মাহিনা চুকাইয়া দিবেন বলিলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ অটল। এণ্টনী তখন বলিলেন, "যা হয় হবে, আমি নিজেই গান বাঁধ্‌ব।" এই বলিয়া তিনি নিজেই গান আরম্ভ করিলেন। তাঁর কবিত্বশক্তি ছিল সুন্দর। এই তাঁর প্রথম গান—তাও বিজাতীয় বাংলা ভাষায়—কিন্তু গান অতি চমৎকার হইল। সকলেই প্রশংসা করিল। সেই হইতে এণ্টনী নিজেই কবির গান বাঁধিতে সুরু করিলেন।

এণ্টনীর কবিতার কয়েকটা নমুনা দিতেছি। একবার ঠাকুর সিংহের দলের সঙ্গে এণ্টনীর কবির লড়াই হইতেছে। ঠাকুর সিংহের দলের বাঁধনদার ছিলেন তখন বিখ্যাত কবি রাম বসু। রাম বসু এণ্টনীকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—

"বল হে এণ্টনী, আমি একটা কথা শুনতে চাই,
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই?"

আগেই বলিয়াছি এণ্টনী বাঙ্গালীর মত থাকিতেন, বাঙ্গালীর মত পোষাক পরিতেন। এমন কি বাঙ্গালীর দেবদেবীও মানিতেন। এণ্টনী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—

"এই বাংলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি,
হয়ে ঠাকরো সিঙ্গীর বাপের জামাই কুর্ত্তি-টুপী ছেড়েছি।"

অর্থাৎ কায়দা করিয়া এণ্টনী প্রতিপক্ষের কর্ত্তা ঠাকুর সিংহকে সুমিষ্ট শ্যালক সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। আর একবার আর এক লড়াইএ রাম বসু (তিনি তখন নিজেই একটা কবির দল খুলিয়াছেন) এণ্টনীকে বলিলেন—

"সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি,
ও তোর পাদরী সাহেব জানতে পারলে গালে দেবে চূণকালী।"

এণ্টনী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভেদ নাই রে ভাই,
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এ-ও কথা শুনি নাই।

আমার প্রভু যে হিঁছুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে ;
আমার মানব-জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই।"

এণ্টনী সাহেবের এই সুন্দর এবং সুবিখ্যাত কবিতাটি হয়তো তোমরা অনেকেই জান।

কিন্তু এণ্টনীর সহিত সব চেয়ে ভাল জমিত ভোলা ময়রার। এই দুই জনে যখন দুই দলে থাকিয়া লড়াই করিতেন তখন নাকি সে একটা দেখিবার জিনিষ হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুদ্ধ ভোলা এবং এণ্টনীর কবি-গানের কথা শুনিলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন। একবার ভোলা ময়রার সহিত লড়াইএ এণ্টনী দুর্গাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"অপাঙ্গে করুণা কর ওগো মাতঃ মাতঙ্গি,
ভজন-সাধন জানি না মা, জেতে আমি ফিরিঙ্গী।"

ভোলা ময়রা তৎক্ষণাৎ দুর্গা সাজিয়া জবাব দিলেন—

"তুই জাত-ফিরিঙ্গী, জবরজঙ্গী (আমি) পারব নাকো তরাতে ;
পারব নাকো তরাতে।
শোন্ রে ভ্রষ্ট, বলি স্পষ্ট,
তুই রে নষ্ট মহা দুষ্ট,
ভজ্‌গে যা তুই যীশুখৃষ্ট শ্রীরামপুরের গীর্জ্জাতে"।

ভোলা ময়রা এবং এণ্টনী যদিও বন্ধু ছিলেন কিন্তু লড়াইএর সময় পরস্পরকে কষিয়া গালাগালি দিতেন ; ভোলার গালাগালিগুলিই একটু বেশী ঝাঁঝাল হইত। কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি। এণ্টনী একটু আহার-প্রিয় ছিলেন ; তাই লইয়া এক দুর্গোৎসবের আসরে ভোলা একবার তাঁকে শুনাইয়া দিলেন—

"পেদ্‌রু ফিরিঙ্গী বেটা, পেরু কাটা, বেটা কি সাহেব ফলিয়েছে !
(বেটা) ছিল ভালো সাহেব হ'ল বাঙ্গালী,
(এখন) কবির দলে এসে মিলে (বেটা) পেটের কাঙ্গালী।
এ বেটা ভেড়ের ভেড়ে নিমক ছেড়ে কবির ব্যবসা ধরেছে।

কেউ বা করছেন ব্যারিষ্টারী, কেউ বা ম্যাজিষ্টারী,
এলেমের জোরে বা কেউ করছে জজগিরি,
আর এ বেটা পুজোর বাড়ী ভুজোর লোভে নাচতে এসেছে।"

(এণ্টনীর পূর্ব্বপুরুষ লবণের ব্যবসা করিতেন, তাই ভোলা বলিলেন এণ্টনী নিমক-ছেড়ে—অর্থাৎ লবণের ব্যবসা ছাড়িয়া আসিয়াছেন।)

আর এক জায়গায়—

"এণ্টনী ফিরিঙ্গী-বাচ্ছা,
না আছে তার কাচ্চাবাচ্চা,
বেটা বড় নচ্ছারের শেষ…"

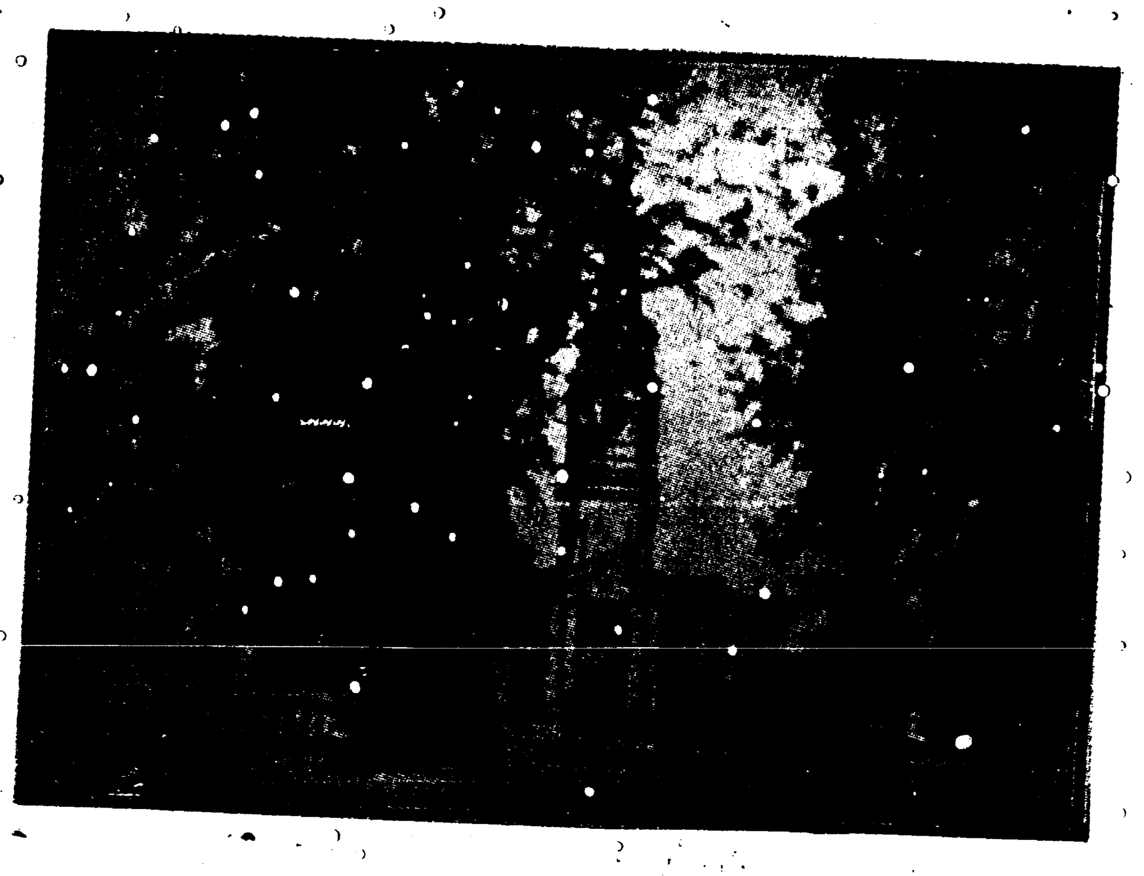
শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গীর্জ্জা

এণ্টনী সাহেব ও ভোলাকে ময়রা বলিয়া গাল দিতেন। ভোলা একবার তার জবাব দিয়াছিলেন—

"আমি ময়রা-ভোলা, ভিঁয়াই খোলা—ময়রাই বারো মাস,
জাতি পাতি নাহি মানি ওগো, মোর কৃষ্ণপদে আশ।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক্ হইতেই বাংলা দেশে কবির গানের আদর আস্তে আস্তে কমিতে থাকে। যদিও ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি বড় বড় কবিরাও সখের কবিতার লড়াই করিতেন কিন্তু ঠিক সেকালকার মত কবির আদর আর রহিল না। ইহার একটা প্রধান কারণ বোধ হয় কবির গানে অশ্লীলতার আমদানী। কবিওয়ালারা প্রায়ই লড়াইয়ের সময়ে কাণ্ডাকাণ্ডি ভুলিয়া অশ্লীল ভাষা আরম্ভ করিয়া দিতেন। কবিত্বশক্তি অবশ্য তার মধ্যেও যথেষ্ট থাকিত কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রুচি বদ্‌লাইবারই কথা। দেশের সামাজিক অবস্থা, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব প্রভৃতিও হয়তো কবি-গানের অবনতির কতকটা কারণ। কবির গান বলিয়া

এখনও একটা জিনিষ আছে, কিন্তু তাকে থাকা বলা চলে না। বর্ত্তমানে কবির গান যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তার প্রতি লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা হইবার কথা নয়। শিক্ষিত লোকেরা এর মধ্যে আর ঘেঁষেন না—যে সব লোক এখনও পেশাদারী কবির দল লইয়া ঘোরে তাহারা প্রায়ই নীচু দরের লোক। ভবানীপুরে আমাদের পাড়ায় প্রতি বছর বারোয়ারী কালীপূজা উপলক্ষ্যে কবি-গান হয়, দু' দলে লড়াইও হয়। যারা লড়াইএ জেতে তারা একটা রূপার মেডেল পায়, পরাজিত দল পায় এক কাঁদি সুপুষ্ট কাঁচকলা। কলা এবং মেডেল আসরে ঝুলাইয়া রাখা হয়। গত বছর দুই দলের কবি-গান এতই উঁচুদরের হইয়াছিল যে বিচারকগণ মেডেল রাখিয়া কাঁচকলার কাঁদিটিই দুই দলের লোককে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তার পর এ বছর আর কবি-গান হয়ই নাই।

কিন্তু আমাদের মনে হয় এই সুন্দর, বাংলার দেশের একান্ত নিজস্ব, উপভোগ্য জিনিষটি যাহাতে দেশ হইতে লোপ না পায়—জিনিষটির পুনরুদ্ধার হয়, চর্চ্চা হয়, প্রত্যেক শিক্ষিত এবং রসজ্ঞ বাঙ্গালীর সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কবির গানের অশ্লীলতাটুকু বাদ দিতে পারিলে তার মত উপভোগ্য এবং আমোদ-জনক জিনিষ কমই পাওয়া যাইবে। উৎসবের দিনে, মজলিসি-আসরে কবির গানের আদর হইবেই। শুনিয়াছি বহু দিন আগে ঠাকুর-বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সখের কবির লড়াই করিতেন। বিখ্যাত নাট্যকার অমৃতলাল বসু প্রভৃতিও এই রকম লড়াইয়ে যোগ দিতেন। কথাটা কত দূর সত্য আমার জানা নাই—কিন্তু এই ধরণের সাহিত্যিকেরা যদি সত্যই এই পুরানো প্রথাটির চর্চ্চা করিতে সাহায্য করিতেন তবে সেটা খুবই আশার কথা হইত সন্দেহ নাই।

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যেও অনেকেই তো বেশ সুন্দর কবিতা লেখ, তোমরাও ইচ্ছা করিলে নিজেদের মধ্যে এ রকম ছোটখাট কবির লড়াই করিতে পার। ছুটীর দিনে নিজেদের মধ্যে আসর জমাইয়া এই রকম কবির লড়াই সহজেই করা যাইতে পারে। দেখিও, তার ভিতর দিয়া শুধু যে তোমাদের উপস্থিতবুদ্ধি আর কবিত্বশক্তিরই চর্চ্চা হইবে তা নয়, আমোদও পাইবে প্রচুর। আমরাও তোমাদের মত ছেলেবেলা এই রকম আসর জমাইয়া নিজেদের মধ্যে কবির লড়াই,

কবিতার সমস্যাপূরণ প্রভৃতি করিতাম এবং প্রচুর আমোদ পাইতাম। তোমরাই তো একদিন বড় হইয়া দেশের সাহিত্য-সাম্রাজ্য চালাইবে! তোমরাই হয়তো তখন বাংলার এই চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কবি-গানকে নতুন রূপ দিয়া তাকে তার হারানো আসন ফিরাইয়া দিতে পারিবে।

পথের রাত্রি

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেলো।

ড্রাইভার তার নিজের কোন দরকারে থামিয়েছে মনে ক'রে আমরা প্রথমটায় কিছু খেয়ালই করলুম না; কিন্তু একটু পরেই সন্দেহ হ'লো যে কল বিগ্‌ড়েছে।

সন্তোষ গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁক দিলে—'ড্রাইভার, কী হ'লো?'

—'আজ্ঞে দেখছি,' ব'লে সবুজ মাফলার জড়ানো ড্রাইভার দরজা খুলে নেমে পড়লো। গাড়ির বনেট খুলে এটা দেখলো, ওটা দেখলো; নিজের গদির তলা থেকে দু'-একটা যন্ত্রপাতি বা'র ক'রে ঠুক্‌ঠাক শব্দ করলে; আবার বনেট চাপা দিয়ে ষ্টিয়ারিং হুইল ধর্‌ল—গাড়িটা যেন দায়ে প'ড়ে অস্ফুট গোঁ-গোঁ আওয়াজ ক'রে উঠ্‌ল, কিন্তু চল্‌ল না।

ড্রাইভার বল্‌লে—'আজ্ঞে মনে হচ্ছে যেন অ্যাক্স্‌ল্ ভেঙে গেছে।'

—'তোমার মুণ্ডু ভেঙেছে'! সন্তোষ তম্বি ক'রে উঠলো, 'যেমন ক'রে পারো এক্ষুণি সারিয়ে নাও'।

ড্রাইভার আবার নামলো, চিৎ হয়ে গাড়ির তলায় ঢুকে চুপ ক'রে শুয়েই রইলো না কী করলো ঈশ্বর জানেন, কিন্তু গাড়ি তো আর নড়ে না।

এ ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। ঘড়িতে চারটে। ভরা শীতের বেলা, সন্ধ্যে হ'তে আর কতক্ষণ? তিন বন্ধু মিলে সকালবেলা রাঁচি থেকে বেরিয়েছি, এত কাছে এসে হাজারিবাগ না দেখে কি ফেরা যায়? তা হাজারিবাগ তো দেখলুম সকালবেলা খবরের কাগজ পড়ার মত, কোনো রকমে চোখ বুলোনো। বেলা না পড়তেই আবার ফিরতি পথে দৌড়, আর মাঝামাঝি রাস্তা এসে এই কাণ্ড।

ব'লে রাখা ভালো, আমরা বুদ্ধি ক'রে সঙ্গে কোন খাবার আনি নি। ফ্লাস্‌কে ক'রে যে চা এনেছিলুম তা আসবার পথেই এক চুমুক দু' চুমুক ক'রে ফুরিয়েছে। হাজারিবাগে অনেক খুঁজে খুঁজে প্লার্ক হোটেল নামে যে বাঙ্গালীর হোটেল পাওয়া গেলো, তার খাদ্য নাক-চোখ বুজে উদরে চালান ক'রেও যে আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি, সেটা নিশ্চয়ই হাজারিবাগের হাওয়ারই গুণ। রাঁচির দিকে আবার রওনা হ'তে-হ'তেই আমরা তিন জনেই বেশ ধার ক্ষিদে টের পাচ্ছিলুম, এবং কতক্ষণে রাঁচি পোঁছে বেশ ভালো রকম খাবো তা ছাড়া আর কোন ভাবনা আমাদের ছিলো না। এরই মধ্যে গাড়ি বিগ্‌ড়ে যাওয়ায় মেজাজটা ঠিক খুসি হ'য়ে উঠলো না তা তো বুঝতেই পারছো।

সন্তোষ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে—'যেমন করে পারো আমাদের সন্ধ্যের আগে পোঁছিয়ে দিতেই হবে। নয়তো পয়সা পাবে না।'

ট্যাক্সিওয়ালা বল্‌লে—'অ্যাক্‌স্‌ল্ ভেঙে গেছে তো আমি কী করবো? রামগড়ে পোঁছতে পারলে টেলিফোন ক'রে দোস্‌রা গাড়ি আনানো যায়।'

সন্তোষ আরো কী কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলো, অশোক তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, 'ওর সঙ্গে চোটপাট ক'রে এখন কী হবে? কী করবে তা-ই ঠিক করো।'

আমি বললুম—'আপাততঃ এই মোটররূপী খাঁচা থেকে নামা যাক্ তো। পা দুটো ধরে গেছে।'

নামলুম তিন জনে গাড়ি থেকে। দু'দিকে বন আর উঁচু-নীচু মাঠ, মাঝখান দিয়ে চমৎকার চওড়া রাস্তা—ঢেউ-খেলানো। কী শান্ত, চুপচাপ সব! দু'জন-একজন ক'রে দেহাতি লোক চলেছে; দূরের গাছপালা শীতের পড়ন্ত রোদ্দুরে মনে হচ্ছে সবুজে সোনায় পটে আঁকা। আমরা এদিক্-ওদিক্ দেখতেই বোঁ ক'রে একটা প্রকাণ্ড মোটর-গাড়ি দারুণ বেগে রাঁচির দিকে চ'লে গেলো।

ট্যাক্সিওয়ালা বল্‌লে—'একটু দাঁড়িয়ে থাকলেই বাস্ আসবে।'

সন্তোষ হুমকি দিয়ে উঠলো—'বাস্-এই যদি যাবো তো তোমাকে এনেছিলুম কেন? ট্যাক্সি ঠিক করে দাও আর একটা।'

কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালার কথায় বোঝা গেলো যে আর একটা ট্যাক্সি পেতে হ'লেও রামগড় পর্য্যন্ত যাওয়া দরকার। আরো ছ' মাইল দূরে রামগড়। কী ক'রে যাবো ছ' মাইল? হেঁটে!

ছ' মাইল হাঁটবার কথা ভাবতেই আমার হাত-পা কালিয়ে এলো। বললুম—'চলো না, বাস্-এই উঠে পড়ি।'

—'হ্যাঃ, বাস্ তোমার দুয়ারে প্রস্তুত কিনা! কখন্ আসে ঠিক কী? কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে পাহাড়ি হাওয়া খাবে?'

অশোক বল্‌লে—'আসবার সময় দেখেছি রামগড়ে চায়ের দোকান। সেখানে পোঁছলে চা খেয়ে বাঁচবো তো! না হয় পোঁছতে দেরিই হবে।'

ট্যাক্সিওয়ালা বল্‌লে, 'এক কাজ করুন বাবু, কতকগুলো লোক ঠিক করুন, গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে।'

রাস্তার নীচে মাঠে দু'-একটা লোক কাজ করছিলো, ট্যাক্সিওয়ালা তাদের ডেকে আনলে। প্রথমে তারা রাজি হয় না, সন্তোষ বখ্‌শিষের কথা ব'লে, খানিক শাসিয়ে খানিক বুঝিয়ে রাজি করালে। দেখতে দেখতে প্রায় আট-দশ জন লোক জড়ো হ'য়ে গেলো। গরিব দেশ, পয়সার কথা বল্‌লে যে কোন কাজের লোক জোটে।

সন্তোষ বল্‌লে—'ঠ্যাল্ ব্যাটারা, ঠ্যাল্।'

যে লোকটা প্রথমে এসেছিলো, মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধা, ভীষণ ঢ্যাঙা আর ভীষণ কালো এক ছোক্‌রা, সে তার ঝক্‌ঝকে দাঁত বার ক'রে হেসে বল্‌লে, 'বখ্‌শিষ মিলবে তো বাবু? বহুৎ মেহনৎ'।

—'মিলবে, মিলবে—যা'।

ড্রাইভার ষ্টিয়ারিং হুইল ধ'রে ব'সে রইলো, আর ওরা হৈ-হৈ কর্‌তে কর্‌তে সেই উঁচু-নীচু রাস্তায় ঠেলে নিয়ে চললো গাড়ি। আমরা পিছন-পিছন হাঁটতে লাগলুম। কিন্তু যত হাঁটি ততই হতাশ লাগে; যত এগোই ততই মনে হয় রামগড় আর কখনোই পোঁছবো না।

এদিকে বেলাও প'ড়ে আসছে।

ইতিমধ্যে একটি রাঁচির বাস্ আমাদের পাশ কাটিয়ে চ'লে গেছে। সন্তোষের কথা না শুনে যদি তখন বাস্-এ যাওয়াই ঠিক করতুম! ওর গোঁয়ারতুমির জন্যেই তো এই দুর্ভোগ। থেকে-থেকেই দু'-একখানা মোটর রাঁচির দিকে যাচ্ছে, আমরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে দেখছি।

শেষটায় একটা ট্যাক্সি আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে আমাদের সামনে এসে থামলো। ট্যাক্সিটায় লোক ছিলো, যাচ্ছিলো হাজারিবাগের দিকেই, কিন্তু হাজারিবাগ পর্য্যন্ত যাবে না। কাছাকাছি একটা জায়গায় সওয়ার নামিয়ে দিয়ে এক্ষুণি আবার ফিরে আসবে।

বাঁচলুম।

ততক্ষণে আমরা দু' মাইল রাস্তা অন্ততঃ এসেছি। রামগড় তখনো ঢের দূরে, হেঁটে যেতে হ'লে শীতের ঘুটঘুট্টি রাত্রে কী হ'তো কে জানে! গাড়ি ঠেলবার আর দরকার নেই, লোকগুলো খালাস পেয়ে পথের উপরেই ব'সে জিরুতে লাগলো।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সিটা ফিরে এলো। লাফিয়ে উঠে বসলুম আমরা। অচল গাড়িটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নেয়া হ'লো—রামগড়ে সে প'ড়ে থাকবে। যে লোকগুলো গাড়ি ঠেলেছিলো, তারা উঠে গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়ালো, কিন্তু গাড়ি তার আগেই ষ্টার্ট দিয়ে ফেলেছে।

ওরা সঙ্গে-সঙ্গে ছুটতে-ছুটতে বল্‌লে—'বাবু, বখশিষ, আমাদের বখশিষ ?'

আমি ব'লে উঠলুম, 'একটু থামো'।

কিন্তু সন্তোষ পকেট থেকে একটা তু'-আনি বা'র ক'রে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌লে—'এই নে, যা।'

আমি ব'লে উঠলুম, 'এ কী করলে—'

সন্তোষ আমার হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, 'ঠিক হয়েছে'।

সেই পাগড়ি-বাঁধা ঢ্যাঙা লোকটা হঠাৎ এগিয়ে এসে মুখ বাড়িয়ে বল্‌লে—'বাবু, বহুৎ মেহনৎ—'

সন্তোষ বল্‌লে, 'ভাগো, ভাগো !' সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটলো পূরোদমে, কোথায় প'ড়ে রইলো ওরা। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলুম, ওরা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে হতাশ ভাবে আমাদের চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো। বললুম—'কী করলে, সন্তোষ! মোটে তু' আনা দিলে! জন-পেছু একটা পয়সাও তো পড়লো না!'

সন্তোষ বল্‌লে—'আবার কী! সমস্ত দিন খেটে ওরা চারটে পয়সা হয়তো পায়। একটা আস্ত পয়সা কম হ'লো ?'

—'এই চড়াই উৎরাই ভেঙে তু' মাইল রাস্তা একটা গাড়ি ঠেলা—'

সন্তোষ বল্‌লে, 'পরে আর তুটো পয়সা দিলেই হ'তো। যাক্ গে।'

কিন্তু আমার মন থেকে ভাবনাটা গেলো না। কাজ হাসিল ক'রে নিয়ে এই নিরীহ লোকগুলোকে যেন স্রেফ ফাঁকি দিলুম। বড় ছোট লাগলো নিজেদের।

ত্যাখ্-না-ত্যাখ্ রামগড় এসে পৌঁছনো গেলো। তখন সন্ধ্যে হয়েছে। এক ও-দিশি খৃষ্টান তার বাড়ির সামনের ঘরেই চায়ের দোকান করেছে। আহার্য্য বিশেষ কিছু নেই ; কিন্তু চা-টা ভালো। শুকনো পাঁউরুটি সহযোগে সেই চা কী যে ভালো লাগলো বলবার নয়। চা খেতে-খেতে আমি আবার বললুম—'সন্তোষ, তোমার হাতে তু' আনা উঠলো কী ব'লে!' অশোক আমার কথায় সায় দিল—'সত্যি! আমি তো ভেবেছিলুম অন্ততঃ তুটো টাকা দেবে।' সন্তোষ বল্‌লে, 'সময় পেলুম কোথায় ? গাড়ি তো দৌড় দিলে।'

সন্তোষ বল্‌লে, 'তাড়াতাড়িতে পকেট থেকে যা উঠলো, তাই দিলুম। যাক্ গে, তোমরাও বড্ড বাড়াবাড়ি করছো।' সন্তোষ ও কথা বল্‌লে বটে, কিন্তু বোঝা গেলো তারও মনের মধ্যে একটু খচ্ খচ্ করছে।

চা খাওয়া শেষ ক'রে আমরা আবার গাড়িতে উঠলুম। অচল গাড়িটা আর গাড়ির চালক রইলো রামগড়ে। অন্ধকার রাত্রিকে তীব্র হেড্-লাইটে তু' টুকরো ক'রে ক'রে আমরা ছুটলুম রাঁচির দিকে। বেশ শীত, কম্বলে পা ঢেকে আমরা ঘন হ'য়ে বসেছি। কারো মুখে কথা নেই ; তীব্র সবুজ আলোয় সামনের ঝোপঝাড় গাছপালা অদ্ভুত ছবির মত আমাদের চোখের সামনা দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে।

এই ষাট মাইল রাস্তার যেটুকু সব চেয়ে সুন্দর সেখানে পৌঁছনো গেলো। ঘুরে ঘুরে একটা পাহাড়ে উঠে আবার নামতে হয়, তার খানিক পরেই রাঁচি। ঘুরে ঘুরে পথ চলেছে, কত অদ্ভুত মোড়, কত বিচিত্র বাঁক, আর তু'দিকে ঘন বন। আসবার সময় নীচে তাকিয়ে দেখেছিলুম, হাতে-আঁকা ছবির মত কত নীচে পৃথিবী প'ড়ে আছে। এখন অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি, ঘন বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি নির্ভাবনায় ছুটেছে, এমন সময় হঠাৎ কোত্থেকে একটা লোক ছুটে এসে গাড়ির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তিন জনে এক সঙ্গে দেখলুম, লোকটা ভীষণ ঢ্যাঙা, ভীষণ কালো, আর তার মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধা। ড্রাইভার 'হে—ই'! ব'লে ব্রেক ক'ষে দিলে, গাড়ি আর্ত্তনাদ ক'রে থেমে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির আলো গেলো নিবে।

আমরা তো অবাক্! এই রাত্রে এই গভীর বনের মধ্যে লোক এলো কোত্থেকে! ঘুটঘুটি অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, লোকটা কি মরলো না কী হ'লো! সন্তোষ হুকুম দিল—'ড্রাইভার, হেড্ লাইট্‌স্।'

একটু পরে ড্রাইভারের জবাব এলো, 'হেড্ লাইট্ জ্বলছে না।'

সন্তোষ চটে গিয়ে বল্‌লে, 'ব্যাটা মাতাল হয়েছিস্ নাকি ? লোকটার কী হ'লো ত্যাখ্।'

ড্রাইভার বল্‌লে, 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি নে।'

সন্তোষ আর এক পরদা গলা চড়িয়ে বল্‌লে—'গাড়ি চালাও।'

কিন্তু গাড়িও চলে না।

—'চালাও, চালাও,' সন্তোষ চীৎকার ক'রে বল্‌লে।

ড্রাইভার আরো অনেকবার চেষ্টা করলে, কিন্তু গাড়ি মোটে নড়েই না।

অন্ধকারে আমরা পরস্পরের মুখ দেখবার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে একটা টর্চ আমি নি, আর

টর্চ থাকলেই বা কোন্ কাজে লাগতো! একটা কথা নেই কারো মুখে, পাথরের মত স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি।

তোমাদের বলবো কী, অমন্ ভয় কখনো তোমরা যেন না পাও। তখন হয়তো সাতটা হবে, কি সাড়ে-সাতটা, শীতের সমস্ত দীর্ঘ রাত সামনে প'ড়ে। শীতের সেই দীর্ঘ, অন্ধকার রাত ঠিক ঐ ভাবে ঐ গাড়িতে ব'সে আমরা কাটিয়ে দিলুম—কী ক'রে কাটিয়েছিলুম এখন ভালো ক'রে মনে করতে পারি নে।

বেশি আর বলবার নেই, পরের দিন সকালে সশরীরে রাঁচি পৌঁছিয়েছিলুম সকলেই। সমস্ত রাত্রি একটা গাড়ি গেলো না ও রাস্তা দিয়ে, সমস্ত রাত্রি একটা অন্ধকার হিমসমুদ্রের মত আমাদের বুকের উপর চেপে ব'সে রইলো। আর ভোরবেলা যখন ফরেস্ট্ সার্বিসের এক সায়েব তাঁর গাড়িতে যেতে-যেতে আমাদের উদ্ধার করলেন, তখন শীতে আর শরীরের কষ্টে আমরা প্রায় আধ-মরা।

ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়, হয়তো গাড়িটা এমনি খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো, হয়তো ভুল দেখেছিলুম। কিন্তু আমরা তিন জনেই কি একসঙ্গে ভুল দেখলুম? আর একই রকমের ভুল দেখলুম তিন জনে—ভীষণ ঢ্যাঙ্গা একটা লোক, ভীষণ কালো, মাথায় পাগড়ি বাঁধা!

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(২৬)

হীরার টুক্‌রা

কিছুক্ষণ সন্তোষ সম্পূর্ণই স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু কথাটাকে কোনক্রমেই সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, কহিল, "তা কি করে হবে মিষ্টার হুক্কা-কাশি? সোনার হরিণের অন্তর্ধান, অহিভূষণ চৌধুরীর ব্যাপার—সে তো কত দিনের কথা! তখন মেজকর্ত্তা এ দেশে কোথা, তিনি তো আমেরিকায়! এই তো সেদিন সবে এলেন!"

"মিষ্টার বাসু আমেরিকা থেকে কদ্দিন ফিরেছে বলে আপনার ধারণা?"

"আপনি কাশী রওনা হয়ে পড়্‌বার মাত্র দু'দিন কি তিন দিন আগে। আমরাই তো হাওড়া-ষ্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলুম।"

"হ্যাঁ, লোক-দেখানো দেশে ফেরার তারিখ ওইটাই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসেছেন উনি তার ঢের ঢের আগে"—হুকা-কাশি বলিলেন।

"কিন্তু তাই বা বলি কি করে? অহিভূষণ বাবু যখন কর্ত্তার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ভাবে কাজ কর্‌ছেন তখনও যে আমরা আমেরিকা থেকে মেজকর্ত্তার চিঠি পেয়েছি; একেবারে খোদ্ তাঁর নিজের হাতে লেখা চিঠি, টিকেটের ওপর পরিষ্কার আমেরিকার ডাকঘরের ছাপ মারা। চান তো সে চিঠি এখনও আপনাকে দেখাতে পারি।"

হুকা-কাশি জবাবে শুধু একটু হাসিলেন, তার পর পকেট হইতে একখানা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া বলিলেন, "এই কেব্‌ল্‌টা একবার পড়ুন তো!"

বিস্মিত সন্তোষ কেব্‌ল্‌টা চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিল; তাতে যা লেখা আছে তার মর্ম্ম—"খামে মোড়া তোমার প্রত্যেকটি চিঠিই পেয়েছি এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে সেগুলো পোষ্ট্‌ও করা হ'য়েছে। এ বিষয়ে আমার কোন ভুল হয়েছে এমন ধারণা তোমার কি জন্য হ'ল বুঝ্‌লাম না। যা হোক আমার কোন ভুল হয় নি। মর্ণিংটন।"

টেলিগ্রাম পড়া শেষ হইলে সন্তোষ কহিল, "আপনি বোধ হয় বল্‌তে চান, মেজকর্ত্তা আমেরিকা ছেড়ে আস্‌বার আগে মর্ণিংটন নামে ওঁর আলাপী এক মার্কিন সাহেবের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে এসেছিলেন। সেটা হচ্ছে এই যে, এখান থেকে উনি আমাদের নামে চিঠি লিখে খামশুদ্ধ সেই চিঠি সাহেবের কাছে পাঠাবেন, আর সাহেবও ঠিক ঠিক তারিখ মিলিয়ে সেগুলো আমেরিকার কোন ডাক-ঘরে ছেড়ে দেবে। সে চিঠি পড়ে আমরা স্বভাবতঃই মনে কর্‌ব যে মেজকর্ত্তা আমেরিকাতেই রয়েছেন—তিনি যে দেশে ফিরে এখানেই বাস কর্‌ছেন এ সন্দেহ কারও মনে ভ্রমেও জাগ্‌বে না,—এই তো?"

"সমস্ত ব্যাপারটা আপনি জলের মত বুঝে ফেলেছেন, সন্তোষ বাবু! আপনার বোঝ্‌বার শক্তির আমি বাস্তবিকই তারিফ্ কর্‌ছি।"

"কিন্তু এ লোকটার খবর সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে?"

"কার? মিষ্টার বাসুর প্রাণের বন্ধু মর্ণিংটন সাহেবের? বঁড়্‌শিতে টাকা বিঁধে জলে ফেল্‌তে হয়েছিল; টাকার লোভে মিষ্টার বাসু অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে টপ্ করে তাই গিলে ফেলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বঁড়্‌শিতেও গেছেন আট্‌কে। আসলে কথা কি জানেন, কোন জটিল অপরাধের অপরাধীকে খুঁজে বার কর্‌তে হলে ঠিক অঙ্ক কষার মতই ধাপে ধাপে এগুতে হয়। যুক্তিতর্কের সাহায্যে ঠিক বৈজ্ঞানিকের মত অগ্রসর হতে পারলে শেষ পর্য্যন্ত

ফল আপনার মিল্‌বেই। এই ভাবে এগোবার ফলে আমি দেখ্‌তে পেলাম—কি করে পেলাম তা পরে জান্‌বেন—যে, যে অপরাধীর সন্ধানে আমরা ফির্‌ছি সে আর আমাদের মিষ্টার বাসু মশাই অভিন্ন ব্যক্তি। আমার এ সিদ্ধান্তে যদি কোন রকম ভুল না থেকে থাকে তবে ঐ সময়টাতে মিষ্টার বাসুর পক্ষে আমেরিকায় বাস এবং আমেরিকায় বসে চিঠি লেখা একেবারেই অসম্ভব। অথচ চিঠি যে সত্যিই আপনারা পাচ্ছেন তাও জানি। কাজেই এ রহস্যের একমাত্র সমাধান হ'তে পারে এই যে, আমেরিকায় ওঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ, বিশ্বাসী কোন লোক আছে যার মারফৎ নিয়মিত ও চিঠিগুলো আপনাদের হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে। আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় থাকা সম্ভব কি? আচ্ছা দেখা যাক্ বাস্তবিকই সে রকম বিশ্বস্ত কোন বন্ধু আছে কিনা!

"বঁড়্‌শিতে টাকা গেঁথে জলে ফেলে দেওয়া—অর্থাৎ মিষ্টার বাসুকে বল্লাম, আমার পরিচিত একজন ধনী পার্শী সওদাগর আমেরিকার বাজারে আপাততঃ লাখ তিনেক টাকার যন্ত্রপাতি কিন্‌তে চান; কিন্তু এত দূর দেশ থেকে বেছে নিজে যাচাই করে মাল কিন্‌তে গেলে তাতে পদে পদে লোকসানের সম্ভাবনা। তিনি তো বহু দিন আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছেন, তাঁর জানার ভেতরে পাকা, অথচ বিশ্বস্ত এমন কোন লোক আছে কি, যে এই ব্যাপারে পার্শী সাহেবের সাহায্যে আস্‌তে পারে? অবশ্য এর জন্য বাজার-চলিত ন্যায্য দালালী কমিশন যা তা তিনি অবশ্যই দেবেন।

"তিন লাখ টাকার ওপর কমিশন একেবারে হেলাফেলার বস্তু নয়, তার ওপর ভবিষ্যতে আরও অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মিষ্টার বাসুর চরিত্র আমি জানি, মোটা টাকার ওপর বখ্‌রা বসাবার এত বড় সুযোগ ছাড়বার পাত্র তিনি মোটেই নন্। অর্থাৎ টোপ তিনি গিল্‌বেনই। আর এও সত্যি যে যাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারেন দালাল হিসেবে তার নাম কিছুতেই তিনি কর্‌বেন না, কেননা এ সব যে নবলগ্ টাকা-কড়ির ব্যাপার—দালাল যদি শেষে কমিশনের বখ্‌রা দিতে অস্বীকার করে বসে! কাজেই এ রকম ক্ষেত্রে শতকর নিরানব্বুই ভাগ সম্ভাবনাই হচ্ছে এই যে নিতান্ত গোপনীয় চিঠি পাঠাবার মত কাজ যে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ওপর পড়েছে দালালের নাম কর্‌তে গিয়েও তার নামই মিষ্টার বাসুর মুখ দিয়ে বার হয়ে আস্‌বে—আমেরিকায় সে-ই তার সব চাইতে বিশ্বাসের পাত্র কিনা!

"মিষ্টার বাসু উল্লেখ কর্‌লেন মর্ণিংটন নামে এক মার্কিন সাহেবের নাম, আর তার নামে একটা পরিচয়-পত্রও লিখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও পেয়ে গেলাম সে সাহেবের ঠিকানা। ব্যস্, বাড়ী এসেই সাহেবের কাছে এক কেব্‌ল্—অবশ্য বাসুর জবানীতে, অর্থাৎ যাতে করে সে মনে করে মিষ্টার বাসুই টেলিগ্রামখানা করেছেন। টেলিগ্রামে লেখা হ'ল যে, যে সব চিঠি তাকে

পাঠান হয়েছে তার সবগুলোই শ্রীপুরে ফিরে এসেছে কিনা অবিলম্বেই কেব্‌ল্ করে সে যেন জানায়। এর জবাবে সে যদি ফিরে টেলিগ্রাম কর্‌ত—'তোমার কেব্‌ল্‌এর অর্থ কিছুই বুঝ্‌লাম না' তা হলে আমাকেও বুঝ্‌তে হত হিসাবে কোন গোল হয়েছে—আমার অনুমান ভুল। কিন্তু সে ধরণের কেব্‌ল্ সে মোটেই করে নি, বরং উল্টে কি করেছে তা তো আপনারা এক্ষুণি দেখ্‌লেন। আমার সিদ্ধান্ত যে একেবারেই নির্ভুল তার স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল।"

সন্তোষ এতক্ষণ হাঁ করিয়া হুকা-কাশির কথাগুলি শুনিতেছিল, তিনি থামিতেই কপালের-উপর-আসিয়া-পড়া চুলগুলিকে পিছন দিকে সরাইয়া দিতে দিতে সে কহিল, "আচ্ছা, সলিল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? আমার কিন্তু মনে বরাবরই কেমন একটা সন্দেহ জেগে আস্‌ছে যে ভেতরকার রহস্য সে সব জানে।"

"আপনার সন্দেহ নির্ভুল; বাস্তবিকই আসল রহস্য সলিল বাবুর অজানা নেই।"

"অথচ সমস্ত জেনেশুনেও কর্ত্তার কাছে কোন কথা ঘুণাক্ষরেও সে প্রকাশ করে নি! একেবারে হীরের টুক্‌রো ভাই বলুন?"

"এবারও আপনার মুখ দিয়ে সত্যি কথাটাই বেরিয়ে পড়েছে সন্তোষ বাবু," হুকা-কাশি কহিলেন, "বাস্তবিকই ভাই হিসাবে সলিল বাবুর তুলনা পাওয়া শক্ত। কিন্তু আপনার ও ইঙ্গিতটা সত্যি নয়। বিদ্রূপভরে নয়, সত্যিসত্যিই আমি বল্‌ছি, সলিলের মত স্নেহময় ভাই একান্তই দুর্ল্লভ। সোনার হরিণ উদ্ধার কর্‌তে সে আপনার, আমার অথবা রণজিৎ বাবুর চাইতে কিছুমাত্র কম চেষ্টা করে নি; এমন কি প্রকারান্তরে তার সাহায্য না পেলে এত সহজে সোনার হরিণ আমি ফিরে পেতাম কিনা, তাও জানি না। অথচ আত্ম-প্রচারের লোভ একবারও তার মনে উঁকি মারে নি। দ্বারিক বাবুর ছেলেপেলে নেই, মিষ্টার বাসু যে অপরাধ করেছেন তাতে তাঁর সিকিপয়সাও পাওয়া উচিত নয়, এবং দ্বারিক বাবুর কানে সব কথা পৌঁছুলে তা যে তিনি পাবেনও না এ কথাও নিশ্চিত। অথচ পাছে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে, পাছে মিষ্টার বাসুকে অর্থাভাবে পথে বস্‌তে হয় এই ভয়ে স্নেহময় সলিল—নিঃস্বার্থপর সলিল—নিজের পাখা দিয়েই যেন আগাগোড়া তাঁকে ঢেকে রেখেছে। সে যে প্রকৃত রহস্য জানে, মিষ্টার বাসুকে পর্য্যন্ত তা টের পেতে দেয় নি। ব্যাপারটা বাস্তবিক কি ঘটেছিল আগে সংক্ষেপে তাই বলে নিই, আমি কি করে ধীরে ধীরে সমস্ত টের পেয়েছি—সেটা বরং পরে বলা যাবে।

"ভাইদের ভেতর দ্বারিক বাবুরা বর্ত্তমানে তিন জন বেঁচে আছেন—তিনি স্বয়ং, খগেন্দ্র, অর্থাৎ আমাদের মিষ্টার বাসু, আর সলিলেন্দ্র। আরও কয়েকটি ভাই ছিল, তবে তারা অল্পবয়সেই মারা গেছে। বোধ হয় ঠিক এই কারণেই ছেলেবেলায় খগেন বাবুর রীতিমত শাসন হয় নি, লেখাপড়ায় তাঁর আদৌ মন বস্‌ল না, বছরের পর বছর কেবল ফেলই হতে লাগ্‌লেন। তার পর

কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে ফাষ্ট্ ক্লাশ পর্য্যন্ত উঠেই মা সরস্বতীর কাছে তিনি বিদায় নিলেন; পাড়ায়-পাড়ায় থিয়েটার আর যাত্রার আসরে ক্রমাগত তাঁকে রাজা-উজীরের পার্টে নাম্‌তে দেখা গেল। দ্বারিক বাবু অতিশয় কড়া মেজাজের লোক, এ সব তাঁর বরদাস্তের বাইরে। তবুও যা হোক মা-বাপ-হারা ছোট ভাইয়ের খেয়াল কিছুদিন তিনি সহ্য করেছিলেন; কিন্তু খগেন বাবু যেদিন কল্‌কাতায় গিয়ে এক পেশাদারী থিয়েটারে নাম লিখিয়ে এলেন সেদিন তাঁর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল—বাড়ী থেকে দিলেন তাঁকে দূর করে।

"বেপরোয়া খগেন্দ্র সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় আমেরিকা চলে এলেন মনে মনে এই ধারণা নিয়ে যে তাঁর অভিনয়-কলার একমাত্র সমঝ্‌দার হচ্ছে আমেরিকা; বায়স্কোপের অভিনেতা-হিসাবে হলিউডে ঢুকে তিনি জগৎ-যোড়া নাম কিন্‌বেন। এদেশ থেকে রওনা হওয়ার আগে এই কথাই তিনি বলে গিয়েছিলেন এবং আরও নাকি জানিয়ে গিয়েছিলেন যে কোটিপতি না হয়ে এদেশমুখো আর হচ্ছেন না।

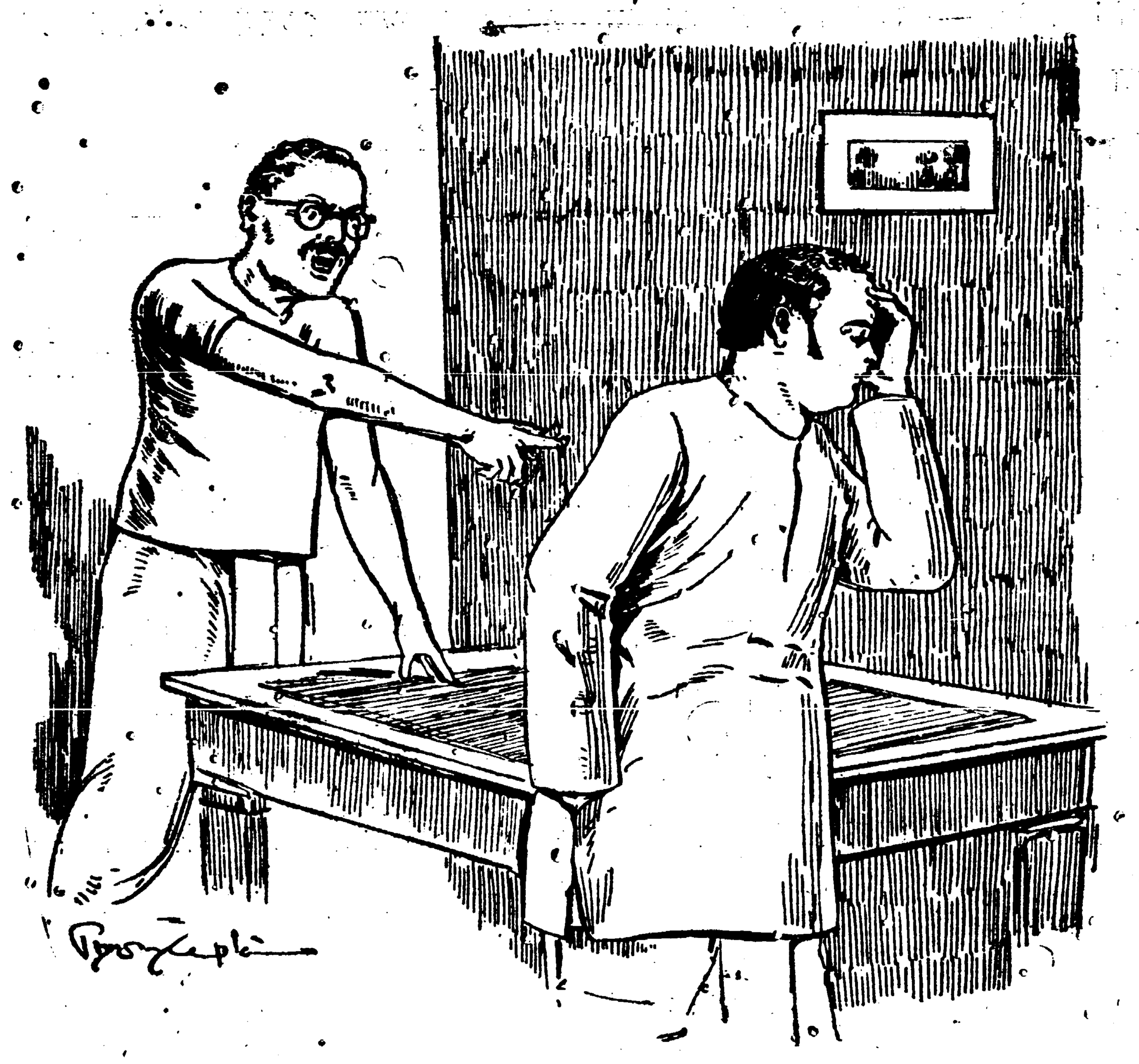
…দিলেন তাঁকে দূর করে।

"কিন্তু ক্রোড়পতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা যত সহজ, সে স্বপ্নকে কাজে পরিণত করা যে ঠিক ততটা সহজ নয়, কিছুদিন আমেরিকায় বাস করবার পরই বাস্থ তা বুঝ্‌তে পারলেন। তাই বছর দশেক পরে ফের তাঁকে শস্য-শ্যামলা বাংলা দেশেই ফিরে আস্‌তে হ'ল—দেশের ওপর মমতায় বুকটা তাঁর টন্ টন্ করে উঠ্‌ছিল বলে নয়, বুকের নীচেই যে স্থূলতর জিনিষটি রয়েছে সেটা খাদ্যাভাবে সর্ব্বদাই চন্ চন্ করছিল বলে।

"বাংলা দেশে তখন সিনেমা-শিল্পের যুগ চলেছে, লাভ-জনক নতুন একটা ব্যবসার সন্ধান

এখানে বহু লোক পেয়ে গেছে। যে ব্যক্তি হলিউডে জীবনের আট দশটি বছর কাটিয়ে সিনেমা-বিশারদ হয়ে এসেছে তার পক্ষে এটা বাস্তবিকই এক অপ্রত্যাশিত রকমের শুভ সময়। দেশে ফিরেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রসিদ্ধ অভিনেতা এবং সিনেমা-ডিরেক্টর অশনিকান্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় হয়ে উঠ্‌ল—অশনিকান্ত তখন দু' চার জন উৎসাহী যুবক জুটিয়ে ডায়মণ্ড্ করপোরেশন নামে ছোট্ট একটি ফিল্মের কারবার গড়ে তোলায় মন দিয়েছেন। সকলের সমবেত পরামর্শে ঠিক হ'ল, বেশ কিছু টাকার যোগাড় করে ব্যবসাটাকে জাঁকিয়ে তুলতে হবে। একটা কথা বলতে ভুল হয়েছে—মিষ্টার বাসু তাঁর এদেশে ফেরার কথা আত্মীয়-স্বজন কারো কাছেই প্রকাশ করেন নি, কেননা প্রকাশ করবার মুখ তখন তাঁর ছিল না।

"ঠিক এই সময়ে দ্বারিক বাবুর অসুখ, বিশেষ করে চোখের অসুখ খুব বেড়ে ওঠায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বার হল—তাঁর একজন প্রাইভেট্ সেক্রেটারী চাই। মিষ্টার বাসু হঠাৎ যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলেন। বড়দার অগাধ সম্পত্তি রয়েছে কেন, যদি না তা' থেকে কিছু লুটে নিয়ে সিনেমা-ব্যবসায়ে তিনি ঢাল্‌তে পারেন। একটা কল্পিত নাম নিয়ে নিজেই তিনি এই প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদের জন্য প্রার্থী হবেন; তার পর একবার ঢুক্‌তে পার্‌লে সুযোগের অভাব হবে না—দাদার তহ্‌বিল থেকে মোটা রকমের কিছু সরাবার সুযোগের কথা বল্‌ছি। লন্ চ্যানির লীলাভূমি হলিউডে বৃথাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণের আর্ট এত দিন ধরে শিখে এসেছেন যদি না সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষে নিজেকে পরিবর্ত্তিত কর্‌তে না পারেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে দেখে নি, তাঁর চেহারার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না, তাদের সাধ্য কি তারা তাঁর ছদ্মবেশের আবরণ ভেদ করতে পারে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে টাকের ওপর ব্যাক্-ব্রাস্ করা চুল দেখা দিল, চোখে চশমা উঠ্‌ল, মুখে নানান্ রকমের অদল-বদল ঘট্‌ল—ব্যস্, অহিভূষণ চৌধুরী নামে সম্পূর্ণ একটি নতুন লোকের ভূমিকায় মিষ্টার বাসু দ্বারিক বাবুর দরজায় এসে চাকরীর উমেদার হলেন।

"দ্বারিক বাবুর রুচি, পৃথিবীর নানান্ বিষয়ে তাঁর নানান্ রকমের মত—প্রভৃতি খুঁটিনাটি কোন খবরই মিষ্টার বাসুর অজানা ছিল না; তার ফলে অল্পক্ষণের আলাপেই দ্বারিক বাবুর মনে হ'ল তাঁর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী হবার সব চাইতে উপযুক্ত লোক ইনিই। অহিভূষণ-বেশী মিষ্টার বাসু কাজে বহাল হয়ে গেলেন। তার পর দ্বারিক বাবুর চোখের ব্যামো যতই বাড়্‌তে লাগ্‌ল মিষ্টার বাসুরও কারবারের ওপর আধিপত্য ততই বেড়ে চল্ল। এক কথায় দ্বারিক বাবুর তিনি ডান হাত হয়ে দাঁড়ালেন, এবং সে কথাও কারোই জান্‌তে বাকী রইল না।

"এইবার মিষ্টার বাসু মন দিলেন নিজের কার্য্যোদ্ধারে এবং শীগ্‌গিরই চমৎকার একটি সুযোগ জুটে গেল। দ্বারিক বাবু খুব তাড়াতাড়ি একটা জমিদারী কিনে ফেলবার মৎলবে ছিলেন,

তাই হঠাৎ এক সঙ্গে অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়্ল। ব্যবসায়ীদের টাকা সব সময়ে হাতে থাকে না, ব্যবসায়ে খাটে। তাই আপাততঃ তিনি তাঁর সোনার হরিণ ব্যাঙ্কে বন্ধক রেখে টাকা ধার করলেন, তার পর টাকা শোধের বন্দোবস্ত করে নিজের এটর্ণী অবিনাশ বাবুকে উপদেশ দিলেন ব্যাঙ্ক থেকে সোনার হরিণটি খালাস করে আনতে। অবিনাশ বাবু ব্যাঙ্ক থেকে রত্নটি ছাড়িয়ে এনেছেন—তখনও দ্বারিক বাবুর হাতে তা ফিরিয়ে দেন নি, ঠিক এই সময়টুকুর মধ্যেই মিষ্টার বাসু চরম ধূর্ত্তের মত একটি চাল চেলেই বাজী মাৎ করে দিলেন। টাইপ্ রাইটারের সাহায্যে একখানা কাগজে তিনি দ্বারিক বাবুর জবানীতে একখানা চিঠি লিখ্লেন; তার মর্ম্ম—'আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী অহিভূষণ চৌধুরীকে আপনি অবশ্যই চেনেন—তার হাতে সোনার হরিণটি ফেরৎ পাঠালে খুসী হব।' তার পর চওড়ায় ঠিক সমান সমান, অথচ লম্বায় খানিকটা খাটো আর একখান কাগজে ব্যবসা-সংক্রান্ত একখানা চিঠি লিখ্লেন—সবটা কাগজ যুড়ে। এইবার একটা ফ্ল্যাট্-ফাইলের ওপর প্রথম কাগজখানা রেখে, খালি চোখে নজরে আসে না এম্নি এক রকম হাল্কা আঠার সাহায্যে দ্বিতীয় কাগজের নীচের প্রান্তটুকু প্রথম কাগজের গায়ে এঁটে দিলেন। প্রথম কাগজখানা লম্বায় বড় থাকায় তার খানিকটা অংশ নীচের দিকে বেরিয়ে রইল। দ্বারিক বাবু চোখে খুবই কম দেখেন, তাতে আবার সময়টা রাত্রি, কাজেই জোড়ার দাগটাতে খুব যত্নের সঙ্গে খড়ি বা সাদা কোন রাসায়নিক পদার্থ ঘষে দিলে, কিছুই তাঁর নজরে আসা সম্ভব নয়—অর্থাৎ একটা কাগজের ওপর আর একটা কাগজ যে চাপান হয়েছে তা তিনি কিছুতেই বুঝ্তে পারবেন না, মনে ভাব্বেন একটাই বুঝি কাগজ। ফ্ল্যাট্-ফাইলের ওপর কাগজকে ধরে রাখ্তে অনেক সময় ফাইলের দুধারে ষ্ট্র্যাপ্ও দেওয়া হয়, মিষ্টার বাসু একটা ষ্ট্র্যাপ্কে সরিয়ে জোড়ার দাগের ওপর নিয়েও থাকৃতে পারেন—তবে দ্বারিক বাবুর মত ক্ষীণদৃষ্টি লোকের কাছে তার কোন দরকার ছিল না।

"দ্বারিক বাবু নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রথম চিঠির বেরিয়ে-আসা অংশের ওপর সই করে দিলেন—অর্থাৎ তাঁর সই পড়্ল মিষ্টার বাসুর লেখা প্রথম চিঠিখানায়—দ্বিতীয় খানায় নয়। ব্যস্, সেই চিঠি অবিনাশ বাবুকে দেখিয়ে সোনার হরিণ নিয়ে অহিভূষণরূপী মিষ্টার বাসু ভেগে পড়লেন। তার পর থেকেই অহিভূষণ চৌধুরী পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল আর তার জায়গায় দেখা দিল খগেন্দ্রনাথ বাসু, যার সঙ্গে অহিভূষণ চৌধুরীর চেহারার আর এতটুকুও মিল নেই। খুঁজে মর এবার অহিভূষণ চৌধুরীকে! কিন্তু যাবার আগে মিষ্টার বাসু আরও একটা চাল চেলে গেলেন। পাছে দ্বারিক বাবু বাঘা ডিটেক্টিভ লাগিয়ে অহিভূষণ চৌধুরীর অন্তর্ধান রহস্যটার কিনারা করতেই বেশী মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন সেই ভয়ে তাঁদের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মে দেবার জন্য—তাঁদের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে মারবার উদ্দেশ্যে—এম্নি একটা ইঙ্গিত

দিয়ে গেলেন যাতে সকলের মনে হয় তিনি কতকগুলো ভীষণ প্রকৃতি লোকের হাতের মুঠোর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন—তারাই তাঁকে যন্ত্রের মত চালিয়েছে। এই ধরণের একটা ধারণার সৃষ্টি করতে পারলে স্বভাবতঃই দ্বারিক বাবুদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়বে সেই মিথ্যে দলটারই সন্ধান করা। মরুক্ তারা মরীচিকার পেছনে ঘুরে! কি করে ঘরের জঞ্জাল-স্তূপের ভেতর তাঁর কাছে লেখা ডাকাত দলের চিঠি আবিষ্কারের বন্দোবস্ত হ'ল, কি করে তিনি

...প্রথম কাগজের গায়ে এঁটে দিলেন।

ঘরের ভেতর কাজ করতে করতে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন বলে ধারণা জন্মাল—একে একে সব কথাই বল্ব।

(ক্রমশঃ)

অনেক চেষ্টা ক'রেও এ সংখ্যায় "সোনার হরিণ" শেষ করা সম্ভব হ'ল না। ২।৩ মাসের মধ্যেই এটা শেষ হবে। আগামী মাস থেকে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর একটি নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস রামধনুতে বার হবে, এবং "সোনার হরিণ" শেষ হলে অন্য আর একখানি নতুন উপন্যাস আরম্ভ করা হবে। অর্থাৎ এবার থেকে রামধনুতে এক সঙ্গে দু'খানা ক'রে ধারাবাহিক উপন্যাস চলবে।

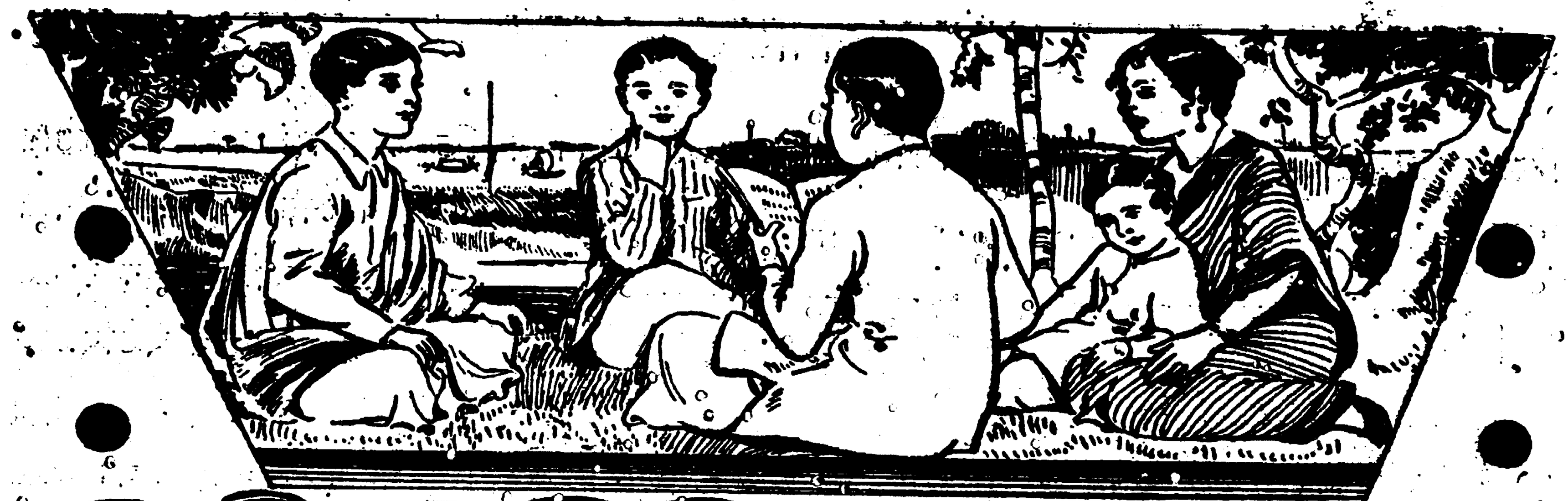

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রহিকাদের লেখা

শীত

(শ্রীভারতী সেন)

হিমগিরি হতে এসেছে বাতাস শীতের বার্ত্তা লয়ে.
এসেছে নামিয়া মোদের দুয়ারে নবীন অতিথি হয়ে
নীল আকাশের বুক হতে তারে পাঠাল রংয়ের রাণী
শ্যামলা ধরায় শুভ্র রংয়ের রেখাটী দিবারে টানি।
ধরার অঙ্গ ঘেরিয়া আজিকে উড়িতেছে শ্বেত বাস,
কর্ণে কপোলে দুলিছে তাহার শুভ্র ফুলের রাশ।
কুহেলী আজিকে ঘন অঞ্চলে আবরিল বন-গিরি,
উত্তর বায়ে অঙ্গ কাঁপায়ে যায় শীত ঘুরি-ফিরি।
স্তব্ধ নিশার আঁধার বুকেতে কুসুম ঘুমায়ে পড়ে,
তুষারের হিম-পরুষ-পরশে কিশলয় পড়ে ঝরে।

রঙ্গ-কণা

(শ্রীহিরণলাল সান্যাল)

জমিদার—'ওহে, সব ভাল করে খেও, পাতে কিছু রেখ না।'
নিমন্ত্রিতেরা—'আজ্ঞে, তা তো নিশ্চয়ই——'
জমিদার—'ওরে হতভাগা কানাই, তুই যে সব মাটীতে ফেলছিস্!'
কানাই—'আজ্ঞে, আপনিই তো বল্লেন পাতে কিছু রেখ না।'

শোক-সংবাদ

(শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র—গ্রাঃ নং ১৬২৬)

গত ৯ই কার্ত্তিক, রামধনুর অন্যতম গ্রাহক অক্ষয়কুমার বিশ্বাস দুরন্ত টাইফয়েড রোগে ১৭ বছর বয়সে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।

অক্ষয়কুমার মেধাবী ছাত্র ছিলেন, গত বছর তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেন্ট্ জেভিয়ার্স্ কলেজে পড়িতেছিলেন। ক্রিকেট, হকি, সাঁতার প্রভৃতিতেও তাঁর খুব সুনাম ছিল। রামধনুকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

ভগবান্ অক্ষয়কুমারের আত্মাকে শান্তি দিন ইহাই আমাদের কামনা।

৺অক্ষয়কুমার বিশ্বাস

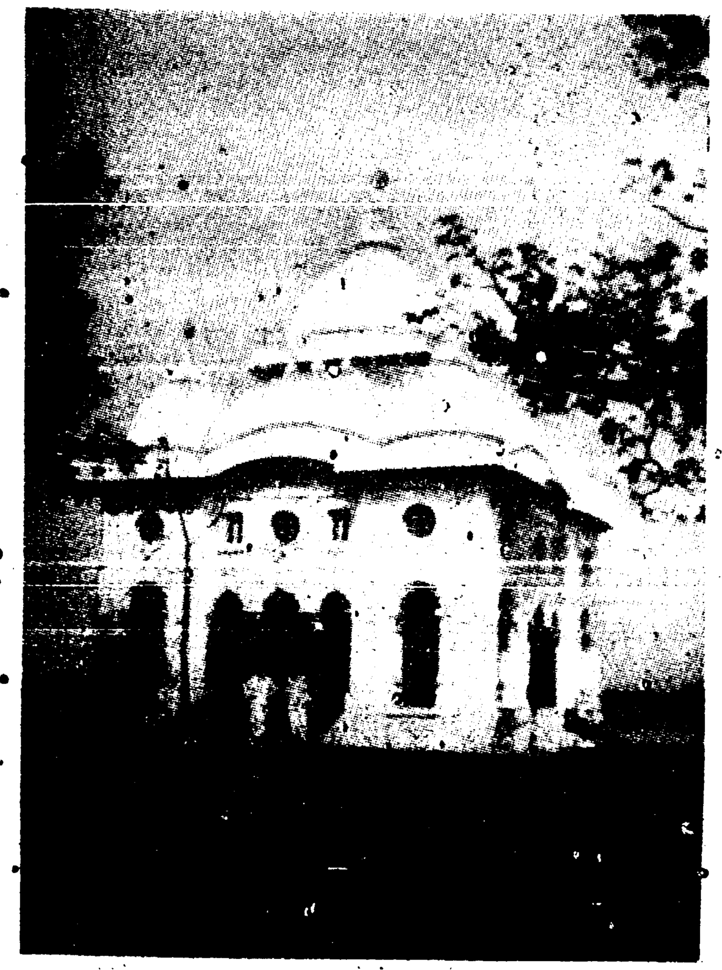

বেলুড় মঠের একটি দৃশ্য

হিন্দুর মহাতীর্থ
স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দির

শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র

পৌষ-প্রাতে

(সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—গ্রাঃ নং ১৩৭২)

ঘুম থেকে উঠে দেখি সকালবেলা,
তপনের তেজ নাই,
বাতায়নে রোদ নাই,
নাই আর ফুলে ফুলে মধুপ-মেলা।
নাই বনে কলরব
চুপচাপ অজি সব,
ছুটে ছুটে মৃগশিশু করে না খেলা।
সবি আজ মৃতপ্রায়
পাখী গান নাহি গায়,
হিম-বুড়ো এল ব'লে করে যে হেলা।
ধরণীর নাই হাসি,
গাছে নাই ফুলরাশি,
নিমেষেতে যায় কেটে ছোট্ট বেলা।

সন্দেশ

আমাদের 'রামধনু' ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে সমস্ত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল—রাজা অষ্টম এড্ওয়ার্ড্ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং তাঁর জায়গায় নূতন সম্রাট্ হইলেন তাঁর দ্বিতীয় ভাই, যিনি এত দিন ডিউক্ অব্ ইয়র্ক্ নামে পরিচিত ছিলেন। রাজা এড্ওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের কারণ সংক্ষেপে এই—মিসেস্ সিম্প্সন নামে এক মহিলাকে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতে এবং বিলাতের বাহিরে অনেকের ধারণা হয় যে, মিসেস্ সিম্প্সন রাণী হন্ ইংল্যাণ্ডের অনেকেই তা পছন্দ করেন না। সেই জন্যই রাজা এড্ওয়ার্ড্ স্বেচ্ছায় ভাইকে রাজ্য দিয়া নিজে বিদায় লইলেন।

নূতন ও পুরাতন রাজার ছবি এ মাসে দেওয়া সম্ভব হইল না, আগামী মাসে দেওয়া হইবে।

* * *

কয়েক বছর পর পর ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে

অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টেষ্ট্ ম্যাচ হয় তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এ বছরও অষ্ট্রেলিয়ায় এই দুই দলে টেষ্ট্ খেলা হইতেছে। সম্প্রতি প্রথম টেষ্ট্ শেষ হইয়াছে; তাহাতে ইংল্যাণ্ড ৩২২ রানে জয়লাভ করিয়াছে। প্রথম ইনিংস্‌এ ইংল্যাণ্ড ৩৫৮ রান্ করে। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যাট্স্‌ম্যান্ হ্যামণ্ড্ এই ইনিংসে কিছুই রান্ করিতে না পারায় সকলেই ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মুখ রাখিয়াছেন লেল্যাণ্ড—১২৬ রান্ করিয়া। দ্বিতীয় ইনিংস্‌এ ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন্ এলেন ৬৮ করেন—এই ইনিংস্‌এ ইংল্যাণ্ডের মোট রান্ হয় ২৫৬।

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস্‌এ করে ২৩৪। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংস্‌এ তারা একেবারে অতি বিশ্রীভাবে হারিয়া যায়। আগের দিন বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের অবস্থা খারাপ ছিল। তার উপর ইংল্যাণ্ডের দুই বোলার এলেন আর ভোস্ এমন বল দিতে সুরু করেন যে মাত্র ৫৮ রান্ করিয়াই ৭১ মিনিটে, অষ্ট্রেলিয়ার সব খেলোয়াড় আউট্ হইয়া যান (শুধু ম্যাক্‌কর্ম্মিক অসুস্থ হইয়া পড়ায় ব্যাট্ ধরেন নাই)। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাট্স্‌ম্যান্—অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন্ ব্র্যাড্‌ম্যান্‌কেও শূন্য রান্ করিয়াই আউট্ হইতে হয়। এমন শোচনীয় পরাজয়—এত কম রান্ গত ৩৪ বছরের মধ্যে টেষ্ট্ খেলায় কোন দিন হয় নাই। ১৯০২ সনে একবার অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট্ ম্যাচে ৩৬ রান্ করিয়াছিল।

* * *

এবার সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত নাট্যকার ও'নীল, ইহার বাবা-মা দু'জনেই আয়ারল্যাণ্ডের লোক। ১৮৮৮ সালে ইহার জন্ম হয়। "Thirst", "Anna Christie", "Beyond the horizon" প্রভৃতি ইহার বিখ্যাত বই।

* * *

আগামী বড়দিনের ছুটীতে রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের ১৪শ অধিবেশন হইবে। মূল সভাপতি হইবেন ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন্।

* * *

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই কোন না কোন জন্তু পোষা হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে সেখানে শতকরা আশীটি পরিবারে এই রকম পোষা জন্তু আছে—আর এদের জন্য প্রতি বছর সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে ৮৭ কোটি টাকা খরচ হয়।

* * *

আমেরিকায় আজকাল কোন কোন জায়গায় কৃষকেরা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে জমিতে সার দেয়। ইহার ফলে নাকি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রচুর ফসল পাওয়া যায়।

* * *

আমরা যে সব জল খাই (নদীর জল, কুয়ার জল, টিউবওয়েলের জল) তার মধ্যে নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য মিশান থাকে, তাই আমরা জলে একটা স্বাদ পাই—আবার ভিন্ন ভিন্ন জলে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। আসল জলের কিন্তু কোন স্বাদ নাই। জল হইতে এই সব রাসায়নিক দ্রব্য পৃথক্ করিয়া ফেলিয়া সে জল খাইলে একেবারে বি-স্বাদ লাগিবে।

* * *

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নম্বর দিয়া খাতায় টুকিয়া রাখিতেন। সারা জীবনে তিনি এই রকম পরীক্ষা করিয়াছিলেন ১৬০৪১টি।

রাজা এলফ্রেডের সময়ে ঘড়ির আবিষ্কার হয় নাই। তিনি ঘড়ির কাজ সারিতেন মোমবাতি দিয়া। তাঁর ঘরে একটা বড় মোমবাতি সর্ব্বদা জ্বালাইয়া রাখা হইত। মোমবাতি কতটা ক্ষয় হইল দেখিয়া তিনি সময় ঠিক করিতেন।

*　　*　　*

জাপানে ছেলেমেয়েরা দুষ্টামী করিলে বা পড়াশুনায় অবহেলা করিলে অনেক সময়ে তাদের শাস্তি দেওয়া হয় ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া। স্কুল তাদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এত আমোদের খোরাক যোগায় যে এই শাস্তিই তাদের কাছে ভীষণ শাস্তি বলিয়া মনে হয়—এবং স্কুলে যাইতে পাইবার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আমাদের দেশে অনেক সময়ে এর ঠিক উল্টা ব্যাপার দেখা যায় না কি?

*　　*　　*

হাকিন সাহেব নামে এক জজ্ একবার একজন আসামীকে পাচ মিনিটের জন্য জেল দিয়াছিলেন—১৮৮৭ সনে। পৃথিবীর মধ্যে এটিই বোধ হয় সব চেয়ে কম সময়ের শাস্তি!

*　　*　　*

পিটার দি গ্রেট্ রাশিয়ার খুব বড় রাজা ছিলেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিয়ম করেন তাঁর রাজ্যের প্রত্যেক দাড়িওয়ালা লোককে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হইবে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাশিয়ায় এই দাড়ির ট্যাক্স ছিল। তার পর দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের সময়ে এই ট্যাক্স তুলিয়া দেওয়া হয়।

*　　*　　*

এইচ্ বাট্স্ একজন ভাল ফুটবল-খেলোয়াড়। একবার দৈবদুর্ঘটনার ফলে তার একটা ঠ্যাং কাটিয়া ফেলিতে হয়। ডাক্তারেরা সেখানে একটা কাঠের ঠ্যাং যুড়িয়া দেন। কিন্তু বলিহারী বাট্স্‌কে, সে ফুট্‌বল্ খেলা ছাড়িল না, ঐ কাঠের ঠ্যাং দিয়াই সে খেলা আরম্ভ করিয়াছে।

গত মাসের ধাঁধা

গত মাসের ধাঁধার ভাঙ্গাটি এইরূপ হইবেঃ—৫৯১৪৪৩

আর সমস্তই ঠিক থাকিবে। ছাপার ভুলে ৪এর জায়গায় ৯ ছাপা হওয়ায় অনেকেই ধাঁধাটির ঠিক উত্তর বাহির করিতে পারেন নাই। কাজেই ধাঁধাটি আর একবার দেওয়া হইল; উত্তরদাতাদের নাম আগামী বারে বাহির হইবে। শ্রীপাঁচুগোপাল ঘোষ ও শ্রীপুষ্পলতা রায় (গারুলিয়া) ছাপার ভ্রম সত্বেও নির্ভুল উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

লুকানো সম্বন্ধ :—নীচের দশটি পদে যে সব — চিহ্ন আছে, সে জায়গাগুলি নানা রকম সম্বন্ধবাচক (বাবা, মা, নাতি, প্রভৃতি) শব্দ দিয়ে পূরণ করতে হবে :

(১) এ যুগে যুদ্ধের দা—র শব্দ বারো— ব্যাপার।
(২) এ— থেকো না ; ওদের সঙ্গে —, নইলে তোমায় — দেবে।
(৩) লোকটা নিশ্চয়ই পাগল ; — — কিন্‌ছে তো — কিন্‌ছে।
　　　　　　　　　　১　২
(৪) দু' ঘণ্টা থেকে ধনুকের — —য় দাঁড়িয়ে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে।
(৫) ছাত্রটি, কো— — কোথায়, সব মুখস্থ করেছে।
(৬) আনাড়ি খেলোয়াড়ের মাঠের শো— দেখা সার।
(৭) না—নীর গল্প করাই স্বভাব।
(৮) চালে ডালে এ—র হয়েছে মিশেল।
(৯) য— —লে, এত কম কেন?
(১০) স— —স হয়ে রহে দীনজন।

৩নং ধাঁধায় ১, ২ চিহ্নিত কথাটিতে দুটি লুকানো সম্বন্ধ আছে। কথাটি কিন্তু একটি ; — — চিহ্নের অর্থ, দুটি কথার অংশ দুটি চিহ্ন একত্র ক'রে একটি সম্বন্ধ হবে।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

১। সিপাহীবিদ্রোহ, ওয়াটালুর যুদ্ধ। (পাণিপথে তিনটি যুদ্ধ হয়—শেষটি ১৭৬১ সনে)

২। (ক) বৃটিশ বেলুচিস্থানস্থ গিরিসঙ্কট ; (খ) মহীশূরের অন্তর্গত—স্বর্ণখনি ; (গ) মণিপুরের রাজধানী ; (ঘ) বালীর সেতু ; (ঙ) ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত হ্রদ ; (চ) হিট্‌লারের সহকর্ম্মী; জার্ম্মেনীর প্রচার-বিভাগের মন্ত্রী ; (ছ) হিট্‌লারের সহকর্ম্মী, জার্ম্মেনীর অন্তর্গত প্রাসিয়ার প্রধান মন্ত্রী ; ৩। লোহা ; ৪। সব চেয়ে ভারী পারা, সব চেয়ে হাল্কা এলুমিনিয়াম্ ; ৫। আলকাৎরা, স্যাকারিন, ফিনাইল, হীরা, এমোনিয়া, এসেন্স, পেন্সিলের শীষ, গ্রামোফোনের রেকর্ড, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ; ৬। গ্রেহাম বেল।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যার সহিত রামধনুর নবম বর্ষ শেষ হইল, আগামী মাঘ হইতে দশম বর্ষ আরম্ভ হইবে। যাঁহারা এ বছর রামধনুর গ্রাহক আছেন আমরা আশা করি তাঁহারা সকলেই আগামী বছরও রামধনুর গ্রাহক থাকিবেন। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের আগামী বছরের বাৎসরিক কিংবা ষাণ্মাসিক চাঁদা (২॥৵০ কিংবা ১।৵০) আগামী ২০শে পৌষের মধ্যে মণিঅর্ডারে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কারণ মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে খরচও কম লাগে পত্রিকা পাইতেও কোনরূপ দেরী হয় না। যাঁহারা কলিকাতায় থাকেন তাঁহারা হাতে আমাদের কার্য্যালয়ে (১৬নং টাউন্‌সেণ্ড্ রোড্) কিংবা আমাদের শাখা কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড্) টাকা জমা দিতে পারেন। আমাদের নতুন শাখা কার্য্যালয় হওয়াতে অন্যান্য বারের মত এইচ্, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং-এ (শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্) আর এ বছর টাকা লওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইল না। কেহ কোনও কারণে আগামী বছর রামধনুর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া ২০শে পৌষের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। ঐ তারিখের মধ্যে চিঠি কিংবা টাকা না পাঠাইলে আমরা সকলকেই ভি, পি,তে পত্রিকা পাঠাইব। ভি, পি,তে অতিরিক্ত পাঁচ আনা ভি, পি, মাশুল লাগিবে। আশা করি গ্রাহকগণ সে ভি, পি, ফেরৎ দিয়া আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

আগামী বছর রামধনুতে দু'খানি ধারাবাহিক উপন্যাস বাহির হইবে—এবং আরও কয়েকটি নতুন বিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

বিনীত—

কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু

১৬নং টাউন্‌সেণ্ড্ রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।